11|9 N-B-1
8/29

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I

No. 11/93

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

13-2-77
28-2-77
15-3-77

৯- ৬২

11|73

প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা

দ্বাদশ পুষ্প।

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য

(পূর্বাশ্রমে
ডক্টর-বিভূতিভূষণ দত্ত,
এম্-এস্‌সি, পি, আর, এস্, ডি, এস্‌সি)
কর্তৃক বিরচিত

কলিকাতা, ১৯৬৩

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের পক্ষ হইতে
ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী
কর্তৃক প্রকাশিত

—প্রাপ্তিস্থান—

১। **প্রাচ্যবাণী-মন্দির**
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। **মহেশ লাইব্রেরী**
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

৩। **দাসগুপ্ত এণ্ড কোং**
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪। **চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং**
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

৫। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**
৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকান।

॥ মুল্য কুড়ি টাকা ॥

মুদ্রণালয়—
প্রাচ্যবাণী মুদ্রণালয়
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-১৯৯৫

ভূমিকা

11153

এই গ্রন্থের লেখক স্বামী বিদ্যারণ্য মহাশয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাঁহার গ্রন্থের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নাই। আমাদের পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় এই যে এই বহুমূল্য গ্রন্থটী আমরা বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছি।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের বুক্কারাও'য়ের প্রধান মন্ত্রী প্রখ্যাত সায়ণাচার্য বিদ্যারণ্য নামে বিভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। জগতের পরম সৌভাগ্যের ফলে আরো বছর ছয়শত পরে বিদ্যারণ্যের পাণ্ডিত্যের থেকেও অত্যধিক পাণ্ডিত্য সহ এক নিষ্কাম-কর্মযোগী এবং পরবর্তী জীবনে মুক্তযোগী সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যারণ্য নাম পরিগ্রহণ করে বিশ্ববাসীকে এক অপূর্ব বস্তু উপহার দিয়ে গেছেন—"ভাগবতধর্মের প্রচীন ইতিহাস" নামক এই গ্রন্থ। তজ্জন্য বর্তমান যুগের সাধকমণ্ডলী ও পণ্ডিত সমাজের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

এই গ্রন্থের প্রুফ-দর্শন কালে কখনও কখনও আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা করতে হয়েছে। একান্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের কোথাও পুস্তকের অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা নির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে কোনও প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হয় নাই। গ্রন্থটীর বিষয় ভাগবতধর্মের "প্রাচীন" ইতিহাস—মধ্যযুগেরও নয়। তদুপরি সেই সনাতন কালে যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়েছিল—দুর্লক্ষ্য ও অবর্ণনীয়—, তা' এই গ্রন্থ পড়্‌তে পড়্‌তে কেবলই যেন চাক্ষুষ হতে থাকে। সেই নিরন্তর প্রবহমাণ স্রোতোধারার গতি—কোথাও বা অতি খর, কোথাও বা মৃদু। স্বামী বিদ্যারণ্যের বিশ্লেষণ প্রভাবে স্রোতোমুখে উপলখণ্ড-জনিত বাধা, স্রোতস্বতীর ঘূর্ণ্যাবর্ত, উভয়তীরের শ্যামলশোভা, যুগযুগান্তরের গতিভঙ্গি সুস্পষ্ট পাঠকের মানসচক্ষে নিরন্তর সুস্পষ্টতর ও সুস্পষ্টতম হতে থাকে।

গণিতাধ্যাপকের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সন্ন্যাসীর পরম ভাগবত দৃষ্টি যুগপৎ একান্ত সমান্তরাল রেখায় সমগ্র গ্রন্থটীকে কেবল ভাগবতরসোত্তীর্ণ করেনি—, তদুপরি গ্রন্থের অগ্র-পশ্চাৎ, অন্তর্বহিঃ—সর্বত্র একান্ত স্বচ্ছতম দৃষ্টি এবং জ্ঞান-বৈশুদ্ধ্যের একটী প্রকৃষ্ট দ্যুতি নিরন্তর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জ্ঞানভক্তি—কর্মধ্যানের এমন অপূর্ব সমন্বয় সর্বযুগের ইতিহাসে বিরল।

পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের কৃতী ও কুশলী ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই॥

এই গ্রন্থ চার খণ্ডে সমাপ্ত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ ও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। আমরা আশা করি, আর এক বৎসরের মধ্যে শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্যজীর সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করতে সমর্থ হব॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী॥

প্রাচ্যবাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-১৯৯৫

পঞ্চচামরেণ

বিভূতিভূষণ-বন্দনম্

জগজ্জনৈকভূষণং তমোবিনাশপূষণং
সমগ্রভূততোষণং ত্রিতাপমূলশোষণম্ ।
শিবং শ্মশানবাসিনং রবীন্দুবহ্নিলোচনং
বিমুক্তভোগবাসনং ভজে বিভূতিভূষণম্ ॥

শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চতুর্ধুরীণস্য ॥

11/93

শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য

এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্যের পূর্বাশ্রমে নাম ছিল শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত। জন্ম ১৮১০ শকাব্দের (১৮৮৮ ইং) ১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী কানুনগোয়পাড়া গ্রামে। ইনি পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। পিতা ৺রসিকচন্দ্র দত্ত দরিদ্র হইলেও সাতিশয় নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি প্রাণান্তেও সন্দিগ্ধ সত্যও বলিতেন না। সাবজজের সেরেস্তাদারের চাকরীতে ঘুষের অপর্য্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকিলেও বৃহৎপরিবারের একমাত্র প্রতিপালক অর্থাভাবক্লিষ্ট রসিকচন্দ্র ঘুষের নামে শিহরিয়া উঠিতেন। আর মাতা মুক্তকেশী দত্ত ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী এবং দয়াশীলা মহিলা। ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরেও তিনি তাঁর দুঃস্থ প্রতিবেশীদিগকে অন্নাভাবে মরিতে দেন নাই। অতি কষ্টে এবং গোপনে সংগৃহীত নিজেদের খাবার চাল, পুত্রদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। পুত্রদের বলিয়াছিলেন, প্রতিবেশীরা উপবাসী থাকিলে তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন না। পিতা যেমন ছিলেন তীক্ষ্ণধী, মাতা তেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী ও প্রখর স্মৃতিশক্তিশালিনী। ৯৭ বছর বয়সে মারা যাওয়ার তিন চার মাস আগেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি তেমনই প্রখর ছিল। বিভূতিভূষণ যেমন পিতামাতার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাইয়াছিলেন, তেমন তাঁহাদের উক্ত সদ্‌গুণরাজি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

বলিতে গেলে তিনি আশৈশব সন্ন্যাসভাবাপন্ন ছিলেন। দশ এগার বছর বয়সেই তিনি পিতামাতাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না, সন্ন্যাসী হইবেন। স্কুলে পড়িবার সময়েই তিনি কৌপীন পরিধান করিতেন এবং পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা ধর্মগ্রন্থই সমধিক অধ্যয়ন করিতেন। তরুণ বয়সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; তখন হইতেই উপনিষদ্, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন; পাঠ্যপুস্তকপাঠে তত মনোযোগ না দিলেও ক্লাসের প্রথম ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিও লাভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব, শাস্ত্র এবং দর্শনের আলোচনায় অধিকতর আকৃষ্ট হন। ফলে পরবর্তী পরীক্ষায় বৃত্তি পান নাই, কিন্তু বেশ ভাল ভাবেই পাশ করেন। ১৯১৪ সালে মিশ্র গণিতে (Mixed Mathematics) প্রথম শ্রেণীতে এম্. এস্‌সি (M. Sc.) পাশ করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের গবেষণা আরম্ভ করেন। তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবেষণা-বৃত্তিও পাইতেন। পরে পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, D.Sc. ডিগ্রি, ইলিয়ট পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেন। ইহার আগেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র গণিতের লেকচারার (Lecturer) নিযুক্ত হন।

এই গবেষণা—অধ্যাপনাদি সমস্তই তাঁর পক্ষে বাহ্যিক ব্যাপার, বড় জোড়, নির্লেপ কর্মযোগ। কাজেই তিনি সর্বদা নির্লোভ, অপরিগ্রহী ছিলেন। বিজ্ঞান কলেজের স্যার রাসবিহারী

ঘোষ অধ্যাপকের পদ খালি হইলে, তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে বলা হয়। 'দুই দিন পরে আমি সন্ন্যাসী হইব, আমার পদোন্নতির প্রয়োজন নাই'—এই বলিয়া তিনি সেই শ্লাঘ্য পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। পক্ষান্তরে, যোগ্য লোক পাওয়া না যাওয়াতে, প্রায় তিন বৎসর যাবৎ তিনি সেই পদের যাবতীয় গুরু দায়িত্ব, বিনা অতিরিক্ত বেতনে, যোগ্যতা সহকারে বহন করেন। এই নিষ্কামতাবশতঃই তিনি শেষকালে গ্রহ-নক্ষত্র-গণিত (Lunar and Planetary Theory) পড়াইতেন। কারণ প্রত্যেক বৎসরই ঐই অতিকঠিন বিষয়ের পাঠার্থী ছাত্র হইত না। ছাত্র না থাকিলে পাছে চাকরী চলিয়া যায়, এই ভয়ে অন্য কেহ ইহা পড়াইতে চাহিত না। তাঁর ত সেই চিন্তা বা ভয় ছিল না। এই দিকে এই জ্ঞানযোগীর আত্মপ্রত্যয় ছিল অসীম। কোন বিষয়ের প্রতি যেমন তাঁহার স্পৃহাও ছিল না, তেমন বিতৃষ্ণাও ছিল না। ঐ দুরূহ কঠিন বিষয় ইতঃপূর্বে কোন দিন আলোচনা না করিলেও কঠোর পরিশ্রম সহকারে তাহা অধিগত করেন এবং অধ্যাপনার সৌকর্য্যার্থ নিজে বিস্তৃত নোট লিখিয়া ফেলেন। কোন বিষয়ই তাঁর পক্ষে অসাধ্য ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজে B. Sc. পড়িবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র তাঁহার সহপাঠী কোন কঠিন অঙ্ক কষিতে না পারিলে তাঁহার জেদ চাপিয়া যাইত। তিনি সেইটিই কষিয়া দিতেন। অথচ সাধারণতঃ তিনি অন্যান্য পাঠ্য বিষয় যেমন তেমন অঙ্ক নিয়াও বেশি সময় ব্যয় করিতেন না। তাঁর মূল উপজীব্য শাস্ত্রের, দর্শনের অধ্যয়ন এবং মনন। তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের আর একটি দৃষ্টান্ত বলা যাউক। এম্. এস্‌সি (M. Sc.) পরীক্ষার সাত মাস পূর্বে ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে সন্ন্যাসী হইবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার মেস হইতে সকলের অজ্ঞাতে নিরুদ্দেশ হন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ হরিদ্বার হইতে তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া আসেন। গুরুজনের প্রতি অবিনয় তিনি কখনও প্রদর্শন করেন নাই। বড় দাদা অভিযোগ করেন 'পড়াশুনা করে নাই, পরীক্ষায় ফেল হইবার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।' বড় দাদা এই অভিযোগ করিতে পারেন। কলেজের পাঠ্য বিষয় নিয়া বিভূতিভূষণ খুব কমই ব্যস্ত থাকিতেন। ঐ অভিযোগ করিলে তিনি বন্ধুবান্ধবদের বলিয়াছিলেন, 'কি ? আমি ফেল হইবার ভয়ে পালাইয়াছি। আচ্ছা, M. Sc.তে First Class নিয়া ছাড়িব।' এবং সত্য সত্যই তিনি প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ছয় মাস বাকি ছিল। এই সময় তাঁহার চারিধারে সমস্ত গণিতের বহি খুলিয়া মধ্যস্থলে বসিতেন। কতক্ষণ এই বই, কতক্ষণ অন্য বই—এই করিয়া পরীক্ষার পড়ায় নিমগ্ন থাকেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আগেই একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধও (paper) লিখিয়া ফেলেন। তখন পরীক্ষায় Thesis বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেওয়ার নিয়ম ছিল না।

তিনি আজন্ম শঙ্করপন্থী। বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বা জীবব্রহ্মৈকাত্মবাদ যেন তাঁহার প্রাক্তন সংস্কার। ইহাতে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রভাব কতদূর ছিল বলা যায় না। সন্ধ্যাহ্নিক, উপাসনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা করিতে তাঁহাকে কোন দিনই দেখা যায় নাই। ছাত্রাবস্থায় আসন-প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে উহা ত্যাগ করেন। তিনি গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ, দান, দম, স্বাধ্যায় ইত্যাদি দৈবী সম্পদের অনুশীলন করিতেন। কর্মে অনাসক্তি, সত্যে নিষ্ঠা, জীবব্রহ্মৈক্যের মনন ছিল তাঁহার 'তপঃ'।

তিনি অন্যান্য সংসারী লোকের মত যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন এবং পূর্ণ উদ্যমে করিতেনও। কোন বিরাট নিমন্ত্রণের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি রন্ধন কার্য্যও জানিতেন। নানা ব্যাধির চিকিৎসাও জানিতেন এবং ঔষধও সঙ্গে থাকিত। রোগীর সেবায় ছিলেন নিপুণ। চট্টগ্রাম হইতে আগত ছাত্রদের সর্ববিধ সাহায্য করিতে ছিলেন তৎপর। চট্টল সুহৃদ্ সমিতির সম্পাদকও ছিলেন। অথচ তিনি নির্লিপ্ত। শোকে দুঃখে বিপদে বিচলিত হইতেন না। ভ্রাতা, ভগ্নী, তাঁহার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যুতেও তাঁর কোন প্রকার মনোবিকার বা চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। গীতার সেই 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'-ভাব, 'বীতরাগভয়ক্রোধ'-ভাব অনুশীলন করিতেন।

সাধারণ সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় আচার নিয়মের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠার আতিশয্য ছিল না। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া জনৈক ভদ্রলোক বাগানের কাজ ফেলিয়া সেই অবস্থায় তাঁহার কাছে চলিয়া আসেন। দূর হইতে বলেন 'আমাকে স্পর্শ করিবেন না, কত নোংরা ঘাঁটিয়া আসিয়াছি।' তিনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলেন, 'পেটের ভিতর যে মল আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন কি ?' টানিয়া তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দেন। এইটি তাঁর দেহত্যাগের দুই তিন মাস আগের কথা। অথচ তিনি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। জীবনে তিনি কখনও মাংস মুখে নেন নাই। দুই বৎসর বয়সে তদীয় জননী তাঁহার মুখে এক টুকরা মাংস খণ্ড দিলে তিনি থু থু করিয়া ফেলিয়া দেন। আর কেহ কোন দিন তাঁর মুখে মাংস দিতে সাহস করে নাই। প্রবেশিকা পড়িবার সময়েই মৎস্যাহার ত্যাগ করেন। খুব সম্ভব ১৯২০ সালে তিনি সন্ন্যাসী হইতে মন্ত্র দীক্ষা নেন এবং ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে মহাপ্রয়াণ করেন। এই বৎসরও তাঁহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রদের আপন পাতে বসাইয়া স্বহস্তে মাছ মাংস খাওয়াইয়া দেন। তারপর হাত ধুইয়া ফেলিয়া নিজে আহার করেন। এমনও দেখা গিয়াছে তাঁহারই থালার একধারে কোন বালক মৎস্যাদি খাইতেছে, তিনি অন্য ধারে তাঁহার আহার্য গ্রহণ করিতেছেন। ছেলে মেয়েদের বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাকেই দেওয়া খাবার তাহাদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন।

বাস্তবিক পূর্বাশ্রমের বাড়ীতে কিংবা ভাইদের বাড়ীতে আসিলে তাঁহার গৈরিক বসন এবং ভাস্বর ব্রহ্মজ্যোতি ছাড়া তাঁহার আচার-ব্যবহারে সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ দেখা যাইত না। তিনি সকলের সঙ্গেই মন খুলিয়া কথাবার্তা বলিতেন, ঠাট্টা বিদ্রূপও করিতেন। 'প্রকৃতি-সম্ভাষণে'ও বিরূপতা ছিল না। পূর্বাশ্রমের ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতেন ; জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর পদধূলি গ্রহণ করিতেন। যার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা গৃহী ভাইদের চেয়েও ভালরূপে করিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহীকে গৃহীর মত সুপরামর্শ দিতেন। শিক্ষিতা যুবতীর অবাঞ্ছনীয় প্রেমপ্রবণতা সংযত করিতেও এই সন্ন্যাসীর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার prostate gland অপারেশনের সময় এই সন্ন্যাসী পুষ্কর হইতে আসিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

পূর্বাশ্রমের অনুজ যখন পত্নীশোকে মুহ্যমান, তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পুষ্কর হইতে

আসিয়া তার পার্শ্বে বহুদিন ছিলেন। তাঁহার এমন আত্মপ্রত্যয় ছিল যে সংসারের প্রলোভনকে ভয় করিয়া তিনি দূরে সরিয়া যাইতেন না। সংসারের ভয়ে তাঁহার সন্ন্যাস নহে।

তিনি ছিলেন অকুতোভয়। বাল্যকালেও তাঁহার ভূতের ভয় ছিল না। অমাবস্যার রাত্রি নিশীথেও শ্মশানে কিংবা গোরস্থানে একাকী গিয়া লাঠি দিয়া গুঁতাইয়া গুঁতাইয়া ভূত বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। সেই রকম কামিনীর ভয়, কাঞ্চনের ভয়, সাংসারিক কর্মের ভয়, স্নেহপ্রীত্যাদি আসক্তির ভয়, সুখদুঃখে বিচলিত হইবার ভয় তিনি জয় করিয়াছিলেন। পুষ্করে থাকা কালে এক রাত্রে মলত্যাগের জন্য বাহিরে বসিলে এক ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহার দিকে কিছু কাল তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। এক কথায়, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞতার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে ক্ষুধার বশ ছিলেন। স্কুল হইতে ফিরিয়া সামান্য জলখাবার পাইতেন। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় খানিকটা আতপ চাল খাইয়া ফেলিতেন। অথচ তাঁর পেটুকতা দোষ ছিল না; নিমন্ত্রণেও অত্যধিক আহার করিতেন না। পুষ্করবাসের সময় এই ক্ষুধাকেও জয় করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম অন্নসত্রে গিয়া রুটি ডাল নিতেন। পরে আকাশব্রত অবলম্বন করেন। আহারের জন্য গৃহের বাহিরে ভিক্ষাটন করিতেন না। প্রথম তিন চারি দিন খুব অসুবিধা হইয়াছিল। তার পর আর অসুবিধা হয় নাই। রোজই ভিক্ষান্ন বাসায় কেহ না কেহ দিয়া যাইত। কোন কোন সন্ন্যাসীও নিয়মিত তাঁহার ভিক্ষান্ন পাঠাইয়া দিতেন। যে যাহা পাঠাইত, তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কোন বেলা কিছু না মিলিলেও ভিক্ষান্নে বাহির হইতেন না। তবে এমন দিন খুব কমই হইত। আবার বেশি দিলেও সব খাইতেন না। দুপুরবেলা দুইখানা রুটি মাত্র তাঁহার খাদ্য। বাদ বাকী তাঁহার সহচরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। পুষ্করের ময়ূর, কাক, কপোত, কাঠবিড়ালী প্রভৃতিই ছিল তাঁহার সহচর 'পরিবার'। তিনি ডাক দিলেই তাহারা আসিয়া হাজির হইত। তাহারা তাঁর হাত হইতেই খাদ্য গ্রহণ করিত। তিনি অভয় দিয়া অন্য কাহারো হাত ধরিয়া থাকিলে তাহার হাত হইতেও তাহারা খাদ্যগ্রহণ করিতে ভীত হইত না। একবার রাজস্থানের এক রাণী শিকার হইতে তাঁহার ঘরে আসিয়া হাজির হন। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজি তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকাডাকি করিলেও কোন কাক পক্ষী হাজির হয় নাই। মানুষের হিংস্রবৃত্তি তাহারা ভালই বোঝে। রাত্রে তাঁহার আহার ছিল সামান্য ছোলা ভাজা বা দুই তিন খানা পাঁপর ভাজা। প্রথম প্রথম এক কাপ দুধ, শেষে এক কাপ চা মাত্র।

তিনি তরুণ বয়সে নিদ্রার বশ ছিলেন। লোকে বলিত, বিভূতি দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ঘণ্টাই ঘুমায়। অবশ্য সে সময় কখনও কখনও অর্জিত জ্ঞানের মনন করিতেন কিনা বলা শক্ত। শেষে দেখা গিয়াছে, তিনি সেই নিদ্রাকেও জয় করিয়াছেন। নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকিলেও আসলে তিনি কোন বিষয়ের মনন-নিদিধ্যাসন করিতেছেন মনে হইত। অবশ্য তিনি যে শেষ কালে একেবারে নিদ্রা যাইতেন না, তাহা নহে।

আগেই বলা হইয়াছে তিনি নির্লোভ ছিলেন। বহু টাকা রোজগার করিয়াছেন। অধ্যাপকের বস্ত্রের মধ্যে ছিল খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী এবং ফতুয়া—তাহাও সংখ্যায় অত্যল্প।

অন্য কোন ব্যসন ছিল না ; চা, সিগারেট, সিনেমা, চপ কিছুই না। ভাইদের, আত্মীয়-বন্ধুদের অনাত্মীয় দরিদ্র ছাত্রদের, এবং দুর্গতদের জন্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। সংসারের খরচও নির্বাহ করিয়াছেন। চাকরিতে পদত্যাগ করিয়া, জনৈক আত্মীয়ের অনুরোধে এবং তাহার সাহায্যার্থে, আবার সেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন এবং বছরখানেক চাকরি করেন। চাকরির মায়া যেমন ছিল না, চাকরি ছাড়িবার মায়াও ছিল না। তিনি নিজের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সমস্ত টাকা নিজ অনুজকে দিয়া যান। তাঁহার ব্যাঙ্কে যৎসামান্য টাকা যাহা ছিল, পুষ্করগমনের পরেও আসিয়া সেই টাকা তাঁহার ভাইকে দিয়া যান। এই আবাল্য সন্ন্যাসী ছাড়া তাঁর ভাইদের মধ্যে অন্য কেহ খরচের এমন খুঁটিনাটি হিসাব কেহ রাখে বলিয়া জানা নাই। তিনি প্রতিটি পয়সার হিসাব খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। হিসাবের খাতায় দেখা যায়, তিনি বহু জনের সাহায্যার্থে হাজার হাজার টাকা দিয়াছেন—দয়াও নয়, দানও নয়। ইচ্ছা হইলে ফেরত দিবে, না পারিলে দিবে না। শত শত টাকা খরচ করিয়া মেধাবী দরিদ্র ছাত্রকে ডাক্তারী পাশ করাইয়াছেন। এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই কিছু ফেরত দেন নাই। দান দয়াও যেন এক প্রকার আসক্তি ; কাজেই দয়ার বশে দান বা সাহায্য করিতেন না। কর্মযোগীর কর্মযোগ হিসাবে 'নৃযজ্ঞ' সাধন করিতেন। স্বদেশী ব্যবসার উন্নতিকল্পে বহু নূতন নূতন কোম্পানীর দশ বার হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়াছিলেন। এক পয়সাও লভ্যাংশ পান নাই। তাতে তাঁর দুঃখও ছিলনা। তিনি দেশের প্রতি কর্তব্য করিতে গিয়াছিলেন। কোন কোন কোম্পানী তাঁহার গৃহত্যাগের পূর্বেই ডুব মারে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বাদ বাকী সমস্ত শেয়ার তিনি তাঁহার অনুজকে দিয়া দেন। সে সমস্ত কোম্পানীও লাল বাতি জ্বালায়।

তিনি দিবারাত্র গুরুপ্রদত্ত মহাবাক্যের মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতেন, শাস্ত্র, দর্শন বিষয়ক নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নোট রাখিতেন। বিশাল বৈদিক সাহিত্যের এমন কোন গ্রন্থ, তার ভাষ্য, সমালোচনা নাই যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। সেই রকম সমস্ত পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে বই কলম পাশে রাখিয়া দিতেন। আবার সেই লোক চলিয়া গেলে বইটি কোলের উপর টানিয়া নিতেন। বয়স্ক লোককে বাড়ীর ফটক অবধি আগাইয়া দিতেন। আজমীঢ় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (Archæological Survey of India) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছিলেন, বিদ্যারণ্যজী তাঁহাদের বিরাট লাইব্রেরীর নানা বিষয়ক সমস্ত বইই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। কলিকাতা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি যে সমস্ত সহরেই যাইতেন, তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কিংবা অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার হইতে বই আনাইয়া পড়িতেন। লোকে বলিত, তাঁহাকে জ্ঞানার্জনের নেশায় পাইয়াছে। অথচ তাঁর গৃহে তিনি নিজস্ব কোন বই সংগ্রহ করেন নাই। আশ্চর্য্যের কথা, পঠিত অসংখ্য গ্রন্থের খুঁটিনাটি তাঁহার স্মৃতিতে ধৃত ছিল। তাঁহার লিখিত 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী' (যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রিত হইতেছে) এবং এই 'ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস'—এই দুইটি গ্রন্থের পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে এই ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারীর কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং অধ্যয়নের পরিধিও কত অসীম! এক একটি কথার

সমর্থনে দশবারটি বৈদিক বা পৌরাণিক গ্রন্থের শ্লোক, অধ্যায় ইত্যাদির নম্বর নির্ভুল ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম বয়সে মনের প্রবণতা একটু বিচারমুখী, সমালোচনা-পরায়ণ ছিল, সম্ভবতঃ আপন জ্ঞানানুশীলনের সাধন হিসাবে বা বোধসৌকর্য্যার্থ। পরিণত বয়সে পুষ্করের তথা রাজস্থানের এই বিখ্যাত 'বাঙ্গালী মহারাজ'কে নানা পন্থী সাধু, সন্ত, বিদ্বজ্জন নিজ নিজ সাধন, ভজন, শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেন। 'বাঙ্গালী মহারাজ' কোন দিনই নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যেককেই নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা এবং সাধনার অনুযায়ী কথা বলিতেন। 'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা' জ্ঞানে পরিহার করিয়া চলিতেন। তিনি গুরুগিরি পছন্দ করিতেন না, কাহাকেও শিষ্য করেন নাই, গুরুশিষ্য হিসাবে উপদেশও দেন নাই। ভিন্ন পন্থার দোষদর্শন করাইয়া স্বকীয় জ্ঞানবিশ্বাস কাহার উপর চাপাইয়া দেন নাই। সাধনামাত্রেই সত্যের সাধনা। সাধনা ঠিক থাকিলে একদিন না একদিন সত্যের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবেই। মায়ার আবরণ টুটিয়া গিয়া মানুষের স্বভাব-ব্রহ্মত্ব দেখা দিবেই। নির্গুণ অদ্বৈতবাদী যদি কোন দেবতা মানিয়া থাকে, তাহা হইলে দেবদেবীর মধ্যে মহাযোগী শিব ছিল তাঁর প্রিয়। বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই ঠাকুর প্রণামের সময় পড়িয়া থাকে,

পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরিঃ॥

শঙ্করপন্থী যুবক ছাত্রাবস্থাতেও এইটি পাঠ করা পাপ মনে করিতেন। এই মন্ত্র সর্বথা হেয় মনে করিতেন। বলিতেন, এ জীব-ব্রহ্মের অবমাননা।

তিনি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। কাছে থাকিলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহাদের চরণে মাথা রাখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন এবং পদধূলি গ্রহণ করিতেন। তদীয় পিতৃদেব ১৯২৬ সালে দেহত্যাগ করেন। তার বার বছর পরে বিভূতিভূষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনেও মাতৃদেবীর প্রাতঃকালীন প্রণাম এবং পদধূলি গ্রহণ—এই ধর্মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তদীয় মাতা এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাঁহার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাবা যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে বিবাহ করিব।' পিতাও তাঁহাকে গৃহী করিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু, আগেই বলিয়াছি, তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। কারো ধর্মে ব্যাঘাত জন্মান তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। মাতা এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ বিভূতিভূষণকে আদেশ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তদীয় পিতৃদেব বলিয়াছিলেন, 'বিভূতি শাস্ত্রবিদ্। আমার চৌদ্দ পুরুষেও এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই। কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা অধর্ম সে আমার-চেয়ে ঢের বেশী বোঝে। তাহাকে বিবাহ করাইলে যদি অধর্ম হয়, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে বলিতে পারিব না।' অথচ বিভূতি বিবাহ করিতেছে না বলিয়া তিনি সঙ্গীদের কাছে দুঃখ করিতেন। যেমন পুত্র তেমন পিতা অথবা যেমন পিতা তেমন পুত্র। স্নেহের বশেও যে পিতা তাঁহার ধর্মে ব্যাখ্যাত জন্মাইবেন না, পুত্র ভাল করিয়াই জানিতেন। পিতার মৃত্যুর পরে মাতার অনুমতি নিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মাতাকে কথা দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পরও তাঁহাকে বছরে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যারণ্য তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। মাতার

কাছে চিরকালই তিনি সেই 'বিভূতি'। গৃহত্যাগের পরে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁহার মাতাকে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করাইয়া আনেন। তদীয় মাতা মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে কলিকাতায় তাঁহার অন্য পুত্রের কাছে আসিয়াছিলেন। মাতৃদেবীর শেষনিঃশ্বাসত্যাগের কয়েক মাস আগে হইতেই তিনি তাঁহার কাছে ছিলেন। মৃত্যুর সময় মাতার শয্যাপার্শ্বে ভূমিতে আসন করিয়া বসিয়াছিলেন; মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব হইতেই মাতার কষ্টলাঘবার্থে মাতার আশু জীবনাবসানের প্রার্থনা করিতেন। ৯৭ বছর বয়সে ১৯৫৮ সালের ২৪শে মার্চ তদীয় মাতৃদেবীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। ছয়মাস পরেই তিনি তাঁর আদরের বিভূতিকে কোলে টানিয়া নেন। মৃত্যুর পর কিছু পথ মাতার শবানুগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্মশানে যান নাই। তাঁর শ্রাদ্ধের দিনও অন্য বাড়ীতে গিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধও করেন নাই। গৃহীর বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দাহকার্য্যে উপস্থিত থাকা নাকি সন্ন্যাসের নিয়মবিরুদ্ধ। ১৯২৬ সালে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে অন্য ভাইদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। সে সন্ন্যাসের বহু পূর্বে। তার আগেই কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী গুরু হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেবল মাতাপিতাকে নয়, জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রভৃতি গুরুজনকেও তিনি যাবজ্জীবন ভূনত হইয়া প্রণাম করিতেন। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর পায়েও প্রণাম করিতেন। অথচ সাধুসন্ন্যাসী ঠাকুর দেবতাকে সন্ন্যাস অবস্থায় প্রণাম করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি কিছু কাল 'নিঃস্তুতি-নির্নমস্কারঃ' হইবার সাধন-প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে সেই ভাব ত্যাগ করিয়া নির্বিশেষে সকলকেই বলিতেন 'ওঁ নমো নারায়ণায়।' জনৈক সাধুকে প্রণাম না করিলে সাধুর ভক্ত কোন ভদ্রলোক এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রণাম করিয়াছি কিনা, সাধুকেই জিজ্ঞাসা কর।' সাধু বিদ্যারণ্যজীকে দেখিবামাত্র উঠিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহাকে এক ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘণ্টা খানেক পরে দুইজনেই বাহির হইয়া আসিলেন। মোট কথা, সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে, আদর্শ গৃহীর মতনই মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের সহিত ব্যবহার করিতেন। কোন কালে কাহারো সংস্রব এড়াইয়া চলেন নাই। তিনি সম্ভাব্য দেহত্যাগের আভাষ আগে হইতে পাইয়া থাকিবেন। বলিয়াও ছিলেন, 'মা আমাকে ডাকিতেছেন।' শেষবার পুষ্কর যাত্রার পূর্বে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিচিত লোক এমন কেহ বাকি ছিল না, যার সঙ্গে সাক্ষাত করেন নাই। নিজের ব্যাধি-দুর্বল শরীর নিয়াও অনেকের বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি যেন পরমহংসদেবের 'মাখন'; সংসারের জল তাঁহার গায়ে লাগিত না। তাঁহার সাধনার সৌকর্য্যার্থে একটু দূরে সরিয়া থাকিতেন। তিনি সজনতাতেও নির্জ্জনতার অনুভাবনা করিতেন।

দেহরক্ষার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি কোন কলেজের অধ্যাপককে ভারতীয় দর্শনের গবেষণাকার্য্যে পরিচালিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য কয়েক মাস কাশী আসিয়া বাস করেন। তাঁহার লিখিত মুদ্রীয়মান গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও তিনি জৈন দর্শন, বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ইতিহাস-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক অসম্পূর্ণ নিবন্ধ

আছে। প্রফেসার থাকা কালে এবং গৃহত্যগের পরেও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গত ডক্টর অবধেশ নারায়ণ সিংএর সহিত একত্র যোগে তিনি হিন্দু গণিতের ইতিহাস (History of Hindu Mathematics) নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লেখেন। তাহার দুই খণ্ড মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক অবধেশের আকস্মিক মৃত্যুতে তৃতীয় খণ্ড হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক থাকা কালেই তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের স্ফুরণ হইতে থাকে। একবার পল্লীগ্রামস্থ তাঁহার প্রতিবেশীর একটি গরু হারাইয়া যায়; তিন চার দিন ধরিয়া পাওয়া যায় না। এমন সময় তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যান। প্রতিবেশার মেয়েরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বিভূতি! তুই তো অনেক যোগটোগ করিস্। বল্ তো দেখি, আমাদের গরুটা গেল কোথায়?' তিনি বলিলেন, 'আমি ঐ-সব কিছু জানি না।' তাঁহারা চাপিয়া ধরিলেন, 'তুই জানিস্, বল্।' প্রতিবেশীদের আগ্রহে তিনি একটু মন স্থির করিলেই দেখিতে পাইলেন, গরুটা পদ্মপুকুরের দক্ষিণ পূর্ব কোণ দিয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। বাড়ীর ভিতরে বসিয়া কথাবার্তা হইতেছিল। সেই বাড়ীর বাহির হইতেও ঐ পুকুর দেখা যায় না। তাহারা ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সত্যই তাই। ইহা হইল ১৯১৭।১৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বিভূতিভূষণ নিজেই জানিতেন না যে, তাঁহার দৃষ্টির আবরণ ঐরকম ভাবে খসিয়া গিয়াছে। যোগৈশ্বর্য্যের অনুশীলন সাধনার বিঘ্নস্বরূপ ভাবিয়া তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু মনে হয়, পরেও তাঁহার সেই শক্তি ছিল। ১৯৩০ সালেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানিকতলায় থাকিবার সময় তাঁহারই প্রদত্ত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর গলার হার চুরি যায়। সকলেই বাসার ঠাকুরকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধমকাইতে থাকে। শেষে পুলিসে খবর দিবার কথা উঠিলে তিনি বলেন 'তোমাদের অমুক আত্মীয় নিতে পারে।' বহু বছর পরে সেই আত্মীয় তাহা স্বীকার করে। তাঁহার যোগৈশ্বর্যের আর কোন প্রমাণ জানা নাই।

তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরকায়-প্রবেশ বিশ্বাস করিতেন। বিখ্যাত তিব্বতী বাবা পরকায় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর মুখে শোনা গিয়াছে। প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগীরা আপন প্রাণ উৎক্রমণ করিয়া অন্য সদ্যোমৃত দেহে প্রবেশ করাইতে পারে অথবা নিজ পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তিনি নিজেও নাকি একবার নিজ প্রাণ উৎক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন সিদ্ধ যোগী উপস্থিত না থাকাতে শেষ মুহূর্তে সেই চেষ্টা ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রায় মৃতের মত শক্তিহীন হইয়া পড়েন। তবে তাঁহার অনেকবার মনে হইয়াছে, তাঁহার দেহ পড়িয়া আছে, তিনি অন্যত্র বিচরণ করিতেছেন।

তিনি পিতার দীর্ঘচ্ছন্দ দেহের গঠন এবং মুখের আকৃতি পাইয়াছিলেন। বিভূতিভূষণের ছিল সোনার মত উজ্জ্বল রঙ্। সন্ন্যাস অবস্থায় সেই দেহকান্তি আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি, ব্রহ্মবিদিব ভাসি।" তিনি বরাবর খদ্দর পরিতেন। সন্ন্যাসের পর সেই খদ্দরই গেরুয়া রঙ করিয়া নিতেন। পুষ্করের বাহিরে কোথাও গেলে গায়ে একটা ফতুয়া এবং হাঁটুর উপরে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া পড়িতেন। পুরাণ খদ্দরের এক টুকরা ছিল গামছা। কোন বালিশ রাখিতেন না।

দরকার মনে করিলে দ্বিতীয় ধুতিখণ্ড ভাঁজ করিয়া মাথার তলায় দিতেন। কাহারো বাড়ীতে গেলে বালিশ যে ব্যবহার করিতেন না, তাহা নহে। পুষ্করে তিনি শীতগ্রীষ্ম সহ্য করিবার চেষ্টা করিতেন, কৌপীন মাত্র পরিয়া থাকিতেন। পুষ্করের রাস্তায়ও সম্পূর্ণ নিরাবরণ ভাবে কৌপীনমাত্র পরিহিত হইয়া বাহির হইতেন। সেই সুঠাম সুপুষ্ট দীর্ঘায়ত হিরণ্ময় দেহ, সেই উন্নত আয়ত ললাট, সেই দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, চকচকে বিরাট বিরলকেশ মস্তক লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সাধু অধ্যাপক বিদ্যার অরণ্য বিদ্যারণ্য স্বামী পুষ্করের রাস্তায় উলঙ্গপ্রায় হইয়া চলিয়াছেন আর বহু নরনারী "বাঙ্গালী মহারাজ"কে করজোড়ে সভক্তি প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছে—এই অদ্ভুত দৃশ্যের কল্পনায়ও চমক লাগে। কোন কোন নারী বিব্রত বোধ করিতেন বলিয়া তিনি শেষে এই রকমভাবে বাহির হইতেন না।

কর্তৃত্ব-বুদ্ধি-বিরহিত হইবার সাধনায় তিনি শেষের দিকে এতটা প্রচেষ্টা করিতেন যে 'আমি অমুক কর্ম করিব না'—এই ভাবে কর্ম না করিবার কর্তৃত্ব বুদ্ধি হইতেও অব্যাহতিলাভের প্রচেষ্টা তাঁহাতে দেখা যাইত। চিঠি পত্র লিখিবার সময় কখনও আমি আমার ইত্যাদি উত্তমপুরুষের ব্যবহার করিতেন না। গীতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্মে অকর্ম দর্শন এবং অকর্মে কর্ম দর্শনের কথা বলিয়াছেন, তিনিও সেই ভাবেই কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিরহিত হইবার সাধনা করিতেন। হাতে পায়ে চোখে মনে কর্ম না করাকেই তিনি সন্ন্যাস বা নৈষ্কর্ম্যাবস্থা মনে করিতেন না। কর্তৃত্ববুদ্ধিবিহীনভাবকেই তিনি বাস্তব নৈষ্কর্ম্য মনে করিতেন। এই জন্যই তিনি নিজের কোন মত বা বিচার তাঁহার গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্র।' ইহাও তাঁহার আত্মপ্রচার বা গুরুগিরি করিবার অনিচ্ছা অথবা অনহংকৃতি-সাধনার রূপান্তর মাত্র। যতদূর জানা যায়, প্রাণ-স্পন্দন-নিরোধাত্মক অথবা চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি তাঁহার জীবনাদর্শ ছিল না; জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানকেই তিনি সমাধি মনে করিতেন। উহাই তাঁহার মতে চৈতন্যসমাধি। অপর সমাধিকে তিনি জড় বা মূঢ় সমাধি মনে করিতেন।

তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তিনি গুরুর সন্ধান করিবেন না, কাহারো কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিবেন না। কোন সদ্‌গুরু অনুগ্রহ করিয়া শিষ্য করিবার আগ্রহ করিলে, তিনি তাঁর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। তাঁর গুরুদেব স্বামী বিষ্ণুতীর্থ মহারাজ নর্মদাতীর্থসেবী শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার শিষ্য ছিলেন বরোদার শঙ্করাচার্য্যমঠ সারদাপীঠের অধীশ্বর স্বামী ত্রিবিক্রমতীর্থ। তিনি মঠাধীশত্ব ত্যাগ করিয়া গুরুর সঙ্গ করিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা বাঙলা দেশে, এমন কি, কলিকাতায়ও আসিতেন। সন্ন্যাসীর সংবাদ পাইলেই তাঁহার দর্শনে যাওয়া এবং তাঁহার সহিত ধর্মতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা করা বিভূতিভূষণের স্বভাব ছিল—এই কথা আগেই বলা হইয়াছে। স্বামী বিষ্ণুতীর্থের আগমনের সংবাদ পাইয়া প্রায় প্রত্যহই—তাঁর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন। খুব সম্ভব ইনি যখন দ্বিতীয়বার বাঙলাদেশে আসেন, তখন সারদামঠের প্রাক্তন শঙ্করাচার্য্য স্বামী ত্রিবিক্রমতীর্থ স্বীয় গুরু হইতে দীক্ষা নিবার জন্য বিভূতিভূষণকে বলেন। তিনি প্রথমে সম্মত হন না। শেষে ত্রিবিক্রমতীর্থ তাঁহার গুরুদেবকে ধরেন। গুরুদেব বিষ্ণুতীর্থও তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিভূতিভূষণ দীক্ষা গ্রহণ

করেন। এইটি কিন্তু সন্ন্যাস দীক্ষা নহে।// গুরু করার পরেও তিনি অন্য সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তবে তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও গুরু স্বীকার করেন নাই। বিখ্যাত সাধু তিব্বতী বাবা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। মন্ত্রদীক্ষার বহু বছর পরে ১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী শঙ্কর সোঽহংতীর্থের ধর্মসিন্ধু নিকেতনে, মাতার অনুমতি নিয়া, স্বীয় গুরুর কাছেই মহাবাক্য শ্রবণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তিনি শিষ্য যেমন করেন নাই, তেমন কোন আশ্রমও করেন নাই। পুষ্করের বেদবিদ্যার্থি-মণ্ডলের সম্পাদক শ্রীমোহন·লাল শর্মা বেদপাঠী মহাশয়ের যজ্ঞশালায় তিনি শেষ কয় বছর অতিবাহিত করেন। বেদপাঠী মহাশয় সাগ্নিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তিনি বাড়ীতে একটা ছোট বেদ-চতুষ্পাঠীও চালান। তিনি ছাত্রদিগকে বেদপাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি দেবতার মত ভক্তি সহকারে এই বাঙ্গালী মহারাজের সেবা করিতেন। যজ্ঞশালাটি তাঁহার বাড়ী হইতে সামান্য দূরে। রাত্রের চা পাঁপরভাজা ইত্যাদি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যোগাইতেন।

মাতার মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস পরেই বিদ্যারণ্যজী বুঝিতে পারেন, তাঁহারও ডাক আসিয়া গিয়াছে। তিনি সকলের সহিত দেখা সাক্ষাত করিয়া পুষ্করাভিমুখে রওনা হন। দিল্লীতে অনুজের বাসায় কয়েক দিন বাস করেন। কলিকাতা থাকিতেই তাঁহার কাল ব্যাধির আক্রমণ সুরু হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই দিল্লী যান। সেই খান হইতে আজমীঢ় গমন করেন। সেইখানেও চিকিৎসায় কোন সুফল না পাইয়া এক রকম জোর করিয়া পুষ্করে চলিয়া যান। পরদিন সোমবার ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার তেমন কোন অসুখ ছিল না। বেলা ৪টা বাজিতেই অন্যান্য দিনের মত সেদিনও বিভিন্ন পন্থার সাধু সন্ন্যাসী শিক্ষিত সজ্জন সমবেত হইয়া স্বামীজির সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, জৈন কি খ্রীষ্টান, মুসলমান ধর্ম এবং শাস্ত্র সমস্ত বিষয়েই তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ভারতীয় যাবতীয় দর্শনের মূল, টীকা, ভাষ্য, সমালোচনা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাক্তন সুকৃতি এবং সংস্কার বলে তিনি দুরূহ বিষয়েরও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারিতেন। কাজেই বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় তাঁর কোন অসুবিধা হইত না। সেদিনও নানা আলোচনা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁহার শেষ ডাক আসিয়া গেল। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বুকে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন 'বহুত দরদ হ্যায়।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়া পড়িল। কোন চিকিৎসার বিধান করিবার পূর্বেই, সমবেত সাধুসজ্জনের হাহাকারের মধ্যে, মহাপুরুষের আত্মা দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে কষ্টের চিহ্ন নাই, সেই পরিচিত ধ্যানমগ্ন স্মিত মুখ।

পরদিন সাধুদের নিয়ম অনুসারে ঐ যজ্ঞশালারই প্রাঙ্গণে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত করা হইল। সাধুসমাজের বিদ্যার জাহাজ ডুবিয়া গেল। নিষ্কাম কর্মযোগী, অদ্বৈতবেদান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ ব্রহ্মীভূত হইলেন।

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

ভূমিকা ৩
বিভূতিভূষণ-বন্দনম্ ৪
শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য ৫—১৪

গ্রন্থের বিষয়সূচী

অধ্যায় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
ভাগবতধর্ম ১—৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাসের উপকরণ ৫৪—৯৬

তৃতীয় অধ্যায়
ভাগবতধর্মের প্রবর্তন ৯৭—১৯০

চতুর্থ অধ্যায়
দার্শনিক সিদ্ধান্ত ১৯১—২৩২

পঞ্চম অধ্যায়
ধার্মিক সিদ্ধান্ত ২৩৩—৩১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
কর্মসন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্য ৩১৭—৩৫৭

সপ্তম অধ্যায়
ব্যূহবাদ ও অবতার-বাদ ৩৫৮—৪২০

সূচী

গ্রন্থ-পঞ্জী
বিষয়-নির্দেশিকা
সাধারণ সূচী

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

ভূমিকা ৩
বিভূতিভূষণ-বন্দনম্ ৪
শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য ৫—১৪

গ্রন্থের বিষয়সূচী

অধ্যায় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ভাগবতধর্ম ১—৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের উপকরণ ৫৪—৯৬

তৃতীয় অধ্যায়

ভাগবতধর্মের প্রবর্তন ৯৭—১৯০

চতুর্থ অধ্যায়

দার্শনিক সিদ্ধান্ত ১৯১—২৩২

পঞ্চম অধ্যায়

ধার্মিক সিদ্ধান্ত ২৩৩—৩১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্য ৩১৭—৩৫৭

সপ্তম অধ্যায়

ব্যুহবাদ ও অবতার-বাদ ৩৫৮—৪২০

সূচী

গ্রন্থ-পঞ্জী
বিষয়-নির্দেশিকা

গ্রন্থ-পঞ্জী *

॥ গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থপঞ্জী ॥

অগস্ত্যসংহিতা	(অগস্ত্য-সুতীক্ষ্ণ-সংবাদ), পণ্ডিত শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক বঙ্গভাষান্তর সহ প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
অহির্বুধ্ন্যসংহিতা	পণ্ডিত শ্রীদেবশিখামণি রামানুজাচার্য সম্পাদিত, আদিয়র, ২য় খণ্ড ১৯১৬
আনন্দসংহিতা (তেলেগু অক্ষরে)	মরীচি প্রণীত
ঈশ্বরসংহিতা	স্বামী অনন্তাচার্য সম্পাদিত, সুদর্শন প্রেস, কাঞ্চী ১৯২৩
কপিঞ্জলসংহিতা (তেলেগু অক্ষরে)	টি, সুব্বারাও, কল্যাণকুমার বিলাস প্রেস, কড়প
জয়াখ্যসংহিতা	পণ্ডিত শ্রী এ কৃষ্ণামাচার্য সম্পাদিত, ‘গায়কবাড় ওরিয়াণ্টাল সিরিজ’, বরোদা ১৯৩১
জ্ঞানকাণ্ড	কাশ্যপ প্রণীত, পণ্ডিত আর পার্থসারথি আয়েঙ্গার সম্পাদিত, তিরুপতি, ১৯৪৮
নারদপঞ্চরাত্র	
পরমপুরুষসংহিতা (তেলেগু অক্ষরে)	
পরমসংহিতা	ডক্টর এস, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজী ভাষান্তরিত, গায়কবাড় ওরিয়াণ্টাল সিরিজ, বরোদা ১৯৪০
পরমাত্মোপনিষদ্ভাষ্য (তেলেগু অক্ষরে)	শ্রীনিবাস দীক্ষিত প্রণীত
পাদ্মসংহিতা	পুষ্করের রমাবৈকুণ্ঠ মন্দিরের পাণ্ডুলিপি
পুরুষোত্তমসংহিতা (তেলেগু অক্ষরে)	
পৌষ্করসংহিতা	যতিরাজ শ্রীসম্পৎকুমার রামানুজমুনি সম্পাদিত, মেলকোট

---

* এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য বহুগ্রন্থও গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের সূচী আমরা চতুর্থ খণ্ডে গ্রন্থ মুদ্রণ সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রদান করিব॥

প্রকীর্ণাধিকার (ক্রিয়াপাদ) (তেলেগু অক্ষরে)	ভৃগু প্রণীত
বিমানার্চনাকল্প	মরীচি প্রণীত, মহন্ত শ্রীপ্রয়াগদাসজী, পণ্ডিত শ্রী ব, রঘুনাথ চক্রবর্তী ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত শ্রীসেতু মাধবাচার্য সম্পাদিত, তিরুপতি ১৯২৬
বিষ্ণুতিলকসংহিতা (তেলেগু অক্ষরে)	শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থশালা, বাঙ্গালোর
বিষ্ণুসংহিতা	মহামহোপাধ্যায় টি, গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, ত্রিভন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ত্রিভন্দ্রম, ১৯২৫
বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা	পণ্ডিত শঙ্কর শাস্ত্রী বেণেগাওকর সম্পাদিত, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, পুণা ১৯১২
বৈখানস শ্রৌতসূত্রম্‌	ডক্টর কলন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৪১। ইহাতে মূল বৈখানসসূত্রের ১২-৩২ প্রশ্ন আছে।
বৈখানসাগম	মরীচি প্রণীত, পণ্ডিত কে শাম্বশিবশাস্ত্রী সম্পাদিত, ত্রিভন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ত্রিভন্দ্রম, ১৯৩৫
বৈখানস স্মার্তসূত্রম্‌	ডক্টর কলন্দ (Caland) কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় রয়াল এশিয়েটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯২৭ (উহার প্রথম ৭ প্রশ্ন বৈখানসগৃহ্যসূত্র এবং শেষের ৩ প্রশ্ন বৈখানস ধর্মসূত্র)
English Translation of Vaikhanasa-Smarta-Sutra	By Dr. W. Caland, কলিকাতা, ১৯২৯
ভরদ্বাজসংহিতা	সরযূপ্রসাদ মিশ্রকৃত টীকা সহিত, খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত, মুম্বই, ১৯৬২ বিক্রমসংবৎ
মোক্ষোপায়প্রদীপিকা (তেলেগু অক্ষরে)	বাসুদেবস্বামী প্রণীত
যজ্ঞাধিকার (তেলেগু অক্ষরে)	ভৃগু প্রণীত
শ্রীপ্রশ্নসংহিতা (গ্রন্থ অক্ষরে)	
সমূর্তার্চনাধিকরণ	অত্রি প্রণীত, পণ্ডিত শ্রী ব রঘুনাথ চক্রবর্তী ভট্টাচার্য ও শ্রী মা রামকৃষ্ণ কবি কর্তৃক সম্পাদিত, তিরুপতি ১৯৪৩
সাত্বত তন্ত্র	পণ্ডিত শ্রীঅনন্তশাস্ত্রী ফড়কে সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, কাশী ১৯৩৪
সাত্বতসংহিতা	স্বামী অনন্তাচার্য সম্পাদিত, সুদর্শন প্রেস, কাশী ১৯০২

ভাগবত-ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

বিষয় নির্দ্দেশিকা

ভাগবতধর্মসমূহ

জিজ্ঞাসা ১
বক্তা কে ? ১
ভাগবত-শব্দার্থ ২
ভগ-শব্দার্থ ব্যাখ্যা, বেদানুযায়ী ৩
যাস্কের মতে ৩
শিবপুরাণ মতে ৩
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে ৩
মহাভারত মতে ৩
দ্রব্য বা গুণ অর্থে ৪
ধাতুগত অর্থে ৫
মহাভারত-পুরাণাদি মতে ৫
পাঞ্চরাত্র সংহিতা মতে ৬
অহির্বুধ্ন্য সংহিতা মতে ৬
ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে ৬
শ্রুতি মতে ৮
বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রানুসারে ৮
লিঙ্গপুরাণ মতে ৯
স্পন্দপ্রদীপিকা মতে ৯
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মতে ১০
বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ও দেবী-ভাগবতপুরাণ মতে ১০
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ১০
অথর্ব বেদানুসারে ১১
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ মতে ১১
কপিঞ্জল সংহিতা মতে ১২
শিলালেখে ১২, ১৩
মুক্তিকোপনিষদ্ মতে ১৩
বরাহপুরাণ মতে ১৩
ভগবান পতঞ্জলি মতানুসারে ১৩
নারদপুরাণ মতে ১৩
স্কন্দপুরাণ মতে ১৪
বরাহমিহিরের মতে ১৫
আচার্য যাদবপ্রকাশ মতে ১৫
উৎপলভট্ট মতে ১৬
ব্রহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণ মতে ১৬
গরুড় পুরাণ মতে ১৬
পাদ্ম সংহিতা ও পরম সংহিতা মতে ১৬
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা মতে
সীমিত সংজ্ঞা ১৭
বৈখানস মতানুযায়ী ১৮
বৃদ্ধহারীত স্মৃতি মতে ১৯
অপ্পয় দীক্ষিত মতে ২০

পাঞ্চরাত্রধর্ম, একান্তধর্ম

স্কন্দপুরাণ মতে ২৩
নারায়ণীয়াখ্যান মতে ২৪
জয়াখ্য সংহিতা মতে ২৪
বিষ্ণু সংহিতা মতে ২৪, ২৫, ২৬
রামানুজ প্রবর্তিত পরমৈকান্তিক ধর্ম ২৭, ২৮
একায়নধর্ম ২৮
মহাভারতোক্ত একায়ন পন্থা ২৮
অট্ঠাঙ্গিক, সতিপট্ঠান ও সদ্ধা ২৯
একায়ন মার্গ ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫
ভগবৎ আরাধনা, পঞ্চকাল ৩০
ভগবদ্ যাগ, অষ্ট অঙ্গ ৩১
পৌষ্কর সংহিতা মতে ৩২
পরম সংহিতা মতে ৩৩
শ্রীপ্রশ্ন সংহিতা মতে ৩৪
ঈশ্বর সংহিতা মতে ৩৪
ব্রহ্মপুরাণ মতে ৩৫
পঞ্চজ্ঞান ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯
শাণ্ডিল্য সংহিতা মতে ৩৬
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র মতে ৩৬
নীলকণ্ঠ মতে ৩৭
ডক্টর শ্রেডার মতে ৩৭
অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ও তত্ত্বত্রয় মতে ৩৭
তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ মতে ৪০
ঋগ্বেদ মতে ৪০, ৪১
সমবিধান ব্রাহ্মণ মতে ৪১, ৪২, ৪৩
পাদ্ম সংহিতা মতে ৪৪

বিষ্বক্‌সেন সংহিতা মতে ৪৪

সাত্বতধর্ম

নারায়ণীয়াখ্যান মতে ৪৫
গ্রীয়ার্সন, ভাণ্ডারকর ও বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ৪৫
মহাভারত মতে ৪৬
বৈশম্পায়ন মতে ৪৬
পদ্মপুরাণ মতে ৪৭
জয়াখ্য সংহিতা মতে ৪৭
আচার্য যামুন মতে ৪৮
পুরুষোত্তম সংহিতা মতে ৪৮
বিষ্ণু সংহিতা মতে ৪৯
কূর্ম পুরাণ মতে ৪৯
হরিবংশ মতে ৪৯
বরাহ পুরাণ মতে ৪৯

নারায়ণ ধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম

মহাভারত মতে ৫০
(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণ মতে, লিঙ্গপুরাণ মতে ৫০
সনাতন ধর্ম ৫০
ভাগবৎ পুরাণ মতে বৈশম্পায়ন মতে ৫০

ভাগবত ধর্মের ইতিহাসের উপকরণ—

মরীচ্যাদি ঋষিকৃত চিত্রশিখণ্ডি ৫৩
মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম ও নারায়ণীয়াখ্যানের বিবরণ ৫৫
শঙ্কর মত ৫৫
মহাভারত, হরিবংশ, (বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণ ৫৭
শাণ্ডিল্য সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু-পুরাণ, অষ্টাদশপুরাণ ৫৭
বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ৫৯
দেবীভাগবত পুরাণ, পাঞ্চরাত্র সংহিতা, জয়াখ্য সংহিতা ৬০
রামানুজ শ্রীভাষ্য, বেদার্থ সংগ্রহ ৬১
মধ্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবত ৬২
মহোপনিষদ্, ঈশ্বরসংহিতা, পৌষ্কর সংহিতা, ৬৪
১০৮ পাঞ্চরাত্র সংহিতা, ৬৫
পাঞ্চরাত্র ধর্ম ৬৫
বৈখানস শাস্ত্র ৬৭
গর্গসংহিতা ৮১
(বিষ্ণু)ভাগবত পুরাণ ৮৬
বিষ্ণুপুরাণ ৮৯
নারদসূত্র এবং শাণ্ডিল্য সূত্র ৯৪
বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা, বৃদ্ধ হারীত সংহিতা, বিষ্ণুধর্মশাস্ত্র ৯৫
ভাগবতধর্মের প্রবর্তন ৯৭
আচার্য পরম্পরা, তিনটি মত ৯৮
পাঞ্চরাত্র মতের পরম্পরা, ১০০
একান্তধর্মের আচার্য পরম্পরা ১০১
নারদপ্রোক্ত বিভিন্ন কল্প ১০২
ভাগবত ধর্মও পাঞ্চরাত্র ধর্মের পৃথকৃত্ব ১০৫
সাত্বত ধর্মের আচার্য পরম্পরা ১০৭
বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম ১১০
নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের পরম্পরা ১১১
সমালোচনা ও সমন্বয় ১১১
পাঞ্চরাত্র সংহিতার মত— পাঞ্চরাত্র সাত্বত, ভাগবত ও একান্ত ধর্ম অভিন্ন ১১৭
বৈখানস মতের আচার্য পরম্পরা ১২৩
পাঞ্চরাত্র মত ও অন্যান্য তান্ত্রিক মতসমূহের প্রবর্তনের হেতু, অর্বাচীন বৈষ্ণবগণের মত ১৩৩
বৈষ্ণবগণের চারি মুখ্য সম্প্রদায়— রামানুজ সম্প্রদায় ১৩৩
নিম্বার্ক সম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায়, বল্লভ সম্প্রদায় ১৩৪
শাণ্ডিল্য সংহিতা মতে চারি ভক্তি সম্প্রদায়—ব্রহ্ম সম্প্রদায় ১৩৪
বিষ্ণুসম্প্রদায় ১৩৫
শঙ্কর সম্প্রদায় ১৪৬
পুরদ্বেষী সম্প্রদায় ১৩৬
বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামী ও বিষ্ণু মহামুনি ১৩৭
বিষ্ণুধর্ম প্রবর্তক শৌনক, ১৪৫
ভাণ্ডারকরের মত—দুইটি বিকল্প মত ১৪৬
কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মত, ১৪৮
কৃষ্ণই ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ১৪৯
ভাগবতধর্ম কৃষ্ণের পরে প্রতিষ্ঠিত ১৪৯
বেদের কৃষ্ণ ১৫০
মহাভারতের কৃষ্ণ ১৫২

বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ ১৫৬
গীতাধর্ম্মের উপদেষ্টা ১৬১
ছান্দোগ্যোপনিষদের কৃষ্ণ ও মহাভারতের কৃষ্ণ ১৬৩
কৃষ্ণ ভাগবতধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন ১৭০
বাসুদেবের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ ১৭৫
কপিল বাসুদেব ১৮৩
পুরণর্ষি জগদ্‌গুরু বাসুদেব ১৮৬
পরমেশ্বর বাসুদেব ও মানুষ বাসুদেব ১৮৮
নারায়ণগণ ১৮৯

ভাগবত সম্বন্ধে দার্শনিক সিদ্ধান্ত

মহাভারতের আধারে—

বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম ১৯১
গীতা ও নারায়ণীয়াখ্যান, ২০০
(বিষ্ণু)ভাগবত পুরাণের আধারে ২১৬
গর্গ সংহিতা মতে ২২৯

ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে ধার্ম্মিক সিদ্ধান্ত

দেবতোপাসনা ২৩৩
প্রতিমাপূজা, ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে ২৪৫
মহাভারতে ও রামায়ণে ২৪৫
জীবসেবা ভগবৎ সেবা ২৫০
শোচনীয় দুরুপযোগ ২৫৪
জনকের সাম্যবাদ ২৫৭
ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম ২৫৮
নিষ্কাম কর্ম্ম ২৬১
কর্ম্মযোগ ২৬৩
নিষ্কাম কর্ম্মযোগ রহস্য ২৬৮
স্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম ২৭১
যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ২৭৪
সমদৃষ্টি ২৮০
আত্মৌপম্য দৃষ্টি ২৮২
ভক্তিযোগ ২৮৬
একান্ত ভক্তি ২৯০
শরণাগতি ২৯১
ভক্তি দ্বারা মুক্তি ২৯৬
ভক্তি দ্বারা মায়ানাশ ২৯৯
সকাম ও নিষ্কাম ভক্তি ৩০০
জপ ৩০১
ভগবৎ প্রসাদ ৩০৩
অহিংসা ৩০৭
সর্ব্বভূতহিতে রতি ৩১০
অসাম্প্রদায়িকতা ৩১১
ভাগবতধর্ম্ম সমূহের নামোল্লেখ ৩১৫

ভাগবতধর্ম্মে কর্ম্ম সন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্ম্য—

কর্ম্মসন্ন্যাস ৩১৭
নারায়ণোপাসক যতিগণ ৩৫১
নৈষ্কর্ম্ম্য ৩৫৩

ভাগবত ধর্ম্মে ব্যূহবাদ ও অবতারবাদ—

ব্যূহবাদ ৩৫৯
অবতারবাদ ৪১২

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

ভাগবতধর্ম

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব একদা দেবর্ষি নারদকে "ভাগবতধর্মসমূহ" জিজ্ঞাসা করেন।[1] তখন নারদ তাঁহার নিকটে বিদেহরাজ নিমি এবং কবি প্রভৃতি নয় জন তত্ত্বদর্শী, "অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ" এবং "মহাভাগবত"[2] মহাত্মার সংবাদ বিবৃত করেন। নিমি তাঁহাদের নিকট "ভাগবতধর্মসমূহের" উপদেশ প্রার্থনা করেন।[3] তাহাতে তাঁহারা ভাগবতধর্ম ব্যাখ্যা করেন।[4] মহাত্মা কবি বলেন, "অবিদ্বান্ পুরুষদিগেরও যথার্থরূপে এবং শীঘ্র[5] আত্মলাভের জন্য ('আত্মলব্ধয়ে') যে সকল উপায় ভগবান্ কর্তৃক নিশ্চিতরূপে প্রোক্ত হইয়াছে, সেইগুলিকেই ভাগবতধর্মসমূহ বলিয়া জান। হে রাজন্! উহাদিগেতে আস্থিত হইলে মনুষ্য কদাচিৎ প্রমাদগ্রস্ত হয় না। সে চক্ষু বন্ধ করিয়া দৌড়িতে থাকিলেও ইহ সংসারে তাহার পদস্খলন হয় না,—(সুতরাং) পতন হয় না।"[6] এই উক্তি হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তাঁহার মতে, ভাগবতধর্ম আত্মলাভের সরল, অভ্রান্ত এবং সুনিশ্চিত সাধন। বসুদেবের পূর্বোক্ত প্রশ্ন হইতে জানা যায় যে ভাগবতধর্ম দ্বারা মনুষ্য সর্ব প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়,—সম্যক্ অভয় হয়।[7] এবং নিমির প্রশ্ন হইতে জানা যায় যে "তদ্দ্বারা প্রসন্ন হইয়া অজ (ভগবান্) প্রপন্ন ভক্তকে আপনাকেও দিয়া বসেন।" ব্রহ্মার মতে, "জ্ঞানং যোগং চ ভাগবতমাত্মতত্ত্বদীপম্" অর্থাৎ ভাগবত জ্ঞান ও যোগ আত্মতত্ত্বপ্রকাশক।[8] যমরাজ বলেন যে ভাগবতধর্ম অতীব বিশুদ্ধ; উহাকে জানিলে মনুষ্য অমৃতত্বলাভ করে; পরন্তু উহা অতি গুহ্য এবং দুর্বোধ্য।[9] এমন কি দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তাহা ঠিক ঠিক জানেন না। সুতরাং অপরের কথা আর কি? তিনি আরও বলেন যে স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), শম্ভু, নারদ, (সনৎ) কুমার, কপিল, (স্বায়ম্ভুব) মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুক এবং তিনি স্বয়ং—এই বার জনেই ভাগবতধর্ম জানেন।[10]

ভাগবতধর্মের বক্তা ঐ ভগবান্ কে?—কবি কিম্বা তাঁহার সতীর্থ অপর কোন মহাভাগবত তাহা বলেন নাই। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র অন্যত্র উক্ত হইয়াছে মহাভাগবত প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে "ভাগবতধর্মসমূহ" উপদেশ করেন।[11] তিনি বলেন, "এই অমল

---

১) (বিষ্ণু) ভাগ, ১১।২।৭; আর ও দেখ—ঐ, ১১।২।১১'২

২) ঐ, ১১।২।২০ ও ২৫ শ্লোক দেখ

৩) ঐ, ১১।২।৩১

৪) ঐ, ১১।৫।৪৩'১, ৪৫'১

৫) মূলে 'অঞ্জ' শব্দ আছে। উহার অর্থ, 'অমরকোশে'র মতে, 'শীঘ্র' এবং 'যথার্থ'। এইখানে উভয় অর্থই-সুপ্রযোজ্য।

৬) (বিষ্ণু) ভাগ, ১১।২।৩৪-৫

৭) আর ও দেখ—ঐ, ১১।২।৩৭-৮

৮) ঐ, ২।৭।১৯'১

৯) "গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে॥"—(ঐ, ৬।৩।২১'২)

১০) ঐ, ৬।৩।১৯—

১১) ঐ, ৭।৬।১—

এবং দুর্লভ জ্ঞান (ঋষি) নরের সখা (ঋষি) নারায়ণ (দেবর্ষি) নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহা প্রসিদ্ধ আছে। যাহারা ভগবানের একান্ত এবং অকিঞ্চন ভক্তগণের চরমকমলরজ দ্বারা আপ্লুতদেহ, তাহাদিগেরই উহা লাভ হয়। বিজ্ঞান-সংযুক্ত এই জ্ঞান—এই বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম আমি পূর্বে দেবদর্শন নারদ হইতে শুনিয়াছিলাম।"[১] সুতরাং, তাঁহার মতে, ভাগবতধর্মের প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই এবং তিনি প্রথমে দেবর্ষি নারদকে তাহার উপদেশ করেন। এই কথা দেবর্ষি নারদের সম্মত বলিতে হইবে। কেননা, কথিত হইয়াছে যে তিনিই প্রহ্লাদের আখ্যান মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।[২] নারদ বলেন, "ধর্মো ভাগবতানাং চ ভগবান্ যেন গম্যতে" ('যদ্দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই ভাগবতগণের ধর্মও তোমায় কথিত হইল')[৩]। অব্যবহিত পরে তিনি বলিয়াছেন যে ঐ ভগবান্ বিষ্ণুই।[৪] তাহাতে জানা যায় যে ভাগবতধর্মে উপাস্য দেবতা ভগবান্ বিষ্ণুই এবং তদনুযায়িগণ 'ভাগবত' নামে খ্যাত।

'ভাগবত' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ্য রূপে উহা গ্রন্থ এবং ব্যক্তি এই উভয় অর্থেই সাধারণত প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[৫] ভগবান্ বা ভগবতী যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাকে 'ভাগবত' বলা হইয়া থাকে।[৬] যথা 'ভাগবত পুরাণ'। ভগবান্ বা ভগবতী যাহার ইষ্টদেবতা সেই ব্যক্তিকেও 'ভাগবত' বলা হইয়া থাকে।[৭] বর্তমান গ্রন্থে আমরা বিশেষ ভাবে এই দ্বিতীয় অর্থে 'ভাগবত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বিশেষণরূপে 'ভাগবত' শব্দের অর্থ 'ভগবান্ বা ভগবতী সম্বন্ধীয়', কিম্বা 'ভগবানের বা ভগবতীর'। যাঁহার 'ভগ' আছে তাঁহাকেই পুংলিঙ্গে 'ভগবান্' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'ভগবতী' বলা হয়।[৮] এইরূপে দেখা যায় যে 'ভাগবত' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য 'ভগ' শব্দের অর্থের

---

১) ঐ, ৭।৬।২৭-৮

২) যমরাজ বলিয়াছেন, "ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং" (ঐ, ৬।৩।১৯'১) অর্থাৎ ভাগবতধর্মের প্রণেতা সাক্ষাৎ ভগবানই। ঐ স্থলে তিনি ভগবান বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া সহজে মনে হয়। ব্রহ্মা নারদকে বলেন যে তাঁহার (নারদের) অত্যন্ত ভক্তিদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান তাঁহাকে "বাসুদেবশরণ ব্যক্তিগণ যাহা শীঘ্র এবং যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হন, আত্মতত্ত্বদীপ সেই ভাগবত জ্ঞান ও যোগ" বলিয়াছেন (ঐ, ২।৭।১৯)। টীকাকার শ্রীধরস্বামীর মতে, ভগবান্ বিষ্ণু হংসাবতাররূপেই নারদকে আত্মতত্ত্বপ্রকাশক ভাগবত জ্ঞান ও যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ঋষিরূপে নারদকে ভাগবতধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, এই মনে করিলে প্রহ্লাদের, তথা নারদের, ঐ উক্তির সঙ্গে ব্রহ্মা এবং যমরাজের এই উক্তিদ্বয়ের পার্থক্য থাকে না। নারায়ণ ঋষি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যাহা হউক, এই বিষয়ের অধিক বিচার পরে তৃতীয় অধ্যায়ে করা যাইবে।

৩) (বিষ্ণু) ভাগ, ৭।১০।৪৫'১ ৪) ঐ, ৭।১০।৪৬'১ ৫) 'চৈতন্যচরিতামৃত', ১।১।৯৬'২-৯৮'১, দেখ।

৬) ভাগবত=ভগবতো ভগবত্যা বা ইদম্; ভগবৎ+ভস্যেদমিত্যণ্।

৭) ভাগবত=ভগবান্ ভগবতী বা অস্য দেবতেতি; ভগবৎ+সোঽস্য দেবতেত্যণ্=ভগবদ্ভক্ত।

"সর্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥"
(পদ্মপু, উত্তরখণ্ড,)

৮) ভগ+তদস্যাস্তীতি মতুপ্; 'ম' স্থানে 'ব' আদেশ হইয়া 'ভগবৎ'; স্ত্রিয়াং ঙীপ ভগবতী। যথা দেখ,—"ভগবান্ ভগসদ্ভাবাৎ" (বায়ুপু, ১।৫।২৪,১); "ভগবান্ ভগবদ্ভাবাৎ" (লিঙ্গপু, ১।৭০।৯৮'১)

উপরই সম্যক্ নির্ভর করে। 'ভগ' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন কাল হইতে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং কালক্রমে উহার অর্থের পরিবর্তনও হইয়াছে, দেখা যায়। বেদে ভগ নামক একজন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে ভগ অদিতির এক পুত্র। বেদের ঋষি বশিষ্ঠ অদিতির পুত্র ভগদেবতার স্তুতি করিয়াছেন।[১] আচার্য্য যাস্ক এবং আচার্য্য শৌনক বলেন যে ঐ ভগদেবতা সূর্য্যই,—'ভগ' সূর্য্যেরই এক নামবিশেষ।—আচার্য্য শৌনক আরও বলিয়াছেন যে সূর্য্য নিজ রশ্মিসমূহ দ্বারা এই সমস্ত লোককে ভাসিত করত ("ভাসয়ন্") উদিত হন; সেই কারণেই বশিষ্ঠ ঋষি স্বয়ং স্তুতি করিয়া তাঁহাকে 'ভগ' বলিয়াছেন।[২] আচার্য্য যাস্ক বলেন, উষাকালের পরবর্তী এবং উদয়ের ঠিক্ প্রাগ্‌বর্তী কালের সূর্য্যের নাম 'ভগ'; ঋষিগণ যে বলিয়া থাকেন "ভগ অন্ধ",[৩] তাহাতে উহা সিদ্ধ হয়; কেননা, অনুদিত থাকাতে সূর্য্য তখন লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই ভগকে অন্ধ বলা হইয়াছে।[৪] কোন কোন পুরাণেও আছে যে ভগ সূর্য্যেরই নাম।[৫] 'শিবপুরাণে' আছে যে সূর্য্য লোকপ্রসবিতা, সেইহেতু প্রসবের ডিম্ব 'ভগ' নামে অভিহিত হয়।[৬] কোন কোন পুরাণের মতে পৌষমাসে সূর্য্যের নাম 'ভগ' হয়।[৭] 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'র মতে, ভগ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা।[৮] মহাভারতাদিতেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।[৯] সূর্য্য যখন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে থাকে, তখন উহার নাম ভগ হয়। //

পূর্বোক্ত বেদ-সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষি ভগদেবতার নিকট ভগ প্রার্থনা করিয়াছেন। ভগদেবতা স্বয়ং "ভগবান্" এবং তাঁহার নিকট হইতে ঐ ভগ লাভ করত ঋষি স্বয়ং ভগবান্ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।[১০] কথিত হইয়াছে যে ধনী এবং দরিদ্র সকলেই ভগদেবতার নিকট

---

১) ঋক্‌সং, ৭।৪১ সূক্ত; বাজসং (মাধ্য), ৩৪; অথসং, ৩।১৬ ২) বৃহদ্দেবতা, ২।৬২

৩) যথা দেখ—

"যো অন্ধো যঃ পুনঃসরো ভগো বৃক্ষেষ্বাহিতঃ।
তেন মাং ভগিনং কৃণু………॥"—(অথসং, ৬।১২৯।৩)

'যে ভগ অন্ধ, যে ভগ পুনঃসর (অর্থাৎ অন্ধতা হেতু বরাবর সম্মুখে চলিতে অসামর্থ্য কারণে কখন কখন পূর্বের চলা পথেও পুনঃ গমন করেন, অর্থাৎ আগে-পিছে এবং এদিকে-ওদিকে চলেন) এবং (সেই হেতু পথিস্থ বৃক্ষসমূহে আহত হন, তিনি আমায় ভগযুক্ত করুণ।' "অন্ধো ভগঃ") শতব্রা(মাধ্য), ১।৭।৪।৬-৭)

৪) নিরুক্ত, ১২।১৪; এইখানে যাস্ক ঋক্‌সং, ৭।৪১।২ মন্ত্র অনুবাদ করত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৫) "ভগো বিবস্বানাদিত্যঃ" (শিবপু, জ্ঞানসং, ৭১।৬৮·১; লিঙ্গপু, ১।৯৮।৯৪·২

৬) শিবপু, বিদ্যেশ্বরসং, ১৬।১০৫·২

'ব্রহ্মপুরাণে' আছে (৩০।৩৪), ভগ পরমাত্মা সূর্য্যের সপ্তমী মূর্তি এবং তাহা দেহীদিগের শরীরে প্রজননশক্তিরূপে অবস্থিত।

৭) (বিষ্ণু) ভাগ, ১২।১১।৪২; বিষ্ণুপু, ২।১০।১৪-৫ 'স্কন্দপুরাণে'র মতে মাঘমাসের সূর্য্যের নাম 'ভগ'। (৭।১।১০১।৬৮)

৮) তৈত্তিব্রা, ১।১।২।৪; ১।৫।১।২; আর ও দেখ—শাঙ্খাগৃহ্য, ১।২৬

৯) মহাভা; ৬।৩।১৪·২ "ভগং নক্ষত্রমাক্রম্য" (ঐ, ৬।৮১) "পূর্বা ফল্গুনী শ্রুতিমতে তূত্তরা ফল্গুনী" (নীলকণ্ঠ)

১০) "ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।" ঋক্‌সং, ৭।৪১।৫·১; বাজসং (মাধ্য), ৩৪।৩৮·১; অথসং, ৩।১৬।৫·১) ঋক্‌সং, ১।২৪।৪ মন্ত্রে ও সূর্য্যের ভগের উল্লেখ আছে।

ভগ প্রার্থনা করেন।[১] ঐখানে অবশ্য ভগ বিষয়ে ধনবত্তা ও দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, অন্য বিষয়ে নহে। এবং তাহাতে ভগদেবতার ভগের আতিশয্য বা আনন্ত্য খ্যাপিত হইয়াছে। ভগদেবতার নিকট এত ভগ আছে যে সংসারে যাহাকে ভগে ধনী বা অনেক-ভগ-সম্পন্ন মনে করা হয়, সেও তাঁহার অপেক্ষা দরিদ্র, ভগদেবতার ভগের তুলনায় তাহার ভগ যৎসামান্য; তাই সে তাঁহার নিকট অধিক ভগ প্রার্থনা করে। সুতরাং যাহারা ভগে দরিদ্র অর্থাৎ স্বল্প-ভগবান্ তাহাদের কথা আর কি? 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে, 'ভগী স্যাম্' (আমি ভগী হইব)—যে এই কামনা করে সে উত্তরফল্গুনীতে অগ্ন্যাধান করিবেক। উত্তরফল্গুনী ভগেরই নক্ষত্র। (সুতরাং উহাতে অগ্ন্যাধান করিলে মনুষ্য) নিশ্চয় ভগী হয়।"[২] বেদে ইন্দ্র,[৩] সবিতা,[৪] সোম,[৫] পৃথিবী,[৬] বৃহস্পতি,[৭] প্রভৃতিরও নিকট ভগ প্রার্থনা করা হইয়াছে, দেখা যায়। কথিত হইয়াছে যে অগ্নি ভগ ভক্ষণ করেন,[৮] এবং ইন্দু ভগার্থ প্রকাশিত হয়।[৯] এই সকল প্রমাণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, বেদে 'ভগ' শব্দ যে কেবল 'দেবতা' বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইত, তাহা নহে, 'দ্রব্য' বা 'গুণ' বিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হইত।

সেই দ্রব্য বা গুণ যাহাকে বেদে 'ভগ' বলা হইত তাহা কি? বেদের এক মন্ত্রে আছে, অগ্নিহোত্রার্থ আনীত ধেনুকে উত্তম যবতৃণ প্রদান করিয়া যজমান বলেন, "এই উত্তম যবতৃণ দ্বারা (অর্থাৎ ভক্ষণ করত) তুমি ভগবতী হও। অনন্তর আমরা ভগবান্ হইব।"[১০] ঐখানে অবশ্যই দুগ্ধকে 'ভগ' বলা হইয়াছে। যেহেতু দুগ্ধ সকলের ভজনীয়, সেই হেতু উহা 'ভগ'। "দ্যুমন্তভগ"[১১] এবং "প্রজাবান ভগের"[১২] ও উল্লেখ বেদে আছে। কোন কোন মন্ত্রে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে ভগ=বর্চ বা তেজ।[১৩] অপর কোন কোন মন্ত্র হইতে জানা যায় যে 'ভগ' ='বর্চ' ও 'বিজ্ঞান'।[১৪] ভগদেবতার যেমন বর্চ আছে,[১৫] তেমন বল বা বীর্য্যও আছে।[১৬] সেই হেতুই, বোধ হয়, ঋষি তাঁহাকে রক্ষার জন্য ("উতয়ে") ভগ, তথা ইন্দ্রাদি অপর তের দেবতার আহ্বান ও স্তুতি করিয়াছেন।[১৭] এক মন্ত্রে ভগ দেবতাকে "বিভক্তা" (বা বিভাগকর্তা, দাতা) বলা হইয়াছে এবং অন্ন ও রক্ষণ সহ আগমন করিতে প্রার্থনা করা হইয়াছে।[১৮] শ্যাবাশ্ব ঋষি ভগদেবতার শ্রেষ্ঠ সর্বধারক এবং শত্রুনাশক রূপের ("শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরম্) ধ্যান করিয়াছেন[১৯] কথিত হইয়াছে যে ভগদেবতা "অমৃতাসঃ" (=অমৃত)।[২০] বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন যে ভগদেবতা "জিত" (=জয়ী), "উগ্র" (=তেজস্বী) ও "বিধর্তা" (=বিশ্বপ্রপঞ্চের বিধারক); তিনি

---

১) ঋক্‌সং, ৭।৪১।২; বাজসং (মাধ্য), ৩৪।৩৫; অথসং, ৩।১৬।২

২) তৈত্তিব্রা, ১।১।২।৪

৩) ঋক্‌সং, ২।১৭।৭; ৩।৩০।১৮, ১৯

৪) ঋক্‌কং, ৩।৬২।১১; ৫।৮২।১; বাজসং (মাধ্য), ৯।১; ১১।৭; ২২।১৪; ইত্যাদি।

৫) বাজসং (মাধ্য), ৫।৭

৬) অথসং, ১২।১।৫

৭) অথসং, ১৯।৪।৩

৮) ঋক্‌সং, ৫।৭।৮

৯) ঋক্‌সং, ৯।১০৯।১০

১০) ঋক্‌সাং, ১।১৬৪।৪০; অথসং, ৭।৭৭।১১; ৯।১৫।২০

১১) ঋক্‌সং, ৩।৩০।১৯

১২) ঋক্‌সং,৩।৩০।১৮

১৩) অথসং, ৩।১২।৬; ৬।১৯।২; ১২।১।৫

১৪) অথসং, ৭।১৩।৩

১৫) অথসং, ৬।১২৯।২

১৬) অথসং, ২।২৯।১; আরও দেখ তৈত্তিব্রা, ৩।১।১।১৮

১৭) ঋক্‌সং, ৫।৪৬।৩

১৮) "ভগ: বিভক্তা শবসা অবসাহ গমৎ"—(ঋক্‌সং, ৫।৪৬।৬)

১৯) ঋক্‌সং, ৫।৮২।১; ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫।২।৭) এই মন্ত্রের উল্লেখ ও প্রয়োগ আছে।

২০) ঋক্‌সং, ৫।৪২।৫

"প্রণেতা" (=প্রকৃষ্টনেতা), "সত্যরাধ" (=সত্যধনবান্), "মঘবন্", "সূর্য্য" (=সর্বজগৎপ্রপঞ্চের প্রসবিতা ও প্রেরয়িতা) এবং "বসুবিদ্"।[১] যে সকল গুণ থাকাতে ভগদেবতা তেমন হইয়াছেন সেই গুলিই তাঁহার ভগ। ঋগ্বেদের এক মন্ত্রে ভগকে জার বলা হইয়াছে ("জার আ ভগম্")।[২] আচর্য্য যাস্ক বলেন,[৩] ঐ স্থলে 'ভগ' শব্দের অর্থ হয়ত 'আদিত্য', অথবা 'স্ত্রীভগ' বা স্ত্রীযোনি। আদিত্য রাত্রির অন্ধকারের, তথা নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কসমূহের জ্যোতির "জরয়িতা" (জীর্ণকারক), সেই হেতু তাঁহাকে জার বলা হইয়াছে।[৪] সেবাবাচক 'ভজ, ধাতু হইতেও 'ভগ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'সাম্বপুরাণে' সূর্য্যের ভগনামের ব্যুৎপত্তি ঐ অর্থমূলেই কৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে, যে হেতু তিনি সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত বা ভজিত হন, সেই হেতু তিনি 'ভগ' নামে অভিহিত হন।[৫] যাহার দ্বারা নারী আপন জারের সেবা করে এবং যাহাতে জার কর্ত্তৃক সেবিত হয়, তাহাই উহার 'ভগ'।[৬] তাহা হইতে বলা যায়, যে গুণ দ্বারা একে স্বপ্রভায় অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করে এবং অপর সকলকে হীনপ্রভ করে, তাহাই উহার ভগ; অথবা যে গুণহেতু একে অপর সকল কর্ত্তৃক ভজিত বা সেবিত হয় এবং স্বয়ং অপর সকলকে ভজনা বা সেবা করে, উহাই তাহার ভগ। এই প্রথম অর্থে 'ভগ' শব্দের ব্যবহার বেদে বস্তুতই পাওয়া যায়।[৭] 'সৌভাগ্য' অর্থেও 'ভগ' শব্দের প্রয়োগ বেদে আছে।[৮] তথায় 'সুভগ', 'সৌভগ' ইত্যাদি শব্দেরও প্রয়োগ আছে।

পরবর্তী কালে, মহাভারতপুরাণাদিতে সাধারণত ছয় গুণ সমষ্টিকে 'ভগ' বলা হইয়াছে, দেখা যায়। তবে ঐ ছয় গুণ কি কি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদও পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন পুরাণে আছে, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় গুণের নাম 'ভগ'।[৯] অপর কোন কোন পুরাণে উহাদের সামান্য পরিবর্তনও দৃষ্ট হয়।[১০] আর কোথাও কোথাও জ্ঞান,

---

১) ঋক্‌সং, ৭।৪১।২—৫ ; বাজসং (মাধ্য), ৩৪।৩৫—; অথসং, ৩।১৬।২ –

২) ঋক্‌সং, ১০।১১।৬   ৩) নিরুক্ত, ৩।১৬

৪) এক মন্ত্রে সূর্য্যকে "স্বসুর্জার" (অর্থাৎ উষার জার বা জীর্ণকারক) বলা হইয়াছে। ঋক্‌সং ৬।৫৫।৫ ১৭'১

৫) "সেব্যতে যঃ সুরৈঃ সর্বৈঃ ভাশ্চৈব ভজতে যতঃ।
ধাতুর্ভজেতি সেবায়াং তেনাসৌ ভগ উচ্যতে॥" —(সোম্বপুরাণ, ৯।৩৭)

৬) ভগ="ভজ্যতে অনেনাস্মিন্ বেতি এতদাশ্রিতৈব কন্দর্পং সেবতে ইতি ভাবঃ ; ভজ্ সেবায়াং ঘঃ।" (শব্দকল্পদ্রুমঃ।

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ১।১।২।৪ "ভগস্য বা এতন্নক্ষত্রম্ যদুত্তরে ফল্গুনী।" অন্যত্র ও আছে, "ফল্গুনী নক্ষত্রং ভগো দেবতা অর্থাৎ সূর্য্য যখন উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত হন—যখন তিনি 'ভগ' নামে অভিহিত হন, তখন তাঁহার প্রজনন শক্তি প্রসিদ্ধ। তাই ঐ নক্ষত্র বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয়। (রামায়ণ, ১।৭২।১৩ ; মহাভারত, ১।৮।১৬) যাহা হউক, তাহাতে ভগদেবতার সঙ্গে স্ত্রীভগের সম্বন্ধ আছে বলিয়া সূচিত হয়।

৭) দেখ অথসং, ৬।১২৯।২ ; ৭।১৩।৩

৮) যথা দেখ বাজসং (মাধ্য), ১৮।৮

৯) যথা অগ্নিপু, ৩৭৯।১১ ; নারদপু, ১।৪৬।১৭

১০) যথা, 'বিষ্ণুপুরাণে' ৬।৫।৭৪ এবং 'সাত্বততন্ত্রে' ৩।৭,১০ 'বীর্য্য' স্থলে 'ধর্ম্ম' আছে। উৎপলাচার্য-ধৃত বচনে

শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ এই ছয় গুণরাশিকে 'ভগ' বলা হইয়াছে।[১] 'পাঞ্চরাত্র-সংহিতা'য় উহাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২] '(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণে'র এক স্থলে "ঐশ্বর-ভাব" বা "মহেশ্বর ভাব"কে ভগ বলা হইয়াছে।[৩] তথায় হয়ত ঐশ্বর্য্যাদি ছয় গুণের গুণরাশির উপলক্ষণাত্মকরূপে ঈশ্বরভাব বা ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ হইয়াছে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় 'ভগ' শব্দের আরও এক প্রকার নিরুক্তি পাওয়া যায়।[৪]

উক্ত ভগ যাঁহাতে আছে, ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে, তিনি পুংলিঙ্গে 'ভগবান্', আর স্ত্রীলিঙ্গে 'ভগবতী'। ঐ নামের অপর নিরুক্তি ও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। যথা, কথিত হইয়াছে যে "যিনি সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় এবং আগতি ও গতি, তথা বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানেন, তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হয়। (সত্ত্বাদি প্রাকৃত) হেয়গুণসমূহ-রহিত সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ "যাঁহাতে আছে, তিনিই 'ভগবৎ' শব্দের বাচ্য।"[৫] 'শিব-পুরাণে' আছে,[৬] 'ভং বৃদ্ধিং গচ্ছতি' অর্থাৎ যাহা 'ভ' বা 'বৃদ্ধি' প্রাপ্ত হয়, তাহাই 'ভগ'।[৭] এই অর্থে নিরুক্তিতে 'ভগ' শব্দের অর্থ 'প্রকৃতি'। ভগের স্বামী 'ভগবান্'। তিনি শিবই।[৮] 'ভগবান্' বা 'ভগস্বামী'কেই পণ্ডিতগণ 'ভর্গ' বলিয়া থাকেন।[৯] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, অজড় স্বাত্মসম্বোধি এবং সর্ব নিত্য সর্বাবগাহনকে গুণচিন্তকগণ 'জ্ঞান' নামক প্রথম গুণ বলিয়া থাকেন। উহা ব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণও বলিয়া পরিগীত হয়। যাহা জগৎপ্রকৃতিভাব তাহা 'শক্তি' বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। তাঁহার যে স্বাতন্ত্র্যপরিবৃংহিত কর্তৃত্ব, গুণতত্ত্বার্থচিন্তকগণ উহাকে 'ঐশ্বর্য্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সতত জগৎ (অর্থাৎ জগতের সৃষ্ট্যাদি) করিতে থাকিলেও যে তাঁহার যে শ্রমহানি (তাঁহার শ্রম হয় না) উহাই গুণকচিন্তকগণ কর্তৃক, তাঁহার 'বল' নামক গুণ বলিয়া কথিত হয়। (জগতের) উপাদানভাব সত্ত্বেও তাঁহার যে বিকারবিরহ

'বীর্য্য' স্থলে 'মোক্ষ' পাঠ আছে ('স্পন্দপ্রদীপিকা', কাশী, ৮ পৃষ্ঠা)। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'বীর্য্য' স্থলে 'রূপ' এবং 'বৈরাগ্য স্থলে 'প্রযত্ন' আছে। (দশভূমিশাস্ত্র, তাইসো সংস্করণ, ২৬।২৯২ ; অভিসময়ালঙ্কারালোক, বরোদাসং, ৯ পৃষ্ঠা)

১) পরে ষষ্ঠ পাদ টীকা দেখ। আরও দেখ—নারদপু, ১।৪৬।২৭ ; বৃদ্ধহারীতস্মৃতি, ৬।১৬৪

২) পরে ১৩শ পাদ টীকা দেখ। পরে পৃষ্ঠা দেখ।

৩) কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন "ভগো মে ঐশ্বরো ভাবঃ" (বিষ্ণু) ভাগ, ১১।১৯।৪০·১)। উহার "ভগো মহেশ্বরো ভাবঃ" পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

৪) পরে ৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৫) বিষ্ণুপু, ৬।৫।৭৮—৯ ; ব্রহ্মপু, ২৩৩।৬৬·২—৬৮·১ ; নারদপু, ১।৪৬।২১—২ ; অগ্নিপু, ৩৭৯।১৩—৪ এই বচনের প্রথম ভাগ 'শিবপুরাণে'ও পাওয়া যায়। (সনৎকুমারসংহিতা, ৬।২৭·২—২৮·১)

৬) শিবপু, বিদ্যেশ্বরসংহিতা, ১৬।১০১—৩ "ভগস্বামী চ ভগবান্ ভর্গ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

৭) 'অগ্নিপুরাণে'র (৩৭৯।১০) আছে। ভকার অর্থ "সম্ভর্তা ও ভর্তা" এবং গকারের অর্থ "নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। 'নারদপুরাণে' (১।৪৬।১৬) ভকারের অর্থ 'জ্ঞেয়' ও 'সংজ্ঞাত' বলা হইয়াছে।

৮) দেখ—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" শ্বেতউ, ৪।১০·১

৯) 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে মাধ্য, ৫।৪।৫।১ "বীর্য্যং বৈ ভর্গঃ" অর্থাৎ 'বীর্যই ভর্গ'

(অর্থাৎ নির্বিকারতা), উহাই 'বীর্য্য' নামক গুণ। উহার অপর নাম 'অচ্যুতত্ব'।[১] সহকার্য্যনপেক্ষা (অর্থাৎ জগতের সৃষ্ট্যাদিতে কোন সহকারী কারণের নিরপেক্ষতা) 'তেজ' নামে সমুদিত হয়।"[২] এই ছয় গুণ আছে বলিয়াই তিনি 'ভগবান্' নামে পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন।[৩] উহাতে আরও আছে যে শক্ত্যাদি পাঁচটি জ্ঞানেরই গুণ বলিয়া কীর্তিত হয়। জ্ঞানই পরমাত্মা ব্রহ্মের পর রূপ। সেই পর ব্রহ্ম স্বশক্তিপরিবৃংহিত ষাড়্‌গুণ্য।[৪] "জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদি গুণসমূহ শক্তিময়।"[৫] 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'র অন্যত্র 'ভগবান্' সংজ্ঞার স্থূল, সূক্ষ্ম এবং পর—এই ত্রিবিধ অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। "এই ভগবান্ শব্দ সমুদায়ত পূজ্যার্থক। তিনি সদা অখিল বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করেন; এবং আপনার দ্বারা ইহাকে ভরণ অর্থাৎ পূরণ করেন, তথা সম্ভরণও করেন। ভকারের সূক্ষ্ম অর্থ এই ত্রয়ীকর্মাত্মক বলিয়া নিরূপিত হয়। নিখিল শব্দসমূহ দ্বারা (তিনি) গীত হন এবং মুমুক্ষুগণ দ্বারা (অব) গত হন; তিনি স্বতঃ সর্বকে জানেন এবং নিখিল জগৎকে ব্যাপ্ত করেন; তিনি নিখিলার্থের নেতাও—হে মুনি (সূক্ষ্ম) গকারার্থ ইহাই বলিয়া স্মৃত হয়। ('ভগ' শব্দে 'বতুপ্' প্রত্যয় করিলে 'ভগবৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ঐ প্রত্যয়ের তাৎপর্য্য এই—) স্বত্ব দ্বারা বিশ্বকে বরণ করেন ('বৃণু'তে), উহার ঈশ্বররূপে বর্তমান থাকেন ('বর্ততে') এবং অখিল কামকে বৃদ্ধি করেন ('বর্ধয়তি') 'বৎ'এর অর্থ ইহাই বলিয়া সমীরিত হয়।"[৬] পরার্থও ঐ প্রকারের।[৭]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সেবা-বাচক 'ভজ' ধাতু হইতেও 'ভগ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ঐ সম্পর্কেও

---

১) আরও দেখ "অবিকার্য্যস্বভাবত্বাদব্যাপ্যত্বাত্তথাঽচ্যুতঃ।" অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৩৩·১

২) অহির্বুধ্ন্যসং ২।৫৬—৬১·১; লোকাচার্যের 'তত্ত্বত্রয়ে'র বর্বরমুনি-রচিত ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। চৌখাম্বাসংস্কৃত সিরিজ ৭৮ পৃষ্ঠা।

উহাদের কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও পাঞ্চরাত্রসংহিতায় পাওয়া যায়। F O. Schrader, Introduchion to the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita, Adyar, 1916, PP. 22-8 উৎপলাচার্য্য কর্তৃক 'কক্ষ্যাস্তোত্র' হইতে ধৃত বচনে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা আছে। (স্পন্দপ্রদীপিকা', ২৬ পৃষ্ঠা) 'স্বতন্ত্রতন্ত্রে'র মতে (৩।১১-২৪), উৎপত্তি ও প্রলয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং আগতি ও গতি—ইহাদের জ্ঞানই 'জ্ঞান' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং জ্ঞান ষড়বিধ। ধর্ম চতুর্বিধ—সত্য, শৌচ, দয়া এবং মৌন। বৈরাগ্যও চতুর্বিধ—অমান, ব্যতিরেখ, ঐন্দ্রিয় ও বশীকৃত। ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবসিতা। ভৃত্য, অমাত্য, সুহৃৎ, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র, কলত্র, বাস, ভূষণ, কোষ, চতুরঙ্গ সেনা, গৃহ, ভু অস্ত্রশ'স্ত্র, দুর্গ প্রভৃতি 'শ্রী' বলিয়া কথিত হয়। 'যশ' কর্ম ও গুণ ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম চতুর্বিধ—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং লীলাবতরণ। গুণ সমূহ অপরিমেয় হইলেও ৬২ প্রকার বলিয়া কথিত হয়-ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, ভক্তবাৎসল্য, দাতৃত্ব, সত্যসন্ধত্ব, শৌর্য্য, ঔদার্য্য, আস্তিক্য, প্রসন্নতা, শীল, শম, দম, ইত্যাদি। ইহা পরিষ্কার যে এই ব্যাখ্যায় কিছু কিছু মনুষ্যভাব সাপেক্ষ, আর কিছু কিছু ঈশ্বরভাব সাপেক্ষ। ভগবান কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মনে হয়।

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।২৮·১

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬১·২—৬২

৫) ঐ, ২।৩৩·১ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের শক্তি লক্ষ্মী বা শ্রীই ষাড়্‌গুণ্য। 'লক্ষ্মীতন্ত্রের (২১।৫—৯) শক্তি শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং শক্তি ষাড়্‌গুণ্য বলিয়া শক্তিমান্ ব্রহ্মও ষাড়্‌গুণ্য। মতে, জ্ঞান লক্ষ্মীর স্বরূপ (২।২৫) এবং শক্ত্যাদি গুণ-পঞ্চক "জ্ঞানস্য স্মৃতয়ঃ" (২।৩৫)

৬) ঐ, ৫২।৫৯·২—৬৩

৭) ঐ, ৫২।৭১

'ভগবৎ' বা 'ভগবতী' শব্দের নিরুক্তি কোন কোন পুরাণে পাওয়া যায়। যিনি সমস্ত প্রাণী কর্তৃক সেবিত হন এবং যিনি তাহাদিগকে সেবা করেন—তিনিই ভগবান্ বা ভগবতী।[১]

শ্রুতিতে এবং তদনুসারী মহাভারতপুরাণাদি স্মৃতিতে অনেক দেব ও দেবীর নাম আছে। তাই ইহা জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভগবান্ বা ভগবতী কে? পুরাণের কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে শ্রুতিতে যাহাকে 'ব্রহ্ম' বা 'বিষ্ণুর পরম পদ' বলা হয়, অথবা যাহাকে 'পরম ধাম' বলা হয়, পরমাত্মার সেই স্বরূপকেই 'ভগবৎ' বলা হয়; ব্রহ্মের ঐ পরম পদ প্রকৃতপক্ষে শব্দবাচ্য না হইলেও পূজার্থ উপচারক্রমে 'ভগবৎ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[২] কোথাও আছে "যে অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্গণ 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন, তাহাই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' এবং 'ভগবান্' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।"[৩] আবার কোথাও আছে যে সর্ব কারণের কারণ অর্থাৎ পরম কারণ মহাবিভূতি-সংজ্ঞক পরব্রহ্মে 'ভগবৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।[৪] জ্ঞানাদি ভগের উপরিপ্রদত্ত ব্যাখ্যানুসারে অনায়াসে বুঝা যায় যে 'ভগবান্' সংজ্ঞা বিশেষভাবে জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব এবং উহার ত্রিবিধকারণত্ব সূচক। বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' অনুসারে ঐ লক্ষণ মুখ্যত ব্রহ্মেরই। সুতরাং পুরাণে ঠিকই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মই ভগবান্। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতায়ও সেই কথা আছে। যথা দেখ,—"যাহা অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, অজর, ধ্রুব এবং অনামরূপসংভেদ্য, (সুতরাং) অবাঙ্মনসোগোচর পরব্রহ্ম, তাহাই সর্বশক্তি-সমস্তাখ্য-ষাড়্গুণ্য;[৫] "সেই পরব্রহ্ম স্বশক্তিপরিবৃংহিত ষাড়্গুণ্য";[৬] "ষাড়্গুণ্যযোগ হেতুই (পরব্রহ্ম) ভগবান্ বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন।"[৭] কোন কোন পুরাণে আবার ইহাও আছে 'ভগবৎ' শব্দ মুখ্যত পরব্রহ্মভূত বাসুদেবকেই বুঝায়; অন্যত্র উহার প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণ।[৮] 'মহাভারতে'র কোন কোন স্থানেও 'ভগবান্' শব্দে কেবল বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৯] অপর কোন কোন মতে রুদ্র বা শিবই ভগবান্। যথা, শ্রুতিতে আছে, "যো বৈ রুদ্রো স

---

১) যথা দেখ— "সেব্যতে যা সুরৈঃ সর্বৈস্তাশ্চৈব ভজতে যতঃ।
ধাতুর্ভজেতি সেবায়াং ভগবত্যেব সা স্মৃতা॥"
—(দেবীপু,) ৪ পৃষ্ঠার ৫ পাদ টীকাও দেখ।

এই বচনে 'সুর' শব্দ সর্বপ্রাণীর উপলক্ষণাত্মক বলিয়া মনে করা সমীচীন।

২) বিষ্ণুপু ৬।৫।৭১; নারদপু, ১।৪৬।১১—১২, ১৪; আর ও দেখ— অগ্নিপু, ৩৭৯।৯

৩) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১।২।১১; আরও দেখ—৩।৩২।২৬

৪) বিষ্ণুপু, ৬।৫।৭২; নারদপু, ১।৪৬।১৫ ৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ২।৬—৭·১ ৬) ঐ, ২।৬২·১

৭) ঐ, ২।২৮৯

৮) বিষ্ণুপু, ৬।৫।৭৬—৭; নারদপু, ১।৪৬।১৯—২০; বৃদ্ধহারীতস্মৃতি, ৬।১৬৮; আরও দেখ—(বিষ্ণু) ভাগপু ১১।১৫।১৬·১; ১৬।২৯·১; অগ্নিপু, ৩৭৯।১২; পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৫৪।৬৬; '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান নারায়ণ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। (১১।১৫।১৬—৭ দেখ)

৯) যথা, বর্ণিত হইয়াছে যে সুন্দ ও উপসুন্দ অসুরকে প্রলোভিত করিতে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিলোত্তমা তাঁহাকে নমস্কার করত উপস্থিত দেবতাগণের "মণ্ডল"কে প্রদক্ষিণ করেন। ঐ মণ্ডলে

ভগবান্” (অর্থাৎ রুদ্রই ভগবান)[১] ‘শিবপুরাণে’ আছে শিবই ভগবান।[২] ‘লিঙ্গপুরাণে’ আছে, “যাহা ঈক্ষণ করে,[৩] তাহাই নিরীক্ষণীয়—এই আজ্ঞা করত ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং (ভক্তকে) আত্মজ্ঞানরূপ যোগ প্রাপ্ত করান। সেই হেতু দেবদেব মহেশ্বর দেব ‘ভগবান্’ বলিয়া কথিত হন।[৪] এই বচনের মূল ‘অথর্বশিরঃশ্রুতি।’[৫] সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্তশক্তি এবং অনন্তশক্তি—এই ছয়টীকে শৈবশাস্ত্রে মহেশ্বরের “ষড়ঙ্গ” বলা হইয়া থাকে।[৬] এই সকল জ্ঞানাদি ষড়্গুণেরই নামান্তর মাত্র। স্বকৃত ‘স্পন্দপ্রদীপিকা’য় (২৬ পৃষ্ঠা) আচার্য্য উৎপল প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত করত তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বজ্ঞতা = জ্ঞান, তৃপ্তি = বল, অনাদিবোধ = তেজ, স্বতন্ত্রতা = ঐশ্বর্য্য, নিত্য-অলুপ্তশক্তি = বীর্য্য, এবং অনন্ত-শক্তি = শক্তি। সুতরাং শিবের ষড়ঙ্গ তাঁহার ভগই। অতএব তিনি ভগবান্।

বস্তুত পক্ষে মুখ্য প্রয়োগ এবং গৌণ প্রয়োগ কল্পনার কোন প্রকৃত মূল নাই। উহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মাত্র বলিয়া মনে হয়। অথবা উহা কেবল অর্থবাদমাত্র হইতে পারে। স্ব স্ব ইষ্টদেবতার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা হেতু তাঁহার মহত্ত্ব বাড়াইতে ভক্তগণ মনে করে যে ‘ভগবৎ’ শব্দের মুখ্য প্রয়োগ একমাত্র তাঁহাতেই হয়, অপর দেবতায় উহার প্রয়োগ গৌণ। তার পর শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই যে দেবতা বহু নহে, একই,—সমস্ত দেবনাম একই পরম দেবতার বা আদিদেবের বিভিন্ন কর্মনামসমূহমাত্র। তখন বহু দেবতার সদ্ভাব অঙ্গীকার এবং উহাঁদের

“প্রাঙমুখো ভগবানাস্তে দক্ষিণেন মহেশ্বরঃ।
দেবাশ্চোত্তরেণাসন্ সর্বতস্ত্বষয়োঽহ ভবন্॥” (মহাভা, ১।২১১।১৬)

‘ভগবান্ পূর্বমুখী হইয়া বসিয়াছিলেন। মহেশ্বরদক্ষিণ দিকে এবং দেবতাগণ উত্তর দিকে ছিলেন। আর ঋষিগণ সর্বদিকেই বসিয়া ছিলেন।’ ঐ ভগবান অবশ্যই ব্রহ্মা কিম্বা মহেশ্বর নহেন। তাই টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, তিনি বিষ্ণুই (“ভগবান বিষ্ণুঃ”)। আরও দেখ—মহাভা, ১।২১১।২৪

‘বিষ্ণুপুরাণে’র (৬।৫।৭৪ ও ৭৮) বচনের আধারে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে,” ঐশ্বর্যাদি ছয় (গুণ) যেই বাসুদেবে অপ্রতিবদ্ধরূপে সামস্ত্যরূপে নিত্য বর্তমান,...তথা উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান ও যাহার, সেই বাসুদেবই ‘ভগবান’ বলিয়া বাচ্য।” (গীতা ৬।৩৭ শঙ্করভাষ্যের উপোদঘাত)

১) জৈমিপ্রা, অথর্বশিরউ, ২।১—৩২ ; ‘রুদ্রসূক্তে’ রুদ্রকে “ভগব” বা ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। (বাজসং (মাধ্য), ১৬।৯, ৫২)

২) পূর্বে ৬ পৃষ্ঠা দেখ।

৩) দেখ—ছান্দোগ্যউ, ৬।২।৩ ; ঐতউ, ১।১।১ ; ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৫

৪)
“যদীক্ষতে চ ভগবান্নিরীক্ষ্যমিতি চাজ্ঞয়া।
আত্মজ্ঞানং মহাদেবো যোগং গময়তি স্বয়ম্।
ভগবাংশ্চোচ্যতে তেন দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥”
(লিঙ্গপু, ২।১৮।২৩'২—২৪)

সৌরপু, ৪৫।৪৪—৪৫'১ (“নিরীক্ষয়তি চান্যথা” পাঠান্তরে)

৫) “অথ কামাদুচ্যতে ভগবান্মাহেশ্বরঃ যস্মাদ্ভক্তা জ্ঞানেন ভজন্ত্যনুগৃহ্ণাতি চ বাচং সংসৃজতি বিসৃজতি চ সর্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগৈশ্বর্য্যেণ মহতি মহীয়তে তামাদুচ্যতে ভগবান্মহেশ্বরঃ।” (অথর্ব-শিরোপনিষৎ,)।

৬) যথা দেখ—বায়ুপু, ১।১২।৬১,

তারতম্য-কল্পনা অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছু নহে। পুরাণাদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মুখ্য দেবতা প্রসিদ্ধ। পরন্তু তথায় ইহাও অতীব স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে যে ঐ তিন একেরই তিন কর্মনামমাত্র,—একই পরম দেবতাকে,—পরব্রহ্মকে বা পরমপুরুষকে, বিশ্বের সৃষ্টি করেন বলিয়া 'ব্রহ্মা', পালন করেন বলিয়া 'বিষ্ণু' এবং সংহার করেন বলিয়া 'রুদ্র' বা হর, নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।[১] ঐ পরম দেব ভগবান্। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর ভগবান্।[২]

বেদে, কেবল ভগদেবতাকে নহে,[৩] অগ্নি, রুদ্র এবং ইন্দ্রকেও 'ভগব' বা 'ভগবন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, দেখা যায়।[৪] 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে' বিরাটপুরুষকে বা সগুণ ব্রহ্মকে "ভগবান্"[৫] ও "ভগেশ"[৬] বলা হইয়াছে। মহাভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, যম, সোম, প্রভৃতি দেবতাকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। কেবল মহত্ত্ব এবং পূজ্যত্ব সূচকরূপেও 'ভগবৎ' (বা 'ভগবতী') শব্দের ব্যবহার হইত।[৭] ঐ অর্থেই বৈদিক ঋষিকে, তথা অপরাপর মহদ্ব্যক্তিকে 'ভগবান্' বলিয়া সম্বোধন করা হইত। উপনিষদে ঋষিগণকে প্রায়ই 'ভগব' বা 'ভগবন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। অবৈদিক জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।[৮] 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' (৩।২৭।৪২·১) উক্ত হইয়াছে যে ঋষিগণকে, দেবতাগণকে এবং গুরুগণকে 'ভগবান্' বলিয়া সম্বোধন কর্তব্য। 'দেবীভাগবতপুরাণে' আছে, জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, যশ, এবং বল—এই সমস্তই ভগ। তৎসম্পন্ন বলিয়া ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমস্বরূপ এবং উহাদের দাত্রী শক্তিকে 'ভগবতী' বলা হয়। তিনি সর্বদাই ভগরূপ (অর্থাৎ তাঁহার ভগ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে)। তাঁহার সহিত যুক্ত বলিয়াই পরমাত্মা 'ভগবান্' বলিয়া কথিত হন।[৯] 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' আছে, "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই নিশ্চয়ই কৃত্রিম এবং মিথ্যা। যেমন ভগবান্ সত্যস্বরূপ, তেমন তাঁহার প্রকৃতি দুর্গা সত্যস্বরূপা।

---

১) যথা দেখ—(বিষ্ণু) ভাগপু, ১।২।২৩ ; ৮।৭।২৩ বিষ্ণুপু, ১।২।৬৬ ;

২) 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, ষাড়্গুণ্য পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ওঁ, ভগবান্, বাসুদেব, আত্মা, অব্যক্ত, সর্বপ্রকৃতি, প্রধান, অচ্যুত, কপিল, কাপিল, হিরণ্যগর্ভ, অপান্তরতপ, শিব, প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। (২।২৬·২—৩৯)

৩) অথসং, ১৯।৪।৩ ; আরও দেখ—৩য় পৃষ্ঠায় ১০ পাদটীকা।

৪) যথা দেখ—বাজসং (মাধ্য), ১৭।৭৮ (অগ্নিকে) ; ১৬।৯, ৫২, ও ৫৩ (রুদ্রকে) ; ৩৬।২১ (ইন্দ্রকে) ; তৈত্তিব্রা, ২।৩।১০।১ (প্রজাপতিকে)

৫) শ্বেতউ', ৩।১১ ; ৫।৪ ৬) শ্বেতউ', ৬।৬

৭) "ভগবানিতি পূজ্যার্থঃ শব্দোহয়ং সমুদায়তঃ" (অহির্বুধ্ন্যসং) ৫২(৫৯·২)

৮) হরিভদ্র লিখিয়াছেন,

"ক্লেশঃ কর্ম তথা জন্ম ক্লেশাজ্জ্ঞেয়াবৃতী তথা।
যেন বৈপক্ষিকা ভগ্নাস্তেনেহ ভগবান্ স্মৃতঃ॥"

এই নিরুক্তি অনুসারে "ক্লেশাদিকং ভগ্নবানিতি ভগবান্" অর্থাৎ ক্লেশাদি ভগ্নবান্ বলিয়াই বুদ্ধদেব 'ভগবান্'। সমগ্র ঐশ্বর্য, রূপ, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও প্রযত্ন—এই ছয় ভগ সম্পন্ন বলিয়া বুদ্ধ ভগবান। ('অভিসময়ালঙ্কারালোক', ৯ পৃষ্ঠা)।

৯) দেবীভাগপু, ৯।২।১০—১২·১

সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাতে যুগে যুগে (অর্থাৎ সতত) বর্তমান আছে। সিদ্ধ্যাদি ভগ বলিয়া জ্ঞেয়। সেইহেতু তিনি ভগবতী বলিয়া স্মৃত হন।[১] অথর্ববেদেও জঙ্গিরা নামক ঔষধিবিশেষকে 'ভগব'[২] এবং তারকাবিশেষকেও 'ভগবতী' বলা হইয়াছে।[৩] উপনিষদে পশু-পক্ষীকেও 'ভগবন্' সম্বোধনের দৃষ্টান্ত আছে।[৪] বেদের এক মন্ত্রে ঋষি নিজের এক হস্তকে "ভগবান্" এবং অপর হস্তকে "ভগবত্তর" বলিয়াছেন।[৫] ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে, ঐখানে 'ভগ' শব্দের অর্থ 'ভাগ্য', সুতরাং 'ভগবান্' অর্থ 'ভাগ্যবান্'। তথায় 'ভগবান্' শব্দের অর্থ 'বীর্য্যবান্', 'বলবান্' কিম্বা 'শক্তিমান্'ও হইতে পারে। যাহা হউক, ঐ অর্থে "ভগবত্তম" শব্দেরও ব্যবহার বেদে পাওয়া যায়।[৬]

এইখানে আরও একটা কথা বলা উচিৎ মনে করি। শ্রুতিতে কোন কোন দেবতা ও ঋষিকে কখন কখন 'ভগ' বলা হইয়াছে দেখা যায়। যথা, 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' ওঙ্কারকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) 'ভগ' সম্বোধন করা হইয়াছে।[৭] 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ককে 'ভগোঃ' বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে।[৮] বেদসংহিতায় অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, প্রভৃতি দেবতাকে 'ভগ' বলার দৃষ্টান্ত আছে।[৯] যে যে দেবতা, ঋষি বা বস্তু যে যে গুণপ্রধান তাঁহাকে তত্তৎ গুণের নামে উল্লেখ করার প্রথা বেদে প্রচলিত ছিল। তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ"[১০] সুতরাং ঐসকল স্থলে 'ভগ-প্রধান' বা 'ভগবান্' অর্থেই 'ভগ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অগ্নীন্দ্রাদি দেবতাগণকে যে বেদে স্পষ্টত 'ভগব' বা 'ভগবান্'ও বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যেমন মৈত্রেয়ী একবার 'ভগোঃ' বলিয়াছেন, তেমন, এবং ততোধিক বার, 'ভগবান্' বলিয়াছেন। 'স্কন্দপুরাণে' আছে যে, 'ভগ' বিষ্ণুরই নাম বিশেষ। তথায় ঐ নামের নিরুক্তিও প্রদত্ত হইয়াছে—"যেহেতু তিনি সর্বলোকে ভাত হন ("ভাতি") এবং ভূর্ভুবাদিতে গীত হন ("গীয়তে"), সেইহেতু সর্বভূতে প্রবিষ্ট বিষ্ণু 'ভগ' বলিয়া স্মৃত হন। সর্বদেবময় ও মহান্ তিনি (সর্বভূতে) প্রবেশ হেতু ("বিশনাৎ") 'বিষ্ণু' বলিয়া অভিহিত হন। ভাসন এবং গমন হেতুও ("ভাসনাদ্গমনাচ্চৈব") তিনি 'ভগ' নামে প্রকীর্তিত হন।"[১১]

---

[১] ব্রহ্মবৈবর্তপু, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭।১৫—৬ [২] অথসং, ১৯।৩৪।৮

[৩] অথসং, ২।৮।১ ; ৬।১২৯।৩ ; আরও দেখ—তৈত্তিআ, ২।৬।১

[৪] যথা দেখ—ছান্দোগ্যউ, ৪।৫।১—২ ; ৪।৭।২—৩ ; ৪।৮।২—৩ ; ৪।৬।২—৩ বচনে অগ্নিকে 'ভগবন্' সম্বোধন আছে।

[৫] ঋক্‌সং, ১০।৬১।১২ ; অথসং, ৪।১৩।৬ [৬] অথসং, ২।৯।২ [৭] তৈত্তিউ, ১।৪।৩

[৮] বৃহউ, ২।৪।২ ; ৪।৫।৩.

[৯] অগ্নিকে—ঋক্‌সং, ২।১।৭ ; ১।১৪১।১১
ইন্দ্রকে—ঋক্‌সং, ২।১১।২১ = ১৫।১০ = ১৬।১৯ ; ৩।৫৬।৬ ; ৭।৪১।৩
বায়ুকে—ঋক্‌সং, ১।১৩৪।৫
পার্শীধর্মগ্রন্থে অহুরমজ্‌দকে "বগ" বা ভগ বলা হয়।

[১০] ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।২৯ [১১] স্কন্দপু, ৫।৩।১৪।২১—২

'কপিঞ্জলসংহিতা' নামে এক পাঞ্চরাত্রসংহিতার মতে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব 'ভগবান্' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বৈষ্ণবের বিশেষ লক্ষণ এই যে উঁহারা একদণ্ডী এবং শিখাযজ্ঞোপবীতাদি-পরিত্যাগী।[১]

ইহাও বোধ হয় বলা উচিত যে পরমেশ্বরকে যেমন 'ভগবান্' বা ভগ-যুক্ত বলা হয়, তেমন কখন কখন ভগহন্ বা ভগ-হন্তাও বলা হয়, দেখা যায়। যথা, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে আছে, বিষ্ণু "ভগবান্ ভগহা।"[২] শিবসহস্রনামস্তোত্রে আছে, শিব "ভগবান্" ও "ভগহারী।"[৩] টীকাকার মনে করেন যে ঐশ্বর্য্যাদি 'ভগ'কে সংহার-কালে হনন বা হরণ করেন বলিয়া পরমেশ্বরকে 'ভগহা' বা 'ভগহারী' বলা হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝিতে হইবে যে ঐখানে ভগের বিকাশ ও সঙ্কোচ বা আবির্ভাব ও তিরোভাবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে আপন ভগের বিকাশ করেন, তখন ভগের আবির্ভাব হয়,—ভগ ব্যক্ত হয়, সুতরাং তখন তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হয়; আর সংহারকালে তিনি ঐ ভগের সঙ্কোচ করেন, তখন ভগের তিরোভাব হয়,—ভগ অব্যক্ত হয়, সুতরাং তখন তাঁহাকে 'ভগহন্' বা 'ভগহারী' বলা হয়। এই প্রকারে ভগের অপ্রকট ও প্রকট অবস্থা বা বীজভাব ও অঙ্কুরভাব বিভাগ হইলেও তিনি কখনও ভগবিরহিত হন না; সুতরাং সেই দৃষ্টিতে তিনি নিত্য ভগবান্।

যাহা হউক, উপরের লেখা হইতে অতি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে পরব্রহ্মের, ব্রহ্মা-বিষ্ণুশিবাদি দেবতার এবং দুর্গাদি দেবীর, তথা রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি ভগবানের অবতার বলিয়া পরিগণিত মহাপুরুষগণের, ভক্ত এবং উপাসককে 'ভাগবত' বলা যায়।[৪] উহার বাস্তবিক দৃষ্টান্তও প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। বাসুদেব, নারায়ণ বা বিষ্ণুর উপাসককে 'ভাগবত' বা 'মহাভাগবত' বলার অসংখ্য দৃষ্টান্ত মহাভারতপুরাণাদিতে আছে।[৫] মধ্যভারতে,—গোয়া-লিয়ররাজ্যান্তর্গত ভিল্সানগরীর সন্নিকটস্থ বেস্নগরে প্রাপ্ত এক শিলালেখে (১৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দকালের ("দেবদেব বাসুদেবের" ভক্ত,—তাঁহার গরুড়ধ্বজ-নির্মাতা-হেলিওদোরকে "ভাগবত" বলা হইয়াছে। ঐ স্থানে প্রাপ্ত অপর এক শিলালিপিতে (১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকালের) "ভগবতের প্রাসাদোত্তমে" গরুড়ধ্বজ-নির্মার্তা গোতমীপুত্রকে "ভাগবত" বলা হইয়াছে। রাজপুতনার চিতোরের সন্নিকটস্থ ঘোসুণ্ডিগ্রামে প্রাপ্ত ঐ সময়ের এক শিলালেখে "ভগবান সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের" "পূজাশিলা-প্রাকার"-নির্মাতা রাজা গাজায়নকে "ভাগবত" বলা হইয়াছে।

---

১) কপিঞ্জলসং, ৪।১৮·২—২০·১

২) মহাভা, ১৩।১৪৯।৭৩; 'গরুড়পুরাণো'ক্ত বিষ্ণুসহস্রনামে আছে, "ভগহা ভগবান্ ভানুস্তথা ভাগবতঃ স্বয়ম্।" (১।১৫।৮২·১)

৩) মহাভা, ১৪।১৭।৩৩·২, ৭৬·২ ও লিঙ্গপু, ১।৬৫।৫৭·১ ৯৮·১

৪) 'মহাভারতে'র এক স্থলে স্বয়ং নারায়ণকে 'ভগবান্' এদং 'ভাগবত' উভয়ই বলা হইয়াছে। গরুড় পুরাণে' বিষ্ণুকে সেই প্রকার বলা হইয়াছে। (উপরে ২ পাদটীকা দেখ) 'পাদ্মসংহিতা'য় (৪।২১।২১·২) আছে "ভগবানেব গোবিন্দঃ সাক্ষাদ্ভাগবতঃ স্মৃতঃ।"

৫) যথা দেখ—মহাভা ১২।৩৩৫।১৭, ২১—২; ৩৩৭।১; অগ্নিপু, ৩৭।৩৮·২; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৫।১৯।২৪·১=দেবী ভাগপু, ৮।১১।২৫·১; লিঙ্গপু, ২।৪।৫—১৬; নারদপু, ১।৫।৫২, ৬১, ৬৪

উহার পরবর্তীকালের শিলালেখে আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমস্তের উল্লেখ নিপ্রয়োজন। কৃষ্ণ-ভক্তের 'ভাগবত' আখ্যার দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে বহু পাওয়া যায়। 'মুক্তিকোপনিষদে' রামের ভক্তকে 'ভাগবত' বলা হইয়াছে।[১] ভগবান মৎস্যাবতারের ভক্ত মনুকে "মহাভাগবতোত্তম" বলা হইয়াছে।[২] 'বরাহপুরাণে' বরাহাবতারের ভক্তগণকে 'ভাগবত' বলা হইয়াছে।[৩] ঐ প্রাচীনকালে শিব-ভক্তগণকেও 'ভাগবত' বলা হইত। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি (১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) "শিব-ভাগবতে"র উল্লেখ করিয়াছেন।[৪] ঐ সংজ্ঞাতে 'ভাগবত' শব্দের সহিত 'শিব' শব্দ সংযুক্ত থাকাতে বুঝা যায়, পতঞ্জলির সময়ে অন্য ভাগবতও বর্তমান ছিল; উহাদের হইতে পার্থক্য নির্দেশের জন্যই পতঞ্জলি শিবভক্ত ভাগবতকে 'শিব' শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন; অন্যথা ঐ সংজ্ঞাতে 'শিব' শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হইত না। ঐ সময়ে বাসুদেবের ভক্তগণও যে 'ভাগবত' নামে পরিচিত ছিল, তাহা এইমাত্র পূর্বে উল্লিখিত শিলালেখসমূহ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায়। 'শিবপুরাণে'র বক্তা স্থতকে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ "ভাগবতোত্তম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।[৫] তথায় স্থত শিবেরই ভক্ত। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাতেও জানা যায় যে শিবভক্তকেও পূর্বে 'ভাগবত' বলা হইত। 'নারদপুরাণে' এই বিষয়ে অতি স্পষ্ট বচন আছে। "যাহারা শিবপ্রিয়, শিবাসক্ত ও শিবপাদার্চনে রত এবং ত্রিপুণ্ড্রধারী, তাহারা নিশ্চয়ই ভাগবতোত্তম।"[৬] "যাহারা শিবাগ্নিকার্যনিরত, ('নমো শিবায়'-এই) পঞ্চাক্ষর (মন্ত্র) জপে রত এবং শিবধ্যানরত, তাহারা নিশ্চয়ই ভাগবতোত্তম।"[৭] তথায় সাত্ত্বিক বিষ্ণুভক্তকেও অবশ্য "ভাগবতোত্তম" বলা হইয়াছে।[৮] আবার ইহাও পরিষ্কারভাবে উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণু বা শিব কাহারও নাম যে জপ করে এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার পুজাদি করে, সেও নিশ্চয়ই ভাগবতোত্তম।[৯]

"শিবে চ পরমেশে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ॥"[১০]

'পরমেশ্বর শিব এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি সমবুদ্ধি সহকারে যাহারা (উপাসনায়) প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই ভাগবত বলিয়া কথিত হন।' 'নারদপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদের অনুরোধে মহর্ষি সনৎকুমার তাঁহার নিকট "ভাগবততন্ত্র" ব্যাখ্যা করেন।[১১] উহার প্রারম্ভে শৈবাগমমতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে,[১২] পরে বৈষ্ণবাগমমত। যাহা হউক, তাহাতে ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে শৈবাগমমতকেও তখন ভাগবতমত বলা হইত।

---

১) মুক্তিকউ, ১।১ ; আরও দেখ,—ওঁ যো হ বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগাবনদ্বৈতপরমানন্দ আত্মা"—(রামোত্তরতাপিনীউ

২) দেবীভাগপু, ৮।৯।২৩·২ ৩) যথা দেখ—বরাহপু, ১৩০।৮—

৪) পানিনি ৫।২।৭৬ সূত্রের পতঞ্জলি কৃত ভাষ্য দেখ। আর ও দেখ—Chandradhar Guleri, "On Siva-Bhagavata' in Patanjali's Mahabhashya," Inb. Ant., Vol. 41(1912), p. 272.

৫) শিবপু, জ্ঞানসং, ৭২।১·১ ৬) নারদপু, ১।৫।৬৮ ৭) নারদপু, ১।৫।৭৩

৮) নারদপু, ১।৫।৫২,৬১,৬৪ ৯) নারদপু, ১।৫।৬৯—৭০

১০) নারদপু, ১।৫।৬২ অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে আদিদেবকে কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু এবং কেহ ব্রহ্মা বলেন। (১।৩।৫·২—৬·১) আরও দেখ ১।৬।৪৪—৫০ ১১) ঐ, ১।৬৩।৯ ও ১২ ১২) ঐ, ১।৬৩।১৩—

শিবপুরাণের এক উক্তিমূলে পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবানই কোন কোন পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'ভর্গ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।[১] তাহাতে ভর্গোপাসক বা গায়ত্রী-উপাসককেও ভাগবত বলা যায়। 'নারদপুরাণে' এবং 'স্কন্দপুরাণে' ঐ বিষয়ে স্পষ্ট বচনও আছে। "গায়ত্রীনিরতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ" ("যাহারা গায়ত্রী-নিরত তাহারাও নিশ্চয় ভাগবতোত্তম)।[২] 'শিবপুরাণে' সুধর্মা নামে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের কথা আছে।[৩] এইখানে উহার উল্লেখ কর্তব্য মনে হয়। কথিত হইয়াছে যে তিনি "সর্বদা ব্রহ্মবিত্তম"; "বেদমার্গপর, নিত্য অগ্নিসেবাপরায়ণ, এবং দেবতা ও অতিথির পূজক।" তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে ত্রিকাল সন্ধ্যা করিতেন। তিনি বেদশাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন এবং শিষ্যদিগকে উহা অধ্যাপন করিতেন। তিনি "জ্ঞান-পরায়ণ" ছিলেন। "তিনি জানিতেন যে আত্মাই আত্মার তারক এবং আত্মাই আত্মার পাবক (বা পবিত্রকারক)।" "তিনি পরমসন্তুষ্ট ছিলেন এবং সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন।"[৪] তিনি দেবতাপূজক হইলেও শিব এবং বিষ্ণুতে তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছিল না, দেখা যায়। কেননা, তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে তিনি "হরির পরিচর্য্যা" করিতে বলেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে শিবপূজা করিতে বলেন।[৪১] এই বিবরণ হইতে সহজে বুঝা যায় যে সুধন্বা বেদমার্গানুযায়ী আদর্শ সৎপ্রকৃতির ব্রাহ্মণমাত্র ছিলেন। পরন্তু 'শিবপুরাণে' ইহাও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে তিনি "ভগবদ্ধর্ম-তৎপর" ছিলেন[৫]; "তিনি ধর্মকর্মরত এবং ভগবদ্ধ্যান-তৎপর ছিলেন।"[৬] সেইরূপে তাঁহাকে অবশ্যই 'ভাগবত' বলা যায়। তাহাতে নিরূপণ করিতে হয় যে বেদশাস্ত্রানুযায়ী সদ্ব্যক্তিও ভাগবত। কোন কোন পুরাণে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ বচনও আছে,—"যাহারা স্বাশ্রমাচারনিরত, তথা অতিথিপূজক, এবং যাহারা বেদার্থবক্তা, তাহারাও নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।"[৭]

'স্কন্দপুরাণে'র বৈষ্ণবখণ্ডে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক ভাগবতের লক্ষণ ও কর্ম বর্ণিত হইয়াছে।[৮] "যাহারা সর্বপ্রাণীর হিতকারী, অসূয়ারহিত, বিমৎসর, নিঃস্পৃহ, শান্ত এবং জ্ঞানী তাহারাই

---

১) পূর্বে ৫ পৃষ্ঠা। ২) নারদপু, ১।৫।৬৩·২ ; স্কন্দপু, ২।১।২১।৫২·২

৩) 'শিবপু, জ্ঞানসংহিতা, ৫৮তম অধ্যায়। ৪) ঐ, ৫৮।১—১৩ দেখ ৪·১। ঐ, ৫৮।২৬ ও ৩৭

৫) ঐ, ৫৮।১২·২ ৬) ঐ, ৫৮।২৭·২ ৭) নারদপু, ১।৫।৬৭ ; স্কন্দপু, ২।১।২১।৪৬

৮) 'স্কন্দপুরাণে'র বৈষ্ণবখণ্ডের অন্তর্গত বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যে আকাশগঙ্গাতীর্থের মাহাত্ম্যথাপন প্রসঙ্গে "রামানুজ নামেখ্যাত সর্বশাস্ত্রপারগ, জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুভক্ত" (২।১।২১।২) জনৈক ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আছে। সেই "ধর্মাত্মা বৈখানসমতে স্থিত হইয়া তপস্যা করেন।" (২।১।২১।৩·১ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং, তাঁহার অনুরোধে, ভাগবতের লক্ষণ ও কর্ম বর্ণনা করেন। (২।১।২১।৪০—৬১)।

বেঙ্কটাচল আচার্য্য রামানুজের অনুযায়ী শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম-পুণ্য তীর্থ। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে উক্ত রামানুজাখ্য ব্রাহ্মণ এবং আচার্য রামানুজ অভিন্ন ব্যক্তি। পরন্তু উহার কোন নিশ্চয়াত্মক হেতু নাই।

তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতের এক উপবিভাগ বৈখানসমত নামে খ্যাত। উক্ত রামানুজ কর্তৃক অনুসৃত বৈখানাসমত সেই বৈখানসমত নহে মনে হয়। কথিত আছে যে রামানুজ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে, বর্ষায় মুক্ত আকাশতলে এবং শীতকালে জল মধ্যে থাকিয়া হৃদয়ে জনার্দনের ধ্যান করত অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। তিনি কিছুকাল জীর্ণ পত্র, কিছু কাল জল এবং কিছু কাল বায়ুভক্ষণ করত, যাপন করেন। ঐ প্রকার কঠোর তপস্যাকেও প্রাচীনকালে বৈখানসধর্ম বলা হইত।

ভাগবতোত্তম। যাহারা মন, বাণী ও কর্ম দ্বারা পরপীড়া করে না এবং অপরিগ্রহশীল তাহারাই ভাগবতোত্তম।"[১] "যে নরোত্তমগণ পিতামাতার শুশ্রূষা করে, যাহারা দেবার্চনরত, যে নরগণ দেবতার সাধক এবং পূজা দেখিয়া আনন্দিত হয়, তাহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।"[২] "যে নরোত্তম সর্বভূতকে আত্মবৎ দেখে, (সুতরাং) শত্রুতে ও মিত্রতে তুল্য (ভাবসম্পন্ন) তাহারাই ভাগবত বলিয়া স্মৃত হয়। যাহারা ধর্মশাস্ত্রের প্রবক্তা এবং সত্যবাক্যরত, তাহারা, আর যাহারা উহাদের শুশ্রূষাকারী, তাহারাও, নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।"[৩] · যাহারা ইষ্টাপূর্তকারী তাহারা ভাগবতোত্তম।[৪] "যাহারা গায়ত্রীনিরত তাহারাও নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।"[৫] "যাহারা স্বাশ্রমাচারনিরত, তথা অতিথিপূজক; এবং যাহারা বেদার্থবক্তা, তাহারাও, নিশ্চয় ভাগবতোত্তম। যাহারা বিদিত শাস্ত্রসমূহ পরার্থে প্রবচন করে এবং যাহারা সর্বত্র গুণগ্রাহী, তাহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।"[৬] উপসংহারে ভগবান্ বলেন, "এই বিষয়ে বেশী বলার প্রয়োজন কি? আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি যে যাহারা সদ্গুণ উপার্জনে প্রবৃত্ত হয় ('সদ্গুণায় প্রবর্তন্তে') তাহারাই ভাগবতোত্তম।"[৭] ভাগবতের এই সকল লক্ষণ ও কর্ম হইতে নিরূপিত হয় যে প্রাচীন কালে কেবল বিষ্ণুভক্তকেই যে ভাগবত বলা হইত তাহা নহে,[৮] বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী সমস্ত ধার্মিকব্যক্তিকে ভাগবত বলা হইত।

কালক্রমে 'ভাগবত' সংজ্ঞা বিশেষভাবে বিষ্ণুর, তথা তাঁহার অবতার রামকৃষ্ণাদির, ভক্ত এবং উপাসক অর্থে প্রায় রূঢ় হইয়াছিল, মনে হয়। কেননা, ষষ্ঠ খ্রীষ্টশতকের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষাচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন, যে যে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যে যে দেবতার "উপাশ্রিত" সেই সেই দেবতার সেবা-পূজার্থ মন্দিরের এবং প্রতিমার প্রতিষ্ঠা সেই সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা স্ব স্ব বিধি-অনুসারে করাইতে হইবে;—বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা ভাগবতগণ, সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা মগগণ, শিবের প্রতিষ্ঠা সভস্মদ্বিজগণ, মাতৃগণের প্রতিষ্ঠা মাতৃমণ্ডলবিদ্‌গণ এবং ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা বিপ্রগণ দ্বারা কর্তব্য।[৯] পাদ্মসংহিতা'য় সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে—বিষ্ণুর পূজা পাঞ্চরাত্রপরায়ণ ভাগবতগণ কর্তৃকই করাইতে হইবে, সামান্যদেবমাত্রপ্রপূজকগণ কর্তৃক তাঁহার পূজা করাইবে না; শিবের পূজা শিবশাস্ত্রজ্ঞ শিবদ্বিজগণ কর্তৃক, সূর্যের পূজা সোমপ দ্বিজেন্দ্রগণ কর্তৃক, মদন, গণনাথ ও সুব্রহ্মণ্যের পূজা শিবদ্বিজগণ কর্তৃক এবং কুবেরাদির পূজা পূজক বিপ্র দ্বারা করাইবে। "দুর্গাং সম্পূজয়েদ্দেবীং সদা ভাগবতঃ স্বয়ং" ('ভাগবত স্বয়ং সদা দুর্গাদেবীর পূজা করিবে')। তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ পারশবগণ দ্বারা মাতৃদিগের অর্চন করাইবে। শাস্তা মহামোটীকে কুলাল পূজা করিবে।[১০] একাদশ খ্রীষ্টশতকের প্রারম্ভে আচার্য্য যাদবপ্রকাশ সেইরূপে লিখিয়াছেন

---

১) স্কন্দপু, ২।১।২১।৪০—১ ২) ঐ, ২।১।২১।৪৩ ৩) ঐ, ২।১।২১।৪৬—৭ ৪) ঐ, ২।১।২১।৫১—৫২

৫) ঐ, ২।১।২১।৫২'২ ৬) ঐ, ২।১।২১।৫৬—৭ ৭) ঐ, ২।১।২১।৬১

৮) ইহা বলা যাইতে পারে যে ঐস্থলে সর্বসমেত ২২ শ্লোকে ভগবান ভাগবতের লক্ষণও কর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র ৫ শ্লোকে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির উল্লেখ আছে

৯) বৃহৎসংহিতা, বরাহমিহির প্রণীত, ৬০।১৯ ১০) পাদ্মসং, ২।২।৬১—৫

১১) এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। 'মনুস্মৃতি'তে (১০।২৩) আছে যে ব্রাত্য বৈশ্য দ্বারা স্ববর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা মৈত্র এবং স্বাত্বত নামে অভিহিত হয়। ঈশানের পূজক সাত্বত বা সুধন্বাচার্য্য হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থই বলা হইয়াছে যে বিষ্ণুর পূজক সাত্বত ভাগবত নামে অভিহিত হয়।

যে সুধন্বাচার্য্য ঈশানের, মৈত্রক শাক্যচৈত্যের এবং সাত্বত—যিনি ভাগবত বলিয়াও উক্ত হন,২—বিষ্ণুর পূজা করিবেন।[1] উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে উৎপলভট্ট (৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন, হর-অর্থাৎ ঈশ্বরভক্ত ভট্টারক···কেশবভক্ত ভাগবত।”[2] কোন কোন পুরাণেও সেই প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ‘ব্রহ্মপুরাণে’ দেখা যায়, শৈব ও ভাগবত ভিন্ন ভিন্ন, ভাগবত = বিষ্ণুভক্ত।[3] উহা হইতে আচার্য্য যামুন (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক একটা বচনেও আছে যে সাত্বত বা ভাগবত রাজার আজ্ঞায় বিষ্ণুর আয়তন সমূহের পূজা করিবেক।[4] ‘পদ্মপুরাণে’ আছে, “(অপর) সমস্ত দেবতাকে পরিত্যাগ করত যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং নিত্য তাঁহার সেবায় রত সে ভাগবত বলিয়া কথিত হয়।”[5] প্রকরণ হইতে জানা যায় যে ঐখানে ভগবান শব্দ দ্বারা হরিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উহার কিঞ্চিৎ পরে আছে “ভগবতী লক্ষ্মী সহ ভগবান্ শ্রীহরি এবং শ্রীভাগবতশাস্ত্র যাহার ভক্তি সহকারে ইষ্ট সেই ভাগবত।” ‘লিঙ্গপুরাণে’র এক স্থলে আছে, “যে নিত্য নারায়ণপর সে মহাভাগবত।”[6] ঈষৎ পরে উক্ত হইয়াছে যে মহাভাগবত = বাসুদেবপর = বৈষ্ণব।[7] ‘গরুড়পুরাণ’ মতে, “যে ভক্তিবশত বিষ্ণুতে এবং ব্রাহ্মণে সর্বান্তঃকরণে ভাব নিবেশিত করিয়াছে, তাঁহার কথা শ্রবণে যাহার প্রীতি হয়, নেত্রে অশ্রু আসে ও অঙ্গবিক্রিয়া হয় এবং তাঁহার ভক্তগণের প্রতি যাহার বাৎসল্য আছে, তাহাদের পূজন ও অনুমোদন করে, কৃতাত্মত্বহেতু, সে মহাভাগবত।”[8] সূতসংহিতা’য়ও শৈব ও ভাগবতকে ভিন্ন বলা হইয়াছে।[9] ‘পদ্মপুরাণে’ আছে, যে গোপাল’ কৃষ্ণ, বা রামের, (অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর অবতারের) মূর্তির পূজা করে সে ভাগবত।[10] ‘পরমসংহিতা’ ও ‘পাদ্মসংহিতা’য় আছে, সময়, সমাচার, স্বাধ্যায়, দ্রব্যসংগ্রহ, শুদ্ধি, যোগ, স্তুতি এবং ধ্যান—এই অষ্ট বিধিতে যে ভগবান হরির অর্চনা করে যে ভাগবত।”[11] ‘পদ্মসংহিতা’য় আরও উক্ত হইয়াছে যে যে ঐ প্রকার করে না সে পাপী; সে ভাগবত নহে। ভগ বা জ্ঞানাদিগুণ সঙ্খাতযুক্তভগবানে যাহার ভক্তি আছে সে ভাগবত।[12] ‘পরমসংহিতা’র মতে বিষ্ণুমন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা ভাগবত আচার্য করিবেন।[13] এবং তাঁহার সহকারী মূর্তিরক্ষকগণও বৈষ্ণব বা ভাগবত হইবেন।[14] ঐ মন্দিরে স্থাপিতব্য শিবগণেশাদি অপর দেবতাগণের পূজাও তাঁহারা করিবেন।[15]

ভাগবত সংজ্ঞার ঐ অর্থসঙ্কোচ কখন হইতে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। বরাহমিহিরের গ্রন্থে উহা দেখিয়া বুঝা যায় যে তাঁহার সময়ের, অর্থাৎ ষষ্ঠখ্রীষ্টশতকের মধ্যভাগের পূর্বে তাহা অন্তত আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাহা সর্বসাধারণের মধ্যে

---

১) বৈজয়ন্তী যাদবপ্রকাশ প্রণীত, গুস্তব ওপার্ট কর্তৃক সম্পাদিত, ৮০ পৃষ্ঠা, ২০৭—৯ পঙ্‌ক্তি।

২) বরাহমিহিরের ‘বৃহজ্জাতকে’র ১৫।১ শ্লোকের উৎপলভট্ট-বিরচিত ভাষ্য।

৩) “ব্রহ্মপু, ৫৬।৬৪

৪) ‘আগমপ্রামাণ্য’, যামুনাচার্যপ্রণীত, কাশীসং, ৮ পৃষ্ঠা।

৫) পদ্মপু, উত্তর খণ্ড, (শব্দকল্পদ্রুমে’ ধৃত)

৬) লিঙ্গপু, ২।৪।১৩·১

৭) ঐ, ২।৪।১৬

৮) গরুড়পু, ১।২২৭।৬·২—৮·১

৯) সূতসং, ৪(১)।১৩।৩৮

১০) পদ্মপু, উত্তর খণ্ড, ৮৩।১৮

১১) পরমসং ৩।৩৬—৩৮

১২) পাদ্মসং, ৪।২।৮৮—৮৯·১

১৩) স্কন্দপু, ২।৯।২০।৬১—৪

১৪) ঐ, ১৮।৩৮ ; ১৯।৫৩

১৫) ঐ, ১৯।৫৩

প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল মনে করিলে, বলিতে হইবে যে 'নারদপুরাণা'দি যে সকল গ্রন্থে প্রাচীন ব্যাপক অর্থে ঐ সংজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়, সেই সকল গ্রন্থ ঐ সময়ের পূর্বের। 'স্কন্দপুরাণে'র বৈষ্ণবখণ্ডে যেমন প্রাচীন ব্যাপক অর্থে 'ভাগবত' সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, একস্থলে তেমন সঙ্কুচিত অর্থেও ব্যাখ্যা আছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে—ভগবান্ বাসুদেব ব্যতীত অপর সমস্ত দেবতাকে কাল ও মায়ার অধীন জানিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি পরিত্যাগ করত গাঢ়স্নেহে একমাত্র তাঁহারই নিত্য সেবাকে ভক্তি বলা হয়; যে অনন্যবুদ্ধিতে আদর সহকারে শ্রবণাদি নবভাবে তাঁহার সেবা করে সে ভক্ত; স্বধর্মাদিত্রয়-যুক্ত ঐ ভক্তি একান্তিক ধর্ম বলিয়া কথিত হয়; এবং ঐ প্রকার ভক্তই ভাগবত।[১] 'স্কন্দ-পুরাণে'র যে অংশে এই বচন আছে, সেই অংশ উহাতে পরে সংযোজিত হইয়াছে মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। //

যাহা হউক, কালান্তরে ভাগবত সংজ্ঞার প্রয়োগ আরও সীমিত করা হইয়াছিল দেখা যায়। 'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা' নামক এক অর্বাচীন বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রে আছে, "যে দ্বাদশাক্ষরতত্ত্বজ্ঞ (অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের তত্ত্বরহস্য জানে), চতুর্ব্যূহবিভাগবিৎ এবং অচ্ছিদ্র পঞ্চকালজ্ঞ, সেই ভাগবত বলিয়া স্মৃত হয়।"[২] আচার্য বেঙ্কটনাথ (১২৬৮—১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় সেই প্রকার এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] তৎকর্তৃক ধৃত শাণ্ডিল্যের বচনে আছে, "যে চতুর্ব্যূহবিভাগজ্ঞ, পঞ্চকালপরায়ণ এবং দ্বাদশাক্ষরনিষ্ঠ সেই ভাগবতোত্তম।" চতুর্ব্যূহ ও পঞ্চকালের তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। এখন এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে উহারা পাঞ্চরাত্রমতানুসারে বিষ্ণু বা বাসুদেব উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহাতে মনে হইবে যে তখন একমাত্র পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী বিষ্ণুভক্তগণকেই ভাগবত বলা হইত। পাঞ্চরাত্রমতানুযায়িগণ যে 'ভাগবত' নামেও অভিহিত হইত, 'জয়াখ্য-সংহিতা' (খুব সম্ভবত ৫ম খ্রীষ্টশতকে বিরচিত) প্রভৃতি প্রাচীনতম পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পরন্তু সেই কালে পাঞ্চরাত্রীকে ব্যতীত অপর বৈষ্ণবগণকেও, তথা অন্য দেবতার উপাসকগণকেও, 'ভাগবত' বলা হইত। উক্ত বচনসমূহে ইহাও আছে যে ভাগবত "দ্বাদশাক্ষরনিষ্ঠ" বা "দ্বাদশাক্ষরতত্ত্বজ্ঞ।" সমস্ত পাঞ্চরাত্রানুযায়িগণ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র-

---

১) স্কন্দপু, ২।৯।২০।৬১—৪

২) 'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা', ২২শ অধ্যায় (জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ', ২য় খণ্ড, ৬৩৬ পৃষ্ঠা)। মুদ্রিত পাঠ-"অচ্ছিদ্রঃ পঞ্চকালজ্ঞঃ সর্বে ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ।" পরন্তু" অচ্ছিদ্রঃ পঞ্চকালজ্ঞঃ স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ" পাঠ প্রকৃত মনে হয়। কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে ঐ বচন অন্যত্রও আছে। (৫৪৫ পৃষ্ঠা) ৫০৪ এবং ৬৩৭ পৃষ্ঠায়ও আছে ভাগবতগণ "পঞ্চকালমুপাসকাঃ" এবং "পঞ্চকালবতঃ"। বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন "অন্যার্থকর্মান্তরিতত্বং সচ্ছিদ্রত্বম্" (পাঞ্চরাত্ররক্ষা, ৫৪পৃষ্ঠা) সুতরাং 'অচ্ছিদ্র' অর্থ 'অন্যার্থকর্মান্তর-রহিত।

৩) 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা' বেঙ্কটনাথ-প্রণীত, শেঠ শ্রীমগনীরাম বাঙ্গর-কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৬ সম্বৎ, ৫৪ পৃষ্ঠা।

নিষ্ঠ নহে। যথা, আচার্য রামানুজ এবং তদনুযায়িগণ পাঞ্চরাত্রানুযায়ী ; তাঁহারা চতুর্ব্যূহ-বাদী এবং পঞ্চকালবাদী বটেন, পরন্তু ‘ওঁ নমো নারায়ণায়’ এই অষ্টাক্ষরমন্ত্রপরায়ণ ; দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র-পরায়ণ নহেন। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে ভাগবত বলা যায় না। তাই বেঙ্কটনাথ মনে করেন যে ঐ সংজ্ঞাতে ‘দ্বাদশাক্ষর’ শব্দ উপলক্ষণাত্মক ; যাহারা স্বসংহিতোক্ত মন্ত্রনিষ্ঠ হইয়া পঞ্চকালিক উপাসনা করে তাহারাও ভাগবত।[১] ‘বিষ্ণুসংহিতা’ নামক এক অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আছে যে ভাগবত কাহারও কাহারও মতে পাঞ্চরাত্রী বৈষ্ণবগণের এক উপবিভাগ মাত্র। ইহাও বোধ হয় বলা উচিত যে উহাদের মতে ‘ভাগবত’ ‘ভগবদ্ভক্ত’ হইতে ভিন্ন। উহারা পাঞ্চরাত্রতন্ত্রানুযায়ী বৈষ্ণবগণের পাঁচ বিভাগ করিয়া থাকে। যথা—ভক্ত, ভগবদ্ভক্ত, দাস, পার্ষদ ও ভাগবত। যে সকল বৈষ্ণব শান্ত ও বর্ণরত, পরন্তু অদীক্ষিত, তাহারা ভক্ত। যাহারা দীক্ষিত তাহারা ভগবদ্ভক্ত। দাস নৈষ্ঠিক এবং পার্ষদ তৎক্রিয়ৈকস্থ ও তন্নিবেদিতয়ত্তিবান্।[২] “পরন্তু আতোদ্যবাদ্যসমূহ সহকারে নিত্য (বিষ্ণুর) পূজক ব্রহ্মচারী বিপ্রগণ ভাগবত বলিয়া জ্ঞেয়। তাহারা সর্বোৎকৃষ্ট।”[৩] ‘বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা’ নামক অপর অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রতন্ত্রে আছে যে ভাগবতধর্ম বৈষ্ণবধর্ম হইতে উৎপন্ন, পরন্তু উহা হইতে ভিন্ন।[৪]

বৈখানস বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে ‘ভাগবত’ সংজ্ঞার ভিন্ন অর্থও পাওয়া যায়। যথা, মহর্ষি মরীচির ‘আনন্দসংহিতা’র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু বৈখানস মতের প্রবর্তক মহর্ষি বিখনসকে বলেন, “নারায়ণ-পরায়ণ ভৃগ্বাদি (ঋষিগণ) তোমার আজ্ঞায় শ্রুতি-সম্মত এবং বৈষ্ণব পরমধর্ম ব্যাখ্যা করিবেন। যাহারা তদ্‌ধর্ম-নিরত হইবে তাহারাই ভাগবত বলিয়া স্মৃত হইবে।”[৫] সুতরাং এতদ্‌মতে একমাত্র বৈখানসমতানুযায়ী বৈষ্ণবগণই ভাগবত। পরংতু উহাতে কিংচিৎ পরে উক্ত হইয়াছে যে ভাগবত বৈষ্ণবগণ বৈখানস, তথা পাঞ্চরাত্র, বৈষ্ণবগণ হইতে ভিন্ন ; বৈখানসগণ বৈদিক, পাঞ্চরাত্রগণ তান্ত্রিক, এবং ভাগবতগণ বা ভক্তগণ মিশ্র বৈষ্ণব।[৬] মহর্ষি ভৃগুর ‘যজ্ঞাধিকারে’রও মতে ভাগবত বৈষ্ণব বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব হইতে ভিন্ন। তবে তন্মতে ভাগবতও তান্ত্রিক। কেননা, উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে বৈষ্ণব তন্ত্র দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক ; তান্ত্রিক আবার শুদ্ধ ও মিশ্র ভেদে দ্বিবিধ ; বৈখানস বৈদিক, ভাগবত শুদ্ধ তান্ত্রিক, আর পাঞ্চরাত্র মিশ্র তান্ত্রিক।[৭] মহর্ষি ভৃগুর ‘প্রকীর্ণাধিকারে’ ভাগবতের লক্ষণ-জ্ঞাপক অনেক শ্লোক আছে।[৮] উহাদের অধিকাংশ হইতে জানা যায় যে ভাগবত ভগবান্ বিষ্ণুরই ভক্ত। বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন তাহার উল্লেখ মাত্রও নাই। ঐ বর্ণনার সর্বত্র অতি উদার উচ্চ ভাব দেখা যায়। যথা, দেবতা ও মনুষ্যকে, তথা পশু, পক্ষী, পিপীলিকা (প্রভৃতি) অপর (প্রাণিগণকে), তরু-পাষাণ-কাষ্ঠাদি (সমস্ত অচেতন পদার্থকে), ভূমি, জল, (তেজ, বায়ু,)

---

[১] ‘পাঞ্চরাত্ররক্ষা’ ৫৪ পৃষ্ঠা।

[২] ‘বিষ্ণুসংহিতা’, ২।৩৬·২—৩৮ [৩] ঐ, ২।৩৯

[৪] ‘বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা’, ১।৭।১৮—৯

[৫] আনন্দসং, ৪।৬৭·২—৮ ; আরও দেখ—৪।৭৩—৮ [৬] ঐ, ৮।১৪—দেখ

[৭] ‘যজ্ঞাধিকার’, ৫১।১—৭ [৮] ‘প্রকীর্ণাধিকার’, ক্রিয়া-পাদ, ৩০।১৩৭—১৫০

ও আকাশ (—এই পঞ্চমহাভূতকে) এবং দিক্‌সমূহকে, তথা নিজেকেও, যে ব্যক্তি দেবেশ জনার্দন হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানে না, সেই পুণ্যাত্মাই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[১] "এই পরিদৃশ্যমান সমস্তকেই বিষ্ণু ('সর্বমেবেদং বিষ্ণুঃ') বলিয়া দর্শন করত যাহার নাড়ীসমূহ সুস্নিগ্ধ হইয়াছে, উদাসীনবৃত্তিক নহে, সেই ভাগবত।"[২] কতিপয় শ্লোকে ভাগবত সংজ্ঞার বৈষ্ণব অর্থে সংকোচন নাই। যথা কথিত হইয়াছে যে,—"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে এবং বেদসমূহকে নিত্যই নমস্কার করে, তথা পরের বিত্তাদির প্রতি দ্রোহ করে না, সেই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[৩] "যাহা কিছু ভূতকালে ছিল এবং যাহা কিছু বর্তমানে সংস্থিত আছে—তৎসমস্তই ভগবানেরই ভাগ (বা অংশ)—যে ইহা নিশ্চিতরূপে জানে, সেই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[৪] "যে ব্যক্তি মন, বাণী, কিংবা কর্ম দ্বারা কোন প্রাণীর প্রতি পাপ-ভাব করে না, সেই ভাগবত বলিয়া স্মৃত।"[৫]

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে বিবৃত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাপাদিপঞ্চসংস্কারযুক্ত, আকারত্রয়সম্পন্ন এবং হরির অনন্যশরণ, সেই 'মহাভাগবত' বলিয়া স্মৃত হয়।[৬] পরে আছে যে, যে পঞ্চসংস্কার-দীক্ষিত এবং অর্থ-পঞ্চক-তত্ত্বজ্ঞ সেই 'মহাভাগবত'।[৭] পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, আকারত্রয়-সম্পন্ন এবং নবেজ্যাকর্মকারক ব্যক্তি 'মহাভাগবতোত্তম'।[৮] অথবা, পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, অর্থপঞ্চকতত্ত্বজ্ঞ এবং নবভক্তিসমাযুক্ত ব্যক্তিই 'মহাভাগবতোত্তম'।[৯] সুতরাং 'মহাভাগবত' যখন নবেজ্যাকর্মকারক কিম্বা নবভক্তিসমাযুক্ত হয়, তখন 'মহাভাগবতোত্তম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর অনন্যশেষত্ব, অনন্যসাধনত্ব এবং অনন্যভোগ্যত্বই 'আকারত্রয়' নামে উল্লিখিত হয়।[১০] প্রাপ্য ব্রহ্মের স্বরূপ, প্রাপক প্রত্যগাত্মার স্বরূপ, প্রাপ্তির উপায়, প্রাপ্তিফল এবং প্রাপ্তিবিরোধী—এই পাঁচটীই 'অর্থপঞ্চক' বলিয়া কথিত হয়।[১১] "অর্চন, মন্ত্রপঠন, ধ্যান, হোম, বন্দন, মন্ত্রার্থচিন্তন, যোগ, বৈষ্ণবদিগের পূজন এবং প্রসাদতীর্থসেবা—'নবেজ্যাকর্ম' বলিয়া উক্ত হয়।"[১২] পরে আছে, "অর্চন, মন্ত্রপঠন, ধ্যান, হোম, বন্দন, মন্ত্রার্থচিন্তন, যোগ, স্তুতি এবং সমাধি—ইজ্যা এই প্রকার নববিধ বলিয়া বৈষ্ণবসত্তমগণ কর্তৃক প্রোক্ত হয়।"[১৩] নববিধ ভক্তি এই—(১) শঙ্খচক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিধারণ, (২) হরির স্মরণ, (৩) তন্নাম-সঙ্কীর্তন, (৪) তৎপাদাম্বুনিষেবণ, (৫) তৎপাদবন্দন, (৬) তন্নিবেদিতভোজন, (৮) একাদশীতে উপবাস, (৮) হরির তুলসীর অর্চন, এবং (৯) তদীয়দিগের অর্চন।[১৪] যাহাতে এই সকল গুণ নাই সে বৈষ্ণব ও নহে, বিপ্র ও নহে (১০) উহার অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে 'যে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৃত্য, (তথা অপর) সৎকৃত্য বিষ্ণুর উপায়রূপে করে সে 'বৈষ্ণব' বলিয়া উদীরিত হয়।"[১৫]

---

১) 'প্রকীর্ণাধিকার', ৩০।১৪০—১ ২) ঐ, ৩০।১৪৬ ৩) ঐ, ৩০।১৩৮

৪) ঐ, ৩০।১৪২ ৫) ঐ, ৩০।১৪৪

৬) বৃদ্ধহারীতস্মৃতি, ৭।১৭৬ ('স্মৃতীনাং সমুচ্চয়,' ২৭৩ পৃষ্ঠা)

৭) ঐ, ৮।৭০ (ঐ, ২৮১ পৃষ্ঠা) ৮) ঐ, ৯।১৪৯'২—১৫০'১ ৯) ঐ, ৮।২৩৩

১০) ঐ, ১১।১৪৯'২—১৫০'১ ১১) ঐ, ১১।১৫২—১৫৯'১ ১২) ঐ, ৯।১৪৮—৯'১

১৩) ঐ, ১১।১৫০'২—১৫১ ১৪), ঐ, ৮।৮১—৩

১৫) বৃদ্ধহারীতস্মৃতি' ৮।৮১—৮৪'১ ('স্মৃতীনাং সমুচ্চয়' ২৮২ পৃষ্ঠা) ১৬) ঐ ১১।১৬৩ (ঐ ৩৪৭ পৃষ্ঠা)।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে আচার্য অপ্পয় দীক্ষিত পাঞ্চরাত্রিকগণকে ‘বিষ্ণু-ভাগবত’ বলিয়াছেন।[১] তাহাতে ‘ভাগবত’ শব্দের সঙ্গে ‘বিষ্ণু’ শব্দ জুড়িয়া দেওয়াতে মনে হয় যে বিষ্ণু ভিন্ন অপর কোন দেবতার উপাসককেও তখন ‘ভাগবত’ বলা হইত। অপ্পয় দীক্ষিত হিন্দুস্থানের তদানীন্তন কালের অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ছিলেন।

‘বিষ্ণুভক্তকে বৈষ্ণব’ও বলা হয়। “বৈষ্ণবো বিষ্ণুসেবকঃ।”[২] পরন্তু, প্রকৃত পক্ষে, যেমন ‘ভাগবত’ শব্দের, তেমন ‘বৈষ্ণব’ শব্দের ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আরও ব্যাপক। ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘বৈষ্ণব’ শব্দের অর্থ ‘বিষ্ণুর’ বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয়’।[৩] সুতরাং যেমন বিষ্ণুর উপাসককে বা ভক্তকে, তেমন বিষ্ণুর বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় অপর কোন বস্তুকেও ‘বৈষ্ণব’ বলা যায়। ঐ উভয় অর্থে ‘বৈষ্ণব’ শব্দের ব্যবহার পুরাণাদিতে বহুল পাওয়া যায়। ‘বিষ্ণুভক্ত’ অর্থে ‘বৈষ্ণব’ শব্দের প্রয়োগ বেদের সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং মুখ্য মুখ্য উপনিষদে নাই।[৪] অষ্টোত্তরশতোপনিষদের মধ্যে পরিগণিত একমাত্র ‘মুদ্গলোপনিষদে’ ঐ প্রয়োগ একবার মাত্রই আছে।[৫] বর্তমান ‘মহাভারতে’ও, আমরা যতদূর জানি, সেই প্রয়োগ এক বারই আছে।[৬] বেদে বিষ্ণু প্রধান দেবতা নহে। তথায় বিষ্ণু উপাসনার কোন বিশেষ পদ্ধতি নাই।[৭] সুতরাং তথায় যে বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব সংজ্ঞা নাই, তাহা আশ্চর্য্য নহে। পরন্তু মহাভারতের যুগে বিষ্ণু এক প্রধান দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন,—তাহার ভক্তি বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল।[৮] তথায় বিষ্ণুভক্তের বৈষ্ণব আখ্যা না থাকাতে বুঝা যায় যে ঐ আখ্যা প্রাচীন

---

১) ‘বেদান্তকল্পতরুপরিমল’, ২।২।৪২ ২) পদ্মপু, পাতালখণ্ড, ৩০।১৪·২

৩) ‘পদ্মপুরাণে’র উত্তরখণ্ডে আছে

“বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে” (৬৯।৩·১)

“বিষ্ণোরয়ং যতঃ প্রোক্তো হ্যতো বৈ বৈষ্ণবো মতঃ।” (৮৩।২·১)

পরন্তু অন্য এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণু হইতে বিষ্ণুধ্যানে তৎপর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের পার্থক্য করিতে নাই; কেননা, সে বিষ্ণু হয় (“স বৈ বিষ্ণুর্ভবেদিহ”—ঐ, ৩০।১৬)

“বিষ্ণুরূপো যতো বিপ্রো বৈষ্ণবঃ স ইহ স্মৃতঃ।” (ঐ, ৩০।২০·১)

“যেহেতু বিপ্র বিষ্ণুরূপ সেইহেতু তিনি ইহসংসারে বৈষ্ণব বলিয়া স্মৃত হন।” শিব আরও বলেন যে “রামোহহং” (‘আমি রামই)—এই জপ করতই বিষ্ণুর ভক্তিপ্রসাদহেতু তিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন। (৩০।২৫—) আরও দেখ—১২৭।২৩—৭

৪) ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে একমাত্র ‘শুক্লযজুর্বেদসংহিতা’তেই ‘বৈষ্ণব’ শব্দের কতিপয় ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গে ও বিভক্তিতে, পাওয়া যায়। (যথা দেখ—১।১২ ; ৫।২১, ২৩, ২৫ ; ১০।৬ ; ২৪।১, ৩৬) উহাদের কোন কোন স্থলে ‘বিষ্ণু’র অর্থ ‘যজ্ঞ’। (যথা দেখ—১।১২)

৫) ‘মুদ্গলোপনিষদে’ প্রকৃত পক্ষে ‘অবৈষ্ণব’ শব্দ আছে। উহার অর্থ ‘যে বৈষ্ণব বা বিষ্ণু-দেবতার ভক্ত নহে’।

৬) মহাভা, ১৮।৬।৯৭

যামুনাচার্য-কর্তৃক অনূদিত ‘মহাভারতে’র শান্তিপর্বের একটা বচনে বৈষ্ণবের পঞ্চরাত্রবিধানানুসারে দীক্ষা গ্রহণের উল্লেখ আছে। তিনি দাক্ষিণাত্য সংস্করণে উহা পাইয়াছিলেন। উত্তর ভারতের সংস্করণে উহা নাই।

৭) ‘তৈত্তিরীয়ারণ্যকে’র অন্তর্গত ‘নারায়ণোপনিষদে’ বিষ্ণুর, তথা অন্যান্য দেবতার, গায়ত্রীর উল্লেখ আছে। ঐ অংশ খিল নামে খ্যাত। সুতরাং উহা পরে সংযোজিত হইয়াছিল।

৮) কথিত হইয়াছে যে সুপর্ণ পক্ষিগণও পরম বিষ্ণুভক্ত ছিল।

নহে। কোন কোন পুরাণে 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা, 'পদ্মপুরাণে' আছে—"বিষ্ণুসেবক বৈষ্ণব।"[১] "একমাত্র বিষ্ণুই যাহার শ্রোতব্য, স্মর্তব্য, কীর্তনীয়, পূজ্য এবং আরাধ্য, সেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সমুদাহৃত হয়।"···হে মুনি! যে নিত্য বিষ্ণুর উপাসনা করে, একমাত্র বিষ্ণুই যাহার ঈশ্বর, পূজ্য এবং ইষ্ট, সংসারে সেই 'বৈষ্ণব'।[২] 'লিঙ্গপুরাণে'র মতে "একমাত্র বিষ্ণুই সর্বত্র যাহার দেবতা বলিয়া স্মৃত হন, হরির কীর্তন হইলে নিত্য যাহার রোমাঞ্চ, কম্প, ও স্বেদ হয়, তথা নেত্রে অশ্রুবিন্দুসমূহ দৃষ্ট হয়, এবং যে বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্ত শ্রৌতস্মার্তপ্রবর্তকগণকে দেখিয়া প্রীত হয়, সেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রকীর্তিত হয়।"[৩] মৎস্য-কূর্মাদি বিষ্ণুর অবতারগণের উপাসকগণকেও 'বৈষ্ণব' বলা হয়। যথা, 'পদ্মপুরাণে' আছে, "যাহারা মৎস্যাদি হরির সর্ব অবতারসমূহের উপাসক এবং উঁহাদের মন্ত্র যাহাদের ইষ্ট, যদি অনন্য হয়, তাহারাও বৈষ্ণব, তাহাতে সংশয় নাই" ইত্যাদি।[১২] তথায় দাস বা বিষ্ণুদাস এবং ভক্ত বা বিষ্ণুভক্তের মধ্যে পার্থক্যও করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, "যে বেদবেদাঙ্গপারগ, নিত্য বেদক্রিয়ারত এবং শঙ্খচক্রাঙ্কিত সে বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হয়। যে শূদ্র নিত্য দ্বিজসেবারত, বিষ্ণুপূজাপ্রপূজক এবং বেদসম্মত পুরাণ বহুধা শ্রবণ করে সেই শূদ্র হরিদাস বলিয়া কথিত হয়। যে পাঁচ বছর ধরিয়া অনেক প্রকারে (বিষ্ণুর) ভক্তি করিয়াছে, সে (বিষ্ণু) ভক্ত বলিয়া প্রোক্ত হয়। ইহা সর্ব সাধুগণের সম্মত।"[৪] "যে শূদ্র শঙ্খচক্রান্বিত-বিষ্ণুভক্তিপ্রকারক (অর্থাৎ নানা প্রকারে বিষ্ণুর ভক্তি করে) এবং বিশেষত চতুর্বিধ মহোৎসবের কর্তা, সে বিষ্ণুদাস।"[৫] তথায় ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, নারদাদি বৈষ্ণব, ধ্রুবপ্রহ্লাদাম্বরীষাদি ভক্ত এবং শূদ্রগণ দাস।[৬] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা' নামে অতি অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে আছে যে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করত বৈদিক যাগযজ্ঞাদির দ্বারা পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করাই 'বৈষ্ণব ধর্ম' বলিয়া কথিত হয়।[৭] "ভগবানের রূপ সর্বত্র আছে বলিয়া জানিয়া, তথা বাসুদেব সনাতন, সাক্ষাৎ ধারক ও প্রেরক, সর্বানন্দময়, নিত্য, নিত্যলীলানিকেতন সর্বাবধি, সর্বশেষী ও, সর্ববেদান্তসম্মত, এবং অনেকরূপ এই জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন, অনিত্য,—মায়াকার্য্য, মৃগতৃষ্ণাভ ও গন্ধর্বনগরোপম—[৮] ইহা জানিয়া, কর্মসমূহে 'ইহা আমার'—এই প্রকার কর্তৃত্ব (বুদ্ধি) এবং ফল ত্যাগ করত বেদোচিত কর্ম করিবে। তাহা বৈষ্ণব বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। যে একমাত্র বিষ্ণুরই শ্রবণাদি কর্ম করে (সে বৈষ্ণব)। হে বৎস।

"দৈবতং বিষ্ণুরেতেষাং বিষ্ণুরেব পরায়ণম্।
হৃদি চৈষাং সদা বিষ্ণুর্বিষ্ণুরেব সদাগতিঃ॥" (মহাভা, ৫।১০।১৮)

১) পদ্মপু, পাতালখণ্ড ৩০।১৪·২ ২) পদ্মপু (শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত)

পদ্মপুরাণে'র আরও কতিপয় স্থলে বৈষ্ণবের সংজ্ঞাও লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে। যথা,—ব্রহ্মখণ্ড ১।১৭—৩২; ১২।১৬·২—১৭·১; পাতালখণ্ড ১০।৬৪—৭১; উত্তরখণ্ড ৬৯তমও ৮৩তম অধ্যায়।

৩) লিঙ্গপু ২।৪।৫—৭·১

৪) পদ্মপু, উত্তরখণ্ড ৮৪।৩—৬·১ ৫) ঐ ৮৪।৮·১—৯ ৬) ঐ ৮৪।২·৬

৭) বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা ১।৭।১৮

৮) "তস্মাদন্যৎপৃথকরূপং মায়াকার্যমিদং জগৎ।
অনিত্যং মৃগতৃষ্ণাভং গন্ধর্বনগরোপমম্॥" (ঐ ১।৭।২২)

ইহাই শ্রোতব্যাদি শ্রুতীরিত বৈষ্ণব ধর্ম।”[1] ‘জয়াখ্যসংহিতা’য় আছে যে দীক্ষান্তে নূতন শিষ্যকে গুরুকে, তৎপশ্চাৎ পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণকে, (“বৈষ্ণবান্ পাঞ্চরাত্রিকান্”) সরলান্তঃকরণে ভোজন ও ধন দ্বারা যথাশক্তি সন্তুষ্ট করিতে হইবে।[2] ঐ স্থানে বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক বিশেষণ প্রয়োগ হইতে মনে হয় যে এমন বৈষ্ণবও তখন ছিল যাহারা পাঞ্চরাত্রিক নহে। একাধিক প্রকারের বৈষ্ণবের সদ্ভাবের প্রমাণ ‘জয়াখ্যসংহিতা’র অপর কোন কোন উক্তি হইতে পাওয়া যায়।[3]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে’র মতে ভাগবতধর্মের প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই এবং তিনি দেবর্ষি নারদকে উহার উপদেশ করেন। ‘মহাভারতে’র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে নারায়ণ নারদকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা ‘পঞ্চরাত্র’নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[4] বোধ হয় সেই হেতুই ভাগবতধর্মকে ‘পাঞ্চরাত্রধর্ম’ [5] এবং তদনুযায়িগণকে “পাঞ্চরাত্রবিৎ” [6] বলা হইয়া থাকে। ভগবান নারায়ণের ভক্তগণকে তথায় ‘একান্তী’ [7] বা ‘একান্তিক’ [8] বলা হইয়াছে। সেইহেতু তাঁহাদের ধর্ম ‘একান্তধর্ম’ নামে অভিহিত হইয়াছে।[9] একান্তধর্ম তথায় কখন কখন ‘সাত্বতধর্ম’ নামে ও উক্ত হইয়াছে।[10] শ্বেতদ্বীপবাসী একান্তিগণকে “পঞ্চকালজ্ঞ” [11] এবং “প্রতিবুদ্ধ” [12] বলা হইয়াছে। সমস্ত একান্তিগণই তখন ‘প্রতিবুদ্ধ’ বলিয়া অভিহিত হইত।[13] অপর কোথাও কোথাও উহাদিগকে সংক্ষেপে ‘বুদ্ধ’ বলা হইয়াছে।[14] এইরূপে দেখা যায়, ভাগবতধর্ম, তথা ভাগবতগণ, প্রাচীন কাল হইতে নানা নামে অভিহিত

---

১) ঐ ১।৭।২০—২৪   ৭) জয়াখ্যসংহিতা ১৬।৩৪২·২—৩৪৩·১

২) যথা দেখ—ঐ ২১।৯৮—১০০

৩) ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে’ (৭।৫।২৩—২৪·১) উক্ত নববিধ-ভক্তি হইতে এই নববিধভক্তি কথঞ্চিৎ ভিন্ন।

৪) “ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্ ॥
সাংখ্যযোগকৃতং যেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্।
নারায়ণমুখোদ্‌গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ ॥”—(মহাভা, ১২।৩৩৯।১১১·২—১১২)

আরও ও দেখ—ঐ, ১২।৩৪৯ ৬৪, ৬৮

“পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।” (৩৪৯।৬৮·১)

‘স্কন্দপুরাণে’ পুনর্বিবৃত নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে নারায়ণ নারদকে ‘একান্তধর্ম’ (২।৯।২০।১ ; ২৬।১), ‘একান্তিক ধর্ম’ (২।৯।২০।৪ ; ২৫।৬৪ ; ২৬।২) বা ‘বৈষ্ণবধর্ম’ (২।৯।২৩।৪১·২) ব্যাখ্যা করেন।

৫) মহাভা, ১২।৩৪৮।৮২ ; ১২।৩৪৯।১, ৬৪, ৬৮   ৬) ঐ, ১২।৩৩৫।২৫ ; ৩৪৯।৭২

৭) ঐ ১২।৩৩৬।৩০·১ ৪৬·২ ; ৩৩৯।২০ ; ৩৪৮।১৬৬—৭ ইত্যাদি।

৮) ঐ, ১২।৩৩৯।১৩   ৯) ঐ, ১২ ৩৪৮।৪৬১   ১০) ঐ, ১২।৩৪৮।৮২ ও ৮৪ দেখ

ইহা ও বোধ হয় এখানে বলা উচিত যে চতুর্থ কল্পের, ব্রহ্মার শ্রবণজ জন্মের, আদি কৃত যুগে প্রবর্তিত একান্তধর্ম নারায়ণীয়াখ্যানে বিশেষভাবে. সাত্বতধর্ম নামে উল্লিখিত হইয়াছে। (ঐ, ১২।৩৪৮।২৯,৩৪—)

১১) ঐ, ১২।৩৩৬।৪৬·২   ১২) ঐ, ৩২।৩৪৩।৫৩

১৩) ঐ, ১২।৩৪১।৩৫ এবং ৩৪৮।৬৭,৭৪—৫ দেখ।

১৪) “ভক্তমেকান্তিকং বিদ্ধো বুদ্ধা ভাগবতাস্তু তে।”—(স্কন্দপু ২।৯।১৬।৫·১)

হইয়া আসিতেছে।[১] 'পাদ্মসংহিতা' নামক এক পরবর্তী পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে আছে যে পাঞ্চরাত্র-মতানুযায়িগণ সূরি, সুহৃদ, ভাগবত, সাত্বত, পঞ্চকালবিৎ, একান্তিক, তন্ময়, পাঞ্চরাত্রিক, ইত্যাদি নামে কথিত হইয়া থাকেন।[২] ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে এইখানে 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞার উল্লেখ নাই। তবে 'আদি' পদে উহাকে সংগ্রহ করা যায়। 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞার উল্লেখ নারায়ণীয়াখ্যানে, তথা ভাগবতধর্মের অপর প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়েও নাই। যাহা হউক, প্রাচীনতম পাঞ্চরাত্র সংহিতাসমূহে এই সংজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়। নারদ-কৃত ভগবান নারায়ণের স্তুতিতে আছে যে তিনি "পঞ্চযজ্ঞ-পঞ্চকালকর্তৃপতি এবং পাঞ্চরাত্রিক।"[৩] একমাত্র পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র বা পাঞ্চরাত্রধর্ম দ্বারা গম্য, অথবা উহার সম্যক্ বেত্তা, প্রবর্তক এবং সংরক্ষক বলিয়াই নারায়ণ 'পাঞ্চরাত্রিক'। শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণ পঞ্চ কালে পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান নারায়ণের পূজা করিয়া থাকেন।[৪] ঐ সম্পর্কেই, ঐ পূজাপদ্ধতির প্রবর্তক অথবা প্রবর্তকের পতি দৃষ্টিতে তাঁহাকে 'পঞ্চযজ্ঞ-পঞ্চকাল-কর্তৃপতি' বলা হয়।

ভাগবতগণের এবং তাহাদের ধর্মের ঐ সকল সংজ্ঞার সকলগুলির উপপত্তি নিরূপণ করা সহজ নহে। ভাগবত এবং বৈষ্ণব সংজ্ঞাদ্বয়ের উপপত্তি পূর্বে নির্দেশিত হইয়াছে। আমরা অধুনা আরও কতিপয় সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি যথাসম্ভব আলোচনা করিব। 'একান্ত' শব্দের অর্থ 'এক অন্ত'। 'অমরকোশে'র মতে 'একতান', 'অনন্যবৃত্তি', 'একাগ্র', 'একায়ন', 'একসর্গ', 'একাগ্র্য' এবং 'একায়নগত' শব্দ পর্য্যায়বাচক।[৫] যাহার চিত্তবৃত্তি একই বিষয়ে অন্ত বা সমাপ্তিপ্রাপ্ত, অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট বা পর্যবসিত হইয়াছে, সে একান্তী। তাই নারায়ণীয়াখ্যানে 'একান্তী'কে "একান্তভাবোপগত", "একান্তে সমাহিত", "একান্তিত্বোপগত" ও "একান্তগতবুদ্ধি" বলা হইয়াছে।[৬] ঐখানে অবশ্য বিশেষভাবে ভগবদ্বিষয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৭] তাই বলা হইয়াছে যে নর ও নারায়ণের মুখ হইতে "ভগবদাখ্যান" শ্রবণ করত নারদ "অত্যন্তং ভক্তিমান্ দেবে একান্তিত্বমুপেয়িবান্" ('দেবতায় অত্যন্ত ভক্তিমান্ হইয়া একান্তিত্ব প্রাপ্ত হইলেন')।[৮] 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে, "স্বধর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সহ সেই লক্ষ্মীবদীশ্বরে (অর্থাৎ বিষ্ণুতে) যে অনন্যা ভক্তি, তাহাই একান্তিক ধর্ম।"[৯] 'গরুড়পুরাণে' আছে, যেহেতু বিষ্ণুই একান্তরূপে এবং সমভাবে তাঁহাদের পরায়ণ, সেইহেতু তদ্ভাবগতচিত্ত

---

১) 'স্কন্দপুরাণে' আছে—

"একান্তিনো ভাগবতা জিতকামাদয়স্তু যে"—(২।৯।৯।৩৪);

"একান্তিকশ্চ ভগবস্তক্তবন্ধবিমোচকাঃ"—(২।৯।২২।৩৭'১)

২) 'পাদ্মসং', ৪।২।৮৬—৭ ৩) মহাভা, ১২।৩৩৮।৬৫—৭ ৪) ঐ, ১২।৩৩৭।৩০ দেখ।

৫) আরও দেখ—বৈজয়ন্তী', ২১১ পৃষ্ঠা, ২৬৬—৭ পঙ্‌ক্তি। একান্ত' শব্দ 'নির্জন' এবং 'তীব্র' বা 'গাঢ়'কেও বুঝায়।

৬) দেখ—মহাভা, ১২।৩৩৬।২৮'২, ৫৪'২ ; ৩৩৯।১০৮'১, ১২৯'১ ; প্রভৃতি।

৭) অপর বিষয়েও একান্তভাব হওয়ার "একায়নগত" কথা 'মহাভারতে' আছে। (১২।২৩৭।৪) আরও দেখ—"একায়নগতা যেহপি ইত্যাদি"। (মহাভা, ১২।৩০।৩৪ ; ৫।১৭০।১২)

৮) মহাভা, ১২।৩৪৬।১ ৯) স্কন্দপু, ২।৯।২০।৪ ; আরও দেখ—২।৯।২৫।৬৪

ভক্তগণ 'একান্তী' বলিয়া প্রোক্ত হইয়া থাকে।"[১] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে "একান্তিগণ ভগবৎপ্রপন্ন। ভগবানের অত্যদ্ভুত এবং অতিমঙ্গলময় চরিত্র গান করতই তাহারা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হয়, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না।"[২] 'মহাভারতে' নারায়ণীয়াখ্যানে একান্তী ও ভাগবতকে প্রকারান্তরে ভিন্ন বলা হইয়াছে। কেননা, কথিত হইয়াছে যে মুক্তির পথে ভাগবতগণ, তথা সাংখ্যগণ, প্রথমে আদিত্যে প্রবেশ করে। তথায় "পরমাণুভূত" হইয়া তাহারা অনিরুদ্ধে প্রবেশ করে। তথা হইতে "মনোভূত" হইয়া তাহারা প্রদ্যুম্নে প্রবেশ করে। তথা হইতে—কি প্রকার হইয়া তাহা উল্লিখিত হয় নাই—তাহারা সঙ্কর্ষণে বা জীবে প্রবেশ করে। তথা হইতে, "ত্রৈগুণ্যহীন" হইয়া, তাহারা বাসুদেবে বা ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবেশ করে। তথায় তাহারা অনন্তসুখে বাস করে।[৩] আর একান্তিগণ, অনিরুদ্ধাদি তিন স্তরে না যাইয়া, সোজাসুজি বাসুদেবে প্রবেশ করে।[৪] ইহা হইতে জানা যায় ভাগবত ও একান্তী উভয়ে বাসুদেব-পরায়ণ হইলেও কথঞ্চিৎ ভিন্ন,—একান্তী ভাগবত হইতে শ্রেষ্ঠ। পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে ভাগবতধর্মিগণের এক উপশ্রেণীবিশেষকেও একান্তী বলা হইয়াছে। যথা, 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে একান্তী ভাগবতধর্মী-তান্ত্রিকগণের (ভাগবতধর্ম-তন্ত্রানাং) পাঁচ উপশ্রেণীর অন্যতম। "যে পুরুষ অপরিগ্রহবান্, ভ্রমণ করত ষট্‌কর্মনিরত জনগণ হইতে সৎকৃত ভিক্ষা গ্রহণ করত তদ্দ্বারা অষ্টাঙ্গ বিধিতে গোপ্তা ও অব্যক্ত মহান্ প্রভুর পূজা করে, গুণী শিষ্য সহ একা বিচারপরায়ণ হইয়া বাস করে এবং কুলক্রমে অধিকারী, ইহসংসারে সে একান্তী বৈষ্ণব।"[৫] 'বিষ্ণুসংহিতা'র মতে, পঞ্চরাত্রতন্ত্রানুযায়ী পঞ্চবিধ বাসুদেবোপাসকগণের মধ্যে, "দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন-যাপন

---

১) গরুড়পু, ১।২২৭।১৩—১৪'১ ২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৮।৩।২০ ৩) মহাভা, ১২।৩৪৪।১৪

৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।২—৬

৫) 'জয়াখ্যসংহিতা' মতে ভাগবতধর্মিগণের পাঁচ উপশ্রেণী এই—যতি, একান্তী, বৈখানস, কর্মসাত্বত এবং শিখি। প্রথমে সকলেই "পঞ্চকালনিষেবী, অপ্রতিগ্রাহী, কণভিক্ষাভিবর্তী, বাহ্যাভ্যন্তরতুল্য, শ্রদ্ধাসংযমসেবী এবং নারায়ণৈকনিষ্ঠ" ছিল। (২২।৩—৪) পরন্তু কালবশে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের অল্পাধিক ভেদ হেতু উহাদের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। উহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণসমূহ এই,—"যাহারা পিতা বা গুরু কর্তৃক নিষেকাদি দ্বারা সংস্কৃত, স্বয়ং বিবেকভাবস্থ ও ব্রহ্মচারিগুণযুক্ত, যাহারা নির্মল বুদ্ধি দ্বারা সর্বভূতে স্থিত বিষ্ণুকে দর্শন করে, সর্বভূতকে তদন্তঃস্থ বলিয়া সর্বদা ভাবনা করে, মন, বাণী ও কর্ম দ্বারা একমাত্র অধোক্ষজকেই যজন করে, আদ্যদ্বিজেন্দ্রগৃহ হইতে, তদভাবে ষট্‌কর্মরত বিপ্রগণ হইতে, অযাচিত সিদ্ধান্ন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডন করে, কাষায়বাসধারী, দণ্ডমাত্র-পরিগ্রাহী, শুদ্ধ এবং সত্ত্বস্থ সেই সকল বৈষ্ণব বিপ্রগণ 'যতি' বলিয়া স্মৃত হয়।" (২২।৬—১০) "যে বিপ্র পরিগ্রহবান্, ব্রাহ্মণ হইতে যাচনা করিয়া প্রাপ্ত, কিম্বা ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য হইতে অযাচিতভাবে প্রাপ্ত, ধন দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করে, তথা কুটুম্বেরও পালন করে, তাহাকে 'বৈখানস' বলিয়া জান। সে জটা, ছত্রী ও সিতাম্বর।" (২২।১৩—১৫'১) "মুখ্যত ক্রিয়ার্থ এবং কুটুম্বের পালনে ও নিজের ভরণে উদ্যুক্ত হইয়া বৃত্ত্যর্থ যে রাজার নিকটে গমন করে, সে বিপ্র 'কর্মসাত্বত'।" (২।১৫'২—১৬) "যাহার হৃদয়ে প্রাধান্যত বৈষ্ণবপূজন, অনন্তর পিত্র্যাদি কর্ম, অবিরত স্ফুরিত হয়, তদর্থে কৃষ্যাদি কর্ম সমাচরণ করে, সেই সাক্ষাৎ দ্বিজোত্তম 'শিখি'। (২২।১৭—১৮'১ 'কর্মসাত্বত'কে প্রায় 'সাত্বত' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। (২০।২৬৭ ও ২১।৮১ দেখ)। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় অনন্তর বৈষ্ণবদিগের অপর উপভেদ-সমূহের লক্ষণও বিবৃত হইয়াছে। যথা, আপ্ত, অনাপ্ত, আরম্ভী, সম্প্রবর্তী, যোগী, জপনিষ্ঠ, তাপস, শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রধারক।

এবং সকৃৎ (দেবদেবের) আরাধন যাহাদের (লক্ষণ), তাহারা একান্তিক বলিয়া স্মৃত।"[১] ইহা হইতে বুঝা যায় যে একান্তিগণ শূদ্র বা শূদ্রবৃত্তিপরায়ণ।[২] 'পরমসংহিতা'য় আছে, "একান্তিগণ মুদাযুক্ত, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ এবং পরা শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া বাসুদেবের উপাসনা করে। হে দেবল! তুমিও এই বৈষ্ণব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ। সর্ব সংশয় বিধৌত করত একান্তী বৈষ্ণব হও।"[৩] তাহারা "একান্তেন পরং দেবং···প্রপদ্যতে" ('একান্তভাবে পরদেবের···শরণ গ্রহণ করে'), সেইহেতু 'একান্তী' বলিয়া অভিহিত হয়।[৪]

'দেবীভাগবতপুরাণে', বৈষ্ণব আগম দৃষ্টে,[৫] বৈষ্ণবদিগের তিন প্রকার ভেদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে,—একান্তী, পরম-একান্তী বা প্রপন্ন-একান্তী এবং কেবল বৈষ্ণব।[৬] তথায় উহাদের ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের ভেদও নির্দেশিত হইয়াছে। জয়াখ্যপৌষ্করাদি পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সমূহে,—যেগুলি প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠতম বলিয়া অধুনা পরিজ্ঞাত, সেইগুলিতে—উহাদের উল্লেখ নাই। 'দেবীভাগবতপুরাণে'র টীকাকার বলিয়াছেন যে—মধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণই 'একান্তী' বা 'বীর-বৈষ্ণব'; রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণই 'পরমৈকান্তী' বা 'মহাবীর-বৈষ্ণব'; এবং ভাগবতগণ 'কেবল বৈষ্ণব।' রামানুজ নিজে স্বমতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে পরমৈকান্তী বলিয়াছেন।[৭] তাঁহার পূর্বাচার্য যামুন, 'মহাভারতো'ক্ত একান্তীভক্তকে বা 'গীতা'র জ্ঞানী-ভক্তকেই[৮] পরমৈকান্তী বলিয়াছেন।[৯] তদ্দ্বারা তিনি কোন সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করেন নাই। 'পদ্মপুরাণে' উহাদের আচার-ব্যবহারের ভেদ নির্দেশিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে বৈষ্ণবকে আপন বর্ণ এবং আশ্রমের অনুরূপ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে করিতে হইবে।[১০] অন্যথা, তাহার নরকে পতন হইবে।[১১] বৈষ্ণবের দিনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ তথায় প্রদত্ত হইয়াছে।[১২]

---

১) 'বিষ্ণুসংহিতা', ২।৩২·২—৩৩·১

২) 'বিষ্ণুসংহিতা'য় পাঞ্চরাত্রতন্ত্রানুযায়িগণের ত্রিবিধ পঞ্চবিভাগের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই প্রকার পাঁচ বিভাগ করিয়া থাকে,—বৈখানস, সাত্বত, শিখি, একান্তিক এবং মূল। তথায় উহাদের প্রত্যেকের যে লক্ষণসমূহ বিবৃত হইয়াছে (২।২৮—৩৫) তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বৃত্তিতে সাত্বত ক্ষত্রিয়, শিখি বৈশ্য এবং একান্তী শূদ্র। বৈখানস "অযাচিতোপপন্ন" দ্রব্য দ্বারা কুটুম্ব পোষণ" করে, আর মূল "অযাচিতোপপন্ন" কিম্বা "স্বশিষ্য হইতে প্রাপ্ত" দ্রব্য দ্বারা জীবন যাপন করে। তাহারা বোধ হয় ব্রাহ্মণ।

৩) পরমসংহিতা, ৩০।৩০—১ ৪) পরমসং, ৩০।৩২·২।

৫) "বৈষ্ণবাগমলোকনাৎ"-(দেবীভাগপু, ১১।১৫।৭৮·১) ৬) দেবীভাগপু' ১১।১৫।৯৪

৭) 'নিত্যগ্রন্থ' নামক এক গ্রন্থে রামানুজ সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহার লিপিবদ্ধ করেন। উহার প্রারম্ভ এই,—"অথ পরমৈকান্তিনো ভগবদারাধনপ্রয়োগং বক্ষ্যে" ইত্যাদি। ('পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ৫৭-৮ ও ১৪৫-৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

বেঙ্কটনাথ 'পরমৈকান্তী' সংজ্ঞার এই প্রকার নিরুক্তি দিয়াছেন, "পরমশ্চাসৌ একান্তশ্চেতি পরমৈকান্তঃ, সোহস্যাস্তীতি পরমৈকান্তী, একত্র অন্তো নিশ্চয়ঃ প্রাপ্যতয়া প্রাপকতয়া চ তদুভয়ং সন্তুর পরমৈকান্তঃ, পরমশ্চাসৌ একান্তী চ ইতি বা সমাসঃ, তত্রাপ্যনন্যোপায়ত্বানন্যপ্রয়োজনত্বয়োঃ সমুচ্চয়াৎ পরমত্বম্, অনন্যোপায়ত্বং চানন্যদেবতা-কত্বপর্যন্তম্" ইত্যাদি। ('পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ১৪৬—৭ পৃষ্ঠা)

৮) মহাভা, ১১।৩৪১।৩৩·২—৩৫; গীতা, ৭।১৬-৮; ৯) 'গীতার্থসংগ্রহ', যামুনাচার্য-প্রণীত, ২৯ শ্লোক। ১০) পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৮০।৩৪ ১১) ঐ, ২৮০।৩৫-৬ ১২) ঐ, ২৮০।৪০

কথিত হইয়াছে যে বৈষ্ণব স্বধর্ম বলিয়াই বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মসমূহ পালন করিবে।[১] আর একান্তী হরির আজ্ঞারূপেই সেই সকল করিবেক। "যে বিপ্র বাসুদেবপরায়ণ এবং হরির আজ্ঞানুরূপেই কর্মজ্ঞানাদি আচরণ করে, সে 'একান্তী' হয়।"[২] যে সকল কর্ম শাস্ত্রে অকৃত্য বলা হইয়াছে, বৈষ্ণব ও একান্তী উভয়েই সেই সকল পরিত্যাগ করে।[৩] পরমৈকান্তী শ্রুতি-স্মৃত্যনুসারী শাস্ত্রকেও পরিত্যাগ করে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ত্রিবিধ কৃত্যকর্ম, ইহলোকে মুনিগণ কর্তৃক সম্প্রকীর্তিত জ্ঞান, কৃত্যাকৃত্যবিবেক, পরলোকের চিন্তন ও তৎপ্রাপ্তির সাধন এবং বিষ্ণুর স্বরূপের জ্ঞান—এই সমস্তই পরমৈকান্তী হেয়বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করে। সে ভক্তি সহকারে নববিধ ভক্তি[৪] এবং প্রপত্তি করে।[৫] "যে বিপ্র তাপাদিপঞ্চসংস্কারী, নবেজ্যাকর্মকারক (অর্থাৎ নববিধভক্তিকারী) এবং অর্থপঞ্চকবিৎ, সে মহাভাগবত বলিয়া স্মৃত হয়।"[৬] বৈষ্ণব প্রপত্তি সম্যক্ ত্যাগ করে। - সে উপায়ভূত বেদ (এবং তদনুযায়ী শাস্ত্র) অবলম্বন করে। আর মহাভাগবতোত্তম বা পরমৈকান্তী উপায়ভাব হেতু শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানকর্মাদি সম্যক্ ত্যাগ করত, ভগবৎপ্রীত্যর্থ কর্ম করিয়া থাকে।[৭] 'বৃদ্ধহারীতসংহিতা'য় ঐ সংজ্ঞাত্রয়ের কোন কোনটার কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। "বেদসমূহে কীর্তিত জ্যোতিষ্টোমাদি সমস্ত যজ্ঞ, পুরাণোক্ত দানাদি পুণ্যব্রতসমূহ এবং নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াসমূহ—সমস্তই বৈষ্ণবোত্তমগণ-কর্তৃক বিষ্ণুর ভোগরূপে ('বিষ্ণোর্ভোগতয়া') কর্তব্য। যে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৃত্য (সমস্ত) বিষ্ণুর সৎকৃত্যসমূহ উপায়তয়া করে, সে 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হয়। যে বুধ সৎকৃত্যসমূহ বিষ্ণুর আজ্ঞারূপে করে, সে বৈষ্ণবোত্তম মুনিগণ কর্তৃক 'একান্তী' বলিয়া কথিত হয়। আর যে সৎকৃত্যসমূহ বিষ্ণুর ভোগরূপে সদা করে সে মহাভাগবতোত্তম 'পরমৈকান্তী' হয়। অকৃত্য সর্বপ্রকারেই তিনেরই বর্জনীয়।…অকৃত্য বৈষ্ণব শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া পাপবুদ্ধিতে, এবং একান্তী ও পরমৈকান্তী উচ্যভাব হেতু সন্ত্যাগ করিবেক। যে বৈষ্ণবাধর্ম শ্রুতিস্মৃত্যুদ্ভব কর্ম ত্যাগ করে, সে পাষণ্ডী বলিয়া বিজ্ঞেয়; সে সর্বলোকে গর্হিত।"[৮] অন্যত্র আছে, "যে বাসুদেবের তুষ্ট্যর্থই ধর্ম সমাচরণ করে, সে যোগী পরমেকান্ত। সে হরির প্রিয়তম হয়।"[৯] 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'য় ঐ সংজ্ঞাত্রয়ের অন্য এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। "যে দ্বিজোত্তম অপর দেবতাকে পরিত্যাগ করত শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিয়াছে, অকাম বা মোক্ষকাম বা সকাম, বিষ্ণুতে ও বৈষ্ণবেই সদা

---

১) পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৮০।১২৬·২ ২) ঐ, ২৮০।১২৭ ৩) ঐ, ২৮০।১২৮

৪) নববিধ ভক্তি বা নবকর্ম এই—(১) সুদর্শনোর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্নের অঙ্কন, (২) সদগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের পঠন (৩) যথাবিধিতে বিষ্ণুর অর্চন, (৪) স্মরণ, (৫) কীর্তন, (৬) সেবা, (৭) তদগ্রে প্রণাম, (৮) তদ্ভক্তগণের পূজন এবং (৯) প্রসাদতীর্থ সেবন। (পদ্মপু, ২৮০।১৩১·২—১৩৪·১; আরও দেখ ২৪—৫) ('বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণো'ক্ত নববিধ ভক্তি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের।

৫) ঐ, ২৮০।১২৯—১৩৫

৬) ঐ, ২৮০।২৭, এই বচনের 'বিপ্র' শব্দে প্রতি বিশেষ ধ্যান দেওয়া উচিৎ। কেননা কথিত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়ও নবেজ্যা, বৈশ্য ষটকর্মেজ্যা এবং শূদ্র পঞ্চেজ্যা কর্ম করিবেক। (ঐ, ২৮০।২৮—৩০)

৭) ঐ, ২৮০।১৩৬·২—১৩৮·১ ৮) 'বৃদ্ধহারীতসংহিতা', ১১।১৬২—৮ (আনন্দাশ্রমের 'স্মৃতিসমুচ্চয়' ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

৯) ঐ, ৮।৬০ (ঐ ২৮১ পৃষ্ঠা); আরও দেখ—৮।২৫ ও ৬৩

নিবদ্ধহৃদয়, অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থ, পঞ্চরাত্রানুসারে, শ্রুতিস্মৃত্যুদিত ধর্ম বর্ণাশ্রমবিভাগ সম্যক্ আচরণ করে, বিশুদ্ধাত্মা (হইয়া) গুহ্য কর্ম পরিত্যাগ করে, তথা মলিনীকর, লোকনিন্দাকর, প্রতিকূল, অনাজ্ঞপ্ত ও সদাচারবহিষ্কৃত কর্ম পরিত্যাগ করে, এবং ভাগবত বেষ ধারণ করত ভগবানের বিমল জন্মকর্মোৎসব বাদি করে, সেই প্রাজ্ঞ পরম বৈষ্ণব বলিয়া মত। আত্মা (স্বরূপত) দেহাদিবর্জিত, নির্লেপ, অক্ষর, শুদ্ধ, পরিণামহীন, সচ্চিদানন্দ, ষট্‌তরঙ্গমুক্ত, অনাময়, অবস্থাত্রয়নির্লিপ্ত, বিকাররহিত, ধ্রুব, বিজ্ঞানময়স্বরূপ, অচ্যুত, অস্ফুট, উপাধিভেদরহিত, শান্ত, স্বপ্রভায় ব্যাপী, উপাধিকৃতসঙ্কোচরহিত, স্ফটিকোজ্জ্বল, সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত, অপ্রধৃষ্য, অনৌপম্য, অপ্রতর্ক্য, অগোচর, স্বরূপভূতসামর্থ্যসম্পন্ন, সত্যবিক্রম, সত্যসঙ্কল্প নিত্যাত্মগুণাশ্রয়, অনুত্তম এবং ভগবচ্ছেষভূত—ইহা জানিয়া এবং ইহাকে (জীবাত্মাকে) সেই আত্মা বলিয়া জানিয়া কৃত্য (কর্ম) হইতে প্রমুক্ত এবং ঐ প্রকার আত্মস্থিতি লাভ করিয়া যে অনাত্মসঙ্গবর্জিত একান্তে,—আত্মার স্বরূপে সংস্থিত বুধ একান্তী। সদা দেহধর্মসমূহ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, মানাপমানবর্জিত, স্বাত্মভূতনিজাধারপরমাত্মাপরায়ণ অনাত্মাসম্বন্ধিজনসঙ্গরতি হইতে নিবৃত্ত, প্রতিকূল জনের অন্নাদি-ভোজন এবং উহাদের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজন বর্জিত, আচার্যোপাসনারত, দেহাকৃতি-নির্গত এবং স্বস্বরূপস্থ একান্তী আমার (ভগবানের) প্রীতিকর বলিয়া মত। হে বৎস ! যে স্বাধারভূত, অচ্যুত, অক্ষর এবং অদ্বৈত ব্রহ্মসংজ্ঞিত, স্বাত্মাকে প্রাপ্যভোগ্যবুদ্ধিতে পরাভক্তি সহকারে সদা সেবা করে, তাহাকে পরমৈকান্তী বলিয়া জান। হে দ্বিজোত্তম ! প্রত্যগাত্মা দেহ হইতে একান্তভূত। সুতরাং সনাতন পরমাত্মা একান্তভূত।···ব্রহ্মাদি অমরগণ যাহার আনন্দের কলালেশের অভিলাষী সেই আনন্দনিধির ভক্তি পরমৈকান্তিতা বলিয়া মত। পরমৈকান্তিক আমার তথা আমিও তাহার, আত্মা বলিয়া জ্ঞেয়। সে ক্ষণমাত্রের জন্যও আমার ধ্যানসুখের বিচ্ছেদ সহন করিতে অক্ষম। যাহার জ্ঞানের কামলেশ পাইয়া নিখিলপ্রাণী জ্ঞানী হয়, সেই জ্ঞাননিধির ভক্তি পরমৈকান্তিতা। যাহার কর্তৃত্বসামর্থ্য হেতু জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ ও কর্তা হয়, সেই পরমকর্তার ভক্তি পরমৈকান্তিতা। যাহার ঐশ্বর্য্যের কলালেশ পাইয়া সুরাসুরগণ ঈশ্বর হয়, সেই ঐশ্বর্য্যনিধির ভক্তি পরমৈকান্তিতা বলিয়া মত।”[১] উহার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে—“পারমৈকান্তিক ধর্ম” রামানুজ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে (“সন্দর্শিত”)। উহা প্রাচীন। তবে কালান্তরে বিলুপ্ত হয়। বিষ্বক্‌সেনাদি-ভক্তগণের এবং শঠারিপ্রমুখ দ্বিজজনের সহায়ে রামানুজ মুনি কর্তৃক উহা পুনঃ সংস্থাপিত হয়।[২] ‘শাণ্ডিল্যসংহিতা’র মতে, “বীরবৈষ্ণবশাসন” গার্গ্যভি শাণ্ডিল্য কর্তৃক প্রোক্ত। তন্মতে বিষ্ণুর সমাশ্রয় করিয়া অপর সমস্তের আশ্রয় ত্যাগ কর্তব্য। বর্ণাশ্রমাদি, শিখাসূত্রাদি এবং বিধি নিষেধাদি সমস্তই ত্যাগ কর্তব্য। উহা অবৈদিক।[৩]

‘বিষ্ণুপুরাণে’ আছে যে একান্তী বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী এবং যোগী হইতে ভিন্ন। কেননা, তন্মতে, বানপ্রস্থী সপ্তর্ষিলোকে এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর “স্বাত্ম-

---

১) বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, ১।৭।২৮—৫০

২) ঐ, ২।৭।৬৭—৭১ ৩) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ভক্তিখণ্ড, ৪।১৬।২৮—৩১

সন্তোষকারী” যোগী “অমৃত স্থান” প্রাপ্ত হয়।[১] “পরন্তু যে যোগিগণ একান্তী এবং সদা ব্রহ্মধ্যায়ী, তাহাদের গতি সেই পরমস্থান যাহা স্থরিগণ দর্শন করে।[২] চন্দ্রস্থর্য্যাদিগ্রহগণ বার বার গমন করত প্রত্যাবর্তন করে। পরন্তু দ্বাদশাক্ষরচিন্তকগণ অদ্যাপিও প্রত্যাবর্তন করে নাই।”[৩] স্বাত্মসন্তোষকারী যোগগিণের লভ্য ‘অমৃত স্থান’ এবং একান্তী ও নিত্যব্রহ্মধ্যায়ী যোগিগণের লভ্য ‘পরমস্থানে’র পার্থক্য কি, তাহা ‘বিষ্ণুপুরাণে’ নির্দেশিত হয় নাই। যাহা হউক, উহাতে নারায়ণীয়াখ্যানের বচনই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে মাত্র। কেননা, তথায়ও উক্ত হইয়াছে যে, “যে সকল বিপ্র বেদ ও উপনিষৎসমূহ বিধিপূর্বক পাঠ করে এবং উহাদিগেতে সম্যক্ আস্থিত, আর যাহারা যতিধর্মী, তাহাদেরও অপেক্ষা একান্তী মনুষ্যগণের গতি বিশিষ্ট বলিয়া জানি।”[৪] ‘বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা’য়ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে কর্মী, জ্ঞানযোগী ও সাত্বতের গতি ভিন্ন ভিন্ন,—কর্মীর গতি ত্রিলোকের অন্তর্গত, জ্ঞানযোগী বা সন্ন্যাসীর গতি তদ্বহিভূত ব্রহ্মলোক, আর ভগবদর্পিতচিত্ত ও ভগবদভিলাসী পরমৈকান্তী বা সাত্বতের গতি গুণাতীত ;[৫] পরমৈকান্তিগণ অর্চিরাদিমার্গে গমন করে, কর্মিগণ ও যোগিগণ সেই পথে যায় না।[৬]

‘একান্ত’ এবং ‘একায়ন’ শব্দ অভিন্নার্থক। সেই হেতু ‘একান্তধর্ম’কে ‘একায়নধর্ম’ও বলা যায়। ঐ সংজ্ঞা ‘মহাভারতে’ বস্তুতই পাওয়া যায়। তথায় উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রকাশিত ধর্মকে বেদবিদ্ জনগণ ‘একায়নধর্ম’ও বলিয়া থাকেন।[৭] কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতাতে ঐ নামের ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “যে হেতু মোক্ষ অয়নের (অর্থাৎ প্রাপ্তির) এতদ্‌ভিন্ন অপর কোন পন্থা নাই, সেইহেতু মনীষিগণ উহাকে ‘একায়ন’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।”[৮] পরে প্রদর্শিত হইবে যে ঐ সংহিতা মতে পাঞ্চরাত্র ধর্মের মূল একায়ন বেদ। ‘শ্রীপ্রশ্নসংহিতা’য় উক্ত হইয়াছে যে “যে বেদে মোক্ষমার্গ আমার আরাধনরূপে সনাতন একই বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে (সেই বেদের নাম) সেইহেতু ‘একায়ন’ হইবে।”[৯] যাহা হউক, সেই হেতুতে ও তন্ত্রোক্তধর্মকে একায়নধর্ম বলা হয় কিনা বিবেচ্য। ‘মহাভারতে’ এক ‘একায়ন পন্থা’র উল্লেখ আছে। পরমর্ষি ব্যাস বলেন যে মনীষিগণ ঐ পথে গমন করেন ; মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাকে জানিয়া মৃত্যুরূপী সংসারে আসক্ত হন না, বরং উহাকে অতিক্রম করেন। ঐ পন্থা অকুতোভয় এবং তদ্দ্বারা হৃষীকেশ-প্রাপ্তিরূপ উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়।[১০] তাহাতে সহজে অনুমান হয় যে এই একায়ন পন্থা এবং পূর্বোক্ত একায়নধর্ম অভিন্ন। ‘একমাত্র মার্গ’ অর্থেও ‘একায়ন মার্গ’ শব্দের প্রয়োগ ‘মহাভারতে’ পাওয়া যায়।[১১] বৌদ্ধসুত্তপিটকে’ও ‘একায়নমার্গে’র উল্লেখ আছে। “জীবগণের বিশুদ্ধির পক্ষে, শোকপরি-

---

১) বিষ্ণুপু, ১।৬।৩৭—৮ ২) অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ ৩) বিষ্ণুপু, ১।৬।৩৯—৪০

৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫—৬'১ ৫) বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা ১।৪।১৯—২১ ৬) ঐ, ৩।৬।৫৭—৯

৭) মহাভা, ১২।২১৭।৩০ ও ৩৮ দেখ।

৮) ‘ঈশ্বরসং’, ১।১৮ ; ২১।৫৩৪'২-৫৩৫'১ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ; ‘পারমেশ্বরসং’, ১। পুরুষোত্তমসং, ১।১২

৯) শ্রীপ্রশ্নসং, ২।৩৯

১০) মহাভা, ৫।৬৯।১৫-১৬ “এষঃ জ্ঞানমার্গঃ একায়নঃ একস্য ব্রহ্মণঃ প্রাপকঃ” (নীলকণ্ঠ)। আরও দেখ ৫।৬৯।১৭-২১। ১১) মহাভা, ৩।১৪৬।৬৭ একায়ন—“একনিশ্চয়” (মহাভা, ৮।৮৮।২০'১

বেদন সম্যক্ অতিক্রম করিবার পক্ষে (এবং) দুঃখদৌর্মনস্য অস্তমিত করিবার পক্ষে" একায়ন-মার্গের[১] তথা একায়নমার্গ দ্বারা অঙ্গার-রাশির ও বৃক্ষবিশেষের সন্নিকটে যাওয়ারও,[২] কথা আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে উহার অর্থ 'একমাত্র মার্গ'।[৩] ঐ ব্যাখ্যা সর্বত্র প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ লাভের তিন মার্গের উল্লেখ আছে। যথা (১) "অট্ঠাঙ্গিক মগ্গে" (=অষ্টাঙ্গিক মার্গ)—ইহা কেবল শীল, চিত্ত এবং প্রজ্ঞামূলক; সুতরাং ইহাতে কায়িক ও মানসিক সংযমেরই প্রাধান্য; (২) "সতিপট্ঠান" এবং (৩) "সদ্ধা" (=শ্রদ্ধা)—ইহা প্রীতিজনক প্রসাদ; ইহা ভক্তিমার্গ। কথিত হইয়াছে যে "সতিপট্ঠান" একায়ন মার্গ। "একায়নো অয়ং মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া" (এই মার্গ একায়ন, প্রাণীদিগের বিশুদ্ধি-কারক)।[৪] নির্বাণলাভের অপর দুই মার্গেরও উল্লেখ থাকাতে 'একায়নমার্গ' অর্থ—ঐস্থলে একমাত্র মার্গ হইতে পারে না। অপর কিছুর সাহায্য ব্যতীত কেবল 'সতিপট্ঠান' দ্বারাই বিশুদ্ধি লাভ হইতে পারে বলিয়া উহা 'একায়ন মার্গ' বলা হইয়াছে কিনা বিবেচ্য। অসঙ্গ লিখিয়াছেন "অনিমিত্তৈকান্তিক পথ" "একায়নপথের" সহিত সংশ্লিষ্ট,—উহার এক শাখা মাত্র।[৫] সুতরাং, তাঁহার মতে, উহারা কথঞ্চিৎ ভিন্ন।

মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে "একযানমার্গ" বা "একযানে"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহার তাৎপর্য এই—বুদ্ধের অনুযায়িগণের মধ্যে কালক্রমে মতভেদ উপস্থিত হয়,—তাঁহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। প্রত্যেক দলেই বলিতে আরম্ভ করে যে তাহাদের অনুসৃত মত স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট। তখন এই প্রশ্ন উঠে যে বুদ্ধ কি পরমতত্ত্ব,—মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের ভিন্ন ভিন্ন মার্গের উপদেশ করিয়াছিলেন? তাহার সমাধানার্থ বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, না, বুদ্ধ বিভিন্ন মার্গের উপদেশ করেন নাই; তিনি একই মার্গেরই উপদেশ করিয়াছিলেন, অপর মার্গসমূহ সেই একই মার্গেরই অন্তর্ভুক্ত। যথা, 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে' আছে, "যান নিশ্চয়ই এক। ইহলোকে দ্বিতীয় (যান) কদাচিৎ নাই এবং তৃতীয়ও নিশ্চয়ই নাই।"[৬] 'লঙ্কাবতারসূত্রে'ও আছে, যান একই।[৭] ঐ একযান কোনটী? উহা কি শ্রাবকযান, বিজ্ঞানবাদীর যান, না শূন্যবাদীর যান

---

১) 'মজ্ঝিমনিকায়', 'সতিপট্ঠানসুত্ত, (১০)

২) ঐ

৩) অধ্যাপক শ্রীবেনীমাধব বড়ুয়া-কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত 'মধ্যমনিকায়ে'র ১ম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠার ৩য় সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ৪) 'দিঘনিকায়', ২য় খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা

৫) "একায়নপথশ্লিষ্টাহ নিমিত্তৈকান্তিকঃ পথঃ।"

('মহাযানসূত্রালঙ্কার', লেভির সংস্করণ, ২০-১।১২'২)

"মিশ্রোপমিশ্রত্বেনৈকায়নপথস্থাষ্টমস্য বিহারস্য শ্লিষ্টঃ অনিমিত্তৈকান্তিকো মার্গঃ।" (টীকা) আরও দেখ—ঐ, ২০-১।৩৭'১।

৬) 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', 'বিব্লিওথেকা বুদ্ধিকা' সংস্করণ, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৬ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—"নাস্তি যানত্রয়ং কিঞ্চিদেকযানমিহাস্তি তু" (১৪৩ পৃষ্ঠা)

৭) 'লঙ্কাবতারসূত্র', বুন্‌যিউ নঞ্জিও কর্তৃক সম্পাদিত, কিয়োতো, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৬৫ ও ২৪৩ পৃষ্ঠা। পরন্তু উহার অন্যত্র আছে, বুদ্ধ "পরমার্থের দ্বার" শিষ্যের অধিকার ভেদে, ত্রিযান, একযান বা অযান বলিয়া থাকে। (২।১৩১ (৬৫ পৃষ্ঠা); ১০।২৪৫ (২৯৭ পৃষ্ঠা)

তাহা লইয়া বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এখানে সেই মতমতান্তরের উল্লেখের প্রয়োজন নাই।[১] আমাদের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'মহাভারতে' ব্যাসোক্ত 'একায়ন পন্থা' এবং ভাগবতধর্মের 'একায়নধর্ম' নামের সহিত মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের 'একযান মার্গে'র কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা বিদ্বদ্বর্গকে অনুরোধ করি। অসঙ্গের 'মহাযান সূত্রালঙ্কারে'র টীকায় (—উহা হয়ত স্বয়ং অসঙ্গ কৃত) 'যান' শব্দের অনেক নিরুক্তি আছে,—"যাতব্যং যানমিতি", "যাতা যানমিতি", "যাতি যানমিতি", "যান্তি তেন যানমিতি" এবং "যতঃ পরেণ যাতব্যং নাস্তি তদ্‌যানমিতি।" 'অয়ন' শব্দ 'যান' শব্দের পর্যায়-বাচক। সুতরাং একযান = এক + যান = এক + অয়ন = একায়ন। অতএব উভয় নাম অভিন্নার্থক। তাই, বোধ হয়, অসঙ্গ একযান মার্গকে কখন কখন 'একায়ন পথ'ও বলিয়াছেন। বৌদ্ধ একযান মার্গ মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের মার্গ; উহা বুদ্ধের জ্ঞান ("বৌদ্ধস্য জ্ঞানস্য") লাভের অর্থাৎ বুদ্ধ হইবার উপায়। 'মহাভারতো'ক্ত একায়ন পন্থাও মোক্ষ মার্গ এবং একান্তিগণকে 'প্রতিবুদ্ধ' বা 'বুদ্ধ' নামেও অভিহিত হইয়াছে।[২] আরও দেখ, একায়ন পন্থা "হৃষীকেশ-প্রাপ্তি"র বা নারায়ণ-প্রাপ্তির পন্থা। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধকে কখন কখন নারায়ণ বলা হইয়াছে।[৩] সুতরাং একযান মার্গকেও নারায়ণ লাভের মার্গ বলা যায়। প্রাচীন ভাগবতধর্মের সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আরও অনেক বিষয়ে মিল আছে। কোটিল্যে 'অর্থশাস্ত্রে'ও একায়নমার্গের উল্লেখ আছে।

পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রসমূহে ভগবানের আরাধনার্থ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া নিশান্ত পর্য্যন্ত কালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে এবং প্রতিভাগে পৃথক পৃথক প্রকার কর্ম করা হইয়া থাকে।[৪] যথা, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত[৫] কাল (দেহাদি শোধন করত শুচি হইয়া) কর্ম, বাক্‌ এবং চিত্ত সংযত করত জপ, ধ্যান, অর্চন এবং স্তোত্র দ্বারা জগদ্‌যোনি ভগবানের অভিগমন কর্তব্য। সেই হেতু উহা 'অভিগমনকাল' বলিয়া স্মৃত হয়। অনন্তর উঠিয়া সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর কাল ভগবদ্‌যাগনিষ্পত্তির নিমিত্ত পুষ্পফলাদি উপকরণ সমূহের অর্জন বা উপাদান করিতে হয়। সেইহেতু ঐ কালকে 'উপাদানকাল' বলা হয়। অনন্তর

---

[১] কৌতুহলী পাঠক ডক্টর শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত প্রণীত Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to Hinayana গ্রন্থের (লণ্ডন, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ৫২-৭ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন। আমরা এখানে কেবল 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র মত দিতেছি,—"তত্রৈকযানগতিলক্ষণং কতমদ্ভূতৈকযানমার্গাধিগমাববোধ কতমো যদুত গ্রাহ্যগ্রাহকবিকল্পযথাভূতাবস্থানাদপ্রবৃত্তের্বিকল্পস্যৈকযানাববোধঃ ভতো ভবতি। এষ একযানাববোধো মহামতে নান্যতীর্থ্যশ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধব্রহ্মাদিভিঃ প্রাপ্তপূর্বোঽন্যত্র ময়া। অত এতস্মাৎ কারণাম্মহামতে একযানমিত্যুচ্যতে।" (১৩৩-৪ পৃষ্ঠা)।

[২] পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ।

[৩] যথা, 'ললিতবিস্তরে' (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ) বুদ্ধকে বলা হইয়াছে—"নারায়ণস্থানবৎ" (৭ম অধ্যায় গাথা ৬ (১২৪ পৃষ্ঠা); "নারায়ণস্থানবান্‌" (৭।১১, ১৪ (১২৫, ১২৬ পৃষ্ঠা)); "বজ্রদৃঢ় অভেদ্য নারায়ণো আত্মভাবো" (১৫শ অধ্যায়, ২৫৭ পৃষ্ঠা)।

[৪] যথা দেখ—'জয়াখ্যসংহিত', ২২।৬৬; পৌষ্করসংহিতা, ৩৮।২৮৪

[৫] 'পৌষ্করসংহিতা'য় (৩৮।২৮৫) উক্ত হইয়াছে "আদিত্যদর্শন" পর্যন্ত।

দুই প্রহর অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা কর্তব্য। ঐ সময় 'ইজ্যাকাল' বলিয়া স্মৃত হয়। পরে এক প্রহর শাস্ত্রের অধ্যয়ন, শ্রবণ, চিন্তন এবং ব্যাখ্যান করিতে হইবে। উহা 'অধ্যায়-কাল' (বা 'স্বাধ্যায়কাল')। দিনাবসান সম্প্রাপ্ত হইলে পূজা করিতে হইবে। পরে শয়ন করত নিশাবসানে জাগিয়া যোগাভ্যাস কর্তব্য। সেই হেতু ঐ পঞ্চম কাল 'যোগকাল' বলিয়া উক্ত হয়।[১] ভগবদ্‌যাগের অষ্ট অঙ্গ যথাক্রমে এই—(১) মহাভিগমন, (২) ভোগ অর্থাৎ অর্ঘ্যপুষ্পাদি অখিলভোগ প্রভৃতি বাহ্য উপচার দ্বারা পূজন, (৩) মধু এবং ঘৃত সম্পৃক্ত দধি দ্বারা, অথবা পশুবলি দ্বারা ("পশুনাঽপি বা) পূজা, (৪) অনন্তর পূজা (—ইহা বোধ হয়, মানসপূজা), (৫) সম্প্রদান অর্থাৎ পূর্বোক্তবিধিতে নিবেদিত বস্তু সমূহের দান, (৬) বহ্নি সন্তর্পন (বা হোম), (৭) পিতৃযাগ এবং (৮) প্রাণাগ্নিহবন নামক অনুযাগ।[২] 'পৌষ্কর সংহিতা'য়ও ঐ প্রকার কালবিভাগ বিবৃত হইয়াছে।[৩]…সূর্য্যাস্তের পরবর্তী পূজাকালের এবং শয়নকালের পরিমাণ কোথাও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে শয়ন করত হৃদয়ে মন্ত্রেশ্বরের স্মরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়, চব্বিশ প্রহরাত্মক এক আহোরাত্রকে প্রকৃত পক্ষে সাত অসমান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পরন্তু উক্ত কালবিভাগগণনায় শয়নকাল-বিভাগকে পৃথক্‌রূপে ধরা হয় নাই। তাহার কারণ সম্ভবত এই যে উহা কর্মকাল নহে, বিশ্রামকালই, আরাধনাকর্ম্মকালের বিভাগের প্রতিই শাস্ত্রের লক্ষ্য ছিল। উহার অব্যবহিত পূর্বের বিভাগ,—দিনান্ত হইতে শয়ন পর্যন্ত কাল, কর্মকাল হইলেও পৃথগ্‌রূপে ধৃত না হইবার কারণ হয়ত এই যে ঐ কালে কর্তব্য কর্ম পৃথক্ নহে,—ঐ কালে কর্তব্য পূজা ইজ্যাকালে কর্তব্য পূজার তুল্য বা অনুরূপ বলিয়া উহাও ইজ্যাকালই, কোন পৃথক্ প্রকারের কাল নহে। এই অনুমান সত্য হইলেই পৃথককর্ম্মভেদে কালবিভাগ প্রকৃত পক্ষে পাঁচই হইয়া থাকে। ঐ অনুমান যে সত্য, 'জয়াখ্যসংহিতা'র বচন হইতে তাহা সিদ্ধ হয়। "প্রভাত হইতে নিশান্ত (কাল) পৃথক্‌কর্ম্মবশত পঞ্চধাই (বিভক্ত বলিয়া) পরিকল্পনা কর্তব্য। বহু কাল (বস্তুত) নাই।"[৪] পাদ্মাদি অপর কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় এই প্রকার পঞ্চকালবিধির স্বল্পবিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়। যথা, 'পদ্মপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে দেবতাস্থানমার্জন, উপলেপ এবং নির্মাল্যদূরীকরণের নাম অভিগমন; গন্ধপুষ্পাদিচয়ন উপাদান; স্বদেবতার যথার্থত পূজা ইজ্যা; মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্বক জপ, সূক্তস্তোত্রাদিপাঠ, হরির সঙ্কীর্তন ও তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাস স্বাধ্যায়; এবং স্বদেবের আত্ম-ভাবনা যোগ।[৫] এই পঞ্চকালতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে জানে বলিয়াই পাঞ্চরাত্রবিৎকে 'পঞ্চকাল-বিৎ' বা 'পঞ্চকালজ্ঞ'ও বলা হইয়া থাকে। শ্বেতদ্বীপবাসী ভগবদ্ভক্তগণ পঞ্চকালজ্ঞ ছিলেন।[৬]

---

[১] জয়াখ্যসংহিতা, ২২।৬৮—৭৪'১

[২] জয়াখ্যসংহিতা, ২২।৭৬—৮০'১

[৩] 'পৌষ্করসংহিতা', ৩৮।২৮৫—২৯২ ; আরও দেখ—৪১।৫৭—

[৪] জয়াখ্যসংহিতা, ২২।৬৬

[৫] পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৭৮।১০—৪ ইহা বোধহয় বিশেষভাবে বলা উচিত যে এই খানে কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই "পঞ্চপ্রকার অর্চা" বিবৃত হইয়াছে।

[৬] মহাভা, ১২।৩৩৬।৪৬'২

ঐ বিধির প্রবর্তক, কিম্বা ঐ বিধির দ্বারা লভ্য, ভগবানকেও কখন কখন ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাই এক বচনে আছে, "হে পঞ্চকালজ্ঞ! হে পঞ্চকালপরায়ণ! তোমাকে নমস্কার। তুমিই পঞ্চকালৈকমানস ব্যক্তিগণের অব্যয় গতি।"[১] এবং সেই হেতু পাঞ্চরাত্রধর্ম্মকে কখন কখন পঞ্চকালধর্ম বা 'পাঞ্চকালিক ধর্ম'ও বলা হয়।"[২]

'সূরি' ও 'সুহৃৎ' বস্তুত পারিভাষিক সংজ্ঞা নহে। 'অমরকোশে'র মতে 'সূরি' শব্দের অর্থ 'বিদ্বান্' বা 'পণ্ডিত'। পরন্তু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (অর্থাৎ সূরিগণ বিষ্ণুর সেই পরম পদ সদা দর্শন করেন)।[৩] তাহা হইতেই বিষ্ণুর ভক্তগণ 'সূরি' শব্দকে আপনাদের পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে মনে করেন, বোধ হয়। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রসমূহ সেই হেতুতেই বোধ হয় "পরম ব্যোম" বা "বৈকুণ্ঠ" বাসী "নিত্য" জীবের বা জীবগণের বা "সূরি"গণের সদ্ভাব পরিকল্পিত হইয়াছে। পরন্তু 'ঋগ্বেদে' বিদ্বান্ স্তোতা, যজ্ঞকর্তা বা যজমান অর্থে 'সূরি' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।[৪] 'অমরকোশে'র মতে, মিত্র', 'সখা' ও 'সুহৃৎ' শব্দ একার্থক। পরে পদর্শিত হইবে যে ভাগবতগণ অহিংসাবাদী,—তাঁহাদের মতে ভগবানের প্রিয় ভক্ত "সর্বভূতের অদ্বেষ্টা ও মৈত্র,"[৫] "সর্বভূতের হিতে রত"[৬] এবং "সর্বভূতের সুহৃৎ;"[৭] তাঁহাদের উপাস্য ভগবান্‌ও "সর্বভূতের সুহৃৎ" এবং তাহা জানিলেই শান্তি লাভ হয়।[৮] এই সকল হইতে ভাগবতগণ 'সুহৃৎ' শব্দকে আপনাদের পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। ইহা ও দেখা যায় যে, বিষ্ণুর সহস্র নামের এক নাম 'সুহৃৎ'[৯] এবং শ্বেতদ্বীপে নারদকৃত নারায়ণের স্তুতিতেও আছে যে তিনি বান্ধব।[১০]

'পঞ্চরাত্র' বা 'পাঞ্চরাত্র' আখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে, তথা অন্যত্রও, নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা হইয়াছে দেখা যায়। ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে উহাদের আগমরত্নত্রয়ের দুইটীতে—'জয়াখ্যসংহিতা'তে এবং 'সাত্বতসংহিতা'তে, ঐ বিষয়ে কিছুই নাই। পরন্তু অপর আগমরত্নে,—'পৌষ্করসংহিতা'য়, আছে।

(১) 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে, "যাহা ফলের উৎকর্ষ দ্বারা বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, এবং পুরাণ,—এই পঞ্চ প্রকার (শাস্ত্রকে) রাত্রি (অর্থাৎ রাত্রিবৎ তমসাচ্ছন্ন মলিন বা ম্লান) করিয়া দেয় ('রাত্র্যায়তে') বলিয়া বিজ্ঞেয়, হে অব্জজ! (সেই শাস্ত্র) 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া স্মৃত হয়।[১১] 'পাদ্মসংহিতা'য়ও এই মতের উল্লেখ আছে। "অপর শাস্ত্র সমূহ, মহান হইলেও, উহার সান্নিধ্যে রাত্রি হইয়া যায় ('রাত্রায়ন্তে')। সেই হেতু উহার ঐ সমাখ্যা (অর্থাৎ পঞ্চরাত্র) লোক মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। অথবা, যেমন দিবাকর উদয় হইলে (রাত্রি পঞ্চত্ব লাভ করে অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়) সেইরূপ উহার উদয়ে অপর রাত্রিসমূহ পঞ্চত্ব লাভ করে। সেই হেতু উহা (পঞ্চরাত্র বলিয়া) কথিত হয়।"[১২]

---

১) বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্ররক্ষায়' অনূদিত ; ২য় অধিকার (৫৩ পৃষ্ঠা)

২) ঐ, ২য় অধিকার (পৃষ্ঠা, ৫৩, ৫৪, ৫৭ ইত্যাদি দেখ। ৩)

৪) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৩১।৭ ; ৪৮।৪ ; ৫৪।১১ ; ৭৩।৫,৯ ; ইত্যাদি। মেক্‌ডোনেল ও কীথ প্রণীত Vedic Tndexএর ২য় খণ্ডের, ৪৬৫ পৃষ্ঠাও দেখ। ৫) গীতা, ১২।১৩'১ ৬) ঐ, ৫।২৫ ; ১২।৪ ৭) ....

৮) গীতা, ৫।২৯'২ ; আরও দেখ—৯।১৮'১ ৯) মহাভা, ১৩।১৪৯।৬২'১ ১০) ঐ, ১২।৩৩৮।১৯৭

১১) পৌষ্করসং, ৩৮।৩০৭'২—৮ ১২) পাদ্মসং, ১।১।৭০—১

(২) 'পরমসংহিতা'য় আছে, "মহাভূতগুণসমূহ দেহীদিগের পঞ্চ রাত্রিসমূহ বলিয়া স্মৃত হয়। উহাদের সংযোগ হইতে বিনিবৃত্তি (কারক) হেতু (এই শাস্ত্র) 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া স্মৃত হয়। অব্যক্ত, বুদ্ধি (বা মহত্তত্ত্ব), গর্ব (বা অহঙ্কার), (পঞ্চ) তন্মাত্র এবং (পঞ্চ) ভূত—এই সকল পুরুষের 'রাত্রিসমূহ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেইহেতু উহারা 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া স্মৃত হয়।"[১] 'কপিঞ্জলসংহিতা'য়ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে "হে মহামতি! পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ (কিম্বা গন্ধাদি উহাদের) পঞ্চ গুণ প্রাণীদিগের রাত্রিসমূহ বলিয়া প্রোক্ত হয়, সর্ব শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। উহাদের ভোগ হইতে বিনিবৃত্তি (করে বলিয়া এই শাস্ত্র 'পাঞ্চরাত্র' বলিয়া স্মৃত হয়।"[২] 'বিষ্ণুসংহিতা'র মতে 'রাত্রি' শব্দের অর্থ 'গোচর' (বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়)। গোচর শব্দাদিরূপ কিম্বা আকাশাদি মহাভূতরূপ—যে রূপই হউক না কেন, সর্বসমেত পাঁচটী। সেইহেতু উহাদিগকে 'পঞ্চরাত্র' বলা হয়। যাহা হইতে পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া ঐ পঞ্চরাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় সর্বজ্ঞানবিনাশন সেই শাস্ত্রও 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হয়।[৩] 'বিষ্ণুতন্ত্রে'ও সে প্রকারে উক্ত হইয়াছে "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী দেহিগণের রাত্রিসমূহ বলিয়া প্রোক্ত হয়; (কেননা, উহারা রাত্রি বা) অবিদ্যা হইতে সম্ভূত বলিয়া স্মৃত। যেহেতু উহাদের ভোগ হইতে বিনিবৃত্ত করায়, সেইহেতু ইহা (অর্থাৎ এই শাস্ত্র) পাঞ্চরাত্র বলিয়া প্রোক্ত হয়। এই শাস্ত্র মৎকর্তৃক সেই প্রকারে প্রোক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, তন্মাত্রা, মহাভূত এবং শব্দাদিগন্ধপর্যন্ত উহাদের গুণসমূহ দেহীদিগের রাত্রিসমূহ বলিয়া স্মৃত। ঐ সকল সমন্বিত দেহসমূহ দ্বারা দেহিগণের সাধন, পূজন, ভুক্তি এবং মুক্তি প্রদ এই (শাস্ত্র) পাঞ্চরাত্র বলিয়া স্মৃত হয়। দেবভূতগুণসমূহ দেহীদিগের পঞ্চ রাত্রি বলিয়া স্মৃত। যেহেতু (এই শাস্ত্র) উহাদের ভোগ হইতে বিনিবৃত্ত করায়, (সেই হেতু উহা পাঞ্চরাত্র বলিয়া) স্মৃত।[৪] 'অগ্নিপুরাণেও আছে হে আকাশাদি পঞ্চভূতই পঞ্চরাত্রি এবং উহারা "অচৈতন্য এবং তমোদ্রিক্ত।"[৫]

এখন প্রশ্ন—অব্যক্তকে এবং উহার কার্য মহদাদিকে 'রাত্রি বলা হয় কেন? কেহ কেহ মনে করেন যে ঐখানে 'রাত্রি শব্দের অর্থ 'দান।[৬] ঐ অনুমান সঙ্গত মনে হয় না।

অপর পঞ্চশাস্ত্র কি কি, তাহা এই বচনে উল্লিখিত না থাকাতে আধুনিক কালের কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহারা এই,—সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ, আর্হত (বা জৈন) এবং শৈব। তাঁহারা 'পৌষ্করসংহিতা'র ঐ বচন দেখেন নাই মনে হয়। অধিকন্তু ঐ অনুমানের বিরুদ্ধে এই শঙ্কা করা যাইতে পারে যে ভাগবতধর্ম মূলত বৌদ্ধ এবং জৈন মত অপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং উহার নাম তাহাদের নিন্দাবাচক মনে করা যাইতে পারে না। তবে উহার 'পঞ্চরাত্র' নাম উক্ত মতদ্বয়ের প্রবর্তনের পরে কৃত হইয়াছে মনে কবিলে ঐ শঙ্কা উঠিতে পারে না।

১) পরমসং, ১।৩৯·২—৪১·১ ২) কপিঞ্জলসং, ১।৩১·২—৩২ ৩) বিষ্ণুসং, ২।৪৯·২—৫১·১

৪) 'পরমসংহিতা'র প্রস্তাবনায় ধৃত (৩৭ পৃষ্ঠা) 'বিষ্ণুতন্ত্র'-বচন।

৫) অগ্নিপু, ৩৯।৭—

৬) 'পরমসংহিতা'র ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য কৃত ভূমিকা (৯ পৃষ্ঠা) এবং ডক্টর শ্রী এস, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারকৃত ইংরাজী-ভাষান্তর (৪ পৃষ্ঠা) দেখ।

'পরমসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে প্রকৃতি সতত পুরুষের নানাবিধ নিদ্রা উৎপন্ন করে।[১] উহা গুণত্রয় দ্বারা পুরুষের ছয় প্রকার নিদ্রা করায় ("ক্রিয়তে নিদ্রাং");[২] ঐ নিদ্রা বশত পুরুষ আপন স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং বন্ধনগ্রস্ত হয়।[৩] রাত্রি যেমন পুরুষের নিদ্রা-জনক, অব্যক্তাদিও সেই প্রকার নিদ্রাজনক। সুতরাং জীবের পক্ষে রাত্রিবৎ বলিয়াই উহাদিগকে 'রাত্রি' বলা হইয়াছে মনে হয়। 'পুরুষ' শব্দের নিরুক্তি অনুসারে জানা যায়, পরমাত্মা অব্যক্তাদি বিরচিত পুরসমূহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রিতে লোক শয়ন করে অথবা রাত্রি লোককে শয়ন করায়। সেই প্রকারে শয়ন-কারক বলিয়া অব্যক্তাদিগকে পুরুষের 'রাত্রি' বলা হইয়াছে মনে হয়। অগ্নিপুরাণের "তমোদ্রিক্ত" শব্দ হইতেও ঐ সংজ্ঞার উৎপত্তি পাওয়া যায়। তমোদ্রিক্ত বলিয়াই আকাশাদি পঞ্চমহাভূত তমোময়। রাত্রিও তমোময়। সুতরাং রাত্রিবৎ তমোময় বা তমোদ্রিক্ত বলিয়াই আকাশাদিকে 'রাত্রি' বলা হইয়াছে, বোধ হয়।

(৩) 'শ্রীপ্রশ্নসংহিতা'র মতে "রাত্রি" 'অজ্ঞান' বলিয়া উক্ত হয় এবং 'পঞ্চ' অর্থ 'অজ্ঞান-নাশক' ('রাত্রিরজ্ঞানমিত্যুক্তং পঞ্চেত্যজ্ঞাননাশকম্')। অন্বর্থের অনুরোধে ঐ শাস্ত্র 'পাঞ্চরাত্র' (নামে অভিহিত) হয়।"[৪]

(৪) 'ঈশ্বরসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে আদ্য কৃতযুগে শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কোশিক, এবং ভরদ্বাজ—এই পঞ্চ মহর্ষির কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং "রহস্যাম্নায় নামক দিব্যমন্ত্রক্রিয়োপেত এবং মোক্ষৈকফল-লক্ষণ আদ্য একায়নবেদ", অর্থ সহ, উপদেশ করেন। এক এক দিবা রাত্রিতে এক এক জনকে করিয়া পঞ্চ দিবারাত্রিতে পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের পাঁচ জনকে বাসুদেব ঐ রহস্য শাস্ত্র অধ্যাপন করেন। সেই হেতু উহা ইহলোকে সর্বজন কর্তৃক 'পাঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[৫] 'বিহগেন্দ্রসংহিতা'য়ও ঈষৎ রূপান্তরে সেই প্রকার কথা আছে।[৬] তন্মতে আদ্য কৃত যুগে ভগবান্ কেশবের কৃপায় অনন্ত, গরুড়, বিষ্বক্‌সেন, ব্রহ্মা এবং কপালী (বা রুদ্র)—এই পাঁচ জন যথাক্রমে পর পর পাঁচ রাত্রিতে শ্রদ্ধাশাস্ত্রের এক এক অংশ শ্রবণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকে জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া (বা মন্দিরবিগ্রহাদি নির্মাণ) এবং চর্য্যা বিষয়ে একলক্ষশ্লোকাত্মক এক অংশের উপদেশ প্রাপ্ত হন। সেই হেতু পঞ্চলক্ষশ্লোকাত্মক সমগ্র শাস্ত্র 'পাঞ্চরাত্র' নামে কথিত হইয়া থাকে। 'মহাসনৎকুমারসংহিতা'য়ও ঐ প্রকার এক কিম্বদন্তী আছে বোধ হয়। কেননা, উহার পাঁচ ভাগ ব্রহ্মরাত্র, শিবরাত্র, ইন্দ্ররাত্র, ঋষিরাত্র এবং অপর এক রাত্র (—পাণ্ডুলিপির ভ্রষ্টতা হেতু যাহার নাম নিরূপণ করিতে পারা যায় নাই)—এই পাঁচ নামে অভিহিত হয়। হয়ত এক এক জনে এক এক রাত্রিতে করিয়া পাঁচ জনে পৃথগ্ ভাবে পাঁচ রাত্রিতে সমগ্র শাস্ত্র অবগত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক রাত্রিকে শ্রোতার নামে বিশিষ্ট করিয়া শাস্ত্রের ঐ অংশকেও ঐ নাম প্রদান করা হইয়াছিল। 'পুরুষোত্তমসংহিতা'র মতে, সমস্ত আগমশাস্ত্র ব্রহ্মা কেশব

---

[১] "সা চ প্রসূতে সততং নিদ্রামস্য পৃথগ্ বিধাম্॥"—(পরমসং, ১।৭৭·২)   [২] পরমসং, ১।৭১

[৩] পরমসং, ১।৭১, ৭৮   [৪] শ্রীপ্রশ্নসং, ২।৪০   [৫] ঈশ্বরসং, ২১।৫১৩—৫৩৩

[৬] Schrader, Introduction to the Pancaratra,

হইতে পাঁচ রাত্রিতে শ্রবণ করেন; সেই হেতু উহা 'পাঞ্চরাত্রাগম' বলিয়া স্মৃত হয়।[১] 'পরমসংহিতা'য় আছে যে ব্রহ্মা ভগবান্ পরমপুরুষের আদেশে, শ্বেতদ্বীপে গিয়া সনকাদি সিদ্ধ চতুষ্টয়কে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সমগ্র তত্ত্বজ্ঞান পঞ্চ রাত্রিতে উপদেশ করেন।[২] পরন্তু উহাতে ইহা বলা হয় নাই যে সেই হেতুতেই ঐ তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের নাম 'পঞ্চরাত্র হয়। বরং তথায় ঐ নামের অন্যপ্রকার উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি ইহা বিশেষ লক্ষিতব্য যে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের কতিপয়ের মতে তত্রোক্ত তত্ত্বের আদ্য উপদেশের সঙ্গে পঞ্চ রাত্রির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—উহা আদিতে পঞ্চরাত্রিতে উপদিষ্ট হইয়াছিল।

(৪) 'ব্রহ্মপুরাণে' আছে, "'রাত্র (শব্দ) জ্ঞান-বাচক। জ্ঞান পঞ্চবিধ বলিয়া স্মৃত হয়। সেই হেতু মনীষিগণ ইহাকে (অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানাত্মক এই শাস্ত্রকে) 'পঞ্চরাত্র বলিয়া থাকেন।"[৩] উপলব্ধ 'নারদপঞ্চরাত্রে'ও ঠিক সেই কথা আছে।[৪] উভয়ত্র একই বচন থাকাতে মনে হয়, হয়ত একে অপরটা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, অথবা উভয়েই কোন অপর গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে 'পঞ্চরাত্র' সংজ্ঞার এই ব্যাখ্যা প্রাচীন কিম্বদন্তীমূলক। স্রেডারও সেই অনুমান করিয়াছেন।[৫] পরন্তু ঐ ব্যাখ্যায় অতি বড় ত্রুটি এই যে 'রাত্র শব্দ কি প্রকারে জ্ঞান-বাচক তাহা বলা হয় নাই। সংস্কৃত কোশ গ্রন্থে ঐ প্রকার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত সাহিত্যেও উহার ঐ প্রয়োগ আর দেখা যায় না। যাহা হউক, পঞ্চবিধ রাত্র বা জ্ঞান কি কি, 'নারদপঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে[৬]—প্রথম জ্ঞান পরমতত্ত্ব। উহা জন্ম, মৃত্যু এবং জরা নাশক। দ্বিতীয় জ্ঞান পর, শুদ্ধ, এবং মুক্তিপ্রদ। উহার দ্বারা জীব হরির পদে লীন হয়। তাই উহা মুমুক্ষুগণের বাঞ্ছিত। তৃতীয় জ্ঞান শুদ্ধ ও মঙ্গল। উহা কৃষ্ণভক্তিদ,—তদ্দাস্যদ। উহা দ্বারা জীব হরির দাস্য লাভ করে। তাই উহা ভক্তগণের অভীষ্ট। চতুর্থ জ্ঞান যৌগিক। উহা পর এবং সর্বসিদ্ধিপ্রদ। উহা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, তথা সার্বজ্ঞ্য, দূরশ্রবণ, পরকায়-প্রবেশ, কায়ব্যূহ, জীবনদান, পরজীবন হরণ, সর্গকর্তৃত্ব, এবং সর্গসংহার—এই ষোড়শবিধ সিদ্ধি প্রদান করে। উহা যোগিগণের সর্বস্ব এবং সিদ্ধগণের সুখপ্রদ। পঞ্চম জ্ঞান বৈষয়িক। উহার ইষ্টদেবী মায়া। উহা পরম সংমোহের হেতু। উহার দ্বারা জীবের চিত্ত বিষয়ে সর্বেন্দ্রিয়ের সেবায় এবং নিজের ও কুটুম্বগণের পোষণে নিরন্তর নিবদ্ধ থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্ঞান সাত্ত্বিক, চতুর্থ জ্ঞান রাজসিক, এবং পঞ্চম জ্ঞান তামসিক,—তাই বিদ্বান্গণ উহার অভিলাষ করেন না। তৃতীয় জ্ঞান নির্গুণ, সুতরাং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'কাপিল পঞ্চরাত্রের' মতে পঞ্চ জ্ঞান এই—(১) আধ্যাত্মিক জ্ঞান, (২) পরমাত্মা কৃষ্ণের ভক্তি জ্ঞান, (৩) মুক্তি-জ্ঞান, (৪) যৌগিক জ্ঞান এবং (৫) মায়িক জ্ঞান।[৭]

---

[১] পুরুষোত্তম সং, ১৬-২—৭-১; 'পরমপুরুষসংহিতা'য় (১।২৪) ও আছে যে সম্পূর্ণ "ভগবচ্ছাস্ত্ররহস্য" পরমপুরুষ নারায়ণ "পঞ্চরাত্রিতে" ব্রহ্মাকে ব্যাখ্যা করেন।

[২] পরমসং, ৩১।১৯

[৩] সাম্বশিবশাস্ত্রী-সম্পাদিত 'বৈখানসাগমে'র ভূমিকায় অনূদিত।

[৪] নারদপঞ্চরাত্র, ১।১।৪৪; আরও দেখ—১।১।৫৬'১

[৫] Schrader Introduction to the Pancaratra, ২৪ পৃষ্ঠা।

[৬] নারদপঞ্চরাত্র, ১।১।৪৫—৫৫।

(৭ নারদপঞ্চরাত্র, ২।৭।৫০—২

'মহাভারতের নারায়ণীয়াখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে

> "এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ॥
> পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রং চ কথ্যতে।"[১]

আচার্য্য রামানুজ মনে করেন যে এই বচনের তাৎপর্য এই যে—সাংখ্য, যোগ, বেদ এবং আরণ্যক—এই সকল পরস্পরের অঙ্গ অর্থাৎ একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতা হেতু একীভুত,—এক 'পাঞ্চরাত্র' বলিয়া কথিত হয়।[২] বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও প্রায় সেইরূপ মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে যে 'চার বেদ এবং সাংখ্য বা যোগ এই পাঁচেরই তাহার (ভাগবতধর্মের) মধ্যে সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে পাঞ্চরাত্রধর্ম,[৩] এবং বেদারণ্যক সমেত (অর্থাৎ উপনিষৎসমূহকেও লইয়া) এই সমস্ত শাস্ত্র পরস্পরের অঙ্গ'।"[৪] তিলক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে 'পাঞ্চরাত্র' শব্দের ঐ নিরুক্তি ব্যাকরণ দৃষ্টিতে শুদ্ধ নহে। তথাপি তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন। উহার সর্ব প্রধান ত্রুটী এই যে উহাতে 'রাত্রি' শব্দের তাৎপর্য্য অব্যাখ্যাত রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে বেদ-সাংখ্যাদিমতসমূহ পঞ্চরাত্রমতের অন্তর্গত,—উহার উপবিভাগসমূহ মাত্র। পরন্তু 'মহাভারতে ঐ প্রসঙ্গে স্পষ্টতই উক্ত হইয়াছে বেদসাংখ্যাদিমতসমূহ ও পাঞ্চরাত্রমত ভিন্ন ভিন্ন, যদিও ঐ প্রসঙ্গে স্পষ্টতই উক্ত হইয়াছে বেদসাংখ্যাদিমতসমূহ ও পাঞ্চরাত্রমত ভিন্ন ভিন্ন, যদি ও সকলেরই নিষ্ঠা একই নারায়ণে।[৫], 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও সেই প্রকার উক্তি আছে এবং তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে উক্ত পঞ্চশাস্ত্রের উৎপত্তি একই মূল শাস্ত্র হইতে[৬], প্রকৃত পক্ষে 'মহাভারতে'র উক্ত বচনের তাৎপর্য্য 'পঞ্চরাত্র' সংজ্ঞার উৎপত্তি নির্দেশকরণে সমর্থ বলিয়া, কিম্বা উহা হইতে তাহা সম্ভব বলিয়া, আমাদের মনে হয় না।

(৭) 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে, সাংখ্য, যোগ, শৈব, বেদ ও আরণ্যক—এই পাঁচটি আত্মানন্দ সমর্পণকারক বলিয়া 'রাত্রি' বলিয়া কথিত হয়। ঐ উক্ত পঞ্চ রাত্রির অর্থ যাহাতে সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যাহা দ্বারা পরমানন্দ লাভ হয়, প্রমাণপঞ্চকপূর্ণ এবং পঞ্চকার্থোপদেশক সেই প্রপঞ্চাতীত সদ্ধর্ম—'পঞ্চরাত্র' বলিয়া উদাহৃত হয়। সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা এবং কেশবে ভক্তি—এই পঞ্চার্থ দান করত জীবকে পরিত্রাণ করে বলিয়া ঐ বিদ্যা পাঞ্চরাত্রিকী।[৭]

(৮) 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র' নামে এক অর্বাচীন শাক্ত তন্ত্রে আছে, পর পর পঞ্চরাত্রি শৈবের মুখদর্শন করিবে না—যাহারা এই পঞ্চরাত্রিব্রত পালন করে সেই বৈষ্ণবগণ পাঞ্চরাত্র বলিয়া প্রকীর্তিত হয়।[৮], ঐ তন্ত্র ষোড়শ খ্রীষ্টশতকের দ্বিতীয়ার্ধে,—১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দের উপকালে বিরচিত হয়। উহার বহুপূর্বে বিরচিত জয়াখ্যাপৌষ্করাদি প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে ঐ ব্রতের কোন উল্লেখ নাই। অপর কোন গ্রন্থেও উহার উল্লেখ আমরা এপর্যন্ত দেখি নাই। ইহা বলা যাইতে

---

[১] মহাভা, ১২।৩৪৮।৮১·২—৮২·১ [২] শ্রীভাষ্য, রামানুজ-কৃত, ২।২।৪২

[৩] মহাভা, ১২।৩৩৯।১১১·২—১১২ ; পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ। [৪] তিলকের 'গীতারহস্য', বাংলা-ভাষান্তর, ৫৬১ পৃষ্ঠা।

[৫] মহাভা, ১২।৩৪৯।৬৪, ৬৮—৭০ [৬] অহির্বুধ্ন্যসং, ১১শ অধ্যায় ; ১২।২—৩, ৪৯—৫৩ .

[৭] শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, প্রথমাংশ, ৪।৭৫—৮ [৮] শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ১ম খণ্ড (কালীখণ্ড), গায়কবাড় সংস্কৃত সিরিজ, বরোদা, ১৯৩২, ৮।৩

পারে যে উক্ত তন্ত্র মতে পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবমত, বৈখানস, ভাগবত, বীরবৈষ্ণব, প্রভৃতি বৈষ্ণবমত-সমূহ হইতে ভিন্ন।[১]

(৯) এক স্থলে আছে, ব্রহ্মা রাত্রিকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে পঞ্চায়ুধের সমীপে ভগবান্ বিষ্ণুকে পাঁচ প্রকারে পূজা করিয়াছিলেন। সেই হেতু ঐ পদ্ধতি 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হয়।[২]

সংস্কৃত ভাষায় 'রাত্রি' শব্দ সাধারণত 'রজনী',—যাহা দিনের বিপরীত, অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার অপর কোন অর্থ 'অমরকোশে' নাই। 'পাঞ্চরাত্র' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত-মতান্তর উপরে সংগৃহীত হইয়াছে, উহাদের দুইটিতে (৩ ও ৭) 'রাত্রি' শব্দ ঐ সাধারণ অর্থে পরিগৃহীত হইয়াছে, অপরগুলিতে টানিয়া ছিঁড়িয়া উহার অস্বাভাবিক অর্থ বাহির করা হইয়াছে। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ জ্ঞান বলিয়া কল্পনা করা (৪) সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতকে কিম্বা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়কে পঞ্চ রাত্রি মনে করা (২)ও কষ্টকল্পনা হইয়াছে। 'রাত্রিবৎ' অর্থে 'রাত্রি' শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত ভাষা মতে, অসাধারণ হইলেও, হইতে পারে। পরন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে এই যে কল্পনা করা হইয়াছে, অপর পঞ্চ শাস্ত্রকে রাত্রিবৎ করে বলিয়াই, উহার নাম 'পঞ্চরাত্র হইয়াছে, (১, ৬) তাহা অস্বাভাবিক হইয়াছে। অপরের নিকট বা দৃষ্টিতে উহা রাত্রিবৎ বলিয়াই অপরে উহার রাত্রি নাম দিয়াছে, মনে করিলে ঠিক হইত বটে। পরন্তু তখন ঐ নাম নিন্দা-সূচক বা নিকৃষ্টতা-জ্ঞাপক হইত। বোধ হয় সেই কারণে তদনুযায়িগণ ঐ উপপত্তি দেন নাই। আধুনিক লেখকদিগের কেহ কেহও 'পাঞ্চরাত্র' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকারের কল্পনা করিয়াছেন।

'মহাভারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে পঞ্চরাত্র=পঞ্চকাল ; দীক্ষাকাল, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যপূজার কাল এবং প্রতিষ্ঠাকাল—এই পঞ্চকাল ; অথবা পঞ্চযজ্ঞের পঞ্চকাল।[৩]

ডক্টর শ্রেডার মনে করেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রমতানুযায়িগণের স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট পরিকল্পনা হইতে তাঁহাদের ঐ নামকরণ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে পরমেশ্বরের স্বরূপ পঞ্চপ্রকারবিশিষ্ট। যথা, 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ নিজেই বলেন, "বেদান্তপারগগণ আমার (স্বরূপ) পঞ্চপ্রকার বলিয়া বলে। যথা পর, ব্যূহ, বিভব, সর্বদেহিগণের নিয়ন্তা (অর্থাৎ অন্তর্যামী) এবং দয়ালু পুরুষাকৃতি অর্চাবতার। রহস্যবিদ্ ব্যক্তিগণ আমাকে এই প্রকার পঞ্চধা বলিয়া বলে।"[৪] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও আছে, "পঞ্চরাত্র নামক তন্ত্র তাঁহার পর, ব্যূহ, বিভব, প্রভৃতি (পঞ্চ) স্বভাব নিরূপণ (কারক) এবং মোক্ষৈকফল লক্ষণ (যুক্ত)।"[৫] লোকাচার্যের 'তত্ত্বত্রয়ে' এবং বর্বরমুনি-বিরচিত উহার ভাষ্যে ঐ বিষয়ের প্রকৃষ্ট বিবরণ আছে।[৬] শ্রেডার মনে করেন যে পুরুষ নারায়ণ কর্তৃক আবিষ্কৃত

---

[১] ঐ, ৮।৩৮—৪০·১ দেখ।

[২] অত্রিসং, অনুবন্ধ ক, ৪৮০ পৃষ্ঠা।

[৩] মহাভা, ১২।৩৩৬।৪৬ নীলকণ্ঠের টীকা।

[৪] লোকাচার্যের 'তত্ত্বত্রয়ে'র বর্বরমুনি-কৃত ভাষ্যে ধৃত, ১০১—২ পৃষ্ঠা

[৫] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' ১১।৬৪

[৬] 'তত্ত্বত্রয়', ১০১—২ পৃষ্ঠা

"পুরুষমেধ পঞ্চরাত্রক্রতু"র [১] সহিত পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে পঞ্চরাত্রমতের ঐ পরিকল্পনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে,—পঞ্চরাত্রসত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিলে ঈশ্বরের স্বরূপ পরব্যূহাদি পঞ্চপ্রকার বলিয়া জানা যায়। তাহা হইতে, তিনি বলেন, ঐ মতানুযায়িগণ 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[২] 'শতপথব্রাহ্মণে' পুরুষ নারায়ণের পঞ্চরাত্র-ক্রতুর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই নাই। কি প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা উহা পরব্যূহাদি পঞ্চধা বলিয়া শ্রেডার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা তিনি নির্দেশ করেন নাই। পুরুষ নারায়ণের সময়ে অর্চা বা প্রতিমা পূজা বৈদিক সমাজে ছিল না, মনে হয়।[৩] সেই হেতু তিনি অর্চাকে পরমেশ্বরের এক রূপ মনে করিতেন, বলা যায় না। সুতরাং পঞ্চরাত্র নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রেডারের ঐ অনুমান গ্রাহ্য নহে। ঐ পুরুষ নারায়ণ বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে'র দ্রষ্টা। শ্রেডার তাহা মানেন। আমরাও মানি। 'মুদগলোপনিষদে'র [৪] এবং 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র [৫] মতে, উহার প্রথম চারি মন্ত্রে বাসুদেবাদি চারি ব্যূহের বিবৃতি আছে। তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, এইমাত্র জানা যায় যে পুরুষসূক্তের সহিত পঞ্চরাত্রমতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উহার দ্রষ্টার পুরুষমেধ পঞ্চরাত্রক্রতুর সঙ্গেও পঞ্চরাত্রমতের এক সময়ে সম্বন্ধ ছিল মনে করা যাইতে পারে। পরন্তু পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে ঐ পঞ্চরাত্রক্রতুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাতে বলিতে হয় যে ঐ সম্বন্ধ বহুদিন পূর্বে ছিন্ন হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও ঐ সম্বন্ধ মূলে উৎপন্ন 'পঞ্চরাত্র' নাম রহিয়া গিয়াছে মনে করা যাইতে পারে। এতাবৎ মাত্র বলিলে শ্রেডারের অনুমান সমীচীন মনে করা যাইতে পারিত। পরন্তু ঐ পঞ্চরাত্রক্রতুতে পরব্যূহাদি পরিকল্পনার সন্ধান নিরূপণ করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। অধিকন্তু পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রথম হইতে পঞ্চপ্রকারবাদী কিনা সন্দেহ।[৬]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা একটা অভিনব মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৭] উহা অতি কৌশলে উদ্ভাবিত। মহাভারতপুরাণাদিতে বিবৃত আছে [৮] যে প্রলয়ের পরে ভগবান্ হরি যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ভাবী সৃষ্টির কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রলয়-সলিলে শায়িত ছিলেন। তখন তাঁহার নাভি হইতে সমুদ্ভূত কমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ঐ ব্রহ্মা বা পরমেষ্ঠী "সত্ত্বস্থ" হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন। তিনি প্রথমে বেদসৃষ্টি করেন। তখন তম ও রজগুণ হইতে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় উদ্ভূত হইয়া বেদ অপহরণ করেন। তাহাতে পরম দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বেদ উদ্ধার করত ব্রহ্মাকে প্রত্যর্পণ করেন এবং ঐ দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। উক্ত মতবাদ অনুসারে বেদ পাঁচ দিন-রাত্র দৈত্যদের হাতে

---

[১] শতব্রা (মাধ্য,) ১৩।৬।১।১—দেখ।

[২] Schrader, Intrduction to the Pancaratra, ২৫—৬ পৃষ্ঠা।

[৩] পরে……পৃষ্ঠা দেখ।

[৪] 'মুদগলোপনিষৎ', ২—৪

[৫] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', ৫।২—৩৯

[৬] পরে দেখ

[৭] Hindusthan Review, Jan. 1924, p- 219 ; Radhakrishnon, Indian Philosophy, Vol. 1, p. 715

[৮] মহাভা, ১২।৩৪৭-১৭ (বিস্তারিত বিবরণ পরে দেখ) ; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।৯।৩২—৭

ছিল এবং ঐ সময়ে মনুষ্যগণের ধর্মপিপাসা মিঠাইবার জন্য বিষ্ণু এক নূতন মত প্রবর্তিত করেন, যাহা পরে পাঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইতে থাকে। এই মতবাদ সম্পূর্ণত কপোল-কল্পিত মাত্র বলিতে হইবে। কেননা, অপহৃত বেদ দৈত্যের নিকট পাঁচ রাত্রি ছিল বলিয়া মহাভারতপুরাণাদিতে উল্লিখিত হয় নাই। অধিকন্তু তাহা ধরিয়া লইলেও, ঐ ঘটনা বিশ্ব-প্রপঞ্চের, সুতরাং মনুষ্যের, সৃষ্টির পূর্বের। যেইহেতু তখন মনুষ্যই ছিল না, সেইহেতু মনুষ্যের ধর্মপিপাসা মিটাইতে নূতন ধর্মমত প্রবর্তিত হওয়ার কথাই হইতে পারে না।

শ্রুতিতে 'দ্বাদশাহ' নামে একটা সত্রের উল্লেখ আছে। ভগবান বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'ও উহার উল্লেখ আছে। দ্বাদশ অহ বা দিনে উহা সম্পন্ন হইত বলিয়া উহাকে 'দ্বাদশাহ' বলা হইত। পতঞ্জলির ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম ভাগকে 'নবাহ্নিক' বলা হয়। কেননা, উহা নয় (=নব) দিনে (=অহ্নি) রচিত হইয়াছিল। 'শতপথব্রাহ্মণো'ক্ত পুরুষ নারায়ণের পুরুষমেধ-যজ্ঞকে 'পঞ্চরাত্র-ক্রতু' বলা হইত। কেননা, উহা পাঁচ দিনে বা অহোরাত্রে সম্পন্ন হইত। কবি ভাসের (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) এক নাটিকার নাম 'পঞ্চরাত্র'। কেননা, পাঁচ (=পঞ্চ) অহোরাত্রের এক ঘটনা অবলম্বনে উহা বিরচিত। এই সকল প্রাচীন দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয় পাঁচ দিনের বা রাত্রির বা অহোরাত্রের ঘটনার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু ঐ শাস্ত্র 'পঞ্চরাত্রশাস্ত্র' এবং তত্রোক্ত ধর্ম 'পঞ্চরাত্রধর্ম' নামে প্রখ্যাত হয়। এখন প্রশ্ন, পঞ্চরাত্রির সেই ঘটনা কি? 'ঈশ্বরবিহগেন্দ্রাদি' কতিপয় সংহিতার মতে এই ধর্মের মূলতত্ত্বের উপদেশ ভগবান্ বাসুদেব পাঁচ ব্যক্তিকে, দেবতাকে বা ঋষিকে, পাঁচরাত্রিতে করিয়াছিলেন, সেইহেতু উহা 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ দৃষ্টে এই ব্যাখ্যা স্বাভাবিক হইয়াছে মনে হয়। মূল শাস্ত্রে এক এক রাত্রির উপদেশ পৃথক্ পৃথক্ নিবদ্ধ ছিল বোধ হয় এবং উপদিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে তত্তৎ-রাত্রি নামে কথিত হইত বোধ হয়, যেমন বর্তমানে 'মহাসনৎকুমারসংহিতা'য় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং মূলশাস্ত্রে সম্ভবত সর্বসমেত পাঁচ 'রাত্রি' ছিল। সেই হেতুতেও উহার নাম 'পঞ্চরাত্র' হইয়া থাকিবে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ প্রকারে নাম করণের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা, মহর্ষি পানিনি-বিরচিত মহাব্যাকরণ, অষ্ট-অধ্যায়-সম্পন্ন বলিয়া, 'অষ্টাধ্যায়ী' নামে কথিত হয়; এবং ঠিক সেই কারণে পূর্বমীমাংসাসূত্র 'দ্বাদশাধ্যায়ী' বা 'দ্বাদশ-লক্ষণ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অথবা, ইহাও হইতে পারে যে আদিতে এই ধর্মের মুখ্য অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পাঁচ রাত্রি সময় লাগিত এবং সেই হেতু উহা 'পঞ্চরাত্রধর্ম' নামে খ্যাত হয়। ঠিক ঐ কারণেই প্রাচীনকালে পুরুষ নারায়ণের উদ্ভাবিত পুরুষমেধ-যজ্ঞ 'পঞ্চরাত্র-ক্রতু' নামে প্রসিদ্ধ হয়।[১] 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' ঐ প্রকারে এক পঞ্চরাত্রিব্রত সম্পর্কেই শাস্ত্রের নাম 'পঞ্চরাত্র' হইয়াছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রে নিরন্তর পাঁচ রাত্রি ধরিয়া শেষশায়ী ভগবান্ বাসুদেবের জাগরণের উৎসব করিবার বিধান আছে।[২] ঐ পঞ্চরাত্রি

---

[১] 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে' ত্রিবিধ পাঞ্চরাত্র যজ্ঞের বিবরণ ও মাহাত্ম্য আছে,—অভ্যাসাঙ্গ পঞ্চরাত্র, পঞ্চশারদীয়াখ্য পঞ্চরাত্র এবং মহাব্রতান্তর্গত পঞ্চরাত্র। তাহাতে পঞ্চরাত্রের ভিন্ন ভিন্ন গণনা আছে। (২১।১৩—খণ্ড) পঞ্চশারদীয়াখ্য পঞ্চরাত্রের বিধি 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'ও (২।৭।১০—১ অনুবাক) পাওয়া যায়।

[২] যথা, 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে আছে, (পর পৃষ্ঠা পাদটীকা দেখ।)

'ভীষ্মপঞ্চরাত্রি' নামে অভিহিত হইত।[১] সুপ্রসিদ্ধ পার্শী পর্যটক আল্‌বীরূনী উহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরিচয় দিয়াছেন।[২] সুতরাং ঐ উৎসব অতি বিশেষত্বযুক্ত ও প্রসিদ্ধ ছিল। তৎসম্পর্কে 'পঞ্চরাত্রি' খ্যাতি হইয়াছে কিনা বিবেচ্য।

'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে "(সৃষ্টির পূর্বে) একমাত্র প্রজাপতিই ছিলেন, (অপর কিছুই ছিল না)। ইহা (অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) প্রজাপতিই ছিল। তিনি কামনা করিলেন, 'বহু হইব,—প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব। তিনি এই অতিরাত্র (=গবাময়নের আদ্য অতিরাত্র) দর্শন করিলেন; উহাকে আহরণ (অর্থাৎ অনুষ্ঠান) করিলেন। তদ্দ্বারা অহ এবং রাত্রি উৎপাদন করিলেন।"[৩] অর্থাৎ অহোরাত্রপ্রমুখ সমস্ত জগৎ যজ্ঞরূপ সাধন দ্বারাই প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। ঐ অতিরাত্রের প্রশংসায় কথিত হইয়াছে যে "যদ্রাত্রিঃ সর্বস্যাপ্ত্যৈ" ('যাহা রাত্রি তাহা সর্বের অর্থাৎ সম্পূর্ণ যজ্ঞের প্রাপ্ত্যর্থ হয়')।[৪] সায়ন বলেন, ঐখানে 'রাত্রি' শব্দ দ্বারা সন্ধি, স্তোত্র ও শস্ত্র—যজ্ঞের এই তিন পর্যায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৫] এইরূপে দেখা যায়, প্রাচীনকালে যজ্ঞের অঙ্গসমূহকে 'রাত্রি' শব্দেও নির্দেশ করা হইত। যদি প্রত্যেক অঙ্গকেও 'রাত্রি' বলা যায়, তবে যে যজ্ঞের মুখ্য অঙ্গের সংখ্যা পাঁচ, উহাকে 'পঞ্চরাত্র যজ্ঞ' বলিতে হইবে। প্রাচীন ভাগবতধর্মের মুখ্য অঙ্গ অভিগমনাদি পাঁচ। সেই হেতু উহাকে ঐ প্রকারে পঞ্চরাত্রধর্ম আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, বলা যায়।

ঋগ্বেদে 'রাত্রি' নামে একজন দেবতার উল্লেখ আছে। উহার ১০ম মণ্ডলের ১২৭তম সূক্তে ঐ দেবতার স্তুতি আছে এবং সেই হেতু উহা তাঁহার নামে 'রাত্রিসূক্ত' বলিয়া খ্যাত। উহার দ্রষ্টা সৌভরি ঋষির পুত্র কুশিক ঋষি, কিম্বা ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা রাত্রি ঋষি। উহাতে সর্ব-সমেত ৮ মন্ত্র আছে। ৪ মন্ত্রে ঋষি রাত্রিদেবতার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

"রাত্রি দেবী আয়তী অক্ষিসমূহ দ্বারা পুরুত্র (অর্থাৎ সর্বত্র) বিশেষরূপে দেখেন। সমস্ত শ্রীসমূহ অধিধারণ করেন॥১॥" অর্থাৎ রাত্রিদেবী সর্বদৃক্ এবং সর্বশ্রীসম্পন্ন।

"অমর্ত্যা রাত্রি (দেবী) উচ্চ এবং নীচ বস্তুসমূহকে (অর্থাৎ সর্ববস্তুকে) উরু (=সর্বত্র) আপূরিত করেন। জ্যোতি দ্বারা তমকে বাধিত করেন॥২॥" অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং তমো-নাশক।

"আয়তী দেবী (রাত্রি) স্বসা উষাকে নিবর্তিত করেন। (তাঁহা হইতে) তম নিশ্চয় অপগত হয়॥৩॥" অর্থাৎ তাঁহার নিকট তম থাকিতে পারে না,—তিনি তমের পর পারে।

"গ্রাম্যগণ (অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যগণ), পাদযুক্তগণ (অর্থাৎ চতুষ্পাদ পশুগণ), পক্ষিগণ এবং

"ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্যঙ্কে বুধ্যমানে সনাতনে॥
অত্রোৎসবং প্রকুর্বীত পঞ্চরাত্রং নিরন্তরম্।" (১০।২৪৪'২—২৪৫'১)

১) ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে আরও আছে। যথা, নবরাত্র শিবরাত্রি। দীপাবলীতে বৌদ্ধজাতকে 'যক্ষরাত্রি' বলা হইয়াছে।

২) Alberuni's India, Eng. trans. by E. Sachau, ২য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা

৩) তাণ্ড্যমহাব্রা, ৪।১।৪ ৪) ঐ, ৪।১।৬

৫) "অত্র রাত্রিশব্দেন ত্রয়ঃ পর্যায়াঃ সন্ধিঃ স্তোত্রং তচ্ছস্ত্রাণি চ লক্ষ্যন্তে। রাত্রির্ভবতীতি যত্তৎ সর্বেষাং স্তুতশস্ত্রাণাং পরিগৃহীতত্বাৎ সর্বস্য সম্পূর্ণস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্তেঃ ভবতি।" (সায়ন)

শীঘ্রগামী শ্যেনাদিও (অর্থাৎ সর্বজীব) তাঁহাতে শয়ন করে ॥৫॥" সায়ন বলেন, ইহার তাৎপর্য এই যে "এষা রাত্রিঃ সর্বাণি ভূতজাতানি অহানি সঞ্চারেণ শ্রান্তানি স্বয়মাগত্য সুখয়তি" অর্থাৎ রাত্রি সর্বাশ্রয়, সর্বশান্তিকর এবং সর্বসুখদাত্রী।

অপর চারি মন্ত্রে ঋষি রাত্রি দেবতার স্তুতি এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যেমন পক্ষিসমূহ (রাত্রিতে) বৃক্ষে নিবাস করে, তেমন যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আমরা (সুখে ও শান্তিতে) নিবাস করিব, তিনি অদ্য আমাদের প্রতি (প্রসন্ন হউন) ॥৪॥

"হে রাত্রি ! (আমাদিগকে হিংসাকারী) বৃক ও বৃকীকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ কর। তস্করকেও আমাদের হইতে পৃথক্ কর। অনন্তর আমাদিগকে সুখে বা উত্তমরূপে তারণকারী ("সুতরা") হও ॥৬॥

"সর্ববস্তুতে সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণ (বর্ণ) তম,—যাহা ব্যক্ত (বিশেষরূপে সকলেরই অঞ্জক, কিম্বা প্রত্যক্ষ), তাহা যেন আমার নিকটে স্থিত না থাকে। হে উষা ! তুমি ঋণসমূহের ন্যায় (সেই তমকে) অপসৃত কর ॥৭॥

হে রাত্রি ! আমি (স্তুতি দ্বারা) তোমাকে গাভীর ন্যায় সর্বত্র হইতে আমার অভিমুখী করিতেছি। হে দিবের দুহিতা ! (তোমার প্রসাদে) আমি বিজয়লাভ করিব। তুমি আমার স্তুতি বরণ কর ॥৮॥"

রাত্রিদেবতার উপাসনা 'সামবিধানব্রাহ্মণে'ও আছে।[১] তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে ঐ রাত্রিদেবতা "পুনর্ভূ (=পুনঃ পুনঃ ভবিত্রী), ময়োভূ (=ময়ের বা সুখের ভাবয়িত্রী), কন্যা (=কমনীয়া), শিখণ্ডিনী (=সুকেশা), পাশহস্তা, যুবতী এবং কুমারী।" 'আমার পুনর্জন্ম না হউক'—যে ব্যক্তি এই কামনা করে, সে রাত্রিদেবতার উপাসনা করিবেক,—"রাত্রির ব্রত" অনুষ্ঠান করিবেক। "রাত্রিং প্রপদ্যে" ('আমি রাত্রিদেবতার শরণ গ্রহণ করি')। অনন্তর সে প্রার্থনা করিবে যে (উঁহার প্রসাদে) তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের অভিমানী দেবতাগণ তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের সমুৎকর্ষ বিধান করুক। অর্থাৎ সে যেন জ্ঞানবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া রাত্রিদেবতা ইহপরলোকে নানা প্রকার সিদ্ধি প্রদান করিতে চাহিবেন। পরন্তু তৎসমস্তই প্রত্যাখ্যান করত উপাসক এই প্রার্থনা করিবে যে "হে রাত্রি ! আমাকে পবিত্র কর। হে রাত্রি ! এই যে পুষ্পান্ত এবং পুরাতন খ বা আকাশ (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) তাহাতে আমার স্থান করুন, যাহাতে আমার পুনর্ভব বা পুনর্জন্ম না হয়।" এই বচনের "পুষ্পান্ত" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। সায়ন বলেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চই 'পুষ্প' ; তাহাতে যাহার 'অন্ত' বা অবসান হয় তাহাই 'পুষ্পান্ত' অর্থাৎ "জগদাকারে পর্যবসন্ন", সুতরাং 'পুষ্পান্ত খ' অর্থ সর্বাত্মক ব্রহ্ম,—"সর্বাত্মকব্রহ্মস্বরূপা রাত্রি।"[২] আমাদের মনে

---

[১] সামবিধানব্রা, ৩।৮

[২] "এতদ্দৃশ্যমানং জগদেব পুষ্পং তস্মিন্নন্তঃ অবসানং যস্য, তদেতৎ পুষ্পান্তম্। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি শ্রুতের্জগদাকারেণ পর্যবসন্নমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্বাত্মকব্রহ্মস্বরূপা রাত্রিঃ" (ঐ, সায়ন-ভাষ্য)

হয় জগদ্রূপ পুষ্পের যাহাতে অন্ত বা বিনাশ হয়, সেই আকাশে বা ব্রহ্মে অর্থাৎ সর্বপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মেই স্থিতি উপাসক প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাসুদেবও রাত্রিদেবতার ন্যায় সর্বদৃক্, সর্বব্যাপী ও সর্বাশ্রয় বা "সর্বভূতাধিবাস"। তিনিও সর্বশ্রীসম্পন্ন বা ভগবান্। তিনি সর্বশান্তিকর, সর্বসুখদাতা এবং সকলের ত্রাণ-কর্তা। তিনি স্বয়ং তমের পরপারে অবস্থিত, সুতরাং সকলকে আপনাতে মিলাইয়া লইয়া তমের পরপারে লইয়া যান। এই সকল বিবেচনায় বাসুদেবকেও 'রাত্রি' বলা যায়, রাত্রিদেবতার ন্যায় জ্ঞানও তমোনাশক,—তম তাহার নিকটে থাকিতে পারে না। রাত্রিদেবতার ন্যায় জ্ঞানও জীবের তারণকারী বা মুক্তি-দাতা। 'ব্রহ্মপুরাণে' 'নারদপাঞ্চরাত্রে' যে জ্ঞানকে 'রাত্রি' বলা হইয়াছে তাহা এই বৈদিক দৃষ্টিতে কিনা বলা যায় না। তবে, যেমন আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 'রাত্রি' শব্দের ঐ প্রকার প্রয়োগ, আমরা যতদূর জানি, সংস্কৃত বাঙ্ময়ে অপর কোথাও পাওয়া যায় না।[১]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বাসুদেবকে বস্তুতই রাত্রি বলা হইয়াছে। পরন্তু তথায় উহার ভিন্ন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। পৌরাণিক সৃষ্টিবাদমতে প্রলয়ে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ স্রষ্টা পরমেশ্বরে লয় পায়। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় তাঁহাকে বিশেষভাবে "বাসুদেব" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে প্রলয়ে সমস্ত জগৎ ক্রমে ক্রমে বাসুদেবে লয় পায়।[২] "হে মুনি! তখন অসৎ নিশ্চয় ছিল না। তখন সৎও ছিল না। ভাব ও অভাব উভয়কে,—বিচিত্র বিভব ও উদয়কে অপনার মধ্যে বিলোপ করত, অনির্দেশ্য পরব্রহ্ম বাসুদেবই (তখন) অবস্থিত ছিলেন। তিনিই রাত্রি, তিনিই পরব্রহ্ম এবং তিনিই অব্যক্ত বলিয়া উদাহৃত। যেহেতু বিজ্ঞানবলাদি ছয় (গুণের) তিন যুক্ (অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) তাঁহাতে অশেষত প্রলীন হয়, সেই হেতু তাঁহাকে রাত্রি বলা হয়" ইত্যাদি।[৩] অন্যত্র আছে, "সংহৃতাখিলভূত ব্রহ্মের যে স্তৈমিত্য, তাহাই অপ্যয় এবং তাহাই মহারাত্রি। তাহা সঙ্কল্পের দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে।"[৪] ঐ মহারাত্রি পর বাসুদেবই। কেননা, অনন্তর সৃষ্টিকে রাত্রির পরে সূর্যের উদয় বশত দিনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে, বাসুদেব 'উষাচক্র', সঙ্কর্ষণ 'উদয়চক্র' ইত্যাদি।[৫]

---

১) 'নিঘণ্টু'তে 'রাত্রি'র ২৩ নাম আছে। (১।৭) উহার একটি 'বসু'। 'জ্ঞান' নাম উহাতে নাই। যাস্ক 'রাত্রি' শব্দের একাধিক অর্থ দিয়াছেন,—"রাত্রি কস্মাৎ। প্ররময়তি ভূতানি নক্তঞ্চারীণি। উপরময়তীতরাণি ধ্রুবীকরোতি। রাতের্বা স্যাদ্দানকর্মণঃ। প্রদীয়ন্তেঽস্যামবশ্যায়াঃ" (২।১৮)

২) 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', ৪।৫৯ ৬৮.১

৩) ঐ, ৪।৬৮.২ ৭২.১

"অনির্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবোঽবতিষ্ঠতে ॥৬৯
সা রাত্রিস্তৎ পরং ব্রহ্ম তদব্যক্তমুদাহৃতম্।
যস্মাৎ যুগানি বিজ্ঞানবলাদীনামশেষতঃ ॥৭০॥
ত্রীণি যস্মিন্ প্রলীয়ন্তে যত্তৎ সা রাত্রিরুচ্যতে।"

৪) ঐ, ৮।৩৮ ৫) ঐ, ৮।৪০

মহারাত্রি = পর বাসুদেব
| |
উষা = ব্যূহবাসুদেব
| |
উদয় = সঙ্কর্ষণ

শক্তির স্তিমিত অবস্থা প্রলয় এবং উন্মেষ অবস্থায় সৃষ্টি। 'মাণ্ডুক্যোপনিষদে' আছে যে আত্মার চারি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় বা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়; এবং অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা—ওঙ্কারের এই চারি মাত্রার সঙ্গে উহাদের সাম্য করা হইয়াছে,—অকার বিশ্ব, উকার তৈজস, মকার প্রাজ্ঞ এবং অর্দ্ধ মাত্রা তুরীয়। সমষ্টি দৃষ্টিতে অকার বিরাট্, উকার হিরণ্যগর্ভ, মকার সূত্রাত্মা এবং অর্দ্ধমাত্রা তূরীয় পরমাত্মা। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় শক্তির উন্মেষের সঙ্গে এবং ব্যূহবাদের সঙ্গে উহাদের সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ভগবানের একই পূর্ণ শক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কারিণী তিন শক্তি-রূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। উহারা অকারাদি অক্ষরত্রয় বা বিশ্বাদিদশাত্রয় রূপিণী।[১] উহাদিগকে যথাক্রমে অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণ শক্তিত্রয় বলিয়া মনে করিতে হইবে।[২] অর্দ্ধ মাত্রাকে "বাসুদেবময়ী শক্তি বলিয়া জান।"[৩] উক্ত শক্তিচতুষ্টয়ের বিলয় হইলে ভগবচ্ছক্তি অখণ্ড, অনুচ্চার্য, নিরঞ্জন ও স্তিমিত রূপে থাকে। উহা শক্তির পঞ্চমী দশা। 'শক্তিসমূহের সর্বগ্রাসী ও দিব্য পঞ্চমী দশা সৎও নহে, অসৎও নহে; উহা যেন কিছুই নহে (ন কিঞ্চিদিব) বলিয়া আভাত হয়।[৪] ঐ সনাতনী পরা শক্তিকে লক্ষ্মী, গৌরী, সরস্বতী, ইত্যাদি বলা যায়।[৫] শক্তির পাঁচ দশা অনুসারে শক্তিমানেরও অবশ্যই পাঁচ দশা। ঐ শাস্ত্রে শক্তিমান্ বিশেষভাবে বাসুদেব, নারায়ণ বা বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বাসুদেবের পাঁচ দশা—তুরীয়াতীত, তুরীয়, প্রাজ্ঞ, তৈজস্ ও বিশ্ব।[৬] ঐ পাঁচ দশায় বাসুদেবকে যথাক্রমে পরবাসুদেব, ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ সমাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। পর ও ব্যূহের ন্যায় সঙ্কর্ষণাদিত্রয়ও বাসুদেবের রূপ বা অবস্থা ভেদ বলিয়া বস্তুত বাসুদেবই।[৭] তাই অনিরুদ্ধকে কখন কখন স্পষ্টতই নারায়ণ ও বিষ্ণু বলা হইয়াছে।[৮] পুরাণের মতে বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন কমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। আর, সাত্বতশাস্ত্র মতে অনিরুদ্ধের নাভি হইতে উৎপন্ন কমলে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টি করেন।[৯] সুতরাং সাত্বতশাস্ত্রের অনিরুদ্ধ = পুরাণের বিষ্ণু। বাসুদের 'রাত্রি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পরাদি অনিরুদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই 'রাত্রি' বলা যায়। ব্রহ্মা হইতেই ব্যক্ত সৃষ্টি। সুতরাং তৎপূর্বের অনিরুদ্ধ হইতে পর পর্যন্ত সকলই অব্যক্ত।

---

১) ঐ, ৫১।২১—২৩·১ ২) ঐ, ৫১।৩১·২—৩২·১
৩) ঐ, ৫১।৩২·২—৩৩·১ ৪) ঐ, ৫১।৩৫·২—৩৬·১ ৫) ঐ, ৫১।৩৭— ; আরও দেখ, ৩।৭—

৬) দেখ 'তত্ত্বত্রয়', ১১০—১ পৃষ্ঠা। 'ঈশ্বরসংহিতা'য় (২০।১৯৬—৯·১) বিবৃত হইয়াছে যে, 'সাত্বততন্ত্রে' পাঁচ ব্যূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—শান্ততর, শান্তোদিত, সুষুপ্তি, স্বপ্নও ব্যূহ। (আরও দেখ—২১।৫৭১)

৭) "বিষ্ণোঃ সঙ্কর্ষণাখ্যস্য বিজ্ঞানবলশালিনঃ" (ঈশ্বরসং, ৮।৩·২)

৮) যথা, দেখ, মহাভা, ৬।৬৫।৭১ ; ৬৭।১১ ;

৯) মহাভা, ৬।৬৫।৭০-১ ; ৬৭।১১-২ ; ১২।৩৩৯।৭৪— ; ১২।৩৪৭।২২— ;

তাই, 'নারায়ণীয়াখ্যানে' উক্ত হইয়াছে, অনিরুদ্ধকে 'প্রধান'ও বলা হয় এবং তিনিই অব্যক্ত ও ত্রিগুণ।[১] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র পূর্বোক্ত বচনে বাসুদেবকেও অব্যক্ত বলা হইয়াছে। উহার অন্যত্রও আছে যে সর্বপ্রকৃতি এবং অব্যক্ত ও বাসুদেবের পর্যায়-নাম।[২] ব্যক্তসৃষ্টি দিনবৎ এবং অব্যক্ত রাত্রিবৎ বলিয়া পরবাসুদেব হইতে অনিরুদ্ধ পর্যন্ত পঞ্চ অব্যক্তকে, অথবা, খুব ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, অব্যক্ত বা বাসুদেবের পঞ্চ অবস্থাকে, পঞ্চরাত্রি বলা যায়। পঞ্চ বাসুদেব বা পঞ্চরাত্রি যে ধর্মের পরমতত্ত্ব বিষয়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত, তাহাকে স্বভাবতই পঞ্চরাত্র বলা যায়।

'পঞ্চরাত্র' আখ্যার উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, ইহা প্রায় সত্য মনে হয় যে ঐ আখ্যা পরে হইয়াছে। 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে,

"মহোপনিষদাখ্যস্য শাস্ত্রস্যাস্য মহামতে॥
পঞ্চরাত্রসমাখ্যাসৌ কথং লোকে প্রবর্ততে।"[৩]

'হে মহামতি! মহোপনিষৎ নামক এই শাস্ত্রের ঐ 'পঞ্চরাত্র' সমাখ্যা লোকে কি প্রকারে প্রবর্তিত হইল?' এই প্রশ্নের ধরণ হইতে সহজে মনে হয় যে এই শাস্ত্র প্রথমে 'মহোপনিষৎ' নামে অভিহিত হইত, পরে 'পঞ্চরাত্র' নামেও অভিহিত হইতে লাগিল। নারায়ণীয়াখ্যানে তাহা সাক্ষাদ্ভাবে উক্ত হইয়াছে, "ইদং মহোপনিষদং···পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্" (পঞ্চরাত্র নামে পরে অভিহিত এই মহোপনিষৎ)।[৪] 'পাঞ্চরাত্র আখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরসংহিতাদিতে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতেও উহা সিদ্ধ হয়। কথিত হইয়াছে যে যাহা 'রহস্যাম্নায়' নামে অভিহিত হইত সেই আদ্য একায়ন বেদই পরে 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হইতে থাকে।[৪]

এই প্রসঙ্গে আর একটা বলা যাইতে পারে। তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে পঞ্চ সংখ্যার কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল বোধ হয়। কেননা, দেখা যায়, তন্মতে, (১) ঈশ্বরের স্বরূপ পঞ্চ প্রকাব (ক) পরবাসুদেব, ব্যূহবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; শান্ততর, শান্তোদিত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রদ্ব্যূহ অথবা, (খ) প্রকারান্তরে পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা। 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় আছে, "মম প্রকারাঃ পঞ্চেতি প্রাহুর্বেদান্তপারগাঃ" ('বেদান্তপারগগণ আমার প্রকারসমূহ পাঁচ বলিয়া কহিয়া থাকেন'), "ইত্যেবং পঞ্চধা প্রাহুর্মাং রহস্যবিদো জনাঃ" ('রহস্যবিদ্ব্যক্তিগণ আমাকে এই প্রকারে (পরব্যূহাদি) পঞ্চধা বলিয়া থাকেন)।[৫] (২) ঈশ্বরের শক্তি সুদর্শন বা লক্ষ্মীর পাঁচ দশা। কিঞ্চিৎ পূর্বে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' হইতে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৩) সুদর্শন বা লক্ষ্মী পাঁচ প্রকারের ক্রিয়া করেন—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, নিগ্রহ (বা তিরোধান) এবং অনুগ্রহ। এই সকল 'পঞ্চকৃত্য' নামে খ্যাত। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় উক্ত হইয়ছে যে সুদর্শন নামে বিষ্ণু-সঙ্কল্প অনন্তরূপ হইলেও "পঞ্চধা স বিজৃম্ভতে"।[৬] (৪) কথিত হয় যে

---

১) "সোহনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তস্তৎপ্রধানং প্রচক্ষতে।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং ত্রিগুণং নৃপসত্তম॥" (মহাভা, ১২।৩৪৭।১৮) আরও দেখ ১২।৩৩৯।৩৯

২) 'অহির্বুধ্ন্যসং', ২।২৯

৩) 'পাদ্মসং', ১।১৬৮·২—৬৯·১

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।১১১·২—১১২

৪·১) পূর্বে ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

৫) 'তত্ত্বত্রয়ে' ধৃত, ১০১—২ পৃষ্ঠা

৬) 'অহির্বুধ্ন্যসং', ১৪।১৪·২

তত্ত্বজ্ঞানলাভ দ্বারা উচ্চতম জীবন লাভ করিতে পাঁচ পদার্থের জ্ঞানলাভ সংসারী মনুষ্যগণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঐ পাঁচ পদার্থ 'অর্থপঞ্চক' নামে খ্যাত। উহারা এই—(৫) স্বস্বরূপ (= আত্মস্বরূপ বা জীবাত্মস্বরূপ), (খ) পর-স্বরূপ (=ঈশ্বর-স্বরূপ), (গ) পুরুষার্থ-স্বরূপ, (ঘ) উপায় স্বরূপ এবং (ঙ) বিরোধী-স্বরূপ (বা প্রতি বন্ধকসমূহের স্বরূপ)। উহাদের প্রত্যেকের আবার পাঁচ প্রকার ভেদ। (৫) তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুর দীক্ষা-সংস্কার পাঁচ এবং উপাসনা-কালও পাঁচ। তাই তান্ত্রিক বৈষ্ণব 'তাপাদি' পঞ্চসংস্কারী, 'পঞ্চকালজ্ঞ' বা পঞ্চকালবিৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (৬) অগ্নি, গুরু, মন্ত্র, শাস্ত্র ও শাস্ত্রাধিকারী—এই পঞ্চকের নিয়ত ভক্তি এবং যথাবৎ পরিপালন কর্তব্য।[১]

'সাত্বত' নামের উপপত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে ভিন্ন ভিন্ন কল্পে একান্তধর্মের আচার্য্যপরম্পরার এবং উত্থান ও পতনের কথা বর্ণনার[২] পর বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলেন, "হে রাজন! এই প্রকারে এই মহান ধর্ম আদ্য এবং সনাতন। (উহা অপরের দ্বারা) দুর্বিজ্ঞেয় এবং দুষ্কর (হইলেও) সাত্বতগণ দ্বারা সদা ধৃত হইয়া থাকে ('সাত্বতৈর্ধার্য্যতে সদা)।"[৩] যে হেতু একান্তধর্ম বিশেষভাবে সাত্বতগণ কর্তৃক সর্বদা ধৃত হইয়া থাকে, সেই হেতুই উহা সাত্বতধর্ম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে বোধ হয়। অন্তত তাহা অতি স্বাভাবিকই। পরন্তু ঐ সাত্বতগণ কাহারা? ঐস্থলে বৈশম্পায়ন ঐ নামে কাহাদের লক্ষ্য করিয়াছেন? ভগবান কৃষ্ণ যেই জাতিতে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জাতি, জনৈক পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে,—উহার বংশ বলিয়া, 'সাত্বত-জাতি' এবং সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি 'সাত্বত' নামে খ্যাত হয়।[৪] গ্রীয়ার্সন, ভাণ্ডারকর, তিলক প্রভৃতি আধুনিক কালের কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখক মনে করেন যে ঐ সাত্বত জাতির মধ্যে প্রচলিত

---

[১] ঈশ্বরসং, ২২(৬২·২—৬৩.১

[২] পরে……পৃষ্ঠা দেখ। [৩] মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৫

[৪] "সত্বতস্তু সুতো রাজা ভীমো নাম মহানভূৎ।
যেন ভৈমাঃ সুসংবৃত্তাঃ সত্বতাৎ সাত্বতাঃ স্মৃতাঃ ॥" —('হরিবংশ' ২।৩৮।৩৮)।

সত্বতের অপত্য পুংলিঙ্গে 'সাত্বত'; স্বত্বত+অঞ=সাত্বত; স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করিয়া 'সাত্বতী'। উহার দৃষ্টান্ত—'মহাভারতে' সত্বতবংশীয় কৃষ্ণ (১।২২০।১৩; ২২৫।১·১; ৫।৭০।৫·২; ১২।৩৩৯।১০৪·২, ইত্যাদি), কৃতবর্মা (১।২২৩।৩১·১; ৬।৫৬।৩·২; ৮১।২·১, ইত্যাদি), সাত্যকি (৫।১৯।১; ৬।৫৯।৮৪·২, ৮৫·২; ১০৬।১৩·২ ইত্যাদি), প্রভৃতিকে 'সাত্বত' বলা হইয়াছে; কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে 'সাত্বতী' (১।২২৩।৬৮·১; ৭।৩৯।২০) ও 'সাত্বতাত্মজা' (১।২২৩।১৭·১) এবং তাঁহার পিসীমা ও শিশুপালের মাকে 'সাত্বতী' (২।৪৫।৭; ১৫।১১।৪৬) বলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির (১২।৪৩।৪·১) এবং ভীষ্ম (১২।৪৭।২৭) কৃত কৃষ্ণস্তবে কৃষ্ণকে "সাত্বতাং পতি" ('সাত্বতগণের পতিঃ') বলা হইয়াছে। তাঁহাকে "ঋষভং সর্বসাত্বতাং" (মহাভা, ৫।৯৪।৫·১, ৩১·১; আরও দেখ—৫।৭২।১), "পুরোগঃ সর্বসাত্বতাম্" (ঐ, ৫।৮৬। ২·১); "সাত্বতর্ষভ" (বিষ্ণুভাগপু, ১০।৫৮।৪২·১; ১১।২৭।১·২) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সাত্যকিকেও "সাত্বতাগ্র্য" (মহাভা, ৬।২২।৪ ;, "সাত্বতাং বরঃ (ঐ, ৭।৯৮।৪২·১), প্রভৃতি বলা হইয়াছে। "সাত্বতমুখ্য" (৭।১১৮।৮·১)

ভোজগণ, বৃষ্ণিগণ এবং অন্ধকগণকে লক্ষ্য করিয়া (মহাভা, ১।২২০।১৯; ২২১।২; ২২২।১৩, ৩৩) কৃষ্ণ "সাত্বতান্" (বা 'সাত্বতগণ' বলিয়াছেন। (ঐ, ১।২২৩।৩; আরও দেখ—২।৪৫।৭) আবার কখন কখন সাত্বতগণ বৃষ্ণিগণ এবং অন্ধকগণ হইতে পৃথক্‌রূপেও উল্লিখিত হয় দেখা যায়। যথা, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' আছে, "মধু, ভোজ, দাশার্হ, অর্হ সাত্বত, অন্ধক এবং বৃষ্ণিগণ" (১।১৪।২৫); "সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ এবং দাশার্হগণ" (৩।১।২৯)।

হয় বলিয়া ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র ধর্ম 'সাত্বতধর্ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[১] এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে ভাগবত বা ভগবদ্ভক্তের সাত্বত সংজ্ঞা জাতিবাচক বা সত্বত-বংশীয় বাচক 'সাত্বত' শব্দ সম্পর্কেই হইয়াছে,—সত্বতবংশীয় সাত্বতগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে পরিগৃহীত ধর্ম যখন কালক্রমে সাত্বতধর্ম নামে পরিচিত হইতে থাকে, তখন ঐ ধর্মানুযায়ী অপর সকলেও সাধারণভাবে সাত্বত নামে অভিহিত হইতে থাকে। পরন্তু সকল প্রাচীন লেখকগণ একবাক্যে 'সাত্বত' শব্দের ভিন্ন নিরুক্তি দিয়াছেন। মহাভারতে আছে যে সাত্বত কৃষ্ণের এক নাম বিশেষ। তিনি সত্বতবংশীয় বলিয়াই যে তাঁহার ঐ নামকরণ হয়, তাহা নহে। কেননা, তিনি স্বয়ং অর্জুনের নিকট উহার উপপত্তি অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তিনি বলেন, "আমি সত্ত্ব হইতে পূর্বে কখনও চ্যুত হই নাই। (সর্ব বস্তুর) সত্ত্ব নিশ্চয়ই মৎকৃত বলিয়া জান। হে ধনঞ্জয়! আমার পূর্ব সত্ত্ব বর্তমান জন্মেও আমাতে আছে। সেই সত্ত্ব হেতু আমি অকল্মষ এবং নিরাশী কর্মসংযুক্ত। আমি সত্ত্ববান্‌দিগের নিকট সাত্বতজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হই। সেই হেতু আমি 'সাত্বত' (বলিয়া অভিহিত হই)।"[২] সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রায় সেই নিরুক্তি দিয়াছেন,—যেহেতু কৃষ্ণ সত্ব হইতে চ্যুত হন না, এবং সত্বও তাঁহাকে ত্যাগ করে না, সেইহেতু তিনি 'সত্বত'; 'সত্বত' বলিয়াই তিনি 'সাত্বত'।[৩] তাহা হইতে ইহা বলা যায় যে কৃষ্ণ যখন এই প্রকারে 'সাত্বত' নামে খ্যাত হন, তখন তৎকর্তৃক প্রচারিত ধর্ম এবং তদনুযায়িগণ 'সাত্বত' নামে অভিহিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষীয় ধর্মের ইতিহাসে ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত আরও আছে। শাক্যবংশীয় সিদ্ধার্থ বা গৌতম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত যখন 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন, তখন তৎকর্তৃক প্রচারিত ধর্ম এবং তদনুযায়িগণ 'বৌদ্ধ' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। জ্ঞাতৃবংশীয় মহাবীর তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করত যখন 'জিন' নামে খ্যাত হন, তখন তৎকর্তৃক প্রচারিত ধর্ম এবং তদনুযায়িগণ 'জৈন' নামে কথিত হইতে থাকে। বৈশম্পায়নের পূর্বোদ্ধৃত বচনে আছে যে একান্ত ধর্ম অপরের দুর্বিজ্ঞেয় এবং দুষ্কর হইলেও সাত্বতগণকর্তৃক সর্বদা ধৃত হইয়া থাকে। ঐ

---

[১] দেখ—G. A. Grierson, "The Narayaniya and the Bhagavatas," Ind. Ant., ১৯০৮ (৩৭ খণ্ড), ২৫৩ পৃষ্ঠা; R. G. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism and Minor Religions Systems. Edited by. N.B. Utgikar, Poona, 1928, পৃষ্ঠা, ১১— ; বালগঙ্গাধর তিলক, 'গীতারহস্য', বাংলাভাষান্তর ৫৫৪ পৃষ্ঠা (পরে ১৯ পৃষ্ঠা দেখ); Ramaprasad Chanda, Indo-Aryan Races, Part 1, Rajshahi, 1916, ১০১ পৃষ্ঠা।

[২] মহাভা ১২।৩৪২।৭৭-৮

[৩] মহাভা, ৫।৭০।৭ সত্ব+তপ (=মতুপ্) সত্বত; সত্বত+স্বার্থে অণ্=সত্বত এব=সাত্বত।

'মহাভারতে'র ইংরাজীভাষান্তর-কারক প্রতাপচন্দ্র রায় মনে করেন যে এই সকল পরবর্তী কল্পনা মাত্র। প্রকৃত কথা, তাঁহার মতে, এই যে সাত্বতবংশীয় ছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণ "সাত্বত' নামে অভিহিত হইতেন।

'মহাভারতে'র (১২।৩৪২।৭৭) টীকায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, "সত্বেন তায়তে পালয়তে বা সত্বং তনোতি বিস্তারয়তি বা সত্বতঃ; সত্বমস্ত্যস্মিন্নিতি সত্বতঃ; সত্বপূর্বকমেব সর্বং কর্মাচরতীতি সত্বতঃ। সত্বতঃ এব সাত্বতঃ। তানুসন্তানপালনয়োস্তনুবিস্তারে আভ্যাং সত্বশব্দপূর্বাভ্যাং ডঃ তৎপ্রবর্দ্ধমরস্ত্যামিত্যত্র শ্রুতো মত্বর্থীয়স্তুপ্ প্রত্যয়ো বাহুলকাৎ সত্বশব্দাদপি অস্তে তদ্ধিতান্তানুকরণমেব প্রাতিপদিকং সদব্রহ্ম তদ্বন্তঃ সত্বন্তঃ আর্ষং ভত্বং। তেষামিদং তত্ত্বং সাত্বতং পাঞ্চরাত্রাদি" ইত্যাদি।

বচনের পূর্বে এবং পরে তিনি বলিয়াছেন যে একান্তধর্ম "দুর্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভিঃ" অর্থাৎ অকৃতাত্মব্যক্তিগণেরই দুর্বিজ্ঞেয়।[1] তাহাতে মনে হয় যে যাহারা কৃতাত্মা তাহাদিগকেই তিনি সাত্বত বলিয়াছেন। অন্তত ইহাও মনে হয় যে ঐ বচনে তিনি 'সাত্বত' শব্দ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেন নাই। বিষ্ণুর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভীষ্ম সৃষ্টির প্রাক্‌কালে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্য-হননকারী ভগবান্ বিষ্ণুকে "ঋষভং সর্বসাত্বতাং" বলিয়াছেন।[2] ঐখানে 'সাত্বত' শব্দের অর্থ অবশ্যই 'সত্ত্বগুণযুক্ত'। অন্যত্র ভীষ্ম বলিয়াছেন যে যাহারা "বিনিদ্র, জিতশ্বাস ও সংযতেন্দ্রিয়" অর্থাৎ যাহারা তম ও রজ গুণকে জয় করিয়াছে তাহারা "সত্বস্থ"।[2] সত্বস্থ বা সত্ববান্ বলিয়াই তাহাদিগকে 'সাত্বত' বলা যায়। সত্ব-প্রধান বিষ্ণু অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্বস্থ বা সাত্বত, সুতরাং 'সর্বসাত্বতগণের ঋষভ'। বিষ্ণুর সহস্র নামের অন্যতম "সাত্বতাং পতিঃ"।[3] উহার উৎপত্তিও ঐ প্রকারেই হইয়া থাকিবে।[4] 'পদ্মপুরাণে' আছে, "যে অনন্যমনে সত্ব, সত্বাশ্রয় এবং সত্বগুণ কেশবের সেবা করে, সে 'সাত্বত' বলিয়া সমুদাহৃত হয়।…যে সত্বগুণোপেতে হইয়া কাম্যকর্মাদি পরিত্যাগ করত সত্যস্বরূপ একাকী হরিকেই ভক্তি সহকারে ভজন করে, (বিদ্বান্‌গণ) তাহাকে 'সাত্বত' বলিয়া জানেন। যে হরির ভক্ত,—দিবারাত্র তাঁহার নামের কীর্তনে ও স্মরণে রত, তাঁহার বন্দন, অর্চন, দাস্য ও সখ্যে যাহার ভক্তি, এবং অনন্তে আত্মার্পণে যাহার দৃঢ় রতি, সেই 'সাত্বত'।"[4] 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে "যাহারা পঞ্চকালিক কর্ম দ্বারা যথাক্রমে দেবতার (বিষ্ণুর) পূজা করে, এবং তাহাতে দ্বিজাতিগণের, অথবা চারও (বর্ণের), অধিকার প্রদান করে, তাহারাই শুদ্ধ ভগবন্মার্গে সত্বস্থ এবং তাহারই 'সাত্বত'।[5] এই সকল বচনে 'সাত্বত' সংজ্ঞার উপপত্তি 'সত্ব' শব্দ সম্পর্কেই কৃত হইয়াছে। 'সাত্বত' সংজ্ঞার ঐ উপপত্তিদ্বয়ের কোনটা প্রাচীন ও মৌলিক এবং কোনটা পরে কল্পিত, তাহা বলা কঠিন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে যে প্রথম ব্যাখ্যাই মৌলিক; অর্থাৎ সত্বতবংশীয় বলিয়া কৃষ্ণ 'সাত্বত', এবং ঐ বংশের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া তিনি "সাত্বতগণের পতি" ও "সাত্বতগণের ঋষভ" নামে অভিহিত হন। পরে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভিন্নতা প্রচারিত হইলে লোকে কখন কখন বিষ্ণুকে ও তাঁহার নামে "সাত্বতগণের পতি" ও "সাত্বতগণের ঋষভ" বলিতে থাকে। পরন্তু ঐ অনুমানকেই যে এক মাত্র তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চিত হেতু নাই। প্রকৃত তথ্য তাহার বিপরীতও হইতে পারে।[6] নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত একান্তধর্ম মতে সাত্বিক পুরুষই সর্বপ্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেননা, তিনি মোক্ষলাভার্থ নিশ্চিত হইয়াছেন।[7] তন্মতে মোক্ষ

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৮।৯'২ ও ৬১'২ ২) ঐ, ১২।২০৭।১৬'২ ২'১) ঐ, ১২,।৪৭।৫৪ আরও দেখ—১২।২৮৪।১৬৯

৩) ঐ, ১৩।১৪৯।৬৭ ৪) শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত

৫) জয়াখ্যসং, ২২।২৮।—২৯'১

এই গ্রন্থে 'কর্মসাত্বত' নামে ভাগবতধর্মীগণের এক উপশ্রেণীর উল্লেখ আছে। তথায় উহাকে প্রায় সাত্বত নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। (পূর্বে ১৭ পৃষ্ঠার ৯ সংখ্যক পাদটীকা দেখ)

৬) অধ্যাপক এস, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার ও সেই প্রকার অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "It is quite possible that these names both of the individual and the tribe are derived from previously known names whatever their origin." (Proc. 2nd Orient. Con. Calcutta, 1922, ৩৫২ পৃষ্ঠা)।

৭) মহাভা, ১২।৩৪৮।৬৯ ; আরও দেখ ৭৩'২ শ্লোকার্ধ।

নারায়ণপর বা নারায়ণাত্মক,[১]—মোক্ষে জীব নারায়ণে প্রবেশ করে।[২] নারায়ণ "সত্বস্থ" "সত্ববান্ এবং সাত্বিক"।[৩] স্থতরাং যে পুরুষ সাত্বিক একমাত্র তিনিই নারায়ণে প্রবেশ করিতে পারেন বা মুক্ত হইতে পারেন—একান্তধর্মের এই সিদ্ধান্ত সমীচীনই হইয়াছে। ভীষ্মও 'মহাভারতে'র অন্যত্র বলিয়াছেন যে সত্বই জীবকে শুদ্ধাত্মক পরম প্রভু নারায়ণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়।[৪] পুরাণাদিতেও সেই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়,—"সত্ব দ্বারাই জীব মুক্ত হয়,—সত্ব নারায়ণাত্মক।"[৫] "সত্বমেব সাত্বং; তৎ তনোতি। তন্+ড। ইতি সাত্বত"—এই নিরুক্তি অনুসারে যাহা সত্বকে বৃদ্ধি করে তাহাকে 'সাত্বত' বলা যায়। একান্তধর্ম পুরুষের সত্বগুণ বৃদ্ধি করে। যথা, শ্বেতদ্বীপবাসী মহাভাগ্যশালী সিদ্ধগণ সম্বন্ধে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন যে তাঁহারা পূর্বে একান্তী ছিলেন, তাহাতে তাঁহারা তম ও রজ গুণ হইতে নির্মুক্ত; সেই হেতু তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাতে প্রবেশ করিবেন।[৬] ভীষ্ম বলিয়াছেন, যখন মানুষের অন্তরস্থ সমস্ত কামনা সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়, তখন সে সত্বস্থ হয় এবং তখন সে ব্রহ্মলাভ করে।[৭] //একান্তধর্ম যে নিষ্কাম কর্মমূলক, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। তাহাতেও জানা যায় যে একান্তধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য লোককে সত্বস্থ করা। সেই কারণে উহাকে সাত্বতধর্ম বলা যায়। উহার মতে নারায়ণের প্রসাদেই জীব সাত্বিক হয়।[৮] স্থতরাং তিনি জীবের সত্ববৃদ্ধিকারী। অতএব তাঁহাকেও 'সাত্বত' বলা যায়। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক কোশে এই নিরুক্তি বস্তুতই প্রদত্ত হইয়াছে। আচার্য যামুন 'বিষ্ণুভক্ত' অর্থে 'সাত্বত' সংজ্ঞার উপপত্তি সত্বগুণ সম্পর্কেই করিয়াছেন।[৯] তৎকর্তৃক অনূদিত এক স্মৃতিবচনেও ঐ উপপত্তি আছে।[১০] আচার্য পরাশর ও নীলকণ্ঠ উহার আরও অনেক প্রকার নিরুক্তি দিয়াছেন।[১১] উহাদের কোনটাই জাতিসম্পর্কে নহে। কোন কোন পুরাণে জাতিবাচক 'সাত্বত' সংজ্ঞার ও ব্যাখ্যা সত্বগুণ সম্বন্ধে কৃত হইয়াছে।[১২] 'পুরুষোত্তমসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে তত্ত্বস্বরূপ হরি কর্তৃক প্রোক্ত বলিয়া একায়নবেদ 'সাত্বত' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[১৩] স্থতরাং তত্রোক্ত ধর্মকে সাত্বতধর্ম

---

১) ঐ, ১২।৩৪৮।৭০, ৭৪

২) ঐ, ১২।৩৩৯।২৫, ৪৩'১ ৩) ঐ, ১৩।১৪৯।৬৫, ১০৬ (বিষ্ণুর সহস্র নামের ভিন্ন নাম)।

৪) ঐ, ১২।৩০১।৭৭'১ ৫) পদ্মপু, পাতালখণ্ড, ৯৩।৩২'১ ; বরাহপু, ৭০।১৯'২, ২৩'১ ; আরও দেখ—কূর্মপু, ১।২২।৩৬'২।

৬) মহাভা, ১২।৩৩৯।২০, ৪৯

৭) "যদা নিবৃত্তঃ সর্বস্মাৎ কামো হ যোঽস্য হৃদি স্থিতঃ।
তদা ভবতি সত্বস্থস্ততো ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" —(মহাভা, ১২।৬৬।৩৮

'কঠোপনিষদে'র ২।৩।১৪ শ্রুতির সহিত ইহার তুলনা কর।

৮) মহাভা, ১২।৩৪৮।৭৩ ৯) 'আগমপ্রামাণ্য', ৭৪ পৃষ্ঠা ১০) ঐ, ৭৬ পৃষ্ঠা

১১) পরাশর-কৃত 'বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্যে' আছে,

"সৎ ব্রহ্ম সত্বং বা, তদ্বন্তঃ সাত্বন্তঃ ব্রহ্মবিধা সাত্বিকা বা ; তেষামিদং কর্মশাস্ত্রং বা সাত্বতম্, তৎকুর্বাণাস্তদাচক্ষণাশ্চ বা।"

অথবা,

"সাতয়তি সুখয়ত্যাশ্রিতান্ ইতি সাৎ পরমাত্মা, স এতেষামস্তীতি বা সাত্বতাঃ সাত্বন্তো বা মহাভাগবতাঃ।"

২) যথা দেখ—বায়ুপু, ২।৩৩।৪৭ ; মৎস্যপু, ৪৪।৪৬-৭ ; কূর্মপু, ১।২৪।৩৪ ১৩) পুরুষোত্তমসং, ১।১৬'১

নামে অভিহিত হয় বলা যায়। বেদে রুদ্রকে 'সত্বনদিগের পতি' ("সত্বনাং পতয়ে নমঃ") বলা হইয়াছে।[১] "সাত্বতাং পতিঃ" শব্দ ও ঐ প্রকারই।

'জয়াখ্যাসংহিতা'র ন্যায় 'বিষ্ণুসংহিতা'রও মতে, পাঞ্চরাত্রতন্ত্রানুসারে দেবদেব বাসুদেবের উপাসকগণের এক বিভাগ সাত্বত নামে অভিহিত হইত। "এককাল বা দ্বিকাল বিষ্ণুর স্ফুট আরাধন, ক্ষত্রবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত ধন দ্বারা কুটুম্বের পোষণ, সংগ্রামে অনাবর্তন এবং সর্বশাস্ত্রে কৌশল—'যাহারা এই সকল লক্ষণযুক্ত তাহারা সাত্বত বলিয়া প্রকীর্তিত।"[২] ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে তদুক্ত স্বাত্বত বৈষ্ণবগণ বৃত্তিতে ক্ষত্রিয় ছিল। তাহারা জাতিতেও ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোন হেতু নাই।

'কূর্মপুরাণে' সাত্বতধর্ম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক নূতন কথা বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে যদুবংশে সত্বত (বা সাত্বত) নামে এক জন "বিষ্ণুভক্ত" প্রতাপবান্ রাজা ছিলেন। "বাসুদেবার্চনরত" সেই মহাত্মা দেবর্ষি নারদের পরামর্শে এক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কুণ্ডগোলাদি উহার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং উহা তাহাদের হিতাবহ। তাঁহার নামানুসারে উহা 'সাত্বত' নামে বিখ্যাত হয়।[৩] সত্বত কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া ধর্মের নাম 'সাত্বত' হওয়া স্বাভাবিক। পরন্তু কুণ্ড ও গোল বা গোলক জারজ পুত্রের নাম,—সধবার জারজ পুত্রকে 'কুণ্ড' এবং বিধবার জারজ পুত্রকে 'গোল' বা 'গোলক' বলা হয়। বিষ্ণুভক্ত তাহাদেরই জন্য ঐ ধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলাতে মনে হয় যে ঐ ধর্মের নিন্দার্থই উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐ কিম্বদন্তি পরে প্রচারিত হইয়াছিল।

'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যদুবংশীয় রাজা সত্বত "সত্ববৃত্তিগুর্ণোপেতঃ" ছিলেন।[৪] বোধ হয় সেই হেতুই তিনি 'সত্বত নামে খ্যাত হন। যাহা হউক, তাঁহার নাম অনুসারে তাঁহার বংশীয়গণ 'সাত্বত বলিয়া স্মৃত হন।[৫] সত্বতের পুত্র ভীম অযোধ্যার রাজা দশরথ-নন্দন রামের সমকালীন ছিলেন।[৬]

বৈশ্যব্রাত্যের ঔরসজ পুত্রকেও স্মৃতিতে 'সাত্বত' বলা হয়। পরন্তু উহার সহিত বিষ্ণুভক্ত সাত্বতের কোন সম্বন্ধ নাই। 'বরাহপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে "সৃষ্টি বিস্তারিত হইলে মহাবল দেবতাগণ ও দৈত্যগণ সাত্বতভাবে আস্থিত হইয়া ('সাত্বতং ভাবমাস্থায়') (পরস্পর) বিজিগীষু হইয়া যুদ্ধ করেন।"[৭] ঐখানে 'সাত্বতভাব' সংজ্ঞার প্রকৃত তাৎপর্য কি বিচার্য।

---

[১] রাজসং (মাধ্য), ১৬।২০

[২] বিষ্ণুসং, ২।২৯'২-৩১।১

[৩] কূর্মপু, ১।২৪।৩০-৩

[৪] 'হরিবংশ', ২।৩৮।৩৭

[৫] ঐ, ২।৩৮।৩৮

[৬] "রাজ্যে স্থিতে নৃপে তস্মিন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
শত্রুঘ্নো লবনং হত্বা চিচ্ছেদ স মধোর্বনম্" —(২।৩৮।৩৯)।

[৭] বরাহপু, ২৫।৮।

ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদগণের একজনের নাম সাত্বত। ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে সাত্বতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাত্বত বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভ করেন।

প্রাচীনকালে ভাগবতধর্ম কখন কখন নারায়ণ-ধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম নামেও অভিহিত হইত মনে হয়। 'মহাভারতে' যেমন 'ভাগবতধর্ম' নাম নাই, তেমন ঐ নামও বস্তুত নাই। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'ও সেই নাম নাই। তবে 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বের যেই উপপর্বদ্বয়ে ঐ ধর্মের কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের একটী 'নারায়ণীয় আখ্যান' অথবা সংক্ষেপে 'নারায়ণীয়' নামে কথিত হয়। ঐ বিবৃতি মধ্যেও স্থানে স্থানে উহাকে "নারায়ণকথা"[১] 'নারায়ণাশ্রয় কথা'[২] বা 'নারায়ণীয় আখ্যান'[৩] বলা হইয়াছে। একস্থলে ঐ নারায়ণকথাকে 'ধর্মসংহিতা'ও বলা হইয়াছে।[৪] এই সকল হইতে সহজে মনে করা যাইতে পারে যে ঐ ধর্মকে নারায়ণধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, লিঙ্গপুরাণে ঐ নামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে রাজা অম্বরীষ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "নারায়ণানাং দিব্যানাং ধর্মানাং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্" (অর্থাৎ দিব্য নারায়ণধর্মসমূহের বা নারায়ণীয় ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম) কি?[৫] তাহাতে মহর্ষি উত্তর করেন, "ভক্তিপূর্বক নারায়ণের স্মরণ, পূজন এবং প্রণামই নারায়ণাত্মক পূণ্য (=ধর্ম)।"[৬] তিনি আরও বলেন যে একমাত্র তদ্দ্বারাই নারায়ণ প্রীত হন। কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে।[৭]

ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মকে কখন কখন "সনাতনধর্ম" বলা হয়। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' ঐ নাম পাওয়া যায়।[৮] 'মহাভারতে' একান্তধর্মকে "সনাতন ধর্ম" বলা হইয়াছে।[৯] কেননা কথিত হইয়াছে যে ঐ ধর্মের বিনাশ হয় না; প্রতিকল্পের আদিতে উহা ভগবান নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হয় এবং দীর্ঘকাল পরে তিরোহিত হইয়া তাঁহাতে প্রত্যাবর্তন করে; পর কল্পের আদিতে আবার উহা তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রকারে উৎপত্তি-প্রলয়-বান্ বা আবির্ভাব-তিরোভাব-যুক্ত হইলেও উহার সম্যক্ বিনাশ কখনও হয় না। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে উপসংহারে বলেন, "এবমেষ মহান্ ধর্ম আদ্যো রাজন্ সনাতনঃ" ('হে রাজন্! এই প্রকারে এই মহান ধর্ম 'আদ্য এবং সনাতন')।[১০] সুতরাং উহার 'সনাতনধর্ম' নাম ঠিকই হইয়াছে! বৈশম্পায়ন আরও বলেন যে ঐ সনাতন একান্তধর্ম, বিশেষত তৃতীয়কল্পে,—ব্রহ্মার বাচিক জন্মের সময়ে, "ত্রিসৌপর্ণব্রত" এবং ষষ্ঠ কল্পে,—ব্রহ্মার অণ্ডজ জন্মের সময়ে, "জ্যেষ্ঠসামব্রত" নামেও খ্যাত হয়।[১১] ঐ দুই নামকরণের হেতু পরে প্রদর্শিত

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৩।২·২, ১৭·২, ৩০·১ দেখ × (বিষ্ণু) ভাগপু, ৮।২১।১৬—৭

২) ঐ, ২২।৩৪৩।৩; আরও দেখ—"নারায়ণকথাশ্রয়ং" (১২।৩৪৩।১৪·১)

৩) ঐ, ১২।৩৪৬।১৬·১; "ভগবদাখ্যান" (৩৪৬।২·২)

৪) "ত্বয়া নারায়ণকথাঃ শ্রুতা বৈ ধর্মসংহিতাঃ"—(১২।৩৪০।৪·২)

৫) লিঙ্গপু, ২।১।৪·১

৬) ঐ, ২।১।৬; আরও দেখ "এষ একান্তিনাং ধর্মো নারায়ণপরাত্মকঃ॥" (মহাভা, ১২।৩৪৮।৮২·২)

৭) লিঙ্গপু, ২।১ অধ্যায়। ৮) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১১।৫·১; আরও দেখ—৭।১১।২—

৯) মহাভা, ১২।৩৪৮।২২ ১০) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৫·১ ১১) মহাভা, ১২।৩৪৮।২১ ও ৪৬;

হইবে। শ্বেতদ্বীপে নারদ-কৃত ভগবান্ নারায়ণের স্তুতিতে আছে যে নারায়ণ "প্রথমত্রিসৌপর্ণ" "জ্যেষ্ঠসামগ" এবং "সামিকব্রতধরা"।[১] নারায়ণয়ের এই তিন খ্যাতির সঙ্গে একান্তধর্মের উক্ত দুইনামের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

এই পর্যন্ত আমরা ভাগবত ধর্মের বিভিন্ন নাম সমূহের নিরুক্তি ও উৎপত্তি আলোচনা করিয়াছি। উহাতে ঐ সকল নামকরণ কেন হয়—তাহা যথা সম্ভব জানা গিয়াছে। ঐ সকল নামকরণ কখন হয়, তাহারও আলোচনা করা ঐতিহাসিকের উচিৎ। একান্তধর্মের 'ত্রিসৌপর্ণব্রত' এবং 'জ্যেষ্ঠ সামব্রত' এই দুই নাম কখন এবং কি হেতুতে হয় তাহা নারায়ণীয়াখ্যানেই বিবৃত হইয়াছে। অপর নামসমূহের উৎপত্তি-কাল, আমরা যতদূর জানি, কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহ ঐ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। গার্বে বলেন যে ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাত্বতবংশীয় বসুদেব ও দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণের ধর্মে পরমেশ্বর 'ভগবৎ' নামে অভিহিত হইতেন। কালক্রমে ঐ নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপর আখ্যাসমূহও প্রচলিত হইয়া পড়ে;—নারায়ণ পুরুষোত্তম তথা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার পিতৃজ নাম বাসুদেব এবং বৈয়ক্তিক নাম কৃষ্ণ। ঐ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাচীনতম নাম 'ভাগবত' এবং 'সাত্বত'। সাত্বত নামের উৎপত্তি কৃষ্ণের স্ববংশ হইতে হয়। 'পঞ্চরাত্র' নাম ঐ নামদ্বয়ের পরে। ঐ নাম কখন কখন ঐ ধর্মের এক উপবিভাগ বিশেষকে বুঝায়; পরন্তু উহা সাধারণত 'ভাগবতে'র সমানার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[২] গ্রীয়ার্সন ও সেই প্রকারে মনে করেন যে ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ-বাসুদেবই। উহার উপাস্য দেবতা 'ভগবৎ' নামে অভিহিত হইতেন। সেই হেতু উহাকে 'ভাগবতধর্ম' বলা হইত। কৃষ্ণের স্বজাতি সাত্বতগণ উহা প্রথমে অঙ্গীকার করে। পরে উহা অন্যত্রও পরিগৃহীত হয়। তখন সেই হেতু 'সাত্বত' ও 'ভাগবত' শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে।[৩] সুতরাং তাঁহাদের মতে 'ভাগবতধর্ম' আদ্য নাম, 'সাত্বতধর্ম' পরের নাম; 'ভাগবতধর্মের 'সাত্বতধর্ম নাম সাত্বতেতর জাতিরাই দিয়াছিল; কেননা, তাহারা সাত্বতজাতি হইতেই 'ভাগবতধর্ম' পাইয়াছিল। লোকমান্য তিলক বলেন, "ভাগবতধর্মের বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার ঐতিহাসিক উপপত্তি দেওয়া যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তৎপূর্বে বোধ হয় তাহা 'নারায়ণীয়' কিম্বা 'পাঞ্চরাত্র নামে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং পরে সাত্বত জাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 'সাত্বত' নাম হইয়া থাকিবে, এবং তাহার পর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণেরই অবতার মানিয়া লোকেরা এই ধর্মকে 'ভাগবতধর্ম' বলিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে।[৪] তৎপূর্বে তিনি বলিয়াছেন, "পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবতার নর ও নারায়ণ ঋষি এই প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের প্রথম প্রবর্তক এবং সেই জন্যই এই

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৮।১০৫ ও ১১১—২

২) Garbe's Introduction to the Bhagavad Gita Eng. trans by N. B. Utgikar, Bombay, 1918, p. 12

৩) Ind. Ant., 1908, p 258

৪) তিলকের 'গীতারহস্য', বাংলাভাষান্তর, ৫৫৪ পৃষ্ঠ।

ধর্মের প্রাচীন নাম 'নারায়ণীয়ধর্ম'।"[১] "শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে জনকাদি এই পন্থা (=বৈদিক কর্মযোগ পন্থা) অনুসারেই আচরণ করিতেন। কিন্তু পরে ভগবান্ তাহাতে ভক্তিকেও মিলাইয়া দিয়া তাহার প্রচার অধিক বিস্তৃত করায়, তাহাই 'ভাগবতধর্ম' নাম পাইয়াছে।"[২] এইরূপে দেখা যায়, তিলকের মতে 'সাত্বতধর্ম' নাম, 'ভাগবতধর্ম' নামের পূর্বে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মত গ্রীয়ার্সনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'মহাভারতা'দিতে দেখা যায়, যেমন কৃষ্ণকে, তেমন নারায়ণ ঋষিকেও 'ভগবান্' বলা হইত। তারপর উহাদিগেতে বারবার উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষিই জগতের কল্যানার্থ কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাহাতে কৃষ্ণ অপেক্ষা নারায়ণ ঋষির প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়াছে। সুতরাং 'ভাগবতধর্ম' নামের উৎপত্তি মূল প্রবর্তকের 'ভগবান্' খ্যাতি হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে না করিয়া পুনঃপ্রচারকের 'ভগবান্' খ্যাতি হইতে হইয়াছে বলিয়া, তিলক কেন মনে করেন, তাহা তিনি নির্দেশ করেন নাই। 'ভাগবতধর্ম' নামের উৎপত্তির সঙ্গে ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই।[৩] সুতরাং ভগবান্ কৃষ্ণ ভগবান্ নারায়ণের প্রাচীন ধর্মে ভক্তিকেও মিলাইয়াছিলেন, তিলকের এই অনুমান সত্য বলিয়া অভ্যুপগম করিলেও, তাঁহার এই অনুমানকে সমীচীন বলা যায় না যে সেই হেতুতেই উহার 'ভাগবতধর্ম' নাম পড়িয়াছে। 'ভগবান্' খ্যাতি নারায়ণ ঋষির বা কৃষ্ণের কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে। প্রাচীন কালে ঋষিগণকে, তথা অপরাপর মহদ্ব্যক্তিগণকে, প্রায় ভগবান্ বলা হইত। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং প্রবর্তকের 'ভগবান্' আখ্যা হইতে 'ভাগবতধর্ম' নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উপাস্য দেবতার 'ভগবান্' নাম হইতেই ধর্মের নাম 'ভাগবত' হইয়াছে মনে করা অধিকতর সঙ্গত। রামকৃষ্ণগোপল ভাণ্ডারকর মনে করেন যে ঐ ধর্মের আদ্য নাম একান্তিকধর্ম ছিল; কেননা, উহা একের প্রতি একান্তিক প্রেমও ভক্তির ধর্ম। অনতিকালের মধ্যে উহা সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করে এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতধর্ম নামে অভিহিত হইতে থাকে। সাত্বত নামক এক ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে উহা নিবদ্ধ ছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে মেগাস্থেনিস্ ঐ প্রকার এক জাতিবিশেষরই ধর্ম বলিয়া উহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৪]

যেমন 'পাদ্মসংহিতা'য়, তেমন ঐ সকল মনীষিগণও ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে পূর্বোক্ত সমস্ত নাম একই ধর্মেরই। ইহা মানিয়া লইয়াই তাঁহারা অধিকন্তু নিরূপণ করিতে চাহিয়াছেন যে কোন কোন কালে কোন কোন হেতুতে বা কোন কোন দৃষ্টিতে ঐ ধর্মের কোন কোন নামকরণ হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহাদের মূল আনুমানিক সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত তত্ত্ব অন্য প্রকার বলিয়াই মনে হয়। ভগবান নারায়ণ ঋষির ধর্ম কালান্তরে স্বল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে উহা হইতে শাখা এবং প্রশাখা সম্প্রদায়ও নির্গত হইয়াছিল।

---

১) ঐ, ৩৪৪ পৃষ্ঠা। ২) ঐ, ৩৫৫ পৃষ্ঠা

৩) সংস্কৃত 'ভক্তি' শব্দ 'ভজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'ভগবান্' শব্দকেও কেহ কেহ মূলত ঐ 'ভজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করেন। এই দৃষ্টিতে 'ভাগবত' সংজ্ঞার সঙ্গে ভক্তির সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।

৪) R. G. Bhandarkar, Vaisnavism etc, p. 142.

তাহাতে আশ্চর্যজনক কিছুই নাই। মহাবীর, বুদ্ধ, মুসা, ঈশা, প্রভৃতি ঐতিহাসিক বলিয়া পরিগণিত মহাপুরুষগণের ধর্মসমূহের প্রত্যেকের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন, তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ও উপসম্প্রদায় ভেদ, হইয়াছিল বলিয়া সাধারণত দেখা যায়, তাহাতে ঐ প্রকার পরিবর্তনও সম্প্রদায়ভেদ ভিন্ন হওয়া যে কোন ধর্মের পক্ষে বরং অপরিহার্যও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। নারায়ণের ধর্মের ভেদোপভেদসমূহের আলোচনা পরে যথাসম্ভব করা যাইবে। অধুনা ইহা বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে পূর্বোক্ত নামসমূহে কোন কোনটি ঐ সকল শাখা বা প্রশাখা সম্প্রদায়সমূহের কোন না কোনটিরই, মূল ধর্মের নহে। মূল ধর্মও অবশ্য দৃষ্টিভেদে একাধিক নামে অভিহিত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের উপকরণ

ভাগবতধর্মের কোন প্রাচীন গ্রন্থ অধুনা পাওয়া যায় না। ‘মহাভারতে’ উক্ত হইয়াছে যে মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি সাত্বতধর্ম সম্বন্ধে লক্ষশ্লোকাত্মক ‘চিত্রশিখণ্ডি’ নামে পরিচিত এক উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন এবং উহার আধারে স্বায়ম্ভুব মনু, সুরগুরু বৃহস্পতি ঋষি এবং অসুরগুরু উশনা ঋষি অপর শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন।[১] পরন্তু সেই শাস্ত্রগ্রন্থ অধুনা উপলব্ধ নহে। উপনিষৎ-কালের পরে এবং ভগবান গৌতমবুদ্ধের পূর্বে বৈদিক ধর্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, উহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। ভাগবতধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহও সেই প্রকারে বিনষ্ট হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রসংহিতা সমূহ ভাগবতধর্মের গ্রন্থ সত্য ; পরন্তু উহাদেরও সমস্তগুলি এখন পাওয়া যায় না। উপলব্ধ সংহিতাসমূহের কোনটাই বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কিঞ্চিৎ পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।[২] অধিকন্তু উহাদের সময়ে ভাগবতধর্ম অনেক রূপান্তরিত হইয়াছিল।[৩] আরও বলিলে উহারা ভাগবতধর্মের এক শাখা বিশেষেরই গ্রন্থ। সুতরাং উহাদের আধারে ভাগবতধর্মের মুল কিম্বা প্রাচীন স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। সেই হেতু তাহার জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অপর গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়।

ভাগবতধর্মের প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষি। ‘মহাভারতে’র শান্তিপর্বের অন্তর্গত ‘নারায়ণীয়-আখ্যান’ প্রকরণে[৪] নারায়ণীয়ধর্মের বিবরণ পাওয়া যায়। তথায় ইহাও উক্ত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাঙ্‌মুখে ‘ভগবদ্‌গীতা’য় ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট ঐ ধর্ম ব্যাখ্যা করেন।[৫] ‘মহাভারতে’র শান্তিপর্বের অন্তর্গত এক প্রকরণের নাম ‘বার্ষ্ণেয় অধ্যাত্ম’ প্রকরণ।[৬] উহার উপসংহারে আছে, “জগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ ঋষি জীবগণের প্রতি কৃপা করিতে এই অমৃত (জ্ঞানরূপ অমৃত কিম্বা অমৃত বা মোক্ষ প্রাপক জ্ঞান) (সাধারণে) প্রকাশ করেন।”[৭] উহার মধ্যে একাধিকবার নারায়ণ ঋষির নাম উল্লিখিত হইয়াছে।[৮] তাহাতে জানা যায় যে ঐ প্রকরণে ভগবান্ নারায়ণ ঋষির মতবাদই বিবৃত হইয়াছে! উহার প্রারম্ভে আছে যে উহাতে “বার্ষ্ণেয় ইতিহাস” বিবৃত হইয়াছে।[৯] আর প্রকরণের নাম হইতে জানা

---

১) মহাভা ; ১২।৩৩৫।৩৯, ৪৪—৬ ; পরে দেখ।   ২) পরে দেখ।

৩) পরবর্ত্তী অধ্যায় দেখ।

৪) ‘মহাভারতে’র শান্তিপর্বের (১২শ পর্বের) ৩৩৪—৩৫১ অধ্যায়সমূহের নাম ‘নারায়ণীয় আখ্যান’ প্রকরণ।

৫) আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন যে বাসুদেব নামক পরব্রহ্মই অভিধেয়-ভূত বলিয়া গীতায় বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। (গীতাভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত) ‘মহাভারতে’র ৬ষ্ঠ পর্ব ভীষ্মপর্বের অধ্যায়সমূহের নাম ‘গীতাপর্ব’।

৬) ‘মহাভারতে’র শান্তিপর্বের ২১০—৭ অধ্যায়।   ৭) মহাভা, ১২।২১৭।৩৮

৮) মহাভা, ১২।২১০।২৩ ; ২১১।১৬ ; ২১৭।১—২   ৯) মহাভা, ১২।২১০।১১ ; আরও দেখ—১৩

যায় যে উহাতে "বার্ষ্ণেয় অধ্যাত্ম" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'বার্ষ্ণেয়' কৃষ্ণেরই এক নাম। যে হেতু তিনি বৃষ্ণিবংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই হেতু তিনি 'বার্ষ্ণেয়' নামে অভিহিত হইতেন।[১] 'মহাভারতে', তথা পুরাণে, প্রসিদ্ধি আছে যে নারায়ণ ঋষিই কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং 'বার্ষ্ণেয়' নামে নারায়ণ ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলা যায়। কেননা, অবতারের নামে অবতারীকে উল্লেখ করার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। আর যদি 'বার্ষ্ণেয়' নামে বস্তুত কৃষ্ণকেই মনে করা হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে নারায়ণ ঋষি কৃষ্ণ অবতারে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই উহাতে বিবৃত হইয়াছে। অন্যথা, নারায়ণ ঋষি এবং বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিলে, শুধু যে তাঁহাদের সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কিম্বদন্তীর সহিত বিরোধ হইবে তাহা নহে, ঐ প্রকরণের উপক্রমের এবং উপসংহারের উক্তির মধ্যেও বিরোধ হইবে। অথবা, বলা যাইতে পারে যে 'বার্ষ্ণেয়' শব্দ কৃষ্ণ বা নারায়ণ বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায় না; উহা 'বৃষ্ণিবংশসম্পর্কীয়' এই সাধারণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে প্রচলিত অধ্যাত্মতত্ত্বকেই 'বার্ষ্ণেয়-অধ্যাত্ম' বলা হইয়াছে। ঐ প্রকরণের উপক্রমে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব বা বিষ্ণুই উহাতে বর্ণিত পরম অধ্যাত্ম[২]; উহাতে "অপরিমিততেজঃসম্পন্ন দেবদেব বিষ্ণুরই মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে।[৩] তাহাতেও নিশ্চিত হয় যে ঐ প্রকরণে বৈষ্ণবধর্মই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তারপর উহাতে নারায়ণ ঋষির সম্পর্ক আছে বলাতে, নিশ্চিত হয় যে তৎকর্তৃক প্রপঞ্চিত বৈষ্ণবধর্মই উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং সর্বপ্রকারে নির্ণীত হয় যে তত্রোক্ত অধ্যাত্ম ভাগবতধর্মেরই। এইরূপে দেখা যায়, 'মহাভারতে'র অন্তর্গত 'ভগবদগীতা' (বা সংক্ষেপে 'গীতা'), 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম' এবং নারায়ণীয়াখ্যান' মুখ্যত এই তিন প্রকরণে ভাগবতধর্মের বিবরণ আছে।

'মহাভারতে' অপর কোন কোন স্থলেও বৈষ্ণব ধর্মের অল্পাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের এক স্থল বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। অশ্বমেধপর্বের অংশবিশেষের নাম 'অনুগীতা পর্ব।[৪] উহার উপোদ্‌ঘাতে বর্ণিত হইয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহাসমরের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিতে সমুদ্যত হইলে অর্জুন তাঁহার নিকটে আসিয়া তৎকর্তৃক পূর্বে (গীতায়) ব্যাখ্যাত ধর্ম পুনর্বার বলিতে অনুরোধ করেন। কেননা তিনি বলেন, যুদ্ধের প্রাক্‌কালে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা তখন তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।[৫] তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করেন যে তিনি

---

১) ইহাও বলা উচিত যে একমাত্র কৃষ্ণকেই যে 'বার্ষ্ণেয়' বলা হইত তাহা নহে।' কেননা, বৃষ্ণিবংশের অপর ব্যক্তিকেও 'বার্ষ্ণেয়' বলা হইত দেখা যায়। যথা, 'মহাভারতে' বলরাম (৫।১৫৮।৩৮'২) সাত্যকি (৫।১৬৪।৭'১ ; ৬।৭২।২৮'১ ; ৭৪।২৭'১ ; ইত্যাদি), চেকিতান (৬।৮৪।২০'১), বার্ধক্ষেমি (৭।২৫।৫১—৫), প্রভৃতিকেও 'বার্ষ্ণেয়' বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে (১।১২১।১৯ ; ৭।৭২।২৭'১ ; ইত্যাদি) 'বার্ষ্ণেয়ী' বলা হইয়াছে। শুষ বার্ষ্ণেয়ের নাম 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' (৬।১০।৯।১৫) আছে; তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় (২।১১।৯।৩) এবং জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে ঐক্ষাক বার্ষ্ণেয়ের (১।৫।৪) ও গোবল বার্ষ্ণেয়ের (১।৬।১) নামোল্লেখ আছে। 'বার্ষ্ণ্য' ও 'বার্ষ্ণেয়' শব্দ একার্থক।

২) মহাভা, ১২।২১০।৮—১০ ৩) মহাভা, ১২।২১০।১২'২—

৪) 'মহাভারতে'র ১৪শ পর্ব অশ্বমেধপর্বের ১৬—৫১তম অধ্যায়ের নাম 'অনুগীতাপর্ব'।

৫) মহাভা, ১৪।১৬।৫—৭'১

উহা সম্যক্ সেই প্রকারে বলিতে পারিবেন না। কারণ উহা তখন তাঁহার স্মরণ নাই।[১] তখন "পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন মনসা[২] অর্থাৎ তিনি যোগযুক্ত হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভাবমুখে যাহা বলা যায় তাহা পরে সাধারণ অবস্থায় ঠিক্ ঠিক্ মনে থাকে না। ইহা সার্বজনীন সত্য। যাহা হউক, কৃষ্ণ তখন অর্জুনের নিকট তিনটি প্রাচীন কাহিনী বিবৃত করেন[৩] এবং বলেন যে উহাদিগেতে গীতার সমস্ত মর্ম প্রকারান্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উহাদিগেতে বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি (অর্জুন) পরমগতি বা মোক্ষ লাভ করিতে পারিবেন।[৪] এই ভূমিকা হইতে অনায়াসে জানা যায় যে 'অনুগীতা'ও ভাগবতধর্মের গ্রন্থ। 'গীতা'র স্বপ্রণীত ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, "তথা এই গীতার্থধর্মকেই উদ্দেশ্য করিয়া ভগবানেরই দ্বারা 'অনুগীতা'য় উক্ত হইয়াছে 'স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদ-বেদনে' (ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে সেই ধর্ম নিশ্চয় সুপর্য্যাপ্ত[৫])। অধিকন্তু তথায় আরও উক্ত হইয়াছে, যে কিছু চিন্তা না করিয়া তুষ্ণীভাবে ব্রহ্মে লীন হয়, সে নিশ্চয় ধর্মী নহে, অধর্মীও নহে শুভাশুভকর্মকারীও নিশ্চয় নহে;'[৫] এবং 'জ্ঞান সন্ন্যাসলক্ষণ'[৬]। সুতরাং দেখা যায় শঙ্কর 'অনুগীতা'র অবতারণাতে যেমন উক্ত হইয়াছে তেমনই যথাযথ বিশ্বাস করিতেন,—'গীতা'র ন্যায় 'অনুগীতা'ও কৃষ্ণেরই অনুশাসন এবং উহা 'গীতা'র পরে প্রদত্ত হয়। অন্যত্র শঙ্কর একটা

---

১) মহাভা, ১৪।১৬।১০—২ ২) মহাভা, ১৪।১৬।১৩.১

৩) সেই তিনটি কাহিনী যথাক্রমে এই, (১) ব্রাহ্মণ-বাসুদেব সংবাদ (১৬শ—১৯শ অধ্যায়), (২) ব্রাহ্মণ-গীতা বা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সংবাদ (২০শ—৩৪তম অধ্যায়), এবং (৩) গুরু-শিষ্য-সংবাদ (৩৫তম—৫১তম অধ্যায়)। জনৈক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে মোক্ষলাভের উপায় ব্যাখ্যা করেন। জনৈক সিদ্ধ ঐ বিষয়ে কশ্যপ নামক ব্রাহ্মণকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে তাহা বলেন। উহাই ব্রাহ্মণ-বাসুদেব সংবাদ। কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে যুদ্ধের প্রাক্‌কালে রথের উপরে তিনি ঐ তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (১৪।১৯।৫৫) এবং ততোধিক অপর কোন বক্তব্য নাই। (১৪।১৯।৬৬) ব্রাহ্মণগীতা জনৈক ব্রাহ্মণের নিজের স্ত্রীর প্রতি তত্ত্বোপদেশ—কর্মরহস্যের উপদেশ। ঐ আখ্যায়িকার শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে উহা রূপক, তাঁহার মনই ঐ ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ঐ ব্রাহ্মণী এবং তিনি স্বয়ং ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমেশ্বর। (১৪।৩৪।১২) তাহাতে জানা যায় যে কর্মরহস্য সম্বন্ধে কৃষ্ণ আপন মনে মনে যে বিচার ও মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সংবাদের রূপকচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। গুরুশিষ্য সংবাদের বিষয় ব্রহ্ম, জীব ও জগতের তত্ত্ব। পরমজ্ঞেয় ব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অর্জুন কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। (১৪।৩৫।১) তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে সেই উপদেশ বর্ণনা করেন, যাহা জনৈক গুরু তাঁহার শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন। বর্ণনার অন্তে, অর্জুনের আগ্রহে, কৃষ্ণ বলেন যে তিনি স্বয়ংই ঐ গুরু এবং তাঁহার মনই উক্ত শিষ্য। (১৪।৫১।৪৬) সুতরাং দেখা যায়, ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বিচার করত কৃষ্ণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ঐ গুহ্য তত্ত্বই তিনি গুরু ও শিষ্যের সংবাদের রূপকচ্ছলে অর্জুনের নিকট ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণ আরও বলেন যে পূর্বে যুদ্ধের প্রাক্‌কালেও তিনি অর্জুনকে ঐ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। (১৪।৫১।৪৯)

৪) মহাভা, ১৪।১৬।১৪

৫) মহাভা, ১৪।১৬।১২.১

৬) "নৈব ধর্মী ন চাধর্মীন চৈব হি শুভাশুভী।
যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণিং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥" মহাভা, ১৪

৭) মহাভা, ১৪।৪৩।২৬.১

বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে উহা "অনুগীতায় ভগবান্ ব্যাসের" বচন।[১] ঐ উক্তিদ্বয়ের সমন্বয় করিলে এই পাওয়া যাওয়া যায় 'অনুগীতা'য় ভগবান্ ব্যাস কর্তৃক কৃষ্ণেরই উপদেশ বিবৃত হইয়াছে, আচার্য শঙ্কর তাহাই মনে করিতেন।[২]

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে সমগ্র 'মহাভারত'ই ভাগবতধর্মপর।[৩] 'মহাভারতে'র উপক্রমে এবং উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে তথায় বিষ্ণুতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রারম্ভে পরমর্ষি ব্যাস ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলেন 'মহাভারতে' তিনি "পাশুপত" মত এবং "হেতুনৈব সমং জন্ম দিব্যমানুষসংজ্ঞিতম্" বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] উহাতে তিনি কৃষ্ণ অবতারকে লক্ষ্য করিয়াছেন বোধ হয়। সৌতি বলেন "বাসুদেবের মাহাত্ম্য"ও 'মহাভারতে' বর্ণিত হইয়াছে।[৫] 'ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ" (ইহাতে সনাতন ভগবান্ বাসুদেবও কীর্তিত হইয়াছেন)।[৬] ভগবান্ বাসুদেব সম্বন্ধে তিনি বলেন, "তিনিই সত্য ও ঋত; তিনি পবিত্র ও পুণ্য, শাশ্বত পরব্রহ্ম, এবং সনাতন ধ্রুব জ্যোতিঃ। মনীষিগণ তাঁহার দিব্য কর্মসমূহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনি অসৎ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচরাতীত) এবং সদসৎ বিশ্ব তাঁহা হইতে প্রবর্তিত হয়। সন্ততি, প্রবৃত্তি, জন্ম, মৃত্যুও পুনর্জন্ম (তাঁহা হইতে হয়)। যাহা অধ্যাত্ম বলিয়া শ্রুত হইয়া থাকে, যাহা পঞ্চভূতগুণাত্মক, যাহা অব্যক্তাদি এবং যাহা তাহাদেরও পর (তৎসমস্তই) নিশ্চয়ই তিনি বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকেন। ধ্যানযোগবলান্বিত মুক্ত যোগিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে আদর্শে প্রতিবিম্বের ন্যায়, আপনাতে অবস্থিত বলিয়া দেখেন।"[৭] উপসংহারে বিবৃত হইয়াছে যে ভারতের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে সর্বত্রই হরি গীত হইয়াছে, উহাতে সনাতন শ্রুতিসমূহ এবং দিব্য বিষ্ণুকথা গীত হইয়াছে।[৮] উহাতে "বৈষ্ণবং যশঃ" (বা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য) গীত হইয়াছে।[৯]

'হরিবংশ' 'মহাভারতে'র খিল বা পরিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার নাম হইতেই জানা যায় যে উহাতে বিশেষভাবে হরি বা কৃষ্ণের বংশের বৃত্তান্তই বর্ণিত হইয়াছে। উহার প্রারম্ভেও তাহা স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে।[১০] উহাতে প্রসঙ্গক্রমে ঐ বংশে প্রচলিত অধ্যাত্মতত্ত্বের ও স্বল্পবিস্তর বিবরণ আছে। সুতরাং 'হরিবংশ'ও প্রাচীন ভাগবতধর্মের ইতিহাসের উপকরণ।

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভে উহা রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। আমরা পরে প্রাচীন ভাগবতধর্মের রূপান্তর প্রদর্শন কালে উহা বিবৃত করিব।[১১] উহা

---

১) "তথা চ স্মরণমনুগীতাসু ভগবতো ব্যাসস্য ক্রিয়াবিস্তির্হি কৌন্তেয়" ইত্যাদি। (বৃহউপ, ১।৪।১০) এইখানে উদ্ধৃত বচন এই,—মহাভা, ১৪।১৯।৫৯

২) 'সনৎসুজাতীয়ে'র ভাষ্যে ও শঙ্কর কতিপয় স্থলে 'অনুগীতা'র বচন স্পষ্টত নামোল্লেখ পূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "তথা চানুগীতাসু স্পষ্টমাহ ভগবান্" (২।৬); "তথা চ সর্বমনুগীতাসু স্পষ্টমাহ ভগবান্" (২।২০) ইত্যাদি।

৩) পরে দেখ।

৪) মহাভা, ১।১।৬৭

৫) মহাভা, ১।১।১০০.১

৬) মহাভা, ১।১।২৫৬.১

৭) মহাভা, ১।১।২৫৬.১—২৬০

৮) মহাভা ১৮।৬।৯৩—৪

৯) মহাভা, ১৮।৬।৯৮৯

১০) 'হরিবংশ', ১।১।৯-১০, ১৩—

১১) পরে দেখ

হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ’ “ভারতাখ্যান” বা “ভারতে”র পরে বিরচিত হয় এবং উভয়ত্র ভাগবতধর্ম-ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ’ প্রাচীন ভাগবতধর্মের অন্যতম মুখ্য উপকরণ। ‘শাণ্ডিল্যসংহিতা’য় উহাকে “ভাগবতাগম” ও “পরমাগম” বলা হইয়াছে।[১]

‘বিষ্ণুপুরাণ’ও বৈষ্ণবধর্মের গ্রন্থ। উহার উপসংহারে আছে যিনি (প্রকৃতপক্ষে) রূপ-বিবর্জিত”, অথচ (অন্য দৃষ্টিতে) সর্বস্বরূপ ও সর্ববিৎ” সেই ভগবান্ বিষ্ণুই উহাতে কীর্তিত হইয়াছেন।[২] উহার আদি, মধ্য ও অন্তে (অর্থাৎ সর্বত্র) অখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রভু, এবং চরাচরের গুরু ব্রহ্ম-জ্ঞানময় ভগবান্ অচ্যুত বর্তমান।[৩] সর্বতোভাবে বিষ্ণুপরক বলিয়াই উহা ‘বিষ্ণুপুরাণ’ বলিয়া খ্যাত।

অপর কোন কোন পুরাণেও বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্যের, উহার সাধনের এবং বিষ্ণুভক্তগণের আচরণের স্বল্পবিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। ‘বায়ুপুরাণে’ উক্ত হইয়াছে অষ্টাদশ মহাপুরাণে বহুবিধ ধর্মসমূহ বিনিরূপিত হইয়াছে। বহুবিধ যোগধর্ম, সাংখ্য(ধর্ম) ও ভাগবত(ধর্ম) উহাদের অন্যতম।[৪] উহাদিগেতে “ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও আর্হত স্বভাবনিয়ত এই ষড়্দর্শন উক্ত হইয়াছে।”[৫] কোন কোন পুরাণের মতে, ১৮ মহাপুরাণের ছয়টিতে বিষ্ণুর মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে, ছয়টিতে শিবের এবং ছয়টিতে ব্রহ্মার মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে; ‘বিষ্ণুপুরাণ’ ‘ভাগবতপুরাণ’, ‘নারদপুরাণ’, ‘গরুড়পুরাণ’, ‘পদ্মপুরাণ’ ও ‘বরাহপুরাণ’—এই ছয়টি বৈষ্ণব পুরাণ; ‘মৎস্যপুরাণ’, ‘লিঙ্গপুরাণ’, ‘শিবপুরাণ’, ‘কূর্মপুরাণ’, ‘স্কন্দপুরাণ’ ও ‘অগ্নিপুরাণ’—এই ছয়টি শৈব পুরাণ; এবং ‘ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ’, ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’, ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’, ‘ভবিষ্যপুরাণ’, ‘বামনপুরাণ’ ও ‘ব্রহ্মপুরাণ’—এই ছয়টি ব্রাহ্মপুরাণ; বৈষ্ণবপুরাণ সাত্ত্বিক, ব্রাহ্মপুরাণ রাজসিক এবং শৈব পুরাণ তামসিক।[৬] তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসের উপকরণ উক্ত বৈষ্ণব পুরাণসমূহেই পাওয়া যাইবে, অন্যত্র নহে। কেননা, প্রথমত অষ্টাদশ পুরাণসমূহের ঐ বিভাগ সর্ববাদীসম্মত নহে। অন্যত্র অন্য প্রকার বিভাগও দেখা যায়। যথা, ‘স্কন্দপুরাণে’ আছে, “অষ্টাদশ পুরাণের দশটীতে শিব, চারিটিতে ভগবান ব্রহ্মা, দুইটীতে দেবী এবং দুইটীতে হরি গীত হইয়াছেন।” উহার অন্যত্র আছে, ‘শিবপুরাণ’, ‘ভবিষ্যপুরাণ’ ‘মার্কণ্ডেয়পুরাণ’, ‘লিঙ্গপুরাণ’, ‘বরাহপুরাণ’, ‘স্কন্দপুরাণ’, ‘মৎস্যপুরাণ’, ‘কূর্মপুরাণ’, ‘বামনপুরাণ’ ও ‘ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ’—এই দশটি শৈব পুরাণ; এই সকলে শিবেরই মহিমা অসাধারণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে; ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ‘ভাগবতপুরাণ’, ‘নারদপুরাণ’ ও ‘গরুড়পুরাণ’—এই চারিটি বৈষ্ণবপুরাণ, ‘ব্রহ্মপুরাণ’ ও ‘পদ্মপুরাণ’—ব্রাহ্মপুরাণ; ‘অগ্নিপুরাণ’ আগ্নেয়পুরাণ; এবং

---

১) ‘শাণ্ডিল্যসংহিতা’, ভক্তিখণ্ড, ৩।১১।৪, ২৫; ৪।১১।৩৬, ৪৫ দেখ।

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটীর নাম ‘ভাগবতসংহিতা’। (শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসূচীর ১০৫ সংখ্যক গ্রন্থ) উহাকেও ভাগবতাগম বলা যায়। পরন্তু উহা অবশ্যই ভিন্ন গ্রন্থ।

২) বিষ্ণুপু, ৬।৮।২৭ ৩) বিষ্ণুপু, ৬।৮।৫৫.১। আরও দেখ—৩।৬।২৭

৪) বায়ুপু (কলিকাতাসং), ১০৪।১১, ১৪ ৫) ঐ, ১০৪।১৬

৬) যথা দেখ—মৎস্যপু, ৫৩।৬৫—; পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৬৩।৮১.২—৮৬

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' সবিতা বা সৌরপুরাণ।[১] 'অগ্নিপুরাণে'র বক্তা অগ্নি। সেইহেতু উহাকে আগ্নেয় পুরাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রোক্ত বলিয়াই 'ব্রহ্মপুরাণ' ও 'পদ্মপুরাণ'কে ব্রাহ্মপুরাণ বলা হইয়াছে, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'র বক্তা সাবর্ণি। তিনি সূর্য-তনয় বলিয়া খ্যাত। সেই হেতু তৎপ্রোক্ত পুরাণকে সবিতা পুরাণ বলা হইয়াছে। পরন্তু শৈব ও বৈষ্ণব পুরাণ-বিভাগ সেই প্রকারে বক্তা-দৃষ্টিতে করা হয় নাই। কেননা, শৈবপুরাণ নামে কথিত দশ পুরাণের বক্তা শিব নহেন এবং বৈষ্ণব পুরাণ নামে কথিত চারি পুরাণের বক্তা বিষ্ণু নহেন। দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরিক বিষয় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—'মৎস্যপুরাণে' শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই কথা আছে; 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' মুখ্যতঃ কৃষ্ণ বা রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব-পরক, ব্রহ্মা-পরক নহে; 'ব্রহ্মপুরাণে', সূর্য, শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে, ব্রহ্মার মাহাত্ম্যের কিছুই নাই, 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ' ও 'ভবিষ্যপুরাণ'কে কোন সম্প্রদায়বিশেষের বলা যায় না। 'বায়ুপুরাণে',—যাহা শৈব পুরাণ বলিয়া পরিগণিত—উক্ত হইয়াছে যে আঠার পুরাণের সমস্তগুলিতেই অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ভাগবতধর্মও এবং অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বৈষ্ণব দর্শনও নিরূপিত হইয়াছে।[২] শৈব পুরাণ বলিয়া কথিত 'স্কন্দপুরাণে'র—'স্কন্দমহাপুরাণে'র, 'স্কন্দ-উপপুরাণে'র নহে—এক উপখণ্ডের নাম 'বাসুদেব-মাহাত্ম্য'।[৩] উহা 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের মূলের[৪] পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র,—অথবা, খুব প্রকৃত বলিতে, পরিবিকৃত রূপ মাত্র। তাহাতে কোন সংশয় নাই। নারায়ণীয় ধর্ম সম্বন্ধে ভীষ্ম যাহা যাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন বলিয়া 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে, তাহা তাহা ভগবান স্কন্দ মহর্ষি সাবর্ণির নিকট পুনঃ বিবৃত করেন বলিয়া 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে। নারায়ণীয়াখ্যানের অনেক বচন অল্পাধিক পরিবর্তন সহ 'বাসুদেব-মাহাত্ম্যে' স্থান পাইয়াছে। এবং তাহাতে আরও বহু অবান্তর বিষয় সংযোজিত করিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রাচীন নারায়ণীয়াখ্যানের দার্শনিক সিদ্ধান্ত উহাতে অতি বিকৃত করা হইয়াছে।

'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ' নামে একটা পুরাণ আছে। উহার নাম হইতে বুঝা যায় যে উহা বিষ্ণুধর্ম-বিষয়ক উত্তরপুরাণ। 'নারদপুরাণে' 'বিষ্ণুপুরাণে'র বিষয়ানুক্রমণিকা বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে উহার দুই ভাগ। "আদিভাগে" ছয় অংশ আছে। উহাতে শক্তিপুত্র (=পরাশর) মৈত্রেয়ের নিকট পুরাণের অবতারিকা নির্দেশ করিয়াছেন। অনন্তর শৌনকাদির প্রার্থনায় সূত 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' নামে কথিত ভাগ বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ আদিভাগই বর্তমান 'বিষ্ণুপুরাণ'। এবং ঐ উত্তরভাগ বর্তমান বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ'। অধুনা উভয়কেই সম্পূর্ণ পৃথক মনে করা হয়। পরন্তু 'নারদপুরাণে'র ঐ বিবরণ হইতে জানা যায় যে 'বিষ্ণু-

---

[১] 'অষ্টাদশপুরাণদর্পণ', পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র প্রণীত, মুম্বই, ১৮৪৪ শক, ৪৫-৬ পৃষ্ঠা দেখ।

[২] বায়ুপু, ২।৪২।১১—৭

[৩] 'নারদপুরাণে' বিবৃত 'স্কন্দপুরাণে'র বিষয়ানুক্রমণিকায় 'বাসুদেব-মাহাত্ম্য'কে উহার প্রথম খণ্ড 'মাহেশ্বর খণ্ডে'র অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। পরন্তু মুম্বাইয়ের খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত 'স্কন্দ-পুরাণে' উহাকে দ্বিতীয় 'বৈষ্ণব খণ্ডে'র অন্তিম (=নবম) উপখণ্ড করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে আমরা সেই সংস্করণের উপযোগ করিয়াছি।

[৪] পরে দেখ।

ধর্মোত্তর'কে প্রাচীনকালে 'বিষ্ণুপুরাণে'রই অন্তর্গত, উহার উত্তরভাগ বলিয়া মনে করা হইত।[১]

জে, এন, ফার্কুহর মহাশয়ের মতে 'হরিবংশ' ও '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' বিশেষভাবে ভাগবত বৈষ্ণবদিগের, আর 'বিষ্ণুপুরাণ' পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ।[২] ঐ উভয় প্রকার বৈষ্ণবগণের পার্থক্য তিনি এই প্রকার বলিয়া মনে করেন,—ভাগবতগণ স্মার্ত বৈষ্ণব; যদিও তাঁহারা মুখ্যতয়া বিষ্ণুরই ভক্ত, তথাপি তাঁহারা পঞ্চদেবতোপাসক এবং বিষ্ণু ও শিবকে সমান মনে করেন; তাঁহারা শ্রৌত আচারবিধি মানেন; পক্ষান্তরে পাঞ্চরাত্রগণ সাম্প্রদায়িক; তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুরই উপাসনা করেন, অপর কোন দেবতার নহে; শিব বা অপর কোন দেবতাকে তাঁহারা বিষ্ণুর সমকক্ষ বলিয়া জানে না।[৩] এই পার্থক্য অঙ্গীকার করত, 'হরিবংশে' বিষ্ণু ও শিবের সমভাবে উপাস্যত্বের কথা দেখিয়া,[৪] ফার্কুহর অনুমান করেন যে উহা ভাগবত বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ। শ্রৌত আচারবিধি পালনের বিধান 'বিষ্ণুপুরাণে'ও পরিদৃষ্ট হয়। উহাতে আছে যে বর্ণাশ্রমধর্মপালন এবং বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই বিষ্ণু আরাধনার প্রশস্ত উপায়।[৫] অধিকন্তু উহাতে বেদবিরোধিগণকে তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে।[৬] তবে যদিও উহাতে অতি স্পষ্ট বাক্যে কৃষ্ণ ও শিবের অভিন্নতা স্থাপিত হইয়াছে,[৭] তথাপি প্রকারান্তরে কৃষ্ণ হইতে শিবের ন্যূনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক মাত্র এই কারণেই-বোধ হয় ফার্কুহর 'বিষ্ণুপুরাণ'কে পাঞ্চরাত্রদিগের গ্রন্থ মনে করেন। পরন্তু ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য করণের যেই সকল হেতু তিনি উপস্থিত করিয়াছেন সেইগুলি সর্বত্র এবং সর্ব সময়ে খাটে না। কেননা, প্রাচীন পাঞ্চরাত্রগণও পঞ্চদেবতোপাসক ছিলেন দেখা যায়। দেবীভাগবতপুরাণে' আছে, চারি বেদ, ধর্মসংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ, পাঞ্চরাত্র ("পাঞ্চরাত্রাদিকেষু") এবং অপরাপর ধর্মশাস্ত্র "সর্বেষ্টং সারভূতং পঞ্চদেবানুসেবনম্" (অর্থাৎ 'পঞ্চদেবতোপাসনা সকলেরই ইষ্ট এবং সারভূত')[৮]। উপলব্ধ কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও শিবাদি দেবতার পূজার বিধান আছে। যথা 'পরম সংহিতা'য় বিষ্ণুমূর্তি স্থাপনের সময়ে মন্দিরে গণেশশিবাদি অপর দেবতারও মূর্তি স্থাপনের কথা আছে এবং উহাদিগকেও নিয়মিত ভাবে যথারীতি পূজা করিতে হইবে, বলা হইয়াছে।[৯] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে বিষ্ণুর বাহ্যপূজায় প্রথমে গণেশের, পরে বাগীশ্বরীর, তথা ব্রহ্মা, ঈশান, বরুণ প্রভৃতি লোকপালগণের

---

১) বিণ্টার্নীজ লিখিয়াছেন যে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'কে কখন কখন 'গরুড়পুরাণে'র অংশ বলা হয়।

(M. Winternity, A History of Indian Literature, Vd. 1, Eng. trans. by Mrs. S. Ketkar, Calcutta, 1927,) তাহা সত্য নহে।

২) G, N, Farquhar, An outline of the religions Literature of India, 1920, pp, 148, 298

৩) ঐ, pp, 142—8, 179, 181

৪) 'হরিবংশ'

৫) বিষ্ণুপু, ৩।৮।১—

৬) ঐ, ১।৬।১৩—

৭) ঐ, ৫।৩৩শ অধ্যায়।

৮) দেবীভাগপু, ৯।৩৬।১০'২

৯) পরমসংহিতা, ১৯।৫৩—, ৮২, ৮৫ দেখ।

পূজা করিতে হইবে।[1] আরও আছে যে অগ্নিকার্যে বা হোমকার্যেও "ব্রহ্ম, মহেন্দ্র, রুদ্র, প্রভৃতি স্বদিক্স্থিত লোকপালগণকে শুভ গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা নিত্য পূজা করিবে।"[2] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় অতি স্পষ্ট বাক্যে বিষ্ণু ও শিবের অভেদ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে একই পরমতত্ত্ব শ্রুতিতে ব্রহ্ম, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে ভগবান্ বা বাসুদেব, যোগিগণ কর্তৃক হিরণ্যগর্ভ ও পাশুপতগণ কর্তৃক শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[3] পরে আরও বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে একই জ্ঞানস্বরূপ ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ ভগবান্ নানা সম্প্রদায় কর্তৃক নানারূপে উপাসিত হন।[4] কথিত হইয়াছে যে জগচ্চক্রাত্মক সুদর্শন ভগবান্ মহাদেবকে বলেন, "অন্তরং নৈব পশ্যামি তব দামোদরস্য চ" (আমি তোমার ও বিষ্ণুর মধ্যে অন্তর নিশ্চয় দেখি না')।[5] প্রাচীনকাল হইতে একটা বচন এদেশে সুপ্রচলিত আছে, "ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদের (সিদ্ধান্তের) বিস্তার কর্তব্য।"[6] তাহার উল্লেখ করত আচার্য রামানুজ 'শ্রীভাষ্যে' মুখ্যতয়া 'বিষ্ণুপুরাণে'রই সহিত মিলাইয়া তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছেন, উহারই আধারে তিনি স্বমত স্থাপন করিয়াছেন।[7]

স্বকৃত 'বেদার্থসংগ্রহে' রামানুজ লিখিয়াছেন যে একমাত্র 'বিষ্ণুপুরাণ'ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঔদীচ্য ও দাক্ষিণ্য সর্ব-শিষ্ট-ব্যক্তিগণ কর্তৃক সর্বধর্মের এবং সর্বতত্ত্বের ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত বলিয়া প্রশংসিত এবং পরিগৃহীত। উহাতেই শ্রুতির তত্ত্ব ঠিক ঠিক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অপর সমস্ত পুরাণ "অন্যবিষয়পরক। 'বিষ্ণুপুরাণে'র অবিরোধে উহাদিগকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উহাদের যে যে অংশ সেই প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না,—সর্বপ্রকারে 'বিষ্ণুপুরাণে'র বিরোধী হয়, সেই সকল 'তামস' বলিয়া উপেক্ষা কর্তব্য।[8] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র কিম্বা 'হরিবংশে'র কোন বচন তিনি উদ্ধৃত করেন নাই।[9] ঐ গ্রন্থদ্বয় যে তাঁহার অনেক পূর্বে বিরচিত তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে।[10] এবং উহারা বৈষ্ণবধর্মে মুখ্য গ্রন্থসমূহের অন্তর্গত, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। উহাদের সম্বন্ধে রামানুজের সম্পূর্ণ নীরবতার কারণ খুব সম্ভব এই যে তাঁহার সম্প্রদায়ে উহাদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত না, 'বিষ্ণুপুরাণে'র প্রামাণ্য মানা হইত। রামানুজের পূর্ববর্তী আচার্য যামুন 'বিষ্ণুপুরাণ'কে "পুরাণরত্ন" (অর্থাৎ 'পুরাণসমূহের মধ্যে রত্নস্বরূপ') বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।[11] উঁহারা পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী। সুতরাং ইহা

---

১) জয়াখ্যসংহিতা, ১৩।৯৭—, ১২২ ও ৭।৬৭·২—৭৭। ২) ঐ, ১৫।৮৪·২—৮৫·১, ২৫০—

৩) অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ২।৩৭—৯ ৪) ঐ, ৩৩।১৪·২— ৫) ঐ, ৪৩।১৬·১

৬) লেখকের 'বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থ দেখ।

৭) শ্রীভাষ্য, ১।১।১

৮) 'বেদার্থসংগ্রহ', সুদর্শনসূরি-কৃত ব্যাখ্যা সহিত, পণ্ডিত শ্রীধরণীধর শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত, বৃন্দাবন, ১৯৭৮ বিক্রমসম্বৎ, ২০২—পৃষ্ঠা।

৯) 'বেদান্ততত্ত্বসার' নামে একটি গ্রন্থ আচার্য রামানুজ কর্তৃক প্রণীত বলিয়া কথিত হয়। উহাতে (বিষ্ণু) 'ভাগবতপুরাণে'র বচন প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ('বেদান্ততত্ত্বসার', 'পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত, পৃষ্ঠা, ২৯, ৩৭ ও ৫৪) এক স্থলে (২৯ পৃষ্ঠা) ভাগবতের নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

১০) পূর্বে দেখ। ১১) যামুন প্রণীত 'স্তোত্ররত্ন' বা 'আলবন্দার-স্তোত্র', ৪র্থ শ্লোক।

অনুমান করা যাইতে পারে বোধ হয় যে পাঞ্চরাত্রী বৈষ্ণবগণ রামানুজের সময়ে ও তৎপূর্বে 'বিষ্ণুপুরাণ'কে মানিত, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'কে মানিত না। পরন্তু ততোধিক ইহাও মনে করা যাইতে পারে না যে 'বিষ্ণুপুরাণ' একমাত্র পাঞ্চরাত্রীদিগেরই গ্রন্থ—যেমন ফার্কুহর মনে করেন। কেননা, রামানুজের পূর্বপক্ষী নির্বিশেষাদ্বৈতবাদী ও স্বমতের সমর্থনে 'বিষ্ণুপুরাণে'র বহু বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং উহাকে তাহাদিগেরও গ্রন্থ বলা যায়। রামানুজের অল্পকাল পরে পাঞ্চরাত্রী বৈষ্ণবগণও, অন্ততঃ উহাদের কেহ কেহ '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণে'র প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন দেখা যায়। যথা, বেঙ্কটনাথ উহার বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য মধ্ব (জন্ম ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার অনুযায়িগণ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'কে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানেন। 'ব্রহ্মসূত্রে'র স্বপ্রণীত ভাষ্যে মধ্ব অন্যান্য পুরাণের ন্যায় উহারও বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] উহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মসূত্র-মহাভারতগায়ত্রীবেদসম্বন্ধশ্চায়ং গ্রন্থঃ" (এই গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র', 'মহাভারত', গায়ত্রী এবং বেদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট)। ঐ সম্বন্ধ কি প্রকারের, তাহা 'গরুড়পুরাণ' হইতে, উহার নামোল্লেখ পূর্বক ("উক্তং চ গারুড়ে"), একটা বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন,[২]

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্‌ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্দসংযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসহস্রঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধঃ।"

'শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক গ্রন্থ (বা পুরাণ) সাক্ষাৎ ভগবান্-কর্তৃক উক্ত। উহা আঠার হাজার গ্রন্থ (বা শ্লোক), একশত বিচ্ছেদ (বা অধ্যায়) এবং বার স্কন্দ সংযুক্ত। উহা 'ব্রহ্মসূত্রে'র অর্থ—(বা তাৎপর্যাত্মক), (মহা)ভারতের অর্থবিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত, এবং (অপর) পুরাণসমূহের সারস্বরূপ।' স্বয়ং '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও আছে যে উহা "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্",[৩] সর্ববেদান্তের সার যে ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণ অদ্বিতীয় বস্তু তন্নিষ্ঠ।"[৪] মধ্ব বলেন, উহা "ভগবান কর্তৃক গলিত এবং শুক কর্তৃক দ্রবীকৃত।" 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহা সমর্থন করিয়াছেন।[৫] অন্যত্র মধ্ব 'ব্যাসস্মৃতি' হইতে একটা বচন অনুবাদ করিয়াছেন। তন্মতে বেদ,

---

১) যথা দেখ—'ব্রহ্মসূত্রে'র মধ্ব-কৃত ভাষ্য, ১।১।৪, ১৭, ৩০ ইত্যাদি।

২) 'শ্রীমদ্‌ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১।১।১ (মধ্বাচার্যের গ্রন্থাবলী, কুম্ভকোণম্, মধ্ববিলাস বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত, ৭৮৯-১ পৃষ্ঠা)। ঐ বচনটি জীবগোস্বামী কর্তৃকও অনূদিত হইয়াছে। ('সাররূপঃ' স্থলে 'সামরূপঃ' পাঠান্তরে)। পরন্তু মুদ্রিত 'গরুড়পুরাণে' উহা নাই।

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।১।৩ ৪) ঐ, ১২।১৩।১২

৫) "উক্তং চ ব্রহ্মাণ্ডে,—

ধর্মপুষ্পস্বর্ণপত্রঃ কামপল্লবসংযুতঃ।
মহামোক্ষফলো বৃক্ষো বেদোঽয়ং সমুদীরিতঃ॥

ইতিহাস (=মহাভারত), ভাগবতপুরাণ এবং মীমাংসা মূলপ্রমাণ। অপর শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যেগুলি উহাদের অবিরোধী সেইগুলি প্রমাণ, আর যেগুলি উহাদের বিরোধী সেইগুলি অপ্রমাণ।[১] একস্থলে মধ্ব বলিয়াছেন "(মহা)ভারত, মূলরামায়ণ, ভাগবতপুরাণ এবং পঞ্চরাত্র—(এই সকল) পঞ্চমবেদ (বলিয়া) কথিত হয়।"[২] এইরূপে দেখা যায়, মধ্ব '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণ'কে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিতেন।

চৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণে'র প্রমাণ শ্রেষ্ঠতম মানা হয়। ঐ সম্প্রদায়ের তত্ত্বব্যাখ্যাতাদিগের প্রধানতম আচার্য জীবগোস্বামী (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) মনে করেন যে[৩] উহা "সমস্ত প্রমাণসমূহের চক্রবর্তীভূত", ভগবানের প্রিয় বলিয়া, তথা ভাগবতের (বা ভগবদ্‌ভক্তের) অভীষ্ট বলিয়া উহা পরম সাত্ত্বিক। উহা 'ব্রহ্মসূত্রে'র "অকৃত্রিমভাষ্যভূত"। সর্ববেদার্থের সূত্রস্বরূপ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া উহা প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া উহাতেই সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হয় ("যস্মিন্নেব সর্বশাস্ত্র-সমন্বয়ো দৃশ্যতে")। আচার্য মধ্ব কর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বোক্ত 'গরুড়পুরাণ'-বচন, 'সাররূপঃ' স্থলে 'সামরূপ' পাঠান্তরে, তিনিও অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যাহা প্রথমে সূক্ষ্মরূপে মনে আবির্ভূত হয়, তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করত সূত্ররূপে পুনঃ প্রকটিত হয়; পরে বিস্তীর্ণভাবে সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতরূপে (প্রকটিত হয়)। (সেই কারণে শ্রীভাগবত) 'ব্রহ্মসূত্রসমূহের অর্থ' অর্থাৎ উহাদের অকৃত্রিমভাষ্যভূত। এইরূপে উহা ভাষ্যভূত বলিয়া স্বতঃই সিদ্ধ হওয়াতে অর্বাচীন অপর অপর (ভাষ্যসমূহ) স্ব স্ব কপোলকল্পিত (বলিয়া সিদ্ধ হয়। তাহাদের যেইটি যেইটি) উহার অনুগত সেইগুলিই আদরণীয় বলিয়া জানা যায়।" যেমন বেদসমূহের মধ্যে সাম শ্রেষ্ঠ, তেমন পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ। তাই বলা হইয়াছে যে উহা "পুরাণ-সমূহের সামরূপ।" "তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্" ('এই প্রকারে ইহা স্থির হয় যে বর্তমান কালে একমাত্র শ্রীভাগবতেরই বিচার করা পরমার্থবিবিদিষুগণের উচিত')। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,[৪] উহার বাক্যের বলবত্তমত্ববশত

শাতি তানি ফলানীহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন তু।
ভারতাদীনি যানীহ তথা ভাগবতং ভুবি॥
আদ্রীকৃতানি তানীহ শুকপ্রভৃতিভির্জনৈঃ।
খ্যাপয়দ্‌ভির্গুরুপ্রোক্তান্ বেদার্থান্ গ্রন্থনিষ্ঠিতান্॥" ইত্যাদি
—('ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১।১।৩ (মধ্ব-গ্রন্থাবলী, ৭৮৯-২ পৃষ্ঠা)।

আরও দেখ—

"সর্বশ্রুত্যর্থসম্পন্নান্ শ্লোকান্ সত্যবতীসুতঃ।
একৈকশাখাস্তত্যর্থান্ জগৌ সর্বোপলক্ষণান্॥
ববন্ধ তান্ ভাগবতে প্রতিশ্লোকং পৃথক্‌শ্রুতিঃ। ইতি তন্ত্রভাগবতে।"
—(ঐ, ১০।৯৪।১৫ (মধ্ব-গ্রন্থাবলী, ৮৭৫-১ পৃষ্ঠা)।

[১] মধ্বের 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ভাষ্য', ৩।৫।৩ (মধ্ব-গ্রন্থাবলী, ৪৮৪-২ পৃষ্ঠা)।

[২] মধ্বের 'ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ভাষ্য', ২।২৪ (মধ্ব-গ্রন্থাবলী, ৫৮৮-১ পৃষ্ঠা)।

[৩] জীবগোস্বামী প্রণীত 'ভাগবতসন্দর্ভে'র ১ম 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র প্রারম্ভে দেখ।

[৪] 'ভাগবতসন্দর্ভে'র ৪র্থ 'কৃষ্ণসন্দর্ভ—'

ভাগবতপুরাণ অপর সমস্ত শাস্ত্রের উপমর্দক ; সুতরাং অপর শাস্ত্রকে উহার আনুগুণ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। উহা "সর্বশাস্ত্রচক্রবর্তী।'

পাঞ্চরাত্র সংহিতা বা তন্ত্র নামক গ্রন্থসমূহেও পাঞ্চরাত্র, সাত্বত, ভাগবত বা একান্ত ধর্মের বিবরণ আছে। উহারা প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্মেরই শাস্ত্র। 'পুরুষোত্তমসংহিতা' নামক এক পাঞ্চরাত্রসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "ভগবদ্‌ভক্তিই ভক্তদিগের মুক্তির কারণ। তদ্‌ভক্তিবোধক শাস্ত্র পাঞ্চরাত্রাগম বলিয়া স্মৃত হয়।"[১] উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে ঐ শাস্ত্র একায়নবেদ, মূলবেদ, সাত্বত, তন্ত্র, আগম, এবং ভগবচ্ছাস্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থকে।[২] "পাঞ্চরাত্রাখ্য সেই উত্তম রহস্যাম্নায় পুরাকালে রজোগুণ অপনোদনার্থ, বিষ্ণু কর্তৃক ব্রহ্মাকে প্রোক্ত হইয়াছিল।"[৩] ব্রহ্মা কেশবের মুখ হইতে সমগ্র রহস্যাম্নায় পাঁচ রাত্রিতে শ্রবণ করেন। তাহাতে উহা 'পাঞ্চরাত্র' আগম বলিয়া স্মৃত হইতে থাকে।[৪] "মোক্ষ অয়নের (অর্থাৎ প্রাপ্তির) এতদ্‌ভিন্ন অন্য পন্থা নিশ্চয় নাই। সেই কারণে মনীষিগণ উহাকে 'একায়ন'ও বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। দিব্যগতিপ্রাপ্তি-বিধায়ক আচার কথন হেতু এবং মাহাত্ম্যতত্ত্ব কথন হেতু উহা 'আগম' বলিয়া পরিগণিত হয়। হে যোগিগণ! ঐ মহান্ (শাস্ত্র) মহান্ বেদবৃক্ষের মূলভূত; আর ঋগাদি (বেদসমূহ) তাহার স্কন্ধভূত এবং শাখাভূত। (সেইহেতু, তথা) মুখ্যতয়া জগতের মূলবেদ (-স্বরূপ) বাসুদেবের প্রতিপাদক বলিয়া, হে দ্বিজগণ! উহার মূলবেদাখ্যতা সিদ্ধ হয়। তত্ত্বস্বরূপ হরি কর্তৃক প্রোক্ত বলিয়া উহাকে 'সাত্বত' বলিয়া মনে করা হয়। যেহেতু উহা তন্ত্রমন্ত্রসমাশ্রিত বিপুল ধর্মসমূহ বিস্তার করে ('তনোতি') এবং (তদ্‌দ্বারা সংসার-দুঃখ হইতে) ত্রাণ করে, সেইহেতু উহা 'তন্ত্র' বলিয়া অভিহিত হয়। পাঞ্চরাত্র (শাস্ত্র) সর্বশাস্ত্রের মূল কারণ।"[৫] 'ভগবচ্ছাস্ত্র' নামের ব্যুৎপত্তি, হয়ত অনায়াস-বোধ্য বলিয়া, ঐখানে প্রদর্শিত হয় নাই। ভগবান্ কর্তৃক প্রোক্ত কিম্বা ভগবান্ বিষয়ক শাস্ত্র বলিয়া উহাকে 'ভগবচ্ছাত্র' বলা হয়। পাঞ্চরাত্র 'সিদ্ধান্ত নামেও অভিহিত হয়।[৬] 'পাদ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে "মহোপনিষৎ"কেই 'সিদ্ধান্ত' বলা হয়। যে সকল মনীষী মীমাংসাদি শাস্ত্রসমূহে সিদ্ধার্থ তাহাদিগের অন্তে ঐ শাস্ত্রে অধিকার হয়। সেই হেতু উহাকে 'সিদ্ধান্ত' বলা হয়।[৭] 'ঈশ্বরসংহিতা'র মতে, যাহারা কোটি কোটি জন্মে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তে উহাতে স্থিতি হয় বলিয়া উহাকে 'সিদ্ধান্ত' বলা হয়।[৮] 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে, "যেহেতু বেদান্ত, ইতিহাস, এবং পুরাণ সহ বেদ দ্বারা যাহারা কোটি কোটি জন্মে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের অন্ত ইহাতে হয় বলিয়া স্মৃত হয়; তথা, যেহেতু বাসুদেবাখ্য

---

[১] পুরুষোত্তমসং, ১।৪ এই শ্লোকে অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্র নামক মহচ্ছাস্ত্র শুভ এবং নিঃশ্রেয়সঙ্কর; তদ্দ্বারা মনুষ্য জ্ঞানমার্গে ("জ্ঞানবর্ত্মনা") সাংসারিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

[২] ঐ, ১।১০-২—১১ [৩] ঐ, ১।৫ [৪] ঐ, ১।৬-২—৭-১ [৫] ঐ, ১।১২—৭

[৬] যথা, 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে

"এবং নানাগমানাং চ সামান্যং বিদ্ধি সর্বদা
নামদ্বয়ং সিদ্ধান্তং পঞ্চরাত্রেতি পৌষ্কর॥"—(৩৮।৩০৩)

[৭] পাদ্মসং, ৪।১৯।১০৭-৮ [৮] ঈশ্বরসং, ২১।৫৮১-২—৫৮২-১

অব্যয় পরব্রহ্ম এই শাস্ত্র হইতে, জ্ঞানপূর্বক কর্ম দ্বারা, সম্যক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব, হে বিপ্র, ইহার 'সিদ্ধান্ত' সংজ্ঞা নিশ্চয় সার্থক।"[১]

পাঞ্চরাত্রসংহিতা সর্বসমেত ১০৮টি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন পাঞ্চরাত্র-সংহিতায়ও তাহার উল্লেখ আছে। পরন্তু উহা সংশয়াত্মক। কেননা, ১০৮ সংহিতার নামোল্লেখ করিতে গিয়া উপলব্ধ কোন কোন সংহিতা তদপেক্ষা অধিকের, অপর কোন কোন সংহিতা তদপেক্ষা অল্পের নাম করিয়াছে, দেখা যায়। অধিকন্তু নাম সম্বন্ধেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ঐ সকল নামরাশির সমাহার করিলে ২১০টি সংহিতার বা তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় সংহিতার সদ্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ডক্টর শ্রেডার ২২৪ সংহিতার নামসূচী সংগ্রহ করিয়াছেন।[২]

পঞ্চরাত্রতন্ত্রের সংখ্যা ১০৮ বলিয়া প্রসিদ্ধি অবশ্যই পরে পরে হইয়াছিল। ঐ প্রসিদ্ধি কখন হইতে হয়, তাহা এখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা যায় না। তবে উহা যে পরে পরে হইয়াছিল তাহাতে কোন সংশয় নাই। কেননা, অপর একটা প্রাচীন কিম্বদন্তীও আছে যে, "জ্ঞানীদিগের পরমজ্ঞানদ পঞ্চরাত্র সপ্তবিধ।" 'ব্রহ্মপুরাণে' এবং উপলব্ধ 'নারদ-পাঞ্চরাত্রে' উহার উল্লেখ আছে।[৩] তৎপরে তন্ত্রের সংখ্যা পঁচিশ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। যথা, 'অগ্নিপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণ্বাদি দেবমূর্তিসমূহের প্রতিষ্ঠাবিধি বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ হয়গ্রীব ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলেন, "সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রই মৎকর্তৃক প্রোক্ত হইয়াছিল। (সেই সকল) মুনিগণ কর্তৃক ইহলোকে পঞ্চবিংশতি সংখ্যায় ব্যস্ত হইয়াছিল।"[৪] অতঃপর তথায় ২৫ তন্ত্রের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে।[৫] 'মাহেশ্বরতন্ত্রে'ও উল্লিখিত হইয়াছে যে পঞ্চরাত্রনামক বৈষ্ণবতন্ত্রসমূহ সংখ্যায় ২৫টী[৬] এবং তাহাতেও ২৫ তন্ত্রের নাম প্রদত্ত

---

[১] পৌষ্করসং, ৩৮।৩০৫-৭.১

[২] Schrader, Introduction to the Pancaratra, ৬-১২ পৃষ্ঠা।

[৩] 'ব্রহ্মপুরাণে'র বচন সাম্বশিব শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'বৈখানসাগমে'র ভূমিকায় অনূদিত হইয়াছে। 'নারদ-পাঞ্চরাত্র', ১।১।৫৬.২—৫৭ উভয়ত্র ঐ সাত পাঞ্চরাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। নারদপাঞ্চরাত্রে 'শৌনকীয়' স্থলে 'গৌতমীয়' পাঠান্তর আছে। পরন্তু শৌনক গৌতম গোত্রীয়। সুতরাং উভয় নাম একই গ্রন্থেরই। এই কিম্বদন্তীর প্রাচীনত্ব বিষয়ে পূর্বে দেখ।

[৪] অগ্নিপু, ৩৯।১.২—২.১ মুম্বাইয়ের খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত 'অগ্নিপুরাণে' এই প্রকার পাঠ আছে,—

> "প্রোক্তানি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাণাণি বৈ ময়া॥
> ব্যস্তানি মুনিভির্লোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া।"

'সপ্তরাত্রাণি' স্থলে 'সপ্তবিধানি' পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা নানাপ্রকার দোষ আপতিত হয়।

[৫] অগ্নিপু, ৩৯।২.২—৫

[৬] 'শ্রীমাহেশ্বরতন্ত্র', ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াচার্য—সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, কাশী, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬।১৬ (মহেশ্বরের উক্তি)। শিব বলেন যে ঐ সকল "বিষ্ণুপ্রোক্ত"। হয়গ্রীব বিষ্ণুরই রূপ। সুতরাং 'হয়গ্রীব-প্রোক্ত' ও 'বিষ্ণু-প্রোক্ত' অভিন্নার্থক।

হইয়াছে।[১] উভয়ত্র কিঞ্চিৎ পাঠভেদে একই বচন আছে। পরন্ত ঐ পাঠভেদকে লিপিকার-প্রমাদদোষজনিত মনে না করিয়া প্রকৃত বলিয়া পরিগ্রহণ করিলে তন্ত্রের সংখ্যা সর্বসমেত ২৯ হইবে।

বিষ্ণু-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রতন্ত্র বা সাত্বতশাস্ত্র মূলত একই ছিল। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে উহার দশবিধ ভেদ ছিল। যথা,—(১) ভগবৎ-সংহিতা, (২) কর্ম-সংহিতা, (৩) বিদ্যা-সংহিতা, (৪) কাল-সংহিতা, (৫) কর্তব্য-সংহিতা, (৬) বৈশেষিকী-ক্রিয়া-সংহিতা (৭) সংযম-সংহিতা, (৮) চিন্তা-সংহিতা, (৯) মার্গ-সংহিতা, এবং (১০) মোক্ষ-সংহিতা।[২] হয়ত ভগবৎ, কর্ম, বিদ্যা, প্রভৃতি দশটি প্রকৃত পক্ষে মূলগ্রন্থের দশটি আলোচ্য বিষয়। উহার এক এক অংশে এক এক বিষয়ের আলোচনা ছিল, এবং প্রত্যেক অংশ তদ্‌বিষয়ক সংহিতা নামে অভিহিত হইত। তাই বোধ হয় বলা হইয়াছে যে মূল সাত্বতশাস্ত্রের দশবিধ ভেদ। আচার্য মধ্ব 'কালসংহিতা', 'কর্মসংহিতা', প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] তাহাতে মনে হয় ঐসকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ। যাহা হউক, পরে পরে, শৈবাগমের ন্যায়, বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রাগমের আলোচ্য বিষয় জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া এবং চর্যা—এই চার বলিয়া পরিগণিত হইত। তাই দেখা যায় কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতার চার পাদ আছে,—জ্ঞান-পাদ, যোগ পাদ, ক্রিয়া-পাদ, এবং চর্যা-পাদ। যথা, 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "সর্বভূতের হিতার্থ আদিদেব (বাসুদেব) কর্তৃক চোদিত শুদ্ধ, অচ্ছিদ্র এবং পাপনাশক বৈষ্ণব শাস্ত্র চতুষ্পাদসমাযুক্ত এবং চতুর্বর্গফলপ্রদ।[৪] "বিজ্ঞান সকলের আদিতে। উহাকে সৃষ্ট্যুপোদঘাতও বলা হয়। তৎপরে যোগ। তৎপশ্চাৎ ক্রিয়া এবং তদনন্তর চর্যা।"[৫] "বিজ্ঞানং ভগবজ্‌জ্ঞানং তজ্‌জ্ঞানান্মুক্তি রুচ্যতে" ('ভগবানের জ্ঞানই বিজ্ঞান এবং ঐ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে)।[৬] "অব্যাকুল চিত্তের কোন এক বিষয়ে বন্ধন 'সংযোগ' (বা সম্যক্ যোগ)। হে চতুর্বক্ত্র, উহা দ্বিবিধ হইয়া থাকে। 'কর্ম অবশ্যই কর্তব্য' (এই দৃঢ় ভাবনা পূর্বক) কেবল (শাস্ত্রে) বিহিত কর্মসমূহে যে মনের নিত্য বন্ধন, উহা কর্মযোগ বলিয়া কথিত হয়। আর শ্রেয়ার্থে (বা পরমার্থে) যে চিত্তের সতত বন্ধন, উহা জ্ঞানযোগ বলিয়া বিজ্ঞেয়। তাহা শুভ এবং সর্ব-সিদ্ধিকর। যথোক্তলক্ষণ মদ্বিধ যোগে যাহার মন স্থিত হইয়াছে, সে সহজে এবং শীঘ্র মোক্ষলক্ষণ পরম শ্রেয় লাভ করে। পূর্বের (অর্থাৎ কর্মযোগের) অঙ্গ যমাদি, আর অপরের অঙ্গ বৈরাগ্যাদি। যমাদি অঙ্গ অষ্ট" ইত্যাদি।[৭] "কর্ষণাদি প্রতিষ্ঠান্ত ক্রিয়াবিধি।"[৮] "কর্ষণাদি-প্রতিষ্ঠান্ত কর্ম যাহার প্রসিদ্ধির জন্য, তাহাই সমারাধনবিধি (বা কর্মচর্যা)"।[৯] এই চর্যাকে বা ভগবানের সমারাধনবিধিকে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই কোন কোন

---

১) অগ্নিপু, ২৬।১৭—২০·১ ২) অহির্বুধ্ন্যসং, ১২।৪৪·২—৪৮

৩) 'ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়' মধ্বাচার্য প্রণীত, ১১।১৬।৮-৯; ১১।৩, ৬-৭ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী পৃষ্ঠা, ৮৯১·১, ৮৯৬·১, ৮৯৭·১ প্রভৃতি।

৪) পাদ্মসং, ১।১।১৯·২—২০; আরও দেখ—১।১।২৬; ১।২।২ ৫) ঐ, ১।২।৫

৬) ঐ, ১।২।৬·১ ৭) ঐ, ২।১।৩—; আরও দেখ—ঐ, ২।৩।১—; পরমসং, ১০।৪—

৮) পাদ্মসং, ৩।১।৬·১ ৯) ঐ, ৪।১।১

পাঞ্চরাত্রসংহিতায় ইহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে "ভগবানের উত্তম সমারাধনই (পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের) অভিধেয়।"[১] যাহা হউক, সকল পাঞ্চরাত্রসংহিতায় ঐ প্রকারে আলোচ্য-বিষয়-ভেদে পাদ-বিভাগ করা হয় নাই।[২]

বৈখানস শাস্ত্রও বৈষ্ণবধর্মের শাস্ত্র। সমস্ত বৈখানসাগমকারগণ তাহা বলিয়াছেন। মহর্ষি ভৃগু একস্থলে বলিয়াছেন, "বৈষ্ণব শাস্ত্র বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র—এই দ্বিবিধ বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক পরিকীর্তিত হয়।"[৩] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, বিষ্ণুর তন্ত্র দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়,—বৈদিক ও তান্ত্রিক; তান্ত্রিক আবার শুদ্ধ ও মিশ্র ভেদে দ্বিবিধ; বৈখানস বৈদিক, ভাগবত শুদ্ধতান্ত্রিক, এবং পাঞ্চরাত্র মিশ্র তান্ত্রিক।[৪] মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব বৈখানস এবং পঞ্চরাত্র—এই দ্বিবিধ বলিয়া বিবেচিত হয়।"[৫] মহর্ষি মরীচি এবং কাশ্যপও সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৬] মরীচি অন্যত্র বলিয়াছেন,—বৈষ্ণব চতুর্বিধ—অনাদি বৈষ্ণব, আদি বৈষ্ণব, অবান্তর বৈষ্ণব, ভাগবত বৈষ্ণব; বৈখানসমতানুযায়িগণ আদি বৈষ্ণব, আর পাঞ্চরাত্র-মতানুযায়ী অবান্তর বৈষ্ণব।[৭] তিনি আবার বলিয়াছেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত, মত, বা শাস্ত্র ত্রিবিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক, ও ভাক্ত; বৈখানস বৈদিক, পাঞ্চরাত্র তান্ত্রিক, আর ভাগবত ভাক্ত।[৮] তিনি আরও বলিয়াছেন, মহর্ষি বিখনা-কর্তৃক প্রোক্ত সূত্র প্রথমে ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে নির্গত হয়; সেইহেতু উহা 'বৈষ্ণবশাস্ত্র'। ঐ শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক বিখনা মুনিকে প্রোক্ত হইয়াছিল। সেইহেতু উহা "ভগবৎসূত্র" বা "ভগবচ্ছাস্ত্র" বলিয়া লোকে স্মৃত হয়।[৯] বৈখানস আগমসমূহের বিষয় দৃষ্টেও জানা যায় যে উহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র। বিষ্ণুর অর্চনাই উহাদের মুখ্য বিষয়। (পরে দেখ) সুতরাং উহারা বৈষ্ণব ধর্মেরই শাস্ত্র। কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা, 'শাণ্ডিল্য-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "(বিষ্ণুর) নিত্যপূজন ষড়্‌বিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক, স্মার্ত, মিশ্র, পৌরাণিক, এবং ভক্তিশাস্ত্রোদিত।"[১০] তন্মধ্যে তান্ত্রিক পদ্ধতি বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র ভেদে দ্বিবিধ; বৈখানস ব্রহ্মা-কর্তৃক, আর পাঞ্চরাত্র নারদ-কর্তৃক উদিত। স্মার্ত বিধি বৌধায়ন-প্রোক্ত।[১১] 'ঈশ্বরসংহিতা'র মতে, "রাজস" বৈষ্ণবশাস্ত্রই "পাঞ্চরাত্র-বৈখানস-বিভেদত দ্বিধা;"[১২] যেই সকল শাস্ত্র মূলত ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক্ প্রণীত,

---

১) যথা দেখ—পাদ্মসং, ১।১।৯৫'২ ; পুরুষোত্তমসং, ১।১৫'২

২) দেখ—Schrader, Introduction to the Pancaratra, ২২-৩ পৃষ্ঠা

৩) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৪ ৪) 'যজ্ঞাধিকার', ৫১।১-৪

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৫।১১৪'২ আরও দেখ—৬৫।১২২'২-৫ ; ৭৮।১.২-২ ; ৮০।১০-১

৬) 'বিমানার্চনাকল্প', ৭৭ পটল (৪৬৭ পৃষ্ঠা) ; আনন্দসং, ৯।১— ; 'জ্ঞানকাণ্ড', ১০৫ অধ্যায় (১৭১ পৃষ্ঠা)

৭) আনন্দসং, ৮।১৪-৮ ; আরও দেখ—১৭।১৮-২০ ৮) আনন্দসং, ৮।২০-৪

৯) "বৈষ্ণবং শাস্ত্রমেতদ্ধি পুরঃ বিষ্ণুমুখোত্থিতম্।
বিখনোমুনয়ে পূর্বং শাস্ত্রং ভগবতেরিতম্॥
তস্মাৎ হি ভগবচ্ছাস্ত্রং লোকে বৈখানসং স্মৃতম্।"
—(আনন্দসং, ১৪।৪০—৪১'১

এই বচনের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি 'শাস্ত্রং' স্থলে 'সূত্রং' পাঠান্তরে কিঞ্চিৎ পূর্বেও আছে। (আনন্দসং, ১৪।৩৩'২—৩৪'১) আরও দেখ, ১৪।৬২

১০) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ১।১০।৩৩ ১১) ঐ, ১।১০।৩৫—৩৬'১ ১২) ঈশ্বরসং, ১।৬১'২

এবং পরে ঋষিগণকর্তৃক স্ববিকল্প দ্বারা পরিস্কৃত এবং সংক্ষিপ্ত হইয়া প্রণীত সেই সকল 'রাজস'।[১] 'পদ্মপুরাণে' আছে, বিষ্ণুর অর্চন-বিধি ত্রিবিধ—শ্রৌত, স্মার্ত, এবং আগমোক্ত; বৈখানস শ্রৌত, বাসিষ্ঠ স্মার্ত, পাঞ্চরাত্র বিধান দিব্যাগম বলিয়া কথিত হয়।[২] সুতরাং উহারও মতে, বিষ্ণুর অর্চনা-বিধি-পর বলিয়া পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের ন্যায় বৈখানসশাস্ত্রও বৈষ্ণব শাস্ত্র। 'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা' নামক এক স্মৃতিগ্রন্থেও বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র—এই দ্বিবিধ বিষ্ণূপাসকের সদ্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩] আচার্য বেঙ্কটনাথ লিখিয়াছেন যে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তির প্রতিষ্ঠার্চনাদি বিষয়ে, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র ব্যতীত, বৌধায়ন, বিখনস্, শৌনক, প্রভৃতি আচার্যগণ প্রণীত শাস্ত্রসমূহও আছে।[৪]

'ঈশ্বরসংহিতা'র এই মাত্র পূর্বে উল্লিখিত বচন হইতে মনে হয় যে বৈখানস পাঞ্চরাত্রের পরবর্তীকালীন এক শাখা-ভেদ মাত্র। 'বিষ্ণুসংহিতা'র মতে বৈখানস পাঞ্চরাত্রতন্ত্রানুযায়িগণের এক বিভাগ, এবং 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে বৈখানস ভাগবতধর্মিগণের এক উপশ্রেণী। উহাদিগেতে বৈখানসের লক্ষণসমূহও নির্দেশিত হইয়াছে।[৫] বোধ হয় সেই কারণেই অর্বাচীন কালে কোন কোন পাঞ্চরাত্রী আচার্য বৈখানস তন্ত্রসমূহকে আর্ষপঞ্চরাত্র' এবং তন্নিষ্ঠগণকে 'কল্প-ভাগবত'ও বলিয়াছেন।[৬] পরন্তু 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র মতে, বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র ভিন্ন ভিন্ন,—উহারা তান্ত্রিক বৈষ্ণবের দুই শাখা। বৈখানস শাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত তাহাই। উহাদিগেতে আরও আছে, বৈখানস শাস্ত্রই আদি বৈষ্ণব শাস্ত্র, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র তদর্বাক্ কালে প্রচলিত। মহর্ষি অত্রি আরও বলিয়াছেন, "শ্রীশাস্ত্রের (=বৈখানস শাস্ত্রের) রক্ষণার্থ, তথা আপৎকালে পূজনার্থ, (ভগবান্ হরি) পুনরায় পাঞ্চরাত্র নামক উত্তম বৈষ্ণব শাস্ত্র উপদেশ করেন।"[৭] পরন্তু মহর্ষি ভৃগুর মতে বৈখানস মত পাঞ্চরাত্রমতের পরে প্রবর্তিত হয়। কেননা, তিনি লিখিয়াছেন, আদ্য কলিযুগে ভগবান্ ব্রহ্মা মৎস্যরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুকে বলেন,

---

১) ঈশ্বরসং, ১।৬১—২ ২) পদ্মপু, ৬।২৮০।৫৪—৬'১

৩) বৃদ্ধগৌতমসং, ৮।৮২'২ (জীবানন্দের'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ', ২য় খণ্ড, ৫৬৪ পৃষ্ঠা)।

ঐখানে বিবৃত হইয়াছে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন,

"কথং ত্বমর্চনীয়োঽসি মূর্তয়ঃ কীদৃশাস্তু তে।
বৈখানসাঃ কথং ব্রূয়ুঃ কথং বা পাঞ্চরাত্রিকাঃ॥"

ভগবান বলেন,

"শৃণু পাণ্ডব তৎসর্বমর্চনাক্রমমাত্মনঃ।" ইত্যাদি।

এই বচন আচার্য বেঙ্কটনাথ কর্তৃকও অনূদিত হইয়াছে। তিনি উহাকে "ব্যাসাদিনিবদ্ধবৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রকাণ্ডাদি"র বচন বলিয়াছেন। ('পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ১ম অধিকার (২৫-৬ পৃষ্ঠা) বেঙ্কটনাথ-ধৃত অপর একট' বচনে আছে

"নিষেকাদীংশ্চ সংস্কারান্ সূত্রোক্তাংচ সমাচরেৎ।
পঞ্চরাত্রোদিতান্ বাপি যে চ বংশ্যৈরনুষ্ঠিতাঃ॥" (ঐ, ২২ পৃষ্ঠা)

এইবচনোক্ত 'সূত্র' 'বৈখানসসূত্র' বলিয়া মনে হয়।

৪) 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ১ম অধিকার (২২ পৃষ্ঠা)। ৫) পূর্বে পাদটীকা দেখ।

৬) বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ১ম অধিকার (২৩ পৃষ্ঠা)।

৭) 'সমূর্তাচনাধিকরণ', ৬৫।১১৯

"তান্ত্রিকেন পুরা প্রোক্তং-মার্গেণ ভবদর্চনম্।
ন প্রসীদতি চাস্মাকং মনঃ কমললোচন॥
বৈদিকেন তদর্চাং মে যথাপূর্বং বদাচ্যুত।"

'হে কমললোচন! তান্ত্রিক মার্গে তোমার অর্চন (তোমা কর্তৃক) পূর্বে প্রোক্ত হইয়াছে। আমাদের মন (তাহার দ্বারা) প্রসন্ন হয় না। (অতএব) হে অচ্যুত! বৈদিক মার্গে ত্বদর্চা আমাকে যথাপূর্ব বল।' এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া ভগবান দেব জগতের প্রীত্যর্থ, তথা যজ্ঞসমূহের পূরণার্থ, শ্রুতি-পথাগত শাস্ত্র বলেন।[১]

উপরে উক্ত হইয়াছে যে কোন কোন বৈখানস-সংহিতা-কারের মতে, বৈখানস মত, পাঞ্চরাত্র মত এবং ভাগবত মত ভিন্ন ভিন্ন।[২] 'ঔশনসধর্মশাস্ত্রে'র একটা বচন হইতেও তাহা মনে হয়,—(কটকারগণ), তথা ত্রেতা যুগে (মহর্ষি) বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রদত্ত শাপ বশতঃ কোন কোন পারশরগণ এবং কলিযুগে, কেহ কেহ বৈখানস (মত) অনুসারে, আর কেহ কেহ ভাগবত (মত) অনুসারে, বেদশাস্ত্রাবলম্বী হইবে। তাহার পর হইতে কটকারগণ 'নারায়ণগণ' বলিয়া স্মৃত হইবে। বৈখানস কর্তৃক উক্ত (বেদ) শাখা তন্ত্রমার্গবিধিক্রিয়া (বহুলই। তত্রোক্ত) নিষেকাদিশ্মশানান্ত ক্রিয়া পূজাঙ্গসূচিকা। অথবা, পঞ্চরাত্রে প্রাপ্ত বা প্রোক্ত ধর্ম সমাচরণ করিবে।"[৩] তবে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসক হিসাবে বৈখানসকে এবং পাঞ্চরাত্রীকেও অবশ্য ভাগবত বলা হইত। 'সূতসংহিতার টীকাকার মাধবমন্ত্রী লিখিয়াছেন, পাঞ্চরাত্রগণ এবং বৈখানসগণ ভাগবতগণেরই উপভেদ।[৪] উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্বান্ ব্যক্তিগণও তাহা স্বীকার করেন।[৫]

মহর্ষি মরীচির 'বিমানার্চনাকল্পে'র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে "নানালোকনিবাসী ধর্মসংসক্ত ঋষিগণ স্বশিষ্যার্পিত কুশাসনে সমাসীন সর্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং শুদ্ধ মহামুনি শ্রীমরীচির নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ, জিজ্ঞাসা করেন, 'হে ভগবন্, কোন মার্গে কোন কোন মন্ত্রসমূহ দ্বারা কোন দেবতাকে অর্চনা করতঃ, (মনুষ্যগণ) কোন লোকে গমন করিবে?' তাহাতে মরীচি উত্তর করেন, সুপ্রসন্ন পরমাত্মা নারায়ণকে ধ্যান করতঃ এবং অভিবন্দনা করতঃ,—শ্রুত্যনুকূলমার্গে চতুর্বেদোদ্ভব মন্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করতঃ (মনুষ্যগণ) শ্রুতিসমূহ দ্বারা অভিহিত শাশ্বত, অতীন্দ্রিয়, পর হইতেও পরতর, এবং দেব-

---

১) স্বকৃত 'পরমাত্মোপনিষদ্ভাষ্যে' (১২১-২ পৃষ্ঠায়) আচার্য শ্রীনিবাস-কর্তৃক ধৃত ভৃগুর বচন দেখ।

২) ভৃগুর 'ক্রিয়াধিকারে'ও আছে

"বৈখানসং পাঞ্চরাত্রং তথা ভাগবতাভিধম্।"
—(কাশ্যপের 'জ্ঞানকাণ্ডে'র গ্রন্থপরিচয়ে ধৃত (৮ পৃষ্ঠা)

৩) 'ঔশনসধর্মশাস্ত্র', ৪৫'২—৪৮ শ্লোক (জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ', ১ম খণ্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা)

৪) সূতসং, ৪(১)।১৩।৩৮ টীকা।

৫) 'বিমানার্চনাকল্পে'র উপোদঘাত (৩ পৃষ্ঠা) দেখ। আচার্য যামুনাচার্যও নাকি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা, ভাগবতমতের প্রশংসায় তিনি নাকি লিখিয়াছেন, "ইদমপি (বৈখানসমপি) ভাগবত-মতমিতি সংগৃহ্যতে।"

গণেরও দ্বারা অনভিলক্ষ্য বিষ্ণুর সেই পরম পদে গমন করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়"[১] মহর্ষি কাশ্যপের জ্ঞানকাণ্ডের প্রারম্ভেও প্রায় সেই প্রকার প্রশ্ন-প্রতিবচন আছে। "সর্বভূতহিতে রত মুনিগণ আশ্রমে সমাসীন সর্ববেদবেত্তা, সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, এবং সুপ্রসন্ন ঋষি কাশ্যপের নিকট অভিগমন করত প্রশ্ন করেন, 'হে ভগবন্, কোন বিধানে, কোন কোন মন্ত্রসমূহ দ্বারা, কোন দেবতাকে অর্চনা করতঃ (মনুষ্যগণ) পরমপদে গমন করিবে?' তিনি উঁহাদিগকে বলেন, 'শ্রুত্যনুকূল বিধি-অনুসারে বৈদিক মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবেশ বিষ্ণুকে অর্চনা করতঃ, (মনুষ্যগণ) বিষ্ণুর সেই পরম পদে গমন করে'।[২] মহর্ষি অত্রির 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে "ধর্ম-সংসক্ত ঋষিগণ বিশ্ববিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বহিতোদয় ঋষি অত্রির নিকটে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম এবং অভিপূজা করতঃ যথান্যায় এইবচন বলেন, হে ভগবন্, যে হেতু আপনি সর্ববিদ্, সেইহেতু আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দেবতাদিগেরও পরমদেব এবং অব্যয় পরমাত্মা কে? পরমধর্ম কীদৃশ? হে বক্তাশ্রেষ্ঠ, আপনি তাঁহার অর্চনাবিধি বলুন'।" তাহাতে মহর্ষি অত্রি উত্তর করেন, "নারায়ণ সমস্ত দেবতাগণেরও পর বলিয়া স্মৃত" ইত্যাদি।[৩] মহর্ষি ভৃগুর 'যজ্ঞাধিকারে'র প্রারম্ভে আছে, "নানা-লোক-নিবাসী ভগবানে আসক্তচিত্ত (ঋষিগণ) কুশাসনে সমাসীন নারায়ণপরায়ণ মুনিবর-শ্রেষ্ঠ ভৃগুর নিকটে সমুপস্থিত হইয়া, (তাঁহাকে) প্রণাম করিয়া (জিজ্ঞাসা করেন), হে নিয়তেন্দ্রিয় (ঋষি), কোন মার্গে, কোন কোন মন্ত্রসমূহ দ্বারা কোন দেবকে সমর্চনা করতঃ (মনুষ্যগণ) অব্যয় পরম পদে গমন করিবে? হে পরমতত্ত্ববক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি, তৎসমস্ত (আমাদিগকে) বলুন।' (তাহাতে মহর্ষি ভৃগু) পরদেব নারায়ণকে মনে মনে (স্মরণ করতঃ বলেন), সাধু! সাধু! আপনাদের দ্বারা চোদিত হইয়া আমি সমস্তই নিঃশেষে বলিব। আপনারা (অবহিত হইয়া) শ্রবণ করুন। শ্রুত্যনুকূল মার্গে, তথা চতুর্বেদোদ্ভব মন্ত্রসমূহ দ্বারা, সমস্তলোকে অব্যয় হরি-কেই (মনুষ্য) সমর্চনা করিবেক। সেই ভক্তি দ্বারাই (মনুষ্য) স্বয়ং সহসাই তৎপদ বৈকুণ্ঠ নিশ্চয় লাভ করিবে। কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। সেই বিষ্ণুকে নিত্য পুজা করিবে। উহা সর্বসাধনের শ্রেষ্ঠসাধন। উহা নিত্য সর্বকামফলপ্রদ এবং সর্বমুক্তিপ্রদ।" ইত্যাদি।[৪]

এই সকল প্রশ্ন প্রতিবচন সমূহ হইতেও নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ঐ সকল গ্রন্থ ভগবান্ নারায়ণেরই বা বিষ্ণুরই পূজাদিপর। উহাদের কোন কোনটিতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে উহাদের মূল মহর্ষি বিখনস্ (বা বৈখানস্) প্রণীত 'বৈখানস স্থত্রে' আছে,

---

[১] 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (২ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ১ পটল (১ পৃষ্ঠা) (ঈষৎ পাঠান্তরে)। মহর্ষি মরীচির 'আনন্দসংহিতা'র প্রারম্ভে ঐ প্রশ্ন প্রতিবচনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

[২] 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ম অধ্যায় (১ পৃষ্ঠা)। [৩] 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।১—

[৪] 'যজ্ঞাধিকার', ১।১—

ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে'র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে ঋষিগণ মহর্ষি ভৃগু হইতে প্রথমে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা এবং পূজাবিধি বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন। (১।১—২·১) অনন্তর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন,

"কেন মার্গেণ কৈর্মন্ত্রৈঃ কং দেবং পূজয়ন্নরঃ।
কান্ লোকান্ সমবাপ্নোতি তত্ত্বমেতদ্‌বদস্ব নঃ॥"—(১।৩)

মহর্ষি ভৃগু চক্রপাণি ও খগধ্বজ দেবদেবেশকে প্রণাম করত তৎসমস্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

"অগ্নৌ নিত্যহোমান্তে বিষ্ণোর্নিত্যার্চা গৃহে দেবায়তনে বা ভক্ত্যা ভগবন্তং নারায়ণমর্চয়েৎ"।[১]

'অগ্নিতে নিত্যহোম করিবার পর বিষ্ণুর নিত্যার্চা। (নিজের) গৃহে কিংবা (বাহিরে) দেবায়তনে ভক্তি সহকারে ভগবান্ নারায়ণকে অর্চনা করিবে।' মূল 'বৈখানসসূত্রে'র "অথাগ্নৌ নিত্যহোমান্তে বিষ্ণোর্নিত্যার্চা" হইতে আরম্ভ করিয়া "দ্বিজাতিরতন্দ্রিতো নিত্যং গৃহে দেবায়তনে বা ভক্ত্যা ভগবন্তং নারায়ণমর্চয়েৎ। তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং গচ্ছতীতি বিজ্ঞায়তে।"[২]—অংশই বিষ্ণ্বর্চনা বিষয়ক। উভয়কেই ঐ সকল গ্রন্থে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

অত্রি, ভৃগু, কাশ্যপ, এবং মরীচি মহর্ষি বিখনসের এই চারিজন শিষ্য[৩] তদুক্ত বিষ্ণ্বর্চনাবিধি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ পুস্তক সমূহ রচনা করেন।[৪] তাই কথিত হয় যে "বৈখানস বিধি" চতুর্বিধ বা বৈখানসশাস্ত্র "চতুরাত্মক"—আত্রেয়, ভার্গব, কাশ্যপীয়, এবং মারীচ।[৫] পরন্তু প্রত্যেক প্রকারের পুস্তকের সংখ্যা সম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যথা মহর্ষি মরীচির 'বিমানার্চনাকল্পে' বিবৃত হইয়াছে যে অত্র্যাদি ঋষিচতুষ্টয়ের বিরচিত পুস্তকসমূহ যথাক্রমে 'তন্ত্র', 'অধিকার', 'কাণ্ড', এবং 'সংহিতা' নামে খ্যাত। মহর্ষি অত্রি চারিটি 'তন্ত্র' পুস্তক রচনা করেন; যথা

(১) পূর্বতন্ত্র, (২) আত্রেয়তন্ত্র, (৩) বিষ্ণুতন্ত্র, (৪) উত্তরতন্ত্র।

মহর্ষি ভৃগু তেরটি 'অধিকার'-পুস্তক প্রণয়ন করেন; যথা

(১) খিল, (২) পুরাতন্ত্র, (৩) বাসাধিকার, (৪) চিত্রাধিকার, (৫) মানাধিকার (৬) ক্রিয়াধিকার, (৭) অর্চাধিকার, (৮) যজ্ঞাধিকার, (৯) বর্ণাধিকার, (১০) প্রকীর্ণাধিকার, (১১) প্রতিগৃহ্যাধিকার, (১২) নিরুক্তাধিকার, (১৩) খিলাধিকার।

মহর্ষি কাশ্যপ-কর্তৃক বিরচিত 'কাণ্ড'-পুস্তক তিনটি,

(১) সত্য-কাণ্ড, (২) তর্ক-কাণ্ড, (২) জ্ঞানকাণ্ড।

মহর্ষি মরীচি আটটি 'সংহিতা' প্রণয়ন করেন; যথা

(১) জয়সংহিতা, (২) আনন্দসংহিতা, (৩) সংজ্ঞানসংহিতা, (৪) বীরসংহিতা, (৫) বিজয়সংহিতা, (৬) বিজিতসংহিতা, (৭) বিমলসংহিতা, (৮) জ্ঞানসংহিতা।

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৩ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ১ পটল (১ পৃষ্ঠা) (ঈষৎ পাঠান্তরে)। আরও দেখ—আনন্দসং, ২।৮৭—; 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।৩১—৩২'১, 'জ্ঞানকাণ্ড', ১ অধ্যায় (২ পৃষ্ঠা)

২) 'বৈখানসস্মার্ত-সূত্র', ৪।১০-২ খণ্ড।

৩) কাহারও কাহারও অত্র্যাদি ঋষিচতুষ্টয় মহর্ষি বিখনসের পুত্রও। শিষ্যকেই পুত্র বলা হইয়াছে মনে হয়। কেননা, 'আনন্দসংহিতা'য় কখন কখন উহাদিগকে বিখনসের পুত্র বলা হইয়াছে (যথা দেখ—১৫।৪৮—) আবার কখন কখন বলা হইয়াছে উহাঁরা ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং বিখনসের শিষ্য। (যথা দেখ—৪।২২-৭; ১৪।৩৭; ১।১)। এই শেষোক্ত উক্তি অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা, 'প্রকীর্ণাধিকার', ৩০।৫৮-৬৪

৪) যথা দেখ—'সমূর্তর্চনাধিকরণ', ১।৩৭'২—৪১'১; প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৮২'২—৮৩'১

৫) 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।৩৮; 'যজ্ঞাধিকার', ৫১।৯'২—১০ ও ১৩; আনন্দসং, ১৭।৫২

বেঙ্কটনাথও বলিয়াছেন, বৈখনসাগম ভার্গবাদি চতুর্বিধ। ('ন্যায়পরিশুদ্ধি' (বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, বেদান্তবিভাগে ২য় সম্পুট, ১৯৪০, ১৬৯ পৃষ্ঠা); 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা', ২২ পৃষ্ঠা।

এইরূপে বৈখানস শাস্ত্রে সর্বসমেত ২৮টী পুস্তক আছে। উহাদিগেতে পূর্ণ চারি লক্ষ গ্রন্থ (=বত্রিশ অক্ষরের এক শ্লোক) আছে। অত্রির চারি তন্ত্রে ৮৮,০০০ গ্রন্থ আছে; ভৃগুর তের অধিকারে ৮৮,০০০ গ্রন্থ; কাশ্যপের তিন কাণ্ডে ৬৪,০০০ গ্রন্থ; এবং মরীচির আট সংহিতায় ১,৮৪,০০০ গ্রন্থ। 'বিমানার্চনাকল্প' 'আনন্দসংহিতা'র অন্তর্গত।[১] মরীচির 'আনন্দসংহিতা'য় তাঁহার স্ব-বিরচিত আট সংহিতা পুস্তকের 'জ্ঞানসংহিতা'র স্থলে 'কল্পসংহিতা'র নাম আছে; অত্রি-প্রণাত চারি তন্ত্র পুস্তকের 'অত্রেয়তন্ত্রে'র স্থলে 'মহাতন্ত্রে'র নাম আছে; কাশ্যপ-প্রণীত তিন কাণ্ডের 'তর্ক-কাণ্ডে'র স্থলে 'কর্মকাণ্ডে'র নাম আছে। এই পার্থক্য বেশী নহে। পরন্তু মহর্ষি ভৃগু-প্রণীত পুস্তক সমূহ উহাতে 'অধিকরণ' নামে অভিহিত হইয়াছে; 'পুরাতন্ত্রকে 'পুরাধিকরণ' বলা হইয়াছে; এবং 'চিত্রাধিকার', 'বর্ণাধিকার'ও 'প্রতিগৃহ্যাধিকার —এই তিন পুস্তকের নাম উহাতে নাই। সুতরাং তন্মতে ভৃগু দশটি 'অধিকরণ' পুস্তক প্রণয়ন করেন। অতএব উহার মতে বৈখানসশাস্ত্রে মূলে ২৫টি পুস্তক ছিল।[৩] উহাদিগেতে চরিলক্ষ গ্রন্থ ছিল। মরীচি ১,৮৪,০০০ গ্রন্থ, অত্রি ৮৮,০০০ গ্রন্থ, কাশ্যপ এবং ভৃগু প্রত্যেকে ৬৪,০০০ গ্রন্থ রচনা করেন। কাশ্যপ ২৮,০০০ অধিক গ্রন্থও রচনা করেন।[৪] মহর্ষি ভৃগু প্রণাত 'যজ্ঞাধিকারে' ঐ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়।[৫] তন্মতে, ভৃগু, মরীচি, এবং অত্রি—ইহাঁদের প্রত্যেকেই ১১টী 'অধিকার' বা 'অধিকরণ' পুস্তক রচনা করেন এবং উহাদের নাম এই,—

(১) খিল, (২) ক্রিয়াধিকার, (৩) বাসাধিকরণ, (৪) মানাধিকরণ, (৫) নিরুক্ত, (৬) প্রকীর্ণক, (৭) অর্চনাধিকার, (৮) যজ্ঞাধিকরণ, (৯) বর্ণাধিকরণ, (১০) পুরাতন্ত্র (১১) উত্তরতন্ত্র

'উত্তরতন্ত্র' অপর ১০ পুস্তকের "সাররূপ"। মরীচির 'উত্তরতন্ত্র' 'বিমানার্চনাকল্প' এবং অত্রির উত্তরতন্ত্র 'সমূর্তাধিকার' নামেও অভিহিত হয়। কাশ্যপ অধিকার প্রভেদে ৫ পুস্তক রচনা করেন:

(১) অর্চনাধিকার, (২) বাসাধিকরণ, (৩) খিলাধিকরণ, (৪) বর্ণাধিকরণ (৫) উত্তরকল্প।

---

১) 'বিমানার্চনাকল্প', ১০১ পটল (৫১১—২ পৃষ্ঠা)

এই বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। কেননা, তন্মতে বৈখানসশাস্ত্রের গ্রন্থসংখ্যা সর্বসমেত ৪,২৪,০০০, সুতরাং চতুর্লক্ষের অধিক হয়। বৈখানসশাস্ত্রের গ্রন্থসংখ্যা যে চারি লক্ষ, তাহা ঐ বিবৃতিতে ব্যতীত অপর কোথাও কোথাও আছে। যথা দেখ, মরীচির 'আনন্দসংহিতা' (১৭।৪০); ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৮।৩'১ পরন্তু ভৃগুর 'যজ্ঞাধিকারে' ঐ বিষয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। (পরে দেখ) 'আনন্দসংহিতা'র মতে ভৃগুর রচিত গ্রন্থ ৬৪,০০০

এই বিবৃতি মতে 'বিমানার্চনাকল্প' 'আনন্দসংহিতা'র অন্তর্গত। তাহা প্রকৃত মনে হয় না। উহা 'আনন্দসংহিতা'য় উক্ত 'কল্পসংহিতা' বলিয়া মনে হয়। ভৃগুর 'যজ্ঞাধিকারে'র মতে উহা মরীচি-প্রণীত 'উত্তরতন্ত্র'ই। (পরে দেখ)

৩) মহর্ষি অত্রির 'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র এক পাণ্ডুলিপিতেও আছে যে চতুর্বিধ বৈখানস শাস্ত্রে সর্বসমেত ২৫টা পুস্তক আছে। (অনুবন্ধ ক, পৃষ্ঠা ৪৮৮-৯ পৃষ্ঠা)

৪) আনন্দসং, ১৭।৪০—৫২ ৫) 'যজ্ঞাধিকার', ৫১।১৪—২৯

'উত্তরকল্পে' ভগবদর্চার কল্প এবং বিষ্ণুযাগবিধি বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেকের রচিত গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধেও উহাতে বিস্তর মতভেদ আছে।[১]

কোন কোন বৈখানস পুস্তকের মতে, ভগবান্ নারায়ণের অর্চনা বা সমারাধনা দ্বিবিধ, অমূর্ত ও সমূর্ত; অগ্নিতে হোম করা অমূর্তার্চ্চনা, আর প্রতিমার পূজাদি সমূর্তার্চনা।[২] অপর কোন কোন পুস্তকের মতে ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা ত্রিবিধ—মানস, বাচিক, এবং কায়িক; কায়িক অর্চনা অমূর্ত এবং সমূর্ত ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয় সুতরাং বিষ্ণুর অর্চনা চতুর্বিধ।[৩] সমূর্তার্চনাধিকরণে মহর্ষি অত্রি লিখিয়াছেন, মহর্ষি বিখনসের মূল 'বৈখানসসূত্রে' অমূর্তার্চনা বিস্তারিতরূপে, আর সমূর্তার্চনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ঐ সংক্ষিপ্ত সমূর্তার্চনা-বিধিকে তিনি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৪] মরীচির বিমানার্চনাকল্পে' আছে, ভগবান্ নারায়ণের পূজামার্গ চারিটি; যথা—চরিত, ক্রিয়া, জ্ঞান, এবং যোগ;[৫] ভগবান বিখনস প্রণীত সূত্রে চরিত বিস্তারিতরূপে, আর অপরগুলি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে; তত্রোক্ত ক্রিয়া-মার্গ মরীচি "বহুপ্রয়োগক্রমে" (প্রথম ৮৪ পটলে) বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর তিনি জ্ঞানের এবং যোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়াছেন।[৬]

---

[১] 'যজ্ঞাধিকারের মতে, মরীচি একলক্ষ গ্রন্থ, ভৃগু তাহার অর্ধেক, অত্রি তাহার অর্ধেক এবং কাশ্যপ তাহার অর্ধেক গ্রন্থ রচনা করেন। কাহার কোন পুস্তকে কত গ্রন্থ আছে, তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ('যজ্ঞাধিকার', ৫১।১৮—)

'সমূর্তার্চনাধিকরণে'র এক পাণ্ডুলিপিতে (অনুবন্ধ, ৪৮৮-৯ পৃষ্ঠা) এবং নরসিংহ বাজপেয়ী প্রণীত 'প্রতিষ্ঠা-বিধিদর্পণ' নামে এক অর্বাচীন বৈখানস পুস্তকে ('বৈখানসাগমে'র ভূমিকায় ধৃত 'প্রতিষ্ঠাবিধিদর্পণ'-বচন দেখ) এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। তবে ঐ উভয় বচনের পাঠ ভ্রষ্ট। সুতরাং তদাধারে কিছু নির্ণয় করা যায় না। অধ্যাপক কলন্দ বৈখানসশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ("On the Sacred books of the Vaikhanasas", Meded derokon, Academie v. Wetensch,························AFd, Letterk, Deel 65, Series A, No. 7 (1928) আমরা ঐ প্রবন্ধ দেখি নাই।

পণ্ডিত শ্রী কে, সাম্বশিব শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত এবং 'ত্রিভন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজে' প্রকাশিত মরীচি-প্রোক্ত 'বৈখানসাগম' 'বিমানার্চনাকল্প'ই। উহার অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। তবে উহা পূর্বোক্ত 'বিমানার্চনাকল্প' হইতে লঘু। কেননা, উহাতে মোট ৭০ পটল আছে, আর পূর্বোক্ত গ্রন্থে ১০১ পটল আছে। উভয়ের সামান্ত ভাগে স্বল্প-বিস্তর পাঠভেদও আছে।

[২] 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।২৮·২—২৯·১; ২৭।১·২—; 'বিমানার্চনাকল্প', ১ পটল (৫ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ১ পটল (১-২ পৃষ্ঠা); 'যজ্ঞাধিকার', ১।১০

[৩] আনন্দসং, ১।৩৪·২—৩৬·১, ৪৬-৭

[৪] 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ১।৩২·২—৩৩·১

[৫] আদর্শ পাঞ্চরাত্রতন্ত্রের চারি বিষয়—জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া এবং চর্যা। (পূর্বে ৬৬ পৃষ্ঠা দেখ)। ঐ 'চর্যা' এবং 'বিমানার্চনাকল্পে' উক্ত 'চরিত' অভিন্ন শব্দ বলা যায়। পরন্তু উভয় সংজ্ঞার তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন।

[৬] 'বিমানার্চনাকল্প', ৮৫ পটল (৪৯১ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—

"তস্মাৎ অগ্নৌ নিত্যহোমান্তে বিষ্ণোর্নিত্যার্চা গৃহে দেবায়তনে বা ভক্ত্যা ভগবন্তং নারায়ণমর্চয়েৎ' ইতি বিখনসা সূত্রে সমাসেনোক্তম্। তদহমশেষং বিশেষেণ সমন্ত্রকং সপ্রয়োগং ক্রিয়ামার্গং ক্রমেণ বিস্তরতো বক্ষ্যামি"

—(ঐ, ১ পটল (৩ পৃষ্ঠা); 'বৈখানসাগম', ১ম পটল (১ পৃষ্ঠা) (ঈষৎ পাঠান্তরে)।

স্ব-বিরচিত 'আনন্দসংহিতা'য় মরীচি লিখিয়াছেন যে বিখনস মুনি স্বপ্রণীত সূত্রে, সর্বসমেত ৩২টি প্রশ্নে এবং সার্ধকোটি প্রমাণ গ্রন্থে নিষেকাদিশ্মশানান্ত সমস্ত মানুষ কর্ম এবং কষর্ণাদ্যুৎসবান্ত সমস্ত দৈবিক কর্ম সূচিত করিয়াছেন ; কশ্যপ, অত্রি, ভৃগু, এবং মরীচি তাঁহার এই চারি শিষ্য গুরুর মুখ হইতে তৎসমস্ত সংগ্রহ করতঃ, এবং সংক্ষিপ্ত করতঃ, চতুর্লক্ষপ্রমাণ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] অপর এক অর্বাচীন বৈখানস গ্রন্থে আছে যে বিখনস-প্রণীত দ্বাত্রিংশৎ-প্রশ্নাত্মক সমগ্র সূত্র স্মার্ত, ধর্ম, শ্রৌত, ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত।[২] ঐ সকল অধ্যাপক কলন্দ-কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতার বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

'বৈখানসস্মার্তসূত্রম্' (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)। ইহাতে সর্বসমেত ১০টী প্রশ্ন আছে। প্রথম ৭ প্রশ্ন 'গৃহ্যসূত্র', আর শেষ ৩ প্রশ্ন 'ধর্মসূত্র'।[৩]

'বৈখানস শ্রৌতসূত্রম্' (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)। ইহাতে 'বৈখানসসূত্রে'র ১২শ-৩২তম প্রশ্ন আছে।

বৈখানসসূত্রের ১১শ প্রশ্নের বিষয় প্রবর। কলন্দ তাহা সম্পাদন করেন নাই। তাহা এবং তৎপূর্ববর্তী ১০ প্রশ্ন ডি কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ মুদ্রিত 'বৈখানসসূত্রে' সার্ধকোটি গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ।

'বৈখানসসূত্রের ৪র্থ প্রশ্নের ১০ম-১২শ খণ্ডে "বিষ্ণুর নিত্যার্চা" ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৪] পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি বিখনস বলেন বিষ্ণুর নিত্যার্চা করিলে সর্বদেবতার অর্চনা হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে "অগ্নি নিশ্চয় দেবতাদিগের অবম, বিষ্ণু পরম ; অপর সমস্ত দেবতা উঁহাদের অন্তরালবর্তী।" সেই হেতু গৃহে পরম দেবতা বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় হোমান্তে অর্চনা করিবে।[৫] তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি বিষ্ণুর পরমভক্ত ছিলেন।[৬] মহর্ষি বিখনসের নারায়ণ-ভক্তির অপরাপর প্রমাণও তাঁহার সূত্রে আছে। যথা,—

(১) 'বৈখানসসূত্রে'র ৩।১৩ খণ্ডে "বিষ্ণুবলি" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ এবং

---

[১] আনন্দসং, ১৭।৩৭-৪০ আরও দেখ ভৃগু-প্রোক্ত 'প্রকীর্ণাধিকার' (১৮।২—৩'১) এবং 'নিরুক্তাধিকার' (মোক্ষোপায়প্রদীপিকা'র ৭ পৃষ্ঠায় ধৃত বচন)।

[২] 'সূত্রতাৎপর্যচিন্তামণি'র টীকা। (অধ্যাপক কলন্দ-সম্পাদিত 'বৈখানসশ্রৌতসূত্রে'র ভূমিকায় ধৃত)

[৩] 'বৈখানসধর্মসূত্র' 'বৈখানসধর্মপ্রশ্ন' নামে 'ত্রিভন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজে'ও প্রকাশিত হইয়াছে। তবে উভয় সংস্করণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠভেদ আছে।

[৪] 'বৈখানসসূত্র', ৪।১০-১২ = 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৪।১০-২ খণ্ড

[৫] অথাগ্নৌ নিত্যহোমান্তে বিষ্ণোর্নিত্যার্চা সর্বদেবার্চনা ভবতি।

'অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ' [ঐতব্রা, ১।১।১] ইতিব্রাহ্মণম্। তস্মাদ্‌গৃহে পরমং বিষ্ণুং প্রতিষ্ঠাপ্য সায়ং প্রাতর্হোমান্তেঽর্চয়তি। ষড়ঙ্গুলাদ্‌হীনং তদ্রূপং কল্পয়িত্বা পূর্বপক্ষে পুণ্যে নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ।" ইত্যাদি। ('বৈখানসসূত্র', ৪।১০ = 'বৈখানসস্মার্তসূত্র', ৪।১০ (৬২ পৃষ্ঠা)

[৬] এই বিষয়ে বৈখানসাগমসমূহের মত পরে বিবৃত হইবে।

দামোদর এই দ্বাদশ নামে বিষ্ণুর আবাহন, স্নপন, অর্চন, স্তুতি, নমস্কার, প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে।[১]

(২) উহার ৪।৮ খণ্ডে চৈত্র পূর্ণিমাতে শ্রীদেবীকে ও শ্রীপতিকে অভ্যর্চনার এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হোম করার বিধান আছে।[২]

(৩) কথিত হইয়াছে যে—

(ক) যজ্ঞার্থ অগ্নি উৎপাদন করিতে অরণি মন্থনকালে মন্থক নিজেকে মন্থ এবং উৎপন্ন অগ্নিকে বিষ্ণু বলিয়া ভাবনা করিবে।[৩]

(খ) যজ্ঞাদি ক্রিয়া নারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে সম্পাদন করিতে হইবে ;—

"ধ্যায়ন্ নারায়ণম্"[৪]
"নারায়ণং ধ্যায়ন্"[৫]
"ধ্যায়ন্ নারায়ণং জুহোতি"[৬]
"ধ্যায়ন্ নারায়ণং বিষ্ণোর্নু কর্মি'তি জপিত্বা" ইত্যাদি[৭]
"হুত্বা ভূমানং বিষ্ণুং ধ্যায়েৎ"[৮]

(গ) শকটে আরোহণ কালে নিজেকে বিষ্ণু বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে।[৯]

(৪) কথিত হইয়াছে যে শ্রৌত এবং স্মার্ত নিত্য কর্মসমূহ যথাবিধি সম্পাদন করিলে শ্রেয় লাভ হয়। পরন্তু বিধিতে কোন ত্রুটি হইলে অপরাধ হয়। সেই দোষ ক্ষালনার্থ শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রবিহিত বিশেষ বিধি জানা না থাকিলে নারায়ণের ধ্যান, জপ, ইজ্যা এবং হোম করিবে। তদ্দ্বারাও দোষবিঘাতন হয়।[১০]

(৫) যজমান কখন কখন মৌন অবলম্বন করতঃ নারায়ণ-পরায়ণ হইবে।[১১]

(৬) "সাংগচতুর্বেদতপোযোগাদৃষিঃ। নারায়ণপরায়ণো নির্দ্বন্দ্বো মুনিরিতি" (সাংগ চারিবেদের (স্বাধ্যায়), তপস্যা এবং যোগ দ্বারা ঋষি হন। যিনি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সংসার দ্বন্দ্ব হইতে নির্গত হইয়াছেন, তিনিই মুনি)। উহার মতে ঋষি হইতে মুনি শ্রেষ্ঠতর এবং মুনিত্বই পরমাবস্থা।[১২]

'বৈখানসসূত্রে' যজ্ঞের বেদীর কোন কোন ইটকে 'বৈখানস' এবং অপর কোন কোন ইটকে 'বালখিল্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[১৩] বেদীর ইটের ঐ প্রকার নাম শাস্ত্রের

---

[১] 'বৈখানসসূত্র', ৩।১৩='বৈখানসস্মার্তসূত্র' ৩।১৩ (৪৪-৫ পৃষ্ঠা)

[২] 'বৈখানসসূত্র', ৪।৮='বৈখানসস্মার্তসূত্র' ৪।৮ (৬১ পৃষ্ঠা)

[৩] 'বৈখানসসূত্র' ১২।১০='বৈখানসশ্রৌতসূত্র', ১।১০ (১১-২ পৃষ্ঠা)

[৪] বৈখাশ্রৌসূ, ১।৪ (৫ পৃষ্ঠা)।

[৫] বৈখাস্মাসূ, ৬।৮ (৯৪ পৃষ্ঠা)

[৬] বৈখাশ্রৌসূ, ১।১৪ (১৫ পৃষ্ঠা)।

[৭] ঐ, ৩।১ (৩২ পৃষ্ঠা)

[৮] ঐ, ২।৫ (২৫ পৃষ্ঠা)।

[৯] ঐ, ৪।৪

[১০] বৈখাশ্রৌসূ, ২০।১ (২৯৮ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—ঐ, ২১।১৮ (৩৩৪ পৃষ্ঠা)

[১১] ঐ, ১২।১০ (১৪০ পৃষ্ঠা)

[১২] বৈখাস্মাসূ, ১।১ (২ পৃষ্ঠা)।

[১৩] বৈখাশ্রৌসূ, ১৯।৩ বালখিল্য নামে বানপ্রস্থীদিগের এক উপবিভেদও আছে। (বৈখাধর্মসূ, ১।৩ (১১৩ পৃষ্ঠা) পরন্তু বৈখানস নামে কোন উপবিভেদের উল্লেখ নাই।

অপর কোথাও পাওয়া যায় না। তাহাতে মনে হয় যে মহর্ষি বিখনসের কিঞ্চিত সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। উহার অপর প্রমাণ এই মনে হয় যে তিনি ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধারণেরও বিধান দিয়াছেন। “শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঊর্ধ্ব-জলনশীল অগ্নিশিখা মধ্যে তেজোমূর্তি-আত্মা স্থিত। উহার শিখার মধ্যে পরমাত্মা (ব্যবস্থিত)।’ সেই হেতু যজমান হোমান্তে সর্বত্র আপনাকে প্রোক্ষণ করত গার্হপত্য হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া ললাটে, হৃদয়ে, কুক্ষিতে, বাহুদ্বয়ে এবং কণ্ঠে উহার জ্বালারূপ চতুরঙ্গুল দীপবৎ ঊর্ধ্বাগ্র পুণ্ড্র করিবে। তদ্দ্বারা শুভ লাভ করত অন্তে আত্মযোগ প্রাপ্তি হয়।”[১]

ইহাও বোধ হয় বলা উচিৎ যে মহর্ষি বিখনসের ঐ সাম্প্রদায়িকভাব প্রবল ছিল না। কেননা, তাঁহার সূত্রে আশ্রমধর্ম বর্ণনায় ইহা উক্ত হইয়াছে যে—(১) চতুর্বিধ ব্রহ্মচারীর মধ্যে একমাত্র “প্রাজাপত্য” ব্রহ্মচারীই “নারায়ণ-পরায়ণ ;”[২] (২) চতুর্বিধ গৃহস্থের মধ্যে একমাত্র “ঘোরাচারিক” গৃহস্থই “নারায়ণপরায়ণ ;”[৩] এবং (৩) চতুর্বিধ সপত্নীক বানপ্রস্থীর মধ্যে একমাত্র “বৈরিঞ্চ” ও “ফেনপ” বানপ্রস্থীই “নারায়ণপরায়ণ ;”[৪] বহুবিধ অপত্নীক বানপ্রস্থীদিগের কেহও নারায়ণ-পরায়ণ বলিয়া উক্ত হয় নাই। চতুর্বিধ ভিক্ষুদিগের কাহাকেও নারায়ণ-পরায়ণ বলা হয় নাই। তবে ইহা বলা হইয়াছে যে বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কালে “অগ্নয়ে সোমায় ধ্রুবায় ধ্রুবকরণায় পরমাত্মনে নারায়ণায় স্বাহা” বলিয়া হোম করিতে হয় ;[৫] এবং যে সকল সন্ন্যাসীর বা ভিক্ষুর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের “নারায়ণ-বলি” করিতে হয়।[৬] যাহা হউক, এইরূপে বিখনস্ প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে নারায়ণ-পরায়ণ হওয়া ব্যতীতও মানুষ ধর্ম-পরায়ণ বা ধার্মিক হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতা-দোষদুষ্ট বলা যায় না।

‘আনন্দসংহিতা’র মতে, বৈখানস যজুর্বেদের এক শাখা। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে যজুর্বেদ ত্রিবিধ বলিয়া প্রোক্ত হয়,—(১) বৈখানস, (২) তৈত্তিরীয় এবং (৩) বাজসনেয়। বৈখানস যজুর্বেদ পীতবর্ণ, তৈত্তিরীয় যজুর্বেদ কৃষ্ণ এবং বাজসনেয় যজুর্বেদ শুক্ল বলিয়া সংপ্রোক্ত। বৈখানস এবং বাজসনেয় “শুদ্ধ” আর তৈত্তিরীয় “অশুদ্ধ”।[৭] বৈখানস যজুর্বেদ পঞ্চকাণ্ড বলিয়া উদাহৃত হয়। উহার শাখা ৬৯ বলিয়া কথিত হয়।[৮] যজুর্বেদের সূত্র সমূহ

---

১) বৈখাশ্রৌসূ, ২।৬ (২৬ পৃষ্ঠা) ; ‘বাসুদেবোপনিষৎ’ও দেখ।

২) বৈখাধর্মসূ, ১।৩ (১১৩ পৃষ্ঠা)। ৩) ঐ, ১।৫ (১১৫ পৃষ্ঠা)

৪) ঐ, ১।৭ (১১৬-৭ পৃষ্ঠা) ৫) ঐ, ২।৬

৬) “নারায়ণবলিং করোতি ॥ ৮ ॥

“নারায়ণবলিং নারায়ণাদেব সর্বার্থসিদ্ধিরিতি ব্রাহ্মণাদ্যৈর্নরৈস্তত্স্যাত্মঘাতিনো রজ্জুশস্ত্রোদকাশনি-দ্রংষ্ট্রপশু-সর্পাদিভিঃ সর্বপাপমৃতস্যাদাহানামন্যেষাং ভিক্ষোশ্চৈকাদশদিনাদূর্ধ্বং মহাপাতকিনাং পঞ্চানাং দ্বাদশসংবৎসরাদূর্ধ্বং সপিণ্ডীকরণস্থানে মৃতকার্থমপরপক্ষে দ্বাদশ্যাং শ্রবণে বা করোতি ॥ ৯ ॥”—(বৈখাধর্মসূ, ৩।৮—৯)

৭) ঐখানে শুদ্ধ শব্দের তাৎপর্য এই যে ‘ব্রাহ্মণ-মিশ্রিত নহে’ ; অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদের যে শাখায় ভিন্ন ভিন্ন, উহা ‘শুদ্ধ’ আর যে শাখায় ভিন্ন ভিন্ন নহে,—মিশ্রিত, উহা ‘অশুদ্ধ’।

৮) আনন্দসং, ২।৭১—৭৫-১

পনর বলিয়া খ্যাত।[১] তন্মধ্যে বৈখানস, ভরদ্বাজ, সত্যাষাঢ়, শাকল, আপস্তম্ব এবং বৌধায়ন—এই ছয় জন কৃত ছয় সূত্র বৈখানসানুসারী।[২] পরে 'সূত্রগণনা' বিষয়ক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে,[৩]—বৌধায়নীয়, আপস্তম্বীয়, সত্যাষাঢ়, গার্গ্যীয়, আগস্ত্য, শাকল, আশ্বলায়ন, শাম্ভবীয় এবং কাত্যায়ন,—এই নয়টি "পূর্বসূত্রসমূহ"; আর বৈখানসীয়, শৌনকীয়, ভারদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনীয়, বাধূল, মাধ্যন্দিন, কৌণ্ডিন্য, এবং কৌশীকীয়—এই নয়টি "অপরসূত্রসমূহ"। "এতানি চতুর্বেদমূলানি বিষ্ণুসম্বন্ধীনি" (এই সকল চতুর্বেদমূলক এবং বিষ্ণুসম্বন্ধীয়')।[৪] পূর্বসূত্রসমূহ শারীর কর্ম-প্রতিপাদক, আর "বৈখানসাদি উত্তরসূত্রসমূহ শারীর এবং দৈবিক উভয় কর্ম-প্রতিপাদক। শ্রুতিতে আছে, 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'। সেই বিষ্ণুরই যাগপ্রপঞ্চ এই 'বৈখানস সূত্রে' সবিস্তারে প্রতিপাদিত হইয়াছে।"[৫]

এইরূপে দেখা যায়, মহর্ষি মরীচির 'আনন্দসংহিতা'র মতে 'বৈখানসসূত্র' যজুর্বেদেরই এক সূত্র,[৬]—আরও বিশেষ করিয়া বলিলে, যজুর্বেদের বৈখানস শাখার অনুযায়ী এক সূত্র। মহর্ষি ভৃগুর 'প্রকীর্ণাধিকারে'র মতেও 'বৈখানসসূত্র' যজুর্বেদেরই সূত্র। উহাতে উক্ত হইয়াছে, "আদিকালে ভগবান ব্রহ্মা বা বিখনা মুনি যজুঃশাখানুসারে[৭] বর্ণাশ্রমাচারযুত এবং শ্রৌতস্মার্ত-সমন্বিত এক মহত্তর সূত্র প্রণয়ন করেন। যেহেতু ঐ সূত্রের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে ইহা গীত হইয়াছে যে,—অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই যষ্টব্য, সেইহেতু উহা সর্বসূত্রোত্তম।[৮]

কিঞ্চিৎ মাত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি মরীচির 'আনন্দসংহিতা'র মতে বৈখানস যজুর্বেদের এক শাখার নাম,—উহার মূলশাখাত্রয়ের একটি 'বৈখানস শাখা' নামে অভিহিত হয়। পরন্তু তৎসম্বন্ধে উহাতে, তথা অপর কোন কোন বৈখানস আগমে, ভিন্ন প্রকার উক্তিও পাওয়া যায়। যথা 'আনন্দসংহিতা'র অপর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে "বেদসমূহের ব্যাসের (পূর্বে)[৯]

---

১) উহারা এই,—বৌধায়নীয়, শাণ্ডিল্য, আগস্ত্য, পঞ্চকাঠক, বৈখানস, ভারদ্বাজ, সত্যাষাঢ়, শাকল, মাধ্যন্দিন, কৌণ্ডিন্য, লৌগাক্ষিক, কুসীদক, কাত্যায়ন, বাধূল এবং আগ্নিবেশ্য। (আনন্দসং, ২।৬৫—৭'১)

২) আনন্দসং, ২।৬৭'২—৮ ৩) আনন্দসং, ৬।১—

৪) এইখানে 'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ' বলিয়া মনে হয়। কেননা, কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে,—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতিঃ"।

৫) আনন্দসং, ৬।৭—৮

৬) পরে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু বিখনসকে বলেন,—

"চতুর্বেদৈশ্চ সংমিশ্রং ময়া মন্ত্রং তবেরিতম্।
তথাপি ত্বন্মতা সর্বে যজুর্বেদানুসারিণঃ॥" (আনন্দসং, ১৬।৩৬

৭) মূলের 'যজুঃশাখা' শব্দের তাৎপর্য 'বেদের যজুঃশাখা', না 'যজুর্বেদের (এক) শাখা' তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পরে আছে "এতদ্বৈখানসং সূত্রং সর্ববেদার্থসংগ্রহঃ" ('প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদঃ, ৩০ (৭৫'১) তাহা অর্থবাদ মাত্র।

৮) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।৭০—৭২-১

৯) মূলে 'পূর্বে' শব্দ, কিংবা তদ্বাচক কোন অপর শব্দ নাই।

"বেদানাং ব্যসনাদ্ যং তু প্রাগ্রূপং মিলিতং মহৎ।"

পরন্তু পরে উদ্ধৃত বচনে আছে,—

"যা তু সম্মিলিতাবস্থা বেদানাং ব্যসনাৎ পুরা॥"

যে মিলিত প্রাগ্‌রূপ, উহাকেই যজুর্বেদরূপ তরুর বৈখানসী শাখা বলিয়া (বিদ্বান্‌গণ) জানেন।”[১] পরে আছে, “বেদসমূহের ব্যাসের পূর্বে যে সম্মিলিতাবস্থা” উহাই “বৈখানসী শাখা”।[২] মহর্ষি ভৃগু লিখিয়াছেন, ব্যাসের পূর্বে[৩] বেদসমূহের যে মিলিত প্রাগ্‌রূপ ছিল, উহাকেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ ‘বৈখানসী শাখা’ বলিয়া মনে করেন। মহর্ষি বিখনস সেই সমষ্ট্যাত্মক বেদের সূত্র রচনা করেন। যেমন ঐ সমষ্ট্যাত্মক বেদ পরে ব্যষ্টিরূপে ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব—এই চতুর্ধা হয়, তেমন সমষ্ট্যাত্মক ‘বৈখানসসূত্র’ও আত্রেয়, ভার্গব, মারীচ এবং কাশ্যপ—এই চতুর্ধা বিভক্ত হয়।[৪] (পরমর্ষি) “ব্যাস—(যিনি) ভগবান্‌ হরি, সেই বৈখানসী শাখাকে ব্যাস করত ঋগাদি বেদরূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করেন।”[৫] এইরূপে দেখা যায়, ঐ সকল বৈখানসাগমকারের মতে ‘বৈখানসী শাখা’ মূলবেদের,—ঋগাদিরূপে চতুর্ধা বিভক্ত হওয়ার পূর্বের সমষ্ট্যাত্মক বেদের নাম। কোন কোন পুরাণের উক্তি হইতে মনে হয় যে ঐ সমষ্টিবেদ পূর্বে ‘যজুর্বেদ’ নামে অভিহিত হইত।[৬] ‘সীতোপনিষদ্‌’ নামে এক অমুখ্য, পরন্তু ১০৮ উপনিষদের অন্তর্গত, উপনিষদের বচন হইতে মনে হয়, ঐ সমষ্টিবেদ কিংবা উহার মূল পূর্বে বৈখানস নামে অভিহিত হইত। উহাতে ব্যাখ্যাত

উভয়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার্থ আমরা এইখানে ‘পূর্বে’ শব্দ যোগ করিয়াছি। ঐ সম্মিলিত বেদকে কি প্রকারে ‘যজুর্বেদ’ বলা হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। আচার্য শ্রীনিবাস ‘আনন্দসংহিতা’ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“বেদানাং ব্যসনাৎ পূর্বং প্রাগ্‌রূপং মিলিতং তু যৎ।
তাং তু বৈখানসীং শাখাং প্রোবাচ স পিতামহঃ॥”
—(পরমাত্মোপনিষদ্‌ভাষ্য, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

১) আনন্দসং, ২।৫৫ ২) ঐ, ১৫।২৮'২—২৯'১

৩) মূলে ‘অর্বাক্‌’ শব্দ আছে,—

“বেদানাং ব্যসনাদর্বাক্‌ প্রাগ্‌রূপং মিলিতং তু যৎ॥
তাং তু বৈখানসীং শাখামিতিব্রহ্মবিদো বিদুঃ
—(‘যজ্ঞাধিকার’, ৫১।১০'২—১১'১

ভৃগু অন্যত্রও প্রায় সেই কথা বলিয়াছেন। (‘প্রকীর্ণাধিকার’, ক্রিয়াপাদ, ৩০।৬১'২—৬২'১) (চতুর্থ চরণে ‘এতানধ্যাপয়ন্মুনিঃ’ পাঠান্তরে)

পরন্তু তাঁহার সমস্ত উক্তির সমন্বয় রক্ষার্থ মনে করিতে হইবে যে ‘পূর্বে’ই তাঁহার অভিপ্রেত। ‘পূর্ব’ অর্থেও ‘অর্বাক্‌’ শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত আছে। (আপ্তের **Sanskrit-English Dictionary** দেখ)

৪) ‘যজ্ঞাধিকার’, ৫১।১০'২—১৩ ; আরও দেখ—‘প্রকীর্ণাধিকার’, ক্রিয়াপাদ, ৩০।৬১'২—৬২'১

৫) ‘প্রকীর্ণাধিকার’, ক্রিয়াপাদ, ৩০।৬৯

৬) ‘বিষ্ণুপুরাণে’ (৩।৪।১১—৫) উক্ত হইয়াছে যে “যজুর্বেদ এক ছিল। (ব্যাস) উহাকে চতুর্ধা বিভক্ত করেন। (তাহাতে) উহাতে চাতুর্হোত্র হয় এবং অনন্তর (তিনি) তদ্দ্বারা যজ্ঞ করেন। (ব্যাস) মুনি যজু (মন্ত্র) সমূহ দ্বারা আধ্বর্যব, ঋক্‌সমূহ দ্বারা হৌত্র, সামসমূহ দ্বারা ঔদ্‌গাত্র, এবং অথর্বসমূহ দ্বারা ব্রহ্মত্ব (কর্ম স্থাপনা) করেন। তদনন্তর সেই মুনি ঋক্‌সমূহ উদ্ধৃত করত ঋগ্‌বেদ, যজুঃসমূহ উদ্ধৃত করত যজুর্বেদ, সামসমূহ দ্বারা সামবেদ রচনা করেন। হে মৈত্রেয়, প্রভু (ব্যাস) অথর্ববেদ দ্বারা রাজার সর্বকর্ম এবং ব্রহ্মত্ব যথাস্থিতি ব্যবস্থা করেন। এই প্রকারে সেই এক বেদরূপ তরু তাঁহার দ্বারা চতুর্ধা পৃথক কৃত হয়। অনন্তর তাহা হইতে বেদপাদপ কানন উৎপন্ন হয়। (‘বিষ্ণুপুরাণে’র ৩।৪।১১—১৪'১ শ্লোক কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে ‘ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে’ও (২।৩৪।১৭—২০) আছে। “যজনাৎ স যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥” (ব্রহ্মাণ্ডপু, ২।৩৪।২২'২)

হইয়াছে যে সীতা ভগবান্ বিষ্ণুর বা রামের পরাশক্তি, যাহা 'মূল প্রকৃতি' বা সংক্ষেপে 'প্রকৃতি' নামেও অভিহিত হয়। ঐ পরাশক্তি তিন রূপে প্রকটিত হয়,—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং (জ্ঞান) শক্তি। ক্রিয়াশক্তিরূপ শ্রীহরির মুখ হইতে নাদ ব্যক্ত হয়। ঐ নাদ হইতে বিন্দু এবং বিন্দু হইতে ওঁ-কার প্রাদুর্ভূত হয়। ওঁ-কারের পর রাম-বৈখানস পর্বত। সেই পর্বতে কর্ম এবং জ্ঞানময় অনেক শাখা আছে। উহাতে সর্বার্থপ্রকটনকারী ত্রয়ীময় আদ্যশাস্ত্র আছে। ঋক্, যজু এবং সাম রূপী বলিয়া তাহা 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হয়। যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মার কার্য অনুসারে তাহা ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব—এই চতুর্ধা পরিকীর্তিত হয়। প্রত্যেক বেদের আবার বহু শাখাভেদ আছে। "অতএব উহাতে আদিতে বৈখানস প্রত্যক্ষদর্শন। সেইহেতু পরম বৈখানস মুনিগণ কর্তৃক নিত্য স্মৃত হইয়া থাকে।" বেদের অঙ্গ ও উপাঙ্গ ভেদ আছে। উপবেদও আছে। ঐ প্রকারে "একবিংশতিভেদযুক্ত উহা স্বপ্রকাশ বলিয়া প্রকীর্তিত।"

"বৈখানসঋষেঃ পূর্বং বিষ্ণোর্বাণী সমুদ্ভবেৎ।
ত্রয়ীরূপেণ সংকল্প্য ইত্থং দেহী বিজৃম্ভতে॥
সংখ্যারূপেণ সংকল্প্য বৈখানসঋষেঃ পুরা।
উদিতো যাদৃশং পূর্বং তাদৃশং শৃণু মেঽখিলম্॥"

'বিষ্ণুর বাণী প্রথমে বৈখানস ঋষি হইতে সমুদ্ভূত হয়। দেহী (=মনুষ্য) উহাকে ত্রয়ীরূপে সম্যক্ কল্পনা করত এই প্রকারে বিস্তার করে। পুরাকালে সংখ্যারূপে সংকল্প করত উহা যে প্রকারে বৈখানস ঋষি হইতে প্রথমে উদিত হয়, সেই প্রকারে সমস্তই আমার নিকট শ্রবণ কর।' এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে বৈখানস শাস্ত্র বেদেরও মূল, কিংবা বেদের মূলরূপ। তাহাতে বৈখানস আগমকারগণের উক্তি সমর্থিত হয় বলা যাইতে পারে। উঁহারা মূল সমষ্টিবেদকে "বৈখানসী শাখা" বলিয়াছেন। অধ্যাপক আর. পার্থসারথি আয়েংগার শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে ঐখানে 'শাখা' শব্দের অর্থ 'বেদ'; সুতরাং বৈখানসী শাখা = বৈখানসী বেদ = বৈখানস বেদ = যজুর্বেদ = সমষ্টিবেদ।"[১] অথবা বলা যাইতে পারে যে সমষ্টিবেদ মূল বৈখানস শাস্ত্রের,—'সীতোপনিষদে'র ভাষায় রাম-বৈখানস পর্বতের,—এক শাখা বলিয়া উহা 'বৈখানসী শাখা' (অর্থাৎ "বৈখানসের শাখা")। পরন্তু তাহা যাহাই হউক না কেন, তাহাতে 'বৈখানস শাখা' যজুর্বেদের মূল শাখাত্রয়ের একটি,—'আনন্দসংহিতা'র এই উক্তির সহিত সমন্বয় হয় না। তদর্থে এই প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে যে বেদব্যাস কর্তৃক চারি ভাগে বিভক্ত হইবার পূর্বে বেদ যজুর্বেদ বা বৈখানস বেদ নামে অভিহিত হইত। চারিভাগে বিভক্ত হওয়ার পরে ঐ নামদ্বয় যজুভাগে রূঢ় হয়, অপর কথায় তখন যজুভাগই যজুর্বেদ বা বৈখানস বেদ নামে অভিহিত

---

[১] অধ্যাপক আয়েংগার ৬।৫।৪৯ তারিখের পত্রে এই লেখককে লিখিয়াছেন, you know that the সমষ্টিবেদ before its বিভাগ into four by Vyasa Bhagavan, was originally called যজুস্ Yajurveda এক আসীদ্-যজুর্বেদঃ। (Sri Vishnupurana). At that stage it was also called Vaikhanasaveda. Sakha simply means Veda, so also Vaikhanasa mantra samhita according to the sutra contains in its body amantra collection from all the four Vadas. That is all. I find no references in other sources."

হইতে থাকে। তারপর যখন উহা হইতে কৃষ্ণযজুর্বেদ এবং শুক্লযজুর্বেদ নামক শাখাদ্বয় নির্গত হয়, তখন মূলের বাকী অংশ পূর্ববৎ বৈখানস বেদ নামে অভিহিত হইতে থাকে, অধিকন্তু উহা তখন মূল যজুর্বেদের এক শাখা মাত্র হইয়া পড়ে। এই কল্পনা নির্দোষ নহে। আবার উহার দ্বারাও বৈখানসাগমের সমস্ত উক্তির সুসমন্বয় হয় না।

বেদের শাখা-উপশাখা-বিভাগের স্বল্পাধিক বিবরণ কোন কোন পুরাণে পাওয়া যায়।[১] মূলবেদের, কিংবা শাখা-বিভাগের পর উহার যজুর্বেদ-শাখার, কিংবা যজুর্বেদের কোন শাখার, নাম 'বৈখানস' ছিল বলিয়া তথায় উল্লিখিত হয় নাই। বৈখানস নামে বেদের কোন শাখার কিংবা উপশাখার উল্লেখ তথায় নাই। আচার্য শৌনকের 'চরণব্যূহে'ও বৈখানস নামে কোন বেদ-শাখার উল্লেখ নাই। তবে উহাতে ঔখেয় নামে 'কৃষ্ণ-যজুর্বেদে'র এক শাখার উল্লেখ আছে।[২] 'বৈখানসশ্রৌতসূত্রে'র ভাষ্যকার বেঙ্কটেশ উহাকে 'ঔখেয়সূত্র' এবং উহার প্রণেতাকে বিখনস্ বলিয়াছেন।[৩] তাহাতে বুঝা যায় যে বৈখানসগণ উক্ত ঔখেয় শাখার অনুযায়ী এবং উহাকে তাঁহারা বৈখানস শাখা বলিতেন। 'আনন্দসংহিতা'র কোন কোন উক্তি হইতেও জানা যায় যে বৈখানসগণ 'ঔখেয়গণ' নামেও অভিহিত হইত।[৪] 'সত্যাষাঢ়শ্রৌতসূত্রে'র টীকাকার মহাদেব লিখিয়াছেন, 'বৈখানসসূত্র' 'কৃষ্ণ যজুর্বেদে'রই সূত্র—'কৃষ্ণ যজুর্বেদ' অনুযায়ী ছয় শ্রৌতসূত্রের অন্তিম শ্রৌতসূত্র।[৫] এইরূপে দেখা যায়, 'বৈখানসসূত্র' কোন বেদের সূত্র, তৎসম্বন্ধে 'চরণব্যূহ'-কারক সুপ্রাচীন আচার্য শৌনকের, তথা শ্রৌতসূত্রের অর্বাচীন টীকাকারগণের মত বৈখানসাগম-কারগণের মত হইতে ভিন্ন।

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে সকল পঞ্চরাত্রতন্ত্রই সমগ্রত বিষ্ণূপাসনা-বিষয়ক বা বৈষ্ণব-ধর্মপর নহে। উহাদের কোন কোনটাতে বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতারও উপাসনাদির পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। 'স্কন্দপুরাণে' "পঞ্চরাত্রবিধানে" ইন্দ্রের ও অপর দেবতাগণের পূজার উল্লেখ আছে।[৬] উহার অন্যত্র পঞ্চরাত্রবিধানে শিবপূজার উল্লেখ আছে।[৭] 'শিবরহস্যে' ও পঞ্চরাত্র-বিধানে শিবপূজার কথা আছে।[৮] প্রচলিত 'শিবরাত্রিব্রত' কথায় ঐ ব্রত সম্বন্ধে, তথা শিবপূজা সম্বন্ধে, 'নারদসংহিতা', 'ঈশানসংহিতা' এবং 'কালোত্তরসংহিতা' হইতে বচন অনূদিত হইয়াছে।

---

১) যথা দেখ বিষ্ণুপু, ৩।৪-৬ অধ্যায় ; বিষ্ণু ভাগপু, ১২।৬।৩৬—৭।৭ ; ব্রহ্মাণ্ডপু, ২।৩৫।৮—

২) 'চরণব্যূহে'র মতে 'কৃষ্ণযজুর্বেদে'র চারিটি প্রধান শাখা—আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী, এবং ঔখেয়।

৩) বেঙ্কটেশ লিখিয়াছেন,

"যেন বেদার্থবিজ্ঞেন লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
প্রণীতং সূত্রমৌখেয়ং তস্মৈ বিখনসে নমঃ॥"

৪) যথা দেখ—আনন্দসং, ৮।২—৩, ১৩, ২৫—৮

৫) মহাদেবের মতে 'কৃষ্ণযজুর্বেদে'রশ্রৌতসূত্রকারগণ পর পর এই,—বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, বাধুল, এবং বৈখানস।

৬) "পঞ্চরাত্রবিধানেন যথাঽন্যেষাং দিবৌকসাম্।"—(স্কন্দপু, ৬।২০৭।৭০'১)

৭) স্কন্দপু, ৭।১।৪।৬০—৩

৮) "পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেন চৈব হি।
পূজয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ॥"

'সূতসংহিতা'র টীকাকার মাধব মন্ত্রী লিখিয়াছেন, "শ্রীকালোত্তরাদিতে লিঙ্গের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে" এবং তিনি তদ্বিষয়ক কতিপয় বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] ঐ সকল সংহিতা পাঞ্চরাত্রসংহিতা।[২] 'হয়শীর্ষসংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতার তৃতীয় কাণ্ড,—(উহাতে মোট চারি কাণ্ড আছে,)—'লিঙ্গকাণ্ড'। উহা সম্পূর্ণত শৈবধর্মপরক।[৩] ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াচার্য-কর্তৃক সম্পাদিত এবং কাশীর 'চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে' প্রকাশিত 'মাহেশ্বরতন্ত্র' নাকি পাঞ্চরাত্র তন্ত্র। উহার প্রথম তিন পটলের, তথা ৮—১১শ ও ১৬—১৭শ পটলের সমাপ্তি-বাক্যের "ইতি শ্রীপঞ্চরাত্রে মাহেশ্বরতন্ত্রে" অংশ হইতে তাহা জানা যায়। সম্পাদক মহাশয়ও উহাকে "নারদপঞ্চরাত্রান্তর্গত" বলিয়াছেন। পরন্তু ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতুও আছে। কেননা, উহাতে, তথা অন্যত্র, উল্লিখিত পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসমূহের মধ্যে উহার নাম নাই। 'ঈশ্বরতন্ত্রে'র নাম আছে।[৪] পরন্তু উহাই যে 'মাহেশ্বরতন্ত্র' তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেননা, 'ঈশ্বরসংহিতা' নামক একখানি পাঞ্চরাত্রগ্রন্থ আছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে। 'মাহেশ্বরতন্ত্র' উহা হইতে ভিন্ন। সুতরাং উহাকে 'ঈশ্বরতন্ত্র' বলা হইয়াছে মনে করা যায় না। যাহা হউক, 'মাহেশ্বরতন্ত্র' সম্পূর্ণত শিবপরক। পণ্ডিত কে, সাম্বশিব শাস্ত্রী বলেন যে বৈখানস তন্ত্রসমূহ প্রায় বৈষ্ণবাধিষ্ঠান, আর পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসমূহ (বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব) উভয়াধিষ্ঠান।[৫]

আচার্য জীবগোস্বামী (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন যে 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে'র (অর্থাৎ 'হয়শীর্ষসংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতার) শাস্ত্রকথনপ্রস্তাবে উল্লিখিত 'তন্ত্রভাগবত' নামক (পাঞ্চরাত্র)তন্ত্র '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র "ভাষ্যভূত"।[৬] আচার্য মধ্ব (জন্ম ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) 'তন্ত্রভাগবত' হইতে বহু বচন অনুবাদ করিয়াছেন।

'গর্গসংহিতা' নামক একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা বৃষ্ণিবংশের আচার্য মহামুনি গর্গ কর্তৃক রচিত বলিয়া খ্যাত। উহার অন্তিম (১০ম) খণ্ডের (অশ্বমেধ খণ্ডের) প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে গর্গ স্বয়ং উগ্রসেনকে বলেন, "আমি পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের সম্বন্ধে যেমন দেখিয়াছি এবং যেমন শুনিয়াছি তেমনই (এই) সংহিতায় বর্ণনা করিয়াছি।" উহাতে রাধাকৃষ্ণতত্ত্বই বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা "হরিভক্তিবিবর্দ্ধন",—"কৃষ্ণভক্তিবিবর্দ্ধন" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং উহাও ভাগবত ধর্মের একটা উপকরণ। 'সম্মোহন-তন্ত্রে' 'গর্গসংহিতা'র মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ঘুম্বাইয়ের খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত 'গর্গসংহিতা' মূল সংহিতা কিনা

---

১) 'সূতসংহিতা' ১।৪।৪ টীকা

২) শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতার সূচীতে 'নারদসংহিতা, ৭০ তম সংখ্যক এবং 'ঈশানসংহিতা' ১৬শ সংখ্যক। উহাতে 'কালোত্তরসংহিতা'র নাম নাই। পরন্তু বেঙ্কটনাথ 'কালোত্তরে'র নামোল্লেখ পূর্বক বচন অনুবাদ করিয়াছেন ('পাঞ্চরাত্ররক্ষা', পৃষ্ঠা ২০, ৩৪ প্রভৃতি) এবং উহাকে "প্রমাণভূত" বলিয়াছেন। (ঐ, ৩০ পৃষ্ঠা)

৩) শ্রেডারের পুর্বোক্ত গ্রন্থ, ২৩ পৃষ্ঠা।

৪) শ্রেডারের সূচীর ১৭শ সংখ্যক গ্রন্থ।

৫) তৎসম্পাদিত 'মরীচি-প্রোক্ত বৈখানসাগমের ভূমিকা।

৬) জীবগোস্বামীর 'ভাগবতসন্দর্ভে,র ১ম সন্দর্ভ 'তত্ত্বসন্দর্ভ', ২৩। শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা সূচীতে উহা 'ভাগবতসংহিতা' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

সন্দেহ হয়। কেননা, উহাতে সর্বসমেত দশখণ্ড আছে,—(১) গোলক খণ্ড, (২) বৃন্দাবন খণ্ড, (৩) গিরিরাজখণ্ড, (৪) মাধুর্যখণ্ড, (৫) মথুরা খণ্ড, (৬) দ্বারকা খণ্ড, (৭) বিশ্বজিৎ খণ্ড, (৮) বলভদ্র খণ্ড, (৯) বিজ্ঞান খণ্ড এবং (১০) অশ্বমেধ খণ্ড। পরন্তু মূল 'গর্গসংহিতা'য় 'অশ্বমেধ-খণ্ড' ছিল না। যেহেতু, 'বিজ্ঞান খণ্ডে'র উপসংহারে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে 'গর্গসংহিতা'য় নয়খণ্ড আছে এবং উহাদের নামও প্রদত্ত হইয়াছে।[১] অধিকন্তু 'অশ্বমেধখণ্ডে'র প্রারম্ভে পরিষ্কার উল্লিখিত আছে যে উহা মূল গ্রন্থে ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে গর্গ স্বয়ংই উহা পরে রচনা করিয়া তাঁহার পূর্বরচিত সংহিতায় সংযোজিত করিয়া দেন।[২] ইহা যথাযথ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও প্রচলিত 'গর্গসংহিতা' যে প্রাচীন নহে, আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব। পাঞ্চরাত্র সংহিতা বা তন্ত্রসমূহের একটার নাম 'গার্গ্য'। উহা 'অগ্নিপুরাণে' এবং 'মাহেশ্বরতন্ত্রে' উক্ত ২৫ তন্ত্রের অন্তর্গত। শ্রেডারের সূচীতেও উহার নাম আছে।[৩] খুব সম্ভবত, উহা আলোচ্য 'গর্গসংহিতা' হইতে ভিন্ন।

ঐ সকল উপকরণ গ্রন্থের সমস্তগুলিতে ভাগবতধর্মের একই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় না। ভাগবত ধর্মের কোন কোন তত্ত্ব বিষয়ে উহাদের মধ্যে অল্পাধিক মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে স্বভাবত জিজ্ঞাসা হয় যে ভাগবতধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি? যে সকল তত্ত্বের বিবরণে বিভিন্ন গ্রন্থে, স্বল্পবিস্তর ভেদ থাকিলেও, পরস্পর-বিরোধ নাই, সেই সকল বিষয়ে অবশ্যই সমাহার দ্বারা সমন্বয় পূর্বক প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করা যায়। পরন্তু যে যে বিষয়ের বিবরণে বিরোধ আছে, সুতরাং সেই প্রকারে সমন্বয় সম্ভব নহে, সেই সকল বিষয়ে ভাগবতধর্ম কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে। উহার মূল কিম্বা প্রাচীন রূপ নিরূপণই বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার জন্য ঐ সকল উপকরণের কোন্‌টার বা কোন্ কোন্‌গুলির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করিতে হইবে তাহা নির্ণয়ার্থ উহাদের কোন কোনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। পরন্তু ঐ কর্ম অতীব কঠিন। কেননা, উহাদের রচনা-কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা নাই। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বদ্বর্গের নানা জনে নানা প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। তাই আমরা এখানে উহাদের রচনা-কালের পৌর্বাপর্য্য মাত্রই যথা সম্ভব কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিব।

গীতা, বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম এবং নারায়ণীয়াখ্যান—ভাগবতধর্মের এই তিন উপকরণ গ্রন্থ 'মহাভারতে'র অন্তর্গত। ইহা নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে উহা বর্তমানে যে রূপে উপলব্ধ হইতেছে প্রথমে সেইরূপেই রচিত হইয়াছিল না এবং উহার রূপ বরাবর একই প্রকার থাকে নাই। মূল গ্রন্থ ক্রমে পরিবর্ধিত—হয়ত এখানে ওখানে অল্পাধিক পরিবর্তিতও হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। মূলগ্রন্থের রচয়িতা পরমর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। উহার নাম 'জয়' ছিল। বর্তমান 'মহাভারতে'র আদি ও অন্ত পর্বে উক্ত আছে যে "জয়ো নামেতিহাসোঽয়ম্"। ব্যাস আপন পুত্র শুককে এবং অপর শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল এবং বৈশম্পায়নকে উঁহা পড়ান। তাঁহাদের

---

১) 'গর্গসংহিতা', খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত, মুম্বই, ১৯৫৪ সম্বৎ, ৯।১০।২৪—

২) ঐ, ১০।১।১২

৩) শ্রেডারের সূচীর ৪১তম সংখ্যক তন্ত্র। উহাতে 'উত্তরগার্গ্য' নামক এক তন্ত্রও আছে। (১৮শ সংখ্যক)।

প্রত্যেকেই পরে উহার পরিবর্ধিত সংস্করণ রচনা করেন। তখন গ্রন্থের নাম হয় 'ভারতসংহিতা' বা 'ভারত'। পরে নানা বিষয়ের সংযোজন দ্বারা বৈশম্পায়নের 'ভারত'কে পরিবর্ধিত করিয়া সৌতি বিরাট 'মহাভারত' রচনা করেন। বর্তমান গ্রন্থ সৌতিকৃত সংস্করণই। ব্যাসের মূল গ্রন্থ স্বল্প কলেবর ছিল। কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্বান্ অনুমান করেন যে উহাতে সর্বসমেত ৮৮০০ শ্লোক ছিল। চিন্তামনি বিনায়ক রাও বৈদ্য মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ঐ অনুমান ঠিক নহে। 'মহাভারতো'ক্ত ঐ সংখ্যা ব্যাসের কূট শ্লোকের।[১] মহাভারতের নিজের উক্তি হইতে জানা যায় যে বৈশম্পায়ন-কৃত 'ভারতে' ২৪০০০ শ্লোক ছিল এবং সৌতির 'মহাভারতে'র শ্লোক-সংখ্যা শতসহস্র বা এক লক্ষ। সেই জন্য উহা 'শতসাহস্রী-সংহিতা' নামেও অভিহিত হয়। বৈদ্য মহাশয় দেখাইয়াছেন যে বর্তমান 'মহাভারতে'র কোন সংস্করণে বস্তুত এক লক্ষ শ্লোক নাই; খিলপর্ব 'হরিবংশ' সহ উহাতে প্রায় ৯৬২৪৪ শ্লোক আছে, আর খিলপর্ব ছাড়িয়া দিলে উহাতে ৮৪২৪৪ শ্লোক থাকে।[২] যাহা হউক, এই প্রকারে বর্তমান 'মহাভারতে' তিন স্তর পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাতে আরও অনেক উপস্তর আছে বলিয়া মনে করেন। বৈদ্য মহাশয় মনে করেন যে গীতা মূল 'মহাভারতে'র অর্থাৎ ব্যাসকৃত 'জয়ের' অন্তর্গত ছিল; পরন্তু নারায়ণীয়াখ্যান মূল গ্রন্থের অন্তর্গত ছিল না, উহা সৌতিকর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।[৩] তিনি আরও বলেন যে "পাঞ্চরাত্র ঔর পাশুপত মতোকা প্রচার গীতাকে সময় নহী থা। উস সময় বেদান্ত' সাংখ্য ঔর যোগ যহী তিন তত্ত্বজ্ঞান প্রচলিত থে ঔর ইন্হীকে একীকরণকা প্রযত্ন ভগবদ্গীতানে কিয়া হৈ। উসী প্রযত্নকো সৌতিনে অপনে সময়মে জারী রক্খা ঔর উক্ত দো নয়ে মতোকে বিচারভী উসনে অপনে প্রযত্নমে শামিল কর লিয়ে। ইসকে লিয়ে সৌতিনে মহাভারতমে অনেক উপাখ্যান ঔর প্রকরণ জোড় দিয়ে হৈ।...পাঞ্চরাত্রমতকা আবিষ্করণ নারায়ণীয় জোড়কর কিয়া গয়া হৈ।"[৪] তাহাতে এই দাঁড়ায় যে বৈদ্য মহাশয়ের মতে গীতা নারায়ণীয়াখ্যান হইতে প্রাচীন। নারায়ণীয়াখ্যানের আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। কেননা, তথায় দুইবার গীতার উল্লেখ আছে।[৫] বৈদ্য যে মনে করেন গীতা 'জয়' নামক ব্যাসের মূলগ্রন্থের অন্তর্গত ছিল, তাহাকে যেমন খণ্ডনের তেমন মণ্ডনেরও কোন প্রকৃষ্ট সাধন বর্তমানে নাই। বর্তমান মহাভারতের আভ্যন্তরিক প্রমাণসমূহের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক তিলক সিদ্ধ করিয়াছেন যে ভগবদ্গীতা উহারই এক অংশ। পরন্তু বৈদ্যের ন্যায় তিনি বলেন নাই যে গীতা ব্যাসের মূল ভারতেরও অন্তর্গত ছিল। তবে তিনি ইহা বলিয়াছেন যে মূল ভারতে ও যে গীতা ছিল না বলা যায় না।[৬] বৈদ্যের ন্যায় তিলকও মনে করেন যে নারায়ণীয়াখ্যান সৌতিকর্তৃক বর্তমান 'মহাভারতে' সংযোজিত হইয়াছে; উহা তিনি নূতন রচনা করেন নাই, পরন্তু পূর্ব-প্রচলিত গ্রন্থ তিনি আপন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে গীতা, নারায়ণীয়াখ্যান, কিম্বা অপর যে সকল তৎকালে প্রচলিত গ্রন্থ বা আখ্যান

---

[১] 'হিন্দী মহাভারত মীমাংসা', চিন্তামনি বিনায়করাও বৈদ্য প্রণীত, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ৭ পৃষ্ঠা

[২] ঐ, ৩ পৃষ্ঠা।

[৩] ঐ, ১৮-৯ পৃষ্ঠা।

[৪] ঐ, ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

[৫] মহাভা, ১২।৩৪৮।৮ ও ৫৩; পরে দেখ।

[৬] তিলকের 'গীতারহস্য', বাংলা ভাষান্তর, ৫১৮-৫৩২ পৃষ্ঠা।

সৌতি আপন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিলেন, তিনি সেইগুলির কিছু না কিছু যথা-প্রয়োজন পরিবর্তন করেন নাই। তথাপি তাঁহাদের ঐ অনুমান অনুসারে ইহা মানিতে হয় যে নারায়ণীয়াখ্যান বর্তমান মহাভারতের পূর্বে প্রচলিত ছিল। পরন্তু সেই বিষয়ে সংশয় করিবার কিঞ্চিৎ হেতুও আছে। নারায়ণীয়াখ্যানেই আছে যে জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বলেন, "হে ব্রাহ্মণ, হে তপোনিধি, যেমন দধি হইতে মাখন, মলয়পর্বত হইতে চন্দন, বেদসমূহ হইতে আরণ্যক এবং ঔষধিসমূহ হইতে অমৃত বাহির করা হয়, তেমন শতসহস্র (শ্লোকাত্মক) বিস্তারিত ভারতাখ্যান হইতে ('শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ') অনুত্তম জ্ঞানসমুদ্রকে বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করিয়া নারায়ণীকথাশ্রয়ে আপনি যাহা বলিয়াছেন সেই এই অমৃত সমুদ্ধৃত হইয়াছে।"[১] তাহাতে নারায়ণীয়কথা বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যানের অন্তর্গত ছিল বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইলেও, বিশেষ প্রণিধান করিলে মনে হইবে যে উহা সৌতির মহাভারতেরও পরবর্তী। কেননা, যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বর্তমান মহাভারতের আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে জানা যায় যে বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যানে মাত্র ২৪০০০ শ্লোক ছিল এবং সৌতি উহাকে শতসহস্রশ্লোকাদি গ্রন্থে পরিণত করেন। সেই হেতু সৌতির মহাভারতই 'শতসাহস্রী' নামে অভিহিত হয়; বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যানকে কিছুতেই 'শতসাহস্রী' বলা যায় না। অধিকন্তু উক্ত বচনে শতসহস্রশ্লোকাত্মক গ্রন্থকে "ভারতাখ্যানবিস্তার" বলাতেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যানকে তাহাতে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহার বিস্তারিত সংস্করণ সৌতির মহাভারতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাতে শঙ্কা করা যায় যে নারায়ণীয়াখ্যান মহাভারতে সৌতির পরে সংযোজিত হইয়াছে। আরও গভীর বিচার করিলে ঐ শঙ্কা নির্মূল হয়। বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম সম্বন্ধে বৈদ্য এবং তিলক কিছুই বলেন নাই।

এই বিষয়ে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। গীতা মুখ্যত কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বটে। পরন্তু সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদের অঙ্গরূপেই উহা প্রকাশ করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বাস্তবিক প্রারম্ভে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা জানিতে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিলে সঞ্জয় উত্তর দিতে গিয়া ঐ কৃষ্ণার্জুনসংবাদও বিবৃত করেন। বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদই। "মোক্ষের পরম যোগ" বর্ণনা করিতে যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে ভীষ্ম গুরুশিষ্যসংবাদরূপ "মোক্ষসংযুক্ত পুরাতন ইতিহাস" বর্ণনা করেন। এইরূপে দেখা যায়, গীতা ও বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে যে সকল ব্যক্তি এবং ঘটনার উল্লেখ আছে, উহাদের কিছুই যুদ্ধের পরকালীন নহে' সমস্তই ব্যাসের 'জয়'রচনার পূর্বকালীন। তাহাতে ইহা বলা যায় না যে বর্তমান গীতা এবং বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম উহাতে কিংবা বৈশম্পায়নের 'ভারতে' থাকা সম্ভব নহে। পরন্তু বর্তমান নারায়ণীয়াখ্যান সম্বন্ধে তাহা অবশ্যই বলা যায়। কেননা, উহাতে বৈশম্পায়ন-জনমেজয়-সংবাদ এবং সৌতিশৌনক-সংবাদও আছে। কথিত আছে যে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রের সময়ে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ব্যাস-রচিত ভারত, অথবা প্রকৃত

---

[১] মহাভা, ১২।৩৪৩।১১·২—১৪·১

বলিতে 'জয়' নামক ইতিহাস শুনান এবং সৌতি পরে নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণকে বৈশম্পায়নের ভারতাখ্যান শুনান। বর্তমান নারায়ণীয়াখ্যানেও আছে যে সৌতি বৈশম্পায়ন কর্তৃক কীর্তিত নারায়ণীয়াখ্যান বিবৃত করিয়াছেন।[১] সুতরাং ব্যাসের মূল গ্রন্থে ঐ সকল সংবাদের এবং বৈশম্পায়নের গ্রন্থে সৌতি-শৌনক-সংবাদের উল্লেখ থাকা সম্ভব নহে। তথাপি মনে হয় যে বর্তমান নারায়ণীয়াখ্যানে নারায়ণীয় ধর্মের সুপ্রাচীন কাহিনী সংরক্ষিত আছে। বিশেষ বিচার করিলে দেখা যায় যে বর্তমান নারায়ণীয়াখ্যান পরিষ্কাররূপে বিভক্ত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ ১২।৩৩৪তম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৩৯ তম অধ্যায়ের ১৩২ তম শ্লোক পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়ভাগ অবশিষ্টাংশ। প্রথমভাগ সম্পূর্ণত ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদই। বৈশম্পায়ণের কথা ১২।৩৩৯।১৩৩ শ্লোক হইতে আরম্ভ হয়। ১২।৩৩৯।১৩৭'২-১৩৮'১ শ্লোকও ভীষ্মেরই উক্তি। উহা পূর্বভাগের অন্তেই থাকা উচিৎ এবং ছিলও মনে হয়, পরন্তু লেখকদোষে কিঞ্চিৎ পরে আসিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের নারদ-নারায়ণ-সংবাদ (১২।৩৪৩।৪৬—) ও হয়ত প্রথমে পূর্বভাগে ছিল। যাক্, তাহার কথা কিছু বলিব না। পূর্বভাগের অন্তে আছে যে ভীষ্ম তৎকীর্তিত নারায়ণকথার বা পুরাণের বংশপরম্পরা বিবৃত করেন,[২] এবং উহার পঠন ও শ্রবণের ফল নির্দেশ করেন।[৩] অধিকন্তু তিনি বলেন, "এই তোমার নিকট নারদোক্ত সমস্ত আখ্যান বিবৃত হইল। উহা (প্রাচীন কাল হইতে) পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে ('পারম্পর্য্যাগতং')। পূর্বে আমার পিতা আমাকে উহা কহিয়াছিলেন।"[৪] "হে নৃপ, এই আর্ষেয় আখ্যান পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি বাসুদেবের ভক্ত নহে, তাহাকে কোন প্রকারে তুমি ইহা বলিও না।"[৫] এই সকল হইতে প্রায় নিশ্চিত হয় যে ভীষ্মোক্ত নারায়ণ-কথা পূর্বভাগে শেষ হয় এবং ঐ কথা অতি প্রাচীন। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন, "হে রাজন, তুমি আমার নিকটে যে শত শত উপাখ্যান শুনিয়াছ উহাদের সকলের সাররূপে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরাকালে যেমন দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তেমন এই কথামৃত বিপ্রগণ কর্তৃক সমুদ্ধৃত হইয়াছিল।"[৬] ইহা বলা যায় না যে এতাবৎমাত্র নারায়ণকথা ব্যাসের মূলভারতে ছিল না। বৈশম্পায়নের ও সৌতির সংস্করণে ঐ মূল আখ্যান নূতন নূতন বিষয়ের সংযোজন দ্বারা পরিবর্ধিত হয়। ইহাও বলা যায় না যে তখন উহার কিছু না কিছু পরিবর্তনও হয় নাই। উহার উৎপত্তি বিষয়ক ভীষ্মের কথা তখন কি প্রকারে পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং তাহা কি প্রকার সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা পূর্বে নির্দেশিত হইয়াছে।

শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত বর্তমান মহাভারতে উক্ত জ্যোতিষিক প্রমাণমূলে দেখাইয়াছেন যে উহা শককালারম্ভের ৫০০ বৎসর পূর্বের উপকালে রচিত হইয়াছিল।[৭] বৈদ্যমহাশয় দেখাইয়াছেন যে মগধ-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় সমাগত গ্রীকরাজদূত মেগেস্থেনীজ

---

১) মহাভা, ১২, ৩৩৯।১৩৮'২ ; ৩৪০।৫-৬, ইত্যাদি

২) ঐ, ১২।৩৩৯।১১১—১২৪'১ ৩) ঐ, ১২।৩৩৯।১২৮'২—১৩১'৭

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।১৩৭'২—১৩৮'১ ৫) ঐ, ১২।৩৩৯।১২৫'২—১২৬'১ ৬) ঐ, ১২।৩৩৯।১২৬'২—১২৮'১

৭) 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রণীত, পৃষ্ঠা, ৮০-৯০, ১১১ ও ১৪৭ দেখ।

(৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) লক্ষশ্লোকাত্মক 'মহাভারত' ও 'হরিবংশে'র সন্ধান জানিতেন। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ 'বজ্রসূচিকোপনিষদে'র স্বকৃত ব্যাখ্যানে 'মহাভারতে'র ও 'হরিবংশে'র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল, তথা অপর কতিপয়, প্রমাণমূলে বালগঙ্গাধর তিলক মনে করেন যে, ৫০০ শকপূর্বোপকালে (= ৪২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দোপকালে) বর্তমান 'মহাভারত' নিশ্চয় ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 'গীতা' তখন 'মহাভারতে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] সুতরাং উহা তদপেক্ষা অর্বাচীন হইতে পারে না। তিলক স্বতন্ত্র বিচার দ্বারাও তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।[২] 'হরিবংশ' অন্তত মেগেস্থেনীজের প্রাক্‌কালীন। সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলেন যে নারায়ণীয়াখ্যান, বুদ্ধপ্রাক্‌কালীন হউক বা না হউক, অন্তত তাঁহার সমকালীন[৩] এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারও উহা স্বীকার করেন।[৪]

'অনুগীতা'র উপোদঘাত হইতে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে উহা 'গীতা'র স্বল্পকাল পরে বিরচিত। উহাতে বর্ণিত কৃষ্ণার্জুনসংবাদ বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট বিবৃত করেন। উহাতে সৌতির নাম নাই। তাহাতে মনে হয় উহা বৈশম্পায়নের ভারতের অন্তর্গত ছিল। সৌতি উহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই; বৈশম্পায়নের 'ভারতে' যেমনটি পাইয়াছিলেন তেমনটী রাখিয়া দিয়াছেন, নিজের কিছু যোগ করেন নাই। কাশীনাথপন্ত তেলেঙ্গ মহাশয় মনে করেন যে উহা 'গীতা'র অনেককাল পরে প্রণীত।[৫] তবে তিনি ইহাও বলেন যে 'অনুগীতা' খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকেরও পূর্বে রচিত হয়; সম্ভবত উহা ৪র্থ খ্রীষ্টপূর্বশতকে প্রণীত হয়।[৬]

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' 'ভারতাখ্যান' ও 'ভারতে'র নামোল্লেখ আছে, 'মহাভারতে'র নাই।[৭] তাহা হইতে সংশয় করা যায় যে বর্তমান 'মহাভারত'কে, সুতরাং তদন্তর্গত নারায়ণীয়াখ্যানকে, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ' অপেক্ষা প্রাচীন বলা যায় না। পরন্তু ঐ প্রকার সংশয় বিচারসহ নহে। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে।[৮] পরন্তু নারায়ণীয়াখ্যানে বর্ণিত বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাবসমূহের মধ্যে বুদ্ধের নাম নাই, তথায় কৃষ্ণের পরের প্রাদুর্ভাব কল্কি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[৯] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে

---

[১] গীতারহস্য, বাংলা ভাষান্তর, [২] ঐ,

[৩] R. G- Bhandarkar, Vaisnavism ইত্যাদি, ১২ পৃষ্ঠা

[৪] অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, "It becomes then clear that Sir R. G. Bhandarkar's claim that the Narayaniya section of the Mahabharata is at least as old as, if not older than, the age of the Buddha, has considerable justification." (Proceedings of the IInd Oriental Conference, Calcutta, 1922, p. 353) মোক্ষমুলর-সম্পাদিত Secred Books of the East Seriesএ প্রকাশিত তেলঙ্গ-কৃত 'গীতা' ও 'অনুগীতা'র ইংরাজী ভাষান্তরের ২১৫, ২১৮ ও ২২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

[৫] ঐ, ২১২ পৃষ্ঠা। [৬] ঐ, ২১৫ পৃষ্ঠা।

[৭] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৪।২৫ ও ২৯ শ্লোকে যথাক্রমে 'ভারতাখ্যান' ও 'ভারত' নাম আছে।

[৮] ঐ, ১।৩।২৪ ; ১১।৪।২২ [৯] মহাভা, ১২।৩৩৯।১০২'২—৪ ; পরে দেখ।

'নারায়ণীয়াখ্যান (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' অপেক্ষা প্রাচীন। ভাগবতপুরাণে গীতার প্রতি পরিষ্কার লক্ষ্য করা হইয়াছে।[১] উহার ভাগবতধর্ম-বিবরণের এক স্থলে আছে, পরমভাগবত মহাত্মা করভাজন রাজা নিমিকে বলেন যে কলিতে "নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি" ভারতবর্ষের অল্প কোন কোন স্থলে কখন কখন ("ক্বচিৎ ক্বচিৎ") অর্থাৎ অল্প সংখ্যায়, পরন্তু দ্রবিড়দেশে বহু ("ভূরিশঃ"), উৎপন্ন হইবে; ঐ দ্রবিড়দেশে (প্রাচ্যগামী) তাম্রপর্ণী, কৃতমাল, পয়স্বিনী, মহাপুণ্য কাবেরী এবং প্রতীচী (গামী) মহানদী নামক নদীসমূহ আছে; উহাদের জল পান করিলে লোক প্রায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া বাসুদেবের ভক্ত হয়।[২] অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ঐ সকল নদীর সঙ্গে দ্বাদশ বৈষ্ণব আলোয়ারগণের জন্মস্থানসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।[৩] তাম্রপর্ণী নদীর অনুদেশে নম্ম আলোয়ার এবং মধুরকবি আলোয়ারের জন্ম হয়; কৃতমাল (বা বৈগৈ) নদীর প্রদেশে পেরিয় আলোয়ার এবং তাঁহার কন্যা অণ্ডাল আলোয়ারের জন্ম হয়; পয়স্বিনী (বা পলর) নদীর প্রদেশে পোয়গৈ আলোয়ার, ভূদত্ত আলোয়ার, পে আলোয়ার এবং তিরুমলিসৈ আলোয়ারের জন্ম হয়; কাবেরী-প্রদেশে তোন্দরদিপ্পোদি আলোয়ার, তিরুপ্পন আলোয়ার এবং তিরুমঙ্গৈ আলোয়ারের জন্ম হয়; এবং মহানদীর (বা পেরিয়র নদীর) অনুদেশে সম্ভবত কুলশেখর আলোয়ারের জন্ম হয়। তাহাতে সহজে মনে হয় যে ঐ কারণেই ঐ সকল নদীর মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে। ঐ বচন যদি মূল 'ভাগবতপুরাণে'রই হয় তবে আলোয়ারগণের সময়ের পরে উহা বিরচিত হয় এবং উহার সময়ে দ্রবিড়দেশে ভাগবতধর্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মতে, বৈষ্ণব আলোয়ারগণ ৩য় হইতে ৯ম খ্রীষ্টশতকের কালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদেরই প্রভাবে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রচার হয়। অতএব ঐ বচনমূলে নির্ণীত হয় যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' ৯ম খ্রীষ্টশতকের পরে বিরচিত। পরন্তু ঐ বচনের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার,—উহাকে পরে প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার হেতুও আছে। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র মাঠর-কৃত বৃত্তিতে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র দুইটি বচন (১।৬।৩৫ ও ৮।৫২) উদ্ধৃত হইয়াছে। মাঠরের সময় অনিশ্চিত। খুব সম্ভবত তিনি ১০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন। যেহেতু তিনি '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইহেতু বলিতে হয় যে উহা তাঁহার সময়ের ১০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালের পূর্বে রচিত। পরন্তু কেহ কেহ তাহাতে সন্দেহ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে মাঠরের বৃত্তিতে ভাগবতের শ্লোক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ঐ সংশয়ের একমাত্র হেতু এই যে ভাগবতপুরাণ তত প্রাচীন হইতে পারে না। 'পঞ্চীকরণে'র ও 'উত্তরগীতা'র গৌড়পাদ-রচিত টীকায় ভাগবতপুরাণের বচন, উহার নামোল্লেখ পূর্বক, উদ্ধৃত হইয়াছে।[৪] তাঁহাকে এবং 'মাণ্ডুক্যকারিকা'কার গৌড়পাদকে—যিনি ৫ম খ্রীষ্টশতকে

---

[১] (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।১৬।৬—৮ দেখ। [২] ঐ, ১১।৫।৩৯—৪০

[৩] S. Krishnaswami Aiyangar, Early History of Vaishnavism in South India Madras, 1920, pp. 8—9

[৪] 'পঞ্চীকরণে'র টীকায় আছে "'জগৃহে পৌরুষং রূপম্' ইতি ভাগবতমুপন্যস্তম্।" উদ্ধৃত বচন '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ১।৩।১ শ্লোক। উত্তরগীতা'র টীকায় "তদুক্তং ভাগবতে" বলিয়া ১০।১৪।৪ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বর্তমান ছিলেন—অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নিরূপণ করিবার, এক নাম-সাদৃশ্য ব্যতীত অপর কোন হেতু নাই। ‘নন্দীশূত্র’ নামক এক প্রাচীন জৈনধর্মগ্রন্থে নানা প্রকার ‘মিথ্যাশ্রুত’ (“মিচ্ছাস্থঅম্”),—‘অ-আগমিক ও লৌকিক’, বিদ্যার উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে যে ঐ সকল “অনানিয়েহি নিচ্ছাদিঠে হি সচ্ছন্দবুদ্ধিবিগপ্পিত” (=অজ্ঞানিকৈর্মিথ্যাদৃষ্টিভিঃ সচ্ছন্দবুদ্ধিবিকল্পিত”); সেই কারণে উহারা ‘অ-আগমিক ও লৌকিক’। উহাদের মধ্যে ‘ভারহম্’ (=ভারত বা মহাভারত) এবং ‘রামায়ণম্’, তথা ‘পুরাণম্’ এবং ‘ভাগবয়ম্’এর উল্লেখ আছে।[১] বিণ্টার্নীজ মনে করেন যে ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ’কেই ঐ স্থলে ‘ভাগবয়ম্’ বলা হইয়াছে।[২] ‘নন্দীস্থত্র’ আচার্য দেবর্দ্ধি ক্ষমাশ্রমণ কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি ৯৮০ (বা ৯৯১) বীরনির্বাণ-সম্বতে (=৪৫৩ বা ৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) গুজরাটের রাজধানী বল্লভীতে আহূত জৈন মহাসঙ্গীতির সভাপতি ছিলেন। বিণ্টার্নীজের ঐ অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয় যে ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ’ ৫ম খ্রীষ্টশতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিল। পরন্তু বিণ্টার্নীজের ঐ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা, উক্ত স্থচীতে ‘পুরাণে’র ও ‘ভাগবতে’র পৃথক পৃথক এবং কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উল্লেখ আছে। ঐ ‘ভাগবত’ (বিষ্ণু) ‘ভাগবতপুরাণ’ হইলে ‘পুরাণে’র অন্তর্গত বলিয়া উহার পৃথক উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। অব্যবহিতভাবে না করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উল্লেখ করাতে এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। আমাদের মনে হয় ‘ভাগবয়ম্’=‘ভাগবতশাস্ত্র’ অর্থাৎ প্রাচীন ভাগবত-ধর্মের শাস্ত্রই। ফুহ্রে বিশ্বাস করিতেন যে তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে কবি বাণ (৬২০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) ‘ভাগবতপুরাণে’র উপযোগ করিয়াছিলেন।[৩] স্থতরাং তন্মতে ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ’ ৭ম খ্রীষ্টশতকের পূর্বেও বর্তমান ছিল। পার্জিটার মনে করেন যে উহা ৯ম খ্রীষ্টশতকোপকালে বিরচিত হয়;[৪] এবং ফার্কুহরের মতে উহা ৯০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে রচিত।[৫] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে উহা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের এবং দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতকের অন্তবর্তীকালে বিরচিত হয়।[৬] ঐ প্রকার অনুমানের কোন হেতু তাঁহারা নির্দেশ করেন নাই।

‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’র কাল সম্বন্ধে আরও নানা জনে ঐ প্রকারের আরও নানা কল্পনা-জল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল অনিশ্চয়তাময় অদৃঢ় ভূমি পরিত্যাগ

---

১) ‘নন্দীস্থত্র’, ৪১তম স্থত্র। আরও দেখ—অনুযোগদ্বারস্থত্র’, ৪১তম স্থত্র।

২) M. Winternitz, A History of Indian Literature Vol- II, English translation by Mrs. S. Ketkar and Miss H. Kohn, Calcutta, 1933, p. 478.

৩) Führer, trans. VIth Oriental Congress, Vol. III, p. 206. ভিন্সেণ্ট স্মিথের Early History of India তে উল্লিখিত। (4th. ed, 1924, p. 23)

৪) F. E. Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, London, 1922. p 57

৫) J N Farguhar, An outline of the Religions Literature of India p. 229 ff.

৬) Haraprasad shastri Descriptive catalogue of Sans. Mss. in the collections of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II (Calcutta, 1928), Preface, pp. cxxvi-cxxvii.

করিয়া আমরা এখন দৃঢ় নিশ্চিত ভূমিতে উঠিব। সুপ্রসিদ্ধ পার্শী-পর্যটক আলবীরুণী স্বকৃত 'ভারতবৃত্তান্তে' '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুর ধর্ম ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে জ্ঞানোপার্জনে নিরত হন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করত তিনি 'ভারতবৃত্তান্ত' রচনা করেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে কাশ্মীরের মহান সাধক, সাহিত্যিক এবং দার্শনিক আচার্য অভিনবগুপ্ত (১০০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) 'গীতা'র স্ববিরচিত টীকায় 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র নামোল্লেখ পুর্বক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১]

'মণিমেকলৈ' নামক বিখ্যাত প্রাচীন তামিল কাব্যে এক আচার্যের উল্লেখ আছে যিনি অতি আগ্রহের সহিত 'বিষ্ণুপুরাণ' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং যিনি বলিতেন যে ভগবান্ নারায়ণ সকলের রক্ষক। ঐ কাব্য খুব সম্ভবত দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতকের শেষ পাদে বিরচিত। সুতরাং 'বিষ্ণুপুরাণ' উহার পূর্বে তামিল প্রদেশে সুপরিচিত ছিল। অতএব উহার অন্তত দুই এক শতাব্দী পূর্বে,—অন্তত খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ-কালে 'বিষ্ণুপুরাণ' বিরচিত হইয়াছিল। বিন্টার্নীজ বলেন, 'বিষ্ণুপুরাণে' বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ পূজা, উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ একেবারেই নাই; এমন কি প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দিরসমূহের এবং বিষ্ণুর পবিত্র স্থানসমূহেরও উল্লেখ নাই; তাহাতে উহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে হয়।[২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে উহা তৃতীয় খ্রীষ্টশতকের প্রাক্‌কালীন হইতে পারে না।[৩]

নেপালের মহারাজার পুস্তকালয়ে 'স্কন্দপুরাণে' এক প্রাচীন হস্তলিখিত প্রতিলিপি আছে। উহা সপ্তম খ্রীষ্টশতকের প্রথম পাদে লিখিত হইয়াছিল।[৪] সুতরাং 'স্কন্দপুরাণ' নিশ্চয় উহার প্রাক্‌কালীন।

প্রাচীন দানপত্রসমূহে অনুদিত বচনসমূহের কতিপয় পদ্ম, ভবিষ্য এবং ব্রহ্ম পুরাণে পাওয়া যায়। তাহাতে নিরূপিত হয় যে ঐ সকল পুরাণ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে,—ঐ সময়ের বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল।[৫] ভিন্সেট স্মিথ বলেন, চতুর্থ খ্রীষ্টশতকের প্রথম ভাগে 'বায়ুপুরাণ' অবশ্যই বর্তমান রূপে ছিল।[৬] শ্রীনারায়ণ আয়ার লিখিয়াছেন যে, যত দূর

---

১) 'গীতা'র ১৪।৮ শ্লোকের টীকায় অভিনব গুপ্ত লিখিয়াছেন, "যথা বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং...... পশ্যন্নাপ ন পশ্যতি॥" তথা কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ......অয়মেব প্রমাদঃ॥' তত্রৈবৈকাদশস্কন্দে আত্মহত্যাশব্দবাচ্যো নির্ণীতো ভগবতা যথা 'নৃদেহমাদ্যং সুলভং...... তরেৎ স আত্মহা॥'

২) M. Winternitz. History of Indian Literature, Vol. 1, Eng. Trans., pp. 544-5

৩) Haraprasad Shasri, Desc. Cat. Sans. Mss. Asiat. Soc. Beng., Vol. V, Preface, p. cx.

৪) Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, p. 49 ; V. A. Smith, Early History of India, 4th ed., p. 28

৫) Pargiter, Ancient Ind, Hist. Lett. Trad., pp.46-50

৬) V. A. Smith, Early History of India, 4th ed., p. 322

জানা যায়, খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভিক শতকসমূহে পুরাণসমূহ তামিলদিগের পরিজ্ঞাত ছিল।[১] কেননা, সঙ্গমযুগের লোকসাধারণের নিকট পৌরাণিক দেবতাগণ অতি সুপরিচিত ছিল,—ঐ যুগের সাহিত্যে শিববিষ্ণ্বাদি দেবতাগণের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সহিত পুরাণের বিবরণের মিল আছে এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহও তাহাদের জানা ছিল।[২]

এই কিঞ্চিৎপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতকে 'বিষ্ণুপুরাণ' তামিল প্রদেশেও সুপরিচিত ছিল। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' তখন উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, না উহাতে পরে সংযোজিত হইয়াছে, যদি পরে সংযোজিত হইয়া থাকে, তবে কখন সংযোজিত হইয়াছে—নিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা যায়না। আল্‌বীরূণী (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) "বিষ্ণুধর্ম" হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি উহার সহিত সুপরিচিত ছিলেন,—উহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'ই সুতরাং উহা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বর্তমান ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে'র জ্যোতিষভাগের—যাহা 'পৈতামহসিদ্ধান্ত' নামে খ্যাত, নিকট বহু ঋণী ছিলেন। তাঁহার টীকাকারগণ ঐ প্রকার মনে করেন।[৩] সুতরাং 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' সপ্তম খ্রীষ্টশতকের পূর্বেকার।

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের রচনা-কাল, কিম্বা রচনার পৌর্বাপর্য নিরূপণ করা অতীব কঠিন। 'ঈশ্বরসংহিতা'র মতে,[৪] পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে 'পৌষ্কর-সংহিতা', 'সাত্বত-সংহিতা'ও 'জয়াখ্য-সংহিতা'; মুখ্য-'রত্নত্রয়' এবং 'পারমেশ্বরসংহিতা', 'ঈশ্বরসংহিতা'ও 'পাদ্ম-সংহিতা' যথাক্রমে উহাদের বিস্তার। পরন্তু তাহা হইতে অনুমান করা যায়না যে পৌষ্করাদি সংহিতাত্রয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেননা, 'সাত্বত-সংহিতা'য় 'পৌষ্কর-সংহিতা', 'বারাহসংহিতা' এবং 'প্রাজাপত্যসংহিতার (বা ব্রাহ্মসংহিতা'র) নাম আছে।[৫] তাহাতে মনে হয় উক্ত সংহিতাত্রয় 'সাত্বতসংহিতা' অপেক্ষা প্রাচীন। পরন্তু 'পৌষ্কর-সংহিতা'য় 'সাত্বতে'র নামোল্লেখ আছে।[৬] তথায় ইহাও উক্ত হইয়াছে যে 'পারমেশ্বরাগম' সর্বাগমসমূহের আদ্য।[৭] 'জয়াখ্য-সংহিতা'য় "সংহিতাপুস্তকাদি"র উল্লেখ আছে;[৮] কিন্তু কোন গ্রন্থবিশেষের নাম নাই। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় 'সাত্বত' এবং 'জয়াখ্য' সংহিতার নামোল্লেখ আছে।[৯] সুতরাং এই সংহিতাদ্বয় উহার আগেকার। 'সাত্বতসংহিতা'য় ও 'পৌষ্করসংহিতা'য় পরস্পরের নাম থাকার একমাত্র

---

১) C. V. Narayana Ayyar, Origin and Early History of Saivism in South India, Madras, 1936, p. 116.

২) নারায়ণ আয়ারের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১০৯—১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

৩) বীণ্টার্নীজ উহার ঠিক বিপরীত কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা মতে 'পৈতামহসিদ্ধান্ত'ই সম্ভবত ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুট্‌সিদ্ধান্তে'র আধারে রচিত হইয়াছিল। সেইহেতু তিনি মনে করেন যে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' নিশ্চয়ই ৬২৮ ও ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের-মধ্যে রচিত হইয়াছিল। (Winternitz, History of Indian Literature, Vol. I. p. 580) প্রাচীন টীকাকারগণের উক্তির বিপরীত কল্পনার কোন হেতু বীণ্টার্নীজ প্রদর্শন করেন নাই।

৪) ঈশ্বরসং, ১।৬৪ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৩।৭৯) আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তিনি 'পঞ্চরাত্রসমূহের মধ্যে কাপিল (পঞ্চরাত্র)।" তাহাতে বুঝা যায় যে কাপিলপাঞ্চরাত্রকে কেহ কেহ সর্বশ্রেষ্ঠ মানিত।

৫) সাত্বতসং, ৯।১৩৩ ৬) পৌষ্করসং, ৩৯।১৮'২ ৭) পৌষ্করসং, ৩৯।১৮'১

৮) জয়াখ্যসং, ১৮।৪৪'১ ৯) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।৫৯

উপপত্তি এই হইতে পারে যে উহাদের কোন একটি অথবা উভয়েই বর্তমানে প্রাচীন মূল রূপে নাই, মূলের পরিবর্তিত সংস্করণে মাত্র আছে। ‘পাদ্মসংহিতা’য় আছে যে পাদ্মসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, পরমসংহিতা, পাদ্মোদ্ভবসংহিতা, মাহেন্দ্রসংহিতা এবং কাণ্বসংহিতা—এই ছয়টিকে পরমর্ষিগণ মন্ত্রসিদ্ধান্তের ‘ষড়রত্ন’ বলিয়া থাকেন।[১] ‘বিষ্ণুতন্ত্রে’ আছে মন্ত্রসিদ্ধান্তমার্গে ‘নবরত্ন’ প্রসিদ্ধ ; উহারা যথাক্রমে এই :—পাদ্মতন্ত্র, বিষ্ণুতন্ত্র, কাপিঞ্জলসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, মার্কণ্ডেয়সংহিতা, শ্রীধরসংহিতা, পরমসংহিতা, ভরদ্বাজ (বা পরাশর) সংহিতা ও নারায়ণতন্ত্র। কতিপয় সংহিতার পৌবাপর্য সম্বন্ধে শ্রেডারের অনুমান[২] ঐ পরস্পরোল্লেখ হেতু অংশত ভূল সিদ্ধ হয়। সাধন-পদ্ধতির এবং বর্ণমালার রূপের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ‘জয়াখ্যসংহিতা’ খুব সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টশতকে বিরচিত হইয়াছিল।[৩] ‘অহির্বুধ্ন্যসংহিতা’ উহার পরে রচিত। শ্রেডার অনুমান করেন যে উহার বেশী কাল পরের নহে।[৪] ‘ঈশ্বরসংহিতা’ প্রভৃতি কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় প্রাচীন আচার্য-পরম্পরার মধ্যে শঠকোপের নাম পাওয়া যায়।[৫] তিনি অষ্টম খ্রীষ্টশতকে প্রাদুর্ভূত হন। তাহাতে বলিতে হয় যে ঐ সকল সংহিতা ঐ সময়ের পরাক্‌কালীন। যামুন (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) ‘ঈশ্বরসংহিতা’র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৬] সুতরাং উহা তদপেক্ষা প্রাচীন। পরন্তু উহা প্রচলিত ‘ঈশ্বরসংহিতা’ হইতে ভিন্ন। কেননা যামুন-ধৃত বচন হইতে দেখা যায় উহা ঈশ্বর (বা শিব) তাঁহার পুত্র ষণ্মুখকে (বা কার্তিকেয়কে) উপদেশ করিয়াছিলেন।[৭] পরন্তু প্রচলিত ‘ঈশ্বরসংহিতা’র বক্তা নারদ। উহাতে কথিত হইয়াছে যে তিনি ভগবান্ নারায়ণ ঋষির আদেশে বদরিকাশ্রমে তপস্যা-নিরত মুনিগণকে উহা উপদেশ করেন।[৮] প্রচলিত ‘ঈশ্বরসংহিতায় রামানুজের প্রতি ইঙ্গিত আছে।[৯] ঐ বচন যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে বলিতে হইবে উহা একাদশ খ্রীষ্টশতকের পরে বিরচিত।

‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে বিষ্ণুপূজার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। যথা, শঙ্খচক্রাদি ও শ্রীবৎসাদিধারী মূর্তিরূপে আবির্ভূত বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়া ব্রহ্মা বলেন, “রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেন। যোগেন” (‘হে

---

১) পদ্মসং, ৪।৩৩।২০২—২০৩'১ ২). Schrader, Introduction to the Pancaratra, ২০ পৃষ্ঠা

৩) ‘জয়াখ্যসংহিতা’র Foreword, ২৬-৩৪ পৃষ্ঠা

৪) শ্রেডারের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৭-৯ পৃষ্ঠা দেখ।

৫) “একান্তিনো মহাভাগাঃ শঠকোপপুরঃসবাঃ ॥”—ঈশ্বরসং, ৮।১৭৫'২ এই সংহিতায় উক্ত “দ্রামিড়ী শ্রুতি” (১১।২৩৬'১) “দ্রামিড়ী স্তুতি” (১১।২৫২'১ ; ১৩।২৪৬'১) এবং “ভাষাপ্রবন্ধ” (১১।২৩৬'২) ও শঠকোপাদি রচিত।

৬) ‘আগমপ্রামাণ্য’ ৮১—২ পৃষ্ঠা।

৭) বেঙ্কটনাথের ‘সচ্চরিত্ররক্ষা’র (৩য় অধিকারে) ধৃত ‘ঈশ্বরসংহিতা’র বচনেও বক্তা ঈশ্বর এবং শ্রোতা স্কন্দ। (শ্রীমদ্‌বেদান্তদেশিক গ্রন্থমালা, ব্যাখ্যান বিভাগে, ‘সচ্চরিত্ররক্ষা’, ৮৩ পৃষ্ঠা)।

৮) ঈশ্বরসং, ১।৮—, ৭০-১

৯) কথিত হইয়াছে যে বলরামের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন এবং তাঁহাকে বলেন যে তিনি পুর্বে প্রথমে শেষরূপে এবং পরে লক্ষ্মণরূপেও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ; ভবিষ্যতে কলি যুগে কশ্চিৎ দ্বিজোত্তম হইয়া নানাবিধ ভোগজাল দ্বারা তাঁহার অর্চন করিবেন। (ঈশ্বরসং, ২০।২৭৩'২—২৭৬'১) শেষাবতার ঐ দ্বিজোত্তম, সাম্প্রদায়িক প্রসিদ্ধি অনুসারে রামানুজই।

পুরুষর্ষভ তোমার এই রূপ শ্রেয়োর্থিগণ কর্তৃক বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ে পূজ্য')।"[১] তথায় বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী দীক্ষারও উল্লেখ আছে।[২] অন্যত্র আছে যে পরমতত্ত্ব নিরুপাধিক এক হইলেও লোকে অজ্ঞানবশত গুণজ ভেদবিকল্প আরোপ করত তাহাকে নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকে। কেহ কেহ (বেদান্তী) তাহাকে ব্রহ্ম বলে ; কেহ কেহ (মীমাংসক) ধর্ম বলে ; কেহ কেহ (সেশ্বর সাংখ্যবাদী) "সদসতের পর পুরুষ পরমেশ্বর" বলে ; অপরে (পাতঞ্জল যোগী) "আত্মতন্ত্র অব্যয় মহাপুরুষ" বলে ; "অন্যেঽবয়ন্তি নবশক্তিযুতং পরং" ('অন্যে নবশক্তিযুক্ত পর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে,)।[৩] শেষোক্ত উহারা কাহারা ? বেদান্তীমীমাংসকাদির পৃথক উল্লেখ থাকাতে নিশ্চিত হয় যে উহারা অবশ্যই উহাদের হইতে ভিন্ন। টীকাকার বলেন যে উহারা পাঞ্চরাত্রগণ এবং ঐ নবশক্তি এই—বিমলা, উৎকর্ষণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা।[৪] ভগবান্ কোন যুগে কিংবর্ণ ও কীদৃশ হয় ? এবং কোন্ নামে ও বিধিতে তাঁহার পূজা করা হয় ? রাজা নিমির এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে পরম-ভাগবত মহাত্মা করভাজন বলেন যে দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, (শঙ্খচক্রাদি) নিজায়ুধযুক্ত ও শ্রীবৎসাদিধারী হন। তাঁহার নাম হয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ ঋষি, পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব ও সর্বভূতাত্মা। জিজ্ঞাসুগণ সেই পরমপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক মার্গে ("বেদতন্ত্রাভ্যাং") পূজা করিয়া থাকে।[৫] ব্রহ্মা-দৃষ্ট পূর্বোক্ত মূর্তি এবং এই মূর্তি একই। করভাজন ঐ সঙ্গে ইহাও বলেন যে মনুষ্যগণ সত্যযুগে "শান্ত, নির্বৈর, (সর্বভূত)-সুহৃদ ও সম-(দর্শী)" এবং "যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ" (শম, দম, ও তপস্যা দ্বারা দেবের পূজা করে') ; ত্রেতাযুগে মনুষ্যগণ ধর্মিষ্ঠ ও ব্রহ্মবাদী এবং "ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা পূজা করে ;" এবং কলিতে 'নানাতন্ত্র বিধানে", তথা "সঙ্কীর্তনপ্রায় যজ্ঞসমূহ দ্বারা" পূজা করিয়া থাকে।[৬] এই বর্ণনা মতে তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি দ্বাপরযুগে প্রচলিত হয় এবং কলি যুগে প্রাধান্য লাভ করে। কথিত হইয়াছে যে তন্ত্র ভগবান কর্তৃক প্রোক্ত বলিয়া স্মৃত হয়।[৭] কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন,

> "সাত্বতাং নবমূর্তীনামাদিমূর্তিরহং পরা।"[৮]

'সাত্বতদিগের নবমূর্তিসমূহের মধ্যে আমি পরা আদিমূর্তি। ঐ আদিমূর্তি বাসুদেবেরই।[৯] 'গীতা'তে তিনি বলিয়াছেন, "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি।[১০] (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' ঠিক সেই

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৮।৬।৯ ; ২) ঐ, ১১'১১।৩৭·২ ৩) ঐ, ৮।১২।৯ ; আরও দেখ—১১।২৭।২৫

৪) "জ্ঞানভাসাদিকানাং চ শক্তীনাং নবকং ক্রমাৎ"—(ঈশ্বরসংহিতা, ২০।১৪৫·২)

পদ্মপুরাণে'র (উত্তরখণ্ড, ২৫৬।৪৭—৫০) মতে মিলাত্মা-ঈশ'নাপর্যন্ত অষ্টশক্তি পরমব্যোমে "পরমাত্মার মহিষীগণ"। ভূদেবা ও লীলাদেবী তাঁহার দুই পার্শ্বে সমাসীন ; আর বিমলাদি অষ্টদিকে থাকিয়া দিব্য চামরসমূহ দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। (আরও দেখ—২৫৭।৭১—৬)

৫) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১১।৫।২৭—৩১·১ ৬) ঐ, ১১।৫।২২, ২৫ ও ৩১·২—৩২

৭) "তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্"—ঐ, ৩।৭।৩০·২

আরও দেখ—১১।৩।৪৭ (আবির্হোত্র) ; ১১।২৭।২৬ ও ৪৯ কৃষ্ণ বৈদিক, তান্ত্রিক এবং মিশ্র-এই ত্রিবিধ পূজা বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। (১১।২৭।৭)

৮) ঐ, ১১।১৬।৩২·২ ৯) পরে দেখ। ১০) গীতা, ১০।৩৭·১

কথাই প্রকারন্তরে ব্যক্ত হইয়াছে। পরন্তু ঐ প্রকারান্তরোক্তি হইতে অধিকন্তু ইহাও জানা যায় যে উহার পূর্বে পাঞ্চরাত্র ধর্মে নবব্যূহবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র ধর্মে নবব্যূহবাদ কখন হইতে প্রচলিত হয় তাহা জানা নাই। তবে যতদূর জানা যায়, তাহাতে ইহা প্রায় নিশ্চিত বোধ হয় যে আদিতে ব্যূহের সংখ্যা চার বলিয়া মানা হইত, পরে নয় বলিয়া মনে করা হইতে থাকে। 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে চারি ব্যূহের উল্লেখ আছে এবং 'পৌষ্করসংহিতা'য় নব ব্যূহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] বিষ্ণ্বাদি দেবতার পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী পূজাবিধির বর্ণনায় 'অগ্নিপুরাণে' "আদি মূর্তি"র বা "একমূর্তি"র, তথা "নবমূর্তি"র বা "নবব্যূহে"র, পূজা বিধি বিবৃত হইয়াছে।[২] পাঞ্চরাত্র সংহিতাসমূহের মধ্যে 'জয়াখ্যসংহিতা'কে 'পৌষ্করসংহিতা'র সমশ্রেণীর বলিয়া অধুনা মানা হইয়া থাকে এবং উহা খুব সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টশতকে বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণকে ঐ সময়ের পূর্বে বিরচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

প্রচলিত গর্গসংহিতা'য় '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র নামোল্লেখ অনেক বার পাওয়া যায়।[৩] 'সম্মোহন তন্ত্রে' 'গর্গসংহিতা'র মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ গর্গমুনিকে "কৃষ্ণ-ভক্তি-বিবর্দ্ধন" সংহিতা প্রণয়নে প্রোৎসাহিত করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে তিনি "শ্রীমদ্ভাগবতে"র উল্লেখ করেন। তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না যে প্রচলিত 'গর্গসংহিতা' '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণে'র পরে বিরচিত হয়। উহার অন্তিম খণ্ডে বিক্রমশালিবাহনাদি শকপ্রবর্তকগণের[৪] এবং রামানুজাদি চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণের উল্লেখ আছে।[৫] কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে যে "কলিতে ৪৫০০ অব্দ গতে (গোবর্ধন) গিরিবরে শ্রীনাথ প্রাদুর্ভূত হইবেন। রবির তনু বিষ্ণুস্বামী ব্রজে তাঁহার পূজা করিবেন। বল্লভাদি অপর গোকুল-স্বামিগণ তাঁহার শিষ্য।"[৬] তাহাতে অনুমান হয় যে বর্তমান 'গর্গসংহিতা' ৪৫০০ কল্যব্দের বা ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে, এমন কি আচার্য বল্লভের (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) ও পরে, রচিত বা সংস্কৃত হয়।

প্রচলিত 'গর্গসংহিতা'র অপর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ-যোগ্য মনে হয়। বিষ্নত

---

১) পৌষ্করসংহিতা

২) 'অগ্নিপুরাণে'র ২৩তম অধ্যায়ের ১—২০ শ্লোকে একমূর্তির পূজা এবং ২১—শ্লোকে নবমূর্তির পূজা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩) 'গর্গসংহিতা,' ৬।১৩।৭·২, ১০—১১·১ ; ৭।১৬।১৮,২০ ; ১০।৬২।৩১— ৪) ঐ, ১০।৬১।২০—১

৫) "বামনশ্চ বিধিঃ শেষঃ সনকো বিষ্ণুবাক্যতঃ।
ধর্মার্থহেতবে চৈতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাঃ কলৌ॥
বিষ্ণুস্বামী বামনাংশস্তথা মাধ্বস্তু ব্রহ্মণঃ।
রামানুজস্তু শেষাংশো নিম্বার্কঃ সনকস্য চ॥
এতে কলৌ যুগে ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্তকাঃ।
সংবৎসরে বিক্রমস্য চত্বারঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ (—ঐ, ১০।৬১।২৩—৬)

বিশেষ লক্ষ্য বিষয় এই যে এইখানে বল্লভের নামোল্লেখ নাই, বিষ্ণুস্বামীকেই সম্প্রদায় প্রবর্তক বলা হইয়াছে। পরন্তু পরে উক্ত হইয়াছে যে বল্লভাদি গোকুলস্বামিগণ বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। (১০।৬২।৩০)

৬) ঐ, ১০।৬২।২৯—৩০

হইয়াছে যে রাজা উগ্রসেনের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া শিবভক্ত বল্বল দৈত্যের সহিত অনিরুদ্ধ-প্রমুখ যাদবগণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। অনিরুদ্ধের বাণে বল্বল মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহাকে পরিরক্ষার্থ ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার বাণে অনিরুদ্ধ মূর্চ্ছিত হন। তখন তাঁহার সাহায্যার্থ কৃষ্ণ তথায় সমাগত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর

> "ওঁ অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
> ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥"

ইত্যাদি[১] ষট্‌পদী স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন।[২] আজকাল বিদ্বজ্জনসমাজে ইহা প্রসিদ্ধি আছে যে ঐ স্তোত্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য (আদ্য) প্রণীত। তাহাতে বলিতে হয় যে 'গর্গসংহিতা' শঙ্করাচার্যের (৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) পরে বিরচিত। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন যে ঐ স্তোত্র প্রকৃতপক্ষে মূলত 'গর্গসংহিতা'র ; পরবর্তী লোকে অজ্ঞানবশত উহা আচার্য শঙ্করের বলিয়া মনে করিয়া থাকে। পরন্তু ঐ অনুমান ঠিক বিচারসহ হইবে না। কেননা, ঐ স্তোত্রে সংসার-সাগর হইতে ত্রাণের জন্য প্রার্থনা আছে। ("তারয় সংসারসাগরতঃ") ; আর স্তোতা বলিয়াছেন যে তিনি সংসারতাপে ভীত ("ভবতাপভীতোঽহম্")। ভগবান্ শঙ্করকে ঐ প্রকার মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং উহাকে তৎকর্তৃক রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ভবভয়ভীত জনৈক বিষ্ণুভক্ত মনুষ্য-কর্তৃকই উহা রচিত বলিতে হইবে।

'নারদসূত্র' এবং 'শাণ্ডিল্যসূত্র' নামক ভক্তিসূত্রদ্বয়কেও ভাগবতধর্মেরই গ্রন্থ বলা যায়। ইহা অবশ্য সত্য যে উহাদের রচয়িতা নারদ এবং শাণ্ডিল্যকে যথাক্রমে ভাগবতধর্মাচার্য নারদের এবং পাঞ্চরাত্র-ধর্মাচার্য শাণ্ডিল্যের সহিত অভিন্ন মনে করিবার নাম-সাদৃশ্য এবং কিম্বদন্তী ব্যতীত অপর কোন হেতু নাই। তবে উহাদিগেতে একান্তভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হওয়াতে[৩] উহাদিগকে একান্তধর্মের গ্রন্থ বলা যায়। শাণ্ডিল্য আরও বিশেষভাবে গীতোক্ত একান্তভাবেরই কথা বলিয়াছেন। 'শাণ্ডিল্যসূত্রে'র এক সূত্রে 'গীতা'র স্পষ্ট উল্লেখ আছে ;[৪] অপর কতিপয় সূত্রে গীতার বচনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৫] কোন কোন সূত্রের বিষয়বাক্য নারায়ণীয়াখ্যানের কোন কোন বচন।[৬] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে উহা গীতার এবং নারায়ণীয়াখ্যানের পরাক্‌কালীন। উহার এক সূত্রে বাদরায়ণের নামোল্লেখ আছে এবং তদ্রচিত 'ব্রহ্মসূত্রে'র সূত্রবিশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৭] তাহাতে প্রমাণিত হয় যে

---

১) 'গর্গসংহিতা' ১০।৩৯।২—৮

২) ঐ, ১০।৩৯।১ ও ৯

ইহা প্রদর্শন করা উচিৎ বোধ হয় যে 'গর্গসংহিতা'য় বিবৃত যাদবগণও বল্বল দৈত্যের যুদ্ধের ব্যাপার 'বিষ্ণুপুরাণে' (৫।৩৩শ অধ্যায়ে) বর্ণিত যাদবগণ ও বাণাসুরের যুদ্ধের ব্যাপারের অনুরূপ।

৩) "ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ" (নারদসূত্র, ৬৭)

"সৈকান্তভাবো গীতার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ"—(শাণ্ডিল্যসূত্র, ৮৩)

৪) শাণ্ডিল্যসূত্র, ৮৩ সূত্র

৫) যথা দেখ—সূত্র ৫, ১৫, ২২, ৮১ ইত্যাদি

৬) যথা ৭৯ ও ৮০ সূত্র

৭) শাণ্ডিল্যসূত্র, ৩০ সূত্র। এই সূত্রের বিষয় 'ব্রহ্মসূত্রে'র ৪।১।৩ সূত্র।

'শাণ্ডিল্যসূত্র' বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'রও পরে বিরচিত। 'নারদসূত্রে' শাণ্ডিল্যের, তথা ব্যাস ও শুকের, নামোল্লেখ আছে।[১] সুতরাং উহা 'শাণ্ডিল্যসূত্র' এবং 'মহাভারতে'র পরাক্‌কালীন। কেহ কেহ উহাকে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' অপেক্ষাও অর্বাচীন মনে করেন।

'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা', 'বৃদ্ধহারীতসংহিতা', 'বিষ্ণুধর্মশাস্ত্র', প্রভৃতি কতিপয় ধর্মশাস্ত্র বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র বলিয়া জানা যায়। "জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহে' প্রকাশিত' 'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা'র প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তি-বাক্যে আছে, "ইতি গৌতমীয়ে শ্রীবৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রে···। উহার প্রারম্ভে আছে যে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ কৃষ্ণকে বৈষ্ণবধর্ম জিজ্ঞাসা করেন এবং তদুত্তরে কৃষ্ণ তাহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যা করেন।[২] এই সকল হইতে, তথা আরও কতিপয় প্রমাণ হইতে,[৩] নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে 'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা'য় বৈষ্ণব ধর্মই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্মৃতি মূলত 'মহাভারতে'র অশ্বমেধপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কেননা, উভয়ের মধ্যে অনেক সামান্য বচন আছে। অপরার্ক (১১২৫ খ্রীষ্টাব্দ), হেমাদ্রি (১২৭০), প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকারগণ 'বৃদ্ধগৌতমসংহিতা' হইতে বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[৪] সুতরাং উহা অন্ততপক্ষে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয়। জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহে' ধৃত 'বৃদ্ধহারীতসংহিতা'র অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্যে উহাকে "বিশিষ্টধর্মশাস্ত্র" বলা হইয়াছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'স্মৃতীনাং সমুচ্চয়' গ্রন্থে ধৃত উহার অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্যে উহাকে "বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র" বলা হইয়াছে। বিষয়পর্য্যালোচনা হইতেও প্রকৃষ্টরূপে জানা যায় যে 'বৃদ্ধহারীতসংহিতা' প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রই।

আরও বিশেষ করিয়া বলিলে উহা বৈখানস বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র বলিয়া মনে হয়। কেননা, উহার উপসংহারে মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন, 'হে রাজন্, তোমাকে পারমৈকান্ত্যসিদ্ধিদ বেদোপবৃংহিত এই বিশিষ্ট বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র,—যাহা পরমাত্মা কর্তৃক বিষ্বক্‌সেনকে এবং ধাতাকে সম্প্রোক্ত হইয়াছিল কথিত হইল। ইহা পুরাকালে বিষ্বক্‌সেন কর্তৃক বিখনসকে সম্প্রোক্ত হইয়াছিল;[১] বিখনস কর্তৃক ভৃগুকে প্রোক্ত হইয়াছিল; মহর্ষি ভৃগু কর্তৃক বৈবস্বত মনুকে প্রোক্ত হইয়াছিল এবং মনু কর্তৃক আমাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। মনু স্বয়ং সামান্যরূপে ('সামান্যেন') ধর্মশাস্ত্র বলিয়াছেন। তাহাই ('তদেব হি'), হে রাজন, মৎকর্তৃক তোমাকে

---

১) নারদসূত্র, ১৭ (পারাশর্য), ১৮(শাণ্ডিল্য), ৮৩ (ব্যাস্‌ শুক, শাণ্ডিল্য)।

২) যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন,

"ভগবন্, বৈষ্ণবা ধর্মাঃ কিংফলাঃ কিংপরায়ণাঃ।
কিং ধর্মমধিকৃত্যাসন্ ভবতোৎপাদিতাঃ পুরা॥"

—(বৃদ্ধগৌতমসংহিতা, ১।৩ ('ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ', ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

মুম্বাইয়ের খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে'ও ঐ প্রশ্ন আছে। (১।১৪৬।২৭'২—২৮'১) তথায় 'কিং ধর্মমধিকৃত্যাসন্' স্থলে 'কিং কৃত্যমধিকৃত্যৈতে' পাঠান্তর আছে।

৩) যথা, 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহে'র ৫০৪, ৬৩৭ ও ৬৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

৪) পি, ভি, কালে বিরচিত History of Dharmasastras, পুণা, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

৫) ঐ, ৬৬ পৃষ্ঠা। ১১) ঐ, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৬) পরে দেখ।

বৈশিষ্ট্যরূপে (‘বৈশিষ্ট্যেন’) কথিত হইল। ইহা পরম বিশিষ্ট উত্তম বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র।”[১] এই বচনের ‘বিশিষ্ট’ ও ‘সামান্য’ সংজ্ঞাদ্বয়ের প্রতি প্রণিধান কর্তব্য। হারীত পূর্বে বলিয়াছেন, বৈষ্ণব হইয়া বৈদিক বৃত্তি আশ্রয় করিয়া যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মসমূহ একমাত্র ভগবৎপ্রীত্যর্থ কৃত হইলে ‘বিশিষ্ট’ বলিয়া অভিহিত হয়, অন্যথা ‘সামান্য’ বলিয়া স্মৃত হয়।[২] ‘বৃদ্ধহারীতস্মৃতি’র ১০ম অধ্যায়ে ইষ্টিযাসমূহের এবং হরির উৎসব কর্মসমূহের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। তথায়ও কথিত হইয়াছে যে ঐ দিব্য এবং উত্তম বিধান পূর্বে বিষ্ণু বিখনসকে, বিখনস ভৃগুকে এবং ভৃগু হারীতকে বলেন।[৩] এই আচার্য পরম্পরা হইতে নিশ্চিত হয় যে ‘বৃদ্ধহারীতস্মৃতি’ বৈখানস বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভৃগু-শাখার স্মৃতিগ্রন্থ। কথিত হইয়াছে যে, যে হারীত-প্রোক্ত ঐ পরম ধর্মসংহিতা অবলোকন করত তদনুসারে বিষ্ণুকে পূজা করে, সে পারমৈকান্ত্য লাভ করে।[৪] “এই পরম বৈদিক উত্তম বৈষ্ণবশাস্ত্র জানিয়াই পরমৈকান্তী ঈশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিবে।”[৫] বৈখানস বিপ্রগণ হরিপূজনতৎপর এবং হরিপাদাব্জসংশ্রিত।[৬] বিশ্বরূপ (৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ ‘বিষ্ণু-ধর্মশাস্ত্রে’র উল্লেখ করিয়াছেন এবং মেধাতিথি (৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) উহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৭] সুতরাং উহা বিশ্বরূপের পূর্বেকার গ্রন্থ। অধ্যাপক কানে অনুমান করেন যে উহা বিশ্বরূপের বেশীকাল পূর্বের নহে।

---

১) ‘বৃদ্ধহারীতস্মৃতি’, ১১।৩৪০'১—৪ (‘স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ’, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

২) ঐ, ৮।৩১—৩২'১ (‘স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ’, ২৭৯ পৃষ্ঠা)।

৩) ঐ, ১০।৩—৭ (‘স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ’,) ৩২৫ পৃষ্ঠা)।

৪) ঐ, ১১।৩৪৮ ৫) ঐ, ১১।৩৫৪ ৬) ঐ, ৮।৭৮

৭) পি, ভি, কানে, History of the Dharmasastras, ৬৬ পৃষ্ঠা।

৮) ঐ, ৬৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাগবত ধর্মের প্রবর্তন

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে যে বেদ পাঠ করিতে হইলে, উহার তত্ত্বরহস্য যথাযথ অবগত হইতে হইলে, উহার প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা, ঋষি, ছন্দ এবং বিনিয়োগ অবশ্যই জানিতে হইবে। তাহাদের প্রত্যেককে জানার ফলও প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, "(বেদের) প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা অতি যত্নের দ্বারা (যথাযথ) জানিতে হইবে। কেননা, যে মন্ত্রসমূহের দেবতাগণকে বিজ্ঞাত হয়, সেই উহাদের তাৎপর্য অধিগত হয়; ঋষিদিগের দৃষ্ট ঐসকল মন্ত্রসমূহে যাহা নিহিত আছে এবং যাহা উহাদের অভিপ্রেত সেই বিজ্ঞান, তথা নানাবিধ কর্মসমূহ, সে বিজ্ঞাপন করিতে পারে।"[১] 'আর্ষেয়ব্রাহ্মণে' আছে, "ঋষিদিগের নামের ও গোত্রের উপধারণ স্বর্গ্য, যশস্য, ধন্য (অর্থাৎ ধনার্থ হিতকর), পুণ্য, পুত্র্য (=পুত্রার্থ হিতকর), পশব্য, ব্রহ্মবর্চস্য, স্মার্ত (=স্মৃতিপ্রদ), আয়ুষ্য এবং প্রাক্‌প্রাতরাশিক বলিয়া কথিত হয়। ইহাও বলা হয়, যে প্রত্যেক ঋষির উহা উপধারণ করে সে দিব্য সহস্র বৎসর অতিথি হয়, অভিনন্দিত প্রতিনন্দিত, মানিত ও পূজিত হয় এবং তাহাতে স্বাধ্যায়ের ফললাভ করে।[২] উহাদিগকে না জানার প্রত্যবায়ও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা, শৌনক বলেন, "দৈবতকে যথাযথ না জানিয়া কেহই লৌকিক কিম্বা বৈদিক কর্মসমূহের ফল প্রাপ্ত হয় না।"[৩] 'আর্ষেয়ব্রাহ্মণে' আছে, "ব্রাহ্মণ (বচন)ও আছে যে, 'যাহার ঋষি, ছন্দ, দৈবত এবং ব্রাহ্মণ বিদিত নহে, সেই মন্ত্র দ্বারা যে যজন করে কিম্বা অধ্যাপন করে, সে স্থাণুত্ব (অর্থাৎ বৃক্ষাদিস্থাবরযোনি) প্রাপ্ত হয়, কিম্বা গর্তে অর্থাৎ নরকে, নিপতিত, কিম্বা অল্পায়ু হয়, কিম্বা পাপী হয়" ইত্যাদি।[৪] মহর্ষি কাত্যায়নও বলিয়াছেন, "ঐ জ্ঞান ব্যতীত শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মাদির ফলসিদ্ধি হয় না। মন্ত্রসমূহের ব্রাহ্মণ, ঋষি, ছন্দ ও দেবতার জ্ঞাতা যাজন ও অধ্যাপন দ্বারা শ্রেয়ো লাভ করে। আর ঐ সকল না জানিয়া যাজন ও অধ্যাপন করিলে বেদমন্ত্রসমূহ নিস্ফল হয়, অথবা স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, অথবা গর্তে নিপতিত হয়, অথবা অল্পায়ু হয়, কিম্বা পাপী হয় বলিয়া জানা যায়।"[৫]

ঐ ন্যায় অনুসারে ভাগবতধর্মের তত্ত্ব সম্যক্ জানিতে উহার ঋষি (অর্থাৎ প্রবর্তক),

---

১) 'বৃহদ্দেবতা' ১।২—৩ ২) আর্ষেয়ব্রা, ১।১ ৩) 'বৃহদ্দেবতা', ১।৪ ৪) আর্ষেয়ব্রা, ১।১

৫) 'কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণী', ১।১ আরও দেখ

"ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাণ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥
মন্ত্রাণাং দৈবতং ছন্দো নিরুক্তং ব্রাহ্মণানৃষীন্॥
...তাদীংশ্চাজ্ঞাত্বা যজন্তো যাগকণ্টকাঃ॥"

ব্রাহ্মণ (বা আচার্যপরম্পরা), দেবতা এবং বিনিয়োগ অবশ্যই জানিতে হইবে। দেবতাতত্ত্ব বিচার দ্বারা ধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগ হইতে আচারপদ্ধতি জানা যায়। ধর্মের প্রসার এবং প্রতিপত্তিও বিনিয়োগের অন্তর্গত।

‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’র এক বচন মূলে পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মের প্রথম প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই; তিনি প্রথমে দেবর্ষি নারদকে উহার উপদেশ প্রদান করেন এবং নারদ প্রহ্লাদ ও যুধিষ্ঠিরের নিকট উহা ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু ঐ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতও শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের ইতিহাস-চর্চাকারী আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহও তৎসম্বন্ধে অন্য মত পোষণ করেন, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই সকল মতমতান্তরসমূহের পর্যালোচনা করতঃ প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে প্রচেষ্টা করিব এবং ভাগবতধর্মের আচার্য-পরম্পরাও যথাসম্ভব নির্ণয় করিব।

ভাগবত ধর্মের আচার্য-পরম্পরা

‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ উহাকে “ভাগবতীসংহিতা”,[1] “সাত্বতীশ্রুতি”[2] এবং “সাত্বত-সংহিতা”[3] নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ‘শাণ্ডিল্যসংহিতা’য় উহাকে “ভাগবতাগম” ও “পরমাগম” বলা হইয়াছে।[4] এই সকল নাম হইতে বুঝা যায় যে উহাতে “ভাগবতধর্ম বা সাত্বতধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহার প্রারম্ভে বিবৃত একটা আখ্যায়িকা হইতেও তাহা সাক্ষাদ্ভাবে এবং নিশ্চিতরূপে জানা যায়।[5] সুতরাং ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’র আচার্যপরম্পরাকে ভাগবতধর্ম বা সাত্বতধর্মের আচার্যপরম্পরা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’র বংশপরম্পরা সম্বন্ধে উহাতে তিনটি মত দেখা যায়। (১) পরমভাগবত শুকদেব এক স্থলে বলিয়াছেন যে ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ ব্যাখ্যাত “পরমগুহ্যজ্ঞান” বা “তত্ত্ববিজ্ঞানের উপদেশ সর্বপ্রথমে ভগবান্ বিষ্ণু ভগবান্ ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন; ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি নারদ উহা প্রাপ্ত হন; তিনি পরমর্ষি ব্যাসের নিকট সংক্ষেপে উহা বিবৃত করেন;[6] ঐ সংক্ষিপ্ত বিবৃতির আধারে ব্যাস বিস্তৃত ‘ভাগবতপুরাণ’ রচনা করেন এবং স্বীয় পুত্র শুকদেবকে পড়ান, শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উহা শুনান।[7] (২) অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে ঐ “পুরাণ-সংহিতা” বা “ভাগবতী সংহিতা” অব্যয় নারায়ণঋষি প্রথমে নারদকে বলেন, নারদ ব্যাসকে এবং ব্যাস শুককে বলেন।[8] (৩) পরন্তু মহর্ষি মৈত্রেয় বলেন যে “ভাগবতপুরাণ” সর্বপ্রথমে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ভগবান্ বাসুদেবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু “নিবৃত্তিধর্মাভিরত” মহর্ষি সনৎকুমারকে বলেন, তিনি “পারমহংস্যধর্মে মুখ্য” সাংখ্যায়ন ঋষিকে এবং সাংখ্যায়ন পরাশর ঋষি ও বৃহস্পতি

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৭।৮·১ ; ১২।৪।৪২·২ ২) ঐ, ১।৪।৭·২ ৩) ঐ, ১।৭।৬·২

৪) ‘শাণ্ডিল্যসংহিতা’, ভক্তিখণ্ড, ৩।১১।৪, ২৫ ; ৪।১১।৩৬, ৪৫ দেখ

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটির নাম ‘ভাগবতসংহিতা’। (শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রতন্ত্রসূচীয় ১০৫ সাংখ্যক গ্রন্থ) উহা অবশ্যই ভিন্ন গ্রন্থ।

৫) পরে দেখ।

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ২।৪।২৫ ; ২।৯ অধ্যায়। আরও দেখ—৩।৪।১৩,

৭) ঐ, ২।৭ অধ্যায় ; ১২।১৩।১৯—২০ ৮) ঐ, ১২।৪।৪০-২ ; আরও দেখ—১০।৮৭।৪৭-৮

ঋষিকে উহা শিক্ষা দেন ; মৈত্রেয় পরাশরের নিকট "ভাগবতপুরাণ" শ্রবণ করেন এবং বিদুরকে উহা বিবৃত করেন।[১] শুকও কখন কখন বলিয়াছেন, যিনি সঙ্কর্ষণ বা শেষ "সাত্বত-শাস্ত্রবিগ্রহ"[২] তিনি সাত্বতগণ কর্তৃক একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেবিত হন ;[৩] এবং তিনিই ভাগবতধর্মের উপদেষ্টা।[৪]

তিনি, ইহাও মুখে বলিয়াছেন যে, ভগবান্ কৃষ্ণ মহাভাগবত মহর্ষি মৈত্রেয় এবং উদ্ধবকে বলেন, "আমার মহিমা-অবভাসক পরজ্ঞান,—যাহাকে সূরিগণ 'ভাগবত' বলেন, আমি পুরা কালে আমার আদিসর্গে আমার নাভিকমলে নিষণ্ণ অজকে (ব্রহ্মাকে) বলিয়াছিলাম।"[৫] সেই "সাত্মরহঃপ্রকাশ পরজ্ঞান",[৬]—"তত্ত্বাত্মবিরোধের মার্গ"[৭] তিনি উহাঁদিগকে উপদেশ করেন।[৮] মৈত্রেয়, কৃষ্ণের আদেশে, বিদুরকে তাহার উপদেশ করেন।[৯] বর্তমান '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণে' শুক-প্রোক্ত পুরাণ এবং মৈত্রেয়-প্রোক্ত পুরাণ উভয়ই সন্নিবদ্ধ আছে। উহার অপর এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ নারদরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ নৈষ্কর্ম্য-খ্যাপক 'সাত্বততন্ত্র' রচনা করেন।[১০] সেই বচন 'গরুড়পুরাণে'ও আছে।[১১]

মৈত্রেয় বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু পরাশর মুনি তাঁহার নিকট "ভাগবতপুরাণ" বা "আদ্যপুরাণ" বিবৃত করেন। তখন কথাচ্ছলে তিনি বলেন যে "উক্তো মুনিঃ পুলস্ত্যেন"[১২] অর্থাৎ পরাশর মুনি যে পুরাণের প্রবক্তা হইবেন তাহা পূর্বে পুলস্ত্য ঋষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল। যেমন টীকাকার প্রদর্শন করিয়াছেন ঐখানে লক্ষিত আখ্যায়িকা এই—পরাশর যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা শক্তিকে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছিল। বড় হইলে তাহা শুনিয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া পরাশর রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ এক সত্র আরম্ভ করেন। ঐ সত্রে শত শত রাক্ষস ভস্মীভূত হয়। তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতামহ মহর্ষি বশিষ্ঠ দয়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করেন এবং ঐ ক্রূর কর্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। তাঁহার কথায় পরাশর যজ্ঞ সমাপন করেন। ঐ সময়ে রাক্ষসবংশের আদি পিতা মহর্ষি পুলস্ত্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সন্ততিগণ রক্ষা পাওয়াতে তিনি তুষ্ট হইয়া পরাশরকে আশীর্বাদ করেন। তখন তিনি বলেন যে "পুরাণসংহিতাকর্তা ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি" ('হে বৎস ! তুমি পুরাণসংহিতাকর্তা হইবে')।[১৩] এই আখ্যায়িকা 'বিষ্ণুপুরাণে'র

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৩।৮।২-৯ ২) ঐ, ৬।১৬।৩৩'২

৩) ঐ, ৫।২৫।৪ ; ৬।১৬।২৫ ; আরও দেখ—দেবীভাগপু, ৮।২০।২৪-৫

৪) শুকদেব পরীক্ষিতকে বলেন যে "দেবদেব" এবং "জগদ্গুরু সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ" ভগবান্ শেষের স্তুতিতে রাজা চিত্রকেতু বলেন,

"জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্।"—(বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।১৬।৪০'১)

"ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতোধর্মঃ।" (ঐ, ৬।১৬।৪৩'১)

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৪।১৩ ৬) ঐ, ৩।৪।১৮'১ ও ২৫'১ ৭) ঐ, ৩।৪।২০'১

৮) ঐ, ৩।৪।৯—১৯ ৯) ঐ, ৩।৪।২৬ ; ৩৫ অধ্যায়।

১০) "তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ ॥"—(ঐ, ১।৩।৮'২)

১১) গরুড়পু, ১।১।১৬ ১২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৮।৯ ১৩) বিষ্ণুপু, ১।১।২৬'১

প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে।[১] তথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে ঐ 'পুরাণসংহিতা',—যাহা পরাশর মৈত্রেয়কে বলেন, 'বিষ্ণুপুরাণ'ই।[২] উহার বংশপরম্পরা ভিন্ন।[৩] তাহাতে সনৎকুমার এবং সাংখ্যায়নের নামও নাই। সুতরাং পরাশর কর্তৃক মৈত্রেয়কে প্রোক্ত ঐ 'ভাগবতপুরাণ' 'বিষ্ণুপুরাণ' হইতে ভিন্ন। মৈত্রেয়ের এক উক্তিমতে ঐ 'ভাগবতপুরাণ'ই তিনি বিদুরকে বলেন।[৪] পরন্তু অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ হইতে তিনি যে জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি, কৃষ্ণের আদেশে, বিদুরকে বলেন।[৫]

সঙ্কর্ষণ বিষয়ক উক্তি ছাড়িয়া দিলে, শুকদেবের অপর উক্তিসমূহের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। তাহার উপায় পরে বিবৃত হইবে। ঐ প্রকার সমন্বয় দ্বারা জানা যায় যে শুকদেবের মতে ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক নারায়ণ; তিনি নারদকে এবং নারদ ব্যাসকে উহার উপদেশ করেন। প্রহ্লাদের এবং নারদের উক্তির সঙ্গে ইহার সম্পূর্ণ মিল আছে।[৬] নারদ যেমন প্রহ্লাদ এবং যুধিষ্ঠিরকে, তেমন ব্যাসকেও উহার উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব ইহাকেই আমরা মূল ভাগবতধর্মের আচার্যপরম্পরা বলিয়া গ্রহণ করিব।

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ 'বিষ্ণুর নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যর্চনা'রূপ "পরমভাগবতধর্ম" ভগবান্ বিষ্ণু ধাতাকে, ধাতা স্বায়ম্ভুব মনুকে, নারদকে এবং হারীতকে বলেন।[৭] পরে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বিবৃত হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ পদ্মসম্ভব ধর্মরক্ষার্থ মনু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, মরীচি, দক্ষ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, এবং অত্রি—এই নব ঋষিকে সৃষ্টি করেন। "মহাতপা এবং বেদান্তপারগ তাঁহারা জগদ্‌গুরুকে প্রণাম করতঃ বলেন, 'হে ভগবন্! আমরা ভববন্ধ-অপনুত্তির জন্য পরম ধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তাহা সমস্তই অশেষে বলুন।' তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে "বেদান্তগোচর ধর্ম" উপদেশ করেন।[৮]

পাঞ্চরাত্র মতের আচার্য-পরম্পরা

'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত এবং পরে পরে 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া অভিহিত ("পঞ্চরাত্রানুশব্দিতং") মহৎ রহস্যবিজ্ঞানের ("মহোপনিষদং") উপদেশ দেবর্ষি নারদ সর্বপ্রথমে বদরিকাশ্রমে ভগবান্ নারায়ণ ঋষির নিকটে লাভ করেন।[৯] অনন্তর তাঁহার অনুমতি লইয়া তথা হইতে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ হইতে নারদ রহস্য এবং সংগ্রহের সহিত ঐ ধর্ম প্রাপ্ত হন।[১০] তথা হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করতঃ তিনি নারায়ণ ঋষির নিকট ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তৎসমস্তই বিবৃত করেন।[১১] তখন নারায়ণ ঋষি তাঁহাকে সেই বিষয়ে আরও উপদেশ প্রদান করেন।[১২]

---

১) বিষ্ণুপু, ১।১।১২— ২) বিষ্ণুপু, ১।১।৩০ দেখ। আরও দেখ—৩।৬।২৬ ; ৬।৮।৪৯'২—৫০

৩) বিষ্ণুপু, ৬।৮।৪৩-৪৯ ৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।৮।৯ ৫) ঐ, ৩।৫।২১—২

৬) পূর্বে দেখ। ৭) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ৭।২৭২-৪ ; ৮।১। ৮) ঐ, ৮।২-৬

৯) মহাভা, ১২।৩৩৪।২৮—৪৫

১০) মহাভা, ১২।৩৪৬।১০—৩৪৮।৪৫ ; পরে দেখ। আরও দেখ—১২।৩৩৪ ও ৩৩৫ অধ্যায়। শ্বেতদ্বীপে নারদের প্রতি নারায়ণের উপদেশ ১২।৩৩৯।১৯—১০৯'১ শ্লোকে লিপিবদ্ধ আছে।

১১) মহাভা, ১২।৩৩৯।১১১—২ ; ৩৪৩।৪৭—৬৭ ১২) মহাভা, ১২।৩৪৪।১—২৪ ; ৩৪৫।২—২৮

এই প্রকারে ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করতঃ নারদ সুদীর্ঘকাল নারায়ণাশ্রমে বাস করিয়া উহার সম্যক্ অভ্যাস করেন।[১] পরে তিনি ব্রহ্মার সদনে গিয়া তথায় সমুপস্থিত সিদ্ধগণকে "পরে পরে পঞ্চরাত্র বলিয়া অভিহিত" সেই "মহোপনিষৎ" বা "বেদসম্মিতপুরাণ" শুনান। তাঁহাদিগের মুখ হইতে,—অথবা নিকটে থাকিয়া—শুনিয়া সূর্য আপন অনুযায়ী ৬৬,০০০ ঋষিকে উহা শুনান। সূর্যানুযায়ী মহাত্মা ঋষিগণ মেরুপর্বতে সমাগত দেবগণকে উহা শুনান। দেবগণের নিকটে,—অথবা, নিকটে থাকিয়া,—প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি অসিত মহারাজ শন্তনুকে উহার উপদেশ প্রদান করেন। ভীষ্ম আপন পিতা শন্তনু হইতে উহা শিক্ষা করেন এবং যুধিষ্ঠিরের নিকটে উহা ব্যাখ্যা করেন।[২]

পূর্বে বিবৃত ভাগবতধর্মের আচার্যপরম্পরার সঙ্গে পাঞ্চরাত্রধর্মের এই আচার্যপরম্পরার তুলনা করিলে দেখা যায় প্রথম হইতে নারদ পর্যন্ত আচার্যগণ উভয়ত্র একই, পরন্তু তৎপরবর্তী আচার্যগণ ভিন্ন ভিন্ন। ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে নারায়ণের ভাগবতধর্মের উপদেশ নারদ যেমন প্রহ্লাদ, ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরকে করিয়াছিলেন, তেমন ব্রহ্মলোকবাসী সিদ্ধগণকেও করিয়াছিলেন; সিদ্ধগণ উহাকে স্বল্পবিস্তর রূপান্তরিত করেন বোধ হয়। তাহাতে ব্যাস-পরম্পরায় সুরক্ষিত মূলের ধার্মিক অনুষ্ঠানাদি হইতে তাঁহাদের পরম্পরায় প্রচলিত ধার্মিক অনুষ্ঠানাদির কিঞ্চিৎ পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই হেতুতে, মূলধর্ম হইতে পার্থক্য নির্দেশের জন্য, উহার নূতন নামকরণ হয় 'পাঞ্চরাত্রধর্ম'।[৩]

একান্তধর্মের আচার্য-পরম্পরা

"হে বিভু! এই (একান্ত) ধর্ম কাহার দ্বারা,—কোন দেবতা কিম্বা ঋষি দ্বারা কথিত হইয়াছিল? একান্তীদিগের চর্যা কি? এবং উহা কখন উৎপাদিত হইয়াছিল?"[৪] মহারাজ জনমেজয়ের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন প্রথমে বলেন,

"সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্॥"[৫]

কুরু ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে (উভয় পক্ষের) সৈন্যদল পরস্পরের সন্মুখীন হইলে যখন অর্জুন বিমনস্ক হন তখন (একান্তধর্ম) স্বয়ং ভগবান্ (কৃষ্ণ) কর্তৃক গীত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি বলেন, "ঐ অগতি এবং গতি পূর্বেই আমি তোমাকে বলিয়াছি। এই ধর্ম নিশ্চয় (অত্যন্ত) গহন এবং

---

[১] মহাভা, ১২।৩৪৫।১— ; ৩৪৬।১—৩ [২] মহাভা, ১২।৩৩৯।১১২—১২৪·১

[৩] ইহা বলা উচিত যে এই অনুমানের বিরুদ্ধে এক শঙ্কা উত্থাপন করা যাইতে পারে। নারায়ণ ঋষির নিকট প্রথম উপদেশ প্রাপ্তির পর শ্বেতদ্বীপে গিয়া নারদ ভগবান্ নারায়ণের যে স্তুতি করেন, তাহাতে 'পাঞ্চরাত্রিক' আখ্যা আছে। একমাত্র পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র বা পাঞ্চরাত্রধর্ম দ্বারা গম্য, অথবা উহার সম্যক বেত্তা, প্রবর্তক এবং সংরক্ষক বলিয়াই নারায়ণ 'পাঞ্চরাত্রিক'। (পূর্বে দেখ) তাহাতে বলা যায় যে 'পঞ্চরাত্র' নাম প্রথম হইতেই নারায়ণ ঋষির উপদেশের পর হইতেই আছে। পরন্তু ইহাও বলা যায় যে ঐ স্তুতি পরে লিখিত, তাহাতে ঐ প্রকার কালিক বিপর্যয় দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। 'পঞ্চরাত্র' আখ্যা যে পরে পরে হইয়াছে তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ শঙ্কা ধর্তব্য নহে।

[৪] মহাভা, ১২।৩৪৮।৬·২—৭·১ [৫] মহাভা, ১২।৩৪৮।৮

সেই হেতু অকৃতাত্ম ব্যক্তিগণের দুর্বিজ্ঞেয়। উহা সামবেদ-সম্মিত। হে রাজন্! উহা পুরা আদিযুগেই কৃত হইয়াছিল এবং স্বয়ং ঈশ্বর নারায়ণ-কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল। হে মহারাজ! এই ধর্ম বিষয়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া মহাভাগ নারদ, ঋষিগণের মধ্যে, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ এবং ভীষ্মও তখন শুনিয়াছিলেন। ("শৃণ্বতোঃ কৃষ্ণভীষ্ময়োঃ")। হে নৃপসত্তম, আমার গুরু (ব্যাস) কর্তৃকও উহা কথিত হইয়াছিল। তথায় নারদ কর্তৃক উহা যে প্রকার কথিত হইয়াছিল সেই প্রকার শুন।"[১] অতঃপর তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন যে প্রতিকল্পের আদিতে ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক একান্তধর্ম জগতে প্রচারিত হয় এবং দীর্ঘকালান্তরে বিলুপ্ত হইয়া তাঁহাতে প্রত্যাবর্তন করে।

(১) প্রথম কল্পে, যখন নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মার মানস জন্ম হয়, তখন নারায়ণ স্বয়ং সেই ধর্ম অনুসারে দৈব এবং পিত্র্য কর্ম করেন। কেনপ ঋষিগণও ঐ ধর্ম পরিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বৈখানস ঋষিগণ এবং বৈখানসগণ হইতে সোম উহা প্রাপ্ত হন। অনন্তর উহা অন্তর্হিত হয়।[২]

(২) দ্বিতীয় কল্পে, যখন ব্রহ্মার চাক্ষুষ জন্ম হয়, তখন তিনি সোমের নিকট ঐ ধর্ম পরিশ্রবণ করেন। নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা রুদ্রকে উহা প্রদান করেন। অনন্তর পুরা কৃতযুগে যোগস্থিত রুদ্র সমস্ত বালখিল্য ঋষিগণকে ঐ ধর্ম পড়ান। তৎপরে সেই দেবের মায়াতে উহা পুনরায় অন্তর্হিত হয়।[৩]

(৩) যখন ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্ম হয়, তখন ঐ ধর্ম স্বয়ং নারায়ণ হইতে সম্ভূত হয়। সুপর্ণ ঋষি পুরুষোত্তম হইতে উহা প্রাপ্ত হন। এই উত্তম ধর্ম সুপর্ণ "সুতপ্ত তপস্যা, দম এবং নিয়ম সহকারে" তিনবার আচরণ করেন ("ত্রিঃ পরিক্রান্তবান্")। সেই হেতু উহা "ত্রিসৌপর্ণ ব্রত" নামে ইহলোকে খ্যাত হয়। এই দুশ্চর ব্রত ঋগ্বেদপাঠপঠিত। এই "সনাতন ধর্ম সুপর্ণ হইতে জগৎপ্রাণ বায়ু এবং বায়ু হইতে বিঘশাসী ঋষিগণ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহোদধি ঐ উত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হন। তৎপরে উহা পুনরায় নারায়ণে সমাহিত হইয়া অন্তর্হিত হয়।[৪]

(৪) তৎপরে ব্রহ্মার শ্রবণজ জন্ম হয়। ঐ কল্পের আদিতে ভগবান্ "হরি নারায়ণ" স্বয়ং জগতের সৃষ্টিতে উৎসুক হইয়া জগৎসর্গকর এক পুরুষের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কর্ণদ্বয় হইতে প্রজাসর্গকর ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। জগৎপতি হরি তাঁহাকে বলেন, "হে পুত্র! তুমি মুখ হইতে, তথা (বাহু, উরু ও) পাদ হইতে, সমস্ত প্রজা সৃষ্টি কর। হে সুব্রত! আমি তোমার বল, তেজ এবং শ্রেয় বিধান করিব। তুমি আমা হইতে সাত্বত নামক ধর্ম গ্রহণ কর এবং তদ্বারা সৃষ্ট কৃতযুগকে যথাবিধি স্থাপন কর। তখন ব্রহ্মা হরিমেধা দেবকে প্রণাম করেন

---

[১] মহাভা, ১২।৩৪৮।৯—১২ বৈশম্পায়ন পরে জনমেজয়কে বলেন, "হে রাজন্! হে বিশাম্পতি! আমার গুরু দ্বিজোত্তম ধর্মজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস, ঋষিগণের সন্নিধিতে এবং কৃষ্ণ ও ভীষ্ম শুনে মত ("শৃণ্বতোঃ কৃষ্ণভীষ্ময়োঃ"), ধর্মরাজকে (অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরকে) এই প্রকার বলিয়াছিলেন্। তৎপূর্বে সুমহাতপস্বী নারদ তাঁহাকে (ঐ ধর্ম) বলিয়াছিলেন।" (১২।৩৪৮।৬৪—৫) আরও দেখ—১২।৩৪৮।৮৫—৬। সৌতিও সেই কথা বলিয়াছেন। (১২।৩৪৬।১৭)

[২] মহাভা, ১২।৩৪৮।১৩—৫ [৩] মহাভা, ১২।৩৪৮।১৬—৮

[৪] মহাভা. ১২।৩৪৮।১৯—২৪

এবং তাঁহা হইতে নারায়ণমুখোদ্ভব অগ্র্যধর্ম, সরহস্য ও সসংগ্রহ, তথা আরণ্যকের সহিত, গ্রহণ করেন।[1]

ব্রহ্মাকে ধর্মোপদেশ করত ভগবান্ হরি তমের পরপারে যেখানে অব্যক্তরূপে ব্যবস্থিত ছিলেন সেইখানে গমন করেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার আদেশ মত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করত সেই ধর্ম দ্বারা প্রথমে শুভ কৃতযুগ প্রবর্তিত করেন। তাহাতে সাত্বতধর্ম সমস্ত লোকসমূহে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। "লোকসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা সেই আদ্য ধর্মেরই দ্বারা প্রভু দেবেশ হরি নারায়ণকে পূজা করেন। অনন্তর লোক সমূহের হিতকামনায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা হেতু তিনি স্বারোচিষ মনুকে উহা পড়ান!" স্বারোচিষ আপন পুত্র শঙ্খপদকে এবং শঙ্খপদ নিজ পুত্র সম্রাট্ সুবর্ণাভকে উহার উপদেশ করেন। অনন্তর ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে উহা অন্তর্হিত হয়।[2]

(৫) ব্রহ্মার নাসত্য জন্মে প্রভু দেব হরি নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট ঐ ধর্ম বর্ণনা করেন। ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্মার নিকটে উহা অধ্যয়ন করেন। কৃতযুগের প্রারম্ভে প্রজাপতি বীরণ সনৎকুমার হইতে উহা প্রাপ্ত হন। বীরণ রৈভ্য মুনিকে এবং রৈভ্য তৎপুত্র দিক্‌পাল ধার্মিক কুক্ষিকে উহা উপদেশ করেন। নারায়ণমুখোদ্ভব ঐ ধর্ম তৎপরে অন্তর্হিত হয়।[3]

(৬) ব্রহ্মার অণ্ডজ জন্মে ঐ ধর্ম পুনঃ নারায়ণের মুখ হইতে সমুদ্ভূত হয়। ব্রহ্মা উহা গ্রহণ করেন এবং যথাবিধি প্রয়োগ করেন। তিনি বর্হিষদ্ নামক মুনিগণকে উহা পড়ান। বর্হিষদ্‌গণ হইতে জ্যেষ্ঠ নামে অভিবিখ্যাত সামবেদান্তগ দ্বিজ উহা প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতে উহা "জ্যেষ্ঠ সামব্রত" নামে খ্যাত হয়। হরি জ্যেষ্ঠসামব্রত অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসামব্রত-গম্য। জ্যেষ্ঠ হইতে রাজা অবিকম্পন উহা প্রাপ্ত হন। তাহার পরে প্রভু হরির এই ধর্ম অন্তর্হিত হয়।[4]

(৭) বর্তমান সপ্তম কল্পে, ব্রহ্মার পদ্মজ জন্মে, যুগের প্রারম্ভে নারায়ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এই ধর্মের উপদেশ করেন। এবং ব্রহ্মা দক্ষকে উহা প্রদান করেন।[5] "অনন্তর, হে নৃপোত্তম! দক্ষ আপন জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রকে,—সবিতার জ্যেষ্ঠ আদিত্যকে (এই ধর্ম) দেন এবং বিবস্বান্ তাঁহা হইতে গ্রহণ করেন।[6] ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে প্রদান করেন এবং মনু লোকভূত্যর্থে

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৮।২৮—৩১.১

২) মহাভা, ১২।৩৪৮।২৫—৩৮ ৩) মহাভা, ১২।৩৪৮।৩৯—৪৩ ৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।৪৪—৭

৫) মহাভা, ১২।৩৪৮।৪৮—৯

৬) ইহার মূল এই,—

"ততো জ্যেষ্ঠে তু দৌহিত্রে প্রাদাদ্দক্ষো নৃপোত্তম।
আদিত্যে সবিতুর্জ্যেষ্ঠে বিবস্বান্ জগৃহে ততঃ॥
—(মহাভা, ১২।৩৪৮।৫০)

এই বচনের তাৎপর্য এমনও হইতে পারে যে দক্ষ আপন দৌহিত্র আদিত্যকে উহা প্রদান করেন এবং আদিত্য হইতে বিবস্বান্ উহা প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বস্তুত উহাকে সেই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যা ভুল। কেননা, তাহাতে আদিত্য ও বিবস্বান্ ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া পড়েন। বৈবস্বত মনুর বংশ বিবরণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বিবস্বান্‌ই দক্ষের দৌহিত্র এবং তাঁহার পুত্র শ্রাদ্ধদেবই বৈবস্বত মনু। সুতরাং আদিত্য ও বিবস্বান্‌কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে,—উভয় শব্দ বস্তুত একার্থক; এবং দ্বিতীয় "ততঃ ('তাঁহা হইতে') শব্দকে 'দক্ষ হইতে' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

আপন পুত্র ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেন। ইক্ষ্বাকু দ্বারা কথিত (এই ধর্ম) সর্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত হইল। হে নৃপ! (সর্বলোকের) ক্ষয় হইলে পর (উহা) পুনরায় নারায়ণে চলিয়া যাইবে।"[১]

একান্তধর্মের বিভিন্ন কল্পের নারদ-প্রোক্ত এই আচার্যপরম্পরাসমুহ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে উহা ভাগবতধর্ম, তথা পাঞ্চরাত্র ধর্ম, হইতে ভিন্ন। যদিও ইহা কথিত হইয়াছে তিনই ধর্ম মূলত নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎপরবর্তী আচার্যপরম্পরা প্রত্যেকের পৃথক্ বলিয়া দেখা যায়। তাহাতে বুঝা যায় তিনই ধর্ম অভিন্ন নহে, ভিন্ন ভিন্নই। পরন্তু ঐ সম্বন্ধে এক গণ্ডগোলও দেখা যায়। মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন,—অথবা বর্তমান 'মহাভারত'-কার সৌতি তাঁহার মুখে ইহা বলাইয়াছেন,—যে দেবর্ষি নারদ এবং পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট ঐ একান্তধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যাস তৎপূর্বে নারদ হইতে উহা পাইয়াছিলেন। তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে,—ইহাও বৈশম্পায়নের উক্তি,—"হে নৃপ! এই ধর্ম, সরহস্য এবং সসংগ্রহ, সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ হইতে নারদ কর্তৃক সুসংপ্রাপ্ত।[২] এই আচার্যপরম্পরা ভাগবতধর্মেরই, সুতরাং তাহাতে উভয়ের আচার্যপরম্পরা অভিন্ন হইয়া যাওয়াতে একান্তধর্মও ভাগবত ধর্ম অভিন্ন হইয়া পড়ে। পরন্তু তাহা সত্য হইতে পারে না। কেননা, একান্তধর্মের বিভিন্ন কল্পের আচার্যপরম্পরাসমূহের কোনটাতে নারদ ও ব্যাসের নাম নাই। আরও বিশেষ কথা এই যে, বৈশম্পায়নও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, নারদ স্বয়ং ঐ আচার্যপরম্পরাসমূহ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিবৃত করেন। বৈশম্পায়নের উক্তিসমূহে সেই গণ্ডগোল প্রকারান্তরেও আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি প্রারম্ভেই অতীব স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে 'গীতা'য় একান্তধর্মই কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে আর এক প্রকারেও তাহা সমর্থিত হয়। কেননা, নারদ কর্তৃক বিবৃত একান্তধর্মের বর্তমান কল্পীয় বংশপরম্পরার সঙ্গে 'ভগবদ্গীতা'য় বিবৃত যোগের বংশপরম্পরার অনেকাংশে[৩] ঐক্য আছে, দেখা যায়। 'গীতা'য় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ঈক্ষ্বাকুকে উহা বলেন। এই প্রকার পরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন। পরন্তু, হে পরন্তপ! দীর্ঘ কালের অন্তর হেতু এই যোগ ইহলোকে বিনষ্ট হইয়াছিল। যেহেতু উহা উত্তম রহস্য সেই হেতু আমি, তুমি আমার সখাও ভক্ত বলিয়া, অদ্য তোমাকে সেই পুরাতন যোগ বলিয়াছি।"[৪] তিনি পরে অর্জুনের শঙ্কার উত্তরে, প্রকারান্তরে নির্দেশ করেন যে তাঁহার পূর্ব জন্মেই তিনি বিবস্বান্‌কে

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫০—২

২) "নারদেন সুসংপ্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ।
এষ ধর্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণান্নৃপ॥"
—(মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৪)

৩) ইহা বিশেষভাবে বলা উচিত যে ঐ ঐক্য সর্বাংশে নহে। কেননা, ভগবান্ নারায়ণ এবং কৃষ্ণকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেও একান্তধর্মের বর্তমান কল্পের বংশপরম্পরার পরবর্তী দুই আচার্যের,—ব্রহ্মা এবং দক্ষের—নাম যোগধর্মের বংশপরম্পরায় নাই। তথাপি তিলক মহাশয় উভয় পরম্পরাকে অভিন্ন মনে করেন। ('গীতারহস্য', বাংলা ভাষান্তর, ৮-৯ পৃষ্ঠা)। পরন্তু বৈদ্য মহাশয় উভয়কে ভিন্ন মনে করেন। ('হিন্দী মহাভারতমীমাংসা', ৫৫০ পৃষ্ঠা)

৪) গীতা, ৪।১—৩

ঐ যোগ বলিয়াছিলেন। নারদ-প্রোক্ত একান্তধর্মের বর্তমান কল্পের আচার্যপরম্পরার এবং 'গীতো'ক্ত যোগধর্মের আচার্যপরম্পরার এই মিল হইতে অনুমান করেন যে 'গীতা'য় একান্তধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে।[১] পরন্তু অন্যত্র, তাহার পূর্বে, বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে 'গীতা'য় নারায়ণের ধর্ম বা ভাগবতধর্মই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেননা, নারদের প্রতি ভগবান্ নারায়ণ এবং নারায়ণ ঋষির উপদেশাদি বর্ণনার পর তিনি বলেন,

"নারদেন তু সম্প্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ।
এষ ধর্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণান্নৃপ ॥
এবমেষ মহান্ ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥"[২]

'পরন্তু, হে নৃপ! রহস্য এবং সংগ্রহের সহিত এই (ভাগবত) ধর্ম সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ হইতে নারদ সম্প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে এই ধর্ম মহান্! হে নৃপোত্তম! তাহাই পূর্বে 'হরিগীতা'য় সমাসবিধিরীতিতে তোমায় কথিত হইয়াছে।"

একান্তধর্মকে ভাগবতধর্ম, তথা পাঞ্চরাত্রধর্ম এবং সাত্বতধর্ম, হইতে পৃথক্ মনে করিবার উহাদের আচার্যপরম্পরার ভিন্নতা ব্যতীত অপর হেতুও আছে। দেখা যায়, 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে নারায়ণের ভাগবতধর্মের ও পাঞ্চরাত্রধর্মের এবং চিত্রশিখণ্ডির সাত্বতধর্মের উৎপত্তি, আচার্যপরম্পরা, চর্যা, প্রভৃতি বিষয়ে যাহা যাহা বিবৃত আছে, তৎসমস্ত শুনিবার পর মহারাজ জনমেজয় একান্তধর্মের উৎপত্তিচর্যাদি বিষয়ে বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করেন। তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি একান্তধর্মকে ঐ সকল ধর্ম হইতে ভিন্ন মনে করিতেন। অন্যথা তিনি তদ্বিষয়ে ঐ সকল প্রশ্ন করিতেন না। আর ভ্রমবশত তিনি প্রশ্ন করিলেও বৈশম্পায়ন এই উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেন যে ঐ সকল পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ে পুনঃ প্রশ্ন করা নিরর্থক। তাহা না করিয়া বৈশম্পায়ন সোজা সুজি ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং উত্তরে একান্তধর্মের যে আচার্যপরম্পরা নারদোক্ত বলিয়া তিনি বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিয়াছেন, উহা ঐ সকল ধর্মের আচার্যপরম্পরা হইতে ভিন্ন। এই সকল হেতুতে মনে হয় একান্তধর্ম ভাগবতাদি ধর্মত্রয় হইতে ভিন্ন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণীয়াখ্যানোক্ত ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ পরিবর্তিত রূপে 'স্কন্দপুরাণে'র অন্তর্গত 'বাসুদেব মাহাত্ম্য' নামক উপখণ্ডে স্থান পাইয়াছে। উহাতে আছে, ভগবান্ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে একান্তধর্ম ব্যাখ্যা করেন।[৩] নারদ নারায়ণের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে হে ভগবন্! যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা সেই বাসুদেব সর্বদা প্রীত হন, আপনার সম্মত সেই একান্তধর্ম আমাকে বলুন।"[৪] তাহাতে নারায়ণ বলেন, "হে মুনি! কল্পের আদিতে আমি

---

[১] R. G. Bhandarkar, Vaisnavism etc, p. 19 ; তিলকের 'গীতারহস্য', বাংলা ভাষান্তর, ৮-৯ পৃষ্ঠা।

[২] মহাভা, ১২।৩৪৬।১০-১ ; আরও দেখ—১২।৩৪৮।৫৩-৪

[৩] স্কন্দপু, ২।৯।২৬।১—২

[৪] ঐ, ২।৯।২০।১

বিবস্বান্‌কে ঐ ধর্ম বলিয়াছিলাম। আজ তোমাকে সেই সনাতন ধর্ম বলিব। স্বধর্ম, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সহকারে লক্ষ্মীবান্ ঈশ্বরে যে অনন্যা ভক্তি তাহাই একান্তিকধর্ম” ইত্যাদি।[১] পরে তিনি বলেন, “হে মুনি! স্বধর্মাদি-ত্রয়-যুক্ত এই ভক্তি একান্তিক ধর্ম এবং উহাই ভাগবত ধর্ম বলিয়া প্রোক্ত হয়। কেননা, সাক্ষাৎ ভগবানের, কিম্বা ঈদৃশ ভক্তগণের, সঙ্গ হইতেই মনুষ্যগণ একান্তিকধর্ম প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্য প্রকারে কখনও নহে।”[২] কথিত আছে যে নারদ নারায়ণের অনুমতি লইয়া তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তখন নারায়ণ তাঁহাকে লোকহিতার্থে ঐ একান্তধর্ম সর্বত্র প্রচার করিতে আদেশ করেন।[৩] তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করত নারদ তথা হইতে প্রথমে পরমর্ষি ব্যাসের নিকটে গমন করেন এবং তাঁহাকে একান্তধর্ম ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মার সভায় গমন করেন এবং ব্রহ্মাকে শুনাইয়া তত্রস্থ দেবগণ পিতৃগণ এবং মহর্ষিগণকে উহা উপদেশ করেন। ভাস্কর তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তিনি নারদের মুখ হইতে শ্রবণ করেন। তিনি আপন অনুযায়ী বালখিল্য ঋষিগণকে উহা আদরের সহিত বলেন। তাহারা মেরুপর্বতে সমাগত ইন্দ্রাদিদেবগণকে উহা শুনান। অসিত মুনি তাঁহাদিগের নিকট ঐ ধর্ম শুনিয়াছিলেন এবং কোন সময়ে পিতৃলোকে গিয়া পিতৃগণকে উহা বলেন। অর্যমাদি পিতৃগণ রাজা শন্তনুকে উহা উপদেশ করেন। শন্তনু ভীষ্মকে এবং ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা ব্যাখ্যা করেন।[৪] তথায় শুনিয়া নারদ কৈলাস পর্বতে গিয়া শঙ্করের নিকট একান্তধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং স্কন্দ শঙ্কর হইতে উহা শিখেন।[৫] উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে ঐ বাসুদেব মাহাত্ম্য ‘স্কন্দপুরাণে’ বিবৃত সমস্ত আখ্যানের সার এবং সমস্ত বেদ, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্রও ধর্মশাস্ত্রের সার; উহা “সাক্ষাদ্ভগবতা গীতং” (‘সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক গীত হইয়াছে’)।[৬] এই বচনোক্ত ‘ভগবান্’ ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই।[৭]

এইরূপে দেখা যায়, ‘স্কন্দপুরাণে’ বিবৃত একান্তধর্মের আচার্যপরম্পরা এবং ‘মহাভারতে’র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত পাঞ্চরাত্রধর্মের, তথা ভাগবতধর্মের, পরম্পরা একই। সুতরাং তাহাতে স্বীকার করিতে হয় যে ‘মহাভারতোক্ত পাঞ্চরাত্রধর্মকেই, তথা ভাগবতধর্মকেই, ‘স্কন্দপুরাণে’ ‘একান্তধর্ম’ বলা হইয়াছে। পরন্তু, ইহাও অবশ্য স্পষ্টত বলা উচিত যে, ঐ একান্তধর্মের যে লক্ষণ ‘স্কন্দপুরাণে’ প্রদত্ত হইয়াছে, তথা উহার সিদ্ধ্যর্থ সেইসকল পূজাবিধি এবং ক্রিয়াযোগ ভগবান্ নারায়ণ ঋষির সম্মত বলিয়া উহাতে বর্ণিত হইয়াছে,[৮] সেই সকল নারায়ণীয়াখ্যানে নাই। ততোধিক উহাদের কোন কোনটি নারায়ণীয়াখ্যানোক্ত ধর্মতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

[১] স্কন্দপু, ২।৯।২০।৩

[২] ঐ, ২।৯।২৫।৩৪—৫ এই বচনে লক্ষিত ভক্তগণের লক্ষণ অব্যবহিত পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, “বাসুদেব ব্যতীত অপর সমস্ত দেবতাকে কাল ও মায়ার বশীভূত বলিয়া জানিয়া উহাদিগেতে প্রীতি পরিত্যাগ করত গাঢ় স্নেহে নিত্য তাঁহারই সেবা ‘ভক্তি’ বলিয়া কথিত হয়। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, চরণসেবন, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন —এই নব ভাবসমূহ দ্বারা যে অনন্যবুদ্ধিতে এবং আদর সহকারে তাঁহাকে সেবা করে তাহাকে ‘ভক্ত’ বলা হয়।” (ঐ, ২।৯।২৫।৬১—৩)

[৩] ঐ, ২।৯।৩১।৮

[৪] ঐ, ২।৯।৩২।১—৮

[৫] ঐ, ২।৯।৩২।৯—১০; আরও দেখ—২।৯।১।১৪; ২।৯।২।৯

[৬] ঐ, ২।৯।৩২।১৯—২২

[৭] ঐ, ২।৯।২।৮ দেখ।

[৮] ঐ, ২।৯।২৬ অধ্যায়। পরে দেখ।

সাত্বত ধর্মের আচার্য-পরম্পরা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে চতুর্থ কল্পের, ব্রহ্মার শ্রবণজ জন্মের আদি কৃতযুগে প্রবর্তিত একান্ত ধর্ম নারায়ণীয়াখ্যানে বিশেষভাবে সাত্বতধর্ম নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[১] কথিত হইয়াছে যে তখন ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা স্বরোচিষ মনুকে, মনু নিজপুত্র শঙ্খপদকে, এবং শঙ্খপদ আপন পুত্র সুবর্ণভকে সাত্বতধর্মের উপদেশ প্রদান করেন ; অনন্তর ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে উহা অন্তর্হিত হয়।[২] পরন্তু নারায়ণীয়াখ্যানে সাত্বতধর্মের আচার্যপরম্পরার ভিন্ন বিবরণও পাওয়া যায়। উহার মতেও সাত্বতধর্মের আদি বক্তা ভগবান্ নারায়ণ। পরন্তু তদর্বাক্ আচার্য-পরম্পরা তন্মতে ভিন্ন। কথিত হইয়াছে যে 'চিত্রশিখণ্ডি' নামে খ্যাত প্রাচীন সপ্ত ঋষি[৩] বহু বৎসর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ নারায়ণ হরিকে আরাধনা করতঃ তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ লাভ করেন ("নারায়ণানুশাস্তা")। অনন্তর তাঁহারা লোকহিতকামনায় সাত্বতধর্ম প্রবর্তন করেন,—শব্দ, অর্থ এবং হেতু বিষয়ে প্রথম সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ মর্যাদা স্থাপন করেন।[৪] "তাঁহারা একমতি হইয়া মহাগিরি সুমেরুতে (বসিয়া) চারিবেদ-সম্মত যে উত্তম শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সাত মুখে নির্গত তাহা উত্তমোত্তম লোকধর্ম।[৫] ঐ শাস্ত্র রচনা করত ঋষিগণ প্রথমে যেখানে কারুণিক নারায়ণ বাস করেন, সেইখানে উহা শুনান। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া "অনির্দিষ্টশরীরগ ভগবান্", "অদৃশ্য পুরুষোত্তম", বলেন—শতসহস্র শ্লোকে রচিত ইহা উত্তম ; সমস্ত লোকতন্ত্রের ধর্ম ইহা হইতে প্রবর্তিত হইবে ; ইহা চারি বেদের দ্বারা সমর্থিত এবং যথাবৎ প্রামাণ্য হইবে ; ইত্যাদি।[৬] ভগবান্ কর্তৃক এইরূপে অনুমোদিত এবং প্রশংসিত হইলে পর সর্বলোকহিতচিন্তক ঐ ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত সেই শাস্ত্র লোকমধ্যে প্রচার করেন। পরে উক্ত হইয়াছে যে স্বায়ম্ভুব মনু ঐ শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম ব্যাখ্যা করেন ; মহর্ষি উশনা ও বৃহস্পতি ঐ শাস্ত্রের প্রচার করেন। তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে অপর শাস্ত্রসমূহও রচনা করেন। স্বায়ম্ভুব মনু সাত্বতশাস্ত্র-রচয়িতাদিগের অন্যতম বলিয়াও পরিগণিত হইয়া থাকেন।[৭] বৃহস্পতি মূল রচয়িতা সপ্তর্ষিগণ হইতে ঐ শাস্ত্র প্রাপ্ত হন।[৮] অনন্তর বৃহস্পতি হইতে তাঁহার শিষ্য রাজা উপরিচর বসু চিত্রশিখণ্ডি-প্রণীত ঐ শাস্ত্র প্রাপ্ত হন।[৯] তিনি সম্ভাবিত এবং ভগবান্ নারায়ণের ভক্ত ছিলেন।[১০] তিনি পরম-ভাগবত ("ভাগবতোঽত্যর্থং") ছিলেন।[১১] তিনি ইহপারলৌকিক সমস্ত ক্রিয়া ঐ শাস্ত্রানুসারে করিতেন।[১২] কথিত হইয়াছে যে তাঁহার পরে সাত্বতশাস্ত্র বিলুপ্ত হয়।[১৩]

---

১) পূর্বে দেখ ২) মহাভা, ১২।৩৩৫।২৭'২—

৩) ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি সপ্ত 'চিত্র-শিখণ্ডি' নামে খ্যাত। তাঁহারা সপ্ত প্রকৃতি বলিয়াও এবং স্বায়ম্ভুব মনু অষ্টম প্রকৃতি বলিয়া খ্যাত। (মহাভা, ১২।৩৩৫।২৯—৩০'১ ; ৩৪০।৩৪—৫)

৪) মহাভা, ১২।৩৩৫।৩৪—৬ ; আরও দেখ—৩৩৫।৩০—৩ ৫) মহাভা, ১২।৩৩৫।২৮—২৯'১

৬) মহাভা, ১২।৩৩৫।৩৭— ৭) মহাভা, ১২।৩৩৫।৩০ এবং ৩৪০।৩৪—৫ দেখ।

৮) মহাভা, ১২।৩৩৫।৫৩—৪ ৯) মহাভা, ১২।৩৩৫।৪৭ ; আরও দেখ—৩৩৬।৩

১০) মহাভা, ১২।৩৩৫।১৭'২, ২১—২২'১, ৪৮'১ ১১) মহাভা, ১২।৩৩৭।১'১

১২) মহাভা, ১২।৩৩৫।৪৮'২ ; আরও দেখ—৩৩৫।২৩—৪ ১৩) মহাভা, ১২।৩৩৫।৫১

সাত্বতধর্মের এই আচার্যপরম্পরা ভাগবতধর্মের, পাঞ্চরাত্রধর্মের এবং একান্তধর্মের আচার্যপরম্পরাসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং সাত্বতধর্ম এই সকল ধর্মসমূহ হইতে ভিন্ন। পরন্তু ইহার বিরুদ্ধে এই শঙ্কা হয় যে একান্তধর্মকেও বৈশম্পায়ন কখন কখন পরিষ্কার সাত্বতধর্ম বলিয়াছেন।[১] অধিকন্তু তিনি প্রকারান্তরেও সেই কথা বলিয়াছেন। একান্তধর্মের বিভিন্ন কল্পের আচার্যপরম্পরা,—যেমনটি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন তেমনটি জনমেজয়ের নিকট বর্ণনার পর, তিনি বলেন, "হে নৃপোত্তম! যতিদিগের যাহা ধর্ম তাহাও পূর্বে 'হরিগীতা'য় সমাসবিধিরীতিতে তোমায় কথিত হইয়াছে। হে নৃপ! এই ধর্ম, সরহস্য এবং সসংগ্রহ, সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ হইতে নারদ কর্তৃক সুসংপ্রাপ্ত। হে রাজন্! এই প্রকারে এই মহান্ ধর্ম আদ্য এবং সনাতন। ইহা (অপরের) দুর্বিজ্ঞেয় এবং দুষ্কর; (পরন্তু) সাত্বতগণ কর্তৃক সদা ধারণকৃত হইয়া থাকে।"[২] প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য এই হে 'ভগবদ্গীতা'য় একান্তধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অপর এক শ্লোকেও বৈশম্পায়ন সাক্ষাদ্ভাবে সেই কথা বলিয়াছেন। উহা ইতি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকের নারায়ণ ও নারদ ভাগবতধর্ম এবং পাঞ্চরাত্রধর্মেরই আদ্যাচার্যদ্বয়। সুতরাং তাহাতে খ্যাত হইয়াছে যে উক্ত দুই ধর্মের একটি ও একান্তধর্ম অভিন্ন; অথবা যেমন তৃতীয় আচার্য হইতে পাঞ্চরাত্রধর্ম ও ভাগবতধর্ম ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তেমন একান্তধর্মও ভিন্ন হইয়াছে;—যেমন পাঞ্চরাত্রধর্ম ভাগবতধর্মের অন্তর্গত এক শাখা-সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে তেমন একান্তধর্ম অপর শাখাসম্প্রদায় হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকের 'সাত্বতগণ'কে কেহ কেহ 'সাত্বতধর্মাবলম্বিগণ' মনে করিয়া থাকেন। যদি তাহাই প্রকৃত হয়[৩] তবে ঐ শ্লোক হইতে জানা যায় যে একান্তধর্ম ও সাত্বতধর্ম অভিন্ন।

সাত্বতধর্মের আচার্যপরম্পরাদির ঐ বিবরণ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করেন বলিয়া নারায়ণীয়াখ্যানে কথিত হইয়াছে। তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে ভীষ্ম ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বলেন যে "সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্যমুখনিঃসৃতম্" অর্থাৎ "নারায়ণ হরির ভক্ত" রাজা উপরিচর বসু যে সাত্বত বিধি আশ্রয়ে ভগবান্ নারায়ণ হরির পূজাদি করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে সূর্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল।[৪] সুতরাং এতন্মতে সূর্য সাত্বতধর্মের প্রবর্তক বা আদ্যাচার্য। কিন্তু ইহা সাত্বতধর্মের প্রবর্তক ও আচার্যপরম্পরা সম্বন্ধে ভীষ্মের পূর্বোক্তির বিরোধী হয়। কেননা, তাহাতে সূর্যের নামও নাই। ভাগবতধর্মের বংশপরম্পরায়ও সূর্য নাই। পাঞ্চরাত্রধর্মের বংশপরম্পরায় একজন সূর্য আছেন বটে। পরন্তু তিনি উহার আদ্যাচার্য নহেন। 'সূর্য' ও 'বিবস্বান্' শব্দ পর্যায়বাচক। আমাদের মনে হয়, 'সূর্য' শব্দে বিবস্বান্‌কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিবস্বান্ নায়ায়ণীয়াখ্যানে উক্ত একান্তধর্মের বর্তমান কল্পের আচার্যগণের এবং 'গীতা'য় ব্যাখ্যাত যোগধর্মের আচার্যগণের অন্যতম। সাত্বতধর্মকে একান্তধর্মের

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৮।৮২.২ ও ৮৪.১ দেখ। ২) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৩—৫

৩) 'সাত্বত' শব্দের অর্থ 'সাত্বতজাতির মনুষ্য' কিম্বা 'সাত্বতধর্মী মনুষ্য' না হইয়া 'সত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্য'ও হইতে পারে। তাই 'যদি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৪) মহাভা, ১২।৩৩৫।৯

সহিত এক মনে করিয়াই যেন বলা হইয়াছে যে উহা "প্রাক্‌সূর্যমুখনিঃসৃত" বা 'প্রাক্‌বিবস্বান্‌-মুখনিঃসৃত'। বেঙ্কটনাথ (জন্ম ১৩২৫ বিক্রম সম্বৎ) "সাত্বতং বিধিমাস্থায় নারায়ণমুখোদ্ভবম্" পাঠ ধরিয়াছেন।[১] ঐ পাঠ প্রকৃত মূল পাঠ হইলে এই সকল কল্পনা-জল্পনার কোন অবসর থাকে না।

নারায়ণীয়াখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে উপরিচর বসুর দেহত্যাগের পর সনাতন সাত্বতশাস্ত্র অন্তর্হিত হয়।[২] পক্ষান্তরে একান্তধর্ম সম্বন্ধে তথায় কথিত হইয়াছে যে ঈক্ষ্বাকুর দ্বারা প্রচারিত হইয়া উহা সর্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিল এবং বর্তমান কল্পের অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে।[৩] সুতরাং যখন সাত্বতধর্ম বিলুপ্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখনও একান্তধর্ম বর্তমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে 'মহাভারত'কার উভয়ধর্মকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতেন।

রাজা বসুর একটা মহৎকর্মের উল্লেখ এইখানে করা উচিত মনে করি। কেননা, তাহাতে তদাচরিত সাত্বতধর্মের একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণীয়াখ্যানে কেবল ইহা বিবৃত হইয়াছে যে সাত্বতধর্মের অন্তিম আচার্য পরমভাগবত রাজা উপরিচর বসু যেমন নারায়ণ হরির ভক্ত, তেমন ইন্দ্রের সখা, বলিয়া খ্যাত ছিলেন।[৪] 'মহাভারতে'র অন্যত্র,[৫] ইন্দ্রের সহিত বসুর মিত্রতার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে রাজা বসু ইন্দ্রের উপদেশে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। অনন্তর তিনি (রাজকার্য এবং) অস্ত্রশস্ত্রাদি, পরিত্যাগ করতঃ আশ্রমে গিয়া কঠোর তপস্যায় নিরত হন। তদ্দ্বারা তিনি ইন্দ্রত্ব পাইতে পারেন বুঝিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার নিকটে সমুপস্থিত হন এবং বুঝাইয়া সুজাইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ তপস্যা হইতে সম্যক্ নিবর্তিত করেন। দেবতাগণ বলেন, "হে পৃথিবীপতি! এই ধর্মকে পৃথিবীতে সঙ্কীর্ণ করিও না। কেননা, ধর্ম তোমার দ্বারা বিধৃত হইলেই, সমস্ত জগৎ (উহাকে) ধারণ করিবে।"[৬] ইন্দ্র বলেন, "তুমি নিত্যযুক্ত, সমাহিত এবং ধর্মযুক্ত হইয়া লোক ধর্মকে পালন কর। তাহাতে শাশ্বত পুণ্য-লোকসমূহ দর্শন করিবে। ভুবিষ্ঠ তুমি দিবিষ্ঠ আমার প্রিয় সখা" ইত্যাদি। সখ্যের নিদর্শনরূপে ইন্দ্র বসুকে দেবোপভোগযোগ্য এক আকাশগামী দিব্য স্ফটিক বিমান প্রদান করেন। তাহাতে চড়িয়া তিনি বিগ্রহবান্

---

১) বেঙ্কটনাথের 'সচ্চরিত্ররক্ষা', ৩য় অধিকার (গ্রন্থমালা, ব্যাখ্যানবিভাগ, ৯২ পৃষ্ঠা)।

২) সমস্ত কথাটা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ভগবান্ নারায়ণের মুখে বসান হইয়াছে। তিনি নাকি চিত্রশিখণ্ডিগণকে তাঁহাদের রচিত সাত্বতশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলেন।

"সংস্থিতে তু নৃপে তস্মিন্ শাস্ত্রমেতৎ সনাতনম্।
অন্তর্ধাস্যতি তৎসর্বমেতদ্বঃ কথিতং ময়া ॥"
(মহাভা, ১২।৩৩৬।৫১)

৩) পূর্বে দেখ। ৪) মহাভা, ১২।৩৩৫।১৭ ৫) মহাভা, ১।৬৩।১—

৬) "ন সংকীর্যেত ধর্মোঽয়ং পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
ত্বয়া হি ধর্মো বিধৃতঃ কৃৎস্নং ধারয়তে জগৎ ॥"—(মহাভা, ১।৬৩।৫)

'এই ধর্ম' কোন ধর্ম ?

দেবতার ন্যায় উপরে বিচরণ করিতেন। সেই হেতু তিনি 'উপরিচর' বলিয়া লোকে বিশ্রুত হন।[১] ইন্দ্র তাঁহাকে আরও দুইটি অমূল্য বস্তু প্রদান করেন। উহাদের একটি "ইন্দ্রমালা" নামে বিখ্যাত "বৈজয়ন্তীমালা" যাহার কমলসমূহ কখনও ম্লান হইত না; অপরটী এক বাঁশের লাঠি ("যষ্টিং চ বৈণবীং")। ঐ বৈজয়ন্তীমালা ধারণ হেতু যুদ্ধে তাঁহার গায়ে শস্ত্রাঘাত লাগিত না,—তিনি অবিক্ষত থাকিতেন। উহা তাঁহার অতুলনীয় বিশেষ চিহ্ন হয়। বেণুযষ্টি অভীষ্ঠ দ্রব্যসমূহ প্রদান করতঃ শিষ্টব্যক্তিগণের প্রতিপালনকারী। অনন্তর এক সংবৎসর গত হইলে, (বোধ হয় ঐ দিনের স্মারকরূপে) রাজা বসু "শক্রের পূজার্থ" ঐ বেণুযষ্টিকে ভূমিতে খাড়া করিয়া প্রোথিত করেন। পরের দিন উহাতে সুগন্ধ পুষ্পমালা, বস্ত্র, আভূষণ প্রভৃতি দ্বারা ভগবান্ ঈশ্বর (ইন্দ্র) হংসরূপে পূজিত হন ("ভগবান্ পূজ্যতে চাত্র হংসরূপেণ চেশ্বরঃ!")। মহাত্মা বসুর প্রতি প্রাতি বশত মহেন্দ্রদেব স্বয়ং ঐ পূজা গ্রহণ করেন. এবং তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া বলেন, "যে সকল রাজাগণ এবং মনুষ্যগণ চেদিপতি রাজার ন্যায় প্রেম সহকারে আমার পূজা করাইবে এবং উৎসব করাইবে, তাহাদের এবং তাহাদের রাষ্ট্রের শ্রী ও বিজয় লাভ হইবে। তাহাদের জনপদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও মুদ্রিত হইবে।"[২] মঘবান্ দ্বারা সম্পূজিত হইয়া, চেদিপতি বসু চেদিতে থাকিয়া রাজ্য পালন করেন। ইন্দ্রের প্রতি প্রীতি বশত তিনি যে ইন্দ্রোৎসব করেন, তাহা পরবর্তী রাজাগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক অনুকৃত হইয়াছিল,—তিনি যেমন ভাবে উহা প্রবর্তিত করেন ("যথা তেন প্রবর্তিতঃ") তেমনিভাবে উহা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।[৩] এইরূপে দেখা যায়, সাত্বতধর্মাচার্য রাজা উপরিচর বসু ইন্দ্রপূজার ও ইন্দ্রোৎসবের প্রবর্তক।[৪]

বাষ্ণেয়াধ্যাত্ম

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'মহাভারতে'র মতে বাষ্ণেয় অধ্যাত্মতত্ত্বের আদি ব্যাখ্যাতা ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই। উহার পরবর্তী আচার্য সম্বন্ধে তথায় সংক্ষেপে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে,— "অনাদ্য পরব্রহ্মকে দেবতা এবং ঋষিগণ জানিতেন না। একমাত্র প্রভু ও ধাতা ভগবান্ নারায়ণ (ঋষিই) তাঁহাকে জানিতে পারেন। নারায়ণ হইতে (অপর) ঋষিগণ, মুখ্য মুখ্য সুরগণ ও অসুরগণ এবং প্রাচীন রাজর্ষিগণ (সংসার) দুঃখের পরম ঔষধ (সেই ব্রহ্মতত্ত্ব)

---

১) মহাভা, ১।৬৩।৩৩'২—৩৪ ২) মহাভা, ১।৬৩।২৩'২—২৫'১

৩) "ততঃ প্রভৃতি চাদ্যাপি যষ্টেঃ ক্ষিতিপসত্তমৈঃ।
প্রবেশঃ ক্রিয়তে রাজন্ যথা তেন প্রবর্তিতঃ॥"—(মহাভা, ১।৬৩।১৯)

৪) ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে উপরিচর বসু প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ রাজাদিগের অন্যতম। তিনি হস্তিনাপুরের রাজা কুরুর পুত্র সুধন্বনের চতুর্থ বংশধর। বসু চেদির যাদবরাজ্য বিজয় করত শাসন করিতে থাকেন। সেইহেতু তিনি 'চৈদ্যোপরিচর' নামে খ্যাত হন। শক্তিমতী নদীর তীরস্থ শুক্তিমতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পূর্বদিকে মগধ পর্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করেন এবং খুব সম্ভবত উত্তর-পশ্চিমস্থ মৎস্য রাজ্যও জয় করেন। সেই হেতু তিনি 'সম্রাট' ও 'চক্রবর্তী' বলিয়া পরিগণিত হন। (F. E. Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, London, 1922, pp. 118-9, 281-2)

অবগত হন।"[১] এতাবন্মাত্র উক্তি হইতে নিরূপণ করা যায় না যে বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম ভাগবতাদি ধর্মসমূহের কোন একটি, না উহাদের হইতে ভিন্ন।

নিরপেক্ষ ভক্তিযোগের পরম্পরা

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' "অনপেক্ষিত ভক্তিযোগে"র অর্থাৎ যে ভক্তিযোগ দ্বারা মন অপর সমস্ত বিষয়ের সঙ্গ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র ভগবানেই নিবিষ্ট হয় তাহার পরম্পরা বিবৃত হইয়াছে। ঐ বিষয়ে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন,[২] যাহাতে ভাগবতধর্ম[৩] নিহিত আছে বেদসংজ্ঞক সেই বাণী তিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা তাঁহার (মানস) পুত্র মনুকে উহা উপদেশ করেন, তাঁহার নিকট হইতে ভৃগ্বাদি সাত ব্রহ্মর্ষিগণ[৪] উহা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের পুত্রগণ,—দেবদানবমনুষ্যাদি সকলে উহা প্রাপ্ত হন। এই পরম্পরা নারায়ণীয়াখ্যানে উক্ত একান্তধর্মের কিম্বা 'গীতা'য় উক্ত যোগধর্মের পরম্পরা হইতে ভিন্ন। নারায়ণীয়াখ্যানোক্ত সাত্বতধর্মের পরম্পরায় সাত ব্রহ্মর্ষির এবং স্বায়ম্ভুব মনুর নাম আছে। পরন্তু তথায় ভৃগুর নাম নাই, ভৃগুর স্থলে বশিষ্ঠের নাম আছে; অপর ছয় নাম উভয়ত্র আছে। অধিকন্তু নারায়ণীয়াখ্যানের মতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি সাত্বতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা; স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রানুসারে ধর্ম ব্যাখ্যা করেন; আর '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ঐ উক্তি মতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মনু হইতে নিরপেক্ষ ভক্তিধর্ম শিক্ষা করেন।[৫] তবে উহার কিঞ্চিৎ পরে আছে যে,—উদ্ধব কৃষ্ণকে বলেন, ভগবানের আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ, যদ্দ্বারা সাত্বতগণ ভগবান্‌কে অর্চনা করেন, ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন; ব্রহ্মা ভৃগুপ্রমুখ পুত্রগণকে এবং মহাদেব পার্বতীকে উপদেশ করেন, নারদ, ব্যাস ও বৃহস্পতি উহাকে মনুষ্যগণের নিঃশ্রেয়স্কর বলেন।[৬] তাহা হইতে মনে হয় যে ঐ অনপেক্ষিত ভক্তিযোগ ধর্ম সাত্বতধর্মই।

সমালোচনা ও সমন্বয়

উপরে প্রদত্ত বিবরণসমূহ সাবধানতা সহকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ভাগবতাদি ধর্মের প্রবর্তন সম্বন্ধে এই দেশে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে। কোন কোন মতে ধর্ম কোন না কোন দেবতা কর্তৃক প্রথমে প্রবর্তিত হইয়াছিল। অপর কোন কোন মতে উহা কোন না

---

১) মহাভা, ঐ, ১২।২১০।২৩—৪ ; ১২।৪৭।১৮—২০·১ (পাঠান্তরে) প্রথম শ্লোক 'ধাতা' স্থলে 'ব্যাস' পাঠান্তরে 'কূর্মপুরাণে'ও আছে। (১।৫১।৪৯·২)

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৪।৩—৬·১

৩) মূলে আছে "মদাত্মকঃ ধর্মঃ"। নীলকণ্ঠ বলেন "মদাত্মকঃ ময্যেবাত্মা চিত্তং যেন সঃ"।

৪) অর্থাৎ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু।

৫) মূলে আছে,

"তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥" (১১।১৪।৪)

এই বচন 'ততঃ' শব্দের অর্থ 'তাঁহার নিকট হইতে' না করিয়া,—যেমন উপরে করা হইয়াছে, 'অনন্তর' করিলে, পাওয়া যায় যে ভৃগ্বাদি ব্রহ্মা হইতেই ধর্ম প্রাপ্ত হন। তাহাতে উদ্ধবের উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি থাকে।

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৭।১—৩

কোন মনুষ্য কর্তৃক—কোন ঋষি কিম্বা অপর কোন মহদ্ ব্যক্তি কর্তৃক প্রথমে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং অপর কতিপয় মতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ে মিলিয়া,—দেবতার অনুমোদনায় মনুষ্য, উহা প্রবর্তিত করিয়াছিল। ঐ তিন মতবাদকে যথাক্রমে দেবতা-প্রবর্তন-বাদ, মনুষ্য-প্রবর্তন-বাদ এবং দেবতা-মনুষ্য-প্রবর্তন-বাদ, অথবা সংক্ষেপে দৈবত বাদ, মনুষ্য বাদ এবং দৈবতমনুষ্যবাদ বলা যায়। প্রাচীন ঋষিগণ, অথবা বস্তুতপক্ষে সাধারণত প্রায় সকল আর্য্যগণই পরম দেবতা-ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কোন মহৎ কার্য সুসম্পন্ন করিলে তাহারা মনে করিতেন যে তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রেরণায় এবং সাহায্যে,—উঁহারই শক্তিবলে তিনি ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কেহ কেহ এমনও মনে করিতেন যে তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহার জন্য ঐ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। সাধারণ কথাবার্তায়ও তাঁহারা আপন আপন সেই মনোভাবই প্রকাশ করিতেন। বেদে উহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।[১] অপর কেহ কেহ মনে করিতেন যে তাঁহারা নিমিত্তমাত্র—ভগবানের হাতে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় মাত্র, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কৃত কর্ম বস্তুত ভগবান্ দ্বারাই কৃত হইয়াছে আবার সর্ব্বসাধারণের হিতকামনায় কোন দার্শনিক বা ধার্মিক সিদ্ধান্ত প্রবর্তন করিয়া উহার প্রাচীনতা এবং গৌরব সিদ্ধ করত উহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আকর্ষণার্থ প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সর্বলোকমান্য দেবতাগণের কাহারও না কাহারও হইতে উহার উৎপত্তি প্রদর্শন করিতেন। কখন কখন আরও বলিতেন যে তদ্ভিন্ন অপর দেবতাগণ উহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, লোকহিতেচ্ছু অপর বিদ্বদ্বর্গও তাহা মানিয়া লইতেন। এই প্রকার সকল কারণে দেবতা কর্তৃক ধর্মপ্রবর্তনের কথাকে ঋষিদিগের বিনয় এবং দেবতা ভক্তির নিদর্শন মাত্র, অথবা লোকহিতকামনায় কল্পিত অর্থবাদ মাত্র, বলিয়া পরিগ্রহণ কর্তব্য। তখন ঐ ধর্মের শাস্ত্রোক্ত আচার্যপরম্পরায় প্রথম আগত ঋষিকে বা অপর মহদ্ব্যক্তিকে সেই ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই বিষয়ে আরও একটা বিশেষ বিবেচনার কথা আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে অবতারবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। মহাভারতপুরাণাদিতে উহার বহুল প্রচলন দেখা যায়। ভাগবতাদিধর্মে ভক্তিঅবতারবাদ বিশেষরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল।[২] তখন সমাজের অসাধারণ বিশিষ্টতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবানের অবতার মনে করা হইত। যদিও প্রধান প্রধান অবতারের সংখ্যা সময় সময় এক প্রকারে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, উহা অপরিবর্তনীয় থাকে নাই। অনেক মহদ্ব্যক্তি তাঁহাদের স্ব স্ব সময়ে বা কালান্তরে অবতার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। সাধারণে আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অবতার মনে করিতেন। 'গীতা'য় কৃষ্ণ অনেক ঋষি মুনি প্রভৃতি মহান্ পুরুষগণকে তাঁহার অবতার বলিয়াছেন। উপসংহারে তিনি সংক্ষেপে বলেন, "যে যে বস্তু বিভূতিমান্, শ্রীমান্ এবং শক্তিমান্ তাহাকে তাহাকে আমার তেজাংশসম্ভূত বলিয়া মনে করিও।"[৩] ইহাতে তিনি তদানীন্তন কালে প্রচলিত সাধারণ ভাবধারার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। অবতাররূপে পরিগণিত ব্যক্তির উল্লেখ অনেক সময়ে অবতারী

---

১) 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী', ১ম খণ্ড,

২) পরে দেখ।

৩) ভগবদ্গীতা, ১০।৪১

ভগবান্ রূপেই করা হইত দেখা যায়। নারায়ণ ঋষি এবং কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তাঁহাদের উভয়কে ভগবান্ নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানা হয়। আবার কোথাও কোথাও ইহাও উল্লিখিত আছে যে নারায়ণ ঋষিই কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নারায়ণ ঋষি এবং ভগবান্ নারায়ণের অভেদোল্লোখের, ভগবান্ নারায়ণরূপে নারায়ণ ঋষিকে উল্লেখের একাধিক দৃষ্টান্ত 'মহাভারতে', তথা '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে', পাওয়া যায়। পরে নারায়ণ ঋষির জীবন-চরিত আলোচনা কালে আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। সুতরাং এইখানে সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলিব না। ভগবান্ নারায়ণ এবং কৃষ্ণের অভেদোল্লেখও নারায়ণীয় আখ্যানে আছে।[১] 'গীতা'য় এবং 'মহাভারতে'র অন্যত্রও, তথা পুরাণাদিতে, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। এই সকল বলার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এইমাত্র দেখান যে অবতারী ভগবান্ এবং অবতার মনুষ্যের অভেদ দৃষ্টিতে একের নামে অপরের উল্লেখ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে করা হইত। যথা, নারায়ণীয়াখ্যানের ৩৪১তম এবং ৩৪২তম অধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট আপন কর্মজ নামসমূহের যে নিরুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ সকল কর্মের অনেকগুলি তাঁহার ঐ জন্মের,—বৃষ্ণিবংশে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মের—ঘটনা নহে, পরন্তু তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনা। কিছু বিশেষ করিয়া বলিলে,—যে সকল মহৎ বা বিশিষ্ট কর্ম নারায়ণ ঋষি করিয়াছিলেন, সেইহেতু যে সকল কর্মজ নাম প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই, সেই সকলকেও কৃষ্ণ আপন নাম বলিয়াছেন।[২] তাঁহার অপর কতিপয় নাম বস্তুত ভগবান্ নারায়ণ বা বাসুদেবেরই। নারায়ণ এবং কৃষ্ণকে অভিন্ন মনে করিয়াই সেইগুলিকে কৃষ্ণের নাম বলা হইয়াছে। ভগবানের সহিত যিনি আপন ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাকেও অবশ্য ভগবান্ বলা যায় এবং ভগবানের সমস্ত নাম তাঁহারই বলা যায়। ঐ প্রকার জীবন্মুক্তিবাদ বা ব্রহ্মজীবাত্মৈক্যবাদ প্রাচীন ভাগবতধর্মে মানা হইত। পরে প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনার সময়ে তাহা প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং অবতারবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেই প্রকারেই,—যেহেতু নারায়ণ ঋষি, তথা কৃষ্ণ, ভগবানের সহিত নিজের ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সাধারণ সকলেও তাহা স্বীকার করিত, সেই হেতুই লোকে ভগবানের নামে বস্তুত তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছে, বলা যায়। তারপর ভগবান্ নারায়ণ এবং নারায়ণ ঋষির নাম অভিন্ন হওয়াতে, তথা মহত্তা এবং পূজ্যতা খ্যাপনার্থ বৈদিক ঋষিকে ও অপরাপর মহদ্ব্যক্তিকে 'ভগবান্' বলিয়া অভিহিত করার প্রথা প্রাচীন কালে প্রচলিত থাকাতে, কেবল নাম দৃষ্টে ব্যক্তি সম্বন্ধে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক হইয়াছিল। কালান্তরে ঐ সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল কারণে ধর্মপ্রবর্তকরূপে যেখানে যেখানে নারায়ণের বা ভগবান্ নারায়ণের, অথবা তাঁহার অপর কোন নামের উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেই সেইখানে নারায়ণ ঋষিকেই মনে করা হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই প্রকার করিলেই '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র

---

১) মহাভা, ১২।৩৪২।৫, ১২—

২) ঐ, ১২।৩৪২।১০৬-২—১৩৬ দেখ।

প্রথম উপদেষ্টা বিষয়ে শুকদেবের উক্তিদ্বয়ের সুসমন্বয় হয়, বাষ্ণেয়াধ্যাত্মের আদি ব্যাখ্যাতা সম্বন্ধে উপক্রমে এবং উপসংহারে প্রাপ্ত ভীষ্মের উক্তিদ্বয়ের ঐক্য হয় এবং ভাগবতধর্মের প্রবর্তক সম্বন্ধে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'স্থ প্রহ্লাদের উক্তির, 'স্কন্দপুরাণে'র উক্তির, এবং 'মহাভারতে'র নারায়ণীয় আখ্যানস্থ ভীষ্মের এবং বৈশম্পায়নের উক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়।

কখন্ কখন্ আচার্য্যপরম্পরার মধ্যে ব্রহ্মার নামও পাওয়া যায়; অর্থাৎ কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু বা নারায়ণ প্রথমে ব্রহ্মাকে উপদেশ দেন এবং ব্রহ্মা পরে কোন না কোন ঋষিকে উপদেশ দেন। ব্রহ্মার নামোল্লেখে বাস্তবিকতা কিছুই নাই। কেননা, মহাভারতপুরাণাদিতে বারম্বার এবং অতীব পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে যে জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা তত্ত্বত কোন পৃথক ব্যক্তি নহেন। একই ভগবান্ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় করিয়া থাকেন। পরন্তু ঐ ত্রিবিধ কর্ম হেতু তিনি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বা শিব এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মাদি নামভেদ থাকিলেও ব্যক্তিভেদ নাই। বেদে তাহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" পরন্তু সাধারণ অল্পবুদ্ধি লোকে নামভেদ দৃষ্টে ব্যক্তিভেদ অনুমান করিয়া থাকে। পুরাণাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে সাধারণের জন্ত লিখিত। সেইহেতু উহাদিগেতেও অনেক সময় ব্রহ্মাদিকে পৃথক্ ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রকারেই প্রাচীন কোন কোন ধর্ম-প্রচারক-আচার্যপরম্পরার মধ্যে ব্রহ্মার নামও করা হইয়াছে। বেদের বংশব্রাহ্মণেও তাহা দেখা যায়। উহাকে কোন প্রকার বাস্তবিক মূল্য না দিয়া, পৌরাণিক অর্থবাদমাত্র বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিলে নারায়ণীয়াখ্যান হইতে ইহা পাওয়া যায় যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক। গীতা, বাষ্ণেয়াধ্যাত্ম এবং '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রমাণ হইতেও তাহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। ভগবান্ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদ এবং প্রজাপতি দক্ষকে উহার উপদেশ করেন। দক্ষ হইতে বিবস্বান্, বৈবস্বত মনু, ইক্ষ্বাকু, প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে উহা জগতে বহুল প্রচারিত হয়। 'গীতা'য় এবং 'স্কন্দপুরাণে'র পরিবর্তিত নারায়ণীয়াখ্যানে দক্ষের নাম নাই। তাহাদের মতে, নারায়ণ ঋষি সাক্ষাৎ বিবস্বান্‌কে ধর্মোপদেশ করেন। নারায়ণীয়াখ্যানের ও গীতার উক্তির সামঞ্জস্ত সাধনার্থই যেন 'স্কন্দপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি প্রথমে বিবস্বান্‌কে, পরে নারদকে ধর্মোপদেশ করেন। দক্ষ বা বিবস্বান্, মনু প্রভৃতি আচার্যপরম্পরায় আগত নারায়ণ ঋষির ভাগবতধর্ম বিশেষভাবে 'একান্তধর্ম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'গীতা'য় কৃষ্ণ অর্জুনকে সেই একান্তধর্ম ব্যাখ্যা করেন।

দেবর্ষি নারদ পরমর্ষি ব্যাসকে, প্রহ্লাদকে, যুধিষ্ঠিরকে এবং অপর কাহাকে কাহাকেও ভাগবতধর্মের উপদেশ করেন। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে উহার উপদেশ করেন। তখন কৃষ্ণ এবং ভীষ্মও উহা শুনিয়াছিলেন। পরন্তু তৎপূর্বেও ভীষ্ম তাঁহার পিতা শন্তনুর মুখে উহার তত্ত্ব অবগত হন। শন্তনু নারদ হইতে ব্যাস-প্রহ্লাদেতর পরম্পরায় প্রাপ্ত অসিত ঋষির নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রধর্ম শিখিয়াছিলেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট উহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে দেখা

যায়, যুধিষ্ঠির নারদ, ব্যাস ও ভীষ্মের নিকট হইতে ভাগবতধর্ম, তথা পাঞ্চরাত্রধর্ম, অবগত হন। প্রহ্লাদ দৈত্যদিগের মধ্যে ভাগবতধর্ম প্রচার করেন।

কথিত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সদনে সমুপস্থিত সিদ্ধ মহাত্মাগণের নিকটও ভাগবতধর্ম প্রচার করেন ; তাঁহাদের নিকট হইতে, অথবা তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া নারদের মুখ হইতে, সূর্য উহা শুনেন ; তিনি আপন অনুযায়ী ৬৬,০০০ ঋষিকে উহা উপদেশ করেন ইত্যাদি। এই উক্তিতে কোন প্রকৃত তথ্য আছে কিনা বিবেচ্য। যদি থাকে, তবে সেই তথ্য কি? এই উক্তিস্থ (নারায়ণীয়াখ্যান মতে) সূর্য বা (বাসুদেবমাহাত্ম্য মতে) ভাস্কর অবশ্যই বিবস্বান্ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, যদিও তিনই নাম একার্থক। কেননা, কথিত হইয়াছে যে বিবস্বান্, 'গীতা' ও 'স্কন্দপুরাণে'র মতে, সাক্ষাৎ নারায়ণ ঋষি হইতে, অথবা, নারায়ণীয়াখ্যানের মতে, তাঁহার শিষ্য এবং আপন মাতামহ দক্ষ প্রজাপতি হইতে ধর্মোপদেশ লাভ করেন ; আর সূর্য (বা ভাস্কর) নারদ হইতে কিম্বা তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মলোকবাসী সিদ্ধগণ হইতে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। বিবস্বানের শিষ্য তৎপুত্র মনু, আর সূর্যের শিষ্য তদনুযায়ী ৬৬,০০০ ঋষি। এইরূপে গুরু এবং শিষ্যের ভিন্নতা হেতু বিবস্বান ও সূর্যকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। সূর্য (বা ভাস্কর) কোন সিদ্ধ মহাত্মার সাধারণ নাম হইতে পারে। অথবা হইতে পারে যে উনি সূর্যোপাসক কোন সিদ্ধ পুরুষ,—যিনি লোকমধ্যে সূর্যের অবতার, সুতরাং স্বয়ং সূর্য, বলিয়া খ্যাত হন। এই দ্বিতীয় বিকল্প আমাদের নিকট অধিকতর প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। সেই প্রকারে আমরা মনে করি যে ব্রহ্মলোকবাসী সিদ্ধগণ ব্রহ্মার উপাসক সিদ্ধ মহাত্মাগণ। সুতরাং আমাদের এই অনুমান অনুসারে, দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণ ঋষির নিকট ভাগবতধর্মের উপদেশ পাইয়া এবং তদনুসারে সাধন করত তত্ত্বোপলব্ধি করিয়া পরে যেমন ব্যাসাদির নিকটে, তেমন ব্রহ্মার উপাসকদিগের নিকটেও, ঐ ধর্ম প্রচার করেন এবং তাঁহাদিগকে ঐ মতে দীক্ষিত করেন। সূর্যোপাসক জনৈক সিদ্ধ পুরুষও তখন ঐ ধর্মব্যাখ্যা শুনেন এবং তাহা অঙ্গীকার করেন। তিনি আপন অনুযায়িগণের মধ্যে উহা প্রচার করেন। কথিত হইয়াছে যে তাঁহার অনুযায়ী ঋষির সংখ্যা ৬৬,০০০ ছিল। উহাকে অক্ষরশঃ না লইয়া, অতি বেশী বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায়। ঐ সৌর আচার্যগণও ঐ ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। মহর্ষি অসিত তাঁহাদের কাহারও হইতে উহা অবগত হন এবং মহারাজ শন্তনুকে উপদেশ করেন। এই পরম্পরায় প্রচারিত ধর্ম বিশেষভাবে 'পাঞ্চরাত্রধর্ম' নামে খ্যাত্যাপন্ন হয়।

নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে সাত্বতধর্মের প্রবর্তক 'চিত্রশিখণ্ডী' নামে খ্যাত মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি প্রথমে নারায়ণের নিকটে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন ; শাস্ত্ররচনার পর "প্রথমেই ওঙ্কারস্বরপূজিত সেই শাস্ত্র ঋষিগণ কর্তৃক যেখানে কারুণিক তিনি (থাকেন) সেইখানে শ্রাবিত হইয়াছিল ;" এবং ভগবান্ উহার অনুমোদন ও প্রশংসা করেন। এই প্রবাদ কেবল অর্থবাদমাত্র হইতে পারে। পরন্তু আমরা মনে করি যে উহাতে কিছু বাস্তবিকতা আছে। তাহা এই যে ঐ নারায়ণ ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই। যেমন দক্ষ প্রজাপতিকে এবং নারদকে, তেমন মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষিকেও, নারায়ণ ঋষি আপন ভাগবতধর্মের উপদেশ করেন। ঐ উপদেশের

আধারে এক বিরাট শাস্ত্র রচনা করত চিত্রশিখণ্ডিগণ নারায়ণ ঋষিকে উহা শুনান এবং তিনি উহার অনুমোদন ও প্রশংসা করেন। "যেখানে" ইত্যাদি বলিয়া নারায়ণের নির্দিষ্ট বাসস্থানের কথা উল্লিখিত হওয়াতে ঐ অনুমানের কথঞ্চিৎ সমর্থন হয়। কেননা, নারায়ণ ঋষি সর্বদা হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমেই বাস করিতেন; সুতরাং তাঁহার নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল। পক্ষান্তরে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণ বিশ্বগত ও বিশ্বমূর্তি, অতএব অনন্ত; সুতরাং তাঁহার স্থানবিশেষে বাসের কথা হইতে পারে না। চিত্রশিখণ্ডি-ব্যাখ্যাত ভাগবতধর্ম 'সাত্বতধর্ম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহাদের নিকট হইতে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতি হইতে রাজা উপরিচর বসু সাত্বতধর্ম প্রাপ্ত হন।

বংশলতা

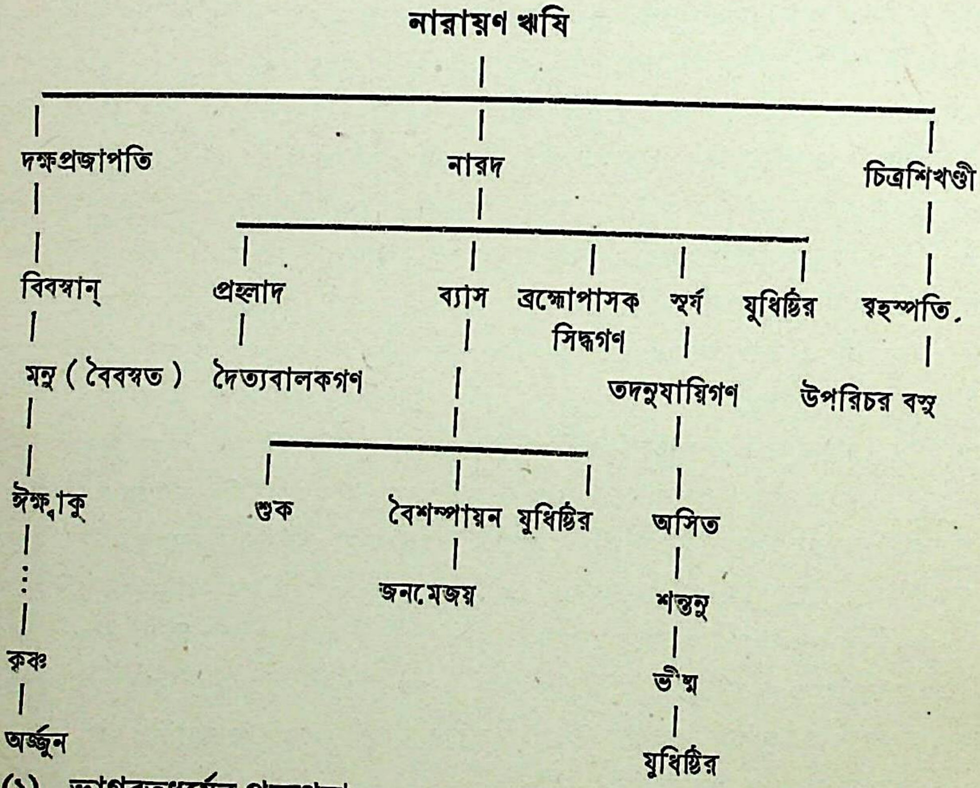
নারায়ণ ঋষি
দক্ষপ্রজাপতি
নারদ
চিত্রশিখণ্ডী
বিবস্বান্
প্রহ্লাদ
ব্যাস
ব্রহ্মোপাসক সিদ্ধগণ
সূর্য
যুধিষ্ঠির
বৃহস্পতি
মনু (বৈবস্বত)
দৈত্যবালকগণ
তদনুযায়িগণ
উপরিচর বসু
ঈক্ষ্বাকু
শুক
বৈশম্পায়ন
যুধিষ্ঠির
অসিত
জনমেজয়
শন্তনু
কৃষ্ণ
ভীষ্ম
অর্জ্জুন
যুধিষ্ঠির

(১) **ভাগবতধর্মের পরম্পরা**

নারায়ণ—নারদ—ব্যাস—শুক ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি

(২) **পঞ্চরাত্রধর্মের পরম্পরা**

নারায়ণ—নারদ—সূর্য—তদনুযায়িগণ—অসিত—শন্তনু—ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির

(৩) **একান্তধর্মের পরম্পরা**

নারায়ণ—দক্ষ—বিবস্বান্—মনু—ঈক্ষ্বাকু—···—কৃষ্ণ—অর্জ্জুন

(৪) **সাত্বতধর্মের পরম্পরা**

নারায়ণ—চিত্রশিখণ্ডী—বৃহস্পতি—উপরিচর বসু

পাঞ্চরাত্রসংহিতার মত

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে পাঞ্চরাত্র, সাত্বত, ভাগবত ও একান্তধর্মকে সাধারণত অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহাদিগেতে তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণসমূহ পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে যেইটি খুব সম্ভবত প্রাচীনতম সেই 'জয়াখ্যসংহিতা'য় আছে, মহর্ষি শাণ্ডিল্য "ভগবদ্ধর্মজিজ্ঞাসু" ঔর্বাদি ঋষিগণের নিকটে "ভগবদ্ধর্ম" বা 'অদ্ভুত'কর্মা বিষ্ণুর উপাসনালক্ষণ কর্ম" বিবৃত করেন।[১] তিনি বলেন, "অদ্ভুততেজ বিষ্ণুর মহৎ" জ্ঞানোপনিষৎ ও অপ্রকাশ্য রহস্য,—ব্রহ্মগর্ভ এবং শাশ্বত ঐ সারভূত শাস্ত্র" পুরাকালে নারদকে অনুগ্রহার্থ স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক কথিত হইয়াছিল। পরন্তু "অতিরহস্যহেতু" উহা সংসারে বেশী প্রকাশিত হয় নাই এবং "ধর্মগৌরব হেতু" কেহ উহার আচরণ করে নাই। তাহাতে কালান্তরে উহা বিলুপ্ত হয়। অনন্তর যখন ভগবান্ বিষ্ণু "ধর্মমার্গাবতারার্থ" নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি বদরিকাশ্রমে নারদ ঋষির নিকট উহা পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। ঐ সময়ে সিদ্ধগণ, দেবগণ, মৃকণ্ডু তার্ক্ষ্যাদি ঋষিগণ, নরগণ, মহাত্মা আদিত্যগণ, ভাবিতাত্মা কিন্নরগণ, দৈত্যগণ ও বসুগণ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞানবেদী সাংখ্যগণ ও যোগসিদ্ধগণ উহা শ্রবণ করেন। শাণ্ডিল্য নারদের নিকট উহার উপদেশ প্রাপ্ত হন।[২] ঔর্ব ঋষি তাঁহার পুত্র সংবর্তকের নিকট উহা ব্যাখ্যা করেন।[৩] 'সাত্বতসংহিতা' নামে অপর প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতা মতে, দেবর্ষি নারদ, ভগবান্ পরশুরামের আদেশে মলয়াচলে সংস্থিত "বিষ্ণুর আরাধনা-পরায়ণ",—"হরির পদ-প্রার্থী" মুনিগণকে "সাত্বত ক্রিয়ামার্গে" নিযুক্ত করেন।[৪] তিনি তাঁহাদিগকে বলেন, "অদ্য হইতে শশ্বৎমোক্ষপ্রদ রহস্যাম্নায়বিধিতে দেবেশ কেশবকে আরাধনা কর।"[৫] অনন্তর, নারায়ণপদপ্রাপ্তির (পক্ষে) যাহা শ্রেয়" তাহা প্রকাশনার্থ তাঁহাদের অনুরোধে নারদ বলেন, পুরাকালে কৃতযুগের অবসানে ত্রেতাযুগ সমুপস্থিত হইলে চক্রপাণি ভগবান্ বিষ্ণু দেবদেব হলধর বা সঙ্কর্ষণের অনুরোধে "শাশ্বত পরব্রহ্মকে" আরাধনার ত্রিবিধ উপায় ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি পরম্পরাক্রমে উহা প্রাপ্ত হন ("পরম্পরাগতং তস্মে")। উহাই তিনি ঐ ঋষিগণের নিকট "যথাবৎ" প্রকাশিত করেন।[৬] ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য যে এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে বিষ্ণু-আরাধনার সাত্বতক্রিয়ামার্গ ব্যতীত অপর পন্থাও ছিল,—নারদ হইতে সাত্বতক্রিয়ামার্গ জানার পূর্বে মলয়াচলস্থ মুনিগণ ঐ পন্থাতে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন; নারদ, পরশুরামের আদেশে, তাঁহাদিগকে সেই পন্থা পরিত্যাগ করাইয়া সাত্বতক্রিয়ামার্গে প্রবৃত্ত করান। ঐ সাত্বতমার্গের মূল প্রবক্তা বিষ্ণু এবং শ্রোতা হলধর বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলধর কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেননা, নাম-সাদৃশ্যে শ্রোতা হলধরকে বৃষ্ণিবংশীয় হলধর বলিয়া মনে করা যাইতে পারিলেও, প্রবক্তা বিষ্ণুকে এমন কোন নামে অভিহিত করা হয় নাই, যাহাতে তাঁহাকেও বৃষ্ণিবংশীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[৭] পক্ষান্তরে ইহা

---

১) জয়াখ্যসংহিতা, ১।১২, ২৯ ও ৪৮-৫২ দেখ।
২) ঐ, ১।৪০·২—৪৮·১ দেখ।
৩) ঐ, ১।৫—৭
৪) সাত্বতসংহিতা, ১।১—দেখ।
৫) ঐ, ১।১৫·২—১৬·১
৬) দেখ—ঐ, ১।১৭—২৬ ; ২৫।৩৭০—১
৭) হলধরের 'হলী', 'লাঙ্গলী', 'সীরিন' (৫।২ ; ১৯।১), প্রভৃতি নাম ব্যতীত, সঙ্কর্ষণ (১।২৯) ; দেবদেব হলায়ুধ (২১।১), বলদেব (৬।১), বনমালী (১১।২ ; ১৬।১) কামপাল (১৮।১), প্রভৃতি নামও 'সাত্বতসংহিতা'য় পাওয়া যায়।

পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের ঐ সম্বাদ ত্রেতাযুগেই হইয়াছিল।[1] উহার তাৎপর্য এতাবন্মাত্র ইঙ্গিত করা মনে হয় যে উঁহারা দ্বাপরযুগান্তে সম্ভূত বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ ও বলদেব নহেন ; উঁহারা ব্যূহীয় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ।

পাঞ্চরাত্রধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ 'পৌষ্করসংহিতা'য় পাওয়া যায় না। তথায় সংক্ষেপে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মা অনিরুদ্ধের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রাপ্ত হন এবং রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের নিকট, তথা নারদাদি নিজের পুত্রগণের নিকট, উহা প্রকাশিত করেন। রুদ্রাদি দেবগণ আপন আপন অনুযায়িগণের নিকট, এবং নারদাদি লোকত্রয়ান্তর্গত ভাবিতাত্মা ঋষিগণের নিকট, উহার উপদেশ করেন। পরে পরে স্বাভিপ্রায় বশে, তথা নানা কাল, দেশ ও জাতি বশে শাস্ত্র বিভিন্ন হইয়া পড়ে।[2]

'পাদ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে তত্রোক্ত "গুহ্যতম জ্ঞান", "বৈষ্ণবশাসন" ভগবান্ আদিদেব বাসুদেব ভগবান্ ব্রহ্মাকে এবং ব্রহ্মা মহর্ষি কপিলকে উপদেশ করেন। মহর্ষি কপিল নাগরাজ পদ্মকে উহা যথাযথ প্রদান করেন। মহর্ষি কপিলের আদেশে পদ্ম মহর্ষি সংবর্তকে "দেবদেবের সমারাধনকর্মজ এবং সাক্ষাৎ দেবের সমাশ্রিত জ্ঞানসমূহের পরম ও সাত্ত্বিক জ্ঞান" উপদেশ করেন। মহর্ষি কণ্ব সংবর্ত হইতে উহা প্রাপ্ত হন এবং আপন আশ্রমস্থ মুনিগণকে উপদেশ করেন।[3]

'পরমসংহিতা'র মতে[4] পরমপুরুষ (বা ভগবান্ হরি) ব্রহ্মাকে তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় যোগ উপদেশ করেন। তাঁহার আদেশে ব্রহ্মা শ্বেতদ্বীপনিবাসী "পরমবৈষ্ণব" বা "একান্তী" সিদ্ধ মহাত্মাগণকে উহার উপদেশ দিতে যান। তঁহারা সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার —এই চারি মহাত্মাকে আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। কেননা, উঁহারা প্রজ্ঞায় ও মেধায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মাকে বলেন, 'হে পিতামহ, ইঁহারাই আপনার প্রসাদে যোগাচার্য হউন। আমরা পরে ইঁহাদের নিকটে উহা যথাসুখে শ্রবণ করিব।"[5] তখন ব্রহ্মা "সৃষ্টি ও সংহার সংযুক্ত, তথা মুক্তি ও সংসৃতি সংযুক্ত,[6] সর্ব জ্ঞান উঁহাদিগকে পাঁচ

বিষ্ণুকে অচ্যুত (১।১৯ ; ২।১ ; প্রভৃতি), জগন্নাথ (৩।১), লক্ষ্মীনন্দন (১২।২), কমলাপতি (১৬।৩০), শ্রীপতি (১৭।১), প্রভৃতিও বলা হইয়াছে। বৃষ্ণিবংশ-সম্পর্কিত কোন নাম তাঁহার নাই। তবে 'কৃষ্ণ' নামের উল্লেখ অন্য সম্পর্কে আছে। (১২।৩৯, ৪৬)

[1] কথিত হইয়াছে যে ত্রেতাযুগে সমনুপ্রাপ্ত হইলে "জগদ্ধাতা অচ্যুত ঈষৎ রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হন" এবং সঙ্কর্ষণ তাহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। (১।১৯) পরে উক্ত হইয়াছে যে যুগভেদে বাসুদেবাদি চারিব্যূহের প্রত্যেকের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের বর্ণ সত্যযুগে সিত ও রক্ত, ত্রেতাযুগে রক্ত ও পীত, দ্বাপরে পীত ও কৃষ্ণ এবং কলিতে কৃষ্ণ ও সিত হয়। (৫।৮৭—৯) অর্থাৎ সিত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণকে পর পর চক্রাকারে স্থাপন করিলে বাসুদেবাদি চারি ব্যূহের প্রত্যেকের বর্ণ কৃতযুগাদিভেদে সিতাদিক্রমে আরম্ভ করিয়া জানা যায়। যাহা হউক, তাহাতেও জানা যায় যে বিষ্ণু-সঙ্কর্ষণ-সংবাদ ত্রেতাযুগে হইয়াছিল।

[2] পৌষ্করসং, ৩৯।২৩—৮

[3] পাদ্মসং, ১।১।১—৩৮ ; ১।১২।৭৮—৮১ ; ৪।৩৩।১৮১—

[4] পরমসং, ৩১।১—

[5] ঐ, ৩১।১৭

[6] মূলে মুদ্রিত পাঠ "মুক্তিসংসারসংযুতম্"। পরন্তু 'মুক্তিসংসৃতিসংযুতম্' পাঠ সমীচীন।

রাত্রিতে সর্বশঃ প্রদান করেন।"[১] উক্ত যোগিচতুষ্টয় ঐ জ্ঞান লাভ করত "কৃতবুদ্ধি" হন এবং পরে অপর সিদ্ধগণকে উহা সম্পূর্ণত প্রদান করেন। যে সকল সংশিতব্রত বৈষ্ণব শ্বেতদ্বীপে গমন করে, ঐ সকল সিদ্ধগণ তাহাদিগকে সেই জ্ঞান উপদেশ করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় শ্বেতদ্বীপে গিয়া যোগাচার্য সনকের নিকট হইতে ঐ "পঞ্চরাত্রতন্ত্র" লাভ করেন।[২] তিনি দেবল ঋষিকে উহার উপদেশ করেন।[৩] তিনি আরও বলেন যে তাঁহার পূর্বে কচ্ছপেন্দ্র অকূপার, তথা জৈগীষব্য, পরশুরাম, অত্রি, অঙ্গিরস প্রভৃতি সংশিতব্রত মুনিগণ, শ্বেতদ্বীপে গিয়া ঐ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। "ঐ প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সুসমাহিত, একান্তী, আনন্দযুক্ত এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন। তাঁহারা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বাসুদেবের উপাসনা করেন।"[৪] ইহা লক্ষিতব্য যে পাঞ্চরাত্রের এই আচার্য পরম্পরার মধ্যে দেবর্ষি নারদের নাম নাই।

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় এই বিষয়ে ভিন্ন প্রকার বর্ণনা আছে।[৫] উহাতে কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ বিষ্ণু জগতের কল্যাণার্থ অধর্মনিবাসক এবং সুকরধর্মমর্যাদা-সংস্থাপক এক শাস্ত্র স্বীয় সঙ্কল্পবলে সৃষ্টি করেন। "উহা মর্যাদাধারণক্ষম সৌদর্শন ব্যূহ,"[৬] "বিষ্ণুর সঙ্কল্প-কল্পিত সৌদর্শন রূপ।"[৭] উহাতে এক নিযুত অধ্যায় ছিল বোধ হয় এবং সেই কারণেই বোধ হয় উহাকে 'নিযুতাধ্যায়ী' বলা হইত।[৮] যাহা হউক, উহা সমস্ত শাস্ত্রগর্ভিত ছিল। "উহা যুক্তিপূর্ণ, পুরুষার্থ-চতুষ্টয়সমন্বিত, এবং ঋক্, যজু, সাম ও অথর্বাঙ্গিরস পুষ্ট" ছিল। উহা বিবিধ ইতিহাসপুরাণ-সমন্বিত এবং সাংখ্যযোগাদি নানাবিধ তত্ত্বসমূহ-যুক্ত ছিল, তথা পশুপতিমতপূর্ণ ছিল।[৯] "অধিকার অনুসারে সদ্ধর্মসমূহ অনেক প্রকারে ব্যাখ্যানশীল আদি বিষ্ণুর সঙ্কল্পজ হইতে সঙ্কর্ষণোদিত সঙ্কল্পময় নিযুতাধ্যায়ক (শাস্ত্র) পূর্বে ছিল।"[১০] সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুষ্যগণ ঐ শাস্ত্রোক্ত "অনেকবিধ সৎকর্মসমূহ দ্বারা নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিত।" পরন্তু কালবিপর্য্যয়ে যুগভেদ সমুদ্ভূত হইলে ত্রেতাযুগের আদিতে সত্ত্বগুণের হ্রাস এবং রজোগুণের বৃদ্ধি হেতু মনুষ্যগণ, এমনকি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণও কামনা-পরায়ণ হওয়াতে ঐ "সুদর্শন শাসনে"র প্রচার মন্দীভূত হয়। তখন লোককল্যাণার্থ "হরির বাক্-সম্ভব অপান্তরতপা নামক মুনি, আদিদেব-সমুদ্ভব পুরাণ ঋষি কপিল, লোকাদি হিরণ্যগর্ভ, পশুপতি শিব" এবং বিষ্ণু বিজ্ঞানবলে উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ একত্রিত করত ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র নির্মাণ করেন ("ততক্ষিম")।[১১] সর্বপ্রথমে "হরির বাচ্যায়ন পুত্র" "ভগবান্ অপান্তরতপা মুনি" উহা হইতে বেদ তক্ষণ করেন ("ততক্ষ")। অনন্তর কপিল সাংখ্যশাস্ত্রাংশ, হিরণ্যগর্ভ যোগশাস্ত্রাংশ, শিব পাশুপাতশাস্ত্রাংশ এবং বিষ্ণু পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রাংশ "তক্ষণ করেন"। সেই কেবল সদাগমময় দিব্যশাসন হইতে সার উদ্ধৃত করত বিষ্ণু স্বয়ং অসঙ্কুল, তৎপরব্যূহবিভব-স্বভাবাদিনিরূপণ এবং মোক্ষৈকফললক্ষণ পঞ্চরাত্র নামক তন্ত্র নির্মাণ করেন।"[১২] "ঐ যে সুদর্শন

---

[১] পরমসং, ৩১।১৯ [২] ঐ, ১।৪৪

[৩] ইহা বলা যাইতে পারে যে মার্কণ্ডেয় দেবলকে যে উপদেশ করেন, তাহা 'পঞ্চরাত্রতন্ত্র' (১।৩৩ ; ৩১।৫৮), 'যোগতন্ত্র' (১।৩৩), 'বৈষ্ণবতন্ত্র' (৩১।৫১, ৬৬) ও 'বৈষ্ণব জ্ঞান' (৩১।৫৩, ৬৫) নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ "পরম জ্ঞান দেবদেবের মুখ হইতে চ্যুত।" (৩১।৫২·১)

[৪] ঐ, ৩১।২৯·২—৩০ [৫] অহির্বুধ্ন্যসং, ১১শ ও ১২শ অধ্যায় [৬] ঐ, ১১।১৪·২

[৭] ঐ, ১১।১৮·২ [৮] ঐ, ১১।১৯ [৯] ঐ, ১১।২০—৪৬ [১০] ঐ, ১১।৪৭·২—৪৮

[১১] অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ১১।৫৩·২—৫৬·১ ; ১২।২—৩ [১২] ঐ, ১১।৬২·২—৬৪·১

নামক পরম বৈষ্ণব সঙ্কল্প উহাকে তিনি (বিষ্ণু) স্বয়ং পঞ্চবক্ত্রগ হইয়া পঞ্চধা বিভক্ত করেন"[১] "প্রাণ, মায়া, ক্রিয়া, শক্তি, ভাব, উন্মেষ, উদ্যম, সুদর্শন এবং সঙ্কল্প—এই সকল শব্দ পর্য্যায়বাচক। পরন্তু এই পঞ্চবর্গ শাস্ত্রসমূহের নিষ্ঠা নিশ্চয় এক সুদর্শন নামক শাস্ত্র। উহার অর্থ অব্যয় বিষ্ণু।"[২] বেদাদি শাস্ত্রপঞ্চকের নিষ্ঠা সম্বন্ধে নারায়ণীয়াখ্যানে যাহা উক্ত হইয়াছে, এইখানে ঠিক সেই কথা আছে। এইখানে ততোধিক আছে যে ঐ শাস্ত্রপঞ্চকের মূল এক আদি শাস্ত্র, যাহার পরম তাৎপর্য্য এক ভগবান্ বিষ্ণু। পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের আচার্য্যপরম্পরা সম্বন্ধে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র উক্তি নারায়ণীয়াখ্যানের উক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে উহা "দিব্য পঞ্চরাত্রময়ী",[৩]—সমস্ত পঞ্চরাত্রতন্ত্রের সার।[৪] উহাতে বিবৃত "অনুত্তম জ্ঞান" ভগবান্ অহির্বুধ্ন্য সুদীর্ঘ কাল ঘোর তপস্যা করত "বিজ্ঞানবলবারিধি সঙ্কর্ষণ হইতে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। উহা ব্রহ্মাদির, তথা মহর্ষিগণের, নিকট নাই।"[৫] তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট উহার উপদেশ করেন। ঐ সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা উহা শ্রবণ করেন।[৬] দুর্বাসা ভরদ্বাজ ঋষিকে উহা ব্যাখ্যা করেন।

'ঈশ্বরসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষির আদেশে দেবর্ষি নারদ বদরিকাশ্রমে হরির পদলাভের আশায় তপস্যায় নিরত মুনিগণকে "সাত্বতশাস্ত্র", "উত্তম রহস্যাম্নায়" বা "একায়ন বেদ" উপদেশ করেন।[৭] মোক্ষলাভের তদ্ভিন্ন অপর কোন পন্থা নাই বলিয়াই মনীষিগণ উহাকে 'একায়ন' বলিয়া থাকেন।[৮] উহার একমাত্র সংশ্রয় সদ্‌ব্রহ্ম বাসুদেব নামক পরম তত্ত্ব। উহা সাক্ষাত্তৎপ্রতিপাদক দিব্য মন্ত্রসমূহ ও ক্রিয়াসমূহ যুক্ত; অবিদ্যাতিমিরাপহ এবং মোক্ষৈকফললক্ষণ; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[৯] ঐ একায়নবেদ নাকি ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদ অপেক্ষাও প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ;—উহা মহান্ বেদবৃক্ষের মূলভূত এবং ঋগাদিবেদসমূহ উহার স্কন্দভূত ও শাখাভূত।[১০] মুখ্যতয়া জগতের মূল ভগবান্ বাসুদেবেরই প্রতিপ্রাদক বলিয়া উহার 'মূলবেদ' নাম সিদ্ধ হয়।[১১] উহা 'প্রকৃতি বেদ', ঋগাদি "বিকারবেদ"। উহাতে একমাত্র বাসুদেবেরই উল্লেখ আছে ("বাসুদেবৈকগোচরঃ"), পরন্ত বিকারবেদসমূহে অপর দেবতাগণেরও উল্লেখ আছে।[১২] একায়ন বেদে 'ভাগবতধর্ম্ম'ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ভাগবতধর্ম্ম সকলেরই আদ্য। উহা "প্রকৃতিধর্ম্ম" নামেও কথিত হইয়া থাকে।[১৩] উহা আদি কৃতযুগে প্রবর্তিত হয়। তখন মনুষ্যগণ যোগ্য ছিল; তাই নিত্য ভাগবতধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিত। অনন্তর ত্রেতাযুগে মনুষ্যগণ "নানাকামসমন্বিত" হইয়া "ব্যামিশ্রযাজী" হওত সেই আদ্য সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। তখন বিকারবেদসমূহ সর্বত্র প্রচলিত হয়, প্রকৃতিবেদ বাসুদেবে প্রত্যাবর্তন করে। তাহার পর হইতে ভগবান্ স্বয়ং সময় সময় যোগ্য ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ করেন।[১৪] নারদ নিজে শ্বেতদ্বীপে

---

১) অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ১১।৬৪'২—৬৫'১ ; আর দেখ—১২।৪৯—৫০
২) ঐ, ১২।৫৩—৪
৩) ঐ, ১।৬৮'২—৬৯'১
৪) ঐ, ৬০।২০'২
৫) ঐ, ২।৩—৪
৬) ঐ, ১।১৮
৭) ঈশ্বরসংহিতা, ১।৮—৯, ১৬, ১৮
৮) ঐ, ১।১৯ ; পূর্বে দেখ
৯) ঐ, ১।২০'২—২১ ; ২১।৫৩১
১০) ঐ, ১।২৪ ; আরও দেখ—১।১০'১ ; ২০।১৯৭
১১) ঐ, ১।২৫
১২) ঐ, ১।২২—৩
১৩) ঐ, ১।২২'২
১৪) ঐ, ১।২৩, ২৬—৮ ; আরও দেখ—২১।৫৩৮—৪০, ৫৪২—৪৪'১

গিয়া স্বয়ং ভগবানের নিকট উহা অধ্যয়ন করেন।[১] তিনি আরও বলেন যে সন, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎসুজাত, সনৎকুমার এবং কপিল—এই সাত জন "একান্তীধর্মের প্রবর্তক আচার্য"।[২] মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই সপ্ত চিত্রশিখণ্ডী এবং স্বায়ম্ভুব মনু দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া মহান তপস্যা দ্বারা ভগবান্ নারায়ণকে প্রসন্ন করত তাঁহার নিকটে "মূলশ্রুতি" অধ্যয়ন করেন এবং অপর ঋষিগণকে যথাযথ পড়ান। অনন্তর তাঁহারা লোকহিতকামনায় মূলবেদ এবং "সাত্বতাদি দিব্যশাস্ত্রসমূহ" সম্যক্ নিরীক্ষণ করত এক লক্ষ শ্লোকে "তন্ত্রাখ্য শাস্ত্র" রচনা করেন।[৩] মূলশ্রুতির অর্থ জানিয়া মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন।[৪] দ্বাপর যুগের অন্তে এবং কলির আদিতে মহামুনি শাণ্ডিল্য তোতাদ্রিপর্বতে সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করত সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ হইতে একায়ন বেদ প্রাপ্ত হন এবং সুমন্তু, জৈমিনি, ভৃগু, ঔপগায়ন ও মৌঞ্জায়ন ঋষিকে তাহা সম্যক্ পড়ান্।[৫] জগতের হিত কামনায় নর ও নারায়ণ ঋষি বদরিকাশ্রমে থাকিয়া মূলধর্ম অনুষ্ঠান করেন।[৬] 'সাত্বত', 'পৌষ্কর', 'জয়াখ্য', প্রভৃতি "দিব্য সচ্ছাস্ত্র"। জগতের হিত কামনায় ভগবান্ হরি স্বয়ং মূলবেদ অনুসারে উহাদের রচনা করেন এবং সঙ্কর্ষণাদি লোকহিতৈষিগণ দ্বারা উহাদিগকে প্রবর্তিত করান। উহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই। দিব্যশাস্ত্রসমূহের মধ্যে আবার 'সাত্বত' উত্তমোত্তম।[৭] মহামুনি শাণ্ডিল্য ভগবান্ সঙ্কর্ষণ হইতে দিব্যশাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হন এবং মুনিগণকে পড়ান।[৮] প্রথমে নারদ পরশুরামের আজ্ঞায় মলয়াচলস্থ মুনিগণকে সাত্বতশাস্ত্র অধ্যাপন করেন।[৯]

'ঈশ্বরসংহিতা'র অন্যত্র[১০] নারদ বলিয়াছেন যে ভগবান্ বাসুদেবের পঞ্চ আয়ুধের অধিপতিগণ তাঁহার আদেশে "লোকসংরক্ষণার্থ" "তাঁহার আরাধনার্থ ভূলোকে সদ্ধর্ম সমূহ প্রবর্তনার্থ"—"মোক্ষৈকফললক্ষণ আদ্য একায়ন বেদ" প্রচারার্থ শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক এবং ভরদ্বাজ—এই পঞ্চ ব্রহ্মর্ষিরূপে পৃথিবীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধস্থলাদিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা একত্রে বিষ্ণুর আরাধনাভিলাষে পরামর্শ করিয়া তোতাদ্রিতে গিয়া সুদুস্তর তপ করেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া জগৎপতি বাসুদেব লক্ষ্মী সহ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইয়া ঋষিগণ করজোরে বলেন,

"অধীতাঃ সকলা বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
মোক্ষোপায়ং ন জানীমস্তস্ত্বাং শরণং গতাঃ॥
ইহৈবানুগ্রহং কর্তুমর্হসি ত্বং দয়ানিধে।"[১১]

'আমরা সমস্ত বেদ এবং বিবিধ শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি। পরন্তু মোক্ষের উপায় জানি না। তাই তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। হে দয়ানিধি! তুমি ইহজন্মেই আমাদিগকে

---

১) ঈশ্বরসংহিতা, ১।২৯'১
২) ঐ, ১।২৯'২—৩০
৩) ঐ, ১।৩১—৫
৪) ঐ, ১।৩৬
৫) ঐ, ১।৩৮'২—৪১ ; আরও দেখ—২১।৫৪১—
৬) ঐ, ১।৪২
৭) ঐ, ১।৫০—১, ৬৪—৫, ৬৮
৮) ঐ, ১।৫২
৯) ঐ, ১।৫৩
১০) ঐ, ২১।৫১৩—
১১) ঈশ্বরসং, ২১।৫২৮—৫২৯'১

অনুগ্রহ কর।' তখনই ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগকে দীক্ষা দ্বারা সংস্কৃত ও অভিষেচন করিয়া "রহস্যাম্নায় নামক আদ্য একায়ন বেদ" অধ্যাপন করেন এবং উহার অর্থসমূহও উপদেশ করেন।[১] তাঁহার আদেশে শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ উহা জগতে প্রচার করেন। এইরূপে আদি কৃত যুগে শাণ্ডিল্যাদি সমস্ত মুনিগণ এবং সমস্ত মনুষ্যগণ আদ্য ভাগবতধর্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকে। "অনন্তর ত্রেতাযুগ আসিলে মনুষ্যগণ নানাকামবশে ভাগবতধর্ম পরিত্যাগ করত মিশ্রযাজী হয়। তাহাতে একায়ন বেদ মন্দাচার হইল। মনুষ্যগণকে এইরূপে কামরত দেখিয়া মুনীন্দ্র শাণ্ডিল্য লোকসংরক্ষণার্থ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। অনেক সহস্র বৎসর তপস্যার পর,—দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলির আদিতে, সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ দেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।[২] তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান্ সঙ্কর্ষণ তাঁহাকে "স্বয়ং হরি কর্তৃক প্রোক্ত ভোগমোক্ষপ্রদ সাত্বতাদি দিব্যশাস্ত্রসমূহ" উপদেশ করেন। শাণ্ডিল্য ঔপগায়নমৌঞ্জায়নাদি মুনিগণকে এবং সনকাদি যোগিগণকে ঐ সকল শাস্ত্র পড়ান। সেই হইতে সাত্বতাদি শাস্ত্র আবার জগতে প্রচারিত হয়। সুতরাং শাণ্ডিল্যাদি পাঞ্চরাত্রপ্রবর্তক।[৩] কথিত হইয়াছে যে যাহারা পরমধর্ম পরিত্যাগ করত মিশ্রধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পরন্তু পুনঃ তৎপদলাভে অভিলাষী এবং শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে অনুগ্রহার্থ এবং বর্ণদিগের যোগ্যতাপাদনার্থ, তথা সর্বজনগণের অভীষ্ট ফলসিদ্ধ্যর্থ, স্বয়ং হরি মূলবেদানুসারে,—উহার সারসংগ্রহ করত সাত্বতাদি শাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।[৪]

অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে "সাত্বততন্ত্র" জগৎপ্রভু বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা হইতে রুদ্রাদি প্রাপ্ত হন।[৫] ব্রহ্মা সনৎকুমারকে "সাত্বতসংজ্ঞক মহোপনিষদ্ তন্ত্র—যাহা মূলবেদের সদৃশ এবং তৎপরিস্রুত, সিদ্ধিমোক্ষপ্রদ এবং সর্বশাস্ত্রার্থগর্ভিত" তাহা প্রদান করেন।[৬]

'পারমেশ্বরসংহিতা'য় আছে, শাণ্ডিল্য বলেন, "যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম,—যাহা হইতে মহত্তর ধর্ম নাই, তথা যাহা একমাত্র বাসুদেবনিষ্ঠ এবং দেবতান্তরবর্জিত" তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে কোন সময়ে উদিত হয়। তখন তিনি তোতাদ্রিপর্বতে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করেন। ঐ তপস্যা পূর্ণ হইলে "দ্বাপর যুগের অন্তে এবং কলিযুগের আদিতে, সাক্ষাৎ ভক্ত সঙ্কর্ষণ হইতে এই মহত্তর (ধর্ম) প্রাপ্ত হন। সাত্বত বিধি বলিয়া প্রখ্যাত এই একায়ন বেদ দুর্বিজ্ঞেয় এবং দুষ্কর। (পরন্তু) প্রতিবুদ্ধগণ কর্তৃক ইহা নিষেবিত হইয়া থাকে।

---

১) ঈশ্বরসং, ২১।৫৩০—কথিত হইয়াছে যে

"পঞ্চাপি পৃথগেকৈকদিবারাত্রং জগৎপ্রভুঃ।
অধ্যাপয়ামাস যতস্ততস্তন্মুনিপুঙ্গবান্॥
শাস্ত্রং সর্বজনৈর্লোকে পঞ্চরাত্রমিতীর্যতে॥"

—(২১।৫৩২—৩৩·১)

২) ঐ, ২১।৫৪৩—৬

৩) "শাণ্ডিল্যাদয়ো যে চান্যে পাঞ্চরাত্রপ্রবর্তকাঃ॥"—(৮।১৭৬·২)

৪) ঐ, ২১।৫৪৭—৫৫০·১

৫) ঐ, ২০।২০৫—৬

৬) ঐ, ২০।১৯৬—৭

মোক্ষ প্রাপ্তির এতদ্ব্যতীত অন্য পন্থা নিশ্চয়ই নাই। সেইহেতু মনীষিগণ ইহাকে একায়ন নামে অভিহিত করেন।”[১]

বৈখানসমতের আচার্যপরম্পরা

বৈখানসশাস্ত্রমতে তত্রোক্ত নারায়ণোপাসনা-পদ্ধতির প্রবর্তক মহর্ষি বিখনস্। কথিত হইয়াছে যে তিনি স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট ঐ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি যেই গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করেন, সেইটি, তাঁহার নামানুসারে, ‘বৈখানসসূত্র’ নামে খ্যাত হয় এবং তাঁহার মতবাদ ‘বৈখানসমত’ নামে অভিহিত হইতে থাকে। তিনি অত্রি, ভৃগু, কশ্যপ ও মরীচি—এই চারি জন শিষ্যকে উহা শিক্ষা দেন।[২] পরন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি আরও পাঁচজন ঋষিকে,—বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতুকে, সুতরাং সর্বসমেত নয় জন শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন।[৩] বৈখানসমতের তদর্বাক্ আচার্যপরম্পরার বিবরণ আমরা পাই নাই।

বৈখানস মতের আদ্যাচার্য ঋষি অত্রি এবং মরীচি সাত্বতধর্মের প্রবর্তক সপ্ত চিত্রশিখণ্ডীর অন্যতম। নব শিষ্যের প্রবাদে ভৃগু ও কশ্যপ ব্যতীত অপর সাতজনই সপ্ত চিত্রশিখণ্ডী। উঁহারাই সাত্বতধর্মের প্রবর্তক। ঐ নয়জন ঋষি পাঞ্চরাত্রমত সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করেন। কোন্ কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় প্রদত্ত পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচীতে তাঁহাদের রচিত সংহিতার উল্লেখ আছে।[৪] তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে বৈখানসধর্ম, সাত্বতধর্ম ও পাঞ্চরাত্রধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পরন্তু ঐ অনুমান প্রকৃত না হইতেও পারে। কেননা, একই মনীষী ব্যক্তি একাধিক পরস্পর সম্বন্ধরহিত বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ততোধিক বৈখানসধর্মের, সাত্বতধর্মের এবং পাঞ্চরাত্রধর্মের ঐ আচার্যগণকে অভিন্ন মনে করিবার এক নাম-সাদৃশ্য ব্যতীত অপর কোন হেতু নাই। সুতরাং ঐ বিষয়ে অধিক কিছু কল্পনা না করাই সঙ্গত।

তবে ইহা বলা উচিত বোধ হয় যে যেমন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তেমন বৈখানসশাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রমতেরও আদ্য উপদেষ্টা ভগবান্ নারায়ণ। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন, বৈখানসমত নারায়ণ কর্তৃক বিখনসকে সংপ্রোক্ত হয়, আর পাঞ্চরাত্রমত তৎকর্তৃক সূর্যকে প্রদত্ত হয় (“সংন্যস্তং সূর্যসন্নিধৌ”) এবং সূর্য হইতে যাজ্ঞবল্ক্যাদি উহা ক্রমে সংপ্রাপ্ত হন।[৫] ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক ঐ দ্বিবিধ মত প্রবর্তনের হেতুও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভগবান্ নারায়ণ প্রথমে বৈখানসশাস্ত্র উপদেশ করেন; উহা ‘শ্রীশাস্ত্র’ এবং ‘একায়ন (শাস্ত্র)’ নামেও অভিহিত হয়[৬]; অনন্তর

> “শ্রীশাস্ত্রস্যৈব রক্ষার্থং পূজনার্থং তথাপদি।
> পাঞ্চরাত্রং পুনঃ প্রাহ শাস্ত্রং বৈষ্ণবমুত্তমম্॥”[৭]

---

১) ‘পরমসংহিতা’র প্রস্তাবনায় ধৃত ‘পারমেশ্বরসংহিতা’র বচন (৩০-১ পৃষ্ঠা)। ‘ঈশ্বরসংহিতা’র বর্ণনার সঙ্গে ইহার অনেক মিল আছে।

২) পূর্বে দেখ। আরও দেখ—“নারায়ণেনৈব সংপ্রোক্তং এতদ্বিখনসে পুরা।” (‘সমূর্তার্চনাধিকরণ’, ৭৮।২'২)

৩) যথা দেখ—‘প্রকীর্ণাধিকার’, ৩০।৬৩—৪; আনন্দসং, ৪।২৪—৭

৪) শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচী দেখ।

৫) ‘সমূর্তার্চনাধিকরণ’, ৭৮।২'২—৪'১ ৬) ঐ, ৬৫।১১৭'১ ৭) ঐ, ৬৫।১১৯; আরও দেখ—৭৮।৭

'শ্রীশাস্ত্রেরই রক্ষণার্থ, তথা আপৎকালে পূজনার্থ, (ভগবান্ নারায়ণ) পুনরায় পাঞ্চরাত্র নামক উত্তম বৈষ্ণবশাস্ত্র উপদেশ করেন।' অত্রি মহর্ষি বিখনস্‌কে, ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন,

> "বৈখানসাবতারেণ ভগবান্ সর্বেশ্বরো হরিঃ।
> শাস্ত্রং বৈখানসং প্রাহ জীবানাং মুক্তিহেতবে॥"[1]

'সর্বেশ্বর ভগবান্ হরি জীবগণের মুক্তির জন্য বৈখানসাবতারে বৈখানস শাস্ত্র উপদেশ করেন।'

প্রবর্তনের হেতু

কোন কোন মহাপুরাণে এবং উপপুরাণে পাঞ্চরাত্রমতের, তথা শৈবাদি অপর তান্ত্রিক মতসমূহের, প্রবর্তনের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, 'দেবীভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে দেবী স্বয়ং হিমালয়কে বলেন, "এই জগতে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ অপর যে নানাবিধ শাস্ত্রসমূহ আছে, তৎসমস্তই সর্বপ্রকারে তামস। বাম, কাপালক, কৌলক এবং ভৈরব আগম মোহনার্থই শিব কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে, অপর কোন কারণে নহে। যে সকল ব্রাহ্মণবর দক্ষের শাপে, ভৃগুর শাপে কিম্বা দধীচির শাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, সদা সোপানক্রমে তাঁহাদিগের উদ্ধরণার্থ ('তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা') শঙ্কর কর্তৃক শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য আগমসমূহ প্রণীত হইয়াছে।"[2] দক্ষ, ভৃগু, কিম্বা দধীচি ব্রাহ্মণদিগকে কেন শাপ দিয়াছিলেন, তাহা তথায় বিবৃত হয় নাই। কতিপয় ব্রাহ্মণের প্রতি গৌতম মুনির শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত তথায় পাওয়া যায়। আমরা কিঞ্চিৎ পরে তাহা বিবৃত করিব। ঐ বচন হইতে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য যে যাহারা বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় সোপানক্রমে বেদমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোন না কোন কারণে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই শৈব বৈষ্ণবাদি তান্ত্রিকমতসমূহ প্রবর্তিত হইয়াছিল। 'কূর্মপুরাণে' কতিপয় ব্রাহ্মণের প্রতি দধীচি ঋষি এবং গৌতম মুনির শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত আছে। কথিত হইয়াছে যে[3] দশম প্রচেতার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ গঙ্গাদ্বারে এক বিরাট যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞে দক্ষের নিমন্ত্রণে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ এবং সমস্ত মুনিগণ উপস্থিত হন। শিবের উপর দক্ষের ক্রোধ ছিল। তাই তিনি আপন যজ্ঞে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই এবং শিবও তথায় উপস্থিত হন নাই। ঐ অন্যায় দেখিয়া মহর্ষি দধীচি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে কুপিত হইয়া দক্ষ শিবের বহু নিন্দা করেন এবং বিষ্ণুর প্রশংসা করেন। দধীচি তাহার প্রতিবাদ করিলে দক্ষ আরও কঠোর নিন্দা করেন। তাঁহার সাহায্যকারী মুনিগণ উহাতে তাঁহার সমর্থন করেন;—তাঁহারাও শিবের এবং বেদমন্ত্রসমূহের নিন্দা করেন। ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা তথা হইতে অন্তর্হিত হন। অনন্তর দক্ষ ভগবান্ বিষ্ণুকে জগতের এবং শরণাগতের রক্ষক মনে করিয়া তাঁহার শরণ লইয়া নির্ভয়চিত্তে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। তখন দধীচি দক্ষের সাহায্যকারী বেদের এবং শিবের বিদ্বেষী

---

[1] 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬৫।১১৬ ; আরও দেখ—৭৮।৬

[2] 'দেবীভাগবতপুরাণ', ৭।৩৯।২৬'২—৩০

[3] 'কূর্মপুরাণ', ১।১৫।৪—৩২

ব্রাহ্মণগণকে শাপ দেন যে "তোমরা সকলে ত্রয়ীবাহ্য এবং ঈশ্বরবিদ্বেষী হইবে। ইহসংসারে ঘোর কলিকালে কলিদোষসমূহের দ্বারা পরিপীড়িত তোমরা ঐশ্বর (অর্থাৎ শৈব) মার্গের নিন্দা পরায়ণ হইয়া কুশাস্ত্রাসক্তচিত্ত, মিথ্যাধীতসমাচারী এবং মিথ্যাজ্ঞানপ্রলাপী হইবে। সমস্ত তপোবল পরিত্যাগ করত তোমরা পুনরায় নরকে যাও। হৃষীকেশ স্বাশ্রিতবৎসল হইলেও তোমাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন।[১] গৌতমের শাপের বৃত্তান্ত এই, পুরাকালে বহু গৃহস্থ মুনি পুণ্য দারুবনে ঈশ্বরারাধনার্থ বহু প্রকার তপস্যা করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে তথায় অতীব উগ্র অনাবৃষ্টি হয়। সেই কারণে সমস্ত বৃক্ষলতাদি বিনষ্ট হওয়াতে প্রাণধারণার্থ আহার সংগ্রহ করা ঐ মুনিগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া তপোনিধি গৌতম মুনির শরণাপন্ন হন এবং তাহার নিকট প্রাণধারক আহার যাজ্ঞা করেন। তিনি নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন দ্বারা সকলের পরিচর্যা করেন। তাঁহারা নিঃশঙ্কিত চিত্তে গৌতমের আশ্রমে সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। এই রূপে বার বছর অতীত হইলে পর প্রভূত বৃষ্টি হয় এবং তাহাতে ঐ প্রদেশ পূর্ববৎ বৃক্ষলতাদিপূর্ণ মনোরম হয়। তখন ঐ মুনিগণ গৌতমের আশ্রম হইতে নিজ নিজ আশ্রমে যাইতে উদ্যত হন। পরন্তু গৌতম তাঁহাদিগকে নিবারণ করেন এবং আরও কিছুকাল তাঁহার আশ্রমে যথাসুখে বাস করিতে বলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের মন ছিল না। গৌতমের বাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবে উপেক্ষা করিতেও তাহারা পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধির কোন এক উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মন্ত্রণা করিয়া যোগবলে এক অতি কৃশ ও জরাজীর্ণ গাভী সৃষ্টি করত মহাত্মা গৌতমের নিকট উপস্থিত করেন। উহাকে দেখিয়া কৃপাবিষ্ট হইয়া গৌতম উহার সংরক্ষণার্থ উহাকে আপন গোশালায় বাঁধিতে উদ্যত হন। পরন্তু তাঁহার হস্তস্পর্শমাত্রই ঐ গাভী মরিয়া যায়। তাহাতে তিনি অতি শোকাভিসন্তপ্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাহা দেখিয়া মুনিগণ তাঁহাকে বলেন, যে আপনি গোবধ করিয়াছেন। যাবৎকাল আপনার শরীরে ঐ পাপ থাকে তাবৎকাল আপনার অন্ন ভোজন করা উচিৎ নহে। সেইহেতু আমরা অন্যত্র গমন করিব।' তিনি অনুমতি দেন এবং মুনিগণ পূর্ববৎ তপস্যার্থ দেবদারুবনে গমন করেন। পরে মহর্ষি গৌতম জানিতে পারেন যে ঐ মুনিগণের মায়া দ্বারাই তাঁহাতে গোবধের লাঞ্ছন লাগিয়াছে। তাহাতে অতীব কোপান্বিত হইয়া তিনি উঁহাদিগকে এই শাপ দেন যে উঁহারা "মহাপাতকিগণের ন্যায় ত্রয়ীবাহ্য হইবেন।" ঐ শাপ বশত বেদবহির্ভূত হওত বারম্বার জন্ম-মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা "লৌকিক স্তোত্রসমূহ দ্বারা"[২] বিষ্ণু ও শিবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করেন

---

[১] 'কূর্মপুরাণে' পরে উক্ত হইয়াছে যে দেহত্যাগের পূর্বে ভগবান্ কৃষ্ণ সমুপস্থিত ভৃগ্বাদি মুনিগণকে বলেন যে কলিতে যে সকল ব্রাহ্মণ ভক্তি সহকারে বেদোক্ত বিধিতে তাঁহার অর্চনা করিবেন, তাঁহারা পরম পদে গমন করিবেন। পরন্তু যাহারা শিবের নিন্দা করিবেন তাঁহারা তথায় যাইতে পারিবেন না। শিবনিন্দকদিগের ধ্যান, যোগ, তপ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি কর্ম ক্ষিপ্র বিনষ্ট হয়। একান্তভাব আশ্রয় করত তাঁহার সম্যক্ অর্চনাকারীও যদি. শিবের নিন্দা করে, তবে নরকে যায়। দক্ষযজ্ঞে দধীচি কর্তৃক শপ্ত ব্রাহ্মণগণ কলিতে উৎপন্ন হইবে। ভক্তগণ তাহাদিগকে পরিহার করিবেক ইত্যাদি। (১।২৭।১১১—৮) আরও দেখ—১।৩০।২৭—৮

[২] "অস্তুবন্ লৌকিকৈঃ স্তোত্রৈরুচ্ছিষ্টৈরিব সর্বগৈঃ।"—(কূর্মপু, ১।১৬।১১১'২)

এবং আপনাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে প্রার্থনা করেন। তাঁহাতে তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া শিব বিষ্ণুকে তাঁহাদের পুণ্যকারক ধর্ম নিরূপণ করিতে বলেন। তখন বিষ্ণু উত্তর করেন, 'হে শঙ্কর, বেদবাহ্য পুরুষে পুণ্যের লেশও থাকিতে পারে না। কেননা, হে মহাদেব, ধর্ম বেদ হইতেই উৎপন্ন। তথাপি, হে মহেশ্বর, ভক্তবাৎসল্য হেতু, নরকে গন্তা হইলেও, ইহাদের সকলকে রক্ষা করা আমাদের উচিৎ। সেইহেতু, হে বৃষধ্বজ, বেদবাহ্যদিগের রক্ষণার্থ এবং পাপীদিগের বিমোহনার্থ[১] আমরা শাস্ত্রসমূহ (প্রণয়ন) করিব। মুরারি মাধব কর্তৃক এই প্রকারে সম্বোধিত হইয়া রুদ্র এবং শিব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কেশব, কাপাল, নাকুল (বা লাকুল), বাম, ভৈরব (পূর্বও পশ্চিম), পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, এবং অপর বহু মোহশাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করেন।[২]" অনন্তর উঁহারা ঐ ভক্তগণকে বলেন যে ঐ সকল শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে থাকিলেই কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ বহু ঘোর নরকে পড়িয়াও তদ্বলে কালে ক্ষীণপাপ হইয়া ঈশ্বরেরই প্রসাদে তাহারা সুকৃতদিগের গতি প্রাপ্ত হইবে, অপর কোন প্রকারে তাহাদের নিষ্কৃতি হইবে না। শিব এবং বিষ্ণু দ্বারা এই প্রকারে চোদিত হইয়া ঐ ভক্তগণ তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকে। পরে ঐ সকল শাস্ত্রের অনুসরণে উহারা নিজে অপর শাস্ত্রসমূহ রচনা করে এবং নানা ফল প্রদর্শন করত শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করেন।[৩]

ব্রাহ্মণদিগের প্রতি গৌতমমুনির শাপের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে 'দেবীভাগবতে'ও পাওয়া যায়।[৪] কথিত আছে এক সময়ে ১৫ বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি হয় নাই। ঐ ঘোর অনাবৃষ্টি হেতু ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। খাদ্যাভাবে বহু লোক মৃত্যুগ্রস্ত হয়। প্রতি ঘরে ঘরে মৃত দেহ পড়িয়া থাকে। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় পশু, পক্ষী, এমন কি শবও ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ দারুণ সময়ে দিক্‌দিগন্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ আপন আপন আত্মীয়, কুটুম্ব, দাস, গো, অগ্নি, অগ্নিহোত্রের দ্রব্য, প্রভৃতি সহ মহামুনি গৌতমের আশ্রমে গিয়া

---

১) অপ্পয়দীক্ষিত বলেন, "বেদবাহ্যত্বেঽপ্যন্তঃকরণশুদ্ধিমতাং রক্ষণার্থং বৈদিকত্বেঽপি মলিনচিত্তানাং বিমোহনার্থং চ" ('শিবার্কমণিদীপিকা', ২।২।৪২)

২) "ন বেদবাহ্যে পুরুষে পুণ্যলেশোঽপি শঙ্করঃ।
সঙ্গচ্ছতে মহাদেবো ধর্মো বেদাদ্বিনির্বভৌ॥
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদ্রক্ষিতব্যা মহেশ্বরঃ।
অস্মাভিঃ সর্ব এবৈতে গন্তারো নরকানপি॥
তস্মাদ্ধি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্।
বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যামো বৃষধ্বজ॥
এবং সম্বোধিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ॥
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথাঽন্যানি সহস্রশঃ॥"—(ঐ, ১।১৬।১১৫—৯)

৩) পরে বিবৃত হইয়াছে মহাত্মা গৌতমের শাপে দগ্ধ ব্রাহ্মণগণ কলিতে উৎপন্ন হইয়া হৃষীকেশের নিন্দা করিবেন । তাঁহারা বেদবাহ্যব্রতাচারী, দুরাচারী ও বৃথাশ্রমী হইবেন। নানা ফল প্রদর্শন করত সর্বজনকে মোহিত করিবেন।" (ঐ, ১।৩০।২৯—৩১)

৪) দেবীভাগপু, ১২শ স্কন্দ, ৯ম অধ্যায়।

উপস্থিত হন। গৌতম অতি শ্রদ্ধাও আদরের সহিত সকলকে আশ্রয় দেন। তিনি গায়ত্রীসিদ্ধ ছিলেন ; তাঁহার প্রার্থনায় গায়ত্রীদেবী তাঁহাকে এক পূর্ণ পাত্র প্রদান করেন। উহার নিকট যাহা চাওয়া যাইত, তাহাই পাওয়া যাইত। উহা হইতে নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন, বস্ত্র, যজ্ঞসম্ভার, প্রভৃতি লাভ.করত মহর্ষি গৌতম আপন অতিথি ব্রাহ্মণগণকে সর্বপ্রকারে সেবা দ্বারা আপ্যায়িত করিতে থাকেন। ঐ রূপে বার বৎসর অতীত হয়। গৌতমের যশ ক্রমে স্বর্গে ও মর্ত্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি দেবতাগণও তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। একদা দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া সর্বসমক্ষে বলেন যে দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে গৌতমের উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি নিজেও গৌতমের বহু প্রশংসা করিয়া চলিয়া যান। ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঐ আশ্রিত ব্রাহ্মণগণের অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া গৌতমের যশোনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে সর্বত্র সুবৃষ্টি হয় এবং পৃথিবী ধনধান্যপূর্ণ হইয়া উঠে। চারিদিক হইতে সুভিক্ষার বার্তা পাইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণ গৌতমের আশ্রম হইতে যাইতে উদ্যত হন। তখন গৌতমের অপযশ প্রচারার্থ তাঁহারা সকলে মিলিয়া মায়া দ্বারা এক অতিবৃদ্ধ ও মুমূর্ষু গাভী নির্মাণ করত উহাকে গৌতমের গোশালায় বাঁধিতে লইয়া যান। গৌতম তখন হোমে বসিয়াছিলেন, সুতরাং মৌন ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের ঐ কাণ্ড দেখিয়া তিনি হুং হুং শব্দ করিয়া তাঁহাদের ঐরূপ করিতে বারণ করেন। সেই শব্দ শুনিয়া ঐ গাভী তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। তখন ব্রাহ্মণগণ সক্রোধে বলিতে থাকেন যে "এই দুষ্ট. গোহত্যা করিয়াছে।" হোম সমাপনান্তে মহর্ষি গৌতম ঐ ব্যাপারে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং উহার কারণ চিন্তা করিতে থাকেন। তখন যোগবলে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তিনি ভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হন এবং তাঁহাদিগকে নানা প্রকার কঠোর শাপ দেন। তিনি বলেন যে তাঁহারা দেবমাতা গায়ত্রী, বেদ, বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ এবং তদ্বার্তায় সর্বদা পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণাধম হইবেন।[১] "তোমরা শ্রৌত এবং স্মার্ত সদাচারে, তথা জ্ঞানমার্গে, সর্বদা পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণাধম হও। তোমরা অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায় এবং শান্তিদান্ত্যাদি-সাধনে সর্বদা পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণাধম হও।"[২] "তোমরা শ্রীদেবী ভিন্ন অপর দেবতাসমূহে শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত এবং শঙ্খচক্রাদ্যঙ্কিত ব্রাহ্মণাধম হও। তোমরা সদা কাপালিকমতাসক্ত, বৌদ্ধশাস্ত্ররত এবং পাষণ্ডাচারনিরত ব্রাহ্মণাধম হও।"[৩] "তোমরা পাঞ্চরাত্রে, কামশাস্ত্রে, কাপালিকমতে এবং বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্রাহ্মণাধম হও।[৪] ইত্যাদি। মহর্ষি গৌতমের ঐ কঠোর শাপে ঐ ব্রাহ্মণগণ বেদরাশি ও গায়ত্রী বিস্মৃত হন। তখন তাঁহারা বহু অনুশোচনা করত মহর্ষির পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। তিনি করুণাপূর্ণহৃদয়ে বলেন যে তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবে না। কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান করিতেই হইবে। অনন্তর কলিযুগে তাঁহাদিগের পৃথিবীতে জন্ম হইবে। ঐ শাপ অনুসারে ঐ ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণের তিরোভাবের পরে কলিযুগে কুম্ভীপাক নরক হইতে নির্গত হইয়া "সন্ধ্যাত্রয়বিহীন, গায়ত্রীভক্তিবর্জিত, বেদভক্তি

---

১) দেবীভাগপু, ১২।৯।৫৬—৭ ২) ঐ, ১২।৯।৬৫—৬ ৩) ঐ, ১২।৯।৭১—২

৪) ঐ, ১২।৯।৭৫ ,

বিহীন এবং অগ্নিহোত্রাদিসৎকর্মস্বধাস্বাহাবিবর্জিত পাষণ্ডমতানুগামী হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা অব্যক্তমূলপ্রকৃতিকে কখনও জানে না। তাঁহাদের কেহ কেহ তপ্তমুদ্রাঙ্কিত, অন্যে কামাচাররত এবং অপরে কাপালিক, কৌলিক বৌদ্ধ বা জৈন হন। পণ্ডিত হইলেও তাঁহারা সকলে দুরাচার প্রবর্তক হন।”[১]

গৌতমমুনির শাপের স্থতসংহিতো’ক্ত বিবরণ,[২] অনেকটা ‘দেবীভাগবতো’ক্ত বিবরণের ন্যায়। তবে তথায় গৌতম গায়ত্রীভক্ত নহেন, শিবভক্তই। তাঁহার তপস্যার প্রভাবে, ততোধিক ভগবান্ শঙ্করের প্রসাদে গৌতমের আশ্রম সর্বপ্রকারে সুভিক্ষই ছিল। সুতরাং দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে মহাকারুণিকোত্তম তিনি সর্বপ্রকারে তাঁহাদের পর্য্যাপ্তরূপে সেবা করেন। দীর্ঘকাল তথায় সুখে বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাহারা গোঘাতক বলিয়া গৌতমকে মিথ্যা লাঞ্ছনা প্রদান করেন। ঐ ঘটনার ততোধিক বিবরণ ‘স্থতসংহিতায় নাই। যাহা হউক ব্রাহ্মণদিগের ঐ মিথ্যাভিশাপের কথা অবগত হইয়া গৌতম তাঁহাদিগকে এই শাপ দেন যে তাঁহারা মহাদেবের স্বরূপ, বিগ্রহ, ভক্তি, নাম, বিজ্ঞান’ প্রভৃতিতে পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণাধম হইবেন।[৩] তাঁহারা শান্তিদান্ত্যাদি বিজ্ঞানসাধনসমূহে, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, দান, জপ’ প্রভৃতিতে পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণাধম হইবেন ; তাঁহারা বেদভক্তিতে, আস্তিক্যে, যমাদিযোগাঙ্গসমূহে এবং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত সর্ববিষয়ে পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণাধম হইবেন।[৪] “তোমরা বিষ্ণ্বাদি সমস্ত দেবতা শঙ্কর হইতে শ্রেষ্ঠ,—এই প্রকার ভ্রান্তবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণাধম হও। তোমরা শ্রদ্ধা বশত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, দণ্ড, পাশ, অঙ্কুশ, প্রভৃতি অঙ্কিত ব্রাহ্মণাধম হও।[৫] “তোমরা পাঞ্চরাত্রে, কাপালে, কালামুখে এবং শাক্তে দীক্ষিত ব্রাহ্মণাধম হও। তোমরা বৌদ্ধ, আর্হত, পাশুপত এবং শাম্ভব মতে দীক্ষিত ব্রাহ্মণাধম হও। তোমরা সেই প্রকার অপর অশ্রৌত পাষণ্ড মার্গসমূহেও শ্রদ্ধায় দীক্ষিত ব্রাহ্মণাধম হও।”[৬]

ব্রাহ্মণদিগের প্রতি মহর্ষি গৌতমের কোপের প্রায় সেই প্রকার বর্ণনা ‘মাহেশ্বরতন্ত্রে’ পাওয়া যায়।[৭] পরন্ত তথায় শাপ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোপাবিষ্ট গৌতম ব্রাহ্মণদিগকে এই শাপ দেন যে “তোমরা স্বীয় কর্ম হেতু বেদবাহ্য ও কৃতঘ্ন হইবে। কলিতে বেদ, ব্রাহ্মণ, গো ও মন্ত্রের নিন্দাবাদ-পরায়ণ, তথা ব্রহ্মবাদ-পরায়ণ, মূর্খ হইবে। অন্তর্দুষ্ট, বহিঃস্বচ্ছ, হেতুবাদপরায়ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞত্বাভিমান বশত ধর্মকর্মবহির্মুখ হইবে। ব্রহ্ম সত্য ; জগৎ মিথ্যা ; যেহেতু জগৎ মিথ্যা সেই হেতু শুভাশুভ কর্মসমূহ করিয়া কি হইবে? এই অনুবাদ করিতে বিচক্ষণ হইবে” ইত্যাদি।[৮] কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রকারে শাপগ্রস্ত ঐ ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে পুনঃ জন্মগ্রহণ করত পামর হন এবং বেদশাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিতে থাকেন। পরন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবাদে বাচাল হন, ইত্যাদি।[৯] যাহা হউক, মাহেশ্বরতন্ত্রের মতে গৌতমের শাপের আখ্যায়িকার তাৎপর্য জগন্মিথ্যাবাদের তীব্র নিন্দা ; পাঞ্চরাত্রমতের সঙ্গে উহার কোন

---

১) দেবীভাগপু, ১২।৯।৯৩—৬

২) স্থতসংহিতা, ৪(১)।৩২।২—৪৪

৩) ঐ, ৪(১)।৩২।১৯—২৪

৪) ‘স্থতসংহিতা’, ৪(১)।৩২।২৯।৩০

৫) ঐ, ৪(১)।৩২।৩২—৩

৬) ঐ, ৪(১)।৩২।৩৯—৪১

৭) ‘মাহেশ্বরতন্ত্র’. ১৭শ ও ১৮শ পটল।

৮) ঐ, ১৭।১৮.২—

৯) ঐ, ১৭।২৭—৯ ; ১৮।৬১—২

সম্বন্ধ নাই। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে[১] 'মহেশ্বরতন্ত্রে' জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক অনেক বচন আছে, জগন্মিথ্যাবাদ উহার সম্মত। সুতরাং ঐ নিন্দাবাক্যের তাৎপর্য ভিন্ন।

দক্ষ প্রথমে বিষ্ণুভক্ত ও শিবদ্বেষী ছিলেন। শিবভক্তগণকেই তিনি বেদবাহ্য বলিয়া নিন্দা করেন এবং শাপ দেন।[২] তাঁহার অধ্বর্যু মহর্ষি ভৃগুও উঁহাদিগকে শাপ দেন।[৩] যেহেতু পাঞ্চরাত্রমতের সঙ্গে ঐ সকল শাপের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, সেইহেতু এইখানে উহাদের ইতিবৃত্ত প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, তখন তাহাতে কুপিত হইয়া শিবভক্ত মহর্ষি দধীচি দক্ষ এবং তদনুযায়ী শিবদ্বেষী বিষ্ণুভক্তগণকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, "যেহেতু দেব পরমেশ্বর তোমাদের কর্তৃক (বৈদিক যজ্ঞ হইতে) বহিষ্কৃত হইয়াছেন, সেই হেতু ঈশ্বর-বিদ্বেষী তোমরা সকলে ত্রয়ীবাহ্য হইবে। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে কলিজ (দোষসমূহ) দ্বারা পীড়িত তোমরা মিথ্যারীতিসমাচারী এবং মিথ্যাজ্ঞানপ্রভাষী (বা মিথ্যাশাস্ত্রপ্রভাষী) হইবে। তপস্যা করিয়াও তোমরা পুনঃ নরকে যাইবে। তোমাদের স্বামী হৃষীকেশও তোমাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন।"[৪] 'স্কন্দপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে শিবের অনুচরগণ কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দক্ষের স্তুতিতে শিব দক্ষের উপর প্রসন্ন হন। তখন দধীচি শিবকে তৎকর্তৃক প্রদত্ত ঐ শাপ হইতে দক্ষের এবং তৎসহচর ব্রাহ্মণগণের মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে শিব বলেন, "কলিযুগ উপস্থিত হইলে (তাঁহারা) অবশ্যই ত্রয়ীবাহ্য হইবে। পরন্তু তখন যে সকল বিপ্র বেদসমূহ পাঠ করিবে, তাহারা স্বর্গগামী হইবে। যে সকল দ্বিজ বিষ্ণু-রচিত আগমসমূহ পাঠ করিবে, তাহারাও আমার প্রসাদে স্বর্গে গমন করিবে। তাহাতে সংশয় নাই।"[৫]

শাণ্ডিল্য

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় শাণ্ডিল্য নামে পাঞ্চরাত্রমতের প্রবর্তক একজন বিশিষ্ট আচার্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণীয়াখ্যানাদি ভাগবতধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বিবৃত আচার্যপরম্পরাসমূহের মধ্যে শাণ্ডিল্যের নাম নাই। পরন্তু পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম এবং উহাদের রত্নত্রয়ের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ 'জয়াখ্যসংহিতা'য় তাঁহার নামোল্লেখ আছে। রত্নত্রয়ের অপর দুইটিতে,—'সাত্বতসংহিতা'য় এবং 'পৌষ্করসংহিতা'য় তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু উহাদের বিবর্ধন বলিয়া খ্যাত 'ঈশ্বরসংহিতা'য় এবং 'পারমেশ্বরসংহিতা'য় পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের কোন অনুক্তনামা গ্রন্থ হইতে আচার্য শঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত একটা বচন হইতে মনে হয় শাণ্ডিল্য পাঞ্চরাত্রমতের অন্যতম প্রবর্তক।[৬] যামুনরামানুজাদি অর্বাচীন পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী বৈষ্ণবাচার্যগণও সেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৭] যামুন আরও

---

১) 'বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ',

২) স্কন্দপু, ১।১।১।৩২—৩

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।২।২৭—৩২

৪) স্কন্দপু, ৭।২।৯।৯৪—৬

৫) ঐ, ৭।২।৯।১৩৭—৮

৬) ব্রহ্মসূত্র, ২।২।৪৫ (শঙ্করভাষ্য); পরে দেখ।

৭) যথা দেখ—যামুনের 'আগমপ্রামাণ্য' (৫১-২ পৃষ্ঠা); রামানুজের 'শ্রীভাষ্য', ২।২।৪২; বেঙ্কটনাথের 'পঞ্চরাত্ররক্ষা' (১ম অধিকার)। ভাস্করের 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে' (২।২।৪৩) ও সেই বচন আছে। পরে দেখ।

স্পষ্টত লিখিয়াছেন, “নারদশাণ্ডিল্য প্রমুখ পরমর্ষিগণ সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া পাঞ্চরাত্র (শাস্ত্রে) স্মৃত হইয়া থাকেন।”[১] ‘বৃদ্ধহারীতস্মৃতি’ নামক বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রেও শাণ্ডিল্য-কর্তৃক প্রবর্তিত পাঞ্চরাত্রমতের বিবরণ আছে।[২]

যাহা হউক, সর্বত্র শাণ্ডিল্য নামে একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই বোধ হয়,—ঐ নামের একাধিক ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন বোধ হয়। কেননা, ‘জয়াখ্যসংহিতা’র মতে, মহর্ষি শাণ্ডিল্য দেবর্ষি নারদের শিষ্য; তিনি নারদের নিকট হইতে ভগবান্ নারায়ণ ঋষির ভাগবতধর্মের উপদেশ লাভ করেন এবং ঔর্বাদি ঋষিগণকে উহা উপদেশ করেন; আর ‘ঈশ্বর-সংহিতা’য় বিবৃত হইয়াছে যে মহামুনি শাণ্ডিল্য তোতাদ্রি পর্বতে সুদীর্ঘ কাল তপস্যা দ্বারা ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে পরিতুষ্ট করত তাঁহা হইতে একায়ন বেদ প্রাপ্ত হন এবং সুমন্তু প্রমুখ পঞ্চশিষ্যকে উহা পড়ান।[৩] ‘পারমেশ্বরসংহিতা’য়ও সেই প্রকার বিবরণ আছে। গুরু ও শিষ্যবর্গ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয় যে ঐ দুই শাণ্ডিল্য ভিন্ন ব্যক্তি। শঙ্কর-ধৃত বচনে প্রোক্ত শাণ্ডিল্যের গুরু কিম্বা শিষ্যের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তবে তিনি নাকি চারি বেদে তত্ত্ব না পাইয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রাপ্ত হন। ‘ঈশ্বরসংহিতা’য় এবং ‘পারমেশ্বরসংহিতা’য়ও শাণ্ডিল্য সম্বন্ধে প্রায় সেই রকম উক্তি আছে। তাহাতে মনে হয় যে ঐ সকল স্থলে একই শাণ্ডিল্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রাচীন কালে শাণ্ডিল্য,—তথা শাণ্ডিল্যায়ন, নামে দুই জন স্মৃতিকার ছিলেন। স্মৃতিকার কাত্যায়ন তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[৪] কানে অনুমান করেন যে কাত্যায়ন খ্রীষ্টাব্দের ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কালে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং স্মৃতিকার শাণ্ডিল্য ঐ সময়ের পূর্বেকার লোক।[৫] তিনি এবং পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়-প্রবর্তক শাণ্ডিল্যগণের কেহ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা নিরূপণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

‘শাণ্ডিল্যস্মৃতি’ নামে একাধিক স্মৃতিগ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। উহাদের একটি নাকি ‘শাণ্ডিল্যবিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে’র ৫ম অধ্যায়।[৬] উহা ভাগবত বৈষ্ণবগণের স্মৃতিশাস্ত্র। উহার প্রারম্ভে একায়ন শাস্ত্রের প্রশংসা আছে। তাহা নাকি “সর্ববেদানামন্তঃসারং।” বেঙ্কটনাথ উহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৭]

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটি ‘শাণ্ডিল্যসংহিতা’ নামে খ্যাত। ‘ব্রহ্মপুরাণে’ এবং ‘নারদপঞ্চরাত্রে’ উক্ত আদি সাত পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে উহার নাম নাই। ‘অগ্নি-পুরাণো’ক্ত পঞ্চবিংশতি, তথা অন্যত্রোক্ত অষ্টোত্তরশত, পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে উহার

---

১) ‘আগমপ্রামাণ্য’, ৬ পৃষ্ঠা, আরও দেখ ৪৬ পৃষ্ঠা

২) ‘বৃদ্ধহারীতস্মৃতি’, ১১।১৮০—১৯২ (‘স্মৃতীনং সমুচ্চয়’, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)। পরে দেখ।

৩) পূর্বে দেখ।

৪) ‘কাত্যায়নস্মৃতি’, ১৭।২১ (জীবানন্দের ‘ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ’, ১ম ভাগ, ৬২৬ পৃষ্ঠা)।

৫) P, V, Kane, History of Dharmasastra, 1930, pp, 217—8

৬) লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানা, মুম্বাই।

৭) যথা দেখ—বেঙ্কটনাথের ‘স্তোত্ররত্নভাষ্যে’ধৃত শাণ্ডিল্যস্মৃতি-বচন ; শাণ্ডিল্যস্মৃতি, ১।৯৫.২—৯৭.১, ৫৫ শ্লোকের ভাষ্যে ধৃত ;

নাম আছে।[১] যামুন শাণ্ডিল্যের কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] শ্রেডার মনে করেন যে ঐগুলি 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র। যামুন স্বয়ং উহাদিগকে স্মৃতিবচন বলিয়াছেন।

'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় চারি জন শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়,—ব্রহ্ম-শাণ্ডিল্য, বেদ-শাণ্ডিল্য, গার্হভি-শাণ্ডিল্য ও মহর্ষি শাণ্ডিল্য। কথিত হইয়াছে যে সামবেদে যাঁহার বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে তিনি 'ব্রহ্ম-শাণ্ডিল্য'; তিনি মন্ত্রাত্মক, তথা মন্ত্রাভিমানী দেবতারূপ।[৩] বোধ হয়, সেই কারণেই তিনি 'ব্রহ্ম-শাণ্ডিল্য' বলিয়া খ্যাত হন। কেননা, 'ব্রহ্ম' শব্দের অতি প্রাচীন এক অর্থ 'বেদমন্ত্র'। বেদ-শাণ্ডিল্যও বৈদিক ঋষি; বেদের বংশ-ব্রাহ্মণে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। তিনি ত্রয়ীবিদ্যা এবং অনুত্তম ভক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।[৪] গার্হভি শাণ্ডিল্য অবৈদিক

---

১) শ্রেডারের 'পাঞ্চরাত্রসংহিতা'-সূচীর ১৭৬তম গ্রন্থ।

২) 'আগমপ্রামাণ্য', ৭৮ পৃষ্ঠা।

৩) 'শাণ্ডিল্যসংহিতা', ৪।১৬।২৬

'শাণ্ডিল্যবিদ্যা'র বিবৃতি 'সামবেদীয়' 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৩।১৪ খণ্ডে) পাওয়া যায়। 'শুক্লযজুর্বেদে'র 'শতপথব্রাহ্মণে' ও (মাধ্য, ১০।৬।৩ ব্রাহ্মণে) 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' প্রতিপাদিত হইয়াছে। উহা শাণ্ডিল্য-প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই। শাণ্ডিল্য 'অগ্নিরহস্যবিদ্যা'রও প্রামাণিক আচার্য ছিলেন। 'শতপথব্রাহ্মণে' তাঁহার মত প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। (মাধ্য, ৯।৪।৪।১৭; ৫।২।১৫; ১০।১।৪।১০; ৪।১।১১) তাঁহার অগ্নি 'শাণ্ডিল্য অগ্নি' নামে খ্যাত ছিল। (ঐ, ৯।১।১।৪৩; ৩।৩।১৮; ৫।১।৬১—৮; ইত্যাদি। ইহাও প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত মনে হয় যে 'শতপথব্রাহ্মণে'র (মাধ্যন্দিন শাখার) ৬ষ্ঠ—১০ম কাণ্ডে শাণ্ডিল্যের মতের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং অপরাপর কাণ্ডসমূহে (১—৫ ও ১১—১৪) যাজ্ঞবল্ক্যের মতের প্রামাণ্য সমধিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য-ভাগে গান্ধার, শাল্ব প্রভৃতি হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের নিবাসী জনগণের উল্লেখ আছে, আর যাজ্ঞবল্ক্য-ভাগে কুরুপাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব প্রান্তের নিবাসী জনগণের উল্লেখ আছে। তাহাতে মনে হয় শাণ্ডিল্য উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের, আর যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর-পূর্ব প্রান্তের নিবাসী ছিলেন। শাণ্ডিল্য নামে মধুবিদ্যারও একাধিক আচার্য ছিলেন। (পরে দেখ)

৪) 'শাণ্ডিল্যসংহিতা', ৪।১৬।২৭

বংশব্রাহ্মণোক্ত শাণ্ডিল্যকেই 'ভক্তিসূত্র' প্রণেতা শাণ্ডিল্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে বোধ হয়। পরন্তু বেদের বংশব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে শাণ্ডিল্য নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত অগ্নিরহস্যবিদ্যার প্রবর্তক ঋষিদিগের বংশ-ব্রাহ্মণে আছে যে শাণ্ডিল্য কুশ্রীর শিষ্য এবং বাৎস্যের গুরু। (মাধ্য, ১০।৬।৫।৯)

…—যজ্ঞবচস্—কুশ্রী—শাণ্ডিল্য—বাৎস্য—বামকক্ষায়ণ—…

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (৬।৫।৪) বিবৃত বংশব্রাহ্মণে উহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

…—যজ্ঞবচস্—কুশ্রী—বাৎস্য—শাণ্ডিল্য—বামকক্ষায়ণ—…

ঐ ব্যতিক্রম লেখক-প্রমাদ জনিত মনে হয়। 'মধুবিদ্যা'র বংশব্রাহ্মণে (শতব্রা, মাধ্য, ১৪।৫।৫।২০) আছে ভারদ্বাজ, ঔদবাহি ও শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য বৈজবাপ ও গৌতম হইতে, গৌতম বৈজবাপায়ন ও বৈষ্টপুরেয় হইতে, বৈষ্টপুরেয় শাণ্ডিল্য ও রৌহিণায়ন হইতে,·· মধুবিদ্যা প্রাপ্ত হন। তৎপূর্বেও শাণ্ডিল্য নামে একজন আচার্য ছিলেন।

…—কৌশর্য কাপ্য—শাণ্ডিল্য—বাৎস্য—গৌতম—গৌতম—মাণ্টি—আত্রেয়—…—ভারদ্বাজ

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (২।৬।১,৩; ৪।৬।১,৩) আছে,—

…—শাণ্ডিল্য—আগ্নিবেশ্য—গৌতম—শাণ্ডিল্য—কৌণ্ডিন্য—কৌশিক—…—কৌশর্য কাপ্য—শাণ্ডিল্য—বাৎস্য—গৌতম—গ্রৌতম—মাণ্টি—আত্রেয়—…

যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ডের আচার্য-পরম্পরায়ও শাণ্ডিল্যের নাম আছে। (শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।৩।২৬—৮) ঐ বংশ মধুবিদ্যার বংশের ন্যায়। এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে বংশ ব্রাহ্মণে একাধিক শাণ্ডিল্যের উল্লেখ আছে। 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় বেদ-শাণ্ডিল্য নামে উঁহাদের কাঁহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে নির্ণয় করা যায় না।

বীরবৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক ; আর মহর্ষি শাণ্ডিল্য বৈদিক বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক। কথিত হইয়াছে যে গার্ধভি শাণ্ডিল্যই জন্মান্তরে মহর্ষি শাণ্ডিল্য হন। তামস ব্যক্তিগণের মুক্তির জন্য গার্ধভি শাণ্ডিল্য বীরবৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করেন। তন্মতে অপর দেবতার আশ্রয় পরিত্যাগ করত একমাত্র বিষ্ণুরই সমাশ্রয় কর্তব্য ; কেননা, সমস্ত বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করত একমাত্র হরিতে দৃঢ়াশ্রিত হইলেই মানুষ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, অপর কোন উপায়ে নহে। সুতরাং বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের এবং তদর্থে শিখাসূত্রাদি রাখার কোন প্রয়োজন নাই। বেদ-বিরোধ হেতু ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া নরকে নিপাতিত করেন। পরন্তু পরে, ভক্ত মনে করিয়া, দয়া করত তাঁহাকে তথা হইতে সমুদ্ধৃত করেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম প্রাপ্ত হন এবং বর্ণাশ্রমধর্মপরায়ণ ও হরিভক্তি-সমাশ্রিত হন। এক সময়ে তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন[1] গমন করেন এবং বর্ণাশ্রমধর্মাভিমান হেতু জগন্নাথের প্রসাদান্ন ভোজন করা সাধু বলিয়া মনে করিলেন না। প্রসাদান্নের মাহাত্ম্যের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঐ অবহেলা হেতু তিনি পুনরায় ধিক্কার প্রাপ্ত হন। পরন্তু পরে উহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সমাদরের সহিত উহা গ্রহণ করেন। তখন তিনি "বৈদিক বৈষ্ণব" হন এবং মহর্ষি শাণ্ডিল্য নামে খ্যাত হন।[2] মহর্ষি শাণ্ডিল্য পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন।[3] কথিত হইয়াছে যে একদা তিনি তন্ময়চিত্তে জগতের নাথ গোবর্ধনধর হরির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ; এমন সময় ভগবান্ গোপালবালকগণসহ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন এবং কৃপা করিয়া স্বকীয় তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। তিনি শাণ্ডিল্যকে "পরম মন্ত্র"ও প্রদান করেন ; এবং তাঁহার প্রিয় ও অনুগৃহীত ললিতা নাম্নী তপোময়ী মুনিকন্যা হইতে আচার শিক্ষা করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। অতঃপর ললিতা দেবী স্বয়ং আসিয়া শাণ্ডিল্যকে বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দেন।[4] এইরূপে শাণ্ডিল্য ললিতা দেবীর শিষ্য হন। তিনি মহামুনি ব্যাসেরও শিষ্য হন। অনন্তর তিনি সমস্ত আগমের সারভূত 'শাণ্ডিল্যসংহিতা' রচনা করেন।[5] "ভাগবত শাস্ত্রে"র আদি প্রবক্তা নারদাদি মহর্ষিগণ।[6] চারি বেদের সারভূত, (ভগবান্ নারায়ণ) ঋষি কর্তৃক উদ্ধৃত এবং নারদ কর্তৃক পরিকীর্তিত পাঞ্চরাত্রের অন্তর্গত ও উহার সারভূত বলিয়া নিরূপিত, ভক্তিধর্মপর, তথা সমাধি-সহিত যে সাত্বত ধর্ম তাহার আধারে এবং বেদশাস্ত্রের অনুকল্পরূপে ("বেদশাস্ত্রানুকল্পেন") শাণ্ডিল্য আপন ভক্তিধর্ম প্রপঞ্চিত করেন।[7] তিনি কৌণ্ডিন্যকে এবং গর্গকে ঐ ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেন।[8] হরিলীলাতে তিনি নন্দাদিরও গুরু হন।[9] শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন যে তৎ-প্রোক্ত শাস্ত্রের প্রকৃত প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণই—"সেই বেদবপু ভূমা পুরুষই হৃদয়ে বসিয়া আমাকে এই শাস্ত্র বলিয়াছেন"[10] এবং তাঁহার সম্প্রদায় 'পুরদ্বেষীর সম্প্রদায়' ("সম্প্রদায়ং পুরদ্বিষঃ"), "ত্রিপুরারিসম্মত সম্প্রদায়"।[11]

---

১) কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন উৎকল প্রদেশের এক পুণ্যতম তীর্থ। উহাতে ভগবান্ হরি স্বয়ং ব্যক্ত আছেন। ('শাণ্ডিল্যসংহিতা', ১।৩।১৩—৬ ২) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৪।১৬।২৮—৩৪ ৩) ঐ, ১।১।১৯—

৪) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ১।৬।৩২—৮১ ৫) ঐ, ৪।১৬।৩৬ ৬) ঐ, ৪।৫।৪৭

৭) ঐ, ৪।১৬।৩৭—৩৯·১,৪৫ ; আরও দেখ—৪।১৬।১৮—৯,৫৩ ; ৪।৩।৬৬

৮) ঐ, ১।৫।১৪·১ ; আরও দেখ—৪।১৬।২২,৫৬ ৯) ঐ, ৪।১৬।৩৫

১০) ঐ, ৩।১১।৬৮·১ ১১) ঐ, ১।৫।৫, ২৮, ৩০

'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র বক্তা এবং ত্রিপুরারি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শাণ্ডিল্যের গুরু এবং শিষ্যবর্গ 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত শাণ্ডিল্যের, তথা 'ঈশ্বরসংহিতা'য় ও 'পারমেশ্বরসংহিতা'য় উক্ত শাণ্ডিল্যের, গুরু এবং শিষ্যবর্গ হইতে ভিন্ন। তাহাতে মনে হয় যে উঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। 'ঈশ্বরসংহিতা'দিতে উক্ত শাণ্ডিল্য বেদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন,—তিনি হয়ত বেদবিরোধী ছিলেন। পরন্তু 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'-কার শাণ্ডিল্য নিশ্চয় বেদ-বিরোধী ছিলেন না। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের অনুকল্প। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিয়াছেন যে উহা যে কেবল চতুর্বেদের সমান তাহা নহে, অধিকও বলিয়া সম্মত।[১] তাহা হইতে তাঁহাকে বেদবিরোধী মনে করা যায় না। কেননা, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে "যে ধর্ম শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণ, তথা প্রাচীন জ্ঞানী সদ্ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট, তাহাই সর্বদেহীর শ্রেয়স্কর"[২] "লক্ষণাগমক সহ এবং রহস্যার্থযুক্ত বেদসমূহকে যে পড়ে কিম্বা পড়ায় তাহার উপর কেশব তুষ্ট হন;"[৩] এমনকি, পদক্রম, পদাবৃত্তি, জটা, দণ্ড, ঘন, প্রভৃতি সহ একটি ঋক্ (মন্ত্র) ও যে অভ্যাস করে তাহার উপর কেশব তুষ্ট হন।"[৪] তিনি বিশেষ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচারসমূহ, যথা তুলসীমালা, শঙ্খাদিমুদ্রা, উর্ধ্বপুণ্ড্র, প্রভৃতি ধারণ শ্রুতিস্মৃত্যাদি বিহিত।[৫] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে তিনি শ্রুতিবিরোধী নহেন; শ্রুত্যনুযায়ীই ছিলেন। তাই তাঁহাকে "বৈদিক বৈষ্ণব" বলা হইয়াছে। শাণ্ডিল্যের শাস্ত্র যেমন "সমস্তনিগমাগমসারভূত", তেমন "মুরারিপদপঙ্কজভক্তিরম্য"ও।[৬] বেদে বিষ্ণু-ভক্তি নাই, কিন্তু উহাতে পূর্ণতয়া আছে। সেইদৃষ্টিতেই বোধ হয় তিনি বলিয়াছেন যে উহা বেদেরও অধিক।

অর্বাচীন বৈষ্ণবগণের মত

অর্বাচীন বৈষ্ণবগণের চারি মুখ্য সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। উহাদের প্রধানতম প্রপঞ্চয়িতা এবং প্রচার-কর্তা আচার্য রামানুজ (জন্ম ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে), নিম্বার্ক, মধ্ব (মৃত্যু ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) এবং বল্লভ (জন্ম ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে,)। উহাঁদের নাম অনুসারে ঐ চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় রামানুজ-সম্প্রদায়, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়, মধ্ব-সম্প্রদায় এবং বল্লভ-সম্প্রদায় নামে কথিত হইয়া থাকে। পরন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়িগণ মনে করেন যে তাঁহাদের সম্প্রদায় অতি প্রাচীন কালে প্রবর্তিত হয় এবং গুরু-পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে; সুদীর্ঘ-কালান্তরের প্রভাবে, তথা বিরোধিগণের আক্রমণের ফলে, উহা কথঞ্চিৎ হীনপ্রভ এবং বিরল-প্রচার হইয়া আসিলে, অর্বাচীন প্রধান আচার্য উহাকে পুনরুদ্ধার এবং পুনঃ-প্রচার করেন মাত্র, কিন্তু তিনি উহার মূল প্রতিষ্ঠাতা নহেন। সম্প্রদায়ানুমোদিত ঐ গুরু-পরম্পরাসমূহ নিম্ন প্রকার—

(১) **রামানুজ-সম্প্রদায়**—জগজ্জননী শ্রী বা লক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণু বা নারায়ণ হইতে

---

১) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৪।১৬।৪৫

২) ঐ, ৩।২।৩৫

৩) "বেদান্ রহস্যার্থযুতান্ লক্ষণাগমকৈঃ সহ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥"— (ঐ, ৩।১১।৪২)

৪) ঐ, ৩।১১।৪৩ ৫) ঐ, ৩।৫—৯ অধ্যায়।

৬) ঐ, ৩।১১।৬৬

তত্ত্বোপদেশ লাভ করতঃ সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। অনন্তর বিম্বক্‌সেনাদিপরম্পরায় রামানুজ উহা প্রাপ্ত হন।

শ্রী—বিম্বক্‌সেন—শঠকোপস্বামী—নাথমুনি—পুণ্ডরীকাক্ষ—রামমিশ্র—যামুন—মহাপূর্ণ—রামানুজ

(২) **নিম্বার্ক-সম্প্রদায়**—নিম্নে (খ) দেখ)

(৩) **মধ্ব-সম্প্রদায়**— " (ক) "

(৪) **বল্লভ-সম্প্রদায়**—

ঐ কল্পিত আদি প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে রামানুজ-সম্প্রদায় 'শ্রী-সম্প্রদায়', নিম্বার্ক-সম্প্রদায় 'চতুঃসন-সম্প্রদায়' বা 'সনকাদি-সম্প্রদায়', মধ্ব-সম্প্রদায় 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' এবং বল্লভ-সম্প্রদায় 'রুদ্র-সম্প্রদায়' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। মধ্বসম্প্রদায়িগণ 'তত্ত্ববাদী' নামেও অভিহিত হন। 'সৌরউপপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে যেহেতু তাহারা বলে যে এই সংসার তত্ত্বই,—উহা সত্যই, সুতরাং কখনও বাধিত হয় না, সেইহেতু তাঁহারা 'তত্ত্ববাদী' নামে খ্যাত।[১]

'শাণ্ডিল্য-সংহিতা'য় ভক্তিধর্ম ও ভক্তিশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতে ভক্তি সম্প্রদায় প্রবর্তক-ভেদে চারিটি—ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, বিষ্ণু-সম্প্রদায়, শঙ্কর-সম্প্রদায় এবং পুরদ্বেষী-সম্প্রদায়। ব্রহ্মাদি প্রবর্তকত্রয় মূলত মহাবিষ্ণু হইতে ভক্তিধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন।[২] আর ত্রিপুরারি কৃষ্ণ হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হন। উহাদের শাখা উপভেদও আছে।

(১) **ব্রহ্মসম্প্রদায়**—ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বা "ব্রাহ্মীভক্তি"র দুই শাখা।

(ক) কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ মহাবিষ্ণু প্রথমে ব্রহ্মাকে ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যা করেন।[৩] ব্রহ্মা হইতে বশিষ্ঠ উহার উপদেশ লাভ করেন। অনন্তর শক্তি, পরাশর, ব্যাস পরম্পরাক্রমে মধুনামক প্রভঞ্জন উহা প্রাপ্ত হন। ঐ ভক্তিবিদ্যা 'মধুবিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। পূর্বে দধীচি মুনিও উহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রভঞ্জন জগতে উহা বহু প্রচার করেন। কর্ণাটক, দ্রাবিড়, আন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র, উৎকল, শূরসেন, ও মাথুরে, উহা "প্রাধান্যত ব্যাপৃত" হয়। ব্যাসরাজ্য, উডুপ, কমলাবন,, হরিস্থান, কুলাদ্রি ও বরসিন্ধুকে সেই ভক্তি সাধুগণকে আনন্দ প্রদান করে।[৪]

আচার্য মধ্ব বায়ু বা প্রভঞ্জনের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারই অপর নাম মধু। তিনি ভগবান্ ব্যাসদেব হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং এই বিবরণ মধ্ব-সম্প্রদায়েরই।

(খ) কথিত হইয়াছে যে অনন্তর কোন সময়ে সনকাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রচতুষ্টয় তত্ত্ববিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া আপন পিতার সন্নিকটে উপস্থিত হন। ব্রহ্মা তত্ত্বোপলব্ধির জন্য

---

[১] "তত্ত্বং সংসার ইত্যেব ন বাধ্যঃ সত্য এব হি।
বদত্যতত্তত্ত্ববাদী মিথ্যাবাদী স উচ্যতে॥" —(সৌরপু, ৪০।৫২)

[২] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা', ৫ম খণ্ড, ১।৩।৮১ ; ১।৪।১

[৩] ঐ, ২।৪।২৩—৯

[৪] ঐ, ১।৪।৩৪—৪৩

ভগবান্ (মহা)বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। (মহা)বিষ্ণু হংসরূপ ধারণ করতঃ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া “সুদুর্লভ ভক্তিযোগ” উপদেশ করেন।[১] পরে ব্রহ্মা সনকাদিকে উহা শিক্ষা দেন। নারদ তাঁহাদের নিকট হইতে উহা যথার্থরূপে প্রাপ্ত হন। নারদ আদিত্যকে এবং আদিত্য ঊর্ধ্বরেতা মুনিগণকে উহা ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা উহাকে বহুপ্রকারে বিস্তার করত মথুরাপ্রদেশে স্থাপন করেন।[২]

আদিত্য বা ভাস্কর নিম্বার্কেরই পূর্ব নাম। তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট ভক্তিধর্মের উপদেশ লাভ করেন। সুতরাং ইহা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়।

(২) **বিষ্ণু-সম্প্রদায়**—বিষ্ণুর সম্প্রদায়ের (“বিষ্ণোঃ সম্প্রদায়ং”) বা “নারায়ণী ভক্তি”রও একাধিক শাখা আছে। কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু-সম্প্রদায় বেদ ও পঞ্চরাত্র সম্মিত। পুরাকালে শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসাগরশায়ী ভগবান্ মহবিষ্ণুকে পরম ভক্তি সহকারে সমারাধনা করতঃ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, মুনিগণ ও তপোধনগণ ঋগাদিবেদচতুষ্টয়, সমস্ত উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ, প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের সারভুত হরির প্রিয় “পঞ্চরাত্রাখ্য রহস্য” প্রাপ্ত হন। সুদীর্ঘ কালান্তরে মনুষ্যগণের দুরদৃষ্টবশত মহাভাগবত উপরিচরের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিলুপ্ত হয়। (ক) দ্বাপর যুগের অন্তে[৩] মহাভাগ নারদ বিষ্ণুকে আরাধনা করতঃ ঐ শাস্ত্র পুনরায় প্রাপ্ত হন। তিনি উহা পুনঃ প্রচার করেন। ভীষ্ম, তথা অপরে, নারদ হইতে উহা প্রাপ্ত হন।[৪] এতাবন্মাত্র বিবরণ হইতে জানা যায় যে উহা ‘মহাভারতে’র নারায়নীয়াখ্যানে বিবৃত “পঞ্চরাত্রানুশব্দিত মহোপনিষৎ”ই। (খ) যাহা হউক, কথিত হইয়াছে যে নারদের পূর্বে, মহর্ষি কর্দম ভগবান্ মহাবিষ্ণুকে উপাসনা করত উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্দম হইতে কপিল এবং কপিল হইতে দেবহুতি, অনসূয়া প্রভৃতি উহা প্রাপ্ত হন।[৫] তদনুসারে উপাসনা করত দেবহুতি প্রভৃতি দেহান্তে “নারায়ণান্তিকে গমন করেন।”[৬]

(গ) পূর্ণকাম এবং সমভাবে বর্তনশীল হরির দেবহুতি প্রভৃতির প্রতি সমধিক প্রীতি এবং সমাদর দেখিয়া কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে হরি তাঁহার নিকট উহার রহস্য বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া বলেন যে, “সর্বপ্রমাণ (শাস্ত্র)সমূহের যে বেদসম্মিত দিব্য রহস্য” তিনি মহাত্মা নারদকে

---

১) ঐ, ১।৪।৪৫—৮ কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে প্রথমবারে “অনুত্তম ভক্তিযোগ” “সংক্ষেপত” উপদেশ করেন, পরে হংসরূপ ধারণ করত বিস্তারিত রূপে (“বিস্তরেণ”) উপদেশ করেন (১।৪।২৩)

২) ঐ, ১।৪।৪৯—৫১

৩) মূলে আছে, “অধুনা” অর্থাৎ শাণ্ডিল্যের সময়ে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে শাণ্ডিল্য দ্বাপর যুগের অন্তে ভগবান্ কৃষ্ণের সমকালে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং ‘অধুনা’ অর্থ ‘দ্বাপর যুগের অন্তে’

৪) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৫ম খণ্ড, ১।৪।৪৩—৬০

৫) কিঞ্চিৎ পরে বিষ্ণু কমলাকে বলেন যে দেবহুতি প্রভৃতি নারদ হইতে “পঞ্চরাত্ররহস্যাখ্য তাঁহার সুদুর্লভ যোগ” প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে উপাসনা করত তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন। (ঐ, ১।৪।৭২—৪)

৬) ঐ, ১।৪।৬১

উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই, অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ সহিত তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন। বিরজা-তটে ঐ মহামন্ত্র জপ করতঃ কমলাদেবী হরির বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি আপন সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। প্রথমে তিনি প্রসাদিত হইয়া বিষ্কক্সেনকে, পরে নন্দ, বিমল, প্রহ্লাদ, বিবস্বান ও পুণ্ডরীককে, উহার উপদেশ প্রদান করেন। বিষ্বক্সেন মহাত্মা অগস্ত্যকে, তথা অপর কয়েকজনকে, উহা প্রদান করেন। অগস্ত্য ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রমিতি, জৈগীষব্যযোগী, পরাভূতিযোগী, এবং মহাভূতিযোগীকে উহা উপদেশ করেন। দ্রাবিড়, পাণ্ড্যদেশ, কাবেরী, সহ্যাদ্রি, অহোবল, ব্যাঙ্কট (পর্বত) শ্রীরঙ্গ, মলয়াচল, কাঞ্চী, কূর্মাচল, পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, প্রভৃতি স্থানে মহাত্মাগণ আবির্ভূত হইয়া এই "রমাভক্তি স্বানুরূপত বহুধা" প্রচার করেন।[1]

এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে ইহা আধুনিক শ্রীসম্প্রদায়ই। আরও জানা যায় যে শ্রীসম্প্রদায় পাঞ্চরাত্রমতানুগত,—বিষ্ণুসম্প্রদায়েরই উপশাখাবিশেষ।

(৩) **শঙ্কর-সম্প্রদায়**—ভগবান্ শঙ্কর দেবরাজ ও পরাশরি মুনিকে "সত্যধর্ম নামে খ্যাত শ্রীপতি-ভক্তি উপদেশ করেন। ব্রহ্মা, শুক ও সনকাদি যাহা যথাযথ জানেন, তাহাই শঙ্কর দেবতাদিগকে জানাইয়াছিলেন।[2] শঙ্কর-সম্প্রদায়ের "শাঙ্করীভক্তি"র অধিক বিবরণ 'শাণ্ডিল্য-সংহিতা'য় নাই।

(৪) **পুরদ্বেষী-সম্প্রদায়**—"পুরদ্বেষী" বা ত্রিপুরারি ভগবান্ শঙ্করেরই নামান্তর। পরন্তু শাণ্ডিল্য অতি পরিষ্কাররূপে নির্দেশ করিয়াছেন এই পুরদ্বেষী-সম্প্রদায় ("সম্প্রদায়ং পুরদ্বিষঃ")[3] উক্ত শঙ্কর-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন।[4] কথিত হইয়াছে যে নারায়ণী ভক্তি কৃতযুগে, ব্রাহ্মী ভক্তি ত্রেতাযুগে এবং শাঙ্করী ভক্তি দ্বাপরযুগে মুনিগণ কর্তৃক সমুপাসিত হয়। নারায়ণী ভক্তি সাত্ত্বিক, ব্রাহ্মী ভক্তি রাজস, ও শাঙ্করী ভক্তি তামস,[5] আর পুরদ্বেষী-ভক্তি নির্গুণ।[6] পুরদ্বেষী-সম্প্রদায়কে "তার্তীয়" সম্প্রদায়ও বলা হয়।[7] উহা "ত্রিপুরারিসম্মত সম্প্রদায়।"[8] ঐ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি শাণ্ডিল্য এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন,—একদা ভগবান্ শঙ্কর গোকুল-মণ্ডলে গমন করেন। তথায় রম্য বৃন্দাবনে সচ্চিদানন্দমন্দিরে ত্রিভঙ্গললিত, কোটিমন্মথসুন্দর, বেণুধর, ব্রজস্ত্রীগণসেবিত এবং শ্রুতিগণ ও মুনিগণ দ্বারা সেব্য আনন্দচিত্তে সেব্যমান দেবকে প্রণাম করতঃ "জগতের সমুদ্ধরণার্থ—সম্প্রদায় লাভের উদ্দেশ্যে" সামগান দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। তথায় সমুপস্থিত ব্যক্তিগণের অনুগ্রহে প্রসন্নাত্মা ভগবান্ তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন। সেই পরমলাভ প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বধামে প্রত্যাবর্তন করতঃ পরমানন্দসংমগ্ন হইয়া দিগম্বরবেশে নৃত্য করিতে থাকেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে পরিতুষ্ট করতঃ উহা লাভ করেন এবং ব্যাসকে প্রদান করেন। ব্যাস নিজ পুত্র ব্রহ্মরাতকে উহা ব্যাখ্যা করেন। শাণ্ডিল্য কৌণ্ডিন্যকে এবং মহাত্মা গর্গকে উহা উপদেশ করেন। অনন্তর কলিকাল আরম্ভ হইলে এই

---

[1] 'শাণ্ডিল্যসংহিতা', ৫ম খণ্ড, ১।৪।৬২—৮৬'১ ; ১।৪।৮৬'২—৯৪ শ্লোকে রমাভক্তির ও তদনুযায়ী ভক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

[2] ঐ, ১।৪।৯৫—৯৮'১

[3] ঐ, ১।৫।৫'১, ২৮'১

[4] ঐ, ১।৫।১—

[5] ঐ, ১।৪।৯৯—১০৩

[6] ঐ, ১।৫।৪, ২২'১

[7] ঐ, ১।৫।৬—

[8] ঐ, ১।৫।৩০

পরাভক্তি বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নির্বাহিত হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকে; পরে লুপ্তপ্রায় হয়। বহুদিন পরে মহাপুরুষগণ দ্বারা উপভাবিত হইয়া, স্বয়ং শ্রীপতি হরির অনুগ্রহে মথুরামণ্ডলে, গোকুলে, ও গোবর্ধন গিরিতে উহা প্রাদুর্ভূত হয়। তথায় সম্প্রদায়রক্ষার্থ সর্বশ্রুতিবিশারদ এবং সুমহাতেজসম্পন্ন এক "ভগবদ্বদনোদিত মহাত্মা" প্রাদুর্ভূত হন। যোগীশ্বর যোগী (শঙ্কর) তাঁহাকে সম্প্রদায় ব্যাখ্যা করেন এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ (কৃষ্ণ) তাহাকে নিজধর্ম উপদেশ করেন। তিনি গোকুলধামে গমন করতঃ ভক্তি সম্বর্ধন করেন এবং অনন্তর গিরিরাজে গিয়া একান্তসংশ্রয় মহাত্মাগণসহ "নির্গুণভক্তিমার্গ" বৃদ্ধি করতঃ বিচরণ করেন। এই ত্রিপুরারিসম্মত সম্প্রদায় ব্রজদেবতা হরির অনুগ্রহীত এবং বেণুগৃহীতবেদ দ্বারা আবির্ভূত হয়।

বিষ্ণুস্বামী ও বিষ্ণু মহামুনি

মুদ্রিত 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় বিষ্ণুস্বামী এবং বিষ্ণু মহামুনি নামে দুইজন বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তকের এবং তাঁহাদের ধর্মমতের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে বৌদ্ধগণের ভীষণ আক্রমণে বৈদিকধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাগণের ও ঋষিগণের প্রার্থনায়, কাবেরী নদীর তটে বিষ্ণুর[1] সন্নিকটে অবতার গ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুস্বামী নামে খ্যাত হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই মহামতি ছিলেন। তিনি ব্যাস মুনিকে গুরু করত তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বাগম এবং পরমমন্ত্র লাভ করেন। তিনি হরির (বা কৃষ্ণের) সমান জ্ঞাতা এবং ব্রতী ছিলেন।[2] কলিকালে "বৈদিকধর্ম" রক্ষার্থ তিনি "প্রথম আচার্য হন।[3] বৈদিকধর্ম স্থাপন করিয়া তৎপরে তিনি পুনরায় অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের ভক্তির ধর্ম ("ভক্তিধর্মঞ্চ দেবানামধিকারভিদা পুনঃ") স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং হরিকে ভক্তি করিতেন; নিজ শিষ্যবর্গকে দিয়া হরিভক্ত করাইতেন; এবং লোকে তাহা প্রচার করেন। এইরূপে বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রবর্তিত উপধর্ম নিবর্তন করত এবং "হরির সম্প্রদায়" প্রবর্তন করতঃ তিনি অদ্ভুত আচরণ করেন।[4] মহারাজা জনমেজয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাহাতে সমাগত মুনিগণ পরামর্শ করিয়া কলিতে যে যে ধর্ম পালন কর্তব্য এবং যাহা যাহা পরিত্যাগ কর্তব্য বলিয়া নিরূপণ করেন বিষ্ণুস্বামী বৌদ্ধ আক্রমণে বিলুপ্তপ্রায় সেই সকল পুনরুদ্ধার করেন এবং স্বয়ং তথা শিষ্যপ্রশিষ্যগণদ্বারা পুনঃ প্রচার করেন।[5] এইরূপে বৈদিকধর্ম প্রবর্তিত করিয়া এবং বৌদ্ধধর্ম নিবর্তিত করিয়া বিষ্ণুস্বামী হরির পদে গমন করেন।[6]

বিষ্ণু মহামুনি বিষ্ণুস্বামীর বহুকাল পরে প্রাদুর্ভূত হন। কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণুস্বামী যে বৌদ্ধধর্ম নিরস্ত করেন উহার প্রবর্তক "জিনসুত বুদ্ধ"। কলিকালে বৈদিকধর্মহিংসাপ্রায় ও

---

১) 'বিষ্ণু' নামে খুব সম্ভবত কাবেরী-তটবর্তী শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ ভগবানকে মনে করা হইয়াছে।

২) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৫ম খণ্ড (ভক্তিখণ্ড), ৪।১৪।১৭—৯

৩) কথিত হইয়াছে যে জীবগণ প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ—দেব, দানব ও মানব। তাহাদের ধর্ম যথাক্রমে বৈদিক, অবৈদিক ও মিশ্র। বিষ্ণুস্বামী ঐ বৈদিকধর্মের প্রথমাচার্য হন। (ঐ, ৪।১৪।২২-৩)

৪) ঐ, ৪।১৪।২৩—৬ ৫) ঐ, ৪।১৪।২৭, ৬৭ ৬) ঐ, ৪।১৫।১

নিষ্ঠুরতাপূর্ণ, সুতরাং পশুগণের দুঃখপ্রদ, যজ্ঞবহুল হইয়া পড়িলে ভগবান্ বিষ্ণু পশুদিগকে পরিত্রাণার্থ "জিনসুত বুদ্ধ" রূপে অবতার গ্রহণ করেন। তিনি জনগণকে হিংসাপ্রায় বেদধর্ম হইতে প্রচ্যুত করতঃ নিজধর্মে প্রবর্তিত করেন।[1] "নিজবুদ্ধিকৃত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা এবং দুর্জয় তর্কবিভ্রম দ্বারা, তথা বাচাল শিষ্যবর্গ দ্বারা, বৌদ্ধগণ বৈদিকগণকে পরাভূত করেন।[2] আচার্য বিষ্ণুস্বামী ঐ বৌদ্ধধর্ম নিরস্ত করেন। শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন এবং রাণী মায়াদেবীর পুত্র শাক্যসিংহ তাঁহার অন্তর্ধানের পরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের উপদেশে তিনি বাল্যবয়সে ভিক্ষুধর্মে প্রবৃত্ত হন এবং পরে "মহাবুদ্ধ" বলিয়া খ্যাত হন।[3] তিনি কষ্টতপোময় নিজধর্ম" প্রবর্তিত করেন এবং স্বয়ং, তথা শিষ্যপ্রশিষ্যগণ দ্বারা, বেদধর্ম নিরাকৃত করেন। তাঁহার প্রচারের ফলে বেদ প্রভাতে তারকার ন্যায় বিলুপ্ত হয়,—বেদধর্ম তেমন বিরল হয়, যেমন সিংহের আগমনে মৃগ। সম্রাট অশোক ঐ "তথাগতমতে"র অনুগামী হয় এবং তাঁহার অনুশাসনে সমস্ত প্রজা ঐ মত গ্রহণ করেন।[4] কথিত হইয়াছে যে প্রথমে রাজস্বামী নামে জনৈক আচার্য ঐ নবীন বৌদ্ধগণকে পরাভূত করেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্তার্য গৌড়পাদের প্রশিষ্য এবং আচার্য গোবিন্দপাদের প্রথম শিষ্য আচার্য বেদদর্শনের শিষ্যপ্রশিষ্যান্বয়ে, সুতরাং উহাঁদের অনেক পরে, বর্তমান ছিলেন। তিনি রাজাগণের দ্বারা সমস্ত "সুগতগণকে" নির্জিত করতঃ দেশ হইতে নিষ্কাসিত করেন। পরন্তু তাঁহারা ছল দ্বারা আগমন করতঃ দেশে প্রবেশ করেন। তখন কুমার (অর্থাৎ কুমারিল ভট্ট), অপর দেবগণ সহ, অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করত সন্মার্গ স্থাপন করেন।[5] "ষট্‌শতাধিক ত্রিসহস্রঅব্দ গতে শাক্যদিগের পরাভব সমারব্ধ হয়।"[6] ঐ সময় গণনা কখন হইতে আরম্ভ হয়, তাহা স্পষ্টত উল্লিখিত না হইলে প্রকরণ আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায় যে উহা কল্যব্দই। সুতরাং রাজস্বামী ৩৬০০ কল্যাব্দ (= ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) বৌদ্ধগণকে পরাভূত করেন বোধ হয়। যাহা হউক, কুমারিল ভট্টের পরে, "(আচার্য) শঙ্কর,—(যিনি) বাসুদেবাংশসম্ভূত শঙ্কর স্বয়ং, হরিভক্তি এবং বৈরাগ্য, তথা বৌদ্ধদিগকে এবং পাষণ্ডীদিগকে জয় করিতে পাষণ্ডীদিগের সংবিৎ-নির্গুণব্রহ্মবাদ এবং আত্মা বিনা (অপর সমস্ত বস্তুর) মিথ্যাবাদ স্থাপন করেন। বৌদ্ধগণ এবং অপর পাষণ্ডিগণ তৎকর্তৃক বিদ্যা এবং বল দ্বারা বিদ্রাবিত হইয়া দিগন্তরে বর্তমান থাকেন। বৈদিক মার্গ স্থাপিত হইলে পর তিনি (অবৈদিক) অপর সকলকেও (যথা) আগমে আসক্ত ব্যক্তিগণকে বিশেষত শিবভক্তগণকে, বৈদিক করেন। তাহাতেও হরিভক্তগণের (মনে) বহু দুঃখ হয়। উহা নিবারণার্থ বিষ্ণু মহামুনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।[7]

এইরূপে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে বিষ্ণু মহামুনি আচার্য শঙ্করের পরাক্‌কালীন—যদিও কতকাল পরের তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; আর বিষ্ণুস্বামী তাঁহার বহু প্রাক্‌কালীন—আচার্য গৌড়পাদ, এমন কি শাক্যসিংহ বুদ্ধ, অপেক্ষাও প্রাচীন। সুতরাং ভিন্নকালীন বলিয়া

---

১) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৪।১৪।১০।৪

২) ঐ, ৪।১৪।১৬ ৩) ঐ, ৪।১৫।২-৩ ৪) ঐ, ৪।১৫।৭-১০ ৫) ঐ, ৪।১৫।২৪-৬

৬) ঐ, ৪।১৫।২৭

৭) 'শাণ্ডিল্যসংহিতা' ৫ম খণ্ড, ৪।১৫।২৮—৩২

বিষ্ণুস্বামী ও বিষ্ণু মহামুনি ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহাদিগকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্ণয় করিবার অপর প্রকৃষ্ট হেতু এই যে উঁহাদিগের প্রত্যেকের ধর্মমত কতকটা ভিন্ন ভিন্ন। উভয়েই অবশ্য হরিভক্ত ছিলেন এবং হরিভক্তি প্রচার করেন। পরন্তু উভয়ের হরিভক্তি কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কেননা, কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু মহামুনি আগমে আসক্ত জনগণকে, তথা পঞ্চদেবতার্চনে রত ভক্তগণকে, পরাভূত করত ভূতলে "বিশুদ্ধা বৈষ্ণবী ভক্তি" প্রচার করেন।[১] পক্ষান্তরে, বিষ্ণুস্বামী নিজে হরিভক্ত হইলেও তৎপ্রচারিত ভক্তিধর্ম কেবল হরির ভক্তিমাত্র নহে। তন্মতে লোক আপন আপন অধিকার অনুসারে শিবাদি অপর কোন না কোন দেবতার ভক্তিও করিতে পারে। বৌদ্ধাক্রমণে লুপ্তপ্রায় যে প্রাচীন বৈদিক ধর্মকে তিনি পুনরুদ্ধার ও প্রচার করেন, তন্মতে "কেশবের, শিবের, কিম্বা (অপর) যে কোন দেবতার ঐকান্তিকভাবে ভজন স্বীয় ধর্ম বলিয়া হিতেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্তৃক (মনে) কর্তব্য।"[২] ঐ দেবতাভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে স্বস্থত্রোক্ত শ্রৌত এবং স্মার্ত সমস্ত ক্রিয়াকর্মাদিও যথাশক্তি করিতে হইবে।[৩] যাহারা নির্ধন, নির্বিঘ্ন কিম্বা রুগ্ন কেবল তাহারাই, অসমর্থ বলিয়া, ঐ সমস্ত ক্রিয়াকর্মাদি না করিয়াও সদা হরিকে ভজনা করিতে পারে। পরন্তু যাহারা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দর্পবশত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মাদি পরিত্যাগ করে, তাহারা সিদ্ধি লাভ করে না, বরং কষ্টই প্রাপ্ত হয় এবং বহুশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়।[৪] এই সকলের বিবেচনা হইতে মনে হয় যে বিষ্ণুস্বামী স্মার্ত বৈষ্ণব, আর বিষ্ণু মহামুনি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ছিলেন।

'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় ইহা বিশেষভাবে নির্দেশিত হইয়াছে যে বিষ্ণুস্বামীর, তথা বিষ্ণু-মহামুনির, বিষ্ণুভক্তি সম্প্রদায় পূর্বোক্ত রমা-সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায় এবং পুরদ্বেষী-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন।[৫] পূর্বোক্ত বিষ্ণু-সম্প্রদায় ("বিষ্ণোঃ সম্প্রদায়ং") হইতেও বিষ্ণুস্বামীর হরিসম্প্রদায় ("সম্প্রদায়ং হরেঃ") ভিন্ন।[৬]

ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে বিষ্ণুস্বামী, বিষ্ণুমহামুনি এবং বৌদ্ধাদি সম্পর্কিত মুদ্রিত 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র উপরোক্ত বিবরণ কতটা প্রকৃত তথ্যমূলক, সুতরাং কতটা বিশ্বসনীয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। উহার যথাশ্রুতার্থে সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় হওয়ার প্রধান কারণ এই যে তত্রোক্ত বিষয়ের উল্লেখ অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না; ততোধিক কোন কোন গ্রন্থে তাহা হইতে ভিন্ন কিম্বা তাহার বিরোধী উক্তিও পাওয়া যায়। সেই হেতু ঐ বিবরণকে প্রাচীন কিম্বদন্তী-মূলক বলিয়া গ্রহণ করিতেও সংশয় হয়। অথবা যদি তদ্রূপই হয়, তবে সেই কিম্বদন্তীকে সর্ববাদী-সম্মত বলিয়া মনে করা যায় না।

বিষ্ণুস্বামী নামে একাধিক প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যের সম্ভাবের প্রমাণ অধুনা পাওয়া যায়।

---

১) ঐ, ৪।১৫।৩৩ কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণু মহামুনি অগস্ত্যের (আর 'আগস্ত্য' পাঠ ধরিলে, অগস্ত্যের মতানুযায়ী জনৈক শিবযোগীর) কোপে দেহত্যাগ করেন।

"বৌদ্ধান্ বিজিত্য শান্তাত্মা গন্তাগস্ত্যঞ্চ তদ্রুজা।
স্বশিষ্যেভ্যো নিজাম্নায়ং দত্ত্বা নিজপদং তথা॥"—(ঐ, ৪।১৫।৩৪)

২) শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৪।১৪।২৯ ৩) ঐ, ৪।১৪।২৮ ৪) ঐ, ৪।১৫।৫০-১ দেখ—গীতা, ১৬।২৩

৫) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ৪।১৫।৩৫—৬ দেখ। ৬) ঐ, ৪।১৪।২৬'২'

‘গর্গসংহিতা’র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগের বিক্রমসংবৎসরের চারি জন ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-প্রবর্তকের অন্যতম ; অপর তিন জন রামানুজ, মধ্ব এবং নিম্বার্ক। তিনি “বামনাংশ”,—ভগবান্ বামনই “ধর্মার্থহেতু” কলিকালে বিষ্ণুস্বামীরূপে প্রাদুর্ভূত হন।[1] কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে যে “কলিতে ৪৫০০ অব্দ গতে (গোবর্ধন) গিরিবরে শ্রীনাথ প্রাদুর্ভূত হইবেন। রবির তনু বিষ্ণুস্বামী ব্রজে তাঁহার পূজা করিবেন। বল্লভাদি অপর গোকুল-স্বামিগণ তাঁহার শিষ্য।”[2] এই দুই উক্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি আছে, যেহেতু প্রথম বচনে আছে যে বিষ্ণুস্বামী “বামনাংশ”, আর দ্বিতীয় বচনের মতে তিনি “রবির তনু”। তথাপি ‘গর্গসংহিতা’ হইতে বিষ্ণুস্বামীর সম্ভাব-কালের ঐতিহাসিকতা অঙ্গীকার করিলে ইহা পাওয়া যায় যে তিনি ৪৫০০ কল্যব্দ বা ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কেননা, আচার্য বল্লভ ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। নাভাদাসের (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) ‘ভক্তমালে’ও সেই প্রকার বিবৃত হইয়াছে যে বিষ্ণুস্বামী, তথা রামানুজ, মধ্ব এবং নিম্বার্ক, কলিযুগে ভাগবতধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করেন,—যেন চতুর্ব্যূহ কলিযুগে প্রকট হইয়াছেন।[3] উহাতে আরও আছে যে সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র সন্ত জ্ঞানদেব বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। জ্ঞানদেবের দুই শিষ্য—নামদেব ও ত্রিলোচনদেব। আচার্য হরিদাস এবং বল্লভ উহাদের মার্গানুযায়ী।[4] জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে আপনার সুপ্রসিদ্ধ ‘জ্ঞানেশ্বরী’ নামক ‘গীতা-টীকা’ রচনা করেন এবং ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। নামদেব ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ‘ভক্তমালে’র ঐ উক্তি যদি সত্য হয়, তবে তদুক্ত বিষ্ণুস্বামীকে ঐ সময়ের প্রাক্কালীন ব্যক্তি মনে করিতে হইবে। পরন্ত ‘ভক্তমালে’র ঐ বচনের এক অংশে সংশয়ের হেতু আছে। কেননা, উহাতে আছে, বিষ্ণুস্বামী আধুনিক ভাগবতধর্ম-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা-চতুষ্টয়ের অন্যতম এবং জ্ঞানদেব বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্ণব। পরন্ত ইহা অতি প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানদেব নাথ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহার বড়ভাই নিবৃত্তিনাথের শিষ্য। নিবৃত্তিনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রশিষ্য এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য গহিনীনাথ বা গৈনীনাথের শিষ্য। নিবৃত্তিনাথ এবং জ্ঞানদেব উভয়েরই লেখা হইতে তাহা জানা যায়।[5] ‘ভক্তমালে’র উক্তির সত্যতা রক্ষার জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে বৈষ্ণবদিগের রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামী প্রকৃত পক্ষে নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যেন্দ্রনাথই। কেননা, ভগবান্ বিষ্ণুই ক্ষীরসাগরের তরঙ্গের মধ্যে এক মৎস্যের পেটের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া তীরে ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক পার্বতীকে উপদিষ্ট রহস্য জ্ঞান শুনিয়াছিলেন এবং পরে এক কুমার রূপে প্রাদুর্ভূত হন, তথা মৎস্যেন্দ্রনাথ

---

[1] গর্গসং, ১০।৬১।২৩—৬ (পূর্বে পাদটীকায় ধৃত)।

[2] ঐ, ১০।৬২।২৯—৩০

[3] ‘ভক্তমাল’, ২৮-৯ মূল ছপ্পয়।

[4] ঐ, ৪৮ ছপ্পয় এবং উহার টীকা দেখ।

[5] দেখ—‘শ্রীজ্ঞানেশ্বরচরিত্র’, লক্ষ্মণ রামচন্দ্র পাঙ্গারকর বিরচিত, লক্ষ্মণ রামচন্দ্র গর্দে কর্তৃক হিন্দি ভাষান্তরিত, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ৬৫, পৃষ্ঠা।

নামে খ্যাত হন। ঐ মতের সমর্থনে ইহা বলা হয় যে মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, 'গোরক্ষকিমিয়াগার' নামক স্ববিরচিত গ্রন্থে তাঁহাকে "মহাবিষ্ণু সাঁই" বলিয়াছেন।[১] পরন্তু ঐ কিম্বদন্তীর সত্যতা অঙ্গীকার করিলেও এবং বিষ্ণুস্বামী মৎস্যেন্দ্রনাথের মত গ্রহণ করিলেও নাথ-সম্প্রদায়ের এবং রুদ্র-সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে এত পার্থক্য আছে যে উভয়ের প্রতিষ্ঠাতা অভিন্ন মনে করা যায় না। নাথ-সম্প্রদায়ের নিবৃত্তিনাথ-জ্ঞানদেবের শাখা বৈষ্ণব হইলেও অপর শাখা শৈব।[২]

বল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র বিট্ঠলের শিষ্য গদ কর্তৃক বিরচিত 'সম্প্রদায়-কুলদীপিকা'র মতে, বিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজার, যিনি কলিযুগের প্রারম্ভের কতিপয় বৎসর পরে রাজত্ব করেন, মন্ত্রীর পুত্র। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার এবং বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেন। বিল্বমঙ্গল তাঁহারই মত প্রচার করেন।

'ভক্তমালে'র, তথা 'গর্গসংহিতা'র, মতে বৈষ্ণবাচার্য বল্লভ বিষ্ণুস্বামীর মতের অনুযায়ী। শ্রীযুত জি, এইচ, ভট্ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে তাহা সত্য হইতে পারে না।[৩] তিনি লিখিয়াছেন বিষ্ণুস্বামীর এবং বল্লভের সম্পর্ক সম্বন্ধে বল্লভের অনুযায়ীদিগের মধ্যে দুই প্রকার মত প্রচলিত আছে। উহাদের কেহ কেহ মনে করেন যে তাঁহাদের মতের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। অপর কেহ কেহ মনে করে যে বল্লভ বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়েরই আচার্য,—বিষ্ণুস্বামীর মত দীর্ঘ কালের অন্তর হেতু ক্ষীণ এবং লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলে তদানীন্তন আচার্যবিল্বমঙ্গলের অনুরোধে বল্লভ উহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাহাতে বলা যায় যে বল্লভ বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ের আচার্য। পরন্তু বল্লভ নিজে দেখাইয়াছেন যে তাঁহার মত বিষ্ণুস্বামীর মত হইতে ভিন্ন,—(১) তাঁহার মত নির্গুণ, আর বিষ্ণুস্বামীর মত সগুণ,—তমোগুণান্বিত; (২) বিষ্ণুস্বামীর মতে ভেদ পারমার্থিক, আর তাঁহার মতে পারমার্থিক নহে।[৪]

'গর্গসংহিতা' এবং 'ভক্তমাল' উভয়েরই মতে বিষ্ণুস্বামী আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের অন্যতম রুদ্র-সম্প্রদায়ের, 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'র ভাষায় 'পুরদ্বেষীসম্প্রদায়ে'র, প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তিনি 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় উক্ত বিষ্ণুস্বামী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

এই মাত্র পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'গর্গসংহিতা'র মতে, বিষ্ণুস্বামী ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, আর 'ভক্তমালের' মতে তিনি ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার। ভট্ মহাশয় মনে করেন যে তিনি ১০ম খ্রীষ্টশতকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অভ্যুপগম করা যাইতে পারে।[৫]

---

১) জ্ঞানেশ্বরচরিত্র, ৭১, ৭৬-৭ পৃষ্ঠা। ২) পরে দেখ।

৩) "Visnuswami and Vallabacharya", by G, H, Bhatt, Prve, 7th All India Oriental Conference, 1933, pp, 449—465 আরও দেখ—অমরনাথ রায় লিখিত—"The Visnuswami Riddle", Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Vol, XIV (1932-33), pp, 161-181

৪) বল্লভ লিখিয়াছেন,

"ভেদঃ পারমার্থিক ইতি শাস্ত্রং পুরস্কৃত্য ত্রিবিধো ভক্তিযোগ উক্তঃ। তে চ সাম্প্রতং বিষ্ণুসাম্যানুসারিণঃ, তত্ত্ববাদিনঃ, রামানুজাশ্চেতি তমোরজঃসত্ত্বভিন্নাঃ। অস্মৎপ্রতিপাদিতশ্চ নৈর্গুণ্যঃ। এবং চতুর্বিধোঽপি ভগবতা প্রতিপাদিতঃ।" —(বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩২।৩৭ বল্লভের ভাষ্য) তাহাতে বুঝা যায় যে নিম্বার্কের মতই বল্লভের মতে বিষ্ণুস্বামীর মত।

৫) ভট্ মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। বিশেষভাবে ৪৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

‘ভবিষ্যপুরাণে’ এক জন বিষ্ণুস্বামীর কথা আছে।[১] উনি কলিঞ্জর নগরে জন্মগ্রহণ করেন উহার প্রকৃত নাম ছিল বিষ্ণুশর্মা এবং উঁহার পিতার নাম ছিল শিবদত্ত। উনি বেদশাস্ত্রকলাভিজ্ঞ, বৈষ্ণব, এবং দেবপূজক” ছিলেন। উনি এই মত প্রচার করেন যে বিষ্ণু হরি সর্বেশ্বর, কেননা, তিনি “বিশ্বকারণ কারক”। তিনি “ভগবান্ সচ্চিদানন্দ, এবং চতুর্বিংশতিতত্ত্ববান্”। তিনি লোকার্থে দেবগণকে সৃষ্টি করেন। তাহাতে তিনি সর্বেশ্বর হন। সুতরাং মনুষ্য প্রথমে সকল দেবতাকে পূজা করিয়া পরে বিষ্ণুকে পূজা করিবেক; যেমন প্রথমে রাজার চাকর-বাকরদিগকে পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পরে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। বিষ্ণুশর্মার অনুযায়িগণ তাঁহাকে ‘বিষ্ণুস্বামী’ বলিয়া অভিহিত করিতে থাকে। পরে আছে যে বিষ্ণুস্বামী বঙ্গদেশে শান্তিপুরে গিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে “কোন্ দেবতা (অপর) সমস্ত দেবগণের পূজ্য?” তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্যদেব বলেন, “ভক্তানুগ্রহকারক মহাদেব সর্বপূজ্য। ভগবান্ হর বিষ্ণ্বীশ্বর, রুদ্রেশ, এবং ব্রহ্মেশ। তাঁহার পূজা বিনা সমস্ত পদার্থ নিষ্ফল। যাহারা বিষ্ণুভক্ত তাহারা নিশ্চয় শঙ্করার্চন-তৎপরও। কেননা, উত্তম বৈষ্ণবীভক্তি শিবের প্রসাদেই সুলভ হয়। এই কর্মভূমিতে সমাগমন করত বৈষ্ণব পুরুষ হইয়া যে লোক-শঙ্কর শঙ্করকে পূজা করে না সে নরকগামী হয়।” ইহা শুনিয়া তাঁহার গুণসমূহ দ্বারা মুগ্ধ হইয়া বিষ্ণুস্বামী চৈতন্যদেবের শিষ্য হন। তিনি কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক হইয়াও শিবার্চক হন। গুরুর অদেশে বিষ্ণুস্বামী বৈষ্ণবী সংহিতা রচনা করেন।[২] চৈতন্যদেব (১৪৮৫) খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং (১৫৩৩) খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ‘ভবিষ্যপুরাণে’ উক্ত ঐ বিষ্ণুস্বামী ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন।

‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’র স্বকৃত টীকায় আচার্য শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুস্বামীর বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে যে[৩] দেবর্ষি নারদ হইতে ভাগবতধর্ম প্রচারার্থ উপদেশ লাভের পর পরমর্ষি ব্যাস স্বীয় আশ্রমে বসিয়া ধ্যান দ্বারা মন নিশ্চল করিতে থাকেন। “ভক্তিযোগ দ্বারা মন নির্মল এবং নিশ্চল হইলে, (ব্যাস) প্রথম পুরুষকে এবং তদুপাশ্রিত মায়াকে দর্শন করেন। (তিনি আরও দেখেন যে) জীব (স্বরূপত) পর (অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত পর ব্রহ্ম) হইলেও তাঁহার (মায়া) দ্বারা সম্মোহিত হইয়া নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং তৎকৃত অনর্থ প্রাপ্ত হয়; অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ (সেই) অনর্থের উপশম (কারক)। (এই সকল স্বয়ং) জানিয়া তিনি অজ্ঞানী লোকগণের জন্য সাত্বতসংহিতা (প্রণয়ন) করেন।”[৪] শ্রীধরস্বামী বলেন, “এই শ্লোকত্রয় দ্বারা ভাগবতের তাৎপর্য সংক্ষেপে দর্শিত হইয়াছে। ইহা উক্ত হয় যে—ঈশ্বর নিত্যাবির্ভূতপরমানন্দস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং বিদ্যা-শক্তি দ্বারা মায়ার নিয়ন্তা; (আর) জীব তাঁহার মায়া দ্বারা সম্মোহিত; (সেইহেতু) উহার স্বরূপ তিরোভূত এবং উহা তদ্বিপরীতধর্মী (অর্থাৎ অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্); ঈশ্বরভক্তি

---

[১] ভবিষ্যপু, ৩।৪।৮।৫১—৭·১ [২] ঐ, ৩।৪।১৯।৪০—৭

[৩] এই বিবৃতির বিশদ বিবরণের জন্য পরে দ্রষ্টব্য।

[৪] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৭।৪—৬·৩।১২।২ শ্লোকের টীকায় ও শ্রীধর বিষ্ণুস্বামীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বারা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা উহার মোক্ষ (লাভ হয়)।” অতঃপর তিনি বলেন, “বিষ্ণুস্বামী কর্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে,—

‘হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥’[১]

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হলাদিনী সংবিৎ দ্বারা আশ্লিষ্ট। জীব স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত এবং সংক্লেশনিকরের আকর।” তিনি (বিষ্ণুস্বামী) আরও বলিয়াছেন, “মায়া যাঁহার অধীন, তিনি ঈশ্বর; আর যে উহার দ্বারা অর্দিত, সে জীব। (ঈশ্বর) স্বাবির্ভূতপরানন্দ, (আর জীব) স্বাবির্ভূত বহু দুঃখের আধার। যাঁহার মায়া দ্বারা (জীব) আপন (স্বরূপের) অজ্ঞান (আপন্ন হইয়া) তদুত্থ বিপর্যাস এবং জন্ম(জন্মান্তর)ভেদ জনিত ভয় ও শোক প্রাপ্ত হইয়াছে সেই (ভগবান্) নৃসিংহকে নমস্কার করি।” তাহাতে দেখা যায় যে বিষ্ণুস্বামী ভগবান্ নৃসিংহের উপাসক ছিলেন। আচার্য মাধব (বা বিদ্যারণ্য মুনি (১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন যে “বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারিগণকর্তৃক নৃসিংহের শরীরের নিত্যত্ব উপপাদিত হয়।”[২] উহার সমর্থনে তদনুযায়ী[৩] গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রের ‘সাকারসিদ্ধি’ নামক গ্রন্থ হইতে একটা বচনও তিনি অনুবাদ করিয়াছেন,

“সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।
রূপঞ্চাস্য হ্যহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতম্॥”

ইহাঁর (নৃসিংহের) যে শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্মত নিত্য, অচিন্ত্য ও পূর্ণ নিজ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সেই রূপ আমি বন্দনা করি।’ সুতরাং বিষ্ণুস্বামী সাকার-ঈশ্বর-বাদী। তিনি সাকার নৃসিংহের উপাসক ছিলেন।

ফার্কুহর বলিয়াছেন, বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত ঠিক মধ্বের সিদ্ধান্তের ন্যায়; ভেদ এইমাত্র যে বিষ্ণুস্বামী রাধাকে স্বীকার করেন। গোপীদিগের মধ্যে রাধা কৃষ্ণের প্রিয়তম,—তাঁহার স্ত্রী। বিষ্ণুস্বামী মধ্বের ন্যায় দ্বৈতবাদী,—মধ্ব যতটা ঠিক ততটা সুস্পষ্টত দ্বৈতবাদী।[৪] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন, “মধ্বাচার্যের প্রভাব তাঁহার (বিষ্ণুস্বামীর) মতে থাকার একান্ত সম্ভাবনা।…হইতে পারে বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্যগণ মধ্বমতের আচার্য ছিলেন এবং কোন কোন বিষয়ে মধ্বমত অনুসরণ না করিয়া নূতন মত প্রবর্তন করেন। বল্লভাচার্যও এই নূতন মতবাদ গ্রহণ করিয়া প্রচার করেন।”[৫] ‘শাণ্ডিল্যসংহিতো’ক্ত বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতবাদী নহেন। কেননা, তাঁহার মতে

---

[১] ‘বিষ্ণুপুরাণে’র (১।১২।৬৮) টীকায় শ্রীধরস্বামী এই শ্লোককে ‘সর্বজ্ঞসূক্তি’র বলিয়াছেন, পরন্তু বিষ্ণুস্বামীর নামোল্লেখ করেন নাই। পরন্তু (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণের সহিত মিলাইলে মনে হয় যে ‘সর্বজ্ঞসূক্তি’ বিষ্ণুস্বামীরই পুস্তক।

[২] ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’, মধ্বাচার্য-প্রণীত, ‘রসেশ্বরদর্শন’ প্রকরণ।

[৩] মূলে আছে “গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৈঃ বিষ্ণুস্বামীচরণপরিণতান্তঃকরণৈঃ”। তাহা হইতে বলা যায় না যে গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র বিষ্ণুস্বামীর অন্তেবাসী শিষ্য ছিলেন।

[৪] ফার্কুহর প্রণীত Outlines of the Religions Literature of India, pp, 238—9

[৫] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দস্বামী প্রণীত ‘বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস’, ৬৬৪ পৃষ্ঠা।

"সচ্চিদানন্দমাত্রৈকো লীলাং কর্তুং নিজেচ্ছয়া।
জাতোঽসৌ জগদাকারো নির্বিকারঃ স্বশক্তিতঃ॥
জড়া জীবাশ্চ জগতি তদ্রূপা সাগরাম্বুবৎ।
বিলক্ষণাদ্‌বিনিময়াৎ পরিণামাঃ স্বলক্ষণাঃ॥[1]

'(হরি) এক এবং সচ্চিদানন্দমাত্র। তিনি লীলা করিতে স্বেচ্ছায়, স্বশক্তিবলে নির্বিকার (থাকিয়াও), জগদাকার হইয়াছেন। জগতে (অচেতন) জড়বস্তুসমূহ এবং (চেতন) জীব-সমূহ সাগরাম্বুবৎ (অর্থাৎ সাগরের তরঙ্গসমূহ বা জলকণাসমূহের ন্যায়) তাঁহারই রূপসমূহ। বিলক্ষণ বিনিময় বশত (ঐ) পরিণামসমূহ (তাঁহার) স্বলক্ষণ।" তিনি স্মার্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কেননা, কথিত হইয়াছে যে কলিকালে যে "বৈদিকধর্ম" রক্ষার্থ তিনি "প্রথম আচার্য" হন, তন্মতে প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বস্বত্রোক্ত শ্রৌত এবং স্মার্ত সংস্কারসমূহ এবং আহ্নিকসমূহ যথাশক্তি পালন করিতে হইবে। পঞ্চযজ্ঞসমূহ এবং অপর অহিংসক যজ্ঞসমূহ নিত্য করিতে হইবে।[2]

"কেশবস্য শিবস্যাপি যস্য কস্য দিবোকসঃ।
একং ভজনং ধর্মং বৈ স্বীয়ং কার্যং হিতেচ্ছুভিঃ॥[3]

'কেশবের, শিবের কিম্বা অপর কোন এক দেবতার, একান্তভাবে ভজনকে হিতেচ্ছুগণকে স্বীয় ধর্ম অবশ্য করিতে হইবে।' এইরূপে দেখা যায়, বিষ্ণুস্বামী কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছিল। শ্রীধরস্বামী কর্তৃক উল্লিখিত বিষ্ণুস্বামী হয়ত অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কেননা, তিনি (শ্রীধর) বলিয়াছেন উঁহার সিদ্ধান্ত ও ভাগবতের সিদ্ধান্ত এক। শ্রীধরের মতে '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদই। সুতরাং বিষ্ণুস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্তও তাহাই হইবে মনে হয়। বিদ্যারণ্যমুনি কর্তৃক উল্লিখিত বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতবাদী।

মহীশূরের তলকাদের স্মার্ত বা ভাগবতমঠের পূর্বচার্যদিগের এক জনের নাম বিষ্ণুস্বামী। উনি নাকি অদ্বৈতাচার্য শঙ্করের প্রশিষ্য এবং পদ্মপাদাচার্যের শিষ্য। সি, হরবদন রাও মনে করেন যে উনি সেই বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক যাহাতে রাধাকৃষ্ণোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হয় এবং যাহা পরবর্তী কালে বল্লভ কর্তৃক আত্মসাৎকৃত হইয়াছিল। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল বিরচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নাটকে ঐ বিষ্ণুস্বামীর মতবাদই প্রখ্যাপিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মধ্ব-মতানুযায়ী বলিয়াও মনে করা হয়। তাহাতে বুঝা যায় যে বিষ্ণুস্বামীর মতের সহিত মধ্বের মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য এই মাত্র যে বিষ্ণুস্বামী রাধাকৃষ্ণ উপাসনার উপর জোর দেন, আর মধ্ব বৈকুণ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উপর। অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের অনুসৃত তত্ত্ব প্রায় সমানই ছিল। রাও মহাশয় আরও বলেন যে দক্ষিণভারতে মধ্ব কর্তৃক এবং উত্তরভারতে বল্লভ কর্তৃক আত্মসাৎকৃত হইয়াই বিষ্ণুস্বামীর মত আরও বিলুপ্ত হইয়াছে।[4]

'কল্যাণ' নামক হিন্দি মাসিক পত্রিকায় বিষ্ণুস্বামী নামে তিনজন বৈষ্ণবাচার্য বিষয়ে

---

১) শাণ্ডিল্যসং, ভক্তিখণ্ড, ৪।১৪।২০-১   ২) ঐ, ৪।১৪।২৮, ৩০   ৩) ঐ, ৪।১৪।২৯

৪) শ্রীকরভাষ্য, Introduction PP 186—9

পরম্পরায় শ্রুত কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে।[১] উঁহারা সকলেই রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য, সুতরাং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী।

(১) প্রথম বিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যবিজয় রাজ্যের রাজগুরু দেবেশ্বরের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম দেবতনু ছিল। ভগবান্ রুদ্র বালখিল্য ঋষিগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে বিষ্ণুস্বামী প্রাপ্ত হন। তিনি 'সর্বজ্ঞসূক্ত' নামে 'বেদান্তসূত্রে'র এক ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেবের দুই শিষ্য ছিল—নামদেব ও ত্রিলোচন। বল্লভাচার্য উঁহাদের শিষ্যপরম্পরাভুক্ত। ইনি 'আদি বিষ্ণুস্বামী' নামে অভিহিত হন।[২]

(২) দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী ৮ম খ্রীষ্টশতকে দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তিনিই কাঞ্চীতে ভগবান্ বরদরাজের ও রাজগোপালদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকার রণ্ছোর ভগবানেরও প্রতিষ্ঠা ইনিই করেন নাকি। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-কার লীলাশুক বিল্বমঙ্গলকে ইহাঁর শিষ্যপরম্পরাগত বলিয়া মানা হয়।

(৩) তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী আন্ধ্রপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর শিষ্যপরম্পরায় লক্ষ্মণভট্ট বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এই কিম্বদন্তীতে ভুল আছে। তন্মতে জ্ঞানদেব প্রথম বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কেননা, জ্ঞানদেব ১৩শ খ্রীষ্টশতকের লোক; আর ঐ কিম্বদন্তী মতে প্রথম বিষ্ণুস্বামী ৮ম খ্রীষ্টশতকের পরবর্তী হইতে পারেন না।

বিষ্ণুধর্ম প্রবর্তক শৌনক

মহর্ষি কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র টীকায় (যাহা 'বেদার্থদীপিকা' নামে খ্যাত এবং ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত) ষড়্গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন, আচার্য শৌনক "সংসারাব্ধিমহাপোত-বিষ্ণুধর্মপ্রবর্তকঃ" ('সংসার-সমুদ্র (উত্তরণার্থ) মহাপোত (স্বরূপ) বিষ্ণুধর্মের প্রবর্তক')। তিনি 'ঋগ্বেদে'র রক্ষার্থ ("ঋগ্বেদগুপ্তয়ে") 'বৃহদ্দেবতা', প্রভৃতি দশ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগের "গৃহপতি" ছিলেন, যাঁহাদিগের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে পরমর্ষি ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা "হরিবংশকথান্বিত মহাভারতাখ্যান" শুনাইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরের রাজা জনমেজয়ের পুত্র রাজা শতানীককে শৌনক হরির সাক্ষাৎকারকারক বিষ্ণুধর্মে আনয়ন করিয়াছিলেন ("উপানয়দ্ বিষ্ণুধর্মান্ সাক্ষাৎকারকরান্ হরেঃ"।[৩]) আচার্য বেঙ্কটনাথও লিখিয়াছেন, আচার্য শৌনক বৈষ্ণবমত-প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম; তাঁহার মত বৈখানস মত এবং পাঞ্চরাত্র মত হইতে ভিন্ন।[৪] তিনি "ভগবান্ শৌনকে"র বচন প্রমাণরূপে

---

[১] 'কল্যাণ', বেদান্তাঙ্ক, ৭০০ পৃষ্ঠা।

[২] ইনি 'ভক্তমালে' উক্ত বিষ্ণুস্বামী বলিয়া মনে হয়।

[৩] Max Miller, A History of Ancient Sanskrit Literature, Allahabad, 1926, p. 128

[৪] পূর্বে দেখ।

উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] আচার্য যামুনও (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) সেই প্রকারে "ভগবান্ শৌনকে"র বচনের প্রমাণ দিয়াছেন।[২]

প্রচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটি নাম 'শৌনকসংহিতা' বা 'শৌনকীয়-সংহিতা'।[৩] 'ব্রহ্মপুরাণো'ক্ত আদি সাত পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের, তথা 'অগ্নিপুরাণে' উক্ত পঁচিশ পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের, মধ্যেও উহার নাম আছে।[৪] সুতরাং উহা যে অতি প্রাচীন তাহাতে সংশয় নাই। পরন্তু সর্বত্র যে একই শৌনককে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা মনে করিবার, এক নাম-সাদৃশ্য ব্যতীত, অপর কোন হেতু নাই। বেঙ্কটনাথ-প্রোক্ত একজন শৌনক পাঞ্চরাত্রবাদী নহেন। সুতরাং তিনি পাঞ্চরাত্রসংহিতাকার শৌনক হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। 'আনন্দসংহিতা' নামক মহর্ষি মরীচি-প্রোক্ত এক বৈখানসাগমে জনৈক বিষ্ণুভক্ত শৌনকের উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে উনি দেবর্ষি নারদের নিকট "বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়ক উত্তম বিষ্ণুপূজাপ্রকরণে"র উপদেশ লাভ করেন।[৫]

'গীতোপনিষদে' "শৌনকীয়" (বা শৌনক-বিরচিত গ্রন্থ)[৬] হইতে একটা বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—"শ্রীরামের সান্নিধ্য বশত জগদানন্দকারিণী এবং সর্বদেহিগণের (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের) উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারিণী সীতাকে মূলপ্রকৃতি-সঞ্জিতা ভগবতী বলিয়া জানা উচিৎ। প্রণবত্বহেতু ব্রহ্মবাদিগণ উহাঁকে প্রকৃতি বলিয়া বলেন।" ঐ শৌনক অবশ্যই বৈষ্ণব ছিলেন।

আধুনিক মত: ভাণ্ডারকরের মত

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিবৃত্ত চর্চাকারী আধুনিক লেখকদিগের কেহ কেহ উহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ভাগবত-ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি বৈকল্পিক অনুমান সম্ভব বলিয়া প্রকাশ করেন।[৭] তিনি প্রথমে সামান্য ভাবে বলেন যে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মত যে বেদ কিংবা উপনিষৎ হইতে উৎপন্ন হয় নাই সেই সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। উহা নিশ্চয়ই বেদ এবং উপনিষৎ হইতে স্বতন্ত্র এক পৃথক্ সিদ্ধান্ত। উহা সেই চিন্তা-ধারা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা হইতে ভগবদ্গীতা, বাসুদেবের উপাসনা এবং ভক্তির সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর তিনি বিশেষ করিয়া বলেন,

---

[১] বেঙ্কটনাথের 'পাঞ্চরাত্ররক্ষা'র মণ্ণীরামের সংস্করণের পৃষ্ঠা ৯১, ১৪৩, ১৪৮ ও ১৯০ দেখ।

[২] 'আগমপ্রামাণ্য', ৮৪ পৃষ্ঠা।

[৩] শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচীর ১৮২তম সংখ্যক গ্রন্থ।

[৪] পূর্বে দেখ। [৫] আনন্দসং, ৬।১৪

[৬] এই 'শৌনকীয়' 'শৌনকীয়সংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতা, না উহা হইতে ভিন্ন, তাহা নিরূপণের কোন উপায় দেখা যায় না।

[৭] R. G. Bhandarkar, Report on the Search for Sanskrit Manuscripts during the year 1883-84, Bombay, 1887; Collected works of Sir R. G. Bhandarkar এর ২য় খণ্ডে (৫৮-২৯১) পৃষ্ঠায় উহার কতেকাংশ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থের ২৯১-৫ পৃষ্ঠা দেখ। বুলারের মতে ভাণ্ডারকরের মতের সারের জন্য দেখ Ind. Ant., XVIII (1889), pp. 189-90.

(১) ইহা অতি ভালরূপে কল্পনা করা যায় যে যাদব, বৃষ্ণি বা সাত্বত জাতির বাসুদেব নামে জনৈক ক্ষত্রিয় এক ঈশ্বরপর ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন শাক্য-জাতির সিদ্ধার্থ এবং জ্ঞাতৃক জাতির মহাবীর অনীশ্বর ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে উপদেষ্টা বুদ্ধ "ভগবৎ" নামেই সূচিত এবং উল্লিখিত হইয়াছেন, ঠিক তেমন ভাবে 'ভগবদ্‌গীতা'য় এবং 'মহাভারতে'র অপর কতিপয় অংশে বাসুদেব 'ভগবৎ' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। উহা নিশ্চয়ই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নামসমূহের অন্যতম হইবে। কেননা, তাঁহার অনুযায়িগণ পরে পরে 'ভাগবত বলিয়াই অভিহিত হইতে থাকেন।

(২) অথবা হয়ত, ইহা সম্ভব যে—বাসুদেব সাত্বত-জাতির এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার স্বজাতীয়গণ তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে থাকেন এবং উপাসনা করিতে থাকেন, ঐ উপাসনা সম্পর্কে কতকগুলি ধার্মিক বিধিপদ্ধতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে; এবং কালান্তরে ঐ ধর্ম সেই সাত্বত-জাতি হইতে হিন্দুস্থানের অপরাপর জাতিগণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে।

ভাণ্ডারকর মহাশয় আরও মনে করেন যে ঐ ধর্ম মূলে অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ছিল। পরে পরে উহা পরিবর্ধিত হইতে হইতে পাঞ্চরাত্রধর্মের রূপ ধারণ করে। সাত্বতপৌষ্করাদি পাঞ্চরাত্রসংহিতা সমূহের কতিপয় তখনই বিরচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ঐ বাসুদেবের ধর্মে বিষ্ণু, নারায়ণ, গোবিন্দ এবং কৃষ্ণ নামে উপাসনার কতিপয় বিধিপদ্ধতি সংমিশ্রিত হয় ও বিষ্ণ্বাদি বাসুদেব হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে; এবং তাহাতে আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন রূপের উৎপত্তি হয়। শঙ্করাচার্য এবং তাঁহার অনুযায়ী মায়াবাদী বৈদান্তিক দার্শনিকগণ ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, প্রভৃতির ন্যায় জনপ্রিয় ধর্মমতসমূহকে করুণাপূর্ণদৃষ্টিতে দেখেন নাই। কট্টর দার্শনিক দৃষ্টিতে তাঁহারা উহাদিগকে তীব্র সমালোচনা করেন। সেই কারণে ঐ মায়াবাদকে নিরস্ত করিতে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত ভক্তিধর্মের জন্য বৈদান্তিক এবং দার্শনিক ভিত্তি সন্ধান করিতে রামানুজ প্রচেষ্টা করেন। তাহাতে পাঞ্চরাত্র মত, যাহা পূর্বে বেদনিরপেক্ষ,—বেদ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, বেদান্তের এক মত বা এক ঔপনিষদ মত হয়।[১]

ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, (১) সাত্বতজাতির যে বাসুদেব মূল ভাগবতধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, অথবা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মূল ভাগবতধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, বলিয়া ভাণ্ডারকর মহাশয় ঐখানে কল্পনা করিয়াছেন, উনি এবং 'মহাভারতের প্রধানতম নায়ক ও পাণ্ডব-সখা,—পার্থসারথি যাদব বা বার্ষ্ণেয় বা সাত্বত বাসুদেব,—যিনি কৃষ্ণ নামে সমধিক সুবিখ্যাত—অভিন্ন

---

[১] ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে রামানুজমতের সিদ্ধান্তসমূহ এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতের সিদ্ধান্তসমূহ একই। তারপর রামানুজ মত সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "It is a system of popular religion and has not such a metaphysical basis as either of those two (সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্ত) has" (অর্থাৎ সাংখ্যের বা অদ্বৈতবেদান্তের যেই প্রকার পরবৈজ্ঞানিক বা উচ্চদার্শনিক ভিত্তি আছে, রামানুজের মতের তেমন নাই। উহা লোকপ্রিয় ধর্মমত মাত্র) (ঐ, ১৮৮-৯ পৃষ্ঠা)। তাহাতে ইহাও প্রতিজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে যে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতে উচ্চ দার্শনিক ভিত্তি নাই, উহা লৌকিক্ ধর্মাচারপদ্ধতি মাত্র।

কি ভিন্ন ব্যক্তি তাহা তিনি (ভাণ্ডারকর) পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। (২) যেই কৃষ্ণের উপাসনার কতিপয় বিধি পদ্ধতি ঐ বাসুদেবোপাসনার বিধিপদ্ধতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়াছিল এবং ততোধিক যেই কৃষ্ণ ঐ বাসুদেবের সঙ্গে অভিন্নীকৃত হইয়াছিল বলিয়া ভাণ্ডারকর ঐখানে কল্পনা করিয়াছেন, উনি এবং 'মহাভারতে' সুবিখ্যাত যাদব কৃষ্ণ অভিন্ন কি ভিন্ন ব্যক্তি তাহাও তিনি স্পষ্ট বলেন নাই। তাঁহার লেখা হইতে ঐ বিষয়ে কিছুই বুঝা যায় না।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে Vaisnavism, Saivism and minor Religions systems নামক স্ববিরচিত গ্রন্থে 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের সার সঙ্কলনের পরে ভাণ্ডারকর মহাশয় মন্তব্য করেন যে, "এইরূপে দেখা যায়, ভক্তিমূলক এক ধর্ম প্রাচীন কালে উৎপন্ন হইয়াছিল; পরন্তু যখন বাসুদেব অর্জুনকে গীতা ব্যাখ্যা করেন, তখন উহা এক নিশ্চিত রূপ প্রাপ্ত হয়' এবং এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনে প্রেরণা করে, যাহাতে তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র এবং পৌত্র তাঁহার রূপসমূহ বলিয়া তাঁহার সম্পর্কিত হয়।...ঐ সম্প্রদায় সাত্বতদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।[১] পরে তিনি লিখিয়াছেন, "Vasudeva was identified with the Vedic sage Krisna and a geneology given to him in the Vrisni race, through Sura and Vasudeva." ('বাসুদেব বৈদিক ঋষি কৃষ্ণের সহিত একীকৃত হইয়াছিলেন এবং বৃষ্ণিজাতিতে, শূর ও বসুদেবকে দিয়া, এক বংশ-পারম্পর্য তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল)।[২]

এই উক্তিদ্বয় হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভাণ্ডারকর মনে করিতেন যে—(১) ভাগবত-ধর্মের প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পর্কিত বাসুদেব 'গীতা'র বক্তা ও অর্জুনের সারথি সাত্বত বাসুদেব হইতে ভিন্ন এবং প্রাচীনতর ব্যক্তি; এবং (২) যেই কৃষ্ণের সহিত উনি একীকৃত হইয়াছিলেন তিনি বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ। তাহাতে তাঁহার আগেকার লেখার পূর্বোক্ত ত্রুটিদ্বয় অপসৃত হইয়া গিয়াছে। তথাপি ভাগবতধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা এখনও নির্দোষ নহে। কেননা তাঁহার ঐ কল্পনা মতে যাদব বা সাত্বত জাতিতে বাসুদেব নামে দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, একজন বসুদেব-নন্দন এবং পার্থসারথি বাসুদেব, অপর জন তৎপ্রাক্। পরন্তু পুরাণাদিতে যদুবংশের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহাতে একজন বাসুদেবের নাম উল্লিখিত আছে,—তিনি বসুদেব ও দেবকীর পুত্র এবং পাণ্ডবসখা। দ্বিতীয়ত বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; অন্তত মহাভারতপুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ নাই।

কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মত

অধ্যাপক এস, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার লিখিয়াছেন যে তামিল প্রদেশের বৈদিকগণ পাঞ্চরাত্রকে শুক্লযজুর্বেদের একায়ন শাখা বলিয়া পরিগণনা করিতে থাকেন। উহার প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব। উনি কৃষ্ণ-বাসুদেব নহেন,—তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং প্রাচীনতর ব্যক্তি। বাসুদেব সর্বাত্মা পরমদেবতা বিষ্ণুরই নামান্তর।[৩] সুতরাং রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের ন্যায় কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারও মনে করেন যে ভাগবতধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব কৃষ্ণ-বাসুদেব হইতে ভিন্ন প্রাচীনতর ব্যক্তি।

---

১) R G. Bhandarkar, Vaisnavism etc, P. ৪ ২) ঐ ১৩ পৃষ্ঠা।

৩) Dr. S. Krishnaswami Aiyangar, "The Narayaniya in Tamil Literature", Jha Commemoration Volume, Poona, 1937, pp- 23-31 বিশেষভাবে ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

কৃষ্ণই ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

কোন কোন আধুনিক লেখক কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করত ভাণ্ডারকরের প্রথম আনুমানিক মত গ্রহণ করিয়াছেন। যথা গার্বে বলিয়াছেন যে বাসুদেব এবং দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ নামে এক সাহসী যোদ্ধা এক একেশ্বরবাদী ধর্ম স্থাপন করেন। উহা প্রথমে তাঁহার স্ববংশীয় যাদবগণ, সাত্বতগণ বা বৃষ্ণিগণের মধ্যে এবং পরে ঐ বংশের বাহিরের লোকগণের মধ্যেও, প্রচারিত হয়। এই মত প্রথমে রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর কর্তৃক এক আনুমানিক কল্পনা রূপে প্রকটিত হয়। এখন উহাকে নির্বিবাদে স্থাপন করা যায়। কৃষ্ণের ধর্মে পরমেশ্বরকে বিশেষভাবে 'ভগবৎ' বলা হইত। সেইহেতু উহা 'ভাগবতধর্ম' নামে অভিহিত হইত। কৃষ্ণের স্ববংশ সাত্বত হইতে উহার নাম হয় 'সাত্বতধর্ম। কালক্রমে উহার উপাস্য 'ভগবৎ' নামের সঙ্গে সঙ্গে, নারায়ণ ও পুরুষোত্তম নামে, তথা প্রতিষ্ঠাতার পিতৃজ নাম বাসুদেব এবং ব্যক্তিগত নাম কৃষ্ণ বলিয়াও, অভিহিত হইতে থাকে।[১] গ্রীয়ার্সনও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ-বাসুদেবই। তিনি এবং 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র (৩।১৭।৬) ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি, কৃষ্ণের স্বজাতি সাত্বতগণ উহা প্রথমে গ্রহণ করেন। পরে উহা অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। তখন, সেইহেতু, 'সাত্বত'ও 'ভাগবত' শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। প্রথমে উহার উপাস্য দেবতা 'ভগবৎ' নামে অভিহিত হইতেন; কালক্রমে প্রতিষ্ঠাতা এবং উপাস্যদেবতা 'ভগবৎ' অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রথমে গোত্রজ বাসুদেব নামেই প্রতিষ্ঠাতাকে 'ভগবৎ' মনে করা হইত এবং পরে তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ ও ভগবৎ অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইতে লাগিল।[২] অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরীও তাঁহাদের অনুসরণে মনে করেন যে ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেবই এবং তিনি মথুরার বৃষ্ণিবংশের সুপ্রসিদ্ধ যুবরাজ কৃষ্ণই।[৩] তিনি লিখিয়াছেন, "শান্তিপর্বে ইহা লিখিত হইয়াছে যে সাত্বত বা ভাগবতধর্ম প্রথমে কৃষ্ণ বাসুদেব কর্তৃক অর্জুনকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, 'সমুপেঢ়েষ্বনীকেষু' ইত্যাদি।"[৪]

কৃষ্ণের পরে প্রতিষ্ঠিত

অপরে স্বল্পবিস্তর পরিবর্তনে ভাণ্ডারকরের দ্বিতীয় মত অঙ্গীকার করিয়াছেন। হার্মান জেকোবি মনে করেন যে ভাণ্ডারকরের প্রথম আনুমানিক মত প্রমাণবিচারে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কেননা, তিনি বলেন, "মহাকাব্যের [অর্থাৎ 'মহাভারতে'র] এবং পুরাণসমূহের গ্রন্থকারগণ কর্তৃক বিবৃত কৃষ্ণের কর্মসমূহ এবং পরাক্রমসমূহ মুখ্যতয়া একজন যোদ্ধার এবং রাজপুত অধিনায়কেরই; এবং (উহাদিগেতে এমন) কিছুই নাই, যাহা তাঁহাকে এক ধর্মের

---

[১] Garbe's Introduction to the Bhagavadgita, pp. 11, 12;

[২] G. A. Grierson, "The Narayaniya and the Bhagavatas", Indian Antiquary, 1908, pp. 251ff. বিশেষভাবে ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ। Encyclopaedia of Religion and Ethics এর ২য় খণ্ডে (১৯০৯, এডিনবরা) গ্রীয়ার্সনের 'ভক্তিমার্গ' লেখ দেখ।

[৩] Hemchandra Raychaudhuri, Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect, 2nd Edition, Calcutta, 1936, pp. 5, 89

[৪] ঐ, ৩৫ পৃষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠাতা রূপে দেখায়। যাহা কিছু সব নিরাপদে স্বীকার করা যায় তাহা,—এক অনুমান কল্পনারূপে, এই মাত্র যে ঐ রাজপুত অধিনায়ক, উপনিষদে সুপ্রসিদ্ধ অপর কতিপয় রাজার মতন ঈশ্বরবিষয়ক উচ্চতম প্রশ্নসমূহের (আলোচনায়) অতি উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন এবং ঐ প্রকারে এক নূতন ধর্মের সংগঠনে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারকর এক বৈকল্পিক মতবাদী প্রস্তাব করিয়াছেন। 'অথবা, হয়ত, ইহা সম্ভব যে' ইত্যাদি।[১] বর্তমান লেখকের মতে, এই মতবাদ পূর্বোক্ত মতবাদ হইতে অধিকতর সম্ভাব্য, পরন্তু উহার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন আছে। তিনটি প্রকৃষ্ট বিষয় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। বোধ হয় যে, মূলে বাসুদেবকে ঈশ্বর বলিয়া এবং কৃষ্ণ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করা হইত।···পরমেশ্বররূপে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনামূলক ধার্মিক পদ্ধতি পাঞ্চরাত্রগণের বা ভাগবতগণেরই (পদ্ধতি), উহার প্রাচীনতম বিবরণ মহাভারতের নারায়ণীয় প্রকরণে বিবৃত আছে।···ঐ নূতন ধর্ম (পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত) প্রথমে এক জাতিবিশেষেরই ধর্ম ছিল। সাত্বতগণ উহা আচরণ করিত। সাত্বতগণ যাদবদিগের এক প্রধান শাখা। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে যে ধর্মে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর মনে করা হইত উহা কৃষ্ণ যে জাতির অন্তর্গত ছিল সেই জাতির মধ্যে উৎপন্ন হয়। ইহা মনে করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে 'রামায়ণে' এবং প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বাসুদেব কৃষ্ণের (উল্লেখ) কেন পাওয়া যায় না। কেননা, ঐ সকল গ্রন্থ প্রাচ্য ভারতবর্ষেরই, আর যাদবগণের নিবাসভূমি ছিল উদীচ্য এবং প্রতীচ্য ভারতবর্ষ।"···বৈদিক যুগের শেষের দিকে বাসুদেব নামে এক লৌকিক দেবতা বিষ্ণুর এক রূপ বিশেষ বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিলেন। যাদববংশ, যাহারা ভারতবর্ষের উত্তর এবং পশ্চিম উভয় ভাগে বাস স্থাপন করিয়াছিল; নিজেদের জাতীয় বীর দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে উপাসনা করিত। উপনিষদ যুগের অপর রাজাগণের মত তিনিও ধার্মিক এবং সত্যের আগ্রহ-পরায়ণ অন্বেষণকারী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা অভ্যুপগম করি যে ঐ সময়ের উপকালে বিষ্ণুর এক রূপবিশেষ বলিয়া বাসুদেবের উপাসনা সেই জাতির মনুষ্যগণের লোকপ্রিয় ধর্ম হইয়া পড়িয়াছিল, যাহারা নিজেদের জাতীয় বীর রূপে কৃষ্ণের উপাসনা করিত, এবং উভয় প্রকার উপাসনা পরস্পরকে প্রভাবিত করত অন্তে এই প্রকারে এক হইয়া পড়ে যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর এক প্রাদুর্ভাব বলিয়া,—এক কথায়, পরেমেশ্বরের মনুষ্য-অবতার বলিয়া বিশ্বসিত হইতে লাগিল।[২]

বেদের কৃষ্ণ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কৃষ্ণনামে একাধিক মহদ্ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ বলিতে আমরা কাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্দেশ করা উচিৎ। 'ঋগ্বেদে'ও কৃষ্ণের নাম আছে। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্তের দ্রষ্টা কৃষ্ণ ঋষি। উহার তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে তিনি স্বয়ং আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ৮।৮৬

---

১) পূর্বে দেখ।

২) Encyclopeedia of Religion and Ethics এ 'Incarnation (Indian)' বিষয়ে জেকোবির প্রবন্ধ দেখ। (সপ্তম খণ্ড, ১৯৩—পৃষ্ঠা)।

স্থক্তের দ্রষ্টা তিনি বা "কার্ষ্ণি" বিশ্বক। উহার প্রথম তিন ঋকে বিশ্বকের নাম আছে,—"তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" ('তাদৃশ তোমাদিগকে বিশ্বক পুত্রের নিমিত্ত স্তুতি করিতেছে')। ৮।৮৭ স্থক্তের দ্রষ্টা ঋষিও হয়ত তিনি।[১] উক্ত তিনই স্থক্তের দেবতা অশ্বিনীদ্বয়। ঐ কৃষ্ণ আঙ্গিরস।[২] ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৪২-৪৪তম স্থক্তের দ্রষ্টা ঋষি কৃষ্ণ এবং দেবতা ইন্দ্র। ঐ কৃষ্ণও আঙ্গিরস।[৩] ১।১১৬।২৩ এবং ১।১১৭।৭ মন্ত্রদ্বয়ে কক্ষীবান্ ঋষি (ঋষি দীর্ঘতমা এবং উশিজের পুত্র) অশ্বিনীদ্বয়ের মহিমা খ্যাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের স্তোতা "কৃষ্ণিয় বিশ্বক"কে উহাঁর নষ্টপ্রায় পুত্র বিষ্ণাপূকে প্রত্যর্পণ করেন। কৃষ্ণিয় = কার্ষ্ণি = কৃষ্ণের পুত্র।[৪] তাহাতে বুঝা যায় যে ঐ কৃষ্ণিয় বিশ্বক এবং ৮।৮৬ স্থক্তের কার্ষ্ণি বিশ্বক অভিন্ন ব্যক্তি। উহার সাধক অপর বিশিষ্ট প্রমাণও আছে। ৮।৮৬ স্থক্তের প্রথম তিন ঋকে বিশ্বক আপন পুত্রের নিমিত্ত অশ্বিনীদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছেন এবং তৃতীয় ঋকে তিনি আপন পুত্রের নাম বিষ্ণাপূ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—বিষ্ণাপূর ধনাদিবৃদ্ধির অভিলাষ পরিপূরণার্থ অশ্বিনীদ্বয়কে প্রার্থনা করিয়াছেন।[৫] এইরূপে দেখা যায়, ঋগ্বেদের কৃষ্ণ আঙ্গিরসের পুত্রের নাম বিশ্বক ও পৌত্রের,—বিশ্বকের পুত্রের নাম বিষ্ণাপূ।[৬]

'ঋগ্বেদে'র ৮।৯৬।১৩-৫ মন্ত্রত্রয়ে "দ্রপ্সকৃষ্ণে"র কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে উনি দশ হাজার সৈন্য লইয়া তর্জন গর্জন করত অংশুমতী নদী মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। ইন্দ্র লোকহিতকামী ("নৃমণা") হইয়া মরুদ্গণ সহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সংহার করিতে মরুদ্গণকে আদেশ করেন। তখন দ্রপ্সকৃষ্ণ উহাঁদিগকে আক্রমণ করেন। ইন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতির সহায়ে, তাঁহাকে সসৈন্যে নিহত করেন। আচার্য শৌনক মনে করেন যে ঐ স্থলে 'দ্রপ্স' অর্থ 'সোম', 'দ্রপ্স কৃষ্ণ' অর্থ 'কৃষ্ণবর্ণ সোম'। ঐ ঋকৃত্রয়ে লক্ষিত সোমের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের প্রাচীন "ইতিহাস" তিনি বিবৃত করিয়াছেন।[৭] পরন্তু ভাষ্যকার সায়ন বলেন যে "অনার্ষত্ব হেতু উহা (ঐ ইতিহাস) অনাদরণীয়।" তাঁহার মতে, ঐ কৃষ্ণ তন্নামক জনৈক

---

১) 'ঋগ্বেদে'র ৮।৮৭ তম স্থক্তের ঋষি, কাত্যায়নের মতে, কৃষ্ণ (আঙ্গিরস), কিম্বা দ্যুম্নীক বাশিষ্ঠ, কিম্বা প্রিয়মেধ আঙ্গিরস।

২) কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র ষড়্গুরুশিষ্য-বিরচিত টীকা (১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত) এবং সায়নের বেদভাষ্য দেখ।

৩) সায়নভাষ্য দেখ।

৪) 'মহাভারতে' অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুকে কখন কখন 'কার্ষ্ণি', বলা হইয়াছে। (যথা, দেখ—৬।১০০।২৩.২, ৩০.১, ইত্যাদি) কেননা, অর্জ্জুনের একনাম কৃষ্ণ ছিল। বাষ্ণেয় কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে এবং ব্যাসের পুত্র শুককেও কখন কখন কার্ষ্ণি বলা হইয়াছে।

৫) "ইমমেধতুং বিষ্ণাপে্ব দদথুর্বিশ্বকায়—(ঋক্সং, ৮।৮৬।৩.১)

৬) সায়ন বলেন, "বিষ্ণোঃ সর্বেষাং দেবানাং মুখ্যত্বাৎ তদ্গ্রহণে সর্বে দেবা গৃহীতা ভবন্তি। বিষ্ণ্বাদীন্ কর্মণা ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণাপূঃ। পৃষোদরাদিঃ। যদ্বা। বিষ্ণুং সর্বগ্রহেষু ব্যাপ্তং সোমং দশাপবিত্রেণাপুনাতীতি।"

৭) 'বৃহদ্দেবতা', ৬।১০৯—১১৫

ইন্দ্রের স্তুতিতে আঙ্গিরস কুৎস ঋষি বলিয়াছেন "যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা" (যিনি ঋজিশ্বন (নামক রাজার) দ্বারা কৃষ্ণগর্ভাকে নিহত করান')। (ঋক্সং, ১।১০১।১.১) সায়ন বলেন, 'কৃষ্ণগর্ভা' অর্থ কৃষ্ণ নামক অসুরের ভার্য্যা যাহাতে সে গর্ভ-নিষেক করিয়াছিল। এই কৃষ্ণাসুর 'দ্রপ্স কৃষ্ণ' হইতে ভিন্ন ব্যক্তি মনে হয়।

অসুর; দ্রুতগামী ছিলেন বলিয়া তিনি 'দ্রপ্স কৃষ্ণ' নামে খ্যাত হন।[১] ড্যা দ্বিবেদী সায়নকে অনুসরণ করিয়াছেন,—তিনিও মনে করেন যে ঐ কৃষ্ণ জনৈক অসুর।[২]

'কৌষীতকী ব্রাহ্মণে' কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষির নামোল্লেখ আছে।[৩] তিনি এবং 'ঋগ্বেদে'র ১০।৪২-৪৪ সূক্তের দ্রষ্টা কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষিকে অভিন্ন মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে;[৪] ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] উনি ঘোর আঙ্গিরস ঋষির শিষ্য। সুতরাং উনিও আঙ্গিরস। পরন্তু উনি এবং 'ঋগ্বেদে'র কৃষ্ণ আঙ্গিরস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা নিরূপণ করিবার কোন হেতু নাই। এই শেষোক্ত কৃষ্ণ আঙ্গিরস ইন্দ্রের ও যজ্ঞের ভক্ত; ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে গিয়া তিনি বলেন, যাহারা তাঁহার প্রসাদে যজ্ঞকে আশ্রয় করে এবং দেবতাগণকে আহ্বান করে তাহারা প্রথম বা মুখ্য হয়। তাহারা ইহলোকে শ্রবণীয় মহান্ যশ লাভ করে এবং দেহান্তে দেবলোকে গমন করে। আর যাহারা যজ্ঞিয় নৌকাতে আরূঢ় হইতে সমর্থ হয় নাই, অর্থাৎ যজ্ঞকে আশ্রয় করে নাই তাহারা "কেপয়" বা কুৎসিতকর্ম-কর্তা,—তাহারা ঋণগ্রস্ত থাকিয়া ইহলোকেই থাকে এবং নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়।[৬]

'মহাভারতের' কৃষ্ণ

'মহাভারতে'র প্রকৃত মূল পাণ্ডবাখ্যানে কৃষ্ণের প্রথম অবতারণা হইয়াছে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায়। "বাসুদেব", তাঁহার বড় ভাই সঙ্কর্ষণ এবং অক্রুর, উদ্ধব, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি তাঁহার অনুগত বৃষ্ণিবংশীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, দ্রৌপদীকে লাভের আশায় স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত ছিলেন।[৭] ইহার পূর্বে বর্তমান 'মহাভারতে'র অংশাবতরণ-ভাগেও অবশ্য কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ঐ ভাগ হয়ত ব্যাসের মূল ভারতে বা জয় নামক ইতিহাসে ছিল না, পরে অপরের কৃত উহার সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। অন্ততঃ ইহা সত্য যে তাহা 'মহাভারতে'র আখ্যানের প্রধান নায়ক পাণ্ডবদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। স্বয়ম্বর-সভার ঐ প্রসঙ্গ হইতে ইহাও জানা যায় যে "জনার্দন" বা "কৃষ্ণ", তথা "হলায়ুধ", তৎপূর্বেও পাণ্ডবদিগের সহিত পরিচিত ছিলেন। কেননা, পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশেই ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার অনল্প কাল পূর্ব হইতে লোকসমাজে ইহা প্রচারিত ছিল যে তাঁহারা, তাঁহাদের মাতা কুন্তীদেবী সহ, দুর্যোধনের ষড়যন্ত্রে বারণাবতে জতুগৃহে পুড়িয়া মরিয়াছেন। তথাপি ঐ

---

১) "দ্রুতং সরতি গচ্ছতীতি দ্রপ্সঃ।" (সায়ন)

২) 'নীতিমঞ্জরী', ১৩২ শ্লোক।

৩) কৌষীব্রা, ৩০।৯

৪) কৌষীব্রা, ৩০।৯ এবং 'শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র', ১২।১২।২-৬ মিলাইয়া দেখ।

৫) ছান্দোগ্যে উ, ৩।১৭।৬

৬) ঋক্‌সং, ১০।৪৪।৬ আর ও দেখ—যাস্কের 'নিরুক্ত, ৫।২৫।১ ছান্দোগ্য উ,

৭) মহাভা, ১।১৮৮।১৭—২০ বর্তমান 'মহাভারতে'র এই বিবরণে আছে যে ঐ স্বয়ম্বর-সভায় রৌক্মিণেয় (=প্রদ্যুম্ন), সাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রভৃতি কৃষ্ণের কতিপয় পুত্র এবং তাঁহার পৌত্র অনিরুদ্ধ (=প্রদ্যুম্নের পুত্র) উপস্থিত ছিলেন। 'প্রাদ্যুম্নি' নামে বৃষ্ণিবংশীয় অপর একব্যক্তিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। উনি বোধ হয় প্রদ্যুম্নের অপর এক পুত্র। এইরূপে অনুমান হয় যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময়ে কৃষ্ণ অন্তত প্রৌঢ় ছিলেন। পরন্তু ঐ অনুমান সত্য হইতে পারে না। কেননা, ইহা নিশ্চিত যে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীম হইতে বয়সে ছোট ছিলেন। তাহাতে বলিতে হয় যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় কৃষ্ণের পুত্রপৌত্রাদির উপস্থিত থাকা সম্ভব নহে, 'মহাভারতে'র পরবর্তী সংস্করণে উহা ভুলে নিবেশিত হইয়াছে।

সয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ ছদ্মবেশী তাঁহাদিগকে চিনিয়া ফেলেন।[১] তিনি সঙ্কর্ষণের নিকট সেই কথা প্রকাশ করেন। তাহা শুনিয়া সঙ্কর্ষণ প্রথমে অতি আনন্দিত হইলেও, ঐ লোকপ্রবাদের কথা স্মরণ করত, কিঞ্চিৎ সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। তাই কৃষ্ণ আবার দৃঢ়স্বরে তাঁহাকে বলেন, "সিংহর্ষভের মতন খেলগামী এই যিনি তালমাত্র মহাধনুকে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি যে অর্জুন, হে সঙ্কর্ষণ, যদি আমি বাসুদেব হই, তবে তাহাতে বিচারের কিছুমাত্রই নাই।[২] অর্থাৎ আমি যে বাসুদেব তাহাতে যেমন সংশয়ের কিছুই নাই, উনি যে অর্জুন তাহাতে তেমন কোন সংশয় নাই। ঐ স্থলের বিবরণ হইতে ইহাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পরম মঙ্গলকামী।[৩] অর্জুন লক্ষ্যভেদ করত দ্রৌপদীকে লাভ করিলে তাঁহার, তথা তাঁহার সাহায্যার্থে স্থিত ভীমের, বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত সমস্ত রাজাগণকে কৃষ্ণ "অনুনয় করিয়া" যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন।[৪] 'মহাভারতে' আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই কৃষ্ণের এই রূপ দেখা যায়—তিনি পাণ্ডবদিগের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ; তাঁহাদিগের পরম মিত্র এবং পরামর্শদাতা ; ("যেষাং মন্ত্রী জনার্দনঃ")[৫] আপদে ও বিপদে, তথা সুখসম্পদে, তাঁহাদিগের পরম আশ্রয়। মহামতি ভীষ্ম বলেন, "প্রীতিমান হি দৃঢ়ং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবেষু যশস্বিষু" ('কৃষ্ণ যশস্বী পাণ্ডবদিগের প্রতি নিশ্চয় দৃঢ় প্রীতিমান্")[৬]। কৃষ্ণ স্বয়ং দ্রৌপদীকে বলেন যে পাণ্ডবদিগের যাহা যাহা সম্যক্ অর্থ হয়, তাঁহাদিগের তাহা তাহা প্রাপ্তির জন্য, তাঁহাকে যাহা যাহা করিতে হয় তিনি তাহা তাহা নিশ্চয় করিবেন। উহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইতে পারে, হিমালয় বিদীর্ণ হইতে পারে, কিম্বা সমুদ্র শুকাইয়া যাইতে পারে, পরন্তু তাঁহার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।[৭] পরে দুর্যোধনকে তিনি বলেন, "ধর্মচারী পাণ্ডবদিগের সহিত ঐকাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া আমাকে জান। যে তাঁহাদিগকে দ্বেষ করে, সে আমাকেই দ্বেষ করে। যে তাঁহাদিগের অনুগত হয়, সেই আমারই অনুগত হয়।[৮] আরও বিশেষত কৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনের সমপ্রাণ সখা।[৯] 'মহাভারতে'র একাধিক স্থলে তাঁহাদের "ঐকাত্ম্যে'র উল্লেখ আছে।[১০] ভীষ্ম বলেন, কৃষ্ণ নারায়ণ, আর অর্জুন নর বলিয়া স্মৃত ; "নারায়ণ ও নর নিশ্চয়ই এক সত্ত্ব দ্বিধাকৃত।"[১১] দুর্যোধন বলেন, "কৃষ্ণ নিশ্চয় পার্থের আত্মা, আর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের আত্মা। অর্জুন যাহাই বলেন কৃষ্ণ কোন প্রকার শঙ্কা না করিয়া তৎসমস্তই করেন। ধনঞ্জয়ের জন্য কৃষ্ণ স্বর্গলোককেও পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথা অর্জুন কৃষ্ণের জন্য

---

১) মহাভা, ১।১৮৯।৮—১০ ২) মহাভা, ১।১৯১।২০ ৩) মহাভা, ১।১৯৩।২৩—৫

৪) মহাভা, ১।১৯২।৩৮ ৫) মহাভা, ১।২০৭।২০ ৬) মহাভা, ৬।৬৮।১৭·১

৭) মহাভা, ৩।১২।১৩৩·২—১৩৫·১ ; আরও দেখ—৫।৮২।৪৮—৯

৮) মহাভা, ৫।৯১।২৮ কৃষ্ণ অর্জুনকে সেই প্রকার বলেন,

"মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু ॥" ৩।১২।৪৬

আরও দেখ—৩।১২।৪৮

৯) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৯৬।৪৬ ১০) যথা দেখ—১।২।২৩০ ; ৭।১১।৪২ ১১) মহাভা, ৫।৪৯।২০

আপনার প্রাণকেও নিশ্চয় পরিত্যাগ করিতে পারেন।”[১] ধৃতরাষ্ট্রও সেই প্রকার বলেন, “অর্জুনঃ কেশবস্যাত্মা কৃষ্ণোঽপ্যাত্মা কিরীটিনঃ” (‘অর্জুন কেশবের আত্মা, আর কৃষ্ণ অর্জুনের আত্মা’);[২] “একাত্মনৌ দ্বিধাভূতৌ দৃশ্যেতে মানবৈর্ভুবি” (‘তাঁহারা) উভয়ে (প্রকৃত পক্ষে) একাত্মাই, যদিও ইহজগতে মনুষ্যগণ কর্তৃক দুই রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন’।[৩] কথিত হইয়াছে যে—কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট এই বর প্রার্থনা করেন যে অর্জুনের সহিত তাঁহার শাশ্বত প্রীতি থাকুক;[৪] তিনি আপন পিতা বসুদেবকে বলেন, “যোঽহং তমর্জুনং বিদ্ধি যোঽর্জুনঃ সোঽহমেব তু” (‘যে আমি, তাহাকে অর্জুন বলিয়া এবং যে অর্জুন, তাহাকে আমি বলিয়া তুমি নিশ্চিতরূপে জান)।[৫] পাণ্ডব-সখা কৃষ্ণ যদুবংশীয় বা যাদব; অথবা, আরও বিশেষ করিয়া বলিলে, বৃষ্ণিবংশীয় বা বার্ষ্ণেয়।[৬] তিনি বসুদেব ও দেবকীর পুত্র,[৭] এবং দ্বারকাবাসী।[৮] পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্বন্ধও ছিল,—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবত্রয়ের মাতা কুন্তী বা পৃথা তাঁহার পিতার ভগিনী এবং অর্জুনের স্ত্রী সুভদ্রা তাঁহার নিজের ভগিনী।[৯] ‘মহাভারত’ হইতে ইহাও জানা যায়,—কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে ইহা বলেন যে, বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রথমে মথুরায় বাস করিতেন, পরে মগধের সম্রাট জরাসন্ধ কর্তৃক বারংবার উৎপীড়িত হইয়া,—তাঁহার ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া পশ্চিম প্রান্তে চলিয়া যান এবং রৈবতক পর্বতের সন্নিকটস্থ কুশস্থলীনগরীতে বাস করিতে থাকেন।[১০] পরন্তু সেখানেও তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিতে পারেন নাই,—জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে মুক্তি পান নাই। তাই তথা হইতে দ্বারকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। “হে মহারাজ! তখন আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা সম্পরিত্যাগ করত দ্বারবতী পুরীতে যাই।”[১১]

বর্তমান ‘মহাভারতে’র আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই স্থানে স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অবসরে অতীব স্পষ্টবাক্যে বিঘোষিত হইয়াছে যে পাণ্ডব-সখা বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ ভগবান্ বিষ্ণু, নারায়ণ বা বাসুদেবের প্রাদুর্ভাব বা অবতার। কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। পরন্তু নারায়ণ ঋষি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের প্রাদুর্ভাব। সুতরাং তাহাতে ও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে কৃষ্ণ নারায়ণের অবতার। এই বিষয়ের অধিক আলোচনা পরে করা যাইবে।

‘মহাভারতে’ কৃষ্ণনামে আরও দুইজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উল্লেখ আছে,—একজন পরমর্ষি ভগবান্ বেদব্যাস, অপর জন মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন। বেদব্যাসের মূল নাম কৃষ্ণ ও দ্বৈপায়ন ছিল। কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন রাখা হয়। পরে বড় হইয়া বেদের ব্যাস করেন বলিয়া তিনি বেদব্যাস, সংক্ষেপে ব্যাস, নামে প্রসিদ্ধ হন।[১] ‘মহাভারতে’র স্থানে স্থানে তিনি কৃষ্ণনামেও উল্লিখিত

---

১) মহাভা, ২।৫২।৩৩—৪ ২) মহাভা, ৭।১১।৩৮·১ ৩) মহাভা, ৭।১১।৪২·১

৪) মহাভা, ১।২৩৬।১৩ ৫) মহাভা, ১৬।৬।২১·২

৬) যথা দেখ—মহাভা, ১।১৮৯।৯ ; ১৯৩।১৮, ২১ ; ২০৪।১৫—৬ ; ইত্যাদি।

৭) পরের প্রকরণ দেখ। ৮) মহাভা, ১।২২০।১৬-৮ ; ২২২।৭ ৯) মহাভা, ১।১৯১।২৪ ; ১৯৩।২১

১০) মহাভা. ২।১৪।৪৬—

১১) মহাভা, ২।১৪।৬৮

১২) মহাভা, ১।১০৫।১৪—৫ ; আরও দেখ—১।৬৩।৮৫-৮

হইয়াছেন।[১] পঞ্চম বেদ বলিয়া খ্যাত 'মহাভারত'কে কৃষ্ণ কর্তৃক বিরচিত বলিয়া 'কার্ষ্ণ্যবেদ' ও বলা হয়।[২] তবে অপরাপর কৃষ্ণ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ তিনি বিশেষভাবে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে অভিহিত হইতেন। পিতৃনামানুসারে তাঁহাকে 'পারাশর কৃষ্ণ' বা 'পারাশর্য কৃষ্ণ' ও বলা যায়। অর্জুনের প্রসিদ্ধ দশ নামের একটি কৃষ্ণ।[৩] 'মহাভারতে'র কোথাও কোথাও ঐ নামেও তিনি উল্লিখিত হইয়াছেন দেখা যায়।[৪] এবং ঐ নাম অনুসারেই তাঁহার পুত্র অভিমন্যুকে কখন কখন কার্ষ্ণিও বলা হইয়াছে।[৫] অর্জুন নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই তাঁহার পিতা আদর করিয়া তাহাকে কৃষ্ণ ডাকিতেন।[৬] বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন যে তাঁহার গায়ের রং কাল (= কৃষ্ণ) ছিল বলিয়াই তাঁহার নাম কৃষ্ণ হয়।[৭] কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তাহা বলিয়াছেন।[৮] তাঁহার ঐ নামের অপর ব্যুৎপত্তিও পরে পরে কল্পিত হইয়াছে।[৯] 'মহাভারতে'র একাধিক স্থলে বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ বা বাসুদেব কৃষ্ণ এবং পাণ্ডব কৃষ্ণ এই দুই কৃষ্ণ একত্রে "কৃষ্ণৌ" (='কৃষ্ণদ্বয়') বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন দেখা যায়।[১০] ভগবান্ নারায়ণ ঋষির এই ভাইয়ের নামও কৃষ্ণ ছিল।[১১] তবে তাঁহার তত প্রসিদ্ধি ছিল না।[১২] বর্তমান পুস্তকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ' বলিতে আমরা বিশেষভাবে বার্ষ্ণের কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছি।

---

১) যথা দেখ—মহাভা, ১।৬০।১৩ ; ১।১০৬।৫, ২৫ ; ১।১৯৮।১, ৩, ইত্যাদি।

২) মহাভা, ১।১।২৬৮ ; ১।৬২।১৮ ; ১৮।৫।৪১

কেহ কেহ মনে করেন যে 'কৃষ্ণ-বিষয়ক' অর্থাৎ 'বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খ্যাপক' বলিয়াই 'মহাভারত'কে 'কার্ষ্ণ্য বেদ' বলা হয়। পরন্তু উহা ঠিক মনে হয় না। কেননা, পরে কথিত হইয়াছে যে "কৃষ্ণপ্রোক্তামিমাং পুণ্যাং ভারতীমুত্তমাং কথাম্"—(১।৬২।৩'২)। আরও দেখ—১৮।৫।৩৬।

৩) মহাভা, ৪।৪৪।৭—১২ দেখ। ৪) যথা দেখ—মহাভা, ১৪।৭৭।৮

৫) যথা দেখ—৬।১০০।২৩'২, ৩০'১ ইত্যাদি ৬) মহাভা, ৪।৪৫।২২ ৭) মহাভা, ১২।৩৪২।৭৯

৮) মহাভা, ১।১৯৯।৩৪'২

গায়ের রং অনুযায়ী নামকরণের দৃষ্টান্ত 'মহাভারতে' আরও পাওয়া যায়। যথা, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাতা সত্যবতীকে 'কালী'ও বলা হইত। দ্রৌপদীকে 'কৃষ্ণা'ও বলা হইত। গায়ের রং হইতেই যুধিষ্ঠিরের নাম 'পাণ্ডু' রাখা হয়। (মহাভা, ১০৬।১৬-২৩) কৃষ্ণ ও বলরামকে "সিতাসিতৌ যদুবরৌ" বলা হইয়াছে। (মহাভা, ৯।৬৩।১২)

৯) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৭০।৫ ; ১২।৩৪২।৭৯'১ পুরাণে 'কৃষ্ণ' নামের আরও বহু নিরুক্তি পাওয়া যায়। যথা দেখ—দেবীভাগপু, ৮।২।২৪-২৬'১ ; ব্রহ্মবৈবর্তপু, ব্রহ্ম খণ্ড, ২৮।৬৬-৭ ; প্রকৃতি খণ্ড, ২।২৪-৬ কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ১৩।৫৫-৬২

১০) যথা দেখ—মহাভা, ১।২।১২৭ ; ২।২০।২৪ ; ৩।৮৬।৪ ; ইত্যাদি। "কৃষ্ণাভ্যাং" (১।২২৯।২০ ; ৮।৪০।১৮-৯ ; ইত্যাদি)।

১১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৯, ১৮।

১২) 'মহাভারতে' কৃষ্ণ নামে আরও কতিপয় অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির বা বস্তুর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, শিবের সহস্র নামের একটি কৃষ্ণ। ভীষ্মের শরশয্যায় উপস্থিত ঋষিগণের এক জনের নাম কৃষ্ণ। (১২।৪৭।১২'১) উনি দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ বা বেদব্যাস হইতে ভিন্ন। কেননা, ইহাঁর নাম পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। (১২।৪৭।৫) কৃষ্ণ নামে স্কন্দের এক সেনা (৯।৪৫।৫৭) এবং বরুণের প্রাসাদে এক সর্প (২।৯।৮) ছিল। কথিত হইয়াছে যে পশ্চিম দিকের দ্বীপে কৃষ্ণ নামে এক পর্বত ছিল ; উহা নারায়ণের প্রিয় ("নারায়ণসখঃ") ছিল এবং কেশব স্বয়ং উহাতে দিব্য রত্নসমূহ রক্ষা করেন। (৬।১২।৪'২—৫)।

বসুদেব-নন্দন

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে 'মহাভারতে'র কৃষ্ণের,—পাণ্ডব-সখা যাদব বা বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব এবং মাতার নাম দেবকী। পরন্তু কোন কোন আধুনিক লেখক তাঁহার পিতার মূল নাম বসুদেব ছিল কিনা সন্দেহ করেন। কৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব। ঐ সকল লেখক অনুমান করেন যে তাঁহার ঐ বাসুদেব নাম হইতেই পরে পরে ইহা কল্পিত হইয়াছে যে তাঁহার পিতার নাম বসুদেব। যথা, সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির উক্তি[১] হইতে মনে হয় যে তিনি 'বাসুদেব' নামের ব্যুৎপত্তি 'বাসুদেবের পুত্র বা বংশজ' রূপে করিয়াছেন, 'বসুদেবের পুত্র বা বংশজ' রূপে করেন নাই; তাহাতে অনুমান হয় যে বাসুদেবের পিতার নাম যে বসুদেব উহা নিশ্চয় পরে কল্পিত হইয়াছে।[২] হার্মান জেকোবি বলেন,—'তৈত্তিরীয়রণ্যকে' (১০।১।৭) নরসিংহ'কে 'নারসিংহ' বলা হইয়াছে; তাহা হইতে বোধ হয় যে 'বাসুদেব' শব্দ 'বসুদেব' শব্দেরই, হয়ত লৌকিক রূপান্তর; তাহাতে কৃষ্ণের বাসুদেব নাম তাঁহার (প্রকৃত) বসুদেব নাম হইতে (বিকৃত হইয়া) উৎপন্ন হইয়াছে মনে হয়; এই অনুমান সত্য হইলে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে যে তাঁহার বসুদেবের পুত্র হওয়ার কাহিনী সত্য নহে,—তাঁহার বাসুদেব নাম হইতেই তাঁহার পিতার নাম বসুদেব বলিয়া পরে পরে কল্পনা করা হইয়াছে মনে হয়। তাঁহার এই অনুমানের সমর্থনে জেকোবি লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণ বিষয়ক প্রাচীনতম কিম্বদন্তীতে তাঁহার পিতার নামের উল্লেখ নাই, পরন্তু তাঁহার মাতার নামোল্লেখ আছে,—তাঁহাকে 'দেবকীপুত্র' বলা হইয়াছে।[৩] অপর পক্ষে পার্জিটার লিখিয়াছেন যে, মহাভারতপুরাণাদিতে কৃষ্ণ তাঁহার বিভিন্ন পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে 'দাশার্হ', 'মাধব', 'সাত্বত', 'বার্ষ্ণেয়' এবং 'শৌরি' নামে এবং তাঁহার পিতার নামানুসারে 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হইয়াছেন।[৪]

বৃষ্ণি-বংশীয় 'বাসুদেব' সংজ্ঞার ভগবান্ পতঞ্জলি-কৃত ঐ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ভাণ্ডারকরের উক্ত ধারণা যথার্থ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং তন্মূলে তিনি যে অনুমান করিয়াছেন 'বাসুদেবের পিতার নাম যে বসুদেব উহা নিশ্চয় পরে কল্পিত হইয়াছে', তাহাও আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। আমাদের মনে হয় যে পতঞ্জলি যেমন 'বালদেব'কে 'বলদেব' হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তেমন 'বাসুদেব'কে 'বসুদেব' হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে ভাণ্ডারকরের যুক্তি "বলদেব বাসুদেবের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বসুদেবের সঙ্গে নহে" মোটেই

---

১) "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুর্বণঃ সেনান্তাণ্ন্যঃ"—কাত্যায়নের বার্তিকের (পানিনি, ৪।১।১১৪ সূত্রের ৭ম বার্তিক) ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, "অন্ধকাণোঽবকাশঃ। শ্বাফল্কঃ শ্বৈত্রকঃ। ণ্যস্ত স এব। উগ্রসেনো নামান্ধকস্তস্মাদুভয়ং প্রাপ্নোতি। ণ্যো ভবতি বিপ্রতিষেধেন। ঔগ্রসেন্যঃ। বৃষ্ণ্যণোঽবকাশঃ। বাসুদেবঃ বালদেবঃ ইত্যাদি। (মহাভাষ্য, কীলহর্ণের সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

২) R. G. Bhandarkar, Vaisnavism etc, p. 15.

৩) Encyclopeedia of Religion and Ethics এ 'Incarnation (Indian)' বিষয়ক জেকোবির প্রবন্ধ দেখ। (Vol. 7, pp. 193-7)

৪) F, E, Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, p. 140

সারবান নহে। সুতরাং ঐ ব্যুৎপত্তি দ্বারা পতঞ্জলি স্বীকার করিয়াছেন যে বাসুদেবের পিতার নাম বসুদেব ছিল। জেকোবি সত্যই প্রদর্শন করিয়াছেন যে উপনিষদে 'নরসিংহ'কে কখন কখন 'নারসিংহ' বলা হইয়াছে। পাণিনির ব্যাকরণের বার্তিককার কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে বেদে অনেক সময় দৃষ্ট হয় যে শব্দের আদ্যস্বরকে দীর্ঘ করা হয়।[১] পতঞ্জলি তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 'পূরুষ' ও 'নারক'।[২] তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে 'বাসুদেব' শব্দ 'বসুদেব' শব্দের ছান্দস রূপান্তর মাত্র। পরন্তু সেই হেতুতে জেকোবি যে, ভাণ্ডারকরের ন্যায়, মনে করিয়াছেন, বাসুদেবের পিতার বসুদেব নাম পরে কল্পিত হইয়াছে, তাহাকেও সত্য বলা যাইতে পারে না। কেননা, কাত্যায়ন ইহাও বলিয়াছেন যে শব্দের আদ্যস্বরের দীর্ঘভবন "অনেকান্ত" অর্থাৎ "যে প্রত্যয়ে দীর্ঘত্ব দৃষ্ট হয়, তাহাতেই আবার দৃষ্ট হয় না" (পতঞ্জলি)।[৩] সুতরাং 'বাসুদেব' এবং 'বসুদেব' শব্দদ্বয় একার্থক হইয়াও একই কালে প্রচলিত থাকিতে পারে। এবং উহারা দুই ভিন্ন ব্যক্তির নাম হইতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্বীয় অনুমানের সমর্থনে জেকোবি যে 'ছান্দোগ্যোপনিষদ' হইতে মাতৃ-সম্পর্কে—'অমুকী-পুত্র' বলিয়া কৃষ্ণের পরিচয় প্রদানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই,—তাহাও বিচার-সহ নহে। কেননা, প্রাচীন সাহিত্যে মাতৃনামের উল্লেখে কাহারও পরিচয় প্রদান হইয়াছে দেখিয়া ইহা অনুমান করা যাইতে পারে না যে তাহার পিতার নাম তখন অজ্ঞাত ছিল। উচথ্য (উতথ্য বা) ঋষি ও মমতার সন্তান সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমার উল্লেখ বেদে যেমন "ঔচথ্য" বলিয়া করা হইয়াছে, তেমন 'মামতেয়'ও 'দীর্ঘতমা মামতেয়' বলিয়াও করা হইয়াছে।[৪] দীর্ঘতমা ও উশিজের সন্তান কক্ষীবান্‌কে 'কক্ষীবান্ ঔশিজ' বলিয়াও পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।[৫] বেদের বংশ-ব্রাহ্মণে বহু ঋষির উল্লেখ কেবল 'অমুকী-পুত্র' বলিয়া করা করা হইয়াছে।[৬] 'শাঙ্খায়নারণ্যকে' "রাধেয়" (=রাধা-পুত্র) নামে এক আচার্যের উল্লেখ আছে।[৭] কোন কোন ব্রাহ্মণে একজন ঋষির নাম কেবল "বৈশী-পুত্র" (='বৈশ্যস্ত্রীর পুত্র') বলা হইয়াছে।[৮] ঐ সকল দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান হয়

---

১) ভাণ্ডারকরের যুক্তি গ্রহণ করিলে ইহা পাওয়া যায় যে, পতঞ্জলির মতে, বলদেবের অপত্যগণ 'বালদেব' নামে এবং তাঁহার ভাই বাসুদেবের অপত্যগণ 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হইত। পতঞ্জলি 'বালদেবে'র ন্যায় দ্বিতীয় 'বাসুদেব' সংজ্ঞারই ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন মাত্র। মূল (বা কৃষ্ণের) বাসুদেব নামের ব্যুৎপত্তি দেন নাই। সুতরাং তাহাতে ভাণ্ডারকরের ন্যায় ইহা বলা যাইতে পারে না কৃষ্ণ-বাসুদেবের পিতার নাম যে বসুদেব তাহা পরে কল্পিত।

২) "তূজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য"—পাণিনির এই সূত্রের (৬।১।৭) উপর কাত্যায়নের ৩য় বার্তিক "অন্যেষামপি দৃশ্যতে"... "অন্যেষাং চ দর্শনাৎ"। অন্যত্র (পাণিনির সূত্র) কাত্যায়নের "ছন্দোঽর্থং বহুলং দীর্ঘং" বার্তিকের ব্যাখ্যায়ও পতঞ্জলি 'পূরুষ' ও 'নারক' দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

৩) "অনেকান্তত্বাচ্চ" পানিনির ৬।১।৭ সূত্রের উপর কাত্যায়নের ৪র্থ বার্তিক।

৪) ঔচথ্য—ঋক্‌সং ১।১৫৮। ১ ও ৪; মামতেয়—ঋক্‌সং, ১।১৪৭।৬; ১।১৫২।৬; 'দীর্ঘতমা মামতেয়' —ঋক্‌সং, ১।১৫৮।৬।

৫) কক্ষীবান্ নিজেই 'ঔশিজ' বলিয়া আপনার উল্লেখ করিয়াছেন। (ঋক্‌সং, ১।১২২।৪, ৫)। অপরে তাঁহাকে 'কক্ষীবান্ ঔশিজ' (ঋক্‌সং, ১।১৮।১; ১।১১২।১১) ও 'ঔশিজ' (ঋক্‌সং, ১।১১৯।৯) বলিয়াছেন। দীর্ঘতমা ও উশিজের অপর পুত্র দীর্ঘশ্রবাকেও 'ঔশিজ দীর্ঘশ্রবা' বলা হইয়াছে। (ঋক্‌সং, ১।১১২।১১)

৬) বৃহভ, ৬।৫ ব্রাহ্মণ দেখ। ৭) 'শাঙ্খ্যায়নারণ্যক, ৭।৬

৮) তৈত্তিব্রা, ৩।৯।৭।৩; শতব্রা: (মাধ্য), ১৩।২

যে 'অমুকের বা অমুকীর পুত্র (বা পৌত্র)' বলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখের কিম্বা পরিচয় প্রদানের রীতি বৈদিক-যুগে প্রচলিত ছিল। 'অথর্ববেদে' উহার সমর্থক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। তথায় বহুস্থলে "অসাবামুষ্যায়ণামুষ্যাঃ পুত্র" (অমুকগোত্রোৎপন্ন অমুকীর পুত্র অমুক') বলিয়া লোককে নির্দেশ করা হইয়াছে।[১] 'মহাভারতে'র যুগেও ঐ প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। যথা, 'মহাভারতে', কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভীষ্মকে যেমন পিতা শন্তনুর সম্পর্কে 'শান্তনব' 'শান্তনোঃ পুত্রঃ', 'শান্তনোঃ সুতঃ', 'শান্তনু-নন্দন' ও 'শান্তনু-সুত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তেমন তাঁহার মাতা গঙ্গার সম্পর্কে, 'ভাগীরথী-পুত্র', 'ভাগরথীসুত', 'গঙ্গাসুত', 'গাঙ্গেয়', 'জাহ্নবী-সুত' এবং 'জাহ্নবী-নন্দন' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] শিশুপালকে যেমন পিতৃসম্পর্কে 'দমঘোষসুত' ও 'দমঘোষাত্মজ', তেমন মাতৃসম্পর্কে শ্রৌতশ্রব' বলা হইয়াছে।[৩] মহাবীর কর্ণের দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কুন্তী বা পৃথার গর্ভজ সন্তান এবং রাধার পালিত পুত্র, তথা সূর্যের ঔরস পুত্র এবং অধিরথ নামক সূতের পালিত পুত্র বলিয়া খ্যাত। 'মহাভারতে' তাঁহাকে 'কৌন্তেয়', 'কুন্তীসুত', 'পার্থ', 'রাধাসুত', 'রাধাত্মজ', 'রাধেয়', 'আদিত্য-তনয়', 'আদিত্য-নন্দন', 'অর্কপুত্র', 'সূর্যপুত্র' ইত্যাদি তথা 'আধিরথি', 'সূতনন্দন', 'সূতপুত্র' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪] কবি ভাসের নাটকসমূহেও ঐ প্রথার প্রয়োগ দেখা যায়।[৫] ভাস কখন কখন কৃষ্ণকে দেবকীপুত্র বলিয়াছেন,[৬] যদিও তিনি তাঁহার পিতার নামও অবগত ছিলেন।[৭]

'মহাভারতে' কৃষ্ণকে যেমন 'দেবকীমাতৃ', 'দেবকীনন্দন', 'দেবকীপুত্র', 'দেবকীসুত' এবং 'দেবকীতনয়' বলা হইয়াছে, তেমন 'বসুদেবপুত্র'[৮] 'বসুদেবসুত'[৯] এবং 'বসুদেবাত্মজ'[১০]ও বলা হইয়াছে।[১১] কৃষ্ণের প্রতিপক্ষী শিশুপাল এবং কর্ণও তাঁহাকে বসুদেবের পুত্র বলিয়াছেন।[১২] কৃষ্ণের পরম ভক্ত ভীষ্ম বলিয়াছেন যে তিনি (কৃষ্ণ) বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে

---

১) যথা দেখ—তৈস্ত্বা সর্বৈরভিষ্যামি পাশৈরসাবামুষ্যায়ণামুষ্যাঃ পুত্র। তান্ তে সর্বাননুসন্দিশামি" (অথসং, ৪।১৬।৯) "ইদমহমামুষ্যায়ণস্যামুষ্যাঃ পুত্রস্য বর্চস্তেজঃ প্রাণমায়ুর্নি বেষ্টয়ামি" ইত্যাদি। (অথসং, ১০।৫।৩৬-) ; "সোঽমুমামুষ্যায়ণমমুষ্যাঃ পুত্রমন্নে প্রাণে বধান।" (ঐ, ১০।৫।৪৪)। আরও দেখ—১৬।৭।৮ ; ১৫।৮।২—৩১) "অয়মসাগমুষ্যায়ণঃ"—(তৈত্তিসং, ১।৮।১২।২ ; "ইদমহমমুষ্যাঽমুষ্যায়ণস্য"—(ঐ, ৩।৪।৮।৬)

২) S. Sorensen, An Index to the Names in the Mahabharata, London, 1904, pp. 138-9

৩) Ibid, pp. 200-1 ৪) Ibid, p. 389 ৫) A. D. Pusalker, Bhasa—A study, Lahore, 1940 p. 18

৬) যথা দেখ—'ভাসনাটকচক্র', পৃষ্ঠা ৪০৫ ('পঞ্চরাত্র'), ৪৫৬ ('দূতবাক্য')

৭) 'বালচরিতে' ভাস কৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব বলিয়া একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন।

৮) মহাভা, ৬।৫৯।৮৮·১ আরও দেখ—"পুত্রং চ বসুদেবস্য" (৮।৪১।৮১·২)

৯) মহাভা, ৩।১৪ ; ৬।১২২।২৫·১ ১০) মহাভা, ৮।৭৯।৬৬·১

১১) সোরেন্সনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৪২১ ও ৪২৫ পৃষ্ঠা।

১২) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণপূজার প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শিশুপাল বলেন, "বসুদেবে স্থিতে বৃদ্ধে কথমর্হতি তৎসুতঃ" (মহাভা, ২।৩৭।৬) কর্ণের উক্তির জন্য দেখ—মহাভা, ৬।১২২।২৫ ; ৮।৭৯।৬৬

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।[১] কথিত হইয়াছে যে যদুশ্রেষ্ঠ শূর বসুদেবের পিতা;[২] রাজা দেবকের কন্যা দেবকীর স্বয়ম্বর সভায় যদুবংশীয় মহাপরাক্রমী শিনি দেবকীকে "বসুদেবার্থ" জোর করিয়া গ্রহণ করেন।[৩] 'মহাভারতের স্থানে স্থানে শূরের কন্যা পৃথাকে বা কুন্তীকে 'বসুদেবের ভগিনী',[৪] কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বসুদেবের কন্যা[৫] এবং সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুকে বসুদেবের দৌহিত্র বলা হইয়াছে।[৬] 'মহাভারতে' তথা পুরাণে, বসুদেবের নাম এই প্রকার আরও নানা সম্পর্কে আসিয়াছে। যথা, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধান্তে কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করত পিতা বসুদেবের নিকট যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন।[৭] যদুবংশধ্বংসের পর অর্জুন দ্বারকায় গিয়া মামা বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।[৮] পরের দিন বসুদেব যোগ বলে দেহত্যাগ করেন এবং দেবকী, রোহিণী, প্রভৃতি তাঁহার চারি স্ত্রী সহমরণ করেন,[৯] বসুদেব বিশ্বদেবগণে প্রবেশ করেন।[১০] মহাভারত পুরাণাদিতে যেখানে যেখানে যদুবংশের বিবরণ আছে, সেইখানে বসুদেবের নাম আছে,—শূরের পুত্রের, তথা কৃষ্ণের বা বাসুদেবের পিতার, নাম বসুদেব বলা হইয়াছে।[১১] এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বসুদেবের নাম পরে কল্পিত বলিয়া মনে করা অতীব কঠিন।

কৃষ্ণ-বাসুদেবের পিতার মূল নাম বসুদেব ছিল না বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহাদের বলা উচিৎ মনে হয় যে উহা কি ছিল এবং কেন পরিত্যক্ত হয়, নূতন নামকরণ কি প্রয়োজনে হইয়াছিল? কৃষ্ণের পূর্বে কপিলের ও নাম বাসুদেব বলিয়া ছিল।[১২] তিনিও ভগবান্ হরির বা বাসুদেবের অবতার বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন।[১৩] তাঁহার বাসুদেব নাম হইতে তাঁহার পিতার নাম 'বসুদেব' বলিয়া কল্পিত হয় নাই। কৃষ্ণের পিতার নাম ঐ প্রকারে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার বিশেষ হেতু কি?

'মহাভারতে' কৃষ্ণের পিতার অপর এক নাম দৃষ্ট হয়—আনকদুন্দুভি। পরন্তু সেই নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে। অধিকাংশত তিনি 'বসুদেব' নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং উহাই তাঁহার মূল নাম বলিয়া মনে হয়।

---

১) "যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ" (মহাভা, ১২।৪৭।২৯.১
অংশাবতরণ-পর্বে আছে

"অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ।
বসুদেবাত্তু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ॥" (মহাভা, ১।৬৩।৯৯)

২) মহাভা, ১।৬৭।১৩০.১ ; ১।১১১।১ ; ৭।১৪৪।৭.২ ৩) মহাভা, ৭।১৪৪।৮

৪) মহাভা, ৩।৩০৩।২৪

৫) "বসুদেবসুতাং শুভাং" (মহাভা, ১।২২১।১৪) ;
"দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা।" (মহাভা. ১।২২১ ; ১৮.১)

৬) মহাভা, ১৪।৬১।৩ ৭) মহাভা ১৪।৬১।১—৩, ৫, ৭ ৮) মহাভা, ১৬।৭।১

৯) মহাভা, ১৬।৭।১৫—৬ ১০) মহাভা, ১৮।১৭—৮

১১) দেখ—মহাভা, ১।৬৭।১৩০ ; ৭।১৪৪।৬—

১২) মহাভা, ৩।১০৭।৩১ ; বাল্মীক 'রামায়ণ', ১।৪০।২৫

১৩) মহাভা, ৩।৪৭।১৯ ; বাল্মীক-রামায়ণ, ১।৪০।২

বসুদেব নাম প্রাচীন শাস্ত্রে অপরিচিত নহে। বিষ্ণুর সহস্রনামের দুই নাম ‘বসু’। পুরাণের বংশবর্ণনায় দেখা যায়, প্রজাপতি দক্ষের এক কন্যার নাম বসু। ধর্মঋষির সহিত উঁহার বিবাহ হয়।[১] ধর্মের ঔরসে এবং বসুর গর্ভে অষ্ট বসু জন্মগ্রহণ করেন। উঁহাদের একজনের নামও নাকি বসু।[২] বসুগণ দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন।[৩] তাহা হইতে ‘বসুদেব’ নামের উৎপত্তি হয়। অষ্টম বসুর অবতার বলিয়া খ্যাত মহাবীর ভীষ্মকেও কখন কখন ‘বসুদেব’ বলা হইয়াছে।[৪] ঐ প্রাচীন নামের অনুকরণে কৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব রাখা হইয়াছিল বলা যায়।[৫]

‘মহাভারতে’ কৃষ্ণের ‘বাসুদেব’ নামের অনেক ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ স্বয়ং একদা অর্জুন-কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া তাঁহার নামসমূহের গুণ ও কর্মজাত নিরুক্তি (“আত্মনো নাম্নাং নিরুক্তং গুণকর্মজম্”) বর্ণনা করেন।[৬] অন্যত্র আছে, সঞ্জয়ও সেই প্রকারে ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বাসুদেবের কতিপয় নামের নির্বচন বর্ণনা করেন।[৭] তাহা হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণের ‘বাসুদেব’ নাম “গুণকর্মজ”, তাহাতে মনে হয় যে বসুদেবের

---

১) যথা দেখ—(বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।৬।৪

২) ঐ, ৬।৬।১০-১

ধর্মঋষিপুত্র অষ্ট বসুর নাম সম্বন্ধে—,মহাভারতে’ ও পুরাণে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা দেখ—মহাভা, ১।৬৭।১৭ ও ১৩।২৫৫।১৭ ; হরিবংশ, ১।৩ ; বিষ্ণুপু, ১।১৫ ; অষ্টবসুর একজনের নাম বসু বলিয়া ‘(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে’ই উক্ত হইয়াছে, মহাভারতাদিতে নহে।

৩) বসুদেবতাদিগের উল্লেখ ‘ঋগ্বেদে’ পাওয়া যায়। যথা, আঙ্গিরস কুৎসঋষি এই বলিয়া অগ্নির স্তুতি করিয়াছেন, “হে অগ্নি! তুমি অতিশয় বিস্তীর্ণ অধ্বরে দেবতাদিগের অদ্ভুত মিত্র দেব, এবং বসুদিগের চারু বসু হও। আমরা তোমার যজ্ঞগৃহে বর্তমান থাকিব। তোমার (সহিত আমাদের) সখ্য (স্থাপিত) হইলে আমরা হিংসিত হইব না।” (ঋক্‌সং, ১।৯৪।১৩) তাঁহার মতে অগ্নি “প্রথম” (অর্থাৎ “সর্বদেবগণের মুখ্য” (সায়ন)) [ঐ, ১।৯৬।৩) এবং “বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোঃ” (‘সমস্ত প্রজাদিগের রক্ষক এবং দ্যাবাপৃথিবীর জনয়িতা’)। [ঐ, ১।৯৬।৪) মহাভারতপুরাণাদিতেও আছে যে অষ্টবসুর একজনের নাম অনিল বা অগ্নি।

৪) মহাভা, ১৮।৫।১১·২

ভীষ্ম-কৃত কৃষ্ণস্তবে আছে,

“বাসুদেবো বসূনাং ত্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা।
দেবদেবোঽসি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥”—(মহাভা, ৬।৬৮।৫)

এইখানে ‘বসুদেব’কেই ‘বাসুদেব বলা হইয়াছে।

৫) কৃষ্ণের পিতার বসুদেব নাম সম্বন্ধে আচার্য জীবগোস্বামীর মতের জন্য তাঁহার ‘ভাগবতসন্দর্ভ’ (‘ভাগবতসন্দর্ভ’ ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা) দেখ।

৬) মহাভা, ১২।৩৪১।৩-৪

৭) মহাভা, ৫।৭০।৩—

দেখ— “বিষ্ঠতে স চ সর্বস্মিন্ সর্বং তস্মিন্ চ বিষ্ঠতে॥
তস্মাৎ সংবিদিতি প্রোক্তো মহান্ বৈ বুদ্ধিমত্তরৈঃ।”—(বায়ুপু, ৪।৪০·২—৪১·১)

পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণের নাম 'বাসুদেব' হয়,—'মহাভারত'-কার এমন মনে করিতেন না।[১] তবে 'হরিবংশে' আছে, "বসুদেবকুলে জাতো বাসুদেবেতি শব্দিতঃ।"[২]

গীতাধর্মের উপদেষ্টা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পাণ্ডবগণের সখা এবং মন্ত্রী মহাপুরুষ কৃষ্ণের পরম বাণী 'ভগবদ্‌গীতা'য় সংগৃহীত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং তিনিই গীতাধর্মের উপদেষ্টা। কেহ কেহ তাহাতে সংশয় করেন। বীণ্টার্নীজ বলিয়াছেন, "পাণ্ডবদিগের সখা ও পরামর্শদাতা কৃষ্ণ, ভগবদ্‌গীতার তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রচারক কৃষ্ণ, যুব-সভার বীর ও অসুর-নিষূদন কৃষ্ণ, গোপীদিগের প্রিয়তম ও বল্লভ কৃষ্ণ এবং পরিশেষে, দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। ইহা অতি অধিকতর সম্ভব যে দুই বা কতিপয় কিম্বদন্তীপরম্পরাগত কৃষ্ণ ছিলেন, যাঁহারা পরবর্তী কালে একই দেবতারূপে সংমিশ্রিত হইয়াছিল"।[৩] তিনি মনে করেন যে, অন্তত পাণ্ডব-সখা কৃষ্ণ, 'হরিবংশে'র কৃষ্ণ এবং পরদেবতা বিষ্ণু ভিন্ন ভিন্ন ছিলেন।[৪] রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মনে করেন যে বৃষ্ণিবংশীয় রাজপুত্র বাসুদেবের গোকুলে লালিত পালিত হওয়ার কিম্বদন্তী তাঁহার 'মহাভারতে' বর্ণিত পরবর্তী জীবন চরিতের সঙ্গে খাপ খায় না।[৫] তবে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতেন যে ঐ বাসুদেবই অর্জুনের নিকট গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।[৬] তিনি আবার ইহাও লিখিয়াছেন যে ভগবদ্‌গীতা যখন তৎকর্তৃক উপদিষ্ট বলিয়া লিখিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে; বুদ্ধের উপদেশসমূহ যখন পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন বুদ্ধ যেমন বাঁচিয়া ছিলেন না, উহাও তদ্রূপ।[৭] চিন্তামণি রাও বিনায়ক বৈদ্য দেখাইয়াছেন যে "গোকুলে, তথা মহাভারতে, শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র আছে, উহা যথার্থই অতি উদাত্ত, এবং উহা ভগবদ্‌গীতার দিব্য উপদেশের কোন প্রকারে বিপরীত নহে।[৮]

---

১) 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে সৌভরাজ শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করেন। তিনি স্পর্ধা করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,

> "........................ক্বাসৌ বৃষ্ণিকুলাধমঃ।
> বাসুদেবঃ স মন্দাত্মা বসুদেবসুতো গতঃ॥"—(মহাভা, ৩।১৪।৮)

কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাতে 'মহাভারত'-কার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে 'বসুদেবসুত' বলিয়াই কৃষ্ণের নাম বাসুদেব হইয়াছে। (H. Roychaudhuri, Early History of Vaisnavism, p. 34) পরন্তু ঐ অনুমান বিচারসহ নহে,—উহা সত্য মনে হয় না।

২) হরিবংশ, ৩।৮২।১৯'১

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও সেই প্রকারে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে বসুদেবের পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণের নাম বাসুদেব হয়। (১০।৮।১৪=২৬।২৭)

৩) M. Winternitz, A History of Indian Literature, Eng trans , Vol. 1 pp 456-7

৪) ঐ গ্রন্থ, ৪৫৭ পৃষ্ঠা

৫) R G Bhanderkar, Vaisnavism etc, p. 50

৬) ঐ, ১১ পৃষ্ঠা

৭) ঐ, ৪২ পৃষ্ঠা

৮) 'হিন্দি মহাভারতমীমাংসা', পৃষ্ঠা ৫৬৮—

তাঁহার মতে, "ইহাতে সন্দেহ নাই যে ভগবদ্গীতায় যেই শ্রীকৃষ্ণের মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐ শ্রীকৃষ্ণই 'ভারতে' এবং 'হরিবংশে' বর্ণিত হইয়াছেন ; এবং উনিই মথুরার, তথা দ্বারকার, শ্রীকৃষ্ণ। আর ঐ শ্রীকৃষ্ণেরই মত ভগবদ্গীতায় ব্যাসের আর্ষ, দিব্য এবং বলবতী বাণী দ্বারা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে।"[১]

'গীতা'র প্রথম অধ্যায় আলোচনা করিলে নিশ্চিতরূপে অবগতি হয় যে কৃষ্ণ যাঁহাকে গীতাধর্মের উপদেশ করেন, সেই অর্জুন মহাবীরবর মধ্যম পাণ্ডবই। কোন কোন আধুনিক সমালোচক প্রথম অধ্যায়ের প্রমাণ হয়ত গ্রহণ করিবেন না। কেননা, তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন যে ঐ প্রথম অধ্যায় মূল গীতার অঙ্গীভূত ছিল না। তাহা অভ্যুপগম করিলেও উক্ত সিদ্ধান্তের কোন হানি হইবে না। কেননা, গীতাধর্ম ব্যাখ্যা করিতে করিতে কৃষ্ণ স্থানে স্থানে অর্জুনকে পার্থ, কৌন্তেয়, পাণ্ডব, কুরুনন্দন, কুরুশ্রেষ্ঠ, প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ঐ অর্জুন কুরুবংশীয় পাণ্ডু এবং পৃথার বা কুন্তীর পুত্র। কৃষ্ণ অর্জুনকে কখন কখন ধনঞ্জয় এবং সব্যসাচী বলিয়াও সম্বোধন করিয়াছেন। ঐগুলি পাণ্ডব অর্জুনেরই বিশিষ্ট নাম।[২] সুতরাং ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না যে 'গীতা'র শ্রোতা অর্জুন পাণ্ডবই। ইহাও সেই প্রকারে নিঃসন্দিগ্ধ যে গীতার বক্তা বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণই। কেননা, অর্জুন প্রশ্ন করিতে গিয়া গীতার বক্তাকে কখন কখন যেমন কৃষ্ণ, তেমন বার্ষ্ণেয় এবং যাদব বলিয়াও সম্বোধন করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে ঐ কৃষ্ণ যদুবংশীয় ও বৃষ্ণিবংশীয়। অর্জুন কখন কখন উহাঁকে অচ্যুত, কেশব, হৃষীকেশ, জনার্দন, মধুসূদন এবং কেশিনিষূদনও বলিয়াছেন। ঐগুলি 'মহাভারতে'র বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণেরই গুণকর্মজ বিশিষ্ট নামসমূহ।[৩] সুতরাং 'গীতা'র বক্তা 'মহাভারতে'র কৃষ্ণই।

ঐ বিষয়ে অপর কতিপয় প্রমাণও আছে। যথা,—

(১) 'মহাভারতে'র কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডব অর্জুনের সখা ও হিতকামী, 'গীতা'র বক্তা কৃষ্ণও তেমন শ্রোতা অর্জুনের সখা ও হিতকামী।[৪]

(২) 'গীতার শ্রোতা অর্জুন বক্তা কৃষ্ণকে বলেন যে তিনি নারদ ব্যাসাদি ঋষিগণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে উনি (কৃষ্ণ) পরব্রহ্ম, পরমধাম, দিব্য শাশ্বত পুরুষ, আদিদেব, পরমপবিত্র, অজ এবং বিভু।[৫] পরে প্রদর্শিত হইবে যে নারদব্যাসাদি ঋষিগণ 'মহাভারতে'র কৃষ্ণকেই ঐ প্রকার বলিয়া ঘোষণা করেন।

(৩) 'গীতা'-বক্তা কৃষ্ণ অর্জুনকে ঐশ্বররূপ বা বিশ্বরূপ দেখান। 'মহাভারতে'র কৃষ্ণও দুর্যোধনাদিকে,[৬] তথা উত্তঙ্ক ঋষিকে,[৭] ঐশ্বররূপ বা বিশ্বরূপ দেখান। কথিত হইয়াছে

---

১) 'হিন্দি মহাভারতমীমাংসা' ৫৭০ পৃষ্ঠা

২) অর্জুনের দশ প্রসিদ্ধ নাম এই—অর্জুন, ফাল্গুনি, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ধনঞ্জয়। (মহাভা, ৪।৪৪।৯) অর্জুন নিজে উহাদের নিরুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (মহাভা, ৪।৪৪।১৩-২২)।

৩) মহাভা, ১২।৩৪১।৮১, ৪৮—৪৯ ; ৩৪২।৬৬-৭ দেখ।

৪) গীতা, ৪।৩·১ ; ১১।৪১-২ ; ১৮।৬৪·২, ৬৫·২

৫) গীতা, ১০।১২-৩

৬) মহাভা, ৫।১৩১।৪-১৩

৭) মহাভা, ১৪।৫৫।৪—

যে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া উত্তঙ্ককে "সেই শাশ্বত বৈষ্ণবরূপ" দেখান যাহা ধনঞ্জয় দেখিয়াছিলেন। উত্তঙ্ক বিশ্বরূপ দর্শন করেন।[১]

(৪) 'গীতা'য় সঞ্জয়ের উক্তি মতেও অর্জুন পার্থ, কৌন্তেয়, পাণ্ডব, ধনঞ্জয় ও কিরীটী এবং কৃষ্ণ কেশব, মধুসূদন, হৃষীকেশ, গোবিন্দ, মহাযোগেশ্বর হরি ও বাসুদেব। সুতরাং উহাঁরা 'মহাভারতে'র অর্জুন এবং কৃষ্ণ।

ঐ সকল অন্তরঙ্গ প্রমাণ ব্যতীত 'গীতার বহিঃস্থ প্রমাণ হইতেও অবগতি হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পার্থসারথি এবং পাণ্ডব-সখা বাষ্ণেয় কৃষ্ণই 'গীতা'র বক্তা। 'মহাভারতে'র প্রারম্ভে বিবৃত কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে স্বপক্ষের সম্যক্ পরাজয় এবং সম্পূর্ণ সর্বনাশের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপে উক্ত হইয়াছে যে যুদ্ধের প্রারম্ভে "রথোপস্থ অর্জুন সীদমান ও কশ্মলাভিপন্ন হইলে কৃষ্ণ (আপন) শরীরে লোকসমূহ দর্শন করাইয়াছিলেন।"[২] অনন্তর পর্বসংগ্রহপর্বে আছে যে ভীষ্মপর্বে "মহামতি বাসুদেব মোক্ষদর্শী হেতুসমূহ দ্বারা পার্থের মোহজ কশ্মল নাশ করিয়াছিলেন।"[৩] 'নারায়ণীয়াখ্যানে' উক্ত হইয়াছে যে "কুরু ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে যখন অর্জুন বিমনস্ক হন, তখন (একান্তধর্ম) স্বয়ং ভগবান্ (কৃষ্ণ) কর্তৃক গীত হইয়াছিল।"[৪] 'অনুগীতা'র অবতরণিকায় এবং উপসংহারেও তাহার উল্লেখ আছে।[৫]

'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণ ও 'মহাভারতে'র কৃষ্ণ

কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে গ্রীয়ার্সন প্রমুখ কোন কোন আধুনিক লেখক মনে করেন যে 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' উক্ত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং মহাভারতে সুপ্রসিদ্ধ যাদব বৃষ্ণি বা সাত্বত বংশীয় বসুদেব ও দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি।[৬] বোথলিঙ্গ,[৭] গার্বে,[৮] প্রভৃতি অপরেও সেই প্রকার মত পোষণ করেন। হপ্‌কিন্স ঐ বিষয়ে সংশয়ান্বিত দেখা যায়। কেননা Religions of India 'ভারতবর্ষের ধর্মসমূহ' নামক স্বকৃত গ্রন্থের এক স্থলে (৪৬৫ পৃষ্ঠায়) তিনি লিখিয়াছেন, 'মহাভারতে'র দেবমানব এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৩।১৭।৬) উক্ত (দেবকীপুত্র কৃষ্ণ নামে) ব্যক্তি নিশ্চয় একই হইবেন। কিঞ্চিৎ পরে (৪৬৬ পৃষ্ঠায়) তিনি লিখিয়াছেন, "যাহা হউক, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না যে, গঙ্গা-প্রান্তীয় কৃষ্ণের উপাসনা পদ্ধতি সেই অস্পষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে উৎপন্ন হইয়াছিল যাহার শিষ্যত্ব (ছান্দোগ্য) উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। মোক্ষমূলর ঐ অনুমান পরিষ্কার অস্বীকার করিয়াছেন। মেক্‌ডোনেল এবং কীথ তাহাতে সংশয় করিয়াছেন।[৯] কীথ পরে বিস্তারিতভাবে ঐ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উক্ত দুই কৃষ্ণের চরিত্রে বহু পার্থক্য আছে'—তাঁহাদের

---

১) মহাভা, ১৪।৫৫।৪-৫ ২) মহাভা, ১।১।১৮১ ৩) মহাভা, ১।২।২৪৬'২-২৪৭'১

৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।৮ ; পূর্বে দেখ।

৫) মহাভা, ১৪।১৬।৫-৭ ; ১৪।৫১।৪৯— পূর্বে দেখ।

৬) পূর্বে দেখ। ৭) সেণ্ট পিটার্সবার্গ সংস্কৃতকোশের ২য় খণ্ডের ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

৮) Garbe, Introduction to the Bhagavadgita, Eng. trans, p. 9.

৯) Macdonell and A. B. Keith, Vedic Index, Vol. 1, p. 184

অভিন্নতা স্থাপনের কোন উপায় দেখা যায় না।[১] শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় গার্বে গ্রীয়ার্সনাদির মত অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা ঐ মতকে সিদ্ধ করিতে প্রযত্ন করেন নাই। পরন্তু রায়চৌধুরী উহার স্বপক্ষে এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।[২]

(১) উভয় কৃষ্ণই দেবকীপুত্র।

(২) 'মহাভারতে'র কৃষ্ণের নাম 'অচ্যুত'। উপনিষদের বচনে, হিল দেখাইয়াছেন যে, ঘোরের শিষ্যকে তদ্রূপ 'অচ্যুত' বলা হইয়াছে।

(৩) 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস বা অঙ্গিরা-বংশীয় ছিলেন। 'ঋগ্বেদ' (৩।৫৩।৭) হইতে জানা যায় যে আঙ্গিরসগণ ভোজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। ভোজগণ বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণের আত্মীয়। কৃষ্ণ "আঙ্গিরসী শ্রুতি"কে "শ্রুতীনামুত্তমা শ্রুতিঃ" ('শ্রুতিসমূহের মধ্যে উত্তম শ্রুতি') বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।[৩]

(৪) 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণ এবং তাঁহার গুরু ঘোর আঙ্গিরস সূর্যোপাসক ছিলেন। 'মহাভারত' হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত সাত্বতবিধি "প্রাক্‌সূর্যমুখনিঃসৃতঃ" ('প্রথমে সূর্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়')

(৫) 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণকে তাঁহার গুরু "তমের পরবর্তী" ('তমসস্পরি' "উত্তম জ্যোতি"র ('জ্যোতিরুত্তমম্') উপাসনা এবং "তপ, দান, আর্জব, অহিংসা এবং সত্যবচন ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'গীতা'র কৃষ্ণও সেই প্রকার পরমতত্ত্ব এবং ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। পরম জ্ঞেয় পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিও সেই প্রকার বলিয়াছেন "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে" ('তাহা জ্যোতিষ্কসমূহেরও জ্যোতিঃ এবং তমের পরবর্তী বলিয়া কথিত হয়')[৪] এবং মোক্ষপ্রাপক দৈবী সম্পত্তিসমূহের মধ্যে তিনি "দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, আর্জব, অহিংসা এবং সত্যে"র উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

(৬) 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' ঘোর আঙ্গিরস ঋষি কৃষ্ণকে যে বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা 'পুরুষযজ্ঞবিদ্যা'ই। তন্মতে পুরুষ ইহজীবনে যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করে এবং বস্তুত করে—কি পানাহারাদি সাধারণ ব্যবহার, তথা কি তপদানাদি ধর্মাচরণ,—সমস্তকেই যজ্ঞরূপে কল্পনা করিতে হয়। পুরুষের মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম ঐ যজ্ঞের অঙ্গ। "হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হবন কর, যাহা দান কর এবং যে তপ কর তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ কর",[৬] 'গীতা'র এই উপদেশও তৎসদৃশ।[৮]

এই প্রকারে রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণ গুরু হইতে যে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই 'মহাভারতে'র কৃষ্ণ 'গীতা'য় অর্জুনের নিকট ব্যাখ্যা

---

[১] A. B. Keith

[২] Hemchandra Roychaudhuri, Early History of the Vaishnava Sect, 2nd Ed, pp. 57—8, 78—83

[৩] মহাভা, ৮।৭০।৮৫

[৪] গীতা, ১৩।১৭'১ [৫] ঐ, ১৬।১'২-২'১ [৬] ঐ, ৯।২৭

[৭] "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"—'গীতা'র এই বচন (১৮।৪৬'২) উল্লেখ করিলে আরও ভাল হইত।

করেন। তাহাতে, এবং তাঁহাদের মাতৃনামও অভিন্ন বলিয়া, তিনি বলেন, যে উভয় কৃষ্ণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়,—তদ্ভিন্ন পার নাই। পুরাণে আছে, কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির শিষ্য; আর 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণ ঘোর ঋষির শিষ্য। তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে উভয় কৃষ্ণ অভিন্ন নহে। রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন, সান্দীপনি মুনির ঐতিহাসিকতা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। থাকিলেও পুরাণের মতে কৃষ্ণ তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যা মাত্র শিক্ষা করেন, ধর্ম বা দর্শন নহে। সুতরাং ধর্ম ও দর্শন শিক্ষার্থ কৃষ্ণের ঘোর ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণের সঙ্গে উহার বিরোধ হয় না।[১]

রায় চৌধুরীর এই সকল যুক্তির কোন কোনটা স্বল্পবিস্তর ভ্রমাত্মক। দ্বিতীয় যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ঘোর আঙ্গিরস বলেন যে তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত পুরুষযজ্ঞবিদ্যার জ্ঞাতা পুরুষ "অন্তবেলায়ামেতৎত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি"। 'মরণকালে এই তিন মন্ত্রের শরণ গ্রহণ করিবে,—'তুমি অক্ষিত' (অর্থাৎ অক্ষীণ বা অক্ষত), 'তুমি অচ্যুত' (অর্থাৎ স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত) এবং 'তুমি সংশিত (বা সূক্ষ্মীভূত) প্রাণ')।[২] সুতরাং ঐ 'অচ্যুত' তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে।[৩] উক্ত পুরুষযজ্ঞবিদ্যাবিদ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরণসময়ে নিজের স্বরূপকে অচ্যুত বলিয়া ভাবনা করিতে ঘোর ঋষি উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। চতুর্থ যুক্তিতে রায় চৌধুরী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে কৃষ্ণ-কর্তৃক ব্যাখ্যাত সাত্বতবিধি প্রথমে সূর্যের মুখ হইতে নির্গত হয়। সেই কারণে, অর্থাৎ সূর্যকে সাত্বতবিধির আদ্য প্রবর্তক মানিলে, তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কৃষ্ণকে সাত্বতধর্মের আদ্য প্রবর্তক বলা যায় না; এতাবন্মাত্র বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণ মৃতপ্রায় প্রাচীন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। অথচ তিনি মনে করেন যে কৃষ্ণই সাত্বতধর্মের প্রবর্তক। সুতরাং 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণের এবং 'মহাভারতে'র কৃষ্ণের অভিন্নতা স্থাপনার্থ এই যুক্তির অবতারণা করিয়া রায়চৌধুরী মহাশয় আত্মবিরোধ করিয়াছেন। 'মহাভারতে' "প্রাক্সূর্যমুখনিঃসৃত" বাক্যের অর্থ যাহা বলিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা অভ্যুপগম করিয়াই আমরা ঐ সমালোচনা করিয়াছি। পরন্তু আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে ঐ বাক্যের তাৎপর্য প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন;—ঐ সূর্য সূর্যদেবতা নহেন। সুতরাং ঐ বচন মূলে সৌরোপাসনার সঙ্গে সাত্বতবিধির সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। অধিকন্তু আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে ঐ বচন বস্তুত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তধারণামূলক।[৪] তৃতীয় যুক্তি একেবারেই বিচারসহ নহে। 'মহাভারতে'র কৃষ্ণ একস্থলে "অথর্বাঙ্গিরসী" শ্রুতিকে[৫] অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন,—উহাকে

---

১) H. C. Roychaudhuri, Early History of the Vaishnava Sect, pp. 78-4

২) ছান্দোগ্যউ, ৩।১৭।৬

৩) হয়ত রায়চৌধুরী মহাশয় নিজেও এই কথা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি হিলের দোহাই দিয়াছেন।

৪) পূর্বে দেখ।

৫) আমাদের ব্যবহৃত 'মহাভারতে'র সংস্করণে (পণ্ডিত শ্রীদামোদর সাতবলেকর কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ, ঔন্ধ) "অথর্বাঙ্গিরসী" পাঠ আছে, "আঙ্গিরসী শ্রুতি" নহে যেমন রায় চৌধুরী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে 'অথর্ববেদ' আদিতে 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ' নামে অভিহিত হইত। (অথসং, ১০।৭।২০ দেখ)

"শ্রুতিসমূহের মধ্যে উত্তম শ্রুতি" বলিয়াছেন, বলিয়া অনুমান করা যায় না যে তিনি ঐ বেদানুযায়ী ছিলেন। 'গীতা'তে কৃষ্ণ বলিয়াছেন "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" ('বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ')।[১] তাহাতে তিনি সামবেদকেই বেদসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। উহার অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে তিনি ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদ।[২] ঐখানে, কিম্বা 'গীতা'র অপর কোথাও, তিনি অথর্ববেদের নামোল্লেখও করেন নাই। এইরূপে দেখা যায় 'গীতা'র কৃষ্ণ 'অথর্বাঙ্গিরসী বেদ'কে শ্রেষ্ঠতম বেদ বলিয়া মনে করিতেন না। অথচ 'মহাভারতে'র উক্ত স্থলে তিনি যে অথর্ববেদের অত উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কারণ ভিন্ন। ঐ বচনের প্রকরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ সময়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়া এমন একটা কাজ করাইতে চাহিতেছিলেন যাহার সমর্থক প্রমাণ তিনি একমাত্র 'অথর্ববেদে'ই পাইয়াছিলেন, অপর কোন বেদে, কিম্বা বৈদিকশাস্ত্রে, নহে। 'অথর্ববেদে'র আপেক্ষিক লাঘব হেতু অর্জুন তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য করিতে পাছে অস্বীকার করে, তাই তিনি উহাকে অতি প্রশংসা করেন। সুতরাং উহা অর্থবাদোক্তি মাত্র—এবং তাহাও বিশেষ অভিপ্রায়ে কৃত,[৩] যথার্থোক্তি বা কৃষ্ণের দৃঢ়নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নহে। প্রাচীন ভাগবতধর্মের সঙ্গে 'অথর্বাঙ্গিরসবেদে'র কোন

তাহার কারণ এই যে উহাতে প্রধানতয়া আথর্বণ এবং আঙ্গিরস ঋষিগণের মন্ত্রসমূহ সংহিত হইয়াছে। 'মহাভারতে' তাহার কারণ ভিন্ন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্র যখন স্বর্গ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তখন ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করেন। তাহাতে সংহৃষ্ট হইয়া ইন্দ্র অঙ্গিরাকে এই বর দেন যে, যে বেদের মন্ত্র দ্বারা তিনি পূজা করিয়াছেন, সেই বেদ অতঃপর 'অথর্বাঙ্গিরস' নামে খ্যাত হইবে। (মহাভা, ৫।১৮।৫—৭) যাহা হউক, পরে পরে উহা সংক্ষেপে 'অথর্ববেদ' নামেও অভিহিত হইতে থাকে (দেখ—গোপথব্রাহ্মণ, ১।১।২৯)। উহার অপর নাম 'ব্রহ্মবেদ' (অথসং, ১৫।৩।৭)। কেননা, উহা যজ্ঞের ব্রহ্মা বা প্রধান পুরোহিতের বেদ (গোপথব্রা, ১।৩।২ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি,১।৫,৮)। পরে পরে উহা কখন কখন "ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ (চুলিকাউপ, ১১ এবং 'আঙ্গিরসবেদ' নামেও অভিহিত হইয়াছ। প্রাচীন কালে উহার এক এক শ্রেণীর মন্ত্র বিষয়ক অংশও এক এক বেদ রূপে পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইত দেখা যায়। যথা, 'গোপথব্রাহ্মণে'—উহা অথর্ববেদে'রই ব্রাহ্মণ—"আথর্বণবেদ" (১।১।৫), "আঙ্গিরস বেদ" (১।১।৮), তথা "সর্পবেদ", পিশাচবেদ", "অসুরবেদ" "ইতিহাসবেদ" ও "পুরাণবেদ"—এই "পঞ্চবেদে"র (১।১।১০) উল্লেখ আছে। শ্রৌতসূত্রে বিবৃত আছে যে অশ্বমেধযজ্ঞে হোতা এক এক দিন এক এক বেদ গান করিতেন এবং ঐ বেদের প্রশংসা করিতেন। তৃতীয় দিনে তিনি 'অথর্ববেদ' গান করিতেন, আর বলিতেন "অথর্ববেদো বেদঃ সোঽয়মিতি ভেষজং নিগদেৎ।" চতুর্থ দিনে তিনি আঙ্গিরসবেদ গান করিতেন, আর বলিতেন "আঙ্গিরসো বেদো বেদঃ সোঽয়মিতি ঘোরং নিগদেৎ।" অনন্তর পর পর দিনে তিনি যথাক্রমে "সর্পবিদ্যা বেদ", "রক্ষোবিদ্যা বেদ", "অসুরবিদ্যা বেদ" "ইতিহাসবেদ"ও "পুরাণবেদ" পাঠ করিতেন। (শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, ১৬।২।৯,১২,১৫,১৮,২১,২৪ ও ২৭ ; আরও দেখ ; 'আশ্বালায়ন শ্রৌত সূত্র, ১০।৭ ; Max Miiller, A History of Ancient Sanskrit Literature pp. 19-21 ; 'ইতিহাসবেদে'র উল্লেখ কৌটিল্যের (খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) 'অর্থশাস্ত্রে'ও আছে (১।৩ ; ৭ পৃষ্ঠা)। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (৭।৫।১১।২) আছে, স্বাহর্গভ্যঃ স্বাহা যজুর্ভ্যঃ স্বাহা সামভ্যঃ স্বাহাঽঙ্গিরোভ্যঃ স্বাহা বেদেভ্যঃ…।" ঐখানে 'অথর্বাঙ্গিরসমন্ত্রসমূহ'কে বা 'অথর্বাঙ্গিরসবেদকেই "অঙ্গিরোভ্যঃ" শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, প্রাচীন কালে 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ' সংক্ষেপে যেমন অথর্ববেদ' নামে, তেমন আঙ্গরসবেদ' নামেও, অভিহিত হইত। পরন্তু সায়ন বলেন "অঙ্গিরোভির্মুনির্ভির্দৃষ্টাশ্চতুর্বেদোৎপন্না অঙ্গিরস।"

১) গীতা, ১০।২২'১ ২) গীতা, ৯।১৭'২

৩) যথা প্রয়োজন এক এক বেদকে প্রশংসা করার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। শ্রৌতসূত্রে তাহা দেখা যায়। (পূর্বের ২য় সংখ্যক পাদ টীকা দেখ) সুতরাং তাহার জন্য কৃষ্ণকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।

বিশেষ সম্পর্ক থাকার কোন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১] অপর পক্ষে, 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণের গুরু ঘোর ঋষি আঙ্গিরস ছিলেন বলিয়াই যে অথর্ববেদা'নুযায়ীও ছিলেন, তাহা মনে করা যায় না। কেননা, ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে অনেকে আঙ্গিরস। স্বয়ং ঘোর আঙ্গিরস ঋষি উঁহাদের অন্যতম।[২] তাঁহাকে এবং 'ছান্দোগ্যোপনিষদোক্ত ঘোর আঙ্গিরসকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিবার এক নামৈক্যতা ব্যতীত অপর কোন হেতু অবশ্যই নাই। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায় যে 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণের এবং 'মহাভারতে'র কৃষ্ণের অভিন্নতা প্রদর্শনার্থ রায় চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক উপস্থাপিত তৃতীয় যুক্তি সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর। তিনি লিখিয়াছেন যে পুরাণের মতে কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা মাত্র শিক্ষা করেন, ধর্ম ও দর্শন নহে। ইহা সত্য নহে। কেননা' 'হরিবংশে, পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে সসংগ্রহ ধনুর্বেদ ও শস্ত্রগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ, তথা বলরাম, সান্দীপনি মুনির নিকট অঙ্গসমূহের সহিত বেদ অধ্যয়ন করেন ('সাঙ্গবেদমধীয়েতাম্')। 'বিষ্ণুপুরাণে'ও সেই কথা আছে। তথায় আরও কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া ইহাও বলা হইয়াছে যে "সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদান্ সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি" (অঙ্গসমূহের সহিত চারিবেদ এবং সর্বশাস্ত্রসমূহও নিশ্চয়) তাঁহারা অধ্যয়ন করেন। (বিষ্ণু) ভগবতপুরাণে' আছে যে কৃষ্ণ (ও বলরাম) যদুবংশের কুলাচার্য গর্গের নিকট ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন এবং সান্দীপনি নামে খ্যাত কাশ্যের নিকটে অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমস্ত বেদ, রহস্যের সহিত ধনুর্বেদ, ধর্মসমূহ, ন্যায়পন্থাসমূহ, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, ষড়্‌বিধ রাজনীতি এবং চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করেন।[৩] আরও বিশেষ কথা এই যে ঘোর নামক কোন ঋষি হইতে কৃষ্ণ কোন শিক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া অথবা, এমন কি, তাঁহার সহিত কৃষ্ণের কখনও সমাগম হইয়াছিল বলিয়া 'মহাভারতে' কিম্বা কোন পুরাণে উল্লিখিত হয় নাই।[৪]

---

১) বেদের সঙ্গে প্রাচীন ভাগবতধর্মের সম্বন্ধের বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

২) ঋগ্বেদের ৩।৩৬।১০ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঘোর আঙ্গিরস। কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'তে আছে, "ইমামূ ষু" প্রভৃতি সূক্তের (৩।৩৬ সূক্তের) উপান্তিম (অর্থাৎ ১০ম ঋক্) ঘোর দেখিয়াছিলেন।" ঐ ঋকের প্রারম্ভিক বচন "অগ্নে প্র যন্ধি"। শৌনকের 'আর্যানুক্রমণিকা'য় আছে,—"ঋগেকাগ্নে প্র যন্ধীতি ঘোরস্যাঙ্গিরসস্য তু" (ষড়্‌গুরুশিষ্যের বেদার্থদীপিকা'য় ধৃত) 'বৃহদ্দেবতায় বিবৃত আছে যে ঘোর ঋষির দুই পুত্র কণ্ব ও প্রগাথ। প্রগাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কণ্বকে পিতৃত্বে বরণ করেন। (৬।৩৫—৮) ষড়্‌গুরুশিষ্য অপর এক গ্রন্থ হইতে ঐ ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ('বেদার্থদীপিকা', ১৩৬—৭ পৃষ্ঠা)। প্রগাথ ঘোর কাণ্ব ঋষি এবং তাঁহার বংশজগণ ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের দ্রষ্টা। (বৃহদ্দেবতা' ৬।৩৯) অন্য মণ্ডলেও কণ্ব ঘোর দৃষ্ট মন্ত্র আছে। ১।৩৬—৪৩, ৯।৯৪ সূক্ত) পরন্তু ঐ ঘোর আঙ্গিরস কিনা নিরূপণ করা যায় না। কৌষীতকীব্রাহ্মণে' (৩০।৬) ঘোর অঙ্গিরস নামে এক জন ঋষির নাম আছে। তিনি আদিত্যগণের যজ্ঞে অধ্বর্যু ছিলেন। কথিত হইয়াছে যে আদিত্যগণও অঙ্গিরস এই বলিয়া পরস্পরে স্পর্ধা করিতে লাগিলেন যে "আমরাই প্রথমে স্বর্গে গমন করিব। তদুদ্দেশে আদিত্যগণ যে যজ্ঞ করেন তাহাতে অগ্নি হোতা, বৃহস্পতি ব্রহ্মা, অয়াস্য উদ্‌গাতা এবং ঘোর আঙ্গিরস অধ্বর্যু নিযুক্ত হন।

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৪৫।২৯—৩৬

৪) মহাভারতে ঘোর নামে এক জন ঋষির উল্লেখ আছে। তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। অঙ্গিরার ৮ পুত্র—বৃহস্পতি, উতথ্য, পয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সংবর্ত ও সুধন্বা (মহাভা, ১৩।৮৫—১৩০—১৩১·১)। উঁহারা সকলেই "জ্ঞাননিষ্ঠ ও নিরাময়" (১৩।৮৫।১৩১·২)। পরন্তু ঐ ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণ অপেক্ষা বহু প্রাচীন।

এইরূপে ইহা প্রদর্শিত হইল যে ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণের এবং 'মহাভারতে'র কৃষ্ণের একত্ব সিদ্ধ করিতে রায় চৌধুরী মহাশয় যেই সকল বহিরঙ্গ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন উহাদের একটা ব্যতীত,—তাঁহাদের উভয়েই দেবকীপুত্র—এই প্রমাণ ব্যতীত অপর সমস্তই অল্পাধিক ভ্রমাত্মক। এবার আমরা তদুপস্থাপিত অন্তরঙ্গ প্রমাণদ্বয় পরীক্ষা করিব। তিনি উহাদের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। কতকটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিলে দোষ হইবে না। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশে এবং গীতার উপদেশে তপদানাদি ধর্মের উল্লেখ পাইয়া এবং উভয়ত্র "উত্তম জ্যোতি" রূপে পরব্রহ্মের [১] ভাবনা দেখিয়া তিনি মনে করেন যে উভয়ত্র একই তত্ত্বোপদেশ হইয়াছে,—ঘোর অঙ্গিরসের উপদেশই গীতায় প্রপঞ্চিত হইয়াছে; সুতরাং উভয় কৃষ্ণ অভিন্ন।[২] বেসনগরে প্রাপ্ত বাসুদেব-ভক্ত ভাগবত হেলিয়োদেয়োর গরুড়স্তম্ভের গাত্রে খোদিত লিপিতে আছে,—

"তিনি অমুত-পদানি (ইঅ) (সু) অনুষ্ঠিতানি নেয়ংতি (স্বর্গং) দম চাগ অপ্রমাদ।" 'অমৃত পদ তিনটী—দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ। (ইহসংসারে উত্তমরূপে) অনুষ্ঠিত হইলে উহারা (স্বর্গে) লইয়া যায়। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশে ঐ সকলের উল্লেখ নাই। তাই রায় চৌধুরী মনে করেন যে ঐ সকল ভাগবতধর্মে কৃষ্ণেরই দান।[৩] তাঁহার ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কেননা, 'মহাভারতে' দেখা যায় কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের নিকট গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যার বহু পূর্বে মহর্ষি সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন,

"দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ এতেষ্বমৃতমাহিতম্।"[৪]

'দম, ত্যাগ এবং অপ্রমাদ—এই সকলেই অমৃত আহিত আছে।' বেসনগরের উক্ত শিলালিপির ঐ উক্তি ইহারই প্রতিধ্বনি মাত্র বলিয়া প্রতীতি হয়। সনৎসুজাত আরও বলেন যে "উহারা "ব্রহ্মমুখ্য" অর্থাৎ বেদ যাহাদের প্রধান' অবলম্বন সেই সকল মনীষী ব্রাহ্মণগণের (লক্ষণ)।"[৫] "মনীষী ব্রাহ্মণগণ উহাদিগকে সত্যমুখ বাণী বলেন;[৬] সত্য, দম, তপ, দান প্রভৃতি ব্রাহ্মণমাত্রেরই অবশ্যপালনীয় ব্রতসমূহের অঙ্গসমূহ।[৭] তিনি ঐ সকলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।[৮] সুতরাং দেখা যায় রায় চৌধুরী মহাশয় যেই গুলিকে ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া, ভাগবতধর্মে কৃষ্ণের দান বলিয়া মনে করেন সেইগুলি সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বেও বর্তমান। তন্মতে সেইগুলি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের লক্ষণ। 'মহাভারতে'র অন্যত্র আছে যে ঐ সকল বনচারীর (অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের) নিত্য ধর্ম",[৯] "আর্ষ বিধি"।[১০] স্বায়ম্ভুব মনুও নাকি ঐ সকল ধর্ম

---

১) গীতার উত্তম জ্যোতি যে পরব্রহ্ম তাহা উহাতে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে। আচার্য শৌনক অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে ঘোর আঙ্গিরস কর্তৃক অনুদিত ঋক্‌মন্ত্রের উত্তম জ্যোতিও বস্তুত পরব্রহ্মই। ('বৃহদ্দেবতা', ৮।১৪০)

২) রায় চৌধুরীর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৮২—৩ পৃষ্ঠা দেখ।

৩) ঐ, ৮৮—৯১ পৃষ্ঠা

৪) মহাভা, ৫।৪৩।২২·১

৫) "দমস্ত্যাগোঽথাপ্রমাদ ইত্যেতেষ্বমৃতং স্থিতম্।
এতানি ব্রহ্মমুখ্যানাং ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্॥" (৫।৪৫।৭)

৬) মহাভা, ৫।৪৩।২২·২

৭) মহাভা, ৫।৪৩।২০ ; ৪৫।৫ আরও দেখ—৩।১৮০।২১ ; ১৮১।৪৩।২১,

৮) মহাভা, ৫।৪৩।২৩—৪০ ; ৪৫।৬

৯) মহাভা, ১২।৭।৬ দেখ।

১০) মহাভা, ১২।১২।১৭ ও বৃহদ্দেবতা ৮।১৩০ দেখ

বলিয়াছেন।[১] বিদুর উহাদিগকে “ব্রহ্মের ঘোড়া” (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়) বলিয়াছেন।[২] সুতরাং ঐ সকল কোন এক ধর্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য নহে। আরও দেখা যায়, গীতায় ঐ গুলিকে কোন বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া হয় নাই। কেননা, উহাতে অনেক—সর্বসমেত ২৬—মোক্ষপ্রাপক দৈবী সম্পদ্‌সমূহের মধ্যে ঐ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে মাত্র। জ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিংশতি সাধনের মধ্যে উহাদের মাত্র দুইটির,—অহিংসা ও আর্জবের—উল্লেখ আছে।[৩] অতএব উহাদিগের আধারে ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’র কৃষ্ণ ও ‘মহাভারতে’র কৃষ্ণকে অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না।

এই সমালোচনা হইতে কেহ যেন ইহা অনুমান না করেন যে আমাদের বক্তব্য এই যে ঘোর আঙ্গিরসের উপদিষ্ট বিদ্যার কোন প্রভাব, কোন আভাস গীতোপদিষ্ট তত্ত্বে পাওয়া যায় না। আমাদের বক্তব্য সেই প্রকার নিশ্চয় নহে। ঔপনিষদ তত্ত্বজ্ঞানই প্রাচীন ভাগবতধর্মের উপজীব্য। তাহাতে কোন সংশয় নাই। গীতা ভাগবতধর্মেরই গ্রন্থ,—উহার এক অতি মুখ্য গ্রন্থ। সুতরাং উহাতেও ঔপনিষদ তত্ত্বজ্ঞান প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ঘোর আঙ্গিরসের উপদিষ্ট বিদ্যা উপনিষদেরই অন্তর্গত,—একমাত্র ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ই উহা নিহিত দেখা যায়। সুতরাং উহারও ছায়া যে গীতায় আছে, তাহা স্বাভাবিকই। অতএব তাহার প্রতি অত্যধিক মহত্ত্ব প্রদানের কোন কিছু নাই। যতক্ষণ ইহা প্রদর্শিত না হয় যে ঔপনিষদ তত্ত্ববিদ্যার সাধারণ ভাবধারা হইতে ঘোরোপদিষ্ট বিদ্যার ভাবধারার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং ঐ অসাধারণ ভাববৈশিষ্ট্যই গীতায় মুখ্যতয়া প্রপঞ্চিত হইয়াছে,—গীতার দিক হইতে বলিলে, উহাতে প্রপঞ্চিত বিদ্যার মূল প্রধানতয়া ঘোরোপদিষ্ট বিদ্যাতেই নিহিত আছে, উপনিষদের অন্যত্র নহে, ততক্ষণ ইহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যায় না যে ঘোরের শিষ্য কৃষ্ণ ও গীতা-বক্তা কৃষ্ণ অভিন্ন। বৈদিক যাগযজ্ঞের নূতন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ অথবা গীতার পরিভাষায় বলিলে প্রাচীন দ্রব্যযজ্ঞের জ্ঞানযজ্ঞ বা ভাবনাময় যজ্ঞ রূপে উপযোগ ঘোরের শিক্ষার বিশেষত্ব নহে। তাহা উপনিষদেরই সাধারণ বিশেষত্ব। প্রাচীন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঐ প্রকার নবীন ব্যাখ্যা লইয়াই বৃহদারণ্যকোপনিষদে’র আরম্ভ। পুরুষযজ্ঞবিদ্যা বা পুরুষের জীবনযাত্রাকে যজ্ঞরূপে ভাবনা করার পদ্ধতিও ঘোরের বিশেষত্ব নহে। কেননা, ঐতরেয় মহীদাসও পুরুষযজ্ঞবিদ্যা উপদেশ করেন। ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ ঘোরের পুরুষযজ্ঞবিদ্যার বর্ণনার অব্যবহিত পূর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে। উভয় বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। ঘোরের বিদ্যার যাহা নিজস্ব বিশেষত্ব তাহা গীতায় নাই। পুরুষের জীবনপ্রণালীর সমস্ত কর্ম

---

১) মহাভা, ১২।২১।১১—২

২) দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রাহ্মণো হয়াঃ ॥
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্থিতো যো মানসে রথে।
তাক্ত্বা মৃত্যুভয়ং রাজন্ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥”
—(মহাভা, ১১।৭।২৩'২—২৪

৩) গীতা, ১৩।৭—১১

ঈশ্বরে সমর্পণের,—স্বকর্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনার অথবা ঈশ্বরের অর্চনা রূপে স্বধর্ম পালনেরপ্রতি গীতায় খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু যেমন ঘোর শিক্ষা দিয়াছেন তেমন ভাবে সেইগুলিকে যজ্ঞাঙ্গরূপে কল্পনা করার উপদেশ গীতায় নাই। অন্তকালে আত্মচিন্তার উপদেশ উপনিষদের অপর একাধিক স্থলেও আছে। সুতরাং গীতার ঐ উপদেশ ঘোরের শিক্ষা হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলা যায় না।

কৃষ্ণ ভাগবতধর্মের প্রবর্তক নহেন

ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, সাত্বত বা একান্তধর্মের আদি প্রবর্তক প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ নহেন। এ, গোবিন্দাচার্য স্বামী ঐ বিষয়ে কতিপয় হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] (১) প্রথমত ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাচীন। ‘তৈত্তিরীয়ারণ্যকে’র ‘বিষ্ণুগায়ত্রী’তে বাসুদেবের উল্লেখ আছে,। (২) দ্বিতীয়ত ‘পাদ্মতন্ত্রে’ (৩।২৯।২৮) আছে, “বসুদেবসুতস্যাপি স্থাপনং বাসুদেববৎ” (অর্থাৎ বাসুদেবের মূর্তির ন্যায় বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণেরও মূর্তি স্থাপন করিবে’)। সুতরাং ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণ বাসুদেব হইতে ভিন্ন।[২] (৩) তৃতীয়ত একায়ন-বিজ্ঞান অতি প্রাচীন। ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ উল্লিখিত নারদ-কর্তৃক অধীত বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে উহার নাম আছে। (৪) চতুর্থত ‘ভগবদ্‌গীতা’য় (৭।১৯˙১) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।” তাহাতে দেখা যায় ভাগবত বা বাসুদেব ধর্ম কৃষ্ণের সময়ে প্রবর্তিত হয় নাই, বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। (৫) পঞ্চমত কৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবেও নির্দেশ করিয়াছেন যে ভাগবতধর্ম সনাতন। কেননা তিনি স্পষ্টত বলিয়াছেন যে ‘গীতা’য় তিনি যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নূতন নহে; তাহা অতি পুরাতন কাল হইতেই প্রচলিত আছে; দীর্ঘ কালান্তরে উহার গ্লানি হইলে তিনি আবির্ভূত হইয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত ও সংস্থাপিত করিয়া যান মাত্র। সুতরাং কৃষ্ণ ভাগবতধর্মের বা বাসুদেবোপাসনার সংশোধক, প্রচারক ও সংস্থাপক মাত্র, আদি প্রবর্তক নহেন।

ঐ মতের সমর্থক অপর কতিপয় যুক্তিও আছে। আমরা সেই সকল প্রদর্শন করিব।

প্রথমত—(১) কৃষ্ণের সমকালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভীষ্ম তাঁহার পরমভক্ত এবং সমধিক প্রশংসক ছিলেন। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে কৃষ্ণকে ভীষ্ম যেমন ঠিক ঠিক (“তত্ত্বত”) জানেন, অপর কেহ তেমন জানে না।[৩] যখন যখন সুযোগ পাইয়াছেন, তখন তখন ভীষ্ম কৃষ্ণের মাহাত্ম্য,—তাঁহার শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমের, তাঁহার বিদ্যার ও বুদ্ধির, এবং

---

[১] A. Govindacarya Swamin, “The Pancaratras or Bhagavat-sastra,” Jour. Roy Asia. Soc, 1911, pp 935—; “A Note on the name ‘Vasudeva, Ind. Ant. 1910 pp. 819—20

[২] ‘পাদ্মসংহিতা’য় “বসুদেবের সুত বৃষ্ণিবর্ণ কৃষ্ণ’কে ভগবান্ বাসুদেব হইতে অতীব পরিষ্কারভাবে পৃথক্ করা হইয়াছে। কৃষ্ণ ভগবানের দশাবতারের ৯ম অবতার। (৩।১।৯।২৮—৩০˙১)। ৩।১৮।১—৩৪ শ্লোকে “যাদব কৃষ্ণের মূর্তি নির্মাণ” বিবৃত হইয়াছে।

[৩] মহাভা, ২।৩৮।৫

তাঁহার অবতারত্বের কথা খ্যাপন করিয়াছেন। পরন্তু তিনি কখনও কোথাও বলেন নাই যে কৃষ্ণ ভাগবতধর্ম কিম্বা অপর কোন ধর্ম প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-মহাযজ্ঞে তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, তথা রাজামহারাজাগণ, সমুপস্থিত ছিলেন। তখন ভীষ্ম সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন যে তেজ, বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[১] "কৃষ্ণই লোকসমূহের উৎপত্তি এবং প্রলয়। এই চরাচর সর্বভূত কৃষ্ণেরই সৃষ্ট। এই অচ্যুতই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সনাতন কর্তা। তিনি সর্বভূত হইতে পরও। সেইহেতু তিনি পূজ্যতম। মহৎ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এবং চতুর্বিধ প্রাণিগণ—সমস্তই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।[২] অর্থাৎ কৃষ্ণ জগতের সৃষ্ট্যাদিকর্তা ভগবানই। তাঁহারই পরামর্শে সহদেব পৃথিবীর পূজ্যতম ("পূজনীয়তমং ভুবি") ব্যক্তিরূপে তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করেন।[৩] কৃষ্ণের পূজ্যতমত্বের দুইটি হেতু তিনি প্রদর্শন করেন,—বেদবেদান্তবিজ্ঞানে এবং বলে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।[৪] তিনি আরও বলেন যে গুণসমূহ দ্বারা বৃদ্ধগণকেও অতিক্রম করত কৃষ্ণ অর্চ্যতম হইয়াছেন।[৫] ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে কৃষ্ণের মহিমার উল্লেখ ভীষ্ম ঐখানে করে নাই। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে ঐ সময় পর্যন্ত কৃষ্ণ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাই ভীষ্ম ঐ সময়ে তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই প্রকার উক্তির, যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে ইহা বলা যায় যে পরে পরেও কখনও ভীষ্ম কৃষ্ণকে কোন নূতনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলেন নাই; তাঁহার কোন কোন উক্তি হইতে বরং ইহা জানা যায় যে ভাগবতধর্ম কৃষ্ণের পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের চতুর্থ দিন রাত্রে ভীষ্ম দুর্যোধনের নিকট 'বিশ্বোপাখ্যান' নামে খ্যাত "কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব" সূচক "পুরাণ গীত" বর্ণনা করেন।[৬] উহার সার ধর্ম এই যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি দৈত্যদানবাদিকে বধার্থ কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে ভীষ্ম বলেন, কৃষ্ণই সেই বাসুদেব "দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলিযুগের আদিতে সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সাত্বতবিধিতে আস্থিত হইয়া ('আস্থায়'), যিনি গীত হইয়াছেন।"[৭] এই বচনে "আস্থায়" ('আস্থিত হইয়া' বা 'আশ্রয় করিয়া') শব্দ থাকাতে বুঝা যায় যে সাত্বতবিধি সঙ্কর্ষণ নিজে উদ্ভাবিত এবং প্রচলিত করেন নাই; পূর্ব হইতে বর্তমান ঐ বিধিকে আশ্রয় করিয়া তিনি কৃষ্ণকে বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করেন মাত্র।[৮] তাহার প্রকৃত রহস্য কিঞ্চিৎ পরে আরও পরিষ্কার হইবে। কুরুক্ষেত্র

---

১) মহাভা, ১।৩৬।২৮

২) মহাভা, ২।৩৮।২৩—৬; আরও দেখ ২।৪০।১৪

৩) মহাভা, ২।৩৬।২৭ ৪) মহাভা, ২।৩৮।১৯

৫) মহাভা, ২।৩৮।১৭'১ ভীষ্ম আরও বলিয়াছেন, কৃষ্ণ "লোকবৃদ্ধতম" (২।৩৮।৬'১), "ত্রয়াণামপি লোকানামর্চনীয়ঃ" (২।৩৮।৯'২)

৬) মহাভা, ৬।৬৫।৪১—৬৮।১২ ভীষ্ম বলেন যে ঐ পুরাণ গীত তিনি পরশুরাম' মার্কণ্ডেয়, নারদ, ব্যাস, প্রভৃতি ভাবিতাত্মা ঋষিগণের নিকট শুনিয়াছিলেন। (৬।৬৬।২৭—৭ ; আরও দেখ, ৬।৬৮।১—১১)

৭) মহাভা, ৬।৬৬

৮) 'আস্থায়' শব্দকে টানিয়া ছিঁড়িয়া 'স্থাপন করত' অর্থ করিলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কেননা, তাহাতে সঙ্কর্ষণই সাত্বতবিধির স্থাপন-কর্তা হন, কৃষ্ণ নহেন।

মহাযুদ্ধের পরে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট ঋষি নারায়ণ ও নারদের সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস"[১] বর্ণনা করেন। উহাতে তিনি অতি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন 'পঞ্চরাত্র' নামে খ্যাত মহোপনিষৎ নারায়ণ ঋষি এবং ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন।[২] সুতরাং নারায়ণই, ভীষ্মের মতে, পাঞ্চরাত্র মতের আদি প্রবর্তক। ঐ নারায়ণ কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন এবং প্রাচীন ব্যক্তি। কেননা, ভীষ্ম বলিয়াছেন যে তিনি, তথা তাঁহার পিতা শন্তনু, আচার্য পরম্পরায় উহা প্রাপ্ত হন। (পরে দেখ) //

(২) নারায়ণীয়াখ্যানে একান্তধর্মের আচার্য-পরম্পরা বর্ণনা করিতে গিয়া বৈশম্পায়ন একবার বলিয়াছেন যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বিমনস্ক অর্জুনকে কৃষ্ণ উহা উপদেশ করেন,[৩] এবং দুইবার তিনি বলিয়াছেন যে উহা সমাসব্যাসবিধিতে 'হরিগীতা'য় বর্ণিত হইয়াছে।[৪] সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ঐ ধর্ম নারদ ঋষি সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হন এবং নারদের পরের আচার্যপরম্পরাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ভীষ্মোক্ত, তেমন বৈশম্পায়ন-প্রোক্ত, আচার্যপরম্পরার মধ্যে কৃষ্ণের নাম নাই। বৈশম্পায়নের বিবরণে ইহা মাত্র আছে যে যখন পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকটে একান্তধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তখন কৃষ্ণ এবং ভীষ্মও উহা শুনিয়াছিলেন। সুতরাং বৈশম্পায়নের মতে নারায়ণই একান্তধর্মের প্রবর্তক, কৃষ্ণ নহেন।৮

প্রকৃত পক্ষে 'মহাভারতে'র কিম্বা পুরাণসমুহের কোথাও কৃষ্ণকে কোন নূতন ধর্মের প্রবর্তক বলা হয় নাই। হার্মান জেকোবি লিখিয়াছেন, 'মহাভারতের এবং পুরাণ সমূহের রচয়িতাগণ কৃষ্ণের যে সকল কর্মের এবং পরাক্রমের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল প্রধানত একজন যোদ্ধার এবং রাজপুত সর্দারেরই; উহাদের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাকে কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রদর্শন করে। এতাবৎ মাত্র নির্বিবাদে অনুমান করা যাইতে পারে যে—তাহাও কল্পনাই—ঐ রাজপুত সর্দার, উপনিষদে প্রসিদ্ধ অপর কতিপয় রাজার মত, উচ্চতম ধার্মিক প্রশ্নসমূহের বিচারে অতীব আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন এবং ঐরূপে এক নূতন ধর্মের গঠনে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন।[৫] পরন্তু শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, "শান্তিপর্বে"[৬] ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে সাত্বত বা ভাগবত ধর্ম কৃষ্ণ-বাসুদেব কর্তৃক

---

[১] মহাভা, ১২।৩৩৪।৭ [২] মহাভা, ১২।৩৩৯।১১১—২; পূর্বে দেখ।

[৩] মহাভা, ১২।৩৪৮।৬; পূর্বে দেখ।

[৪] মহাভা, ১২।৩৪৬।১১; ৩৪৮।৫৩; পূর্বে দেখ।

[৫] "The deeds and adventures of Krsna related by tha authors of the great epic and the Puranas are essentially those of a warrior and Rajput chief, and there is none which shows him in the light of a founder of a religion. All that may safely be concluded, as a surmise is that this Rajput chief like some other Kings of Upanisad reknown, took a great interest in the highest theosophical questions and thus gave an impetus to the formation of a new religion". (Encyclopædia of Religion and Ethics এর ৭ম খণ্ডে Incarnation Indian বিষয়ে জেকোবির প্রবন্ধ হইতে। (১৯৫ পৃষ্ঠা)

[৬] মহাভা, ১২।৩৪৮।৬—৮

অর্জুনকে প্রথমে (First) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, 'সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু' ইত্যাদি।"[১] এই উক্তি ভুল। কেননা, ইহাতে তিনি প্রমাণরূপে 'মহাভারতের' শান্তিপর্বের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'প্রথমে', কিম্বা তদ্বাচক অপর কোন শব্দ নাই। ততোধিক তাহার অব্যবহিত পরে আছে, "এষ ধর্ম…পুরৈবাদিযুগে কৃতঃ" (এই ধর্ম…পুরাকালেই আদিযুগে কৃত হইয়াছিল)[২] এবং সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ হইতে উহার আচার্যপরম্পরাও প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং এমন কি ইহাও কিছুতেই মনে করা যাইতে পারে না যে কৃষ্ণকে একান্তধর্মের প্রথম উপদেষ্টা বলা শান্তিপর্বের ঐ বচনের অভিপ্রায় ছিল।

যত দূর জানা গিয়াছে, একমাত্র 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ' এবং 'বৃদ্ধগর্গসংহিতা' নামক দুইটি অতি অর্বাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে যে বৈষ্ণবধর্মসমূহ পুরাকালে ("পুরা") কৃষ্ণ কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল।[৩] পরন্তু ঐখানে 'পুরা' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে পুরাকালে,—যখন তিনি নারায়ণ ঋষি ছিলেন তখনই, বৈষ্ণবধর্মসমূহ কৃষ্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, এই জন্মে নহে,—ইহা বলাই ঐ বচনের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়ত—যুধিষ্ঠিরের নিকট "ঋষি নারায়ণ ও নারদের সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস" বর্ণনান্তে ভীষ্ম বলেন, "ইদমাখ্যানমার্ষেয়ং পারম্পর্যাগতং নৃপ" ('হে নৃপ! এই আর্ষেয় আখ্যান পরম্পরাক্রমে আগত');[৪] যেমন দেবতাগণও অসুরগণ মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করত অমৃত বাহির করিয়াছিলেন, তেমন পুরকালে ("পুরা") বিপ্রগণ দ্বারা (শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করত) এই কথামৃত বাহির করা হইয়াছিল।[৫] তিনি আরও বলেন, পরম্পরায় আগত ("পারম্পর্যাগতং") ঐ কথা তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।[৬] ভীষ্মের এই পুনঃ পুনঃ উক্তি হইতে আর কোন সংশয় থাকে না যে ঐ আখ্যান সুতরাং পাঞ্চরাত্র মত, অতি প্রাচীন,—তাঁহার এবং তাঁহার পিতার বহু পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণ ভীষ্ম অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট,—ভীষ্মের পৌত্র অর্জুনের সমবয়সী। সুতরাং কৃষ্ণই যদি পাঞ্চরাত্রমতের আদি প্রবর্তক হইতেন,—তিনিই যদি নারদের নিকট উহার প্রথম উপদেশ করিয়া থাকিতেন, অথবা অপর কথায় বলিলে, পাঞ্চরাত্রমতের প্রথমোপদেষ্টা ভগবান্ নারায়ণ যদি বস্তুত কৃষ্ণই হইতেন, উহার প্রবর্তন বিষয়ক ঐ ইতিহাস ভীষ্মের দৃষ্টিতে প্রাচীন ও পরম্পরাগত হইত না। ভীষ্মের পিতা শন্তনু কৃষ্ণের

---

১) H C Raychaudhury, Early Hist. of the Vaishnava Sect, ৩৪—৫ পৃষ্ঠা

২) মহাভা, ১৩।৩৪৮।৯—১০

৩) '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' অক্রুর-কৃত কৃষ্ণ-স্তুতিতে আছে,

"অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্॥"—(১০।৪০।৭)

এইখানে "বিধিনাভিহিতেন তে"বলাতে মনে হইতে পারে যে কৃষ্ণ কোন ধর্মের প্রবর্তক। পরন্তু তখন কৃষ্ণ কৈশোর বয়সে ছিলেন। সেই কারণে কোন ধর্ম প্রবর্তন তাঁহার পক্ষে তখন সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার পূর্বতন নারায়ণ ঋষির জন্মের প্রতিই অক্রুর লক্ষ্য করিয়াছেন বলিতে হইবে। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অন্যত্র অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।১২৫·২ ৫) মহাভা, ১২।৩৩৯।১২৭·১—১২৮·১

৬) মহাভা, ১২।৩৩৯।১৩৭·২—১৩৮·১ ; আরও দেখ—পূর্বে।

জন্মের পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চরাত্রমতের প্রবর্তক হইলে শন্তনুর মুখ হইতে ঐ ইতিহাস শোনা ভীষ্মের পক্ষে সম্ভব হইত না। সুতরাং কৃষ্ণকে পাঞ্চরাত্রমতের প্রবর্তক বলা যায় না। সাত্বতধর্মের ভীষ্ম-প্রোক্ত আচার্যপরম্পরাতে চেদিরাজ বসুর নাম আছে। ভীষ্মের উক্তি হইতে জানা যায় উনি কৃত যুগে বর্তমান ছিলেন।[১] বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, একান্তধর্ম "পুরৈবাদিযুগে কৃতঃ" (পুরাকালেই আদিযুগে কৃত হইয়াছিল)।[২] তিনি বিভিন্ন কল্পে উহার উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত এবং আচার্যপরম্পরা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে "পুরা কৃতযুগ"[৩] "কৃতযুগ"[৪] ও "ত্রেতাযুগের"[৫] উল্লেখ আছে। ঐ সকল কল্প ও যুগ বিভাগ কল্পনার তাৎপর্য আর কিছু থাকুক বা না থাকুক এতাবৎ মাত্র নিশ্চয় আছে যে উহা বহু প্রাচীনতার খ্যাপক। বৈশম্পায়ন দ্বাপরযুগের অন্তিম সময়ে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং ঐ বিবরণ হইতে বলিতে হয় যে একান্তধর্ম তাঁহার বহু পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল। একান্তধর্মের বর্তমান কল্পের আচার্য-পরম্পরাতে প্রজাপতি দক্ষ, তাঁহার দৌহিত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র মনু (= বৈবস্বত মনু বা শ্রাদ্ধদেব) এবং মনুর পুত্র ঈক্ষ্বাকুর নাম আছে। উঁহারা সকলেই কৃষ্ণ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, বিবস্বান্ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ("ত্রেতাযুগাদৌ") মনুকে একান্তধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন।[৬] সুতরাং কৃষ্ণকে সাত্বতধর্মের কিম্বা একান্তধর্মেরও প্রবর্তক বলা যাইতে পারে না। ভীষ্ম এবং বৈশম্পায়ন উভয়েই ভগবান্ নারায়ণ ঋষিকে ধর্মপ্রবর্তক বলিয়াছেন। মহাভারতের তথা পুরাণসমূহের, বহু স্থলে উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষিই কৃষ্ণরূপে এবং তাঁহার সখা নর ঋষি অর্জুনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নারদ[৭], ব্যাস[৮] প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা প্রচার করেন। কৃষ্ণ নিজেও একাধিক স্থলে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[৯] ভীষ্ম বলিয়াছেন, "নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ" (অর্থাৎ নর ও নারায়ণ দুই জন প্রাচীন ঋষিসত্তম)[১০] আরও অনেকে সেই প্রকার বলিয়াছেন। আমরা পরে নারায়ণ ঋষির জীবনচরিত আলোচনা কালে সেই সকল বিবৃত করিব। ভীষ্ম প্রকারান্তরেও তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে নারায়ণ ঋষি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সত্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[১১] কৃষ্ণ বলিয়াছেন দক্ষের যজ্ঞের সময়ে তিনি নারায়ণ ঋষি ছিলেন।[১২]; সুতরাং নারায়ণ ঋষি যে কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি এবং তদপেক্ষা বহু প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয়ত—'গীতা'তে কৃষ্ণ স্পষ্টত বলিয়াছেন যে তিনি অর্জুনের নিকট "পুরাতন যোগ" ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১৩] উহা কি প্রকারে পুরাতন তাহাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্বে তিনি উহা বিবস্বান্‌কে (=প্রজাপতি দক্ষের দৌহিত্র, সূর্য নহেন, যেমন কেহ কেহ ভ্রমবশত মনে

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৬।১৭—৮ ও ৩৩৭।৫—দেখ।

২) মহাভা, ১২।৩৪৮।৯—১০

৩) মহাভা, ১২।৩৪৮।১৭

৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।২৯, ৩৪,৪১

৫) মহাভা, ১২।৩৪৮।১২,৫১

৬) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫১

৭) মহাভা,

৮) মহাভা,

৯) যথা দেখ—মহাভা, ৩।১২।৪৭ ; ১২।৩৪১।৩৭'২—৩৮'১ ; ৩৪২।১০৬'২—১৩৬ ;

১০) মহাভা, ৬।৬৬।১১'১

১১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৯

১২) মহাভা, ১২।২৪২।১০৮

১৩) "স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ—(গীতা, ৪।৩'১)

করেন) উপদেশ করেন ; বিবস্বান্ (তাঁহার পুত্র) মনুকে (=অপর নাম শ্রাদ্ধদেব, বৈবস্বত মনু) এবং মনু (আপন পুত্র) ঈক্ষ্বাকুকে উহা ব্যাখ্যা করেন। ঐ প্রকার পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ উহা প্রাপ্ত হন। পরন্তু "স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ" ('হে পরন্তপ! দীর্ঘ কালান্তরে সেই যোগ ইহসংসারে নষ্ট হয়')।[১] তিনি সেই পুরাতন যোগই অর্জুনকে ব্যাখ্যা করেন। তাহাতে অর্জুন এই শঙ্কা করেন যে বিবস্বান্ তাঁহার (কৃষ্ণের) বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিবস্বান্‌কে ধর্মোপদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব? তাহাতে কৃষ্ণ বলেন যে তাঁহার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে এবং সমস্তই তাঁহার মনে আছে।[২] যদিও তিনি সাক্ষাদ্ভাবে বলেন নাই যে তিনি কোন এক অতীত জন্মে বিবস্বান্‌কে যোগ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সার তাৎপর্য উহাই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্জুন সেই শঙ্কা পুনঃ উত্থাপন না করাতে সিদ্ধ হয় যে তিনিও ঐ প্রকার বুঝিয়াছিলেন। তাহাতে নিশ্চিত হয় যে গীতোক্তধর্মের মূল প্রবর্তক, অর্জুনের সখা এবং তাঁহার নিকট ঐ ধর্মের ব্যাখ্যাতা, 'গীতা'র বক্তা বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন এবং তাঁহার অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ব্যক্তি।

বাসুদেবের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ

ভগবান্ বাসুদেবের প্রকৃত প্রাদুর্ভাব কে? এই লইয়া কৃষ্ণ ও বার্ষ্ণেয় বাসুদেবের সহিত পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেবের ভীষণ বিরোধ হয় এবং তাহার ফলে পরিণামে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বার্ষ্ণেয় বাসুদেব কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। 'হরিবংশে' এবং কতিপয় পুরাণে ঐ ঘটনার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] 'মহাভারতে'ও অপর প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। 'ব্রহ্মপুরাণে' ও 'বিষ্ণুপুরাণে' ঈষৎ পাঠভেদে একই বচন আছে এবং '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' সেই কথাই ভাষান্তরে বিবৃত হইয়াছে। উহা সংক্ষেপে এই—লোকে পৌণ্ড্রককে বাসুদেবের অবতার বলিয়া মানিত। তাহারা তাঁহাকে বলিতে লাগিল—'আপনি জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' তাহাতে তিনিও নিজেকে সেইরূপ মনে করিতে লাগিলেন এবং চক্রাদি বিষ্ণুর চিহ্নসমূহ ধারণ করিতে থাকেন। কোন সময়ে তিনি এই বলিয়া কৃষ্ণের নিকট দূত পাঠান যে একমাত্র আমিই বাসুদেব ; প্রাণীদিগের প্রতি অনুকম্পার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি মিছামিছি আমার নাম ও চিহ্নসমূহ ধারণ করিতেছ। যদি বাঁচিয়া থাকিতে

---

১) "স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ"—(ঐ, ৪।২'২)

২) গীতা, ৪।৫

৩) 'হরিবংশ', ৩।৯১—১০২ অধ্যায় ; ব্রহ্মপু, ৯৮ অধ্যায় ; বিষ্ণুপু, ৫।৩৪ অধ্যায়, বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৬৬ অধ্যায় স্কন্দপু, ৭।১।৯৯ অধ্যায় ; পদ্মপু, ৬।২৭৮ অধ্যায়।

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' পৌণ্ড্রক বাসুদেব করূষাধিপতি ; এবং 'স্কন্দপুরাণে' আছে তিনি বারাণসীর রাজা। এবং পদ্মপুরাণে' আছে তিনি কাশিরাজ। তাহা সত্য নহে। 'স্কন্দপুরাণে' ইহাও উক্ত হইয়াছে যে "কাশিরাজ" পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মিত্র ছিলেন এবং কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সহায় ছিলেন। কাশী ও বারাণসী ভিন্ন নহে। সুতরাং পৌণ্ড্রক বাসুদেব বারাণসীর রাজা ছিলেন না। 'মহাভারত' হইতে জানা যায় যে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সময়ে করূষাধিপতি ছিলেন দন্তবক্র। (মহাভা, ২।১৪।১২,১৪ কৃষ্ণোক্তি) হরিবংশ, ২।৩৪।১১'২ ; ২।৪৯।১ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও কিঞ্চিৎপরে তাহা উক্ত হইয়াছে। (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭৮।৪—১৩)

চাও, সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর।'[1] দূতমুখে তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া তাহাকে বলেন, 'তোমার রাজাকে বলিও যে আমি তাঁহার পুরীতে গমন করিব এবং তাঁহার কথামত চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিব।' দূত চলিয়া গেলে পর কৃষ্ণ যথাশীঘ্র সসৈন্যে পৌণ্ড্রকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাহা শুনিয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেবও সৈন্য লইয়া কৃষ্ণের অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার মিত্র কাশীর রাজা সসৈন্যে তাঁহার সহায় হন। কাশীর পশ্চিমে—কোন্ স্থানে তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় দেখা যায় না—উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। তখন কৃষ্ণ দূর হইতে পৌণ্ড্রকের রূপ দেখেন—তিনি এক বৃহৎ রথে স্থিত ছিলেন; তাঁহার পরিধানে পীতবাস, হাতে গদা, চক্র, শার্ঙ্গধনু ও পদ্ম, গলায় কৌস্তুভমণি ও বৈজয়ন্তীমালা, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মাথায় নানা রত্নশোভিত কিরীট এবং কর্ণে নানারত্নোপশোভিত কুণ্ডল ছিল। তাঁহার রথে গরুড়ধ্বজা ছিল। তাঁহার মূর্তি ভাবগম্ভীর ছিল।[2] যাহা হউক উভয় সৈন্যদলের মধ্যে তখন ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের ও কাশীরাজের সম্মিলিত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করেন এবং তাঁহাদের উভয়কে বধ করেন। কাশীরাজের শিরকে কাশীতে নিক্ষেপ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাহাতে মর্মাহত হইয়া কাশীরাজের পুত্র পিতৃবধের প্রতিশোধ লইতে মহাদেবের উপাসনা করেন এবং তাঁহার বরে মহাকৃত্যা উৎপাদন করত দ্বারকা দহনার্থ প্রেরণ করেন। পরন্তু কৃষ্ণের প্রভাবে ঐ কৃত্যা বিফল হয়। কৃষ্ণ কাশী নগরী দগ্ধ করেন। 'স্কন্দপুরাণে' আছে যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব ব্রাহ্মণদিগের মুখে এই পুরাণবচন শুনিয়াছিলেন যে দ্বাপরের অন্তে এবং কলির আদিতে ভগবান্ বাসুদেব ক্ষত্রিয়বংশে অবতার গ্রহণ করিবেন।[3] তাহাতে তিনি নিজেকে এই মনে করিতে লাগিলেন যে "অহংবিষ্ণুঃ" ('আমিই বিষ্ণু')। ইহার পরের বিবরণ ঠিক পূর্বের ন্যায়। 'হরিবংশে'র বিবরণ আরও অধিক বিস্তৃত। পরন্তু তত্রোক্ত কথা পূর্বোক্ত কথা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। তাহাতে আছে যে পৌণ্ড্র নৃপবরোত্তম। তিনি যোদ্ধা, বলবান্ এবং বিপুলবিক্রম ছিলেন; তিনি সত্ত্বসম্পন্ন ছিলেন; পরন্তু সদা বৃষ্ণিশত্রু এবং কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন।[4] অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ যাদব প্রধানগণকে বলেন, "পৌণ্ড্র বীর্যবানদিগের নেতা। সে সদাই আমার দ্বেষ্টা। ঐ রাজেন্দ্র দ্রোণের শিষ্য, ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, বলী এবং কৃতী; শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিমান, যত্নবান এবং সকলের সাক্ষাৎ নেতা। সেই রাজা যোদ্ধা ও যুদ্ধপ্রিয়,—অপর পরশুরামের তুল্য। সে আমাদের একান্ত শত্রু এবং সদাই আমার ছিদ্রান্বেষী। যদি ছিদ্র পায়, তবে সেই যোদ্ধা এই পুরী আক্রমণ করিবে। পুণ্ড্রের

---

১) '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র বিবৃতি অনুসারে। অন্যত্র এই বচনের শেষাংশ মাত্র আছে।

২) '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে, (১০।৬৬।১৫) উক্ত হইয়াছে

"দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যবেষং কৃত্রিমমাস্থিতম্।
যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ॥"

অন্যত্র এই কঠোর পরিহাস করা হয় নাই। তথায় আছে দৃষ্ট্বা ভাবগম্ভীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ।"

৩) "তেন শ্রুতং পুরাণং তু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ॥
কল্যাদৌ দ্বাপরান্তে তু ক্ষত্রিয়ানাং নিবেশনে।
অবতারং মহাবাহুর্বাসুদেবঃ করিষ্যতি॥" —(স্কন্দপু, ৭।১।৯৯।৪·২—৫

৪) 'হরিবংশ', ৩।৯১।১—২·১

ঈশ্বর বলবান নৃপোত্তম, নিশ্চয় অল্পসাধ্য নহে।"[১] তাই তিনি যখন তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করেন, পৌণ্ড্রকের আক্রমণ হইতে দ্বারকানগরীকে রক্ষার নানা বন্দোবস্ত করিয়া যান। কেননা, তাঁহার এই ধারণা ছিল যে তাঁহার অনুপস্থিতি জানিতে পারিলে পৌণ্ড্রক নিশ্চয় দ্বারকা আক্রমণ করিবে এবং সে উহাকে নির্যাদবী করিতে সমর্থ (ঐ, ৩।৭৪।২১—৭)। একদা আপন অনুগত রাজাদের ডাকিয়া পৌণ্ড্রক বলেন,—আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছি; অনেক বড় বড় রাজাকে জয় করিয়াছি; পরন্তু বৃষ্ণিগণ বলোন্মত্ত এবং কৃষ্ণের আশ্রয়ে গর্বিত; কৃষ্ণের সংশ্রয় হেতু তাহাদের কেহ আমায় কর দেয় না। সেই কৃষ্ণ চক্রবলে আমায় অবজ্ঞা করে। সেই গোপের সর্বদা এই অভিমান আছে যে 'আমিই চক্রী'; শঙ্খী, চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, প্রভৃতি বলিয়া তাহার মহাগর্ব আছে; আমারই নাম বাসুদেব বলিয়া লোকে বিশ্রুত; মদবলান্বিত সেই গোপ আমার সেই নাম গ্রহণ করিয়াছে; রাজগণ আমাকেই শঙ্খী, চক্রী, গদী ও শার্ঙ্গী বীর বাসুদেব বলিয়া নিত্য বলিয়া থাকেন, সেই যদুশ্রেষ্ঠকে কেহ বলে না; সেই গোপদারককে যুদ্ধে বধ করিয়া আমি একাই বাসুদেব হইব।[২] ঐ সময়ে দেবর্ষি নারদ পৌণ্ড্রকের নিকটে উপস্থিত হন। তাঁহাকে পাদ্যার্ঘাদির দ্বারা সমাদরান্তে পৌণ্ড্রক জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার গতি সর্বত্র অবারিত। আপনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেখানে সেখানে কি ইহা শুনেন নাই যে একমাত্র পৌণ্ড্রই বাসুদেব নামে অভিহিত; তিনিই শঙ্খী, চক্রী, গদী ও শার্ঙ্গী প্রভৃতি। ঐ যে গোপ বাসুদেব নামে কথিত হয় সে বৃথাই আমার নাম ধারণ করিতেছে। আপনি ইহা নিশ্চয় করুন। আমি সেই গোপকে মারিয়া ইহজগতে একাই বাসুদেব হইব।" পরন্তু নারদ বলেন যে "কৃষ্ণই বাসুদেব; কৃষ্ণ পৃথিবীতে থাকিতে অপর কাহাকেও বাসুদেব বলা যায় না। কৃষ্ণ তোমায় নাশ করিবেন।" এই বলিয়া নারদ অন্তর্ধান হন। পৌণ্ড্রক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া, একলব্য প্রভৃতি রাজগণসহ দ্বারকা আক্রমন করেন এবং উহাকে অবরোধ করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ছিলেন না। তিনি ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিতে কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন। উভয় সৈন্যে ভীষণ সংগ্রাম হয়। সহস্র সহস্র যদুবীর তাহাতে নিহত হন। যখন সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহাদের একে অপরকে স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে একমাত্র তিনিই বাসুদেব; তিনিই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী; অপরে তাঁহার নাম ও চিহ্নাদি বৃথা ধারণ করিতেছেন; অপরকে মারিয়া তিনি একা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাসুদেব হইবেন। যাহা হউক তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অতি ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং পৌণ্ড্রক কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হন এবং তাঁহার সহায়ক নিষাদরাজ একলব্য পলায়ন করত সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশীরাজ কর্তৃক পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সাহায্য করার এবং কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার বধের ও কাশীদাহের উল্লেখ 'হরিবংশে' নাই। 'পদ্মপুরাণে'র মতে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব কাশীরাজ। তিনি বারাণসীতে বার বছর ধরিয়া নির্জনে থাকিয়া অনাহারে শিব-পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র ('ওঁ নমঃ শিবায়') জপ করেন এবং পূর্ণাহুতির সময়ে নিজের নেত্ররূপ কমল দ্বারা

---

১) হরিবংশ, ৩।৭৪।১৫—১৮·১

২) ঐ, ৩।৯১।৩—

ভগবান্ শিবের পূজা করেন। তাঁহার ঐ কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া শিব তাঁহাকে, তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে, "বাসুদেবসমানরূপ" প্রদান করেন,—তাঁহাকে "শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুত চতুর্ভুজ, পুণ্ডরীকদলনিভলোচন এবং কিরীটমণিকুণ্ডলপীতবস্ত্রকৌস্তুভাভরণাদি চিহ্নসমূহ প্রদান করেন।" তাহাতে তিনি নিজেকে বাসুদেব বলিয়া প্রচার করেন। একদা দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণকে জয় করিতে না পারিলে তাঁহার বাসুদেবত্ব সিদ্ধ হইবে না। তাহা শুনিয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব সৈন্যদল লইয়া দ্বারকায় গমন করেন এবং নগর অবরোধ করেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বধ করেন এবং তাঁহার শির ছেদন করত বারাণসীতে নিক্ষেপ করেন। ইহার পরের বর্ণনা প্রায় 'ব্রহ্মপুরাণা'দির বর্ণনার মত।[১]

'মহাভারতে' বিবৃত আছে যে রাজসূয়যজ্ঞের পূর্বে মগধরাজ জরাসন্ধের প্রভাব এবং শৌর্য, বীর্য ও বলের বর্ণনা করিতে গিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন,[২] পৌণ্ড্রক মহাবলশালী রাজা ছিলেন;[৩] তিনি বাসুদেব বলিয়া অভিবিশ্রুত ছিলেন; চেদিদেশে, তথা বঙ্গ, পুণ্ড্র, কিরাত, প্রভৃতি দেশে তিনি পুরুষোত্তম বলিয়া বিজ্ঞাত ছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং ও নিজেকে ইহলোকে পুরুষোত্তম বলিয়া মানিতেন, আর (শঙ্খচক্রাদি বাসুদেবের) চিহ্নসমূহ ধারণ করিতেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ ইহাও বলেন যে তিনি তৎপূর্বে পৌণ্ডক বাসুদেবকে মারেন নাই।[৪] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে পৌণ্ড্রক বাসুদেব উপস্থিত ছিলেন।[৫] সুতরাং তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধের, কিম্বা কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার বধের কোন উল্লেখ 'মহাভারতে' নাই। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের,—তিনি কি কি পরাক্রমের কার্য করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ বীরকে যুদ্ধে পরাজিত বা নিহত করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া অর্জুন বলেন, কৃষ্ণ বারাণসী দগ্ধ করিয়াছিলেন।[৬] উহার

---

১) একটা পার্থক্যের উল্লেখ করা উচিৎ বোধ হয়। 'ব্রহ্মপুরাণে' ও 'বিষ্ণুপুরাণে' কাশিরাজের পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে উহার নাম সুদক্ষিণ। 'পদ্মপুরাণে' পৌণ্ড্রক বাসুদেবই কাশিরাজ, পরন্তু তাঁহার পুত্রের নাম দণ্ডপাণি। 'হরিবংশে'র পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুত্রের নাম সুদেব (২।৫৯।৪)।

২) "পুরুষোত্তমবিজ্ঞাতো যোঽসৌ চেদিষু দুর্মতিঃ ॥
আত্মানাং প্রতিজানাতি লোকেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমম্।
আদত্তে সততং মোহাদ্‌যঃ স চিহ্নং চ মামকম্ ॥
বঙ্গপুণ্ড্রকিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যোঽসৌ লোকেঽভিবিশ্রুতঃ ॥" —(মহাভা, ২।১৪।১৯·২ ২১)

৩) "পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্"—(মহাভা, ২।৩০।২২·১)
"পৌণ্ড্রশ্চ বলিনাং বরঃ"—(হরিবংশ, ২।৩৪।১২·১)

৪) "পুরা যো ন ময়া হতঃ"—(মহাভা, ২।১৪।১৯·১)

৫) মহাভা, ২।৩৪।১০। বঙ্গদেশের রাজা শৈব্য, অঙ্গদেশের রাজা সুমিত্র এবং কিরাতরাজ সুমনা ও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। (২।৪।২৫—৬)

৬) অর্জুন বলেন,
"অনেন জগ্ধা বর্বপূগান্ বিনাথা বারাণসী নগরী সম্বভূব।" —(মহাভা, ৫।৪৮।৭৬·২)

কারণ তিনি বলেন নাই। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধের, কিংবা কৃষ্ণকর্তৃক তাঁহার বধেরও উল্লেখ অর্জুন ঐখানে করেন নাই।[১]

এই সকল স্বল্পবিস্তর পৃথক্ বিবরণসমূহ হইতে এতাবৎ সামান্য তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যে (১) বার্ষ্ণেয় বাসুদেব ও পৌণ্ড্রক বাসুদেব সমকালীন ছিলেন; (২) তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুযায়িগণ দ্বারা ভগবান্ বাসুদেব, নারায়ণ বা বিষ্ণু (কিম্বা তাঁহার প্রাদুর্ভাব) বলিয়া পরিগণিত ও পূজিত হইতেন এবং প্রত্যেকে নিজেকে সেইরূপ মনেও করিতেন, এবং (৩) সেইহেতু প্রত্যেকে মনে মনে অপরের প্রতি কুভাব রাখিতেন। একে অন্যকে পরাভূত করিয়া সর্বসম্মত বাসুদেব হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন।

আরও একটা কথা এখানে বলা উচিত মনে করি। উহা নিছক অনুমান মাত্রই হইবে। তথাপি ঐ অনুমান করা উচিত মনে হয়। খুব সম্ভবত, প্রথম প্রথম বার্ষ্ণেয় বাসুদেব অপেক্ষা পৌণ্ড্রক বাসুদেবেরই মান্যতা সমধিক ছিল। 'মহাভারতে' কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে তদানীন্তন উত্তর ভারতের পূর্বভাগের বঙ্গ, পুণ্ড্র, প্রভৃতি দেশে,[২] উত্তরভাগের কিরাতদেশে এবং মধ্যভাগের চেদিদেশে পৌণ্ড্রক বাসুদেব পুরুষোত্তম ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া বিজ্ঞাত ছিলেন। অন্তবর্তী কাশী মগধ বিদেহাদি দেশে তাঁহার সেই প্রকার মান্যতা ছিল কিনা কৃষ্ণ বলেন নাই। পরন্তু থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায় যে মগধের রাজা জরাসন্ধ তদানীন্তন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন। ঐ সময়ে ঐল,, ঈক্ষাকু, যযাতি এবং ভোজ বংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের সর্বত্র রাজ্য করিতেছিলেন। ঐল এবং ঈক্ষাকু বংশেরই একশত রাজা ছিলেন। সকলেই জরাসন্ধের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রতাপবান্ চেদিপতি শিশুপাল তাঁহার সেনাপতি হন। মহাযোধী এবং মহাবল করুষাধিপতি দন্তবক্র তাঁহার নিকটে শিষ্যবৎ সমুপস্থিত থাকিতেন। মুরু ও নরক দেশের শাসক যবনাধিপতি ভগদত্ত,—যাঁহার বল অপর্যাপ্ত ছিল এবং যাঁহার অধিকার পশ্চিমের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল, তিনি কথায় ও কাজে জরাসন্ধের নিকট প্রণত থাকিতেন। যিনি ভারতবর্ষের চতুর্থ ভাগের রাজা, ভোজদেশের অধিপতি এবং বিদ্যাবলে পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৌশিকগণকে বিজয় করেন, সেই মহারাজ ভীষ্মক জরাসন্ধের ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণ ভীষ্মকের কুটুম্ব ছিলেন এবং সদা তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্যসমূহ করিতেন। তথাপি উনি কৃষ্ণের অনুকূলে ছিলেন না; জরাসন্ধের প্রদীপ্ত যশ দেখিয়া তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন। কংস জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন এবং তাঁহার বলে নিজ জ্ঞাতিগণকে পরাভূত করিয়া মথুরার রাজা হন। ভোজ, পাঞ্চাল, কোশল প্রভৃতি দেশের অনেক রাজা জরাসন্ধের ভয়ে দেশ ত্যাগ করেন। তাঁহার ভয়ে কৃষ্ণ স্বজনগণসহ মথুরা পরিত্যাগ

---

১) 'মহাভারতে' অন্যত্রও অর্জুন কৃষ্ণকর্তৃক নিহত বীরদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩।১২।২৮—৩৪) তন্মধ্যেও পৌণ্ড্রকের নাম নাই।

১) 'হরিবংশে' আছে, মহাবল পৌণ্ড্রক বাসুদেব অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদির ঈশ্বর (২।৫৯।২৯)। অর্থাৎ ঐ সকল দেশে তাঁহার সর্বাধিপত্য স্বীকৃত হইত (২।৫৯।৫৩)। সুতরাং ঐ সকল দেশে তিনি অবতার বলিয়া মানিত হইতেন মনে করা যায়।

করত দ্বারকায় গিয়া বাস করেন।[১] কথিত হইয়াছে যে কুরুগণ ও অন্ধকবৃষ্ণিগণকে ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর সকলকেই জরাসন্ধ আপন বশীভূত করিয়াছিলেন; উঁহারা দৈবকৃপাতেই রক্ষা পাইয়াছিলেন।[২] 'হরিবংশে' জরাসন্ধের স্বপক্ষীয়,—কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযানে জরাসন্ধের সাহায্যকারী বহু রাজার নামোল্লেখ আছে।[৩] তাহাতে গান্ধার ও কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন রাজগণেরও নাম আছে। উঁহাদের সকলে জনার্দনকে বিদ্বেষ করিতেন ("বিদ্বিষন্তো জনার্দনম্") বটে পরন্ত তাঁহাদের দেশে দেশে পৌণ্ড্রক বাসুদেব অবতার বলিয়া পরিগণিত ও পূজিত হইত কিনা বলা যায় না। 'মহাভারতে'র মতে, জরাসন্ধ পরম শিবভক্ত ছিলেন; শিবের বরের প্রভাবে প্রতাপবান্ হইয়া তিনি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট হন।[৪] 'হরিবংশে' আছে, তিনি কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন।[৫] এই কথা পরে কল্পিত এবং সংযোজিত হইয়াছে মনে হয়। জরাসন্ধের ভয়েই বোধ হয় কৃষ্ণ বাসুদেবত্বের দাবী লইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ করেন নাই। জরাসন্ধের শক্তি সম্বন্ধে কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "ন শক্যোঽসৌ রণে জেতুং সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ" ('সমস্ত দেবতাগণ এবং অসুরগণ মিলিয়াও যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে')।[৬] জরাসন্ধের মৃত্যুতে পৌণ্ড্রক হতবল হন। রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার সমর্থক শিশুপাল নিহত হন এবং কৃষ্ণ অবতার বলিয়া বিঘোষিত হন। তাহার পর হইতেই পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মান্যতা কমিতে আরম্ভ করে বোধ হয়।

ঐ সময়ে আরও এক ব্যক্তি আপনাকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি করবীরপুরের রাজা ছিলেন। এবং তাঁহার নামও বাসুদেব ছিল। তবে তিনি বিশেষভাবে 'শৃগাল' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অবতারত্ব লইয়া কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাদের বিশদ বিবরণ 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' পাওয়া যায়।[৭] 'হরিবংশে'ও উহার আভাষ আছে। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে গোমন্ত পর্বতে জরাসন্ধের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃষ্ণ ও বলরাম করবীরপুরে গমন করেন।[৮] অবশ্য তৎপূর্বেও তিনি করবীরপুরের এবং উহার রাজা শৃগাল নামে খ্যাত বাসুদেবের কথা শুনিয়াছিলেন।[৯] উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শৃগাল কৃষ্ণকে বলেন, "তুমি নিহত হইলে, আমিই ইহলোকে বাসুদেব হইব, আর আমি মরিলে একা তুমিই বাসুদেব হইবে।"[১০] এক জন বলবান বীরপুরুষ তাঁহার সমনামের প্রতিস্পর্ধী বীরকেও এই কথা বলিতে পারেন। সুতরাং এতাবন্মাত্র উক্তি হইতে অনুমান করা যায় না যে বাসুদেবের প্রকৃত অবতার কে? —এই লইয়া শৃগাল বাসুদেব ও কৃষ্ণ বাসুদেবের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'হরিবংশে' এমন অপর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উক্তি নাই, যাহা হইতে জানা যায় যে শৃগাল

---

১) মহাভা, ২।১৪।৪—৩৩, ৬৮

২) মহাভা, ৫।৫১।৩৮—৯

৩) হরিবংশ, ২।৩৪।১১—১৯ ; ৩৫।৩৯—৪৮ ; ৪২।২৮—৩৭ দেখ।

৪) মহাভা, ২।১৪।৬৪—৭ ; ১৫।১৩—

৫) হরিবংশ, ২।৪৮।১৩—৩৭

৬) মহাভা, ২।২০।২১

৭) 'ব্রহ্মবৈবর্তপু, ৪।১২১

৮) 'হরিবংশ', ২।৪৩।৮৫—

৯) ঐ, ২।৩৯।৪৯—৫১

১০) 'হরিবংশ', ২।৪৪।২২

বাসুদেব নিজেকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া মনে করিতেন ও ঘোষণা করিতেন, কিম্বা অপর কেহ তাঁহাকে সেই প্রকার মনে করিত ও ঘোষণা করিত। যাহা হউক, যুদ্ধে কৃষ্ণ শৃগালকে নিহত করেন।[১] 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে "রাজেশ মণ্ডলেশ্বর শৃগাল বাসুদেব" এক ব্রাহ্মণ দূতকে দিয়া কৃষ্ণ বাসুদেবকে বলিয়া পাঠান, "আমিই বৈকুণ্ঠে দেবেশ চতুর্ভুজ বাসুদেব। আমি লক্ষ্মীপতি, জগতের ধাতা এবং ব্রহ্মারও পালক। পৃথিবীর ভারাবতরণার্থ ব্রহ্মা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তদর্থে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি। বসুদেবসুত বৈশ্য। আমিই তাহাকে ক্ষত্রিয় করিয়াছি" ইত্যাদি। "মধু, কৈটভ, মহাবল হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে হনন করিয়া আমি সৃষ্টিরক্ষক। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা। আমিই স্বয়ং শিব এবং আমিই স্বয়ং জগতের পাতা ও দুষ্টাবহারক বিষ্ণু।[২] সমস্ত মুনিগণ ও মনুষ্যগণ অংশ ও কলা মাত্র। নির্গুণ এবং প্রকৃতির পর নারায়ণ স্বয়ং আমিই। লজ্জা, কৃপা ও মিত্রবুদ্ধি বশত (এযাবৎ পর্যন্ত) আমি (তোমাকে) ক্ষমা করিয়াছি। যাহা গিয়াছে, তাহা গিয়াছে।……এখন হয়ত আমার সহিত যুদ্ধ কর, নতুবা আমার শরণ গ্রহণ কর। যদি আমার শরণ গ্রহণ না কর, তবে আমি সমস্ত দ্বারকা ভস্মীভূত করিব" ইত্যাদি।[৩] তিনি কৃষ্ণকে কঠোর নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেন। কৃষ্ণ সসৈন্যে শৃগালের রাজধানীতে গমন করেন। ইহার পরের বিবরণ হাস্যকর। কথিত হইয়াছে যে শৃগাল কৃষ্ণকে দেখিয়াই আপন অবতারাভিমান পরিত্যাগ করে, ভয়ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করে এবং তাঁহার শিরচ্ছেদন করত তাঁহাকে উদ্ধার করিতে বলেন। তিনি বলেন যে যে কৃষ্ণের দর্শন লালসায় তিনি তাঁহাকে রাগাইয়া স্বপুরে আনয়নার্থই দূতমুখে ঐ প্রকার দারুণ বাক্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই বিবরণ যে উৎকট কৃষ্ণভক্তি-প্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ইহার মধ্যে প্রকৃত তত্ত্ব কিছু থাকে তাহা এই মনে হয় যে শৃগাল আপনাকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া প্রচার করেন। পরন্তু তিনি পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ন্যায় বলবান এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন না। কৃষ্ণ স্বল্পায়াসে তাঁহাকে বিধ্বংস করেন। কৃষ্ণের নিন্দা করিতে গিয়া শৃগাল বলিয়াছেন যে তিনি (কৃষ্ণ) ভীমকে দিয়া জরাসন্ধ ও দুর্যোধনকে বধ করাইয়াছেন; অর্জুনকে দিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিকে বধ করাইয়াছেন।[৪] তাহাতে বলিতে হয়, শৃগাল-বধ, 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' মতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরের ঘটনা। পরন্তু 'হরিবংশে'র মতে উহা তাহার বহু পূর্বের,—জরাসন্ধ বধের পূর্বের ঘটনা। //

এইরূপে দেখা যায়, একই সময়ে,—দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলিযুগের আগে,—তিন সুদূরবর্তী প্রান্তে তিন পৃথক্ ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া লোকমধ্যে মানিত এবং পূজিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজেকে সেইরূপ মনেও করিতেন এবং খ্যাপনও করিতেন। একমাত্র এই প্রকারেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল,—সুপ্রাচীন কাল হইতে এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছিল যে ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব লোককল্যাণার্থ,—দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিয়া ধর্মের বৃদ্ধি অর্থে, পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইবেন; পুরাণাদি শাস্ত্রে উহা বিঘোষিত

---

১) হরিবংশ, ২।৪৪।২৩—৮ ; ৪৬।১৪ ; ৪৯।৪৬ ; ৩।৭৪।১৩'১

২) ব্রহ্মবৈবর্তপু, ৪।১২১।৪—

৩) ঐ, ৪।১২১।১৩—

৪) ঐ, ৪।১২১।৭—৮

হইয়াছিল, বিদ্বান্‌গণ উহা বিশ্বাস করিতেন এবং লোকসমাজে উহা বহুল প্রচারিতও হইয়া পড়িয়াছিল। এমন অবস্থায় ঐ সময়ে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বল ও বিক্রমের, তথা লোককল্যাণকর, অতি প্রশংসাযোগ্য মহৎ কার্যসমূহ দেখিয়া তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ সমর্থক এবং অনুযায়ী লোকদিগের মনে সেই প্রাচীন শাস্ত্র-প্রবাদের কথা উদয় হইয়া এই ধারণা হইতে থাকে যে 'ইনিই বুঝি সেই জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব, যাঁহার এই সময়ে প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী আছে।'[১] তাহাদের নিকট হইতে ঐ ধারণা ক্রমে ক্রমে তৎপ্রান্তের প্রায় সর্বত্র বহু জনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সকলের মুখে ঐ অত্যুচ্চ প্রশংসাবাণী শুনিয়া শুনিয়া, অথবা অপর কোন কারণে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিও ক্রমে নিজেকে সেইরূপ মনে করিতে থাকেন এবং কখন কখন কথায়বার্তায় তাহা প্রকাশও করেন। তাহাতে লোকের ধারণা অতি পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় হইয়া পড়ে। তিনি নিজে স্পষ্ট বাক্যে ঐ প্রকার স্বীকার না করিলে ও তাঁহার কর্মসমূহ হইতে বিশেষ করিয়া বিশ্বাসী এবং ভাব-প্রবণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঐ প্রকার ধারণা চলিয়া পড়া অসম্ভব নহে। যাহা মূলে লোকের মনের ধারণা ও বিশ্বাস মাত্র ছিল, তাহা কালান্তরে প্রকৃত তথ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল এবং ঐ প্রান্তের সর্বত্র এবং তদ্‌বহির্ভূত প্রান্তসমূহেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই প্রকারেই একই সময়ে তিন সুদূরবর্তী প্রান্তে তিন ভিন্ন ব্যক্তির ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া প্রচারিত হওয়া সম্ভবপর হয়। ঐ রূপ একটা "পুরাণ" বা প্রাচীন প্রবাদ যে দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলিযুগের আগে ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত ছিল 'স্কন্দপুরাণে' তাহা সুস্পষ্টত উক্ত হইয়াছে। তথায় কেবল ইহা বলা হইয়াছে যে ঐ প্রবাদের সুযোগে এবং আশ্রয়েই পৌণ্ড্রক বাসুদেব বাসুদেব বলিয়া প্রচারিত হইয়া পড়েন। পরন্তু বার্ষ্ণেয় বাসুদেব এবং শৃগাল বাসুদেব সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য সমভাবে প্রযুজ্য বলিয়া বলা যায়।

ভগবান্ বাসুদেবের উপাসকগণ সাত্বত নামে অভিহিত হইত।[১] তাহাদের ধর্মকে 'সাত্বতধর্ম' এবং তাহাদের শাস্ত্রকে 'সাত্বতশাস্ত্র' বলা হইত।[২] সুতরাং বাসুদেবের পুনপ্রাদুর্ভাব বিষয়ক

---

১) '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে

"যত্তদ্‌ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃহ্নন্তি হি সাত্বতাঃ॥" (৯।৯।৪৯)

আরও দেখ—ঐ, ১১।৬।১০·২

'বিষ্ণুপুরাণে' আছে

"যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্॥" —(৫।১৭।১৫)

অর্থাৎ যাঁহাকে যাজ্ঞিকগণ (অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডিগণ) যজ্ঞপুরুষ বলেন এবং বেদান্তবিদগণ বিষ্ণু বলেন, তাঁহাকেই সাত্বতগণ বাসুদেব বলেন। আরও দেখ—

"বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং কথয়ন্তিশ্চ সাত্বতৈঃ॥" (পাদ্মসং, ৪।১১।১১৯·২)

২) দেখ—

"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজম্॥"
—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮।৪৫

প্রবাদ তাঁহাদিগের মধ্যেই উৎপন্ন এবং প্রচারিত হয়। প্রথম প্রথম উহা তাঁহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; পরে অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়ে। তখন ঐ প্রবাদ 'সাত্বতবিধি'নামে অভিহিত হইতে থাকে। ঐ সাত্বত-বিধির আশ্রয়ে সঙ্কর্ষণ বা বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করেন। অপর কথায় বলিলে যাঁহার আগমন সাত্বতগণ বহু দিন পূর্ব হইতে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সঙ্কর্ষণ প্রচার করেন যে তিনি বস্তুত আসিয়াছেন—তিনি কৃষ্ণ-বাসুদেবই। কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতে গিয়া ভীষ্ম উহাকে লক্ষ্য করিয়া দুর্য্যোধনকে বলেন, "সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।"

এইরূপে দেখা যায়, ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাচীন।

কপিল-বাসুদেব

বাসুদেবোপাসনাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাচীন মনে করিবার অপর হেতুও আছে। কৃষ্ণের বহু পূর্বে সাংখ্যাচার্য কপিল বাসুদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। শ্বেতদ্বীপে গিয়া নারদ যে যে "গুহ্য এবং তথ্য(পূর্ণ) নামসমূহ দ্বারা" ভগবান্ নারায়ণের স্তুতি করেন, 'বাসুদেব', 'সাংখ্যযোগ' ও 'সাংখ্যমূর্তি' উহাদের অন্যতম। ব্রহ্মা-কৃত স্তুতিতেও আছে যে ভগবান্ হরি 'সাংখ্যযোগনিধি'।[১] ঐ নারায়ণীয়াখ্যানেই আছে যে পরমর্ষি কপিলই সাংখ্যমতের প্রবর্তক।[২] সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তিনিই 'সাংখ্যমূর্তি' ও 'সাংখ্যযোগনিধি'। যখন তিনি ভগবান্ নারায়ণের প্রাদুর্ভাব বা নারায়ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হন, তখন তাঁহার খ্যাতিসমূহ নারায়ণে আরোপিত হইতে থাকে। ঐরূপেই নারায়ণ 'সাংখ্যমূর্তি' ও 'সাংখ্যযোগনিধি',—সংক্ষেপে 'সাংখ্যযোগ'। শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ মহানারায়ণ স্বয়ং নারদকে বলেন যে "সাংখ্যসিদ্ধান্তে নিশ্চিতবুদ্ধি আচার্যগণ আমাকে বিদ্যাসহায়বান, আদিত্যস্থ এবং সমাহিত কপিল বলেন।"[৪] নিজের নামসমূহের গুণকর্মজ নিরুক্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কৃষ্ণও অর্জুনকে ঠিক সেই কথা বলেন।৪ সুতরাং নারায়ণীয়াখ্যানের মতে নারায়ণ=কপিল=কৃষ্ণ। 'মহাভারতে'র অন্যত্র ঐ বিষয়ের আরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অর্জুনের পরিচয় দিতে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি লোমশকে বলেন, "ঐ যে ভূমিগত শ্রীমান্ বিষ্ণু ও মধুনিষূদন, কপিল নামক দেব ভগবান্ অজিত হরি,—যিনি পূর্বে রসাতল-খনমান সগরের আত্মজ মহাত্মাগণকে দৃষ্টি দ্বারাই নিহত করিয়াছিলেন, হে বিভু, হে দ্বিজসত্তম, তিনি ও পার্থ সম্মিলিত হইয়া মহাযুদ্ধে আমাদের মহৎ কার্য করিবেন। তাহাতে সংশয় নাই।"[৫] তাহাতে জানা যায় যে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব কপিল অর্জুনসখা কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৭।৩৮'২

২) মহাভা, ১২।৩৪৯।৬৫'১ 'মহাভারতে'র অন্যত্রও তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা দেখ, ১২।২১৮।৯; ১৩।১৮।৪'১।

৩) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬৮ বিষ্ণুর সহস্রনামের একনাম 'কপিলাচার্য' (১৩।১৪৯।৭০'১)। মহর্ষি উপমনু-কৃত শিব-স্তুতিতেও আছে "সাংখ্যানাং কপিলো হ্যসি।" (১৩।১৪।৩২৩'২)

৪) মহাভা, ১২।৩৪২।৯৫ ('সমাহিত' স্থলে 'সনাতন' পাঠান্তরে)। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনি "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।" ('গীতা' ১০।২৬'২) যুধিষ্ঠির কৃত কৃষ্ণস্তুতিতে আছে যে তিনি কপিল। (মহাভা, ১২।৪৩।১২

৫) মহাভা, ৩।৪৭।১৮—২০

হন। বিষ্ণু—কপিল—কৃষ্ণ। পরে আছে যেই মহাত্মা কপিল দৃষ্টি দ্বারা সগরের পুত্রগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তিনি 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ছিলেন।[১]

"বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্॥"[২]

'যেই মুনিপুঙ্গব কপিলকে (বিদ্বানগণ) বাসুদেব বলিয়া বলিতেন।' বাল্মীকির 'রামায়ণে'ও তাহার উল্লেখ আছে। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে সগরের পুত্রগণ পৃথিবী খনন করিতে করিতে "দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্" ('তথায় সনাতন বাসুদেব কপিলকে দেখেন')।[৩] কোন কোন পুরাণেও আছে যে যিনি সগরের পুত্রগণকে বিনাশ করেন সেই কপিল বাসুদেব।[৪] 'পদ্মপুরাণে' আছে যে উনিই সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা ("কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ")[৫] তিনি "পুরাণ ঋষিসত্তম"।[৬] পরন্তু তাহা সত্য নহে। কেননা, সাংখ্যের বক্তা ভগবান্ কপিল মহর্ষি কর্দমের পুত্র; আর যিনি সগরাত্মজগণকে বিনাশ করেন সেই কপিল, 'মহাভারতে'র (৫।১০৯।১৭'২—১৮'১) মতে সূর্য হইতে উৎপন্ন ("সূর্যাজ্ জাতঃ"); উঁহার প্রকৃত নাম চক্রধনু; তবে লোকে উঁহাকে কপিল দেব বলিয়া জানিত। 'রামায়ণে' আরও আছে যে বাসুদেবই কপিল রূপে প্রাদুর্ভূত হন।[৭] প্রাচীন পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহেও তাহা পাওয়া যায়।[৮] এইরূপে দেখা যায় যে বিষ্ণুর বাসুদেব নাম কপিলেরও পূর্বে প্রচলিত হয় এবং যখন কপিল বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব বা বিষ্ণু বলিয়া খ্যাত হন, তখন 'বাসুদেব' নামেও তিনি অভিহিত হইতে থাকেন। কেহ কেহ এমনও কল্পনা করিতে পারে যে বাসুদেব কপিলেরই নামান্তর ছিল এবং যখন কপিল বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব বা বিষ্ণু বলিয়া খ্যাত হন, তখন কপিল ও বাসুদেব বিষ্ণুর নামান্তর হয়। এই কল্পনা অভ্যুপগম করিলেও ইহাতে কোন সংশয় থাকে না যে বিষ্ণুর বাসুদেব নাম কৃষ্ণের বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত হয়। কেননা, সাংখ্যাচার্য পরমর্ষি কপিল অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। পরন্তু বিষ্ণুর কপিল নাম সম্বন্ধে ঐ কল্পনা সত্য হইলেও, বাসুদেব নাম সম্বন্ধে তাহা বাস্তব বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরা ঐ বিষয়ে প্রথম বিকল্পকেই অধিকতর সমীচীন এবং প্রকৃত বলিয়া মনে করি। কেননা, কপিলের বাসুদেব নাম অতি অপ্রসিদ্ধ এবং ঐ অপ্রসিদ্ধ নাম মূলে বিষ্ণু বাসুদেব বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হন,—মনে করা কষ্ট-কল্পনাই। আরও দেখ,—কোন দেবতার কিম্বা কোন প্রাচীন মহদ্ব্যক্তির নামে সন্তানের নামকরণ করার পদ্ধতি এই দেশে প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালেও উহা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুর বাসুদেব নাম কপিলের পূর্ব হইতে লোকসমাজে সুপরিচিত ছিল। তিনি যখন বিষ্ণু বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন হন,

---

১) মহাভা, ৩।১০৭।২৯-৩১, ৫০-৮ ২) মহাভা, ৩।১০৭।৩১'২

৩) 'রামায়ণ' ১।৪০।২৫'১ ৪) বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ১।১৮।৪— ৫) পরে দেখ।

৬) মহাভা, ৩।১০৭।৫১'১

৭) "যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।"(রামায়ণ, ১।৪০।২)

৮) যথা দেখ—
"কাপিলং রূপমাসাদ্য বাসুদেবঃ স্থিতঃ প্রভুঃ।"
—(পৌষ্করসংহিতা, ৩৬।৩৫৮'২)

তখন তিনি সময় সময় বিষ্ণুর বাসুদেব নামেও অভিহিত হইতেন। অথবা, বাসুদেব যদি কপিলের মূল নামান্তর হয়, তবে বলিতে হইবে যে বিষ্ণুর বাসুদেব নামের অনুকরণে তাঁহার পিতামাতা তাঁহার নাম বাসুদেব রাখেন। ঐ প্রকারেই কৃষ্ণের, পৌণ্ড্রকের এবং শৃগালের নামও বাসুদেব রাখা হয়। এই অনুমান খুব সহজ এবং সঙ্গত। একই সময়ে হিন্দুস্থানের তিন পরস্পর সুদূরবর্তী স্থানের তিন ব্যক্তির একই নাম হওয়ার সঙ্গত কারণ অপর কিছুই হইতে পারে না।

প্রসঙ্গত ইহা বলা উচিৎ মনে হয় যে 'মহাভারতে' অপর এক জন "পরমর্ষি কপিলে"র উল্লেখ আছে। তিনিও "সাংখ্যযোগ—প্রবর্তক"। "যতিগণ যাহাকে সদা 'পরমর্ষি কপিল' বলেন, সেই কপিল নামক অগ্নি সাংখ্যযোগপ্রবর্তক।"[1] তিনি পূর্বোক্ত বাসুদেব কপিল হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। 'পদ্মপুরাণে' তাহা পরিষ্কার নির্দেশিত হইয়াছে। তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে বাসুদেব নামেও খ্যাত কপিলের সাংখ্য 'সর্ববেদার্থোপবৃংহিত', আর অপর কপিলের সাংখ্য "সর্ববেদবিরুদ্ধ" এবং "কুতর্কপরিবৃংহিত"। উভয়েই আসুরির নিকট সাংখ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, পরন্তু ঐ আসুরি ভিন্ন ভিন্ন।[2] আচার্য মধ্ব 'কালকীয়' নামক এক গ্রন্থ হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[3] উহাতেও প্রকারান্তরে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে,—পুরাকালে ঐতরেয় মহীদাস, দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় কপিল—এই তিন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে অতন্দ্রিত থাকিয়া কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহাদের সকলেই এই বরসমূহ প্রার্থনা করেন যে—(১) তাহারা "বেদোক্তা" হইবেন, (২) বিষ্ণুর সহিত তাঁহাদের নামৈক্য হউক ("নামৈক্যং বিষ্ণুনা স্যাৎ"), এবং (৩) তাঁহাদের নামে নামবান্ অপর তিন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুক। মহীদাস এবং কৃষ্ণ অধিকন্ত প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের নামীয় ব্যক্তিদ্বয়ের মাতার নামও তাঁহাদের মাতার নামের সহিত এক হইবে, আর কপিল প্রার্থনা করেন যে তাঁহার এবং ভাবী-কপিলের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের

---

[1] মহাভা, ৩।২২১।২১

[2] "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ববেদবিরুদ্ধং চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ॥
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্।

"স্বকৃত 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা'য় 'পদ্মপুরাণ', কাশ্মীরি কেশবভট্ট (১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) 'পদ্মপুরাণে'র এই বচন এবং ঐ 'মহাভারত'—বচন (৩।২২১।২১) অনুবাদ করিয়াছেন এবং উহাদের আধারে তিনি বলিয়াছেন যে "শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্তকস্ত্বগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব ন কর্দমাত্মজঃ।" তিনি আরও মনে করেন যে ঐ দ্বিতীয় কপিলেরই মত বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। ('বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা', ২।১।১) ঐ 'পদ্মপুরাণে'র বচন, 'সাংখ্যং তত্ত্বং' স্থলে 'তন্ত্রং সাংখ্যং' পাঠান্তরে আচার্য মধ্বও (জন্ম ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) অনুবাদ করিয়াছেন। ('ভাগবততাৎপর্যনির্ণয়', ১।৩।১০ ('গ্রন্থাবলী', ৭৯২'২-৭৯৩'১ পৃষ্ঠা)।

[3] 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র মধ্ব-কৃত ভাষ্য, ৩।১৬ ('গ্রন্থাবলী', ৫৯৬ পৃষ্ঠা)।

নামের ঐক্য হউক। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত বর প্রদান করেন। তাহাতে পরবর্তী কালে তাঁহাদের নামে নামবান্ তিন জন মুনি জন্মগ্রহণ করেন। "বহ্বৃচোপনিষদ্‌গত ঐতরেয় মহীদাস সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু। তাঁহার নামের একজন মুনিও অবশ্যই ছিলেন। বাসুদেবাখ্য কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কেবল পরমাত্মা। পরন্তু তন্নামা অন্য এক দেবকী-পুত্রও অচিরে জন্মগ্রহণ করেন। বাসুদেবাখ্য কপিল সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণই। তাঁহার নামের অন্য এক কপিলও জন্মগ্রহণ করেন,—যাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের নামও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের নাম ছিল। এই অপর মহীদাস ঋষি হন এবং ষোড়শ শত বৎসর জীবন ধারণ করেন। ঘোর-শিষ্য (দেবকীপুত্র) কৃষ্ণও তথা (অর্থাৎ ঋষি), আর কপিল, কুশাস্ত্রকৃৎ হন।" এই আখ্যায়িকা হইতে এতাবৎ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, মনে হয় যে পুরাকালে ঐতরেয় মহীদাস, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং কপিল নামে দুই দুই ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। ঐ নামের আদ্য ব্যক্তিত্রয় বৈদিক ঋষি ছিলেন। তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভাব বলিয়া পরিগণিত হন এবং সেই হেতু তাঁহাদের নাম বিষ্ণুর নামত্রয় বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ঐ নামের প্রাক্‌কালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐতরেয় মহীদাস এবং দেবকীপুত্র কৃষ্ণই বেদানুযায়ী ঋষি হন, পরন্তু অপর জন—কপিল, অবৈদিক কিম্বা বেদবিরোধী মত প্রচার করেন। তাই তাঁহাকে "কুশাস্ত্রকৃৎ" বলা হইয়াছে। এই অবাক্‌-কালীন কৃষ্ণ ঘোর ঋষির শিষ্য ছিলেন। তিনিই বোধ হয় 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র কৃষ্ণ।

পুরাণর্ষি জগদ্‌গুরু বাসুদেব

'স্কন্দপুরাণে' "পুরাণর্ষি জগদগুরু বাসুদেবে"র এক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"ধর্মস্য যস্য শ্রদ্ধা স্যান্ন চ সা নৈব পূর্যতে।
পাপস্য যস্য শ্রদ্ধা স্যান্ন চ সাপি ন পূর্যতে॥
এবং বিচিন্ত্য বিদ্বাংসঃ প্রকুর্বন্তি যথারুচি।"[১]

'ধর্মের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা আছে, তাহার সেই শ্রদ্ধা যে পূর্ণ হয় না, তাহা নহে। পাপের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা আছে, তাহার সেই শ্রদ্ধাও পূর্ণ হয় না, তাহা নহে। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিদ্বানগণ যথারুচি করিয়া থাকেন।' কথিত হইয়াছে এই বচন দেবর্ষি নারদ অর্জুনের নিকট অনুবাদ করেন। ঐ জগদগুরু বাসুদেব কে? //

পরমেশ্বর বাসুদেব ও মানুষ বাসুদেব

উপরের লেখা হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে প্রাচীন কালে হিন্দুস্থানে বাসুদেব দুই কোটির বলিয়া মানা হইত,—এক ঈশ্বর-কোটির, অপর মনুষ্য-কোটির,—এক পরমদেবতা বা পরমেশ্বর-বাসুদেব, অপর মানুষ-বাসুদেব। ততোধিক ইহাও মানা হইত যে পরমেশ্বর-বাসুদেবই মানুষ-বাসুদেব রূপে প্রাদুর্ভূত হন। অথবা, ইহাও বলা যায় যে পরমেশ্বরের বাসুদেব নামের অনুকরণে মানুষের নাম বাসুদেব রাখা হয়। তাই পরমেশ্বর-বাসুদেব এক, আর

---

[১] স্কন্দপু, ১।২।৪।২৯—৩০।

মানুষ-বাসুদেব অনেক। ঐ দুই কোটির বাসুদেবের সদ্ভাবের উল্লেখ মহাভারতপুরাণাদিতে প্রকারান্তরেও,—এবং কখন কখন কথঞ্চিৎ সাক্ষাদ্ভাবেও পাওয়া যায়। যথা, 'গীতা'র এক স্থলে আছে, "বাসুদেবঃ সর্বং" ('সর্ব বা বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুত বাসুদেবই')।[1] উনি অবশ্যই পরমেশ্বর-বাসুদেব। উহার অপর এক স্থলে আছে, "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি"[2] অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশীয়, সুতরাং মানুষ, বাসুদেব ঐ পরমেশ্বর-বাসুদেবের এক বিভূতিমাত্র,—সর্বের একটি মাত্র,—বিশ্বপ্রপঞ্চের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অপর কথায়—'গীতা'র নিজের ভাষায়, বলিলে, উহাতে কৃষ্ণ বাসুদেবের দুই রূপের উল্লেখ আছে—এক "ঐশ্বররূপ"[3] বা "পরম ঐশ্বররূপ"[4], অপর তাঁহার স্বকীয় রূপ ("স্বকং রূপং")।[5] ঐশ্বররূপ "বিশ্বরূপ" বা "বিশ্বমূর্তি"[6], আর স্বকীয় রূপ "মানুষ রূপ"।[7] নারায়ণীয়াখ্যানে আছে, শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ (মহা)নারায়ণ নারদের নিকট বাসুদেবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। বাসুদেব সনাতন পরমাত্মাই; তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, সর্বগত ও সাক্ষী; অজ, নিত্য, শাশ্বত, নির্গুণ, নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ।[8] "সর্বভূতাত্মভূতো হি বাসুদেবো মহাবলঃ" ('মহাবল বাসুদেব সর্বভূতের আত্মভূত')[9]। তিনি আরও বলেন যে দ্বাপর ও কলির সন্ধির শেষভাগে তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং কংসবধাদি নানা কার্য করিবেন।[10] ঐ প্রাদুর্ভাবের নাম 'বাসুদেব' বলিয়া উল্লিখিত না হইলেও তাঁহার জন্ম এবং কর্মসমূহের বর্ণনা ভবিষ্যদ্বাণী রূপে হওয়াতে নিশ্চিত হয় যে কৃষ্ণ-বাসুদেবের জন্মের পূর্বেও পরমেশ্বর-বাসুদেব ছিলেন,—'মহাভারত'কার তাহাই মনে করেন। শ্বেতদ্বীপ হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর নারদকে নারায়ণ ঋষি বলেন যে নির্গুণাত্মক পরমাত্মাই সর্বাবাস বাসুদেব;[11] "(যাহারা) সমাহিতমনস্ক, নিয়ত, সংযতেন্দ্রিয় এবং একান্তভাবোপগত, তাহারা বাসুদেবে প্রবেশ করে।"[12] তাহাতে মনে হয় যে ভগবানের বাসুদেব নাম নারায়ণ ঋষিরও পূর্বে প্রচলিত হয়। পরন্তু তাহাতে সন্দেহ করিবারও হেতু আছে। কিঞ্চিৎ পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

বাসুদেব যে দ্বিবিধ—এক ভগবান্, অপর মানুষ, তাহা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও (১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দোপকাল) মানিতেন এবং তাঁহার মতে পানিনিও জানিতেন। পানিনির এক সূত্রে আছে "বাসুদেবার্জুনভ্যাং বুন্" (৪।৩।৯৮)। তন্মতে বাসুদেব + বুন্ = বাসুদেবক (= বাসুদেবভক্ত) এবং অর্জুন + বুন্ = অর্জুনক (= অর্জুন-ভক্ত)। উহার অব্যবহিত পরের সূত্রে পানিনি বলিয়াছেন "গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্" (৪।৩।৯৯) অর্থাৎ গোত্র ও ক্ষত্রিয় বাচক শব্দে বুঞ্ প্রত্যয় হয়, বুন্ নহে। তাহাতেও পতঞ্জলি বাসুদেব এবং অর্জুনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বাসুদেব + বুঞ্ = বাসুদেবক, অর্জুন + বুঞ্ = অর্জুনক। এইরূপে দেখা যায়, 'বাসুদেবক' এবং 'অর্জুনক' শব্দ পানিনি মতে দুই সূত্র দ্বারা দুই প্রকারে সাধন করা যায়। তাহাতে পতঞ্জলি এই শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে ক্ষত্রিয় হিসাবে 'বাসুদেব' শব্দে যখন 'বুঞ্' প্রত্যয়ের বিধান আছে, তখন

---

[1] গীতা, ৭।১৯'২

[2] গীতা, ১০।৩৭'১

[3] গীতা, ১১।৩

[4] গীতা, ১১।৯'২

[5] গীতা, ১১।৫০'১

[6] গীতা, ১১।১৬, ৪৬ ও ১৫—

[7] গীতা, ১১।৫১

[8] মহাভা, ১২।৩৩৯।২১-৫ ; পরে দেখ

[9] মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৩'১

[10] মহাভা, ১২।৩৩৯।৮৯'২—১০৩'১

[11] মহাভা, ১২।৩৪৪।১৭—৮

[12] মহাভা, ১২।৩৪৪।১৯

আবার 'বুন্' প্রত্যয়ের ব্যবস্থা কেন? বিশেষত যখন 'বাসুদেব' শব্দে 'বুঞ্' কিম্বা 'বুন্' যে, প্রত্যয়ই করা যাউক না কেন, নিষ্পন্ন শব্দের রূপের কিম্বা স্বরের কোনই পার্থক্য হয় না। পতঞ্জলি স্বয়ং ঐ শঙ্কার উত্তর দিয়াছেন,—"অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্র ভগবতঃ" অর্থাৎ যাহাতে 'বুন্' প্রত্যয় হয়, সেই 'বাসুদেব' ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ভগবানেরই নাম।[১] কৈয়টের 'ভাষ্যপ্রদীপে' আছে: "সংজ্ঞৈষেতি। নিত্যং পরমাত্মদেবতাবিশেষ ইহ বাসুদেবো গৃহ্যত ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ ঐখানে বাসুদেবকে নিত্য পরমাত্মদেবতাবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'কাশিকা'কার জয়াদিত্যও বলিয়াছেন যে ঐখানে পানিনি বাসুদেবকে দেবতাবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন ("সংজ্ঞৈষা দেবতাবিশেষস্য")। এইরূপে দেখা যায়, পানিনি দুই জন বাসুদেবের উল্লেখ করিয়াছেন,—এক ভগবান্ বাসুদেব, অপর বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় বাসুদেব।

কোন কোন বৈখানস আগমেও দুই জন বাসুদেবের মূর্তির প্রতিষ্ঠার্চনাদির বিধান আছে,—একজন "মানুষ বাসুদেব", অপর জন "দৈবিক বাসুদেব"। মানুষ বাসুদেবের মূর্তি দ্বিভুজ এবং শঙ্খচক্রধর। উহার দক্ষিণে পর পর রুক্মিণী, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, প্রভৃতির মূর্তি, আর বামে পর পর অনিরুদ্ধ, সাম্ব প্রভৃতির মূর্তি স্থাপন করিতে হইবে। দৈবিক বাসুদেবের মূর্তি চতুর্ভুজ। উহার তিন হাতে শঙ্খ, চক্র ও অভয় এবং অপর হাত কট্যবলম্বিত। উহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যথাক্রমে শ্রীদেবীর ও ভূদেবীর মূর্তি স্থাপন করিতে হইবে। উহাদের পার্শ্বে পূর্বোক্ত ক্রমে বলরাম, অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকেও সস্ত্রীক স্থাপন করিতে হইবে।[২] এই বিবরণ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে দৈবিক বাসুদেব ভগবান্ বিষ্ণুই, আর মানুষ বাসুদেব তাঁহার অবতার বলিয়া খ্যাত বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণই।[৩]

নারায়ণ ও বাসুদেব নাম

ইহা বলা উচিৎ যে নারায়ণ কিম্বা বাসুদেব নামে কোন দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। অপর কথায়, ঋগ্বেদে কোন দেবতাকে নারায়ণ কিম্বা বাসুদেব নামে অভিহিত

---

১) "কিমর্থং বাসুদেবশব্দাদ্বুন্ বিধীয়তে ন 'গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্' [৪।৩।৯৯] ইত্যেব সিদ্ধম্। ন হ্যস্তি বিশেষো বাসুদেবশব্দাদ্বুনো বা বুঞো বা। তদেব রূপং স এব স্বরঃ। ইদং তর্হি প্রয়োজনং বাসুদেবশব্দস্য পূর্বনিপাতং বক্ষ্যামীতি। অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্রভগবতঃ।"—(মহাভাষ্য, ৪।৩।৯৮)

২) 'বিমানার্চনাকল্প', ৬০ পটল, ৩৮৪-৬ পৃষ্ঠা; 'বৈখানসাগম', ৬১ পটল, ২০৬-৭ পৃষ্ঠা; 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬১ অধ্যায়।

৩) দেখ—

"বাসুদেবং যদুবরং বিষ্ণুং চ পুরুষোত্তমম্।
রুক্মিণীং সুন্দরীং দেবীং রমামীতি সমাহ্বয়েৎ॥"
—('সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬১।২৩)

মরীচি বলিয়াছেন গ্রামকে ৬৪, ৮১ কিম্বা ২২৫ পদে বিভক্ত করতঃ তন্মধ্য ব্রহ্মভাগকে চারিভাগে ভাগ করিয়া তাহার বায়ব্যাংশে…দেবেশ বিষ্ণুর নব, ষট্, পঞ্চ বা এক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ অর্চনা করিবে।…"পরাঙ্মুখে জয়ন্তে দৌবারিকে কৃষ্ণস্থালয়ং, পুষ্পদন্তে শোষিণে রাঘবস্য,…যক্ষগন্ধর্বে বলভদ্রং,…গৃহক্ষতে দৈবতং বাসুদেবং, বিতথে মানুষং বাসুদেবং, কৃষ্ণাংশে হ্যাদিমূর্তিং…" প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চনা করিতে হইবে। ('বিমনার্চনাকল্প', ২য় পটল, ৮ পৃষ্ঠা; 'বৈখানসাগম', ২য় পটল, ৩ পৃষ্ঠা)। তাহাতে বুঝা যায় যে মানুষ বাসুদেব ও দৈবত বাসুদেব ভিন্ন ভিন্ন, এবং কৃষ্ণ তাঁহাদের উভয় হইতে ভিন্ন।

করা হয় নাই। নারায়ণ নামে একজন ঋষির উল্লেখ বেদে আছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে'র দ্রষ্টা। বাসুদেব নামে কোন ঋষির কিম্বা অপর কোন ব্যক্তির উল্লেখ বেদে নাই। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা,—বেদের কতিপয় মন্ত্রের দেবতা বিষ্ণু। তাঁহার নারায়ণ ও বাসুদেব নাম মহাভারতপুরাণাদিতে অতীব প্রসিদ্ধ। অথচ ঋগ্বেদে উহাদের আভাস মাত্রও নাই। তাই জানিতে ইচ্ছা হয়, উহারা কখন হইতে এবং কি কারণে প্রচলিত হইল। বিষ্ণুর বাসুদেব নাম, যতদূর জানা গিয়াছে, প্রথম প্রথম 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র অন্তর্গত 'নারায়ণোপনিষদে' পাওয়া যায়। তথায় এই মন্ত্র আছে,—

> "নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"[১]

ইহা 'বিষ্ণু-গায়ত্রী' বলিয়া খ্যাত।[২] ইহার মতে,

নারায়ণ = বাসুদেব = বিষ্ণু

পরন্তু 'মৈত্রায়ণীয়সংহিতা'র সমান প্রকরণের মন্ত্র কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

> "তৎকেশবায় বিদ্মহে নারায়ণায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"[৩]

সুতরাং উহার মতে—

কেশব = নারায়ণ = বিষ্ণু

এই সকল হইতে মনে হয় যে 'মৈত্রায়ণীয়সংহিতা'র সময়ে বিষ্ণুর নারায়ণ নাম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, পরন্তু বাসুদেব নামকরণ হয় নাই। সুতরাং বিষ্ণুর নারায়ণ নাম-করণ পূর্বে হয়, বাসুদেব নাম-করণ তাহার পরে হয়। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র যেই অংশে 'নারায়ণোপনিষৎ' আছে, উহা খিল-রূপ। সুতরাং উহা পরে সংযোজিত। সেই কারণে উহার প্রমাণে বিষ্ণুর নারায়ণ ও বাসুদেব নামদ্বয়কে প্রাচীন বলা যায় না।

নারায়ণগণ

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে একদল সৈন্য ছিল, যাহারা "নারায়ণা ইতি খ্যাতাঃ" ('নারায়ণগণ বলিয়া খ্যাত ছিল')। উহাদের শৌর্যবীর্যের ও যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। কথিত হইয়াছে যে উহারা "যুদ্ধদুর্মদ" এবং "সমরে চিত্রযোধী"। কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে উহারা সকলে সংগ্রামযোধী,—এমনকি তাঁহাকেও মারিতে সমর্থ ("মৎসংহননতুল্যানাং")। এক সময়ে নারায়ণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল দ্বারা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এমন করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে যে মুহূর্ত মধ্যে উঁহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া দেয়।[৪] উহারা জাতিতে গোপ বা গোপাল ছিল।[৫]

---

১) তৈত্তিরীয়ার, ১০।১।৬

২) "নারায়ণায় বিদ্মহে" ইত্যাদি মন্ত্র প্রথম হইতে বিষ্ণুগায়ত্রী বলিয়া খ্যাত ছিল না বোধ হয়। অথবা সকলে উহাকে বিষ্ণুগায়ত্রী বলিয়া মানিত না বোধ হয়। কেননা, 'বৈখানসাগমে' আছে, "বিষ্ণুগায়ত্রীং 'চিত্রং দেবানামি'ত্যুক্ত্বা।" (১০ম পটল, ৩৫ পৃষ্ঠা)

৩) মৈত্রাসং, ২।৯।৮

৪) মহাভা, ৭।১৯।৭—

৫) "নারায়ণাশ্চ গোপালাঃ সমরে চিত্রযোধিনঃ।" (মহাভা, ১।২।২৬৩·১)
"নারায়ণাশ্চ গোপালাঃ" (৭।১৮।৩১·২)

দুর্যোধন কি প্রকারে উহাদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে যুদ্ধের উদ্যোগের সময়ে,—সৈন্য সংগ্রহের সময়ে দুর্যোধন এবং অর্জুন উভয়েই কৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ উভয়কে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি বলেন "আমাকেও সংহনন করিতে সমর্থ গোপদিগের নারায়ণগণ বলিয়া খ্যাত এক অর্বুদ মহান্ (সৈন্য আছে। উহারা) সকলে সংগ্রামযোধী। যুদ্ধে দুরাধর্ষ তাহারা একের সৈনিক হউক। আর সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্র এবং অযুধ্যমান আমি এক পক্ষে (থাকিব)।"[১] তিনি প্রথমে অর্জুনকে উভয়ের এককে বরণ করিতে বলেন। অর্জুন কৃষ্ণকেই বরণ করেন। সুতরাং দুর্যোধন নারায়ণগণকে প্রাপ্ত হন। উহাদিগকে পাইয়া দুর্যোধন মনে করিতে লাগিলেন যে তিনি যেন কৃষ্ণকেই অপহরণ করিয়াছেন ("কৃষ্ণং চাপহৃতং জ্ঞাত্বা") এবং সেই হেতু তিনি পরম আনন্দিত হইলেন,—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।[২] তাহাতে অনুমান হয় যে নারায়ণগণ কৃষ্ণেরই সৈন্য,—তিনিই গোপদিগের মধ্য হইতে ঐ সৈনিকগণকে সংগ্রহ করিয়া সংগঠিত এবং শিক্ষিত করিয়াছিলেন। অন্যথা তিনি কি করিয়া কাহাকেও উহাদিগকে দিতে পারিতেন? এক স্থলে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত এবং তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বানকারী সৈন্যদিগের মধ্যে "চত্বারি চ সহস্রাণি বাসুদেবস্য চানুগাঃ" ('চারি হাজার বাসুদেবের অনুযায়িগণ') মহারথের উল্লেখ আছে।[৩] গোপাল নারায়ণগণকেই "বাসুদেবের অনুযায়িগণ" বলা হইয়াছে মনে হয়। আর ঐ বাসুদেব যদি কৃষ্ণ-বাসুদেবই হন, তবে পূর্বোক্ত অনুমান আরও সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত হয়। পরন্তু ঐ অনুমানের বিরুদ্ধে এক শঙ্কা করা যাইতে পারে। কথিত হইয়াছে যে এক সময়ে অর্জুন হতাবশিষ্ট নারায়ণগণের প্রতি ত্বাষ্ট্র নামক পরমাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাহা দ্বারা মোহিত হইয়া উহাদের প্রত্যেকে অপরকে কৃষ্ণ ও অর্জুন বলিয়া ভ্রম করিতে লাগিল। এবং সেই হেতু কৃষ্ণ ও অর্জুনকে মারিতে গিয়া নারায়ণগণ পরস্পরকে বধ করে এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।[৪] নারায়ণগণ যদি কৃষ্ণ-বাসুদেবেরই সৈনিক হইবে—তাঁহারই অনুযায়ী হয়, তবে তাঁহাকে এবং তাঁহার পরম মিত্র অর্জুনকে মারিতে সমুদ্যত হয় কি প্রকারে? হপ্‌কিন্স বলেন, "নারায়ণগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণোপাসনার মূল বিরোধী ছিল কেননা, যদিও তাহারা গোপাল ছিল, তাহাদিগকে কৃষ্ণগোবিন্দের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রুগণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্জুন ঐ গোপগণকে প্রত্যাখ্যান করেন, তৎপরিবর্তে নারায়ণকে বরণ করেন। তাহা নিশ্চিতরূপে প্রদর্শন করে যে (নারায়ণগণের উপাস্য) নারায়ণ কৃষ্ণ নহেন এবং যে এক প্রাচীনতর বাসুদেবের অনুযায়িগণ (তাহাদিগকে 'বাসুদেবস্য অনুগাঃ' বলা হইয়াছে) কর্তৃক কৃষ্ণের দেবভবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাধা প্রদান করা হইয়াছিল।"[৫]

"নারায়ণবলৈর্যুক্তো গোপালৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ।" (৮।১১।১৭·২)
"গোপানাং বহুসাহস্রৈর্বলৈর্গোপায়নৈর্বৃতঃ।" (৬।৭১।১৩·১)

[১] মহাভা, ৫।৭।১৮-৯

[২] মহাভা, ৫।৭।২৪·১, ৩১.২ ; আরও দেখ—১।২।২১।২১৮·২—২২১

[৩] মহাভা, ৭।২৭।১১·২

[৪] মহাভা, ৭।১৯।১১—৪ আরও দেখ—৭।৯১।৩৯

[৫] E. W. Hopkins, Epic Mythology, Strasoburg, 1915, p. 214.

চতুর্থ অধ্যায়

দার্শনিক সিদ্ধান্ত

(১) 'মহাভারতে'র আধারে

বাষ্ণেয়াধ্যাত্ম—'জনৈক শ্রেয়ার্থী এবং পরমমেধাবী শিষ্য আপন আচার্য্য তত্ত্বদর্শী ঋষিসত্তমকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি এবং আমি (অর্থাৎ জীববর্গ) কোন্ উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? তাহা হইতেও পরম তত্ত্ব কি? তৎসমস্ত সর্বভূতে সমান হইলেও উহাদের উন্নতি এবং অবনতি বিষম দৃষ্ট হয় কেন? ঐ বিষয়ে বেদের সিদ্ধান্ত কি? এবং ব্যাপক (বা বহুজন-সম্মত) লৌকিক সিদ্ধান্তও বা কি?'[১] তাহাতে আচার্য্য উত্তর করেন যে ঐ অধ্যাত্মতত্ত্ব বেদেরও পরম গোপনীয়; উহা সমস্ত বিদ্যার এবং সমস্ত আগমের পরম সম্পত্তি। তবে বৃষ্ণিবংশীয় বিদ্বান্‌গণ, অথবা তাঁহাদিগের প্রধানতম ব্যক্তি কৃষ্ণ, উহা যে প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা তিনি বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "বাসুদেবই ঐ পরম অধ্যাত্ম। তিনি সমস্ত বেদের মুখ (স্বরূপ ওঁ)। তিনি সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ। অনন্তর তিনি যজ্ঞ, তিতিক্ষা, দম এবং আর্জব (অর্থাৎ যজ্ঞাদি তাঁহাকে জানিবার প্রকৃষ্টতম সাধন) বেদবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্গপ্রলয়কর্তা, বিষ্ণু, সনাতন পুরুষ, এবং শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া জানেন।"[২] অনন্তর তিনি অপরিমিততেজঃসম্পন্ন দেবদেব বিষ্ণুর মাহাত্ম্য" বিবৃত করেন। "এই যে অনাদি ও অনন্ত কালচক্র,—যাহা ভাবাভাবস্বলক্ষণাত্মক (অর্থাৎ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং স্বর্গপ্রলয়াত্মক), এই যে ত্রৈলোক্য,—যাহা সর্বভূতেশে (অবস্থিত থাকিয়া) চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে, (হে পুরুষব্যাঘ্র, তাহাকেই (বিদ্বান্‌গণ) পুরুষর্ষভ কেশব এবং অক্ষর, অব্যক্ত, অমৃত ও শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।"[৩] এইরূপে দেখা যায় বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম মতে বাসুদেব বা বিষ্ণু কেবল যে জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তা তাহা নহেন, তিনিই সৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ। অর্থাৎ তিনিই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ। আবার তিনিই কার্যকারণভাবের অতীত অক্ষর, অব্যক্ত, অমৃত এবং শাশ্বত ব্রহ্ম।

বিষ্ণু সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেন এবং উহাদের সুপরিচালনার জন্য শাশ্বত বেদশাস্ত্রসমূহ এবং লোকধর্মসমূহ সৃষ্টি করেন। প্রতিযুগের অন্তে সমস্ত সৃষ্টবস্তুসহ প্রলয়প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর পর যুগের প্রারম্ভে ভগবান্ প্রকৃতিকে এবং তদ্বিকার জগৎকে পুনঃ সৃজন করেন। ঋতুতে যেমন ঋতুচিহ্নসমূহ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পত্রপুষ্পাদি লক্ষণসমূহ পর্য্যায়ক্রমে যথানিয়মে প্রকট হইয়া থাকে, তেমন যুগে যুগে জাগতিক বস্তুসমূহও প্রকাশ পায়। তখন লোকযাত্রানির্বাহার্থ জ্ঞানও যথাযথ প্রকাশ পায়।[৪]

---

[১] মহাভা, ১২।২১০।৫.২—৭

[২] ঐ, ১২।২১০।৯—১০

[৩] ঐ, ১২।২১০।১৩.২—১৪

[৪] ঐ, ১২।২১০।১৫—৮

"পুরুষাধিষ্ঠিতান্ ভগবান্ প্রকৃতিঃ সূয়তে যদা।
হেতুযুক্তমতঃ পূর্বং জগৎ সম্পরিবর্ততে॥"[১]

'যখন প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত (বা আলোচিত) বস্তুসমূহ উৎপন্ন করে, তখনই জগৎ প্রথম হইতেই (বিষম উন্নতি ও অবনতির) হেতুযুক্ত হইয়াই নির্গত হয়।' অর্থাৎ জগতের কারণ বিষ্ণু নির্দোষ এবং সম হইলেও,[২] সৃষ্ট জগতে বৈষম্য অনাদিকাল হইতেই আছে। সুতরাং উহা কোথা হইতে আসিল? সেই প্রশ্ন সমীচীন নহে। তাহার কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। সৃষ্টির ক্রম সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে ব্রহ্ম হইতে প্রথমে অব্যক্ত বা প্রকৃতি উৎপন্ন হয়; অনন্তর উহা হইতে প্রথম "কর্মজ বুদ্ধি" বা মহৎ এবং তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল্ এবং জল হইতে পৃথিবীতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই আটটিকে অষ্টপ্রকৃতি বলা হয় এবং সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ইহাদিগেতেই অবস্থিত। পুরুষ পরম অব্যয়।[৩] সুতরাং সৃষ্টিতে তাঁহার কোন বিকার হয় না। তাহাতে প্রকৃতিরও অপচয় হয় না। এক দীপ হইতে যেমন অপর সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তেমন প্রকৃতি হইতে অনন্তবৈচিত্র্যময় এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন ঐ ব্যাপারে প্রথম দীপের কোন হানি হয় না, তেমন সৃষ্টিতে প্রকৃতিরও কোন অপচয় হয় না, কেননা, উহা অনন্ত।[৪]

"এতে ভাবা জগৎ সর্বং বহন্তি সচরাচরম্।
শ্রিতা বিরজসং দেবং যমাহুঃ প্রকৃতেঃ পরম্॥"[৫]

এই সমস্ত পদার্থ (=অষ্ট প্রকৃতি এবং তদুৎপন্ন ষোল বিকার) চরাচর সমস্ত জগৎকে বহন করিতেছে। এবং উহারা, যাহাকে প্রকৃতি হইতে পর (=ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠ) বলা হয়, সেই বিরজস (অর্থাৎ প্রবৃত্তিরহিত=নিষ্ক্রিয়) দেবের (অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষের) আশ্রয়ে অবস্থিত আছে।' সৃষ্টি সম্বন্ধে বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। "যেমন অণুপরিমাণ অশ্বত্থ বীজের মধ্যে মহান্ অশ্বত্থবৃক্ষ, (সূক্ষ্মরূপে) নিহিত আছে, (পরন্তু তখন উহা দৃষ্ট হয় না, স্থূল বৃক্ষরূপে) নিষ্পন্ন হইলেই দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ এই (বিরাট্) ব্যক্ত (বা কার্য্যজগৎ) অব্যক্ত (কারণ) হইতে উৎপন্ন হয়, (কারণে নিহিত অবস্থায় ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না, পরন্তু কার্য্যরূপে নিষ্পন্ন হইলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে)।"[৬] এইরূপে সৎকার্য্যবাদ স্থাপিত হইল। তন্মতে কার্য্য কারণে অতিসূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে। কালবশতই অব্যক্ত কারণ কার্যরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।[৭] কাল এবং কার্য্যজগৎ যে বস্তুত বিষ্ণুই তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে বিষ্ণুর কার্য্যকারণাত্মকত্ব ব্যাখ্যা করতঃ সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে যে বস্তুত

"নাভ্যেতি কারণং কার্য্যং ন কার্য্যং কারণং তথা।"[৮]

'(সৃষ্টিতে) কারণ কার্য্য হয়, তথা (প্রলয়ে) কার্য্য কারণ হয় না।' টীকাকার নীলকণ্ঠ রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বচনের তাৎপর্য্য বিশদ করিয়াছেন। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়,

---

১) মহাভা, ১২।২১০।২৫
২) দেখ—"নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"—(গীতা)
৩) ঐ, ১২।২১০।১৫·২
৪) ঐ, ১২।২১০।২৬
৫) ঐ, ১২।২১০।৩৬
৬) মহাভা, ১২।২১১।২
৭) ঐ, ১২।২১১।১১·২; আর ও দেখ ২১০।১৮·১
৮) ঐ, ১২।২১১।১১·১

তখন রজ্জু বস্তুতঃই সর্প হয় না। নিরাধার ভ্রম হইতে পারে না। সেইহেতু যদিও সর্পপ্রতীতি ভ্রমমাত্র, তথাপি উহার জন্য রজ্জুরূপ আধারের প্রয়োজন আছে। ঐ দৃষ্টান্তে রজ্জুকে কারণ এবং সর্পকে কার্য্য বলা যায়। পরন্তু তাহাতে কারণ বস্তুতঃ কার্য্য হয় না। সেইরূপ সৃষ্টিতে ব্রহ্ম বস্তুতঃ জগৎপ্রপঞ্চ হয় না। এইরূপে, তিনি বলেন, ঐ বচনে বিবর্তবাদই খ্যাত হইয়াছে। অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে

"মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি গুণাঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
ত্রৈলোক্যং সেশ্বরং সর্বমহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিতম্।"[1]

'মহাভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণত্রয়,—(এক কথায়) ত্রৈলোক্য এবং (উহার সৃষ্ট্যাদিকর্তা) ঈশ্বরও, সমস্তই অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ অহঙ্কার-কল্পিত)।' অহঙ্কার অজ্ঞানজ এবং দুঃখময় ("অজ্ঞান-প্রভবং দুঃখমহঙ্কারং)।"[2] সুতরাং সমস্ত জগৎ অজ্ঞানজ। এই বিষয়ে শঙ্কা করা যাইতে পারে যে—যদি জগৎ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানজ অহঙ্কার-কল্পিতই হয়, তবে উহা অজ্ঞানজ অহঙ্কার-প্রসূত স্বপ্ন জগতের ন্যায় বিশৃঙ্খলাময় হইত; পরন্তু জগতে শৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়; সুতরাং উহাকে ঐ প্রকার বলা যায় কি? এই প্রকার শঙ্কা নিরাসার্থ বলা হইয়াছে যে "যেমন ইহসংসারে কাল যথানিয়মে ঋতুলক্ষণসমূহ প্রকট করিয়া থাকে, তেমন অহঙ্কারকে ভূতসমূহে কর্মপ্রবর্তক বলিয়া জানিও।"[3] অর্থাৎ ঐ প্রতীয়মান শৃঙ্খলাও পূর্বকর্মের ফল এবং ঐ কর্মসমূহ আবার অহঙ্কারজনিত সুতরাং অজ্ঞানজ। অপর কথায়, জগতের শৃঙ্খলা অনাদিকাল হইতে পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। তাহা যে কেহ বিচারপূর্বক প্রবর্তিত করিয়াছে তাহা নহে। সুতরাং তদ্ধেতু বলা যায় না যে, জগৎ অজ্ঞানজ নহে

অন্যত্র তাহা আরও বিশদভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে[4] যে—অব্যক্তজ অচেতন পদার্থসমূহ এবং উহাদের পরস্পর সংহতি হেতুই চেতন পরব্রহ্মের কর্তৃত্ব এবং কারণত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্বে আকাশাদি পঞ্চভূত, ভুবনত্রয়, প্রাণিবর্গ, ঋষিগণ, সুরাসুরগণ এবং অপর কিছুই ছিল না। তখন অচেতন বস্তুসমূহ ছিল না, এবং উহাদের সংঘাতরূপ শরীরসমূহ ছিল না। সুতরাং তদুপহিত চেতন জীববর্গও ছিল না। পরেও ঐ সকল থাকিবে না। পরন্তু একমাত্র পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম সততই থাকে। তিনি অনাদি, নিত্য, বিভু এবং অলক্ষণ। তাঁহাকে "মনোহেতু" বা 'মনের হেতু' অর্থাৎ মনোবিলাসরূপ চিদচিৎ জগতের কারণ বলা হয়।[5] "অব্যক্তলক্ষণং বিদ্যাদ্ব্যক্তাত্মাত্মকং মনঃ"[6] অর্থাৎ মনের লক্ষণ অব্যক্ত (অর্থাৎ স্পষ্টরূপে নিরূপণ করা যায় না)। উহা অব্যক্ত আত্মারই এক রূপবিশেষ।[7]

---

[1] ঐ, ১২।২১২।১৯

[2] ঐ, ১২।২১২।১৮'২

[3] ঐ, ১২।২১২।২০

[4] ঐ, ১২।২১১।৪—৭

[5] ঐ, ১২।২১০।৩২ দেখ।

[6] ঐ, ১২।২১১।১'৩

[7] মনের স্বরূপ বুঝাইতে টীকাকার নীলকণ্ঠ দ্বিতীয় চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্র একমাত্র চন্দ্রে যেমন কল্পিত, মন-রূপ দ্বিতীয় বস্তুও তেমন এক ও অদ্বিতীয় আত্মায় কল্পিত।

"অজ্ঞানকর্মনির্দিষ্টমেতৎ কারণলক্ষণম্ ॥"[১]

অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ প্রকার কারণতা অজ্ঞানের কার্য বলিয়াই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু কার্যসংগ্রহকারক ঐ কারণতা প্রযুক্তই অনাদি এবং অনন্ত এই মহৎ জগচ্চক্র পরিবর্তিত হইতেছে।[২]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এবং উহাদের বিষয়ে অনুস্যূত বলিয়া জানিতে হইবে।[৩] বিদ্বান্‌গণ বলেন, মনকে সত্ত্বের গুণ, সত্ত্ব অব্যক্ত বা প্রকৃতির গুণ এবং প্রকৃতি সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিত। এখন আবার বলা হইল যে জগৎপ্রপঞ্চ মনোবিলাস মাত্র। তাই এই বিষয়ে সংশয় হয় যে প্রকৃত তথ্য কি ? ঐ সংশয় অপনোদনার্থ বলা হইয়াছে যে জ্ঞানোদয়ে "গুণসমূহ সাম্য লাভ করিলে,

"ভবিতা মনসো জ্ঞানং মন এব প্রজায়তে।
জ্যোতিষ্মৎ বিরজো নিত্যং মন্ত্রসিদ্ধং মহাত্মনাম্ ॥"[৪]

'মহাত্মাদিগের মনে এই বোধ উৎপন্ন হয় যে মনই (বিষয়াকারে) উৎপন্ন হইতেছে। তখন তাঁহাদিগের মন নিত্য বিরজ (অর্থাৎ বিষয়বিগত) এবং প্রকাশ-স্বরূপ হয়। এইরূপে তাঁহাদিগের মন্ত্রসিদ্ধি হয় (অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ লাভ হয়)।' জ্ঞানী মহাত্মাদিগের অনুভবসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎপ্রপঞ্চ মনোবিলাস মাত্র, বাস্তব সত্য নহে। তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে থাকে না বলিয়াই সিদ্ধ হয় যে উহা অজ্ঞানজ। আবার তখন মন লয় পায়,—নিত্য, নিষ্প্রপঞ্চ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়।

জীবভাব এবং সংসৃতিও অজ্ঞানজনিত। উহারা স্বপ্নবৎ।

"জ্ঞানাধিষ্ঠানমব্যক্তং বুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণম্ ॥
তদ্বীজং দেহিনামাহুস্তদ্বীজং জীবসংজ্ঞিতম্।
কর্মণা কালযুক্তেন সংসারপরিবর্তনম্ ॥
রমত্যয়ং যথা স্বপ্নে মনসা দেহবানিব।
কর্মগর্ভৈর্গুণৈর্দেহী গর্ভে তদুপলভ্যতে ॥"[৫]

'জ্ঞানরূপ অধিষ্ঠানে বুদ্ধি ও অহঙ্কার লক্ষণ অব্যক্ত (বা অজ্ঞান) অধ্যস্ত হইয়াছে।[৬] (তত্ত্বদর্শিগণ) বলেন, ঐ (অধ্যস্ত) অব্যক্তই দেহীজীবের (দেহপ্রাপ্তির) বীজ এবং ঐ অধিষ্ঠান-ভূত জ্ঞানবীজই জীব। (স্বকৃত) কর্ম দ্বারা উহা কালবশে সংসারপরিবর্তন (অর্থাৎ সংসারে

---

১) ঐ, ১২।২১১।৬·৯ ২) ঐ, ১২।২১১।১৭

৩) ঐ, ১২।২১০।৩১·২

৪) মহাভা, ১২।২১৪।২৬

৫) ঐ, ১২।২১৩।১২·২—১৪ ; আরও দেখ—২১২।২৮

৬) অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"জ্ঞানাধিষ্ঠানমজ্ঞানং ত্রীঁল্লোঁকানধিতিষ্ঠতি।
বিজ্ঞানানুগতং জ্ঞানমজ্ঞানেনাপকৃষ্যতে ॥"—

'ত্রিলোক'=ত্রিভুবন এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে ১২।২১৩।১২·২ শ্লোকাধস্থ 'অব্যক্ত' অর্থ 'অজ্ঞান'ই।

বিচরণ) করে। যেমন এই জীব স্বপ্নে মন দ্বারা দেহবানের ন্যায় হইয়া রমণ করে, তেমন কর্মজ গুণসমূহ দ্বারা দেহী (সংসার)গর্ভে তাহা (অর্থাৎ সংসারপরিবর্তন) অনুভব করে।' এইখানে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইতে নিশ্চিত হয় যে স্বপ্নের জীব বস্তুত দেহবান্ হয় না, যদিও সে আপনাকে দেহবান্ বলিয়া মনে করে এবং ঐ ভাবে নানাবিধ ভোগবিলাস করত বহুরূপে বিচরণ করে। অন্যত্রও আছে, "দেহী (জীব) স্বপ্নে রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অভিভূত হয় এবং উপগতস্পৃহ হইয়া যেন দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ('দেহান্তরমিবাপন্নঃ') বিচরণ করে।"[১] স্বপ্নে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রলীন হইলেও জীব দেহবানের ন্যায় ("দেহবানিব") এবং বিষয়বানের ন্যায় ("বিষয়বানিব") হইয়া থাকে।[২] কথিত হইয়াছে যে স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ভগবান্ নারায়ণ ঋষির অভিমত যুক্তিযুক্ত বলিয়া অপর সকল ঋষিগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।[৩] তাঁহার মতে, "জাগ্রদবস্থায় কার্য্যে বিশেষরূপে আসক্ত ব্যক্তির মনে যেমন সঙ্কল্প হইয়া থাকে, মনোরথ ঐশ্বর্য্য (ভোগ) হইয়া থাকে, স্বপ্নেও তেমন মনোগত মনোরথ ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়।"[৪] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁহার মতে, স্বপ্ন ব্যাপার বাস্তব নহে, মনঃকল্পিত মাত্র। পূর্বোদ্ধৃত বচনে জীবের দেহবত্তা এবং তজ্জনিত ভোগাদিকেও স্বপ্নবৎ বলাতে সিদ্ধ হয় যে উহারাও বাস্তব নহে, মনঃকল্পিত মাত্র। অন্যত্র আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে

"স্বপ্নযোগে যথৈবাত্মা পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুতঃ।
দেহমুৎসৃজ্য বৈ যান্তি তথৈবাত্মোপলভ্যতে॥"[৫]

'স্বপ্নে যেমন আত্মা পঞ্চেন্দ্রিয়-সমাযুক্ত হয় এবং ঐ দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, তেমন আত্মা (দেহবান্ হয় এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয়)। তাহা (শাস্ত্রে) উপলব্ধ হয়।' অর্থাৎ স্বপ্নে কখন কখন নিজের এবং অপরের জন্ম এবং মৃত্যু দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নদ্রষ্টা দেখেন যে তিনি (কিম্বা অপরে) জন্মগ্রহণ করেন, কিছুকাল সংসারভোগ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হন এবং পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। জীবের জন্মমৃত্যুও ঠিক তদ্বৎই। স্বপ্নের জন্মমৃত্যু যেমন মনঃকল্পিত, জীবের সংসারগতিও সেই প্রকার মনঃকল্পিত মাত্র। জীবের মুখ্যতম ব্যাপার সংসৃতি এবং ভোগকে এই প্রকারে স্বপ্নবৎ মনঃকল্পিত বলাতে তদ্দৃষ্ট সমস্ত ব্যাপারকেই,—এই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকেই স্বপ্নবৎ মনঃকল্পিত বলা হয়।

'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম প্রকরণের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে

"এতাবদেতদ্বিজ্ঞানমেতদস্তি চ নাস্তি চ।"[৬]

'ইহা (=জগৎপ্রপঞ্চ) আছে এবং নাইও—এই বিজ্ঞান (অর্থাৎ একায়নধর্মবিজ্ঞান) এতাবৎ মাত্রই।' জগৎকে আছে এবং নাই উভয় বলা অবশ্যই বিরোধাভাস। তবে দৃষ্টিভেদে উক্ত প্রকার মনে করিলে উহার অতি সুন্দর সমন্বয় হয়। উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম-মতে জগৎ মনোবিলাস বা স্বপ্নবৎ মনঃকল্পনা মাত্র। তথাপি যেহেতু উহা পরিদৃষ্ট হইতেছে সেইহেতু উহাকে 'আছে' বলিতে হয়। ইহা সাধারণের ব্যবহারিক দৃষ্টি বা প্রাকৃত দৃষ্টি,—অজ্ঞানীর

---

১) ঐ, ১২।২১৬।২ ; মূলে 'অপগতস্পৃহ' পাঠ আছে। পরন্তু 'উপগতস্পৃহ' পাঠ শুদ্ধ মনে হয়।
২) ঐ, ১২।২১৬।৪
৩) ঐ, ১২।২১৬।৫
৪) ঐ, ১২।২১৬।৭
৫) ১২।২১১।৪৪
৬) মহাভা, ১২।২১৭।৩৪১

দৃষ্টি। যেহেতু জ্ঞানী মহাত্মাদিগের পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহা দৃষ্ট হয় না, সেইহেতু বলিতে হয় যে উহা বস্তুতঃ নাই। এইরূপে দেখা যায়, অজ্ঞানীর ও জ্ঞানীর, অথবা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিভেদে জগৎপ্রপঞ্চ আছে এবং নাইও। রজ্জুসর্প, শুক্তিকারজত, দ্বিচন্দ্র প্রভৃতি এই বিষয়ে অতি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রজ্জুসর্পভ্রম স্থলে রজ্জুই অজ্ঞানবশত সর্পরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা বলিয়া রজ্জু তখন বস্তুতই সর্প হইয়া যায় না। কেননা, যে কালে এক ব্যক্তি ভ্রমবশত রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখে, সেই কালেই পার্শ্বস্থ অপর ব্যক্তি,—যাহার সেই ভ্রম কখনও নাই, অথবা পূর্বে হইয়া থাকিলেও তৎকালে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে সে উহাকে রজ্জু বলিয়াই দেখিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সর্প একের দৃষ্টিতে আছে, অপরের দৃষ্টিতে নাই। রজ্জুসর্প প্রতীতির মূল অজ্ঞান। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জগৎও অজ্ঞানমূলক। অতএব জগৎ রজ্জুসর্পাদির ন্যায় ভ্রমমাত্র। ভ্রম নিরাধার হয় না। রজ্জু, পুষ্পমালা, প্রভৃতি কোন এক আধার ব্যতীত সর্পভ্রম হইতে পারে না। জগদ্ভ্রমও সেই প্রকার নিরাধার নহে। উহার আধার ব্রহ্ম। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্মে জগৎ আছে, আর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নাই। অথবা, স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ বিরোধাভাসের সমন্বয় করা যায়। যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট জগৎও থাকে। স্বপ্নভঙ্গ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ থাকে না। সেই প্রকার অজ্ঞান দশায় জগৎ আছে আর জ্ঞানোদয়ে উহা থাকে না। সুতরাং অবস্থাভেদে জগৎকে আছে এবং নাই উভয়ই বলা যায়।

রজ্জুসর্প দৃষ্টান্ত স্থলে সর্পরূপে যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা যেমন বস্তুতঃ রজ্জুই, তেমন জগদ্রূপে যাহা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং যেমন ব্রহ্মপরিণামবাদে, তেমন ব্রহ্মবিবর্তবাদেও,—বরং তদপেক্ষা প্রকৃষ্টতররূপে, জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই।

জগৎ যদি প্রকৃত পক্ষে বাস্তব না হইয়া স্বপ্ন বা মনোরথ সদৃশ হয়, তবে কেন বাস্তববৎ উহার উৎপত্ত্যাদি বিবৃত হইয়া থাকে এবং উহার ব্রহ্মাত্মকতা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে? ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। নারায়ণ ঋষি বলেন; যে ব্যক্তি স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং তত্তুল্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত—এই চতুষ্টয়ের তত্ত্ব যথাযথ জানে না, সে পরব্রহ্মকে জানিতে পারে না, চরাচর জগৎ ব্যক্ত, উহা মৃত্যুমুখ আর অব্যক্ত অমৃতপদ, উহা শাশ্বত ব্রহ্ম।[1] সুতরাং, তাঁহার মতে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় জগত্তত্ত্বেরও আলোচনা অবশ্যই কর্তব্য।[2]

“হেতুমচ্ছক্যমাখ্যাতুমেতাবজ্‌জ্ঞানচক্ষুষা।
প্রত্যাহারেণ বা শক্যমক্ষরং ব্রহ্ম বেদিতুম্ ॥”[3]

‘জ্ঞানী ব্যক্তি যুক্তিযুক্ত বিচারে (ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন, সুতরাং জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই) এই মাত্র বলিতে পারেন। পরন্তু অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যাহার (অর্থাৎ জগতের অপবাদ) দ্বারাই অবগত হওয়া

---

১) ঐ, ১২।২১৭।১—

২) ঐ, ১২।২১৭।৫—;

বিকারং প্রকৃতিং চৈব পুরুষং চ সনাতনম্।
যো যথাবদ্বিজানাতি স বিতৃষ্ণো বিমুচ্যতে ॥”—(১২।২১৭।৩৭)

৩) ঐ,।১২।২১৬।২০

যায়।' এই যুক্তিবিচারের দৃষ্টিতে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন যে তিনি কর্তা, কারণ ও কার্য্য। পরন্তু ইহা অজ্ঞানীর দৃষ্টি। ব্রহ্মের কারণত্ব সিদ্ধ করা অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়াই বাঙ্কের্য়াধ্যাত্মে মনে করা হইয়া থাকে। তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞানীর পারমার্থিক দৃষ্টিতে অক্ষর এবং শাশ্বত ব্রহ্ম কারণ নহেন, সুতরাং কার্য্যও নহেন।

কথিত হইয়াছে যে জীব স্বকৃত কর্ম দ্বারাই রূপ (বা দেহ) উপলব্ধি করে ("উপলভ্যতে"), কর্ম দ্বারাই সেই রূপ বাধিত হয় এবং বলবান্ কর্ম দ্বারাই রূপান্তরে নীত হয়। সমস্ত প্রাণিবর্গ স্ব স্ব কর্মের ফলেই বারম্বার এক দেহ পরিত্যাগ করত অপর নূতন দেহ গ্রহণ করে।[1]

"কর্ম তৎকুরুতে তর্ষাদহঙ্কারপরিগ্রহাৎ।
কার্য্যকারণসংযোগে স হেতুরুপপাতিঃ॥"[2]

(জীবাত্মা) অহঙ্কার পরিগ্রহ হেতু ঐ তৃষ্ণা বশতঃ ঐ সকল কর্ম করে। কার্য্য এবং কারণের সংযোগে ঐ কার্য্যই কারণ হয় বলিয়া উপপাদিত হয়।' অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মার কোন এক দেহপ্রাপ্তির এবং সেই দেহে কর্ম-করণের কারণ নিশ্চয় আছে বলিতে হইবে। তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্মই ঐ কারণ। বর্তমান জন্মে কৃত কর্মসমূহ তাহার ভাবী দেহ প্রাপ্তির কারণ হয়। এইরূপে কর্মহেতু জীবাত্মার দেহান্তর পরম্পরা প্রাপ্তি চলিতেছে। ঐ কর্মের মূল অহঙ্কার-পরিগ্রহজনিত তৃষ্ণা। "ভূতেষ্বহঙ্কারং বিদ্যাৎ কর্মপ্রবর্তকম্" ('অহঙ্কারকে ভূতসমূহে কর্মপ্রবর্তক বলিয়া জানিও')।[3] অহঙ্কার অজ্ঞানজ। তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপেও সিদ্ধ হয় যে জীবের সমস্ত কর্ম এবং তদ্ধেতু জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম—সমস্তেরই একমাত্র মূল অজ্ঞানই। তাই বলা হইয়াছে যে—যেমন তিলপীড় (বা তেলী) চক্রে তিলকে নিপীড়ন করে তেমন অজ্ঞানজ ভোগসমূহ জন্মমৃত্যুচক্রে সর্বপ্রাণীকে নিপীড়ন করিতেছে।[4] "সমস্ত প্রাণী অজ্ঞান-হেতু সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণদ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া চক্রের ন্যায় (ক্রমাগত) পরিভ্রমণ করিতেছে।"[5]

"(এই শরীররূপী) নবদ্বারযুক্ত পবিত্রপুর (পঞ্চমহাভূত দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং সত্ত্ব)—এই সমস্ত ভাবযুক্ত। পরমাত্মা উহা ব্যাপিয়া শায়িত আছেন। সেইহেতু তাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হয়। তিনি অজর ও অমর। (শাস্ত্রে) তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত (বা মূর্ত ও অমূর্ত) উভয়রূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি সূক্ষ্ম, বিভু, সগুণ এবং সর্বভূতগুণাশ্রয়। প্রকাশাত্মা দীপ যেমন (উপাধিবশত) হ্রস্ব বা মহান্ হয়, জ্ঞানস্বরূপ পুরুষকেও সর্বজন্তুতে তেমন (হ্রস্ব বা মহান্) বলিয়া জান। (যাহার সদ্ভাব হেতু) শ্রোত্র শ্রবণযোগ্য বস্তুকে শুনিতে সমর্থ হয়, (প্রকৃত পক্ষে) সেই শোনে এবং (সেই প্রকারে) সেই দেখে। সেই সর্বকর্মের কর্তা এবং এই দেহ তাহার কারণ।"[6] এই উক্তি হইতে অনায়াসে অবগতি হয় যে পরমাত্মাই দেহে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়া নানা কর্ম করিতেছেন এবং শরীরের বহুত্ব হেতু তিনি বহু জীবরূপে ব্যবহার করিতেছেন। দেহের সহিত আত্মার ঐ সম্বন্ধ স্বভাবতঃ বিচ্ছিন্ন হয় না। সাধারণ সাংসারিক

---

১) মহাভা, ১২।২১০।৪৫—৬ ২) ঐ, ১২।২১১।১০
৩) ঐ, ১২।২১২।২০'২ ৪) ঐ, ১২।২১১।৯
৫) ঐ, ১২।২১২।১৭ ৬) ঐ, ১২।২১০।৩৭—৪০

দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে যে যেমন নদীসমূহে জল সর্বদাই থাকে এবং কিরণসমূহ সূর্য্যে সদাই যুক্ত থাকে ও সূর্য্যের সহিত গমন করে, শরীরীদিগের দেহসমূহও তদ্বৎই।[১] ধর্মাধর্মাদি সংস্কার-সমূহও সঙ্গে সঙ্গে গমন করে।[২] অব্যক্ত (বা অজ্ঞান) জীবের জন্মমরণচক্রের নাভি, ব্যক্ত (অর্থাৎ অজ্ঞানজ কর্মজবুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি) উহার অর এবং (ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি) বিকারসমূহ উহার নেমি। রজোগুণ (বা প্রবৃত্তি রূপ তৈল) দ্বারা উহার অক্ষ স্নিগ্ধীকৃত। ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ চক্র অবিচলিতভাবে আবর্তিত হইতেছে।[৩] বিষ্ণুর মায়া দ্বারা মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ জ্ঞানভ্রষ্ট হয়, এবং বিচারবুদ্ধিরহিত হয় এই প্রকারে জ্ঞানসংমোহ হইতে জীব সংসারগ্রস্ত হয়।[৪]

এইরূপে ইহা প্রদর্শিত হইল যে বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম মতে, জগৎ অজ্ঞানজ, জীবভাব এবং সংসৃতিও অজ্ঞানজ। অজ্ঞানজ পঞ্চভূতাত্মক শরীরোপাধি সম্পর্কে পরব্রহ্ম জীব সাজিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় যে ব্রহ্মই অজ্ঞানবশতঃ চিৎজীব এবং অচিৎ জগৎ রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। কথিত হইয়াছে যে

"ব্রহ্ম তৎ পরমং জ্ঞানমমৃতং জ্যোতিরক্ষরম্।"[৫]

'ব্রহ্ম সেই পরজ্ঞান যাহা অমৃত, অক্ষর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। "তদাহুর্জ্ঞানলক্ষণম্" (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জ্ঞানলক্ষণ বা জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়')।[৬] বাসুদেব সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ।[৭] তাই দার্শনিকের মনে এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃ উদয় হয়—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়? অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? এবং তাঁহাতে কি প্রকারে থাকে? ব্রহ্ম কেন জীব সাজিয়া দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছেন? ইত্যাদি। কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানে বুদ্ধ্যহঙ্কারলক্ষণ অজ্ঞান অধিষ্ঠিত আছে; ঐ অজ্ঞান দেহী জীবের দেহপ্রাপ্তির বীজ এবং ঐ অধিষ্ঠানভূত জ্ঞানীবীজই জীব।[৮]

"জ্ঞানাধিষ্ঠিতমজ্ঞানং ত্রীল্লোঁকানধিতিষ্ঠতি।
বিজ্ঞানানুগতং জ্ঞানমজ্ঞানেনাপকৃষ্যতে॥
পৃথক্ত্বাৎ সম্প্রযোগাচ্চ নাসূয়ুর্বেদ শাশ্বতম্।
স তয়োরপবর্গজ্ঞো বীতরাগো বিমুচ্যতে॥
বয়োঽতীতো জরামৃত্যূন্ জিত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্।
অমৃতং তদবাপ্নোতি যত্তদক্ষরমব্যয়ম্॥"[৯]

'জ্ঞানে অধিষ্ঠিত অজ্ঞান ত্রিলোক (=ত্রিভুবন এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়) ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। (বুদ্ধ্যাদি) বিজ্ঞানের অনুগত জ্ঞান অজ্ঞান (অর্থাৎ অজ্ঞানজ বিষয়সমূহ) দ্বারা অপকৃষ্ট হয়। (জীব প্রকৃত পক্ষে ত্রিলোক হইতে) ভিন্ন হইলেও উহার সংযোগ বশতঃ শাশ্বতকে (অর্থাৎ

---

১) মহাভা, ১২।২১০।৪৩ ২) ঐ, ১২।২১১।৩—৪
৩) ঐ, ১২।২১১।৮ ; আরও দেখ—২১১।১২—৩
৪) ঐ, ১২।২১৩।৩— ৫) ঐ, ১২।২১৬।১৯'১
৬) ঐ, ১২।২১৬।১৭'২ ৭) ঐ, ১২।২১০।৯
৮) ঐ, ১২।২১৩।১২'২—১৩'১ ; পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ। ৯) মহাভা, ১২।২১৫।২৫—৭

আপন ব্রহ্মস্বরূপকে) জানে না ; (অধিকন্তু) উহাকে অসূয়া করে। যে যখন উহাদের অপবর্গ জানে, তখন বীতরাগ হইয়া বিমুক্ত হয়। তখন জরামৃত্যুকে জয় করিয়া কালাতীত হইয়া অক্ষর, অব্যয়, অমৃত ও সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।' পরমাত্মা বস্তুতই সংসারগ্রস্ত হয় না। বায়ু নানাবর্ণের ধূলি উড়াইয়া থাকে। তাহাতে লোকে বায়ুকে নানাবর্ণময় দেখিয়া থাকে। সেই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ত্রিগুণাত্মক-ভাবময় বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্তু যেমন স্বভাবতঃ নীরজস্ক বায়ু বস্তুত সরজস্ক হয় না, তেমন পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে ঐসকল ভাবময় হয় না,—পরমাত্মা উহাদের দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হয় না, এবং পরমাত্মা দ্বারাও উহারা কখনও স্পৃষ্ট হয় না।[১] অর্থাৎ পরমাত্মা সর্বদাই আপন বিশুদ্ধ স্বরূপে স্থিত থাকেন, সাংসারিক ভাবসমূহ তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করে না। এই সকল পূর্বোক্ত প্রশ্নসমূহের যথার্থ উত্তর অবশ্যই নহে। কেননা, তাহাতে কেবলমাত্র ইহা উক্ত হইয়াছে যে অজ্ঞান জ্ঞানে অধিষ্ঠিত এবং অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। পরন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব, বলা হয় নাই এবং অজ্ঞান কোথা হইতে আসিয়াছে তাহাও বলা হয় নাই। অজ্ঞানকে আগন্তুক নহে, স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিলে উহার বিনাশের এবং জ্ঞানের উদয়ের, সুতরাং মুক্তিলাভের, সম্ভাবনা থাকে না।

যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে, সেই সম্বন্ধে ততোধিক কিছু নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলাও যায় না। তবে যেমন ঐ সকল বচনে, তেমন অন্যত্রও, ইহা বিশেষভাবে বারম্বার বলা হইয়াছে যে যথোপযুক্ত সাধন দ্বারা ঐ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, এবং তাহাতে জীব পুনঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়,—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হয়।

"এবং হি তপসা যুক্তমর্কবত্তমসঃ পরম্।
ত্রৈলোক্যপ্রকৃতির্দেহী তমসোঽন্তে মহেশ্বরম্ ॥"[২]

'এই প্রকার তপস্যা দ্বারা (মন) তম (অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার) হইতে নির্মুক্ত হইয়া অর্কবৎ (বা স্বপ্রকাশ) হয়। দেহী ত্রৈলোক্যপ্রকৃতি (অর্থাৎ জগদাত্মক ব্রহ্ম)। তম নাশ হইলে সে মহেশ্বর (অর্থাৎ জগদতীত শুদ্ধ ব্রহ্ম) হয়।' "যাহাদের চিত্ত বিদ্যায় (বা ব্রহ্মজ্ঞানে) সংসক্ত তাহারা মর্ত্যলোক হইতে বিমুক্ত হয়। তাহারা 'ব্রহ্মভূতাঃ বিরজসস্ততো যান্তি পরাং গতিম্' অর্থাৎ সর্বলোকাতীত এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।"[৩]

সাধারণ দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম—এই পুরুষদ্বয়ের ("পুরুষাবেতৌ") ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। উভয়েই "অলিঙ্গ" ; সেই হেতু "অসংহত" (অর্থাৎ কোন বিষয়সংযুক্ত নহে) এবং "অগ্রাহ্য"। প্রকৃতির সহিত এক পুরুষের (জীবের) সংযোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তদ্বশতঃ কর্তা সাজিয়া নানা কর্ম করিয়া থাকে। ঐ কর্মাভ্যাস হেতু সে আপন স্বরূপকে পুনরায় অবগত হয় না।[৪] নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া সে 'আমি কে?' 'ইনি কে?' এবং উনি (ব্রহ্ম) কে?'—এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে।[৫] তাহার ফলে ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে সে অবগত হয় যে 'আমি উনিই' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মই'।[৬]

---

১) ঐ, ১২।২১১।১৩—৪

২) ঐ, ১২।২১৬।১৬

৩) ঐ, ১২।২১৭।২৯'২—

৪) ১২।২১১।১৫'২

৫) ১২।২১০।৫—৭ পূর্বে, পৃষ্ঠা দেখ।

৬) ঐ, ১২।২১৭।১০'২—১১

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥"[১]

'যেমন বীজসমূহ অগ্নি দ্বারা উপদগ্ধ হইলে অঙ্কুর উৎপন্ন করে না, তেমন ক্লেশসমূহ জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা পুনঃ দেহ প্রাপ্ত হয় না।' সুতরাং জ্ঞান দ্বারা জীব মুক্ত হয়। যেহেতু জীবভাব এবং সংসৃতি অজ্ঞানজ, সেইহেতু একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হইতে পারে। তাই বলা হইয়াছে যে অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করা উচিৎ। ঐরূপে প্রদীপ্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপকে (অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাকে) সূর্য্যবৎ প্রকাশিত করে।[২]

উক্ত হইয়াছে যে যাঁহারা বেদশাস্ত্রজ্ঞ এবং পরমতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ (=ব্রহ্মবিদ্); তাঁহারা সর্বভূতাত্মভূত, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী।[৩] সেই সকল জ্ঞানবিৎ সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪] প্রকৃত কথা এই যে ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্ম হয়। সগুণ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বাত্মক। সেই ব্রহ্মের সহিত অভেদ বোধ হেতু জ্ঞানীও সর্বাত্মক হয়। পরন্তু যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সার্বাত্ম্য ব্রহ্মের পরমতত্ত্ব নহে; কেননা, সার্বাত্ম্য বাস্তব নহে, মায়িক। প্রকৃত পক্ষে, ব্রহ্ম "নির্লিঙ্গ, শব্দস্পর্শাদিবিবর্জিত, এবং যদ্ধেতু শ্রোত্র দ্বারা শুনা যায়, চক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং বাক্য দ্বারা বলা যায়, সেই মনও পরিবর্জিত।"[৫] সুতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ। প্রকারান্তরেও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে সর্বাত্মক নহে। কেননা, সর্ব প্রকৃতির বিকার, আর ব্রহ্ম প্রকৃতির পরে। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে প্রকৃতির অধিষ্ঠান বলা যায় মাত্র। দেবসত্তম বিষ্ণু পরমাত্মা, দেব (=চিৎস্বরূপ), অক্ষয় এবং অব্যয়। তিনি অব্যক্তসংস্থান, (পরন্তু) পরম (অর্থাৎ অব্যক্তের অতীত)।[৬] সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মভবনই পরম মুক্তি। তাই বলা হইয়াছে যে সর্বলোকাতীত ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াই জীব পরম গতি প্রাপ্ত হয়। 'ব্রহ্মভবন' শব্দের প্রকৃত রহস্য সর্বদা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। ক্রমভেদাভেদবাদ মতে জীব মুক্তির পূর্বে প্রকৃতই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং মুক্তিতে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়। সুতরাং তন্মতেও মুক্তি ব্রহ্মভবন। বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম মতে জীবের ব্রহ্মভবন সেই প্রকার নহে। কেননা, তন্মতে জীব সদাই ব্রহ্ম, মুক্তির পূর্বেও উহা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই ছিল। তবে তখন জীব তাহা জানিত না। অজ্ঞান অপসারিত হইলে সে তাহা উপলব্ধি করে। অজ্ঞানের থাকা, না থাকা হেতু ব্রহ্মের কোন প্রকার বাস্তব পরিবর্তন হয় না। সুতরাং ব্রহ্মভবন ব্রহ্মাত্মৈক্যতানুভূতি মাত্র।

গীতা ও নারায়ণীয়াখ্যান

নারায়ণীয়ধর্মের মতে বাসুদেব, নারায়ণ বা বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব। তাঁহা হইতে পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন) আর কোন তত্ত্ব নাই।[৭] সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় তিনি পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষ। যথা, ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন, "যিনি সর্বগত,

---

১) ঐ, ১২।২১১।১৭
২) ঐ, ১২।২১৫।২৪
৩) ঐ, ১২।২১৪।৩
৪) ঐ, ১২।২১৪।৪·২
৫) মহাভা, ১২।২১৪।৮—৯·১
৬) ঐ, ১২।২১৬।২
৭) যথা দেখ—মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৩·১ ; ৩৩৯।৩১·২ ; গীতা, ৭।৭·১ ; ১০।৩৯ ; মূলে 'পর' ও 'পরতর' শব্দ আছে। 'পর' শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ' এবং 'ভিন্ন' উভয়ই হয়। এখানে আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

যিনি সাক্ষী এবং লোকের আত্মা বলিয়া কথিত হন, সর্বভূতশরীরসমূহ বিনষ্ট হইলেও যাঁহার বিনাশ হয় না, যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহ হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব বলিয়া খ্যাত অজ, নিত্য, শাশ্বত, নির্গুণ, নিষ্কল এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষ, যিনি জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া কথিত হন এবং যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া দ্বিজসত্তমগণ ইহসংসার হইতে মুক্ত হয়, তাঁহাকেই সনাতন পরমাত্মা বাসুদেব বলিয়া জানিও।"[১] উপনিষদের ভাষায় তিনিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।[২] কখন কখন তাঁহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ',[৩] 'অব্যক্ত'[৪] 'পুরুষোত্তম'[৫] বা 'মহাপুরুষ'[৬] নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'সর্বতোমুখী' যুক্তিসমূহ দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের (সিদ্ধান্তে)একমাত্র তত্ত্ব মহাযোগী প্রভু হরি নারায়ণই।"[৭]

যাহা শ্রুতির সর্বত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে,[৮] সেই জগদ্‌ব্রহ্মবাদ নারায়ণীয়ধর্মেও এক মুখ্য সিদ্ধান্ত রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথা, 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বাসুদেবঃ সর্বম্" (সমস্ত বাসুদেবই')।[৯] "অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহম্" (অমৃত এবং মৃত্যুও,—সৎ এবং অসৎও (অর্থাৎ সমস্ত কিছু) আমিই।[১০] তিনি প্রকারান্তরেও, অল্পাধিক বিস্তারিতরূপে, সেই কথা বলিয়াছেন। যজ্ঞের দৃষ্টান্ত লইয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমিই ক্রতু (অর্থাৎ শ্রৌত যজ্ঞ), আমিই যজ্ঞ অর্থাৎ (স্মার্ত যজ্ঞ), আমিই স্বধা, আমিই ঔষধী, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি এবং আমিই আহুতি।"[১১] উহার তাৎপর্য্য এই যে সমস্ত কৃষ্ণই। ভগবানের যোগ এবং বিভূতি বর্ণনার তাৎপর্য্যও ঠিক তাহাই।[১২] 'নারায়ণীয়াখ্যানে' বৈশম্পায়ন ঋষি বলিয়াছেন, "নির্মল এবং নিষ্কল হরিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই সর্বভূতে পঞ্চভূতগুণাতীত জীব। তিনিই পঞ্চেন্দ্রিয়-পরিচালক মন বলিয়া প্রথিত হন। তিনিই লোকবিধি (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ) এবং তিনিই লোকস্রষ্টা। তিনিই কর্তা ও অকর্তা এবং কার্য্য ও কারণ। হে রাজন্, সেই অব্যয় পুরুষ যথেচ্ছ লীলা করেন। হে নৃপসত্তম, এই তোমার নিকট একান্তধর্ম কীর্তিত হইল।"[১৩] কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার বলিয়াছেন, হে রাজন্, সাংখ্য এবং যোগ এই দুই শাস্ত্র সনাতন। সমস্ত বেদ ও (সনাতন)। সমস্ত (সনাতনশাস্ত্র) এবং সমস্ত ঋষিগণ কর্তৃক (এক বাক্যে) নিরুক্ত হইয়াছে যে এই পুরাণ বিশ্ব নারায়ণই ('নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্)।"[১৪]

জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে নারায়ণ ঋষি নারদকে সংক্ষেপে বলেন যে বাসুদেব "ত্রিগুণব্যতিরিক্ত

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।২২·২—২৫, আরও দেখ—৩৩৪।৩০ ; ৩৩৯।৪৩

২) ঐ, ১২।৩৩৯।৩১·২ ; ৩৪০।২৮·২, ১০৮·১ ; ৩৫১।১৪

৩) ঐ, ১২।৩৩৪।১৩০ ; 'ক্ষেত্রজ্ঞ' সংজ্ঞার গূঢ়ার্থের জন্য 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ২য় খণ্ড দেখ

৪) ঐ, ১২।৩৪০।৪৪·২ ; পরে পৃষ্ঠা দেখ।

৫) ঐ, ১২।৩৩৬।৫২·১ ; ৩৩৯।১৩১·২ ; গীতা, ১০।১৫·১ ; ১১।৩.২ ; ১৫।১৭—৮

৬) মহাভা, ১২।৩৩৬।৪৪·১ ; ৩৪০।২৯·১ ; ৩৫১।৯

৭) ঐ, ১২।৩৪৭।৯০·২—৯১·১

৮) 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী,' ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায় দেখ।

৯) গীতা ৭।১৯·২ ১০) ঐ, ৯।১৯২

১১) ঐ, ৯।১৬ ১২) ঐ, ৯।৮—১১ এবং ১০ম অধ্যায় দেখ

১৩) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৮—৬১·১ ১৪) ঐ, ১২।৩৪৯।৭৩

পুরুষ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তম! তাঁহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। যাহা অব্যক্ত, (পরন্তু) ব্যক্তভাবস্থ, তাহাই অব্যয়া প্রকৃতি।"[১] ভগবান্ নারায়ণ ঐ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনাও করিয়াছেন। প্রথমে তিনি প্রলয় সম্বন্ধে বলেন, "হে দেবর্ষি, জগৎ-প্রতিষ্ঠা পৃথিবী জলে প্রলীন হয়; জল তেজে প্রলীন হয়; তেজ বায়ুতে প্রলয় পায়; বায়ু আকাশে প্রলয় প্রাপ্ত হয়; এবং আকাশ মনে (প্রলয় প্রাপ্ত হয়)। মন পরম ভূতই। তাহা অব্যক্তে প্রলীন হয়। হে ব্রহ্মন্, অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষে সম্যক প্রলয় প্রাপ্ত হয়। সেই সনাতন পুরুষ হইতে পরতর কিছুই নাই। সেই এক সনাতন পুরুষ বাসুদেব ব্যতীত জগতে চর কিম্বা অচর কিছুই নিত্য নহে।"[২] কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলেন, "এই শাশ্বত আমি (জগদ্রূপে) প্রকটিত হইয়া ("ব্যক্তিমাগত্য") দ্যুলোকে অবস্থান করিতেছি। অনন্তর সহস্র যুগের অন্তে জগৎকে সংহার করিব;—পুনঃ জগৎকে অর্থাৎ চরাচর ভূতবর্গকে আত্মস্থ করিয়া বিদ্যার সঙ্গে একাকী বিহার করিব। অনন্তর (সহস্র যুগ পরে) বিদ্যা দ্বারা পুনরায় সর্বজগৎ সৃষ্টি করিব। ইহাতে (আমার) যে চতুর্থ মূর্তি (অর্থাৎ বাসুদেব) তাহা অব্যয় শেষকে সৃষ্টি করে। সে সঙ্কর্ষণ বলিয়াও প্রোক্ত হয়। সে প্রদ্যুম্নকে জন্ম দেয়। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহং (উৎপন্ন হয়)। (এই প্রকারে) আমার সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ (হয়)। সেই প্রকারে অনিরুদ্ধ হইতে—তাহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে চরাচর সর্ব ভূতবর্গ (উৎপন্ন হয়)।"[৩] তিনি আরও বলেন যে সূর্য্যের উদয় ও অস্তের ন্যায় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়, কল্পের আদিতে ও অন্তে, পুনঃ পুনঃ হয়।[৪] যাহা হউক, এইরূপে জানা যায় যে ভগবান্ নারায়ণই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় কর্তা,—তিনিই জগতের কারণ এবং তিনিই জগদ্রূপ কার্য্য। শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন। "হে নারদ, চরাচর সমস্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হয়। আমি অক্ষর ও ক্ষর এবং সৎ ও অসৎ।"[৫]

"অহং কর্তা চ কার্য্যং চ কারণং চাপি নারদ॥"[৬]

'হে নারদ! আমিই (জগতের) কর্তা ও কারণ এবং (জগদ্রূপ) কার্য্যও।' তথা হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করত নারদ নর ও নারায়ণ ঋষির নিকট তাহার পুনরুল্লেখ করেন,—"অত্যন্ত বল ও দ্যুতি স্বরূপ তিনি কর্তা, কারণ ও কার্য্য।"[৭] পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, "তিনিই সৃষ্টবস্তুসমূহের আদি, মধ্য এবং অন্ত। তিনিই ধাতা এবং তিনিই ধেয়। তিনিই কর্তা এবং তিনিই কার্য্য। প্রতি যুগের অন্তে লোকসমূহকে (আপনাতে) উত্তমরূপে সঙ্কুচিত করত তিনি প্রসুপ্ত হন এবং যুগের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি জগৎকে বহির্দিকে নিক্ষেপ করেন।"[৮] যেহেতু নারায়ণ বা বাসুদেবই জগতের যেমন নিমিত্ত, তেমন উপাদান কারণও, সেইহেতু জগৎ বস্তুতঃ তিনিই,—তিনিই সর্বাত্মক। ভগবান্ নারায়ণ বলেন, "অহং···বিশ্বমূর্তিরিহাব্যয়ঃ" (অর্থাৎ অব্যয় আমিই এখন বিশ্বমূর্তি হইয়াছি)।[৯] নারায়ণ ঋষি বলেন,

---

১) ঐ, ১২।৩৩৪।৩০˙২—৩১

২) ঐ, ১২।৩৩৯।২৯—৩২ ; আরও দেখ—৩৪৭।১৪—৬

৩) ঐ, ১২।৩৩৯।৭০—৪

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।৭৫

৫) ঐ, ১২।৩৩৯।৪২

৬) ঐ, ১২।৩৩৯।৪৬˙২

৭) ঐ, ১২।৩৪৩।৫৬˙১

৮) ঐ, ১২।৩৪০।১০০

৯) ঐ, ১২।৩৩৯।১৫˙২

"মহান্ মহাত্মা সর্বাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ॥"[১]

'নারায়ণ মহান্, মহাত্মা এবং সর্বাত্মা। ইহা আমরা শুনিয়াছি।' নারদ বলিয়াছেন, তিনি "সর্বমূর্তি"[২] বা "বিশ্বরূপধর"।[৩]

'গীতা'য় কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন,—"আমিই সম্পূর্ণ জগতের প্রভব এবং প্রলয়,"[৪] "আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ,…গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, স্থান, নিধান এবং অব্যয় বীজ ;"[৫] "হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান ;"[৬] "হে অর্জুন! যাহা সর্বভূতের বীজ তাহাও আমি ;"[৭] এবং "আমিই ভূতবর্গের আদি, মধ্য এবং অন্ত।"[৮] সুতরাং তিনি বিশ্বরূপ[৯] বা বিশ্বমূর্তি[১০]। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহা হইতে ব্যতিরিক্ত চর কিম্বা অচর কোন বস্তু নাই।[১১]

যাহা হউক, নারায়ণের ঐ সর্বাত্মত্ব বাস্তব নহে, মায়িক। "নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন,

"এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ॥
ইচ্ছন্মুহূর্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ।
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ॥
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।"[১২]

'আমাকে রূপবান্ দেখিতেছ বলিয়া তুমি ইহা জানিও না যে আমি (সত্যই) রূপবান্। কেননা, আমি ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত মধ্যে ইহাকে নাশ করিতে পারি। আমি ঈশ্বর,—জগতের গুরু। (সুতরাং তাহা করিতে আমি সম্পূর্ণ সমর্থ)। হে নারদ, তুমি আমাকে যে রূপ দেখিতেছ, তাহা মৎসৃষ্ট মায়াই। তাহা হইতে তুমি ইহা জানিও না যে আমি এই প্রকারে সর্বভূতগুণযুক্ত।' এই উক্তির সম্পূর্ণ রহস্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইহার প্রকরণ আলোচনা কর্তব্য। কথিত হইয়াছে যে নারদ শ্বেতদ্বীপে গিয়া এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণের স্তুতি করেন যে তিনি নির্গুণ ও গুণাত্মক ; তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ ; তিনি লোকসাক্ষী ; তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, অমর দেবতা, অনন্ত (বা শেষ), বৃহস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি (বা সূত্রাত্মা), দিবস্পতি (বা সূর্য্য) মরুৎপতি, সলিলপতি (বা বরুণ), পৃথিবীপতি (বা রাজা), দিক্‌পতি (ইন্দ্রাগ্ন্যাদি), বনস্পতি, ত্রিগুণ, প্রধান, সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত ইত্যাদি ; অর্থাৎ সমস্তই তিনি, তিনি বিশ্বমূর্তি বা বিশ্বরূপ।[১৩] তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করত তাঁহাকে দর্শন দেন।[১৪] শান্তিপর্বের ৩৩৯।২-৫ শ্লোকে তাঁহার নানাবিধ-রূপ বা বর্ণের বর্ণনা আছে। অনন্তর সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে,

---

১) ঐ, ১২।৩৪৫।২৮·২ ২) ঐ, ১২।৩৩৯।১৭·২
৩) ঐ, ১২।৩৪৩।৪৭·২ ৪) গীতা, ৭।৬·২ ৫) ঐ, ৯।১৭—৮
৬) ঐ, ৭।১০·১ ৭) ঐ, ১০।৩৯·১ ৮) ঐ, ১০।২০·২ ; আরও দেখ—৯।১৩·২
৯) ঐ, ১১।১৬·২ ১০) ঐ, ১১।৪৬·২
১১) "ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥"—(ঐ, ১০।৩৯·২) ; আরও দেখ—৭।৭·১
১২) মহাভা, ১২।৩৩৯।৪৪·২—৪৬·১
১৩) মহাভা, ১২।৩৩৮ অধ্যায়। ১৪) ঐ, ১২।৩৩৯।১, ১৫·২, ১০৯·২ ; ৩৪৩।৪৭ ২

"এতান্ বহুবিধান্ বর্ণান্ রূপৈর্বিভ্রৎ সনাতনঃ।"[১]

'সনাতন (নারায়ণ) এই সকল বহুবিধ বর্ণসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন।' অতঃপর ৬·২-১০·১ ও ৫১-৫৮ শ্লোকে তাঁহার বিরাট্রূপ বিবৃত হইয়াছে। উক্ত বচনে ঐ সকলের নিষেধ করা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে তিনি বিশ্বরূপ বা সর্বাত্মক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন বলিয়াই কেহ যেন মনে না করে যে তিনি বস্তুতঃ নিত্য সর্বাত্মক,—সার্বাত্ম্য তাঁহার স্বভাবিক ধর্ম। কেননা, উহা স্বাভাবিক হইলে, উহার নাশ কখনও হইত না, অথবা নাশ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও নাশ হইত। পরন্তু নারায়ণ ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত মধ্যে বিশ্বরূপ বিনষ্ট করিতে পারেন এবং অধিকন্তু উহা বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না; কেননা, তিনি অজ, নিত্য এবং শাশ্বত।[২] ভগবান্ নারায়ণ আরও বলিয়াছেন, "সেই এক সনাতন পুরুষ বাসুদেব ব্যতীত জগতে চর কি অচর কোন বস্তুই নিত্য নহে।"[৩] সুতরাং নারায়ণ স্বভাবতঃ নিত্য সর্বাত্মক নহে।[৪] স্বাভাবিক না হইলেও তাঁহার সার্বাত্ম্য আগন্তুক বা ঔপাধিক হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে ব্রহ্ম কখন কখন সর্বাত্মক হন, কখন হন না; ঐরূপে পর্য্যায়ক্রমে সর্বাত্মক হওয়া এবং না হওয়া তাঁহার স্বভাব। জগতের সৃষ্টি প্রলয়বাদও ঐ অনুমানের আনুকূল্য করে। এই দ্বিতীয় প্রকার অনুমান নিরসনের জন্য নারায়ণ বলিয়াছেন যে তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং তিনি কোন প্রকার স্বভাবের বা অপর কিছুর অধীন নহেন। অতএব সর্বাত্মক হওয়া না হওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। এবং সেইহেতু ইহাও বলা যায় না যে তিনি অপরের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সর্বাত্মক হন। স্বভাববশে বা পর-প্রণোদিত হইয়া না হইলেও স্বেচ্ছায় তিনি কখন কখন বস্তুত সর্বাত্মক হন,—এই প্রকারের আশঙ্কা নিরসনের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে বিশ্বরূপাত্মক বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলেও তিনি সত্যই বিশ্বরূপাত্মক নহেন, বিশ্ব তাঁহাতে বস্তুতঃ নাই; প্রতীয়মান বিশ্বরূপ মায়া। পূর্বে নারায়ণ ঋষিও নারদকে বলিয়াছিলেন,

"যত্তৎসূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবম্।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্বভূতৈশ্চ বর্জিতম্॥"[৫]

'তাহা (পরমতত্ত্ব নারায়ণ) সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল এবং ধ্রুব। তাহা ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ এবং সর্বভূত-বিবর্জিত।' সুতরাং জগৎ বস্তুতঃ তাঁহাতে নাই। ভগবান্ নারায়ণও বলিয়াছেন, "তাহা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না, স্পর্শ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, এবং ঘ্রাণের দ্বারা আঘ্রাত হয় না। কেননা, তাহা গন্ধরসাদি-বিবর্জিত। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ তাহাতে নাই।"[৬] উহা বস্তুতঃ "অজ, নিত্য, শাশ্বত, নির্গুণ এবং নিষ্কল"[৭]; "নির্গুণ, নিষ্কল, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্পরিগ্রহ;"[৮] এবং "নিষ্ক্রিয়"।[৯] নিত্য, শাশ্বত, অচল ও ধ্রুব বলিয়া তিনি অপরিণামী।

---

১) ১২।৩৩৯।৬·১ ২) ঐ, ১২।৩৩৯।২২·২—২৩, ৪৮ ৩) ঐ, ১২।৩৩৯।৩২

৪) ইহা একাধিক বার উক্ত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপে নারদ "অনিরুদ্ধতনুতে স্থিত" ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছিলেন (১২।৩৪৩।৬·১, ২৫·১; আরও দেখ—৩৪৩।৯·১, ৩৪৭।৬৩·২) সুতরাং ভগবান্ নারায়ণ যখন অনিরুদ্ধতনুতে স্থিত হন, তখনই তিনি বিশ্বরূপ। অনিরুদ্ধ জন্মবান্। সুতরাং ভগবানের সার্বাত্ম্যও জন্মবান্, নিত্য নহে।

৫) ঐ, ১২।৩৩৪।২৯ ৬) ঐ, ১২।৩৩৯।২১—২২·১

৭) ঐ, ১২।৩৩৯।২৩·২ ৮) ঐ, ১২।৩৩৯।৪৪·১ ৯) ঐ, ১২।৩৩৯।২৪·২, ৫৩·২

নিষ্ক্রিয় বলিয়াও তাঁহার কোন বিকার বা পরিণাম হয় না, সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া তিনি করেন না। যেহেতু তিনি নিষ্কল, সেইহেতু তাঁহার স্বগতভেদ নাই; অতএব তিনি নির্দ্বন্দ্ব। তিনি নিষ্পরিগ্রহ, সুতরাং স্বতঃ জগৎ পরিগ্রহ করেন না; এমন কি, কোন উপাধিও তিনি পরিগ্রহ করেন না। সুতরাং স্বাভাবিক বা ঔপাধিক কোন প্রকার সকলতা তাঁহাতে নাই। অতএব তজ্জনিত দ্বন্দ্বও তাঁহাতে নাই। সুতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ অদ্বৈত এবং জগৎ মায়া।

'গীতা'য় ভগবান্ কৃষ্ণও বলিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্ত রূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগদ্রূপ মায়িক; উহার পরে যে তাঁহার অব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর রূপ, তাহাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ; এবং অব্যক্ত স্বরূপ অক্ষর ও অব্যয়, বস্তুতঃ ব্যক্তরূপ ধারণ করে না। যথা, তিনি বলিয়াছেন,

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"[১]

'(সত্ব, রজ ও তম) এই তিন গুণাত্মক এই ভাবসমূহ (অর্থাৎ পদার্থসমূহ) দ্বারা মোহিত (হইয়া) এই সমস্ত জগৎ (অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত প্রাণী) এই সকল হইতে পর (অর্থাৎ বিলক্ষণ) অব্যয় (অর্থাৎ ষড়্ভাব-বিকাররহিত) আমাকে জানে না। আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুস্তর। যে আমারই শরণ গ্রহণ করে, সেই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।' কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলেন,

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"[২]

'আমার উত্তমোত্তম এবং অব্যয় পরমভাবকে (অর্থাৎ স্বরূপকে) না জানিয়া বুদ্ধিরহিত লোক অব্যক্ত আমাকে (জগৎপ্রপঞ্চরূপে) ব্যক্তভাব-প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট (আপন প্রকৃত স্বরূপে) প্রকট নহি। মূঢ় লোক ইহা জানে না যে আমি অজ ও অব্যয়।' জগৎপ্রপঞ্চের প্রলয় হইলে যাহা অবশেষ থাকে, যাহাতে প্রলয়ে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ প্রলীন হয় এবং যাহা হইতে সৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ ব্যক্ত হয়, তাহাকেও 'গীতা'তে 'অব্যক্ত' বলা হইয়াছে।[৩] পরন্তু পূর্বোক্ত বচনের 'অব্যক্ত',—যাহাকে কৃষ্ণ আপন স্বরূপ বলিয়াছেন, সেই 'অব্যক্ত' ঐ জগদ্বীজভূত অব্যক্ত হইতে ভিন্ন। কৃষ্ণ অতি স্পষ্টবাক্যে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। "পরন্তু অপর অব্যক্ত ভাব (বা পদার্থ) সনাতন। উহা সেই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত জগদ্বীজভূত) অব্যক্ত হইতে পর। সর্বভূতের বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। ঐ অব্যক্তকে 'অক্ষর'ও বলা হয় এবং উহাকে 'পরমগতি'ও বলা হয়।"[৪] জগদ্বীজভূত অব্যক্ত ক্ষর, কেননা তাহা জগদ্রূপে ক্ষরিত হয় বা পরিণত হয়। পরন্তু ব্রহ্মরূপ অব্যক্ত সম্পূর্ণ

---

[১] গীতা, ৭।১৩—৪
[২] ঐ, ৭।২৪—৫
[৩] ঐ, ৮।১৮
[৪] ঐ, ৮।২০—২১'১

নির্বিকার,—উহা ষড়্বিধভাববিকারবিবর্জিত, তাই উহাকে ‘অক্ষর’ বলা হয়। তাই কৃষ্ণ উহাকে “কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব” বলিয়াছেন।[১] ব্যক্ত জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া অবশ্যই ‘ক্ষর’। তদপেক্ষায় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অব্যক্ত বা প্রকৃতিকে ‘অক্ষর’ বলা হয়,[২] কেননা, উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সেই দৃষ্টিতে তাহা হইতে পার্থক্য রক্ষার জন্য ব্রহ্মকে ‘পরম অক্ষর’ বলা হয়। “অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং” অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম পরম অক্ষর’।[৩] অব্যক্ত প্রকৃতির নিজের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় না এবং সেই দৃষ্টিতে উহাকে ‘অক্ষর’ বলা গেলেও উহা জগৎপ্রপঞ্চরূপে ক্ষরিত বা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দৃষ্টিতে উহা অক্ষর নহে। ব্রহ্ম এই দৃষ্টিতেও অক্ষর। তিনি কোন দৃষ্টিতে বা প্রকারে ক্ষরিত হন না বলিয়াই তিনি ‘পরম অক্ষর’। সাংখ্য-বেদান্তের দৃষ্টিতে অব্যক্ত বা প্রকৃতিরও উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়,—প্রলয়ে অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষে লীন হয় এবং সৃষ্টিতে উহা নিষ্ক্রিয় পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়। একান্তধর্মে এই মতই পরিগৃহীত হইয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন।[৪] সুতরাং তন্মতে একমাত্র ব্রহ্মই অক্ষর, অপর কিছু নহে। তাই পূর্বোক্ত বচনে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহারা ব্রহ্মের এই প্রকৃত স্বরূপ যথার্থত জানে না, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণই মনে করে যে ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। জগৎপ্রপঞ্চরূপে বস্তুতঃ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াও যে ব্রহ্মজগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীতি-গোচর হইতেছেন, ইহা মায়া। অন্যত্র কৃষ্ণ ইহাকে তাঁহার ‘ঐশ্বরযোগ’ বলিয়াছেন। “এই সর্বজগৎ অব্যক্ত স্বরূপ আমা দ্বারা ব্যাপ্ত। সর্বভূতবর্গ আমাতে স্থিত, (পরন্তু) আমি উহাদিগেতে স্থিত নহি। আরও বলিলে, ভূতসমূহ আমাতে স্থিত নহে। দেখ, (ইহা কেমন) আমার ঐশ্বর যোগ। আমার আত্মা ভূতভাবন (অর্থাৎ ভূতসমূহ উৎপন্ন করে) এবং ভূতভৃৎ (অর্থাৎ ভূতসমূহকে পালন করে), পরন্তু ভূতস্থ নহে।”[৫] অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, পরব্রহ্মকে ‘সৎ’ও বলা যায় না, ‘অসৎ’ও বলা যায় না।[৬] আবার পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সৎ ও অসৎ ;[৭] ব্রহ্ম সৎ, অসৎ এবং তদপেক্ষা যাহা পর সেই অক্ষরও।[৮] যেমন পূর্বে বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মপ্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে,[৯]

---

১) “যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥”—(ঐ, ১২।৩)

২) ঐ, ১৫।১৬ দেখ

৩) ঐ, ৮।৩·১

৪) মহাভা, ১২।৩২৯।৩১ ; আরও দেখ—৩৩৪।৩১ ; ৩৪০।২৯

৫) “ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥”—(গীতা, ৯।৪—৫)

আরও দেখ—
“যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥”—(ঐ, ৭।১২)

৬) “অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥”—(গীতা, ১৩।১২·২)

৭) “অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥”—(ঐ, ৯।১৯·২)

৮) “ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ”—(ঐ, ১১।৩৭·২)

৪) পূর্বে দেখ।

জ্ঞানীর অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে বা অবস্থাভেদে উক্ত মনে করিলে এই সকল বিরোধাভাসের সুন্দর সমন্বয় হয়।

নারায়ণীয় ধর্মমতে জীব স্বরূপতঃ বাসুদেবই; বাসুদেবই শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন, "মহাবলবান্ বাসুদেবই সর্বভূতাত্মভূত। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ মহাভূত সংহত হইয়া 'শরীর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্, লঘুবিক্রম অদৃশ্য প্রভু (অর্থাৎ বাসুদেব) তখন (ঐ শরীরে) প্রবেশ করেন এবং শরীরচেষ্টা নির্বাহ করেন। (এই প্রকারে তিনি জীবরূপে) উৎপন্নই হন। ধাতুসংঘাত ব্যতীত শরীর কখনও হয় না। পুনঃ, হে ব্রহ্মন্, জীব বিনা (প্রাণ) বায়ুসমূহ (শরীর) চেষ্টা করিতে পারে না। সেই প্রভু (অর্থাৎ শরীরে প্রবিষ্ট বাসুদেব) 'জীব', 'শেষ' ও 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া পরিসংখ্যাত হন।"[১] জীবরূপে শরীররূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বলিয়া বাসুদেব 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামেও অভিহিত হন। ভগবান্ নারায়ণ বলেন, "যিনি বাসুদেব তাঁহাকেই নির্গুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, সঙ্কর্ষণ, ভগবান্ ও প্রভু বলিয়া জানিও।"[২] অনন্তর সাংখ্যদর্শনের পরিভাষায় তিনি বলেন,

"অহং হি পুরুষো জ্ঞেয়ো নিষ্ক্রিয়ঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"[৩]

'আমিই পঞ্চবিংশতিতম(তত্ত্ব) নিষ্ক্রিয় পুরুষ,—ইহা জানিও।' পূর্বেও তিনি সেই প্রকার বলিয়াছেন, "যিনি সর্বগত, যিনি সাক্ষী এবং লোকের আত্মা বলিয়া কথিত হন, এবং সর্বভূত শরীরসমূহ বিনষ্ট হইলেও যাঁহার বিনাশ হয় না, যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহ হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব বলিয়া খ্যাত অজ, নিত্য, শাশ্বত, নির্গুণ, নিষ্কল এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষ, যিনি জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া কথিত হন এবং যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া দ্বিজসত্তমগণ ইহ সংসার হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয়, তাঁহাকেই সনাতন পরমাত্মা বাসুদেব বলিয়া জানিও।'[৪] বিশেষ প্রণিধান করিলে সহজে অবগতি হইবে যে এই উক্তির তাৎপর্য্য কেবল এইমাত্র নহে যে জীব পরমাত্মা বা বাসুদেবই, উহাতে অধিকন্তু আরও নির্দেশিত হইয়াছে যে—(১) বাসুদেব চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথবা প্রকারান্তরে বলিলে, জগৎপ্রপঞ্চ বাসুদেবে বস্তুতঃ নাই; এবং (২) একই পুরুষ বা বাসুদেব বহু শরীরে উপহিত হইয়া বহু জীব হইয়াছেন, 'পুরুষ' শব্দ একবচনান্ত এবং 'সর্বভূতশরীরসমূহ' ("ভূতগ্রামশরীরেষু") বহুবচনান্ত প্রয়োগ হওয়াতে তাহা সিদ্ধ হয়। মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বলেন যে তিনি তাঁহার গুরু পরমর্ষি ব্যাসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে একান্তধর্মমতে জীব বিষ্ণুই।

"আত্মা হি পুরুষব্যাঘ্র জ্ঞেয়ো বিষ্ণুরিতি স্থিতিঃ।"[৫]

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৬—

২) ঐ' ১২।৩৩৯।৪০; আরও দেখ—

"সর্বাবাসং বাসুদেবং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ॥"—(ঐ, ১২।৩৪৪।১৮'২)

"হরিরেব হি ক্ষেত্রজ্ঞো নির্মমো নিষ্কলস্তথা।
জীবশ্চ সর্বভূতেষু পঞ্চভূতগুণাতিগঃ॥"—(ঐ, ১২।৩৪৮।৫৮)

৩) ঐ, ১২।৩৩৯।৪৩'২

৪) ঐ, ১২।৩৩৯।২২'২—২৫

৫) ঐ, ১২।৩৪৬।৮'১

নির্বিকার,—উহা ষড়্‌বিধভাববিকারবিবর্জিত, তাই উহাকে 'অক্ষর' বলা হয়। তাই কৃষ্ণ উহাকে "কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব" বলিয়াছেন।[১] ব্যক্ত জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া অবশ্যই 'ক্ষর'। তদপেক্ষায় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অব্যক্ত বা প্রকৃতিকে 'অক্ষর' বলা হয়,[২] কেননা, উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সেই দৃষ্টিতে তাহা হইতে পার্থক্য রক্ষার জন্য ব্রহ্মকে 'পরম অক্ষর' বলা হয়। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" অর্থাৎ 'ব্রহ্ম পরম অক্ষর'।[৩] অব্যক্ত প্রকৃতির নিজের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় না এবং সেই দৃষ্টিতে উহাকে 'অক্ষর' বলা গেলেও উহা জগৎপ্রপঞ্চরূপে ক্ষরিত বা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দৃষ্টিতে উহা অক্ষর নহে। ব্রহ্ম এই দৃষ্টিতেও অক্ষর। তিনি কোন দৃষ্টিতে বা প্রকারে ক্ষরিত হন না বলিয়াই তিনি 'পরম অক্ষর'। সাংখ্য-বেদান্তের দৃষ্টিতে অব্যক্ত বা প্রকৃতিরও উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়,—প্রলয়ে অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষে লীন হয় এবং সৃষ্টিতে উহা নিষ্ক্রিয় পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়। একান্তধর্মে এই মতই পরিগৃহীত হইয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন।[৪] সুতরাং তন্মতে একমাত্র ব্রহ্মই অক্ষর, অপর কিছু নহে। তাই পূর্বোক্ত বচনে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহারা ব্রহ্মের এই প্রকৃত স্বরূপ যথার্থত জানে না, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণই মনে করে যে ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। জগৎপ্রপঞ্চরূপে বস্তুতঃ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াও যে ব্রহ্মজগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীতিগোচর হইতেছেন, ইহা মায়া। অন্যত্র কৃষ্ণ ইহাকে তাঁহার 'ঐশ্বরযোগ' বলিয়াছেন। "এই সর্বজগৎ অব্যক্ত স্বরূপ আমা দ্বারা ব্যাপ্ত। সর্বভূতবর্গ আমাতে স্থিত, (পরন্তু) আমি উহাদিগেতে স্থিত নহি। আরও বলিলে, ভূতসমূহ আমাতে স্থিত নহে। দেখ, (ইহা কেমন) আমার ঐশ্বর যোগ। আমার আত্মা ভূতভাবন (অর্থাৎ ভূতসমূহ উৎপন্ন করে) এবং ভূতভৃৎ (অর্থাৎ ভূতসমূহকে পালন করে), পরন্তু ভূতস্থ নহে।"[৫] অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, পরব্রহ্মকে 'সৎ'ও বলা যায় না, 'অসৎ'ও বলা যায় না।[৬] আবার পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সৎ ও অসৎ;[৭] ব্রহ্ম সৎ, অসৎ এবং তদপেক্ষা যাহা পর সেই অক্ষরও।[৮] যেমন পূর্বে বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মপ্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে,[৯]

---

[১] "যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥"—(ঐ, ১২।৩)

[২] ঐ, ১৫।১৬ দেখ

[৩] ঐ, ৮।৩·১

[৪] মহাভা, ১২।৩২৯।৩১ ; আরও দেখ—৩৩৪।৩১ ; ৩৪০।২৯

[৫] "ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"—(গীতা, ৯।৪—৫)

আরও দেখ—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"—(ঐ, ৭।১২)

[৬] "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥"—(গীতা, ১৩।১২·২)

[৭] "অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥"—(ঐ, ৯।১৯·২)

[৮] "ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ"—(ঐ, ১১।৩৭·২)

[৪] পূর্বে দেখ।

জ্ঞানীর অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে বা অবস্থাভেদে উক্ত মনে করিলে এই সকল বিরোধাভাসের সুন্দর সমন্বয় হয়।

নারায়ণীয় ধর্মমতে জীব স্বরূপতঃ বাসুদেবই; বাসুদেবই শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন, "মহাবলবান্ বাসুদেবই সর্বভূতাত্মভূত। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ মহাভূত সংহত হইয়া 'শরীর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। হে ব্রহ্মন্, লঘুবিক্রম অদৃশ্য প্রভু (অর্থাৎ বাসুদেব) তখন (ঐ শরীরে) প্রবেশ করেন এবং শরীরচেষ্টা নির্বাহ করেন। (এই প্রকারে তিনি জীবরূপে) উৎপন্নই হন। ধাতুসংঘাত ব্যতীত শরীর কখনও হয় না। পুনঃ, হে ব্রহ্মন্, জীব বিনা (প্রাণ) বায়ুসমূহ (শরীর) চেষ্টা করিতে পারে না। সেই প্রভু (অর্থাৎ শরীরে প্রবিষ্ট বাসুদেব) 'জীব', 'শেষ' ও 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া পরিসংখ্যাত হন।"[১] জীবরূপে শরীররূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বলিয়া বাসুদেব 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামেও অভিহিত হন। ভগবান্ নারায়ণ বলেন, "যিনি বাসুদেব তাঁহাকেই নির্গুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, সঙ্কর্ষণ, ভগবান্ ও প্রভু বলিয়া জানিও।"[২] অনন্তর সাংখ্যদর্শনের পরিভাষায় তিনি বলেন,

"অহং হি পুরুষো জ্ঞেয়ো নিষ্ক্রিয়ঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"[৩]

'আমিই পঞ্চবিংশতিতম(তত্ত্ব) নিষ্ক্রিয় পুরুষ,—ইহা জানিও।' পূর্বেও তিনি সেই প্রকার বলিয়াছেন, "যিনি সর্বগত, যিনি সাক্ষী এবং লোকের আত্মা বলিয়া কথিত হন, এবং সর্বভূত শরীরসমূহ বিনষ্ট হইলেও যাঁহার বিনাশ হয় না, যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহ হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব বলিয়া খ্যাত অজ, নিত্য, শাশ্বত, নির্গুণ, নিষ্কল এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষ, যিনি জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া কথিত হন এবং যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া দ্বিজসত্তমগণ ইহ সংসার হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয়, তাঁহাকেই সনাতন পরমাত্মা বাসুদেব বলিয়া জানিও।'[৪] বিশেষ প্রণিধান করিলে সহজে অবগতি হইবে যে এই উক্তির তাৎপর্য্য কেবল এইমাত্র নহে যে জীব পরমাত্মা বা বাসুদেবই, উহাতে অধিকন্তু আরও নির্দেশিত হইয়াছে যে—(১) বাসুদেব চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথবা প্রকারান্তরে বলিলে, জগৎপ্রপঞ্চ বাসুদেবে বস্তুতঃ নাই; এবং (২) একই পুরুষ বা বাসুদেব বহু শরীরে উপহিত হইয়া বহু জীব হইয়াছেন, 'পুরুষ' শব্দ একবচনান্ত এবং 'সর্বভূতশরীরসমূহ' ("ভূতগ্রামশরীরেষু") বহুবচনান্ত প্রয়োগ হওয়াতে তাহা সিদ্ধ হয়। মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বলেন যে তিনি তাঁহার গুরু পরমর্ষি ব্যাসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে একান্তধর্মমতে জীব বিষ্ণুই।

"আত্মা হি পুরুষব্যাঘ্র জ্ঞেয়ো বিষ্ণুরিতি স্থিতিঃ।"[৫]

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৬—

২) ঐ' ১২।৩৩৯।৪০ ; আরও দেখ—

"সর্বাবাসং বাসুদেবং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ॥"—(ঐ, ১২।৩৪৪।১৮'২)

"হরিরেব হি ক্ষেত্রজ্ঞো নির্মমো নিষ্কলস্তথা।
জীবশ্চ সর্বভূতেষু পঞ্চভূতগুণাতিগঃ॥"—(ঐ, ১২।৩৪৮।৫৮)

৩) ঐ, ১২।৩৩৯।৪৩'২ ৪) ঐ, ১২।৩৩৯।২২'২—২৫

৫) ঐ, ১২।৩৪৬।৮'১

'হে পুরুষব্যাঘ্র! (জীবের) আত্মাতে বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় জান। ইহাই (একান্ত ধর্ম্মের) স্থির সিদ্ধান্ত।' নারায়ণীয়াখ্যানের উপসংহারে একজীববাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১]

যে মতবাদে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা হয়, এবং জীব বহু বলিয়া মানা হয়, ভগবান্ নারায়ণ উহার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি নারদকে বলেন,

"অহং হি জীবসংঘাতো ময়ি জীবঃ সমাহিতঃ
নৈবং তে বুদ্ধিরত্রাভূদ্দৃষ্টো জীবো ময়েতি বৈ॥"[২]

"আমিই জীবসংঘাত (অর্থাৎ জীববর্গ, অথবা জীবাত্মা এবং তদুপাধিভূত জড়বর্গ)[৩] এবং জীব আমাতেই সমাহিত। এখানে তোমার এই বুদ্ধি যেন না হয় যে 'আমি নিশ্চয় জীব দেখিয়াছি।' এই বচনের তাৎপর্য্য এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান হয় যে জীবও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং জীব বহু এবং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। বর্তমান সংখ্যদর্শনে ঐ প্রকারেই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ বলেন যে ঐ অনুমান সত্য নহে। কেননা, সমস্ত জীব তিনিই। শরীরোপাধিতে উপহিত হইয়াই তিনি জীব হইয়াছেন এবং উপাধির বহুত্ব হেতুই জীব বহু বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবের সদ্ভাব-বুদ্ধি সঙ্গত নহে।

'গীতা'য় ও ঐ বাদদ্বয় পরিগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য… … … …॥"[৪]

'নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় শরীরীর এই দেহসমূহ অন্তবান্ বলিয়া উক্ত হয়।' এইখানে 'দেহ' শব্দ বহুবচনান্ত এবং 'শরীরী' শব্দ একবচনান্ত হওয়াতে সিদ্ধ হয় যে, কৃষ্ণের মতে, বহু শরীরের একই শরীরী। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ঐ শরীরী তিনি স্বয়ং।

"অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥"[৫]
"ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত॥"[৬]

প্রকারান্তরেও তিনি সেই কথা বলিয়াছেন। যথা,

"মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥"[৭]

কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে অজ্ঞান বশতঃই জীব আপন ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে পারিতেছে না।

---

১) 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বের ৩৫০তম ও ৩৫১ তম অধ্যায়। উহার সংক্ষিপ্ত সারের জন্য 'বেদান্ত' ও অদ্বৈতবাদ এবং 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ২য় খণ্ড দেখ।

২) মহাভা, ১২।৩৩৯।৫৭

৩) 'জীবসংঘাত' স্থলে 'জীবসংজ্ঞাত' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তখন অর্থ—'আমিই জীব নাহে অভিহিত'।

৪) গীতা, ২।১৮ ৪) ঐ, ৮।৪'২ ৬) ১৩।২'১

নারায়ণীয়াখ্যানেও আছে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে তিনি "সর্বভূতের ক্ষেত্রজ্ঞ" (মহাভা, ১২।৩৪২।৭৪'২) অন্যত্র অর্জুনও তাহাই বলিয়াছেন

"ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানামাদিরন্তশ্চ কেশবঃ।"—(ঐ, ৬।১২।১৭'১)

৭) গীতা, ১৬।১৮'২

"অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত। সেইহেতু জীবগণ (অহন্তামমতারূপ) মোহগ্রস্ত হয়। পরন্তু আত্মার (স্বরূপ বিষয়ক) জ্ঞান দ্বারা যাহাদের সেই অজ্ঞান বিনাশিত হয়, তাহাদিগের নিকট সেই জ্ঞান পরকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে বা আপন পরম স্বরূপকে) সূর্য্যবৎ প্রকাশিত করিয়া দেয়।[১] অনন্তর তিনি আরও বলিয়াছেন, "যাহারা তদ্বুদ্ধি (অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট), তদাত্মা (অর্থাৎ পরব্রহ্মই যাহাদের আত্মা বা স্বরূপ হয়), তন্নিষ্ঠ এবং তৎপরায়ণ, জ্ঞান দ্বারা তাহাদের পাপ বিধৌত হইয়া যায়, এবং তাহাতে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।"[২] জ্ঞানী "যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতাত্মভূতাত্মা" হন।[৩] "যোগযুক্ত আত্মা (জীব) সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তিনি আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে আছে বলিয়া দেখেন।"[৪] "যে জ্ঞান দ্বারা তুমি অশেষে সর্বভূতকে আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে।"[৫] অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে জীব ব্রহ্মের সহিত আপন একত্ব উপলব্ধি করে; ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়। সগুণ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বাত্মক। সেই ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিলে,—অভেদবোধ হইলে জ্ঞানীও সর্বাত্মক হয়। পরন্তু, যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে সার্বাত্ম্য ব্রহ্মের পরমতত্ত্ব নহে; কেননা, সার্বাত্ম্য বাস্তব নহে, মায়িক। নারায়ণীয়াখ্যান মতে ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে নির্বিশেষ অদ্বৈত।[৬] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম পরম নির্বাণ। উহা পরমধর্ম বলিয়া কথিত হয়। উহা হইতে আমি পূর্বে কখনও চ্যুত হয় নাই। সেইহেতু আমি 'অচ্যুত' নামে "অভিহিত হই।"[৭] তাহাতেও জানা যায় যে ব্রহ্মের পরম স্বরূপ নির্বিশেষ এবং ঐ পরম স্বরূপ হইতে তিনি কখন চ্যুত হন না; অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম কখনও বস্তুতঃ সবিশেষ হন না। সুতরাং সার্বাত্ম্য বাস্তব নহে, মায়িক। অতএব সার্বাত্ম্য-অনুভূতি পরম মুক্তি নহে; নির্বিশেষ ব্রহ্মভবনই পরমমুক্তি। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেবই শরীরে প্রবেশ করিয়া বা শরীর সম্পর্কে জীব সাজিয়া বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছেন। সুতরাং জীব যখন মুক্ত হয়, তখন তাহার শরীর থাকে না। নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন, "যাহারা সপ্তদশ (অর্থাৎ লিঙ্গশরীর) রহিত, গুণ ও কর্মসমূহ রহিত এবং পঞ্চদশ কলা (অর্থাৎ স্থূলশরীর) পরিবর্জিত, তাহারা মুক্ত। ইহা নিশ্চয়।"[৮] প্রকারান্তরে বলিলে, মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না, মুক্তপুরুষ আর পুরুষ থাকে না, ব্রহ্ম হইতে তাহাকে পৃথকরূপে নির্দেশ করিবার কিছুই থাকে না। অন্যত্র তিনি ঐ বিষয়ে জলবিন্দুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কথিত হইয়াছে, যে ভগবান্ রুদ্রের স্তুতিতে তিনি বলেন,, "জলবিন্দুসমূহ সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে এবং পুনরায় উহাতে বিলীন হইয়া উহার সহিত (তথা নিজেদের মধ্যেও) ঐক্য প্রাপ্ত হয়। ভূতবর্গের প্রভব এবং প্রলয়ও সেইরূপ বলিয়া জানিয়া বিদ্বান্‌গণ তোমার সাযুজ্য লাভ করে।"[৯] কিঞ্চিৎ পরে তিনি আরও বিশদ করিয়া বলেন,

---

১) গীতা, ৫।১৫'২—১৬ ২) ঐ, ৫।১৭

৩) ঐ, ৫।৭ ৪) ঐ, ৬।২৯ ৫) ঐ, ৪।৩৫'১

৬) পূর্বে দেখ। ৭) মহাভা, ১২।৩৪২।৮১

৮) মহাভা, ১২।৩৩৪।৪০ ৯) মহাভা, ৭।২০০।৭৫

"আত্মানং ত্বামাত্মনোঽনন্যবোধং
বিদ্বানেব গচ্ছতি ব্রহ্ম শুক্রম্।"[১]

'নিজকে তুমি বলিয়া জানিয়া,—তোমা হইতে নিজের অনন্যবোধ লাভ করিয়া (জীব) শুদ্ধ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে গমন করে।' সুতরাং মুক্তিতে জীবভাবের নির্বাণ হয়। তাই নারায়ণীয়ধর্মে মুক্তিকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বা 'নির্বাণ'ও বলা হয়।[২] 'গীত'ায়ও উহাকে সেই প্রকার বলা হইয়াছে।[৩]

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কখন কখন পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তিও দেখা যায়। যথা, নারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন, "হে ব্রহ্মন্, মুক্তপুরুষদিগের গতি 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া কল্পিত হয়। তিনি সর্বগুণযুক্ত এবং নির্গুণও বলিয়া কথিত হন।"[৪] অপরেও নারায়ণকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই বলিয়াছেন।[৫] কৃষ্ণ নারায়ণকে কর্তাও বলিয়াছেন, অকর্তাও বলিয়াছেন।[৬] এই সকল উক্তিকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করিয়া বাসুদেব বা নারায়ণকে উভয়াত্মক, অথবা কাল বা অবস্থা ভেদে সগুণ ও নির্গুণ এবং কর্তা ও অকর্তা বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। কেননা ভগবান্ নারায়ণ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে তাঁহাকে বস্তুতঃ সর্বভূতগুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ মনে করা ঠিক হইবে না,—তাঁহার সগুণভাব মায়িক। তাঁহার কর্তৃত্ব সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলিতে হয়। কেননা, যিনি সগুণ তিনিই করিতে পারেন,—কর্তা হইতে পারেন, আর যিনি নির্গুণ তিনি কিছু করিতে পারেন না,—কর্তা হইতে পারেন না। সুতরাং যেহেতু ব্রহ্মের সগুণত্ব মায়িক, সেইহেতু তাঁহার কর্তৃত্বও মায়িক। বৈশম্পায়ন এক স্থলে বলিয়াছেন, "নির্গুণ বলিয়া খ্যাত তিনি (বাসুদেব) পরম এবং নিত্য; তিনি মহর্ষি এবং মহাবিভূতি-সম্পন্নও। যেমন কাল ঋতুলক্ষণসমূহ দ্বারা সম্প্রযুক্ত হয়, তেমন তিনি শীঘ্র গুণসমূহের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হন।"[৭] ঐ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে গুণসমূহ স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক; ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্গুণ; উপাধিসংযোগ বশতঃই সগুণ হন। তিনি আরও বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে ঐ বিষয় অতি দুর্জ্ঞেয়; একমাত্র জ্ঞানী মহর্ষিগণই নিত্য নির্গুণ ("গুণাধিক") ব্রহ্মকে দর্শন করেন।[৮] সুতরাং সাধারণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের সৃষ্ট্যাদির কর্তা এবং সৃষ্ট জগৎ; সুতরাং তিনি সগুণ ও সবিশেষ। পরন্তু জ্ঞানীর প্রকৃত পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ এবং অকর্তা। অতএব দৃষ্টি ভেদেই ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, এবং কর্তা ও অকর্তা বলা হইয়াছে।

জীবভাব এবং সংসৃতি অজ্ঞানজ। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান অপসৃত হইতে পারে; অপর কোন উপায়ে নহে। সুতরাং একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হইতে পারে।

---

১) মহাভা, ৭।২০০।৭৮·১

২) মহাভা, ১২।৩৪০।৮·১

৩) যথা, দেখ—গীতা, ২।৭২ ; ৫।২৪—৬ ; ৬।১৫

৪) মহাভা, ১২।৩৩৪।৪১

৫) মহাভা, ১২।৩৩৮ (নারদ) ; ৩৪১।১২·১ (কৃষ্ণ) ; ৩৪৬।২০·১ (সৌতি) ; ৩৪৭।১৩·১ (বৈশম্পায়ন)॥

৬) মহাভা, ১২।৩৪২।১২৫·২—১২৬·১

৭) মহাভা, ১২।৩৪৭।৯৫

৮) মহাভা, ১২।৩৪৭।৯৬

নারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন যে মুক্ত পুরুষদিগের গতি ক্ষেত্রজ্ঞ "দৃশ্যতে জ্ঞানযোগেন" (জ্ঞানযোগ দ্বারা দৃষ্ট হন")।[১] পরে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে বলেন, যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণ মুক্ত হন, সেই বাসুদেব "একমাত্র জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া কথিত হন।"[২] ভাগবত ধর্মের অন্যতম প্রধান আচার্য পরমর্ষি ব্যাসও বলিয়াছেন, তিনি "জ্ঞানদৃশ্য";[৩]

"এষ চৈতৎ পরং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ো বিজ্ঞানচক্ষুষা";[৯]

ইনিই পরব্রহ্ম; এবং ইনি বিজ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা জ্ঞেয়।' নারায়ণীয়াখ্যানের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা রুদ্রকে বলেন, এই (পরম) পুরুষ শাশ্বত, অব্যয় ও অক্ষয়, এবং অপ্রমেয়, তথা সর্বগ ও সর্ব, বলিয়া নিরুক্ত হইয়া থাকেন। হে সত্তম, আমি, তুমি, কিম্বা অপর সগুণ বা নির্গুণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। তিনি একমাত্র জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া স্মৃত।"[৫] "আমি সাংখ্যবিধিতে এবং যোগবিধিতে তাঁহার তত্ত্ব যথাক্রমে চিন্তা করিয়াছি। পরন্তু তাঁহার পরম তত্ত্ব জানিতে পারি নাই।"[৬]

"এবং স ভগবান্ স্বেন জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ ॥"[১৩]

'এই প্রকারে সেই ভগবান্ আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রতিবোধিত হন।' অর্থাৎ তিনি জ্ঞানদৃশ্য সত্য; পরন্তু সাংখ্যমত এবং যোগমত অনুসারে আপনা হইতে তাঁহাকে পৃথক মনে করিলে, তত্ত্বৎ পদ্ধতি অনুসারে যথাযথ সাধন করিয়াও কেহ তাঁহাকে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। আর আপনা হইতে অভিন্ন রূপে বিচার করিতে থাকিলে, আত্মজ্ঞান দ্বারা তাঁহারও পরম স্বরূপের অবগতি হয়।

'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, মনুষ্য

"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"[৮]

'জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরা শান্তি প্রাপ্ত হয়।' মনুষ্যকে পবিত্রকারী জ্ঞানের তুল্য অপর কিছুই নাই।[৯] জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য সমস্ত পাপ হইতে নিস্তার পায়।[১০] জ্ঞান সমস্ত কর্মকে ধ্বংস করে।[১১] সুতরাং জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য পুনঃ মোহগ্রস্ত হয় না।[১২] সুতরাং মুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণ বলেন, জ্ঞানী উপলব্ধি করে যে "বাসুদেবঃ সর্বম্" ('সমস্ত বাসুদেবই');[১৩] "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" (জ্ঞানী আমার আত্মা বা স্বরূপই,—ইহাই আমার মত)।[১৪] ঐ জ্ঞান অবশ্যই পরম জ্ঞান,—যাহা পরম "জ্ঞেয়" বা "জ্ঞানগম্য" বস্তু,[১৫] যাহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না,[১৬] যাহাকে জানিলে

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৪২·১

২) মহাভা, ১২।৩৩৯।২৪—৫ ৩) মহাভা, ১২।৩৪০।১০৭·১

৪) মহাভা, ১২।৩৪০।১০৮·১; আরও দেখ—"এবমেতৎ পুরা দৃষ্টং ময়া বৈ জ্ঞান-চক্ষুষা।" (৩৪০।১০৮·২)

৫) মহাভা, ১২।৩৫১।১—২ ৬) মহাভা, ১২।৩৫১।৭·২—৮·১

৭) মহাভা, ১২।৩৫১।২২·২

৮) গীতা, ৪।৩৯·২

৯) গীতা, ৪।৩১·১ ১০) ঐ, ৪।৩৬ ১১) ঐ, ৪।৩৭

১২) ঐ, ৪।৩৫·১ ১৩) ঐ, ৭।১৯

১৪) ঐ, ৭।১৮ ১৫) ঐ, ১৩।১২·১ ও ১৭·২

১৬) "যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥"—(ঐ, ৭।২·২)

মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে (অর্থাৎ মুক্ত হয়),[১]—তৎস্বরূপ হইয়া যায়,[২]—সেই পর ব্রহ্মেরই জ্ঞান।[৩] যদ্দ্বারা তাহাকে জানা যায়, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, প্রভৃতি সেই সদ্‌গুণ সমূহকেও 'গীতা'য় 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে।[৪] আবার অন্য প্রকারে কখন কখন গুণভেদে জ্ঞানের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার ভেদের কথাও বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান, অপর গুলি অসম্যক্ জ্ঞান। "যে জ্ঞান দ্বারা (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত অনন্তরূপে) বিভক্ত সমস্ত পদার্থে এক অবিভক্ত এবং অব্যয় ভাব (অর্থাৎ বস্তু) উপলব্ধি হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জান। আর যে জ্ঞান দ্বারা (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত) সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানাবিধ বস্তুসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলিয়া জান।"[৫] তাৎপর্য এই যে—জগতে সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনন্ত বস্তুসমূহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। উহাদিগকে যথাদৃষ্টরূপে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া,—বিভক্ত বলিয়া নিরূপণ এবং অবধারণ করা রাজস জ্ঞান। আর উহাদিগেতে এক অবিভক্ত সত্তার উপলব্ধি করা সাত্ত্বিক জ্ঞান। অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে ঐ সত্তা অব্যয় অর্থাৎ উহার স্বরূপের বিচ্যুতি কখনও হয়না,—উহা নিত্য একরূপেই থাকে। সুতরাং ঐ অবিভক্ত বস্তু কখনও বিভাগগ্রস্ত হয় না। তাহাতে বুঝা যায় যে ঐ সত্তা পূর্ণাদ্বৈতই সুতরাং পরমজ্ঞানও পূর্ণাদ্বৈতই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মই শরীরে প্রবেশ করিয়া বা শরীর সম্পর্কে জীব সাজিয়াছেন এবং জীবরূপে নানাবিধ কর্ম করিয়া নানা সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন; এক তিনি বহু শরীরে উপহিত হইয়া বহু জীব হইয়াছেন। তাহাতে শঙ্কা করা যায় যে ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় এত দুঃখকষ্ট ভোগ অঙ্গীকার করিয়াছেন কেন? জীবের পক্ষ হইতে ঐ শঙ্কাকে প্রকারান্তরে বলা যায়। কথিত হইয়াছে যে জ্ঞান দ্বারা সাধক সর্বাত্মক ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া সর্বাত্মক হয়। আচার্য শঙ্করের ভাষায় বলিলে, "তিনি সর্বভূতের আত্মা হন, সর্বভূতের প্রাণ হন, সর্বভূতের মন হন, সর্বভূতের বাক্ হন, ইত্যাদি। এই প্রকারে সর্বভূতাত্মরূপে তিনি সর্বজ্ঞ হন, সর্বকৃৎ হন;" ইত্যাদি।[৬] তাহাতে শঙ্কা উত্থাপন করা যায় যে, যদি প্রকৃত পক্ষেই তাহা হয়,—যদি জ্ঞানী প্রকৃতই সর্বপ্রাণীর দেহেন্দ্রিয়াদির স্বরূপ হন, তবে সর্বপ্রাণীর সুখদুঃখেরও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয়। এইরূপে জ্ঞান মহাদুঃখের হেতু হয়। যেই বাদে জীবকে ব্রহ্মের অংশ মানা হয়, সেই বাদের বিরুদ্ধেও এই শঙ্কা প্রথম প্রকারে করা যায়। কেননা, অংশের সুখে বা দুঃখে অংশী সুখ বা দুঃখ গ্রস্ত হয়। সুতরাং যেমন অদ্বৈতবাদ-সম্মত জীববাদের বিরুদ্ধে, তেমন দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-সম্মত জীববাদের বিরুদ্ধেও, এই শঙ্কা করা যায়। শঙ্কর এই প্রকার শঙ্কার সমাধান করিয়াছেন।[৭] ভগবান্ নারায়ণ শ্বেতদ্বীপে নারদকে বলেন,—ইহা বাসুদেবের মহিমা এবং মাহাত্ম্য। সর্বভূতাধিবাস এবং সর্বভূতাত্মা ভূত হইয়াও[৮] তিনি কখনও শুভ কিম্বা

---

১) "যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে"—(ঐ, ১৩।১২·১)

২) "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।"—(ঐ, ১৩।১৮·২)

৩) ঐ, ১৩।১২ ৪) ঐ, ১৩।৭—১১ ৫) ঐ, ১৮।২০—১

৬) বৃহউ, ১।৫।২০ (শঙ্করভাষ্য)

৭) পরে পাদটীকা দেখ।

৮) নারায়ণীয়াখ্যানে ইহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে "সর্বভূতাত্মভূত" অর্থাৎ সর্বভূতরূপে আত্মপ্রকাশ

অশুভ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। সত্ত্বাদি গুণত্রয় সর্বশরীরে বর্তমান এবং নানারূপে ক্রিয়া করিতেছে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে তিনি ঐ সকল গুণ ভোগ করেন, পরন্তু গুণসমূহ তাঁহাকে ভোগ করে না। তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণভোক্তা এবং গুণস্রষ্টা বলিয়া গুণাধিক।[১] ব্রহ্মা রুদ্রকে বলেন, "তিনি অশরীর (অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার নিজস্ব শরীর নাই)। সর্ব (প্রাণী) শরীরে তিনি নিবাস করেন। শরীরসমূহে নিবাস করিলেও (উহাদের) কর্ম সমূহ দ্বারা তিনি লিপ্ত হন না। তিনি, আমার এবং তোমার, তথা অপর যে সকল শরীরী আছে, তাহাদেরও অন্তরাত্মা। তিনি সকলের সাক্ষীভূত। কেহ কখনও তাঁহাকে (অর্থাৎ তাঁহার এই তত্ত্বরহস্যকে যথাযথ) হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না"।[২] ব্রহ্মা আরও বলেন,—যিনি সর্বাত্মা, তিনি পরমাত্মা বা নারায়ণ; তিনি নিত্য নির্গুণ; সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়; পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমন তিনি কর্মফলসমূহ দ্বারা লিপ্ত হন না; পরন্তু কর্মাত্মা লিঙ্গশরীরাভিমানী; উহাই বন্ধনগ্রস্ত হয় এবং মুক্ত হয়।[৩] 'গীতা'য় কৃষ্ণও বলিয়াছেন, "প্রভু (অর্থাৎ দেহস্বামী পরমাত্মা) লোকের কর্তৃত্বকে, তাহার কর্মসমূহকে এবং কর্মফলের সংযোগ উৎপন্ন করেন না। পরন্তু স্বভাবই (অর্থাৎ অহংভাব বা মায়াই) প্রবর্তিত হইতেছে (—সমস্ত কিছু করিতেছে ও করাইতেছে) বিভু কাহারও পাপ কিম্বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত। সেইহেতু জীবগণ (অহন্তামমতারূপ) মোহগ্রস্ত হয় (এবং তদ্বশতঃ নানা কর্ম করে ও তাহাদের ফল ভোগ করে)।"[৪]

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"[৫]

'হে কৌন্তেয়! অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া এই অব্যয় পরমাত্মা, শরীরস্থ হইলেও, কোন কর্ম করেন না, (সুতরাং) লিপ্ত হন না (অর্থাৎ কর্মফলবন্ধন-গ্রস্ত হন না)।' আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্লেপত্ব প্রদর্শন করিতে কৃষ্ণ আকাশ ও সূর্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আকাশ সর্বগত; পরন্তু সূক্ষ্মত্ব হেতু সর্বের কাহারও কিছুরই লেপ উহাতে লাগে না। সেই প্রকার আত্মা দেহের সর্বত্র, তথা সর্ব দেহে, অবস্থিত থাকিলেও কাহারও কিছুরই লেপ উহাতে লাগে না।[৬] যেমন একই সূর্য সর্বজগৎকে প্রকাশিত করে, তেমন একই পরমাত্মা সমস্ত শরীরকে প্রকাশিত করে।[৭] যেমন সূর্য তৎকর্তৃক প্রকাশিত বস্তুসমূহের দোষ কিম্বা গুণ দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমন পরমাত্মাও শরীরসমূহের দোষগুণ দ্বারা লিপ্ত হয় না।

এই প্রকারে পূর্বোক্ত শঙ্কার এই উত্তর পাওয়া যায়—পরমাত্মা সর্বাত্মক হইলেও সর্বের কিম্বা তদন্তর্গত কাহারও সুখদুঃখাদি কিছুরই লেপ উহাতে লাগে না। সর্বরূপে তিনি নানাবিধ কর্ম করিতেছেন এবং তদ্ধেতু নানাবিধ ফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। সেই হেতু তাঁহার কর্মফল ভোগ হয় না। সুতরাং

করিয়াছেন বলিয়াই এবং "সর্বভূতাধিবাস" অর্থাৎ সর্বভূতরূপে বাস করিতেছেন বলিয়াই পরমতত্ত্বকে 'বাসুদেব' নামে অভিহিত করা হয়। (মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৩'১; ৩৪১।৪১'২)

[১] মহাভা, ১২।৩৩৯।২৬—৮
[২] মহাভা, ১২।৩৫১।৩—৪
[৩] মহাভা, ১২।৩৫১।১৪—৬
[৪] গীতা, ৫।১৪—৫
[৫] ঐ, ১৩।৩১
[৬] ঐ, ১৩।৩২
[৭] ঐ, ১৩।৩৩

সর্বাত্মক ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করত যে জ্ঞানী সর্বাত্মক হন, তিনিও নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্লেপ হন,—সর্বপ্রাণীর সুখদুঃখের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ হয় না। এই তত্ত্ব "সর্বথা দুর্বিজ্ঞেয় এবং দুর্বাচ্য" তাই ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে উহাকে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। উহার হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াছেন যে তাহা বাসুদেবের মহিমা ও মাহাত্ম্য। ব্রহ্মার উক্তির তাৎপর্য এই যে যে শরীরাভিমানী,—শরীরে অহন্তামমতাবুদ্ধি যাহার আছে, শরীরজ সুখদুঃখাদির ভোগ তাহারই হয়; বাসুদেব সর্বভূতরূপে বাস করিলেও শরীরে অহন্তামমতাভিমান করেন না; সুতরাং তাঁহার সুখদুঃখভোগ হয় না কৃষ্ণও সেই কথা বলিয়াছেন, "স্বভাবস্তু প্রবর্ততে" অর্থাৎ স্বভাবই প্রবর্তিত হইতেছে—সমস্ত কিছু করিতেছে ও করাইতেছে। 'স্বভাব' শব্দের অর্থ 'অহংভাব' অর্থাৎ 'অহংপরবুদ্ধি' বা 'অহন্তামমতাবুদ্ধি'। সুতরাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি সমস্তই অহন্তামমতাবুদ্ধিজনিত। 'স্বভাব' শব্দের অর্থ অহন্তামমতাবুদ্ধির কারণ 'অবিদ্যা' বা 'মায়া'ও হয়। তাই আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া।"[1] উক্ত শঙ্কার কৃষ্ণ-কৃত পরিহারের তাৎপর্য, তাঁহার মতে, এই—

"অবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যতে ইতি ব্যবহারো ভবতি ন তু পরমার্থত একস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্তি।"[2]

'করে', 'লিপ্ত হয়', ইত্যাদি প্রকারের ব্যবহার অবিদ্যামাত্রস্বভাবই। এক (ও অদ্বিতীয়) পরমাত্মা পরমার্থতঃ অবিদ্যাতীত। সুতরাং তাঁহাতে ঐ প্রকার ব্যবহার নাই। তাই তাঁহার সুখদুঃখাদি ভোগও নাই।[3]

কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,

"প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাঽত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥"[4]

'যে জানে যে আত্মা (স্বয়ং) অকর্তা, (শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা) সর্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ সমস্ত

---

১) গীতা, ৫।১৪ (শঙ্করভাষ্য) ২) ঐ, ১৩।৩১ (শঙ্করভাষ্য)

৩) শ্রুতিতে আছে,

"স এবংবিৎ সর্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি।"

—(বৃহউ, ১।৫।২০)

শঙ্কর বলেন, ঐ বিষয়ে এই শঙ্কা করা যায় যে, যদি জ্ঞানী সমস্ত প্রাণীর কার্যকরণাত্মত্ব লাভ করে, তবে সর্ব প্রাণীর সুখদুঃখসমূহের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ হইবে। (পরন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইবে না। কেননা, তাঁহার বুদ্ধি অপরিচ্ছিন্ন হয়। যাহারা আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই আক্রোশাদি কারণে দুঃখ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে আক্রোশ করে এবং যাহার প্রতি আক্রোশ করা হয়, তাহাদের উভয়েতেই সর্বাত্মক ব্যক্তির আত্মবুদ্ধির কোন পার্থক্য না থাকায় আক্রোশাদি নিমিত্ত কোন দুঃখ তাঁহার হয় না। নিমিত্তের অভাবে যে দুঃখ হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা, কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতাদিরই তদ্ধেতু দুঃখ হয়, পরন্তু অপরের ঐ মৃত্যু হেতু দুঃখ হয় না। তেমন অপরিচ্ছিন্নাত্ম ঈশ্বরের দুঃখের নিমিত্ত মমত্ব-তবত্বাদি-মিথ্যাজ্ঞানাদি দোষের অভাব হেতু দুঃখ উৎপন্ন হয় না।

৪) গীতা, ১৩।২৯

কর্ম প্রকৃতিরই দ্বারা (কৃত হয়, অপর কিছুরই দ্বারা নহে), সে (পরমতত্ত্ব যথার্থতঃ) জানিয়াছে।'

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাঽহমিতি মন্যতে॥"[১]

'প্রকৃতির গুণসমূহ (অর্থাৎ কার্যকরণরূপ গুণবিকারসমূহ[২]) দ্বারা সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে কৃত হইয়া থাকে। পরন্তু অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিত পুরুষ মনে করে যে 'আমিই কর্তা।" এই সকল বচনের ভাষা ও ভাব সাংখ্যশাস্ত্রের হইলেও, উহারা বেদান্তীর—বিশেষতঃ ভাগবতধর্মীর,—সর্বথা গ্রাহ্য। সুতরাং তাহাতেও জানা যায় যে ভাগবতধর্ম মতে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি সমস্তই প্রকৃতিরই বা মায়ারই খেলা। অজ্ঞানজ অহঙ্কার বশতঃ জীব ঐ সকলকে আপনার মনে করে। ব্রহ্মের জীবজগদ্‌ভবন এবং জীবের ব্রহ্মভবন বিষয়ে যাহা কিছু পূর্বে উক্ত হইয়াছে তৎসমস্তই মায়ার খেলা। ভগবান্ নারায়ণ অতি স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন। যাহা হউক, মায়ার খেলায় যে লিপ্ত হয় না ও মুগ্ধ হয় না, কিম্বা, অধিকন্তু, যে মায়াকে অতিক্রম করিয়াছে, সে কর্তা নহে, সুতরাং ভোক্তাও নহে।

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মের অনেক বিভাব—পরব্রহ্মবিভাব, ঈশ্বর-বিভাব, জীব-বিভাব ও জগদ্‌বিভাব। পরব্রহ্মরূপে তিনি কূটস্থ, নিত্য, সদা একরূপ, ও একরস, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। ঈশ্বররূপে তিনি সগুণ ও সক্রিয়,—জগতের সৃষ্ট্যাদির কর্তা, পরন্তু ভোক্তা নহেন। জীবরূপে তিনি কর্তা ও ভোক্তা এবং জগদ্রূপে তিনি জীবের ভোগ্য। ঈশ্বররূপে তিনি শাসক ও পালক, আর জীব-জগদ্রূপে তিনি শাস্য ও পাল্য। ঈশ্বররূপে তিনি পরম স্বতন্ত্র কর্তা, আর জীবরূপে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্তা নহেন, কেননা তাঁহার কর্তৃত্বে ঈশ্বরাধীনতাও আছে। যাহা হউক, 'গীতা'র এক স্থলে উহাদিগকে (পর) ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈবত এবং অধিযজ্ঞ ভাব বলা হইয়াছে।[৩] "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যাহা পরম অক্ষর রূপ তাহা (পর) ব্রহ্ম। "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" অর্থাৎ স্ব বা অহং-ভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। আত্মা বা মন আশ্রয়েই অহংভাব হয়। সুতরাং অহংভাব অধ্যাত্ম। শ্রুতিমতে ঐ অহং-বোধের পরে বহুভবনের সঙ্কল্প হয়';—"একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"। তাহার ফলে তিনি বহু হন। ঐ যে বহু-ভবন বা বহুরূপে ক্ষরণ অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণান, সেই ভাব তাঁহার অধিভূতভাব। গীতা বলিয়াছেন "অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ"। অনত্র আছে, "ক্ষর সর্বাণি ভূতানি" ('সর্বভূত ক্ষর')।[৪] সুতরাং ক্ষর-ভাব সর্বভূতাধিকৃত্য ভাব বা অধিভূত ভাব। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ('তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করত পশ্চাৎ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন')। গীতায় উহাকে 'পুরুষ' ভাব বলা হইয়াছে। 'পুরে' শয়ন করিয়া আছে বলিয়া পুরুষ বলা হয়। ঐ 'পুর' দৃষ্টি ভেদে সমস্ত সৃষ্টি প্রপঞ্চ বা ব্রহ্মাণ্ডও হইতে পারে কিম্বা উহার অংশ পিণ্ড বা ব্যষ্টি দেহও

---

[১] গীতা, ৩।২৭

[২] আকাশাদি পঞ্চমহাভূত এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ কার্য। কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং অন্তঃকরণচতুষ্টয়—করণ। এই সমস্তই প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিকার।

[৩] গীতা, ৮।৩—৪

[৪] ঐ, ১৫।১৬·২

হইতে পারে। ব্যষ্টিপুর-শায়ী 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষ বা জীব এবং সমষ্টি-পুরশায়ী মহাপুরুষ বা বিরাট্ পুরুষ। অথবা এই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহার দ্বারা পূর্ণ বলিয়াও অর্থাৎ সর্বগ এবং সর্বব্যাপী বলিয়াও তিনি পুরুষ। এই পুরুষ-ভাবকে গীতায় অধিদৈবত বলা হইয়াছে। —"পুরুষশ্চাধিদৈবতম্"। এই দেহে প্রবেশ করিয়া তিনি তৎসম্পর্কিত সমস্ত যজ্ঞ বা কর্ম নিষ্পন্ন করিতেছেন। সেই হেতু তিনি অধিযজ্ঞ। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে" ('আমিই এই দেহে অধিযজ্ঞ')। 'গীতা'র অন্যত্র অন্য এক প্রকার বিশ্লেষণ আছে,

> "উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
> পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥"[১]

'পরম পুরুষ (অথবা অব্যক্ত হইতে পর পুরুষ) এই দেহে উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তাঃ ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন 'দেহ' শব্দে ব্যষ্টি বা পিণ্ড এবং সমষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ড উভয় প্রকার দেহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি দেহের অতি সমীপে থাকিয়া, উহার সমস্ত ব্যাপারে অব্যাপৃত বা উদাসীন থাকিয়া কেবল উহাদের দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে অবস্থিত আছেন, সেই হেতু তিনি উপদ্রষ্টা বা অতি সন্নিহিত বিশুদ্ধ সাক্ষী। অন্য দৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন বিশুদ্ধ সাক্ষী নহেন ; কেননা, দৈহিক ব্যাপারসমূহে স্বয়ং ব্যাপৃত না হইলেও উহাদের অনুমোদন করিয়া থাকেন। সেইহেতু তিনি 'অনুমন্তা'। অপর দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন। অতএব তিনি 'ভর্তা'। তিনি সমস্ত ব্যাপারের ফল ভোগ করেন, তাই 'ভোক্তা'। তিনি সমস্ত ব্যাপার চালাইয়া থাকেন। তাই তিনি 'ঈশ্বর'।[২] উহাতে তাঁহার কোন প্রতিবন্ধক নাই,—তিনি পরমস্বতন্ত্র। সেই হেতু তিনি 'মহেশ্বর'। জগদ্ব্যাপারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচালক বা ঈশ্বর অপর যাঁহারা আছেন, " তিনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর। সুতরাং তিনি 'মহেশ্বর'। নির্গুণ ও নির্বিশেষ স্বরূপে,—শুদ্ধ কূটস্থ স্বরূপে তিনি 'পরমাত্মা'। 'পরমাত্মা' শব্দে নির্গুণ ও নির্বিশেষ পরব্রহ্মকে, 'উপদ্রষ্টা', 'অনুমন্তা', 'ভর্তা'ও 'মহেশ্বর' শব্দে সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে, এবং 'ভোক্তা' শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনই একই পরমতত্ত্বের তিন বিভাব মাত্র।

(ii) '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র আধারে

এবার আমরা ভাগবতধর্মের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র আধারে উহার দার্শনিক সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা অন্যত্র বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছি যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' অদ্বৈতভাবপূর্ণ ; অধিকন্তু মনে হয় যে উহার দার্শনিক তাৎপর্য অদ্বৈতবাদে।[৪] এখানে আমরা সেই কথার প্রতি কোন ধ্যান দিব না। যাহা যাহা ভাগবতধর্ম

---

১) গীতা, ১৩।২৩

২) দেখ— "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।"—(ঐ, ১৫।১৭'২)

৩) দেহাদিসংঘাতের স্বামী ও পরিচালক জীবকেও 'গীতা'তে কখন কখন 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে। যথা, দেখ— ১৫।৮, ১৬।১৪, ১৮।৪৩

৪) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী', ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

বলিয়া অতি স্পষ্ট বাক্যে '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে মাত্র সেই সকল উক্তির আধারে উহার দার্শনিক সিদ্ধান্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আমরা এখানে দেখাইব।

(১) ('বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে যে কবি প্রভৃতি নয় জন[১] তত্ত্বদর্শী…অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগবত মহাত্মা মিথিলাধিপতি নিমির নিকট ভাগবতধর্ম ব্যাখ্যা করেন। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে।[২] তাঁহাদের এক এক জনে এক একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। পিপ্পলায়ন নামে একজন "নারায়ণ নামক পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের স্বরূপ[৩] এই প্রকারে ব্যাখ্যা করেন।[৪]

"যাহা এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং অহেতু, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে এবং (উহাদের) বাহিরেও বর্তমান, এবং যাহা দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও হৃদয় (স্ব স্ব ব্যাপারে) প্রবৃত্ত হয়, হে নরেন্দ্র, তাহাকেই তুমি পর (তত্ত্ব) বলিয়া জান ॥৩৫॥

"যেমন বিস্ফুলিঙ্গসমূহ আপনাদের (মূলকারণ) অগ্নিকে প্রকাশিত করিতে পারে না, তেমন উহাতে (পরমতত্ত্ব ব্রহ্মে) মন প্রবেশ করে না; বাণী, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও (প্রবেশ করে) না। শব্দও কেবল বোধক বস্তুর নিষেধ দ্বারা অর্থাপত্তি প্রমাণে আত্মারূপ ঐ মূল বস্তুকে বলিয়া থাকে, যাহা ব্যতীত নিষেধ সিদ্ধি হয় না ॥৩৬॥

"যাহাকে আদিতে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) একই বলা হইত, তাহাকেই (পরে) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবৃৎ (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রধান), মহান্, সূত্র, অহঙ্কার এবং জীব বলা হয়। অনন্তশক্তি ব্রহ্মই জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফলরূপে,—(সংক্ষেপে বলিলে) সৎ, অসৎ, এবং তদতীত যাহা কিছু রূপে ভাসিত হইতেছে ("ভাতি") ॥৩৭॥

"ঐ আত্মা (কখনও) জন্মগ্রহণ করে নাই এবং মরিবেও না। উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। উহা সর্বত্র নিত্য অনপায়ী (রূপে বর্তমান)। উহা জ্ঞানস্বরূপ ("উপলব্ধিমাত্রং")। উহা ব্যভিচারিদিগের (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের) সাক্ষী। যেমন একই প্রাণ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াভেদে (নানারূপে) বিকল্পিত হয়, তেমন (একই) সৎ (বস্তু বিবিধরূপে বিকল্পিত হয়) ॥৩৮॥

"এক অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ এবং অনিশ্চিত (অর্থাৎ জায়স্বম্রিয়স্ব-সংজ্ঞক স্বেদজ) যোনিসমূহে তত্র তত্র প্রাণ যেমন জীবের অনুসরণ করে (তেমন আত্মা সর্বাবস্থায় সাক্ষীরূপে অসঙ্গভাবে থাকে)। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চেষ্ট এবং অহঙ্কার লীন হইয়া গেলে কূটস্থ আশয় (অর্থাৎ আত্মা) ব্যতীত ঐ অবস্থার অনুস্মৃতি হইতে পারে না ॥৩৯॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বাণী দ্বারা উহাকে ইদমিত্থংরূপে প্রকাশ করা যায় না। তাই বাণী 'ইহা নহে, ইহা নহে' ইত্যাদি প্রকারে তদ্দ্বারা প্রকাশ্য সর্ববস্তুর নিষেধ দ্বারা উহাকে নির্দেশ করিয়া থাকে। ঐ প্রকারে সর্ববস্তুর নিষেধে শূন্যে পর্য্যবসান হয়

---

[১] তাঁহাদের নাম,—কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন। (বিষ্ণুভাগ, ৫।৪।১১; ১১।২।২১) তাঁহারা "ভাগবতধর্মদর্শনা নব মহাভাগবতাঃ" (ঐ, ৫।৪।১২)

[২] পূর্বে দেখ

[৩] (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।৩।৩৪

[৪] ঐ, ১১।৩।৩৫—৯

না। কেননা, ঐ নিষেধ প্রক্রিয়ার চরমে কিছু অবশ্যই অবশেষ থাকে, যাহার শেষ কখনও হয় না। অধিকন্তু ঐ পরম বস্তুর সদ্ভাব ব্যতীত নিষেধও সিদ্ধ হয় না। ঐ মূল আধারের আশ্রয়েই অপর সর্ববস্তুর নিষেধ করা যায়। ঐ পরম মূল বস্তুই ব্রহ্ম। ইহাই পিপ্পলায়নের ৩৬তম উক্তির তাৎপর্য্য। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্ম নির্বিশেষ। উহা জ্ঞানস্বরূপ।৩৮ উহা ষড়্‌ভাব-বিকারবিহীন এবং সর্বত্র নিত্য নির্বিকারস্বরূপে অবস্থিত।৩৬ উহা কূটস্থ নিত্য।৩৯ উহা বিশ্ব-প্রপঞ্চ রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে।৩৭ যেহেতু উহা কূটস্থ নিত্য এবং নির্বিকার, সেই হেতু উহার পরিণাম হয় না, অতএব বিশ্বপ্রপঞ্চকে উহার পরিণাম বলা যায় না। সাধারণতঃ উহাকে বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্ট্যাদির হেতু বলা হয় বটে, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা হেতু নহে।৩৫ যেহেতু ব্রহ্মই জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে, সেইহেতু জগৎ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই। যেমন একই প্রাণ উপাধি-ভেদে নানারূপে বিকল্পিত হয়, তেমন একই ব্রহ্ম উপাধিবশতঃ নানারূপে বিকল্পিত হয়।(৩৮) সুতরাং ব্রহ্মের ভেদ ঔপাধিক, বাস্তব নহে। উপাধিও আবার মায়িক, বাস্তব নহে। অতএব ব্রহ্ম অদ্বৈতই।

সাধারণতঃ জগৎকে ব্রহ্মের শরীরও বলা হয়। যথা, অপর এক মহাত্মা,—নাম কবি,—বলিয়াছেন, "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্র, প্রাণী, দিক্‌সমূহ, বৃক্ষাদি, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতি যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই হরির শরীর।"[১] দ্রুমিল বলিয়াছেন, "যাহার শরীরে এই ভুবনত্রয় সন্নিবেশ হয়, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা দেহধারীদিগের (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) উভয় ইন্দ্রিয়সমূহে স্বতঃ জ্ঞান হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে বল, ওজ এবং তৃষ্ণা হয় এবং সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা (জগতের) স্থিতি উদ্ভব ও লয় হয়, তিনিই আদিকর্তা নারায়ণ।"[২] পরন্তু তাহা বলিয়া জগৎ সৎ নহে অসৎ। কবি স্পষ্টতঃই তাহা বলিয়াছেন,

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তান্মায়য়া … … …॥"[৩]

'ব্রহ্ম হইতে চ্যুত পুরুষের মায়াবশতঃ অস্মৃতি (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞান) এবং বিপর্য্যয় (অর্থাৎ ব্রহ্মকে জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিপরীত জ্ঞান) হয়। (অনন্তর ব্রহ্ম ভিন্ন) দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হেতু ভয় উৎপন্ন হয়।'

"অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হ্বয়ো
র্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথো যথা।
তৎকর্ম সঙ্কল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥"[৪]

'স্বপ্ন এবং মনোরথ বাস্তব না হইলেও যেমন উহাদের চিন্তনকারীর বুদ্ধিতে উহারা বাস্তববৎ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও উহাতে অভিনিবেশকারীর দৃষ্টিতে সত্যবৎ অবভাসিত হয়। তাহার কর্ম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে নিরোধ করা বিদ্বান্‌গণের উচিৎ। তাহাতে (দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্তি হয়, এবং সেইহেতু) অভয় প্রাপ্তি হয়।' এইরূপে দেখা যায়, জগৎ

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২।৪১
২) ঐ, ১১।৪।৪
৩) ঐ, ১১।২।৩৭
৪) ঐ, ১১।২।৩৮

মনঃকল্পনা মাত্র। উহা বস্তুতঃ না থাকিলেও স্বপ্ন এবং মনোরথের ন্যায় সত্যবৎ প্রতিভাসিত হইতেছে। ঐ মনের হেতু মায়া। মায়া বশতঃ ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপের বিস্মৃতি হয় এবং অধিকন্তু ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতিভাসিত হন। সুতরাং জগৎ মায়িক। মহাত্মা হরিও বলিয়াছেন, ভাগবতোত্তমেরা এই জগৎপ্রপঞ্চকে বিষ্ণুর মায়া বলিয়া মনে করেন ("বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্")।[১]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পিপ্পলায়নের মতে, ব্রহ্ম যেমন জড়জগদ্রূপে তেমন জীবরূপেও প্রতিভাসিত হইতেছেন। সুতরাং জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই। অন্তরিক্ষ প্রকারান্তরে সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করিয়া জীব হইয়াছেন।

যাহা দ্বারা ব্রহ্ম জীব ও জড়জগৎরূপে প্রতিভাসিত হয় সেই মায়ার স্বরূপ কি, আলোচ্য। নিমি জিজ্ঞাসা করেন, মায়াবীদিগের ও মোহিনী পরমেশ্বর বিষ্ণুর মায়ার স্বরূপ কি?[২] অন্তরিক্ষ উত্তর করেন[৩] সর্বশক্তিমান ভগবান্ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধ্যর্থ আপনা হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন করিয়া, তদ্দ্বারা উচ্চাবচ শরীরসমূহ নির্মাণ করত তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া জীব সাজিয়াছেন। এইরূপে যিনি এক ছিলেন, তিনি আপনাকে দশ (অর্থাৎ বহু) ভাগে বিভক্ত করিয়া গুণসমূহ অর্থাৎ গুণবিকারজ বিষয়সমূহ উপভোগ করেন। জীবরূপী ব্রহ্ম আত্মা দ্বারা প্রকাশিত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়সমূহ ভোগ করত এবং এই সৃষ্ট শরীরকে আত্মা মনে করত উহাদিগেতে আসক্ত হন। দেহী বহুবিধ কর্ম করত উহাদের সুখদুঃখময় ফল ভোগার্থ উচ্চনীচ নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। এই প্রকারে অবশ হইয়া নানা প্রকার দুঃখপ্রদ কর্মগতিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া এই পুরুষ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যু ভোগ করিতে থাকে। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সমস্ত সৃষ্টি ক্রমে আপনাতে লীন করিয়া দেয়।

"এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাঽস্মাভিঃ……॥"[৪]

'ইহাই ভগবানের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ত্রিগুণময়ী মায়া, আমাদের কর্তৃক বর্ণিত হইল।' বিষ্ণুমায়ার এই স্বরূপবর্ণনায় ব্রহ্মের জীবভবন, জীবের উপাধিকত্ব এবং উপাধিবহুত্বহেতু জীববহুত্ব অর্থাৎ একজীববাদ বর্তমান আছে। পরন্তু মায়াসৃষ্ট পদার্থ যে অবাস্তব প্রতীতিমাত্র তাহার স্পষ্টোল্লেখ নাই। বরং উহা হইতে মনে হয় যে ব্রহ্ম সত্য সত্যই প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছেন, অথবা ব্রহ্মের প্রভাবে মায়া বা অব্যক্ত সত্য সত্যই প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে জীবের উপাধিও বাস্তবিক। পরন্তু তাঁহার পূর্বে কবি যাহা বলিয়াছেন,[৫] তাহার সঙ্গে সমন্বয় করিলে বুঝা যাইবে যে ঐ প্রকার বলা অন্তরিক্ষের অভিপ্রায় ছিল না।

ভাগবতধর্ম মতে তত্ত্বদর্শী সার্বাত্ম্যলাভ করে। মহাত্মা হরি ভাগবতোত্তমের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২।৪৮ ২) ঐ, ১১।৩।১ ৩) ঐ, ১১।৩।৩—১৬

৪) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।৩।১৬

৫) কবি অন্যত্র বলিয়াছেন যে দেহাদি "অসৎ"। (১১।২।৩৩'২)

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"[১]

'যে সর্বভূতকে আপন ভগবদ্ভাব এবং সর্বভূতকে ভগবৎস্বরূপ আপনাতে দেখে, সে উত্তম ভাগবত।'

"গৃহীত্বাঽপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥"[২]

অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকে যে বিষ্ণুর মায়া মাত্র বলিয়া মনে করে, এবং সেইহেতু তাহার প্রতি দ্বেষও করে না কিম্বা উহাকে পাইয়া হর্ষিতও হয় না, সে নিশ্চয়ই ভাগবতোত্তম। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করে বলিয়া "যাহার বিত্তসমূহে কিম্বা শরীরে আপন বা পর বলিয়া ভেদবুদ্ধি হয় না, সে নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।" মহাত্মা প্রবুদ্ধ বলিয়াছেন "যে সর্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে দেখে ("সর্বত্রাত্মেশ্বরান্ বীক্ষাং") সে বিষ্ণুর মায়া অনায়াসে পার হইয়া যায়।[৩] কবি প্রভৃতির নিজেদের সম্বন্ধে নারদ বলেন,

"এতে বৈ ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন মহীম্॥"[৪]

'ইহাঁরা সদসদাত্মক সম্পূর্ণ বিশ্বকে আপনা হইতে অভিন্ন ভগবদ্রূপ দর্শন করত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন।'

কবি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী এবং অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ মহাভাগবতগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভাগবতধর্মের অধ্যাত্মতত্ত্বের উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে উহা অদ্বৈতবাদই।

(২) পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ বা শেষ, মহর্ষি মৈত্রেয়ের মতে, 'ভাগবতপুরাণে'র আদি উপদেষ্টা।[৫] শুকদেব তাঁহাকে "সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ" বলিয়াছেন।[৬] অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণই ভাগবতধর্মের উপদেষ্টা।[৭] কথিত আছে যে দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে সাধন করিয়া শূরসেন দেশের রাজা চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করেন। চিত্রকেতু তখন সেই দেবের স্তুতি করেন।[৮] তাহাতে প্রসন্ন হইয়া সঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে বলেন যে পূর্বে মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে (চিত্রকেতুকে) যে উপদেশ দিয়াছেন (পরে বিবৃত) তাহা তাঁহারই (সঙ্কর্ষণেরই) "অনুশাসন"।[৯] অনন্তর তিনি বলেন,[১০]—

"আমিই ভূতভাবন (অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপাদক), ভূতাত্মা এবং সর্বভূত। শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম—উভয়েই আমার শাশ্বতী তনু॥৫১॥

"জগৎপ্রপঞ্চে আত্মা ব্যাপ্ত এবং আত্মায় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত। এবং উভয়ই আমা দ্বারা ব্যাপ্ত। উভয়ই আমাতে কৃত (অর্থাৎ কল্পিত বা অধ্যস্ত)॥৫২॥

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২।৪৫ ২) ঐ, ১১।২।৫১ ৩) ঐ, ১১।৩।২৫
৪) ঐ, ১১।২।২২ ৫) পূর্বে দেখ ৬) (বিষ্ণু)ভাগ, ৬।১৬।৩৩·২
৭) "যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবন্তম্"—(ঐ, ৬।১৬।৪০·১).
"যথা হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ"—(ঐ, ১৬।১৬।৪৩·১)
৮) ঐ, ৬।১৬।৩৪—৪৮ ৯) ঐ, ৬।১৬।৫০ ১০) (বিষ্ণু)ভাগ, ৬।১৬।৫১—৬৪

"যেমন নিদ্রিত পুরুষ স্বপ্নে (স্বপ্নান্তরে) সমস্ত বিশ্বকে আপনার মধ্যে দেখে এবং সেই স্বপ্ন হইতে জাগিয়া আপনাকে বিশ্বের একস্থানে দেখে, আত্মার জীবভাবগত জাগ্রদাদিও সেই প্রকার মায়ামাত্র ('মায়ামাত্রাণি') বলিয়া জানিয়া উহাদের দ্রষ্টাকে উহাদের হইতে ভিন্ন পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করিও। যদ্দেতু প্রসুপ্ত পুরুষ আপন সুষুপ্তিকে এবং তৎকালীন সুখকে জানে, আত্মাকে তথা আমাকে সেই নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিও ॥৫৩-৫॥[1]

"(যে জ্ঞান) সুষুপ্তি এবং জাগৃতি এই উভয় অবস্থার স্মরণকারী পুরুষের অনুগত, (পরন্তু যাহা বস্তুতঃ) উহাদের ব্যতিরিক্ত, সেই জ্ঞানই পরব্রহ্ম ॥৫৬॥

"পুরুষ যে আপন এই মদ্ভাব (অর্থাৎ পরব্রহ্মভাব) বিস্মৃত হয়, এবং আপনাকে (ব্রহ্ম হইতে) ভিন্ন মনে করে, তাহাতে সংসারগ্রস্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥৫৭॥[2]

"জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে আত্মাকে জানে না, সে কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না"॥৫৮॥

* * * * *

"এতাবানেব মনুজৈর্যোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ।
স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎপরাত্মৈকদর্শনম্"॥৬৩॥

'পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার একত্ববোধই একমাত্র স্বার্থ বা পরমার্থ। যোগমার্গে নিপুণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের তাহা সর্বপ্রকারে জানা উচিৎ।"

তৎপূর্বে মহর্ষি অঙ্গিরা পুত্রশোকার্ত চিত্রকেতুকে যে "পরজ্ঞান"[3] উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই,—[4] "এখন তুমি স্বয়ং পুত্রবান্‌দিগের তাপ অনুভব করিয়াছ। স্ত্রী, গৃহ, ধন বিবিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্, শব্দাদি বিষয়সমূহ, রাজৈশ্বর্য্য, পৃথিবী; রাজ্য, বল, কোশ, ভৃত্য, অমাত্য, মিত্র, প্রভৃতি সকলই, হে শূরসেন, এই প্রকার চঞ্চল এবং সকলই শোক, মোহ, ভয় ও ক্লেশ দায়ক।

"গন্ধর্বনগরপ্রখ্যা স্বপ্নমায়ামনোরথাঃ॥
দৃশ্যমানা বিনাঽর্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ।
কর্মভির্ধ্যায়তো নানাকর্মাণি মনসোঽভবন্॥
অয়ং হি দেহিনো দেহো দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।
দেহিনো বিবিধক্লেশসন্তাপকৃদুদাহৃতঃ॥
তস্মাৎস্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রব্ধং ত্যজোপশমমাবিশ॥"[5]

---

[1] "যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ॥
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ॥
যেন প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ স্বাপং বেদাত্মনস্তদা।
সুখং চ নির্গুণং ব্রহ্ম তমাত্মানমবেহি মাম্॥"—(ঐ, ৬।১৬।৫৩—৫)

[2] "যদেতদ্বিস্মৃতং পুংসো মদ্ভাবং ভিন্নমাত্মনঃ।
ততঃ সংসার এতস্য দেহাদ্দেহো মৃতের্মৃতিঃ॥"—(ঐ, ১৬।১৬।৫৭)

[3] (বিষ্ণু)ভাগ, ৬।১৫।২০·১ [4] ঐ, ৬।১৫।২১— [5] ঐ, ৬।১৫।২৩·২—২৬

"উহারা গন্ধর্বনগর, স্বপ্ন, মায়া বা মনোরথ মাত্র। উহারা বস্তুতঃ না থাকিয়াও দৃশ্যমান হয়; আবার (কালান্তরে) দেখা যায় না। উহার মনঃকল্পনা-জাত। কর্মবাসনাযুক্ত মন হইতেই নানা কর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। দেহীর এই দেহ (পঞ্চভূতাত্মক) দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক। উহা বিবিধ ক্লেশ ও সন্তাপ প্রদানকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি শুদ্ধ চিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার পূর্বক এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চে ধ্রুবত্ব এবং বাস্তবত্ব (অর্থাৎ সত্যত্ব) বিশ্বাস পরিত্যাগ করত উপশম প্রাপ্ত হও।"

অনন্তর দেবর্ষি নারদ চিত্রকেতুকে সঙ্কর্ষণের "মন্ত্রোপনিষৎ" বা "বিদ্যা" উপদেশ করেন। উহার সারমর্ম এই,—এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে এবং ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, স্থিত এবং লয় হয়। যেমন মৃন্ময় ঘটাদিতে মৃত্তিকা, তেমন জগৎপ্রপঞ্চে ব্রহ্ম অবস্থিত।[1] ব্রহ্ম বিশ্বমূর্তি।[2] ব্রহ্ম ব্যোমবৎ সর্ববস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে বিতত হইলেও মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং জানে না।[3] তাঁহাকে না পাইয়া বাণী মনের সহিত উপরত হইয়া যায়। তিনি সৎ ও অসতের পর (অর্থাৎ কার্যকারণাতীত)। তিনি নামরূপ রহিত এক এবং চিন্মাত্র।[4] তিনি বিজ্ঞানমাত্র, পরমানন্দস্বরূপ, আত্মারাম, শান্ত এবং নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহাতে দ্বৈতদৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া যায়)।[5] তাঁহার স্বরূপানন্দ অনুভূতি দ্বারা (মায়া) শক্তির উর্মিসমূহ পরিত্যক্ত হয়।[6] তাঁহার চৈতন্যাংশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্ব স্ব কার্যসমূহে প্রধাবিত হয়। যেমন অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত না হইলে লৌহ হস্তাদি দগ্ধ করিতে পারে না, তেমন তাঁহাকে বিনা ঐ সকল কিছুই করিতে পারে না। জাগ্রদাদি অবস্থার সাক্ষীরূপে তাঁহারই জীব-সংজ্ঞা হয়।[7] নারদ আরও বলেন যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেবের শরণ গ্রহণ করত পূর্বে অনেকে এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতভ্রমকে ("ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং") পরিত্যাগ করত সদ্য তাঁহার অতুলনীয় অধিক মহিমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।[8]

যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সঙ্কর্ষণের নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে অঙ্গিরা এবং নারদ চিত্রকেতুকে যে উপদেশ দেন তাহা তাঁহারই "অনুশাসন", সুতরাং তাঁহার ভাগবতধর্ম-সম্মত। উপরের বিবরণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ভাগবতধর্মের আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদই। সৃষ্টি বিষয়ে সঙ্কর্ষণের এবং নারদের উক্তি হইতে, বিশেষতঃ নারদ-কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্তিকার ও মৃন্ময় ঘটাদির দৃষ্টান্ত হইতে, মনে হয় বটে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, সুতরাং সত্য। পরন্তু ঐ প্রকার বলা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে। কেননা, সঙ্কর্ষণ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ এবং জীব ও ব্রহ্ম একই, আর নারদ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ ভ্রমমাত্র এবং ব্রহ্ম নিবৃত্ত-দ্বৈতদৃষ্টি। তাহাতে নিরূপণ করিতে হয় যে তাঁহারা ভিন্ন অভিপ্রায়েই সাধারণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বা বুদ্ধ্যারোহার্থই, ব্রহ্মপরিণামবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সঙ্কর্ষণদেবের স্তুতিতে রাজা চিত্রকেতু বলিয়াছেন, সঙ্কর্ষণ জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্গুণ, আর জীবের সমস্ত দ্বন্দ্বজালসমূহ সত্ত্বাদি গুণসমূহজনিত, সুতরাং

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১৬।১৬।২২
২) ঐ, ৬।১৬।২০·২
৩) ঐ, ৬।১৬।২৩
৪) ঐ, ৬।১৬।২১
৫) ঐ, ৬।১৬।১৯
৬) ঐ, ৬।১৬।২০·১
৭) ঐ, ৬।১৬।২৪
৮) ঐ, ৬।১৫।২৮

সঙ্কর্ষণে চিত্ত নিহিত হইলে সমস্ত বিষয়বাসনা ভৃষ্টবীজবৎ নিরঙ্কুর হইয়া যায়।[১] ভাগবতধর্মে অপর ধর্মের ন্যায়, আমি, তুমি, আমার, তোমার—এই প্রকার ভেদবুদ্ধি নাই। ঐ প্রকার ভেদবুদ্ধিতে রচিত ধর্ম অবিশুদ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু, এবং অধর্মবহুল।[২] ভাগবতধর্মী আর্য্যগণের চরাচর সমস্ত প্রাণীতে অভেদজ্ঞান হয়।[৩] ভেদদৃষ্টিবান্ ব্যক্তিগণ ভগবানের পরমতত্ত্বকে জানিতে পারে না।[৪]

(৩) "মহাভাগবত" প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে জ্ঞান এবং "ভাগবত ধর্মসমূহে"র উপদেশ করেন।[৫] তিনি বলেন, ভগবান্ অচ্যুত সর্বভূতের আত্মা এবং সর্বত্র বিরাজমান।[৬] "ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত পরাবর সর্বভূতে, মহাভূতসমূহে, উহাদের বিকারজ বস্তুসমূহ, (সত্ত্বাদি) গুণসমূহে, গুণসাম্যে (বা প্রকৃতিতে) এবং গুণব্যতিকরে (অর্থাৎ প্রাকৃত প্রপঞ্চে) একই অব্যয় পরমাত্মা, ভগবান্ বা ঈশ্বর (বর্তমান)। তিনি স্বয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপে এবং দৃশ্য(প্রপঞ্চ)রূপে (আছেন)। তিনি অনির্দেশ্য এবং অবিকল্পিত, তথাপি ব্যাপ্যব্যাপকনির্দেশ্য (অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে)।[৭] পরমেশ্বর কেবলানুভবানন্দস্বরূপ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য (অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপ) গুণসর্গ মায়া দ্বারা ("মায়য়া······গুণসর্গয়া) আচ্ছাদিত। (তাহার নিবৃত্তি হইলেই) উহার প্রাপ্তি হয়।[৮] ইহসংসারে ধর্মাদি সমস্তই গুণব্যতিকরহেতু জীব স্বতঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, পরন্তু মোক্ষ অগুণ।[৯] "জন্মাদি ছয় ভাববিকার দেহেরই হইয়া থাকে, আত্মার নহে। যে প্রকার বৃক্ষে বর্তমান থাকিতেই ফলের ঐ সকল বিকার দেখা যায়, সেই প্রকার আত্মা থাকিতেই শরীরের ঐ প্রকার বিকার ঈশ্বরের মূর্তি কাল দ্বারা হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, (সকলের) আশ্রয়, নির্বিকার, স্বয়ংপ্রকাশ, (সকলের) কারণ, ব্যাপক, অসঙ্গ ও অনাবৃত (অর্থাৎ অন্তর-বাহির-রহিত)। এই দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক বলিয়া জানিয়া উহাদিগেতে অহন্তামমতারূপ মোহজ অসদ্ভাব পরিত্যাগ করা বিদ্বানের উচিৎ। উপায়কৌশল স্বর্ণকার যেমন যথোচিৎ উপায় দ্বারা পাথর হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশিত করে, সেই প্রকার অধ্যাত্মবিদ্ পুরুষ আত্মযোগ দ্বারা দেহসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া ব্রহ্মগতি লাভ করে। আচার্য্যগণ বলেন, প্রকৃতি আট (=প্রধান, মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র), উহার গুণ তিন (=সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ) এবং বিকার ষোল (=এগার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত), পরন্তু ঐ সকলে সমন্বিত পুরুষ একই। ঐ সকলের সঙ্ঘাতকে দেহ বলা হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দেহ দ্বিবিধ। 'নেতি, নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) ইত্যাদি প্রকারে সমস্ত অনাত্ম বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া এই দেহমধ্য হইতে পুরুষকে (বা আত্মাকে) অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সর্গ, স্থিতি ও প্রলয়ের স্বরূপ নির্ণায়ক বেদবাক্যসমূহের সাহায্যে সূক্ষ্ম বিবেক বিচার দ্বারা খুঁজিয়া লওয়া উচিৎ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বুদ্ধিরই। ঐ অবস্থাত্রয়কে যে জানে এবং যে উহাদের অধ্যক্ষ, সুতরাং উহাদের হইতে ভিন্ন,

---

[১] (বিষ্ণু) ভাগ, ৬।১৬।৩৯

[২] ঐ, ৬।১৬।৪১

[৩] ঐ, ৬।১৬।৪৩·২

[৪] ঐ, ৬।১৬।৪৭·২

[৫] ঐ, ৭।৬।১·১

[৬] ঐ, ৭।৬।১৯

[৭] ঐ, ৭।৬।২০—

[৮] (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৬।২০-৩

[৯] ঐ, ৭।৬।২৫

সেই আত্মা। যেমন ফুলের সুগন্ধি উহাব আশ্রয় বায়ু হইতে ভিন্ন, সেইরূপ বুদ্ধির ঐ কর্মজনিত ত্রিগুণাত্মক অবস্থাত্রয়ের জ্ঞাতা ও সাক্ষী আত্মা উহাদের হইতে ভিন্ন ; এবম্প্রকার বিচার দ্বারা আত্মার স্বরূপ নিরূপণ কর্তব্য।

‘এতদ্দ্বারো হি সংসারো গুণকর্মনিবন্ধনঃ।
অজ্ঞানমূলোঽপার্থোঽপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবেষ্যতে॥”[১]

‘এই বুদ্ধিই সংসারের দ্বার। কেননা, বুদ্ধির গুণ এবং কর্ম হেতুই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। উহা অজ্ঞানমূলক। উহা অপার্থ হইলেও স্বপ্নের ন্যায় পুরুষের প্রতীতিগোচর।”[২] পরে তিনি আরও বলেন, “দেহী আত্মানুবর্তী দেহ দ্বারা কর্মসমূহ করে এবং কর্মসমূহ হেতু (পুনঃ) শরীর ধারণ করে। পরন্তু তদুভয়ই (অর্থাৎ কর্ম ও শরীর) অবিবেকতঃ (ধারণ করিয়া থাকে)।”[৩]

“সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ।
ভূতৈর্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ॥”[৪]

“হরি স্বকৃত মহাভূতাদির দ্বারা কৃত সমস্ত প্রাণীরই জীবসংজ্ঞিত আত্মা, ঈশ্বর এবং প্রিয়।’ পরমেশ্বর ভগবান্ হরি সর্বভূতাত্মা।[৫] তিনি সমানভাবে সমস্ত দেহীরই নিজ নিজ আত্মা ও সখা।[৬]

এইরূপে প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন তাহার সারমর্ম সংক্ষেপে এই,—

(১) আত্মা বিভু (“ব্যাপকঃ”, “অনাবৃতঃ”)
(২) আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন।
(৩) দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অজ্ঞানমূলক (“মোহজং”, অবিবেকতঃ”)।
(৪) সমস্ত দেহে একই আত্মা অবস্থিত। (“ক্ষেত্রেষু দেহেষু” ইত্যাদি)। সুতরাং দেহের বহুত্ব হেতুই জীব বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে জীব একই।
(৫) আত্মা হরিই। হরিই স্বকৃত পঞ্চমহাভূত দ্বারা শরীরসমূহ নির্মাণ করত তাহাতে জীব বা আত্মা রূপে অবস্থিত আছেন।
(৬) জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত হরিই। কেননা, তিনিই প্রত্যগাত্মস্বরূপে ও দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা বিষয়ী ও বিষয় রূপে অবস্থিত আছেন।
(৭) জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতপক্ষে অবস্তু ;[৭] উহা স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক মাত্র।
(৮) জগৎ অজ্ঞানমূলক অর্থাৎ জগৎ প্রকৃতপক্ষে অবস্তু হইলেও অনাদি অবিদ্যা বশতঃই স্বপ্নবৎ প্রতীতিগোচর হইতেছে।
(৯) হরি কেবলানুভবানন্দস্বরূপ। পরন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ গুণসর্গাত্মক মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত।

---

[১] (বিষ্ণু) ভাগ, ৭।৭।২৭ [২] ঐ, ৭।৭।১৮-২৭
[৩] ঐ, ৭।৭।৪৭ [৪] ঐ, ৭।৭।৪৯ [৫] ঐ, ৭।৭।৪৮,৫৩ [৬] ঐ, ৭।৭।৩৮·২ ; ৭।৯।২৭·১
[৭] মূলে আছে “অপার্থ”। টীকাকার শ্রীধরের মতে উহার অর্থ “মিথ্যাভূত”।

(১০) হরির প্রকৃত স্বরূপ অনির্দেশ্য এবং সর্ববিকল্পাতীত। তথাপি ব্যাপ্য ও ব্যাপক রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

ইহা অদ্বৈতজ্ঞানই। ইহার একমাত্র ত্রুটি এই যে এইখানে স্পষ্ট নির্দেশিত হয় নাই যে ব্রহ্ম বা হরির প্রকৃত স্বরূপ নির্গুণ ও নির্বিশেষ। তবে মুক্তিকে "অধোক্ষজালম্ভ" (অর্থাৎ 'ভগবদুপলব্ধি'), "ব্রহ্মনির্বাণ" এবং "অগুণ" বলাতে[1] প্রকারান্তরে বলা হয় যে ব্রহ্ম নির্গুণই। যাহা হউক পরে ভগবান্ নৃসিংহের স্তুতিতে প্রহ্লাদ স্পষ্টতঃ তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিঞ্চিৎপরে তাহার উল্লেখ করিব। //

ধর্ম সম্বন্ধে প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলেন, যেহেতু সংসার অজ্ঞানমূলক, বুদ্ধির গুণ ও কর্ম নিবন্ধন, অপার্থ এবং স্বপ্নবৎ,

> "তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্তব্যং কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
> বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ॥
> তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
> যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ॥[2]

'সেইহেতু, ত্রিগুণাত্মক কর্মসমূহের বীজ বিনাশ এবং বুদ্ধির প্রবাহরূপ সংসারের উপরমরূপ যোগ তোমাদের কর্তব্য। তাহার সহস্র উপায়সমূহের মধ্যে ভগবান্ ঈশ্বরে রতি (রূপ উপায়ই) ভগবান্ (নারায়ণ ঋষি)[3] কর্তৃক কথিত হইয়াছে। এবং যে সকল উপায়ে তাহা শীঘ্র এবং যথার্থরূপে লাভ হয় তাহাও তিনি বলিয়াছেন। যথা, ভক্তি সহকারে গুরু শুশ্রূষা, সর্বপ্রাপ্তবস্তু ঈশ্বরে অর্পণ, সাধু ভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ ও কর্মসমূহের কীর্তন, তাঁহার চরণকমলের ধ্যান, তাঁহার লিঙ্গের দর্শন পূজনাদি; এবং ভগবান্ ঈশ্বর হরি সর্বভূতে বর্তমান—এই ভাবনাতে মনে মনে সর্বভূতের প্রতি সম্মান এবং তাহাদের কামনাসমূহের পরিপূরণ। যে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই) ছয়কে জয় করিয়া এই প্রকারে ঈশ্বরে ভক্তি করে, সে ভগবান্ বাসুদেবে রতি সম্যক্ লাভ করে।[4] প্রহ্লাদ আরও বলেন, দেবত্ব, ঋষিত্ব, দ্বিজত্ব, সদাচার, বহুজ্ঞতা, দান, তপ, যজ্ঞ, শৌচ কিম্বা ব্রতসমূহ কিছুই ভগবানকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ নহে; তিনি একমাত্র অমল ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন; অপর সমস্ত বিড়ম্বনামাত্র।[5] "অতএব, হে দানবগণ, সর্বজীবকে আপনারই সমান দর্শন করিয়া ('আত্মোপম্যেন' সর্বত্র') সর্বভূতাত্মা ঈশ্বর ভগবান্ হরিতে ভক্তি কর।"[6]

> "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
> একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্"[7]

'সর্বত্র তাঁহাকে দর্শন রূপ গোবিন্দে একান্তভক্তিই ইহসংসারে জীবের পরম স্বার্থ বলিয়া স্মৃত

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৬।২৫ ও ৭।৭।৩৭ দেখ। ২) ঐ, ৭।৭।২৮-৯

৩) এইখানে উক্ত 'ভগবান্' 'ভগবান্ নারায়ণ ঋষিই', অপর কেহ নহেন। পরের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়।

৪) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৭।৩০-৫ ৫) ঐ, ৭।৭।৫১-২; আরও দেখ—৭।৯।৯ ৬) ঐ, ৭।৭।৫৩

৭) ঐ, ৭।৭।৫৫

হয়।' যেহেতু সমস্তই ব্রহ্ম, সর্বত্র একই আত্মা অবস্থিত আছে, সেই হেতু আপন ও পর রূপ ভেদভাব অজ্ঞান, তাহা অতি নিন্দনীয়।[১] সর্বভূতে দয়া এবং সৌহৃদ্য করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হন।[২] ভগবৎশরণই জীবের পরম পুরুষার্থ।[৩] অপর যাহা কিছু তৎসমস্তই যদি আপন পরম সুহৃদ পরম পুরুষে স্বাত্মসমর্পণের সহায় হয়, তবে সার্থক, অন্যথা বৃথা।[৪]

> "অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
>
> শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্।
>
> তদ্ব্রহ্মনির্বাণসুখং বিদুর্বুধা—
>
> স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্॥"[৫]

'ইহলোকে ভগবানের উপলব্ধিই অশুদ্ধচিত্ত প্রাণিগণের জন্মমরণচক্র-বিনাশক। পণ্ডিতগণ উহাকে ব্রহ্মনির্বাণানন্দ বলেন। সেইহেতু, (হে দৈত্যবালকগণ! আপন) হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরকে ভজন কর।'

প্রহ্লাদ বলেন, "এই অমল এবং দুর্লভ জ্ঞান (ঋষি) নরের সখা (ঋষি) নারায়ণ নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহা প্রসিদ্ধ আছে। বিজ্ঞানসংযুক্ত এই জ্ঞান,—এই শুদ্ধ ভাগবতধর্ম, আমি পূর্বে দেবদর্শন নারদ হইতে শুনিয়াছিলাম।"[৬] তারপর প্রহ্লাদ আরও বিস্তার পূর্বক বলেন যে তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা দৈবগ্রস্ত হইয়া কিছুকাল দেবর্ষি নারদের আশ্রমে বাস করেন। ঐ গর্ভবতী সতী তখন পরমভক্তি সহকারে ঋষির সেবা করেন। তখন পরমকারুণিক এবং সর্বসমর্থ ঋষি প্রহ্লাদকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার মাতাকে ধর্মের তত্ত্ব এবং নির্মল জ্ঞান উভয়ই উপদেশ করিয়াছিলেন।[৭] এই উক্তিদ্বয় হইতে ইহা নিঃসন্ধিগ্ধরূপে জানা যায় যে,—অন্ততঃ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'কার ইহা মনে করেন যে, ভাগবতধর্মের প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষি এবং উহার মূল দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান অদ্বৈতবাদই।

এবার আমরা প্রহ্লাদ-কৃত ভগবান্ নৃসিংহের স্তুতিতে নিহিত দার্শনিকতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। কেননা, প্রহ্লাদের নিজ স্বীকারোক্তি মতে,[৮] ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট পাইয়াছিলেন। সুতরাং উহাও মূলতঃ ভাগবতধর্মসম্মতই। সেইহেতু, ঐ নৃসিংহ-স্তুতির দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা হইতে ভাগবতধর্মের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

নৃসিংহস্তুতিতে প্রহ্লাদ প্রথমে বলিয়াছেন যে জগৎ ব্রহ্মের রূপ,—জগৎ ব্রহ্মই। জগতের দুই অবস্থা,—এক ব্যক্ত, মূর্ত বা কার্য্য অবস্থা, অপর অব্যক্ত, অমূর্ত বা কারণ অবস্থা। সুতরাং

---

১) (বিষ্ণু) ভাগ, ৭।৬।১৬'২ ;

২) ঐ, ৭।৬।২৪ ৩) ঐ, ৭।৬।২ ৪) ঐ, ৭।৬।২৬ ৫) ঐ, ৭।৭।৩৭

৬) ঐ, ৭।৬।২৭-৮ ৭) ঐ, ৭।৭।১৫ ; প্রহ্লাদের আখ্যান দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করেন। উপসংহারে তিনি বলেন,

> "ধর্মো ভাগবতানাং চ ভগবান্ যেন গম্যতে।
>
> আখ্যানেঽস্মিন্ সমাম্নাতমাধ্যাত্মিকমশেষতঃ॥"—(৭।১০।৪৫)

৮) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৯।২৮-৯

জগদাত্মক ব্রহ্মেরও ঐ প্রকার দুই অবস্থা আছে। এই বিষয়ে তাঁহার মূল যুক্তি এই,—পৃথক্ স্বভাব, পর কিম্বা অপর, যে দ্রব্য ("ভাবঃ"), সঞ্চোদিত হইয়া, যাহাতে, যাহা হইতে, যে প্রকারে (অর্থাৎ করণদ্বারা), যাহার, যাহার হেতু এবং যাহার জন্য আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, পুনঃ যিনি যাহা যে প্রকারে (ইচ্ছা সেই প্রকারে) আবির্ভূত ও তিরোভূত করেন, সেই দ্রব্য তাহার স্বরূপ।[১] অথবা, সংক্ষেপে বলিতে যাহা (যে বস্তু) যাহার ঈক্ষণ (এবং তজ্জনিত) জন্ম, স্থিতি ও লয় তাহা (সে বস্তু) নিশ্চয় তাহাই। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত বৃক্ষ ও বীজ। উভয়ে এক পৃথিবীরই অবস্থাভেদ মাত্র।[২] এই যুক্তিতে বলিতে হয় যে জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই; কেননা, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "এই (ব্যক্ত) এবং ঐ (অব্যক্ত) জগৎ একমাত্র তুমিই; কেননা, তুমিই ইহার আদি ও অন্তে এবং মধ্যে পৃথক্‌রূপে (আদি ও অন্তে অব্যক্তরূপে এবং মধ্যে ব্যক্তরূপে) প্রতীত হইতেছ। নিজ মায়া দ্বারা এই গুণব্যতিকরকে সৃষ্টি করতঃ তুমি তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাদের দ্বারা (অর্থাৎ তত্তৎ উপাধি যোগে) নানার ন্যায় অবভাসিত হইতেছ ('নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ')।"[৩]

"ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।'[৪]

হে ঈশ! এই সৎ (ব্যক্ত) এবং অসৎ (অব্যক্ত) জগৎ তুমিই; অথবা তুমি ইহা হইতে ভিন্ন; কেননা, মায়া,—যাহা এই আত্ম-পর (ভেদ) বুদ্ধিরূপা তাহা—অপার্থ (অর্থাৎ অসদ্বস্তু বা মিথ্যা-বস্তু)।' প্রকারান্তরে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন যে সৃষ্টিতে ভগবানের জাগ্রদবস্থা এবং প্রলয়ে তাঁহার সুষুপ্তি অবস্থা। প্রলয়ে এই নিখিল প্রপঞ্চকে আপনার মধ্যে বিলীন করতঃ তিনি যোগ দ্বারা চক্ষু নিমীলিত করিয়া নিস্পৃহ হইয়া নিজে নিজ সুখ অনুভব করতঃ প্রলয়জলে শয়ান থাকেন।[৫] প্রলয়ান্তে তিনি যোগনিদ্রারূপ সমাধি পরিত্যাগ করতঃ নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতির ধর্মসমূহকে সঞ্চোদিত করেন। তখন তাঁহাতে অন্তর্নিহিত এই জগৎপ্রপঞ্চরূপ মহাপদ্ম, ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায়, তাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন হইল। যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ আর থাকে না, তেমন কার্য্যজগৎ উৎপন্ন হওয়ার পর ব্রহ্মের কারণভাব রহিল না। তখন ব্রহ্ম পৃথিবীতে ব্যাপ্ত অতি সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্রার ন্যায়, ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময় জগৎপ্রপঞ্চে অতিসূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত থাকেন। তিনি সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র শির, সহস্র হাত, উরু, নাসিকা, মুখ, কর্ণ, নয়ন, আভূষণ এবং আয়ুধ সম্পন্ন হন। উহাই তাঁহার "সদুপলক্ষিতসন্নিবেশ" (অর্থাৎ কার্যজগদ্রূপ-অবয়ব-বিশিষ্ট) "মায়াময় মহাপুরুষ" রূপ।[৬] এইরূপে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের শরীর।[৭]

জীব "অজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ" (অর্থাৎ মায়া দ্বারা গুণসৃষ্টি রূপ সংসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে)।[৮]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৯।২০

২) ঐ, ৭।৯।৩১'২ ৩) ঐ, ৭।৯।৩০

৪) ঐ, ৭।৯।৩১'১ ৫) ঐ, ৭।৯।৩২—৩

৬) ঐ, ৭।৯।৩৩—৬ ৭) ঐ, ৭।৯।৩২'২

৮) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৯।১২'২; আর দেখ—"চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে নিপীড্যমানং"—(ঐ, ৭।৯।২২'২)

"মায়া মনঃ সৃজতি কর্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেত্ত্বদন্যঃ ॥"[1]

'কালে যাহার গুণসমূহ ক্ষুভিত হইয়া থাকে সেই মায়া পুরুষের অনুমত (অর্থাৎ সংস্কারবেগ রূপ অনুমতি) হেতু বলবান্ এবং কর্মময় মন সৃষ্টি করে। যাহাতে মায়া দ্বারা ষোল (বিকার রূপ) অর অর্পিত হইয়াছে সেই ছন্দোময়[2] (মনরূপ) সংসারচক্রকে, হে অজ! তুমি ভিন্ন অথবা ভিন্ন কে অতিক্রম করিতে পারে?

এই জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি অবস্থা অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-ভাব ব্রহ্মের পরম রূপ নহে। সুষুপ্তি বা কারণ রূপ হইতে ভিন্ন এবং তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের অপর এক অবস্থা বা রূপ আছে, যাহা জাগ্রদাদি অপেক্ষায় তুরীয় অবস্থা বা রূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"আত্মনিপীতনিদ্রস্তুর্য্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্‌ক্ষে ॥"[3]

পরন্তু স্বস্বরূপে তোমার দ্বারা নিদ্রা নিঃশেষে পীত। (যখন সেই) তুরীয়াবস্থায় স্থিত (থাক) তখন তুমি তম (অর্থাৎ অবিদ্যা) এবং গুণসমূহ আপনাতে যুক্ত কর না।' তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ সুষুপ্তি বা কারণভাব যুক্ত নহে। তাহাতে অবিদ্যা নাই; সত্ত্বাদি গুণসমূহ নাই; সুতরাং গুণসাম্যরূপা প্রকৃতি নাই, গুণসর্গাত্মক বা গুণসর্গকারী মায়া নাই এবং গুণব্যতিকর রূপ মহদাদি জগৎপ্রপঞ্চ নাই।

এখন প্রশ্ন হয়,—ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ নির্গুণ, মায়াতীত এবং কার্য্য-কারণাতীতই হয়,—অপর কথায় বলিলে, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় যদি অসত্যই হয়, তবে শাস্ত্রে উহাদের সত্যবৎ বিবৃতি কেন করা হয়? প্রহ্লাদ কেন পূর্বে সগুণ, মায়াবান্ এবং কার্য্যকারণাত্মকরূপে ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ নৃসিংহস্তুতিতে প্রহ্লাদ নিজেই পরে ঐ প্রকার শঙ্কার উত্তর দিয়াছেন।

"রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তা সমক্ষমুভয়ত্র বিচিন্বতে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥[4]

'অরূপ তোমার বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় সৎ ও অসৎ (অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ)—এই দুই রূপ বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন (কেননা, তদুভয় ব্যতীত তোমাকে জানিবার) অপর কোন (সাধন) নাই; অথবা, অন্য কোন প্রকারে নহে। যোগীগণ যোগ দ্বারা, কাষ্ঠসমূহে নিহিত অগ্নির ন্যায়, তদুভয়ত্র নিহিত তোমাকে সাক্ষাৎকার করেন। (তদুভয় তোমাতে ব্যতীত) অন্যত্র নহে।'

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৯।২১

২) 'ছান্দোময়' অর্থ, শ্রীধ'রের মতে 'বেদোক্তকর্মপ্রধান'। উহার অর্থ 'শৃঙ্খলাময়'ও হইতে পারে। জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় শৃঙ্খলা যুক্ত। আবার প্রত্যেক স্থিতিতে জগদ্ব্যাপারে শৃঙ্খলা দেখা যায়।

৩) ঐ, ৭।৯।৩২'২ ৪) ঐ, ৭।৯।৪৭

"হে ভূমন্! তুমিই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, (পঞ্চ) তন্মাত্রা, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। সগুণ এবং নির্গুণ সমস্তই নিশ্চয় তুমিই। অধিক কি, মন ও বাণী গম্য যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটাই তোমা হইতে ভিন্ন নহে। পরন্তু, হে মহাকীর্তি! এই গুণসমূহ মহদাদি গুণবিকার এবং দেবতা মনুষ্যাদিসহ মন প্রভৃতি তোমাকে (যথার্থতঃ) জানে না। (কেননা, উহারা) সকলেই আদি-অন্ত-যুক্ত (আর তুমি উহাদের উৎপত্তির পূর্বে, তথা বিনাশের পরে, বর্তমান থাক)। সুধিগণ তোমাকে এই প্রকার জানিয়া শব্দ হইতে উপরত হন (অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করেন)।[১]

(iii) 'গর্গসংহিতা' মতে

'গর্গসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি অগস্ত্য ভগবান্ কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে "ভাগবত-জ্ঞান" উপদেশ করেন।[২] প্রদ্যুম্ন অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "পরন্তু দৃশ্য পদার্থ জগৎ (সত্য না হইয়াও) কি প্রকারে সত্যবৎ বর্তমান আছে। এই জীব ব্রহ্মাংশক এবং মুক্ত হইয়াও কি প্রকারে গুণসমূহ দ্বারা বদ্ধ হয়?"[৩] তাহাতে মহর্ষি উত্তর করেন,

"যথা সত্যস্য সূর্য্যস্য বিম্বং বারিষু সত্যবৎ।
দৃশ্যতে সত্যবদ্দৃশ্য প্রধানপরয়োস্তথা॥
কাচে মুখং গুণে সর্পং সৈকতে জীবনং যথা।
তথাঽয়ং সন্ দেহগুণৈর্বধ্যতে প্রেক্ষ্য তাং স্বয়ম্॥"[৪]

যেমন জলরাশিতে সত্য সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমন প্রধানে (বা মায়াতে) সত্য পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপ এই দৃশ্যজগৎ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন দর্পণে মুখ, রজ্জুতে সর্প এবং উত্তপ্ত মরুভূমিতে জল, তেমন ব্রহ্মে এই জীব, (তথা দৃশ্যপ্রপঞ্চ জগৎ)। যেমন লোক দর্পণে আপন মুখ দেখিয়া মোহবশত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া তাহা হইতে ভীত হয় এবং মরুভূমিকে জল মনে করিয়া তৎপ্রতি গমন করে, তেমন এই জীব ব্রহ্মে দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখিয়া স্বয়ং দেহগুণসমূহ দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়া থাকে। তখন প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করেন, জীব কি প্রকারে,—কোন্ উপায়ে বন্ধনগ্রস্ত হয় না?[৫] অগস্ত্য বলেন,

"বিবেকং যঃ সমাশ্রিত্য ভজেদ্ব্রহ্ম সনাতনম্।
মনোময়ং জগন্মত্বা স ব্রজেৎ পরমং পদম্॥"[৬]

যে বিবেককে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করতঃ জগৎকে মনোময় মনে করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে ভজন করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।' তিনি আরও বলেন যে, "আত্মা নিরীহ, অতনু, সর্বতঃ, অনহঙ্কৃতি, শুদ্ধ, গুণাশ্রয়, সাক্ষাৎ পর, নিষ্কল, আত্মদৃক্, জ্ঞানস্বরূপ এবং সদা পূর্ণ। মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে জানেন। সেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে জানিয়া জীব সুখী হইয়া বিচরণ করিবেন।"[৭] সত্বাদি গুণসমূহ প্রকৃতির, আত্মার নহে। যেমন পট সূত্র দ্বারা ওতপ্রোত, তেমন উহাদের

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৯।৪৮—৯
২) 'গর্গসংহিতা', ৭।১২।৫০-১ ৩) ঐ, ৭।১২।১৪
৪) ঐ, ৭।১২।১৮—৯ ৫) ঐ, ৭।১২।২০ ৬) ঐ, ৭।১২।২১
৭) ঐ, ৭।১২।২৩—৪

দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত।[১] পরমাত্মা ঐ গুণসমূহের, সুতরাং প্রকৃতির আশ্রয় হইলেও, উহাদের দ্বারা লিপ্ত হন না।

"নভোঽগ্নিপবনাঃ কোষ্ঠকাষ্ঠপ্রোদ্গতরেণুভিঃ।
ন সজ্জতে গুণৈর্ব্রহ্ম বর্ণৈশ্চ স্ফটিকো যথা॥"[২]

আকাশ সর্ববস্তুর অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, পরন্তু ঐ সকল বস্তুর দোষ কিম্বা গুণ দ্বারা লিপ্ত হয় না। অগ্নি উহার আশ্রয় কাষ্ঠের দোষ গুণ দ্বারা লিপ্ত হয় না। বায়ু পৃথিবী হইতে উত্থিত নানা বর্ণের ধূলি সমুহের আশ্রয় হইলেও, উহাদের দ্বারা পরিপূরিত এবং নানাবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে উহাদের দ্বারা লিপ্ত হয় না। সচ্ছ স্ফটিক তাহাতে উপহিত নানা বর্ণসমূহের দ্বারা নানাবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীতি গোচর হইলেও বস্তুত উহাদের দ্বারা লিপ্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হয় না। সেই প্রকার শুদ্ধ পরমাত্মা তদাশ্রিত এবং তদ্বারা সর্বতো ব্যাপ্ত গুণসমূহ দ্বারা লিপ্ত হন না। জগতের প্রলয় হইলেও তিনি থাকেন। তিনি সমস্তই দেখেন। পরন্তু জগৎ তাঁহাকে দেখে না। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। ব্রহ্ম মন ও বাণীর অগোচর। সূক্ষ্ম লাক্ষণিক ও ইঙ্গিতপূর্ণ বাণী দ্বারাও তাঁহাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না, সুতরাং লৌকিক বাক্যের আর কথা কি?[৩] সেই হেতু নানা মুনিগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। "কেহ তাঁহাকে কর্ম বলেন; কেহ কাল বলেন; অপরে কর্তা বলেন; অপরে সাংখ্যযোগ বলেন; কেহ ব্রহ্ম বলেন; কেহ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন; আর কেহ তাঁহাকে বাসুদেব বলেন।"[৪] "বহুগুণাশ্রয় একই বিষয় যেমন পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা নানাত্ব প্রাপ্ত হয় তেমন ব্রহ্ম তত্ত্বদর্শিগণ দ্বারা শাস্ত্রবর্ত্মসমূহ দ্বারা নানাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে কেহ কেহ পরম পদ বলে; কেহ কেহ বৈষ্ণবপদ বলে; কেহ সর্বব্যাপী বৈকুণ্ঠ বলে; কেহ তাহা হইতেও পর শান্ত কৈবল্য পদ বলে; কেহ কেহ সেই ব্রহ্মকে অব্যয় পরম ধাম বলে; আর কেহ প্রকৃতির পরে অক্ষর কাষ্ঠ এবং কেহ গোলক বলে। ইহসংসারে কোন কোন পুরাবিদ্-ব্যক্তি তাঁহাকে বিশদ নিকুঞ্জ বলেন।"[৫]

অগস্ত্যের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিসমূহ হইতে জানা যায় যে জগৎ মনোময় বা মনোবিলাস মাত্র। উহা মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বের ন্যায়। উহা প্রকৃত পক্ষে সত্য না হইলেও ব্রহ্মের সত্যতা হেতু সত্য বলিয়া মনে হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় এবং মরীচিকাতে জলভ্রম হয়, তেমন ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইতেছে। তিনি পরেও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"অন্ধকারে গুণাৎ কার্ষ্ণে সর্পবুদ্ধির্বিভেতি চ।
আরান্মরীচিকাং বারি তথেদং মন্যতে জগৎ॥"[৬]

'হে কৃষ্ণতনয়! যেমন (স্বল্প) অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি (করে) এবং (সেই হেতু লোক) রজ্জু হইতে ভীত হয় এবং যেমন দূর হইতে মরীচিকা জল (বলিয়া মনে করে) সেই প্রকার (লোকে অজ্ঞান হেতু ব্রহ্মকে) এই জগৎ বলিয়া মনে করে।' যেহেতু জগৎ অজ্ঞানজ, সেইহেতু জ্ঞান-নাশ্য। (পরে দেখ)। অতএব উহা মিথ্যা।

---

১) 'গর্গসংহিতা', ৭।১২।৩৩
২) ঐ, ৭।১২।২৬
৩) ঐ, ৭।১২।২৫,২৭
৪) ঐ, ৭।১২।২৮—২৯'১
৫) গর্গসংহিতা, ৭।১২।৪৫—৮'১
৬) ঐ, ৭।১২।৩৫

যেমন দর্পণে মুখ, রজ্জুতে সর্প এবং মরীচিকাতে জল ভ্রম হয়, তেমন ব্রহ্মে জীব ভ্রম হয়।[১]

"যথেন্দুরুদপাত্রেষু যথাগ্নিঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ে।
তথৈকো ভগবান্ সাক্ষাৎ পরাত্মাঽনেকবৎ স্থিতঃ॥"[২]

'যেমন একই চন্দ্র অনেক জলপাত্রে অনেকবৎ হয় এবং যেমন একই অগ্নি অনেক কাষ্ঠপুঞ্জে অনেকবৎ স্থিত হয় তেমন সাক্ষাৎ ভগবান্ এক (হইয়াও বহু উপাধিতে উপস্থিত হইয়া) অনেকবৎ স্থিত আছেন।' সুতরাং জীববহুত্ব ঔপাধিক, বাস্তব নহে।

"যথাঽম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব॥
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ।
তথা গুণানাং ভ্রমণৈর্ভ্রমতা মনসা যতঃ॥
ভ্রাম্যমানঃ সদা রাজন্ করেণালাতচক্রবৎ।
করিষ্যামি করোমীতি মমেদং তব চাব্রবন্।
ত্বমহং চ সুখী দুঃখী সদাঽজ্ঞানবিমোহিতা॥"[৩]

পুকুরের চলায়মান জল দেখিলে পার-স্থিত বৃক্ষসমূহ চলায়মানের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে মনে হয় যে পৃথিবী ঘুরিতেছে। তেমন, গুণসমূহের ভ্রমণ হেতু বশতঃ মনের ভ্রমণ হেতু হস্তস্থিত অলাতচক্রবৎ সদা ভ্রাম্যমান, সদা অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত জীব 'ইহা আমি এখন করিতেছি', 'ইহা আমি ভবিষ্যতে করিব', 'ইহা আমার, ইহা তোমার', 'আমি ও তুমি' ইত্যাদি বলিয়া, আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করিয়া থাকে। জীব বস্তুতঃ পরমাত্মাই। পরমাত্মা নির্লেপ। সুতরাং জীবও প্রকৃতপক্ষে নির্লেপই। "যেমন মহাকাশ, ঘট, মঠ প্রভৃতির অন্তরে ও বাহিরে (নির্লেপভাবে থাকে) তেমন পরাত্মা দেহসমূহে এবং স্বকৃত কর্মসমূহে নির্লিপ্ত থাকে।"[৪] "তাঁহার (আত্মার) জন্ম ও মৃত্যু, শোক ও মোহ, বাল্য, যৌবন ও জরা প্রভৃতি অহংমদ, ভয়, সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, রতি এবং আধি ও ব্যাধি কখনও (বস্তুত) হয় না।"[৫] যেহেতু জীবের সমস্ত বন্ধন অজ্ঞানজ, সেইহেতু একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাহার স্বরূপের বোধ হইতে পারে, সুতরাং মুক্তি হইতে পারে। গৃহাভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহ অন্ধকারে দেখা যায় না, পরন্তু সূর্য্যোদয়ে ঐ অন্ধকার বিদূরিত হইলে দেখা যায়। তেমন জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান বিদূরিত হইলে আপন শরীরাভ্যন্তরেই পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়।[৬] সুতরাং জীব "প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিগম এবং আত্মসংবিদ দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে বিচার করতঃ (অবগত হইবেক এবং) নিঃসঙ্গ হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করিবেক।"[৭] ভক্তি, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান দ্বারাই পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, আর কোন প্রকারে নহে।[৮] "যেমন জল পদ্মপত্রকে স্পর্শ করে না, তেমন যিনি কৃষ্ণভক্ত, বিরাগবান্, শান্তাত্মা এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইহসংসারে গুণসমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। জ্ঞানী সদানন্দময় এবং বালবৎ বিচরণ করেন। স্বীয় পরিহিত বস্ত্র স্খলিত হইলেও যেমন মদিরা-

---

[১] 'গর্গসংহিতা', ৭।১২।২৯
[২] ঐ, ৭।১২।৪০
[৩] ঐ, ৭।১২।৩০·২—৩২
[৪] ঐ, ৭।১২।৪১
[৫] ঐ, ৭।১২।২২—২৩·১
[৬] ঐ, ৭।১২।৪৪
[৭] ঐ, ৭।১২।২৯·২—৩০·১
[৮] ঐ, ৭।১২।৪৮·২

মদমত্ত ব্যক্তির তাহার জ্ঞান হয় না, তেমন জ্ঞানীর স্বীয় দেহের ভান হয় না।”[১] যেমন পক্ষোদ্গম হইলে পক্ষীশাবকের আর বাসার প্রয়োজন থাকে না, যেমন নদীর পরপারে পৌঁছিয়া গেলে, নৌকার আর প্রয়োজন থাকে না, তেমন জ্ঞানোদয় হইলে, জগতের ও দর্শণের[২] আর প্রয়োজন থাকে না। অন্ধকারস্থিত বস্তুকে দেখিবার জন্যই উল্কার প্রয়োজন। বস্তু দৃষ্ট হইলে উল্কার প্রয়োজন আর থাকে না। তেমন সাধনপন্থা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারাবৃত পরমতত্ত্বকে অবগত হইয়া মুনি ঐ সাধনপন্থা সত্বর পরিত্যাগ করতঃ সমদৃক্ হইয়া বিচরণ করিবেন।[৩]

এইরূপে মহর্ষি অগস্ত্য প্রদ্যুম্নের নিকট যে তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করেন, তাহা অদ্বৈতবিজ্ঞানই। পরন্তু ‘গর্গসংহিতা’য় পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে উহা “ভাগবতজ্ঞানই”।[৪] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে তন্মতে ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদই।

“ঘনাবলির্দেহগুণা অহোরাত্র মৃতের্যথা।
যথা সার্থং তথা দৃশ্যং ন কিঞ্চিৎ সর্বদৈব হি॥” ৭।১২।৩৭

---

[১] গর্গসংহিতা, ৭।১২।৪২—৩

[২] মূলে আছে “দর্পণাৎ”। উহা ভুল মনে হয়। প্রকৃত পাঠ “দর্শনাৎ” হইবে মনে হয়। কেননা ইহা বলা ঐ বচনের তাৎপর্য মনে হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে উহার প্রয়োজন আর থাকে না।

[৩] ঐ, ৭।১২।৩৮—৯

[৪] “ইতি ভাগবতং জ্ঞানং শ্রুত্বা কার্ষ্ণি র্মহামুনিম্”—(ঐ, ৭।১২।৫০-১)

পঞ্চম অধ্যায়

ধার্মিক সিদ্ধান্ত

দেবতোপাসনা—"ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষুক যে সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কোন্ দেবতার পূজা করিতে হইবে? কাহা হইতে ('কুতঃ' অর্থাৎ কোন্ দেবতার প্রসাদে এবং তাঁহাকে কি প্রকারে পূজা করিলে) তাহার ধ্রুব স্বর্গ লাভ হয়? আর কাহা হইতে তাহার পরম নিঃশ্রেয়স (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ হয়? দৈব কর্মে তথা পিত্র্য কর্মে, কোন্ বিধিতে হবন করা উচিৎ? মুক্ত পুরুষ কোন্ গতিতে গমন করে? মোক্ষের স্বরূপ কি? যদি স্বর্গে গমন করে তবে তথায় তাহার কি করা উচিৎ, যাহাতে তাহাকে স্বর্গ হইতে পুনঃ চ্যুত হইতে না হয়? দেবতাদিগেরও দেবতা, তথা পিতৃগণেরও পিতা, কে? তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর কে?"[১] নারায়ণীয়খ্যানের প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে মহারাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে ঐ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। দেবতা বিষয়ক প্রশ্নের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্যক্ বুঝাইতে বৈদিক দেবতা-তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ কর্তব্য।[২] বেদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রভৃতি নানা দেবতার নাম আছে। বৈদিক ঋষিগণের নানাজনে নানাকার্য্য সিদ্ধির জন্য নানাদেবতার স্তুতি করিয়াছেন পরন্তু তখন কোন কোন বৈদিক ঋষি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে দেবতাগণ ভিন্ন ভিন্ন নহেন; তাঁহারা বস্তুতঃ অভিন্ন; ইন্দ্রাদি দেবনাম প্রকৃত পক্ষে একই পরম দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র বিভিন্ন কর্ম হেতু একই পরম দেবতা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ('তিনি এক হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বহু প্রকারে অভিহিত করিয়া থাকেন')[৩]। "যো দেবানাং নামধা এক এব" (যিনি এক হইয়াও সমস্ত দেবগণের নাম ধারণ করেন')।[৪]

"সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভি—
রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"[৫]

'সুপর্ণ (পরমাত্মা) একই আছেন। মেধাবী তত্ত্বদর্শিগণ তাঁহাকে বাণী দ্বারা বহু প্রকারে কল্পনা করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তাঁহাকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন)।' এই দেবৈকত্ব-বাদ মহাভারত-পুরাণাদি পরবর্তী শ্রুত্যনুযায়ী স্মৃতিগ্রন্থসমূহে সম্যক্ পরিগৃহীত হইয়াছিল।[৬] ইহাও বলা উচিৎ যে ঐ বেদ-পরাক্ যুগে মুখ্য দেবনামের কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছিল,—তখন বৈদিক ইন্দ্রবরুণাদির পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মুখ্য দেবনাম বলিয়া

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।১—৪

২) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ১ম ভাগে দেখ।

২) ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬·২; অথর্ববেদ, ৯।১৫।২৮·২

৪) ঋগ্বেদ, ১০।৮২।৩·২; শুক্লযজুর্বেদ মাধ্যান্দিন শাখা ১৭।২৭·২, কাণ্ব শাখা, ২।৮।৩।৩ কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৪।৬।২।১·২; অথর্ববেদ, ২।১।৩·২; ইত্যাদি

৫) ঋগ্বেদ, ১০-১১৪।৫·১

৬) যথা দেখ—মহাভা, ১২।২৭৯।২৬—৯; মনুস্মৃতি, ১২।১২৩

পরিগণিত হইয়াছিল এবং কতিপয় বৈদিক দেবনাম পরিত্যক্তও হইয়াছিল। স্মৃতিগ্রন্থসমূহে স্থলে স্থলে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একই পরম দেবতার তিন কর্মনাম মাত্র,—একই পরমদেবতাকে জগতের সৃষ্টিকর্ম হেতু ব্রহ্মা নামে, স্থিতিকর্ম হেতু বিষ্ণু নামে এবং সংহারকর্ম হেতু শিব নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।[1] তথাপি সাধারণতঃ এক এক জনের এক একটি দেবনামে প্রীতি ছিল দেখা যায়। সে সেই নামেই পরমদেবতার উপাসনা করিত। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যে নাম যখন যাহার প্রিয় বোধ হইয়াছে, সে তখন সেই নামকে দেবতার মুখ্য নাম বলিয়া মনে করিত, অপর সমস্ত নামগুলিকে তাহার পর্য্যায় রূপে গ্রহণ করিত। সাধারণ অজ্ঞজনে নামভেদ এবং কর্মভেদ হেতু দেবতাগণকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করিত। যাহা হউক, 'মহাভারতে'র সময়ে দেবতা উপাসনার প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল দেখা যায়। যথা, হনুমান্ ভীমকে বলেন, বলি, হোম, নমস্কার এবং মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবতাদিগকে সম্মান করা মনুষ্যগণের, বিশেষতঃ পুরুষদিগের, নিশ্চয় উচিৎ। কেননা, ভক্তি দ্বারা দেবতাগণ প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।[2] কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলেন, "ধর্ম আচারসম্ভব। বেদসমূহ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞসমূহ দেবসমূহ দ্বারা সমুৎপন্ন (হয়)। দেবগণ যজ্ঞসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (হন)। দেবতাগণ বেদাচারবিধানোক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা ধারণ করেন।"[3] টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে উহার তাৎপর্য এই যে—সদাচার দ্বারা ধর্ম লাভ হয়; তাহাতে বেদ অধিগত হয়; বেদজ্ঞান হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়; যজ্ঞ দ্বারা দেবতার প্রসাদ লাভ হয়; এবং তাহাতে মনুষ্যগণের স্থিতি লাভ হয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাগণকে যজ্ঞসহ সৃষ্টি করতঃ বলেন, তোমরা ইহার (যজ্ঞের) দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। ইহা তোমাদিগের অভীষ্ট ফল প্রদানকারী হউক। ইহার দ্বারা তোমরা দেবগণকে ভাবনা কর; এবং (তাহাতে) ঐ দেবতাগণ তোমাদিগকে ভাবনা করুক (অর্থাৎ তোমাদের উন্নতি ও কল্যাণ করুক)। এই প্রকারে পরস্পরকে ভাবনা করতঃ তোমরা পরম শ্রেয় লাভ কর। যজ্ঞ দ্বারা ভাবিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের প্রদত্ত (ভোগ্যবস্তুসমূহ) তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে (ব্যক্তি নিজেই) ভোগ করে সে নিশ্চয় চোর'।"[4] পরে তিনি বলেন, যাহারা দেবতাদিগকে পূজা করে, তাহাদিগের নিষ্ঠা সাত্ত্বিক;[5] দেবপূজাও এক প্রকার শারীর তপ।[6] এই প্রকারে তিনি দেবতোপাসনার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।[7] 'মহাভারতে'র সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও দুর্গা দেবতার উপাসনা বিশেষ

---

১) এই বিষয়ে 'বিষ্ণুপুরাণে' (৫।১৮।৫১) এক সুন্দর বচন আছে। ঈশ্বর ক্ষরাক্ষরময়, সর্বাত্মা ও সর্ব। তিনি "ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাখ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ" অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি নাম কল্পনামাত্র। আরও দেখ—৫।১৮।৫৬

২) মহাভা, ৩।১৫১।২৩·২—২৪

৩) মহাভা, ৩।১৫১।২৮—২৯·১

৪) গীতা, ৩।১০—২ ৫) গীতা, ১৭।৪·১

৬) গীতা, ১৭।১৪

৭) 'গীতা'র এক স্থলে কৃষ্ণ বলিয়াছেন

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"—(৭।২৩·২)

প্রচলিত ছিল দেখা যায়।[1] উহাদের উপাসনা দ্বারা প্রাপ্য ফল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ ছিল বোধ হয়। তাই যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন যে উহাদিগের মধ্যে কাঁহার উপাসনা দ্বারা মনুষ্য ইহপারলৌকিক অভ্যুদয়, এমন কি মুক্তিও, লাভ করিতে পারে? উত্তরে ভীষ্ম তাঁহার নিকটে নারায়ণীয়ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। উহার মূল আধার এবং পরম উপাস্য দেবতা ভগবান্ নারায়ণ, বাসুদেব, ব্রহ্মণ্যদেব বা বিষ্ণুই। এই প্রশ্নোত্তর হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে নারায়ণীয় ধর্মে সগুণ দেবতা উপাসনার মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া খ্যাপিত হয়। গীতায় তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করান। উপসংহারে তিনি বলেন যে তাঁহার ঐ রূপের দর্শনলাভ অতীব কঠিন; এমন কি দেবতাগণও ঐ রূপ দেখিতে সর্বদা ইচ্ছা করেন;[2] একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে ঐরূপে দেখা যায় অপর কোন উপায়ে নহে।[3] অনন্তর তিনি বলেন,

> "মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
> নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"[4]

'হে পাণ্ডব! যে মৎকর্মকৃৎ (অর্থাৎ একমাত্র মদর্থে কর্ম করে), মৎপরায়ণ, (সর্ববস্তুতে) আসক্তি-রহিত এবং সর্বভূতে নির্বৈর, সেই আমার (অনন্য) ভক্ত। সে আমাতে আসে (অর্থাৎ মিলিত হয়)।' আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে মোক্ষলাভার্থ যাহা যাহা ভগবদ্গীতার মতে অবশ্য কর্তব্য তৎসমস্তেরই সার সংগ্রহ করতঃ এই শ্লোকে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করেন, "যে ভক্ত এই প্রকারে নিত্যযুক্ত হইয়া ('যথাদর্শিত বিশ্বরূপ') তোমার উপাসনা করে এবং যে অক্ষর অব্যক্তের (অর্থাৎ নির্বিকার ও নিরাকার ব্রহ্মের[5]) উপাসনা করে তাহাদের মধ্যে কে উত্তম যোগবিৎ?"[6] তাহাতে ভগবান্ বলেন, "যে (বিশ্বরূপ) আমাতে মন সমাহিত করতঃ নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করে, সেই আমার মতে উত্তম যুক্ত (অর্থাৎ যোগী)। পরন্তু যাহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্ প্রকারে নিয়মন করিয়া অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, বিভু এবং অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করে, সর্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং সর্বভূতের হিতে রত থাকে, তাহারাও নিশ্চয় আমাকে পায়। (কিন্তু) অব্যক্তে আসক্তচিত্ত তাহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ (ব্যক্ত) দেহাভিমানী মনুষ্যগণ অতি কষ্টে

'দেবতাদিগের উপাসকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়।' তাহাতে মনে হইতে পারে যে তিনি দেবপূজার নিন্দা করিয়াছেন। পরন্তু প্রকরণ আলোচন করিলে দেখা যায়, যাহারা কামনাসমূহ দ্বারা বিমোহিত হইয়া পরমদেবতা বাসুদেবকে বা বিষ্ণুকে ছাড়িয়া অপর কোন না কোন দেবতার আরাধনায় নিরত হয়, ঐখানে তাহাদিগকেই নিন্দা করা হইয়াছে। "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ" ইত্যাদি। (৭।২০—) সুতরাং উহা দেবারাধনামাত্রেরই নিন্দা নহে। পূর্বে তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার নাম করিয়া বলিয়াছেন যে দেবপূজা দ্বারা মনুষ্য "পরম শ্রেয়"ও লাভ করিতে পারে। (৩।১১)

[1] বৈদ্যের 'হিন্দী মহাভারতমীমাংসা,' ৪৫০—৫ পৃষ্ঠা দেখ।

[2] গীতা, ১১।৫২ [3] ঐ, ১১।৫৩—৪; পরে দেখ।

[4] ঐ, ১১।৫৫; পরে দেখ।

[5] ঐ, ৮।৩,১১ এবং ২০—১ শ্লোক দেখ। [6] ঐ, ১২।২

অব্যক্তস্থিতি[১] লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সংন্যস্ত (অর্থাৎ অর্পণ) করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া কেবল অনন্যযোগ দ্বারা (অর্থাৎ আমার বিশ্বরূপ ব্যতীত অপর কোন আলম্বন গ্রহণ না করিয়া)[২] আমার ধ্যান করতঃ উপাসনা করে, হে পার্থ! আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল লোককে আমি অচিরে (জন্ম) মৃত্যুময় এই সংসার সাগর হইতে সম্যক্ উদ্ধার করি।"[৩] এইরূপে দেখা যায়, অব্যক্তোপাসনা বা নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং ব্যক্তোপাসনা বা সগুণ ও সাকার পরমেশ্বরের,—বিশ্বরূপের উপাসনা উভয়েরই দ্বারা মোক্ষলাভ হয়; পরন্তু অব্যক্তোপাসনা অতিকষ্টকর, আর ব্যক্তোপাসনা সহজ; কেননা, গুণময় ব্যক্তদেহাভিমানী মানুষের পক্ষে নির্গুণ অব্যক্তের ধারণা করা অতীব কঠিন, আর সগুণ ব্যক্তরূপের ধারণা করা সহজ; সুতরাং ব্যক্তোপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করাই সাধকের কর্তব্য। ইহাই গীতার এক মুখ্য সিদ্ধান্ত। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র সিদ্ধান্তও তাহাই। যথা, রাজা পরীক্ষিৎ বলেন "ভগবানের গুণময় স্থূলরূপে নিবিষ্ট মন স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মের,—যিনি বাসুদেব নামেও অভিহিত হন, তাঁহার,— নির্গুণ সূক্ষ্মতম স্বরূপে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয়।"[৪] পরমভাগবত শুকদেব তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মুখ্য মুখ্য নাম, রূপ, পরিমাণ এবং লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনার পর[৫] তিনি বলেন "যাহা পুরাণসমূহে চতুর্দশ (ভুবন) রূপে বিকল্পিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডকোশ এতাবৎ মাত্রই। যাহা সাক্ষাৎ মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের আত্মমায়াগুণময় স্থূল রূপ বলিয়া উপগীত হয়, তাহা উপবর্ণিত হইল। যে (ব্যক্তি) ইহা আদর সহকারে পাঠ করে, শ্রবণ করে কিম্বা শুনায়, সে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ভগবান্ পরমাত্মার উপনিষদে বর্ণিত স্বরূপ, (ইন্দ্রিয়ের) অগ্রাহ্য হইলেও, জানে। ভগবানের স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ শুনিয়া যতি (প্রথমে) স্থূলরূপে চিত্ত স্থির করতঃ, (পরে) বিচার দ্বারা ধীরে ধীরে উহাকে সূক্ষ্মরূপে লইয়া যাইবেক।"[৬] এই প্রকারে নিরূপিত হয় যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের এক মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে সাধনের প্রারম্ভে সাধককে ভগবানের স্থূলরূপে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে, কেননা, তাহাতে সাধন সুগম হয়।

উপরের বিবৃতি হইতে ইহাও অনায়াসে অবগতি হইবে যে সাধনার সৌকর্য্যার্থ ভগবানের যে স্থূলরূপের আশ্রয় সাধককে প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বিশ্বরূপই। সুতরাং দেখা যায়, প্রাচীন ভাগবতধর্মের মতে ব্রহ্মসাধনার প্রথম স্তর বিশ্বরূপের উপাসনা। বিশ্বরূপ পুরুষরূপে,—বিরাট্ পুরুষরূপেও কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহাকে বিরাট্‌পুরুষের উপাসনাও বলা যায়। তাই শুকদেব বলিয়াছেন, আসন, প্রাণ, আসক্তি এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতঃ বুদ্ধির

---

১) মূলে আছে "অব্যক্তা গতি"। ইহার সহিত "ব্রাহ্মীস্থিতি" (২।৭২'১) তুলনীয়।

২) মূলে আছে "অনন্যেনৈব যোগেন"। শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত্বা যস্য স অনন্যঃ তেন অনন্যেন এব কেবলেন যোগেন সমাধিনা"।

৩) গীতা, ১২।৬—৭

৪) "ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং……।"—(বিষ্ণু) ভাগ, ৫।১৬।৩

৫) ঐ, ৫।১৬ ৬) ঐ, ৫।২৬।৩৮—৯

দ্বারা ভগবানের স্থূলরূপে মনকে সম্যক্ ধারণ করা (সাধকের) উচিৎ। যাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই সমস্ত জগৎ প্রতীত হয়, সেই এই(ব্রহ্মাণ্ডই) তাঁহার স্থূল হইতে স্থূলতর বিশেষ দেহ। সপ্ত[1] আবরণ সংযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডকোশরূপ এই শরীরে যে ভগবান্ বিরাটপুরুষ আছেন, তিনিই ধারণার আশ্রয়।”[2] সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কি প্রকারে বিরাট্‌পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে কল্পনা করিতে হয়, অতঃপর তিনি তাহা বিবৃত করিয়াছেন।[3] অনন্তর তিনি বলেন যে ঐ ঈশ্বরবিগ্রহ হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তু নাই, সাধককে নিজ বুদ্ধি দ্বারা মনকে ঐ স্থূলরূপেই সম্যক্‌প্রকারে ধারণ করিতে হইবে।[4] নারায়ণীয়াখ্যানে কথিত হইয়াছে যে পরমর্ষি ব্যাস তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন, “সাংখ্যযোগবিদ্‌গণ যাঁহাকে ‘পরমাত্মা’ বলেন, তিনি স্বীয় কর্মহেতু (‘স্বেন কর্মণা’) ‘মহাপুরুষ’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।” তিনিই অব্যক্তাদি ক্রমে বিশ্বজগতের সৃষ্ট্যাদি করেন।[5] বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপই। সুতরাং ‘মহাপুরুষ’ বিশ্বরূপেরই নামান্তর। শ্বেতদ্বীপে নারদকৃত ভগবান্ নারায়ণের স্তুতিতে আছে যে তিনি যেমন ‘বিশ্বরূপ’, ‘বিশ্বমূর্তি’ ও ‘মহামূর্তি’, তেমন ‘পুরুষ’ ‘মহাপুরুষ’ ও ‘পুরুষোত্তম’। বিরাট্‌পুরুষ বা মহাপুরুষরূপে ব্রহ্মের উপাসনাই প্রাচীন ভাগবতধর্মের বিশেষত্ব।

পূর্বে[6] প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের মূল দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ অব্যক্তই, নির্বিশেষ ও নিরাকারই, পরিদৃশ্যমান ব্যক্তরূপ, বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌পুরুষরূপ মায়িক, বাস্তব নহে। নারায়ণীয়াখ্যানে ভগবান্ নারায়ণ অতীব স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন। গীতায় কৃষ্ণও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। অধিকন্তু যাহারা মনে করে যে অব্যক্ত ব্রহ্ম বস্তুতই ব্যক্তরূপ ধারণ করেন, সেইহেতু ব্যক্তরূপও প্রাকৃত, তাহাদিগকে তিনি অজ্ঞানী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তথাপি সাধনার সৌকর্যার্থ অবাস্তব মায়িক ব্যক্তরূপকে অবলম্বন গ্রহণের বিধান প্রাচীন ভাগবতধর্মে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা উহার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সাকার বিগ্রহ—বিশ্বরূপ বা বিরাট-পুরুষের পরিবর্তে পরিচ্ছিন্ন সাকার বিগ্রহকে ধারণার আশ্রয় করিবার প্রথাও কালক্রমে প্রাচীন ভাগবতধর্মে প্রচলিত হইয়াছিল। যথা, বিরাট্‌পুরুষের ধারণা বিবৃত করিবার পর শুকদেব বলেন, কেহ নিজের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে বিরাজমান চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করে। উনি প্রসন্নবদন, কমলনয়ন ও পীতবাস। তাঁহার শরীরে উজ্জ্বল মহারত্নখচিত স্বর্ণালঙ্কার, শিরে মহারত্নময় কিরীট এবং কর্ণে মণিময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীবৎস এবং কণ্ঠে কৌস্তুভমণি ও অম্লান বনমালা আছে। তাঁহার মেখলা, অঙ্গুরী, নুপুর, কঙ্কন, প্রভৃতি বহুমূল্য আভূষণ আছে।

---

[1] পরে শুকদেব বলিয়াছেন “ভগবানের স্থূলরূপ” “মহাদি (অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই) অষ্ট অবরণ দ্বারা বহির্দিকে আবৃত।” (বিষ্ণু)ভাগ, ২।১০।৩৩)

“যস্তাবয়বসংস্থানে কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্॥”

[2] ঐ, ২।১।২৩—৫ [3] ঐ, ২।১।২৬—৩৭

[4] ঐ, ২।১।৩৮ [5] মহাভা, ১২।৩৪০।২৮'২— [6] পূর্বে দেখ।

কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ আছে যে দেবতার, ও পিতৃগণের পূজা গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের বেদবিহিত ধর্মের অঙ্গ (২য় সং ৬—৭ পৃষ্ঠা)

তিনি কমলোপরি স্থিত, ইত্যাদি।[১] কপিল দেবহুতিকে নাসাগ্রে[২] এবং কৃষ্ণ উদ্ধবকে হৃদয়কমলে[৩] ঐ প্রকার পরিচ্ছিন্ন পুরুষবিগ্রহের ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল রূপ বর্ণনাতে স্বল্পবিস্তর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে মনে হয় ঐ সকল রূপক কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে। কেননা ঐ পুরুষ বাস্তব হইলে উহার বর্ণনায় কপিল, কৃষ্ণ ও শুকদেবের মত পূর্ণজ্ঞানী পুরুষের মতভেদ হইত না। ভগবানের বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌পুরুষ রূপ যেমন মায়িক কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে, ক্ষুদ্র পুরুষরূপও তেমন মায়িক কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' তাহা অতীব স্পষ্টবাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা, ঐ প্রকার পুরুষরূপে আবির্ভূত বিষ্ণুর স্তুতিতে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন যে তিনি নির্বিশেষ চিন্মাত্র এবং মায়ারহিত শুদ্ধস্বরূপে থাকিয়াও মায়া দ্বারা পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন;[৪] ব্রহ্মাও বলিয়াছেন যে উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে।[৫] কর্দম ঋষি বলিয়াছেন যে ভগবান্ বস্তুতঃ অরূপ (বা রূপরহিত) তবে তাঁহার ভক্তগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে তাঁহাকে যে যে প্রিয়রূপে কল্পনা করে, তিনি সেই সেই রূপেই তাহাদের প্রতীতিগোচর হন।[৬] মহাতপস্বী বিশ্বরূপ দৈত্যপরাহত ইন্দ্রকে যে 'নারায়ণকবচ' দিয়াছিলেন, তাহাতে আছে, নারায়ণের ভূষণ, আয়ুধ এবং লিঙ্গসমূহ মায়িক শক্তিবিশেষ। ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবিগণ যাঁহাকে নিষ্প্রপঞ্চ বলিয়া অনুভব করেন, সেই হরিকেই অপরে সপ্রপঞ্চ, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং তিনিই অন্য সাধকের দৃষ্টিতে ভূষণ, আয়ুধ এবং চিহ্নরূপ শক্তিসমূহ ধারণ করেন।[৭] অপর কথায় বিশ্বরূপকে যেমন কেহ কেহ বিরাট্‌পুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তেমন অপরে ভূষণায়ুধাদিপরিশোভিত পরিচ্ছিন্ন পুরুষ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মহাত্মা সূত বলেন[৮]—এই পুরুষ (অর্থাৎ মনুষ্য) আপন (হস্তপদাদি) সংস্থায় যাবৎ পরিমাণ, লোকসংস্থা দ্বারা (কল্পিত) ঐ মহাপুরুষ ও তাবৎ পরিমাণ। দ্যৌ তাঁহার শির, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, অন্তরিক্ষ তাঁহার মধ্য, (চন্দ্র) সূর্য্য চক্ষু, বায়ু নাসিকা, দিক্ কর্ণ, প্রজাপতি শিশ্ন, মৃত্যু গুহ্য, লোকপালগণ বাহুদ্বয়, চন্দ্র মন, যম ভ্রূদ্বয়, লজ্জা উপরৌষ্ঠ, লোভ অধরৌষ্ঠ, জ্যোৎস্না দন্ত, ভ্রম হাস্য, বৃক্ষসমূহ রোমসমূহ এবং মেঘসমূহ তাঁহার মাথার কেশ। "সেই অজ বিভু স্বাত্মজ্যোতিকে কৌস্তুভ (মনি) রূপে এবং তাঁহার ব্যাপী প্রভাকে সাক্ষাৎ শ্রীবৎসরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তিনি নানাগুণময়ী আত্মমায়াকে বনমালারূপে, ছন্দোময় (বেদকে) পীতবাসরূপে এবং ত্রিবৃৎস্বরকে (=ওঙ্কারকে) ব্রহ্মসূত্ররূপে ধারণ করেন। সেই দেব সাংখ্য ও যোগকে মকরকুণ্ডলরূপে এবং সর্বলোকভয়ঙ্কর পারমেষ্ঠ্যপদকে (=ব্রহ্মলোককে) মুকুটমণিরূপে ধারণ করে। অব্যাকৃত সেই অনন্তাখ্য আসন যাঁহাতে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। ধর্মজ্ঞানাদিযুক্ত

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ২।২।৮—১২

২) ঐ, ৩।২৮।১২—৭

৩) ঐ, ১১।১৪।৩৬—৪১

৪) ঐ, ৪।৭।২৬

৫) ঐ, ৪।৭।৩১

৬) "তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যামি যামি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥"—(ঐ, ৩।২৪।৩১)

৭) (বিষ্ণু)ভাগ, ৬।৮।৩১—৩

৮) ঐ, ১২।১১।৬—

সত্ত্বগুণকে তাঁহার কমল বলা হয়। তিনি ওজ; সহঃ ও বলযুক্ত মুখ্য (প্রাণ)তত্ত্বকে গদারূপে, জলতত্ত্বকে শঙ্খরূপে, তেজতত্ত্বকে সুদর্শনরূপে, এবং আকাশনিভ (নীল) আকাশতত্ত্বকে অসিরূপে ধারণ করিয়াছেন। তিনি কালরূপ শার্ঙ্গধনু এবং কর্মরূপ জ্যা ধারণ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সমূহকে তাঁহার শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন তাঁহার রথ ইত্যাদি। শুকদেব কর্তৃক বিবৃত পূর্বোক্ত বিরাট্‌পুরুষের কল্পনা হইতে এই ক্ষুদ্রপুরুষকল্পনার পার্থক্য এই যে ইহাতে গরুড়াদি উপাঙ্গের, সুদর্শনাদি আয়ুধের এবং কৌস্তুভশ্রীবৎসাদি আভূষণেরও কল্পনা আছে; উহাতে এই সকল নাই।[১]

উপরে বিবৃত সাকার বিগ্রহ সালঙ্কার নারায়ণ বা বাসুদেব মূর্তিই। পরন্তু বিশ্বরূপকে কোথাও কোথাও শিবমূর্তিরূপেও কল্পনা করা হইয়াছে।[২] ঐরূপের স্তুতিপ্রসঙ্গে প্রজাপতিগণ বলিয়াছেন, "হে মহেশ্বর! তোমার এই (সাকার)রূপই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ মনে হইতেছে। তোমার (প্রকৃত) পরমস্বরূপ দর্শন করিতে আমরা সমর্থ নহি। অব্যক্তকর্মা তোমার এই ব্যক্তি (অর্থাৎ সাকাররূপে আবির্ভাব) নিশ্চয়ই সংসারের কল্যাণার্থ।"[৩] ইহা হইতে বুঝা যায় যে যাহারা ব্রহ্মের নিরাকার নির্বিশেষ পরমস্বরূপ ধারণা করিতে পারে না, তাহারাই সবিশেষ সাকাররূপকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অধিকন্তু বিশ্বরূপকে বা বিরাট্‌পুরুষকে কেহ নারায়ণরূপে, আর কেহ শিবরূপে মনে করে বলিয়া নিশ্চিত হয় যে সাকার বিগ্রহ কল্পনা মাত্র, বাস্তব নহে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভগবানের প্রকৃত অব্যক্ত সূক্ষ্মরূপে চিত্তপ্রবেশ করাইবার সুগম উপায়রূপে প্রাচীন ভাগবতধর্মে তাঁহার ব্যক্ত স্থূলরূপের,—প্রথমে বিরাট্‌পুরুষরূপের, পরে ক্ষুদ্রপুরুষরূপের, কল্পনা করা হইয়াছিল। চিত্তকে বরাবর উহাতে নিবিষ্ট রাখিলে, অব্যক্তরূপের উপলব্ধি কখনও হইবে না। তাই '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' কপিল, কৃষ্ণ, প্রভৃতি সকলেই, কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে ঐ স্থূলরূপের ভাবনা ছাড়াইয়া মনকে সম্যক্ নির্বিষয় করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা অন্যত্র তাহা বিবৃত করিয়াছি।[৪] সুতরাং এইখানে তাহার বিবরণ দিলাম না।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে আর একটা বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া উচিৎ মনে করি। সাকার বিগ্রহের উপাসনা প্রাচীন হিন্দুস্থানে কখন এবং কাহাদের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল? '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি শৌনক "সমস্ত তন্ত্রসিদ্ধান্তে তত্ত্ববিৎ এবং বহুবিত্তম" ভাগবত সূতকে বলেন, "যেই ক্রিয়ানৈপুণ্য দ্বারা মর্ত্য (মনুষ্য) অমর্ত্যতা প্রাপ্ত হয়, সেই ক্রিয়াযোগের জিজ্ঞাসু আমাদের নিকট, কেবল শ্রীপতির পরিচর্যায় তান্ত্রিকগণ যে প্রকারে, এবং যাহাদের (অর্থাৎ জগতের যে যে বস্তুসমূহের) দ্বারা (তাঁহার যে যে) অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ এবং

---

১) 'বিষ্ণুপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে (১৷২২৷৬৮—) মহর্ষি বশিষ্ঠেরও মতে বিষ্ণুর মূর্তি কল্পিত। তাঁহার কল্পনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

২) ঐ, ৮৷৭৷২৬ ৩) ঐ, ৮৷৭৷৩৫

৪) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী', ২য় খণ্ড, ।

আভূষণ কল্পনা করিয়া থাকে, তৎসমস্ত বর্ণনা করুন।"[১] ইহা হইতে কেহ যেন অনুমান না করেন যে সাকার বিগ্রহের উপাসনা তান্ত্রিকগণ কর্তৃকই প্রথমে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কেননা ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রেও ইন্দ্রাদি উপাস্যদেবতাগণের শিরহস্তপদাদি কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, তথা শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রাদির এবং রথবাহনাদিরও উল্লেখ আছে। ইহাতে কোন সংশয় নাই যে ঐ সকল অনেক সময়ে রূপক কল্পনা মাত্র। তবে তাহাতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে দেবতার সাকার বিগ্রহ কল্পনা বৈদিক কালে আরম্ভ হইয়াছিল। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (১।৪।১) স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে আত্মা "পুরুষবিধ" ছিল। ব্রহ্ম পরমদেবতার 'পুরুষ' নাম বেদেও আছে। দেবতার আকার সম্বন্ধে বেদমন্ত্রে কি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় আচার্য যাস্ক তাহা আলোচনা করিয়াছেন।[২] তিনি বলেন, একমতে দেবতাগণ, "পুরুষবিধ" (বা পুরুষবিগ্রহ) ; অপর মতে পুরুষবিধ নহেন) ; এবং আর একমতে উহারা উভয়বিধ (অর্থাৎ কখন পুরুষবিধ, আর কখন অপুরুষবিধ)। আবার কোন কোন মতে অপুরুষবিধ দেবতা পুরুষবিধ দেবতারই কর্মাত্মা ; সুতরাং দেবতা প্রকৃত পক্ষে পুরুষবিধই। প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে তিনি যুক্তি ও বেদমন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং সাকারোপাসনা অতি প্রাচীন। পরে পরে সাকারোপাসকগণের বিভিন্ন দলে বা সম্প্রদায়ে দেবতার আকার বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা হইত দেখা যায়। পাঞ্চরাত্রতন্ত্রিকগণ কি প্রকারে কল্পনা করিত, তাহা বর্ণনা করিতে উক্ত বচনে শৌনক সূতকে অনুরোধ করেন। উত্তরে সূত যে আকার বর্ণনা করেন উহা সালঙ্কার নারায়ণ বা বাসুদেব মূর্তিই। উপরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রতান্ত্রিকগণ যে ভগবানকে কেবল ঐ রূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে মনে হয়। অধিকন্তু তাঁহারা উহাকে শ্রেষ্ঠতম রূপ বলিয়াও মনে করিতেন না বোধ হয়। 'স্কন্দপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি ভৃগু এবং খ্যাতির কন্যা লক্ষ্মী বিশ্বরূপকে ভগবান্ নারায়ণের পরমরূপ মনে করিতেন। উহা দর্শন করিতে এবং নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে তিনি কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ "সুরপূজিত শঙ্খচক্রগদা(পদ্ম)ধারী রূপ পরিত্যাগ করতঃ" তাঁহাকে "যথোক্ত পরমরূপ বিশ্বরূপ দেখান। উহা দেখাইয়া (বিষ্ণু এই) বাণী বলেন, 'যে পাঞ্চরাত্রবিধান অনুসারে আমাকে নিত্য পূজা করিবে সে পূজ্য এবং সে পূজিত'" ইত্যাদি।[৩] ইহা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে প্রাচীন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে শঙ্খচক্রাদিধারী পরিচ্ছিন্ন রূপ অপেক্ষা বিশ্বরূপকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ রূপ মনে করা হইত। 'গীতা'য় ভগবান্ কৃষ্ণও বলিয়াছেন যে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের পরমরূপ"[৪] এবং উহা চতুর্ভুজ কিংবা মানুষ রূপ হইতে শ্রেষ্ঠ।[৫] 'পরমসংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতা গ্রন্থে আছে যে পরমদেবতা বস্তুতঃ দিক্, দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি কখনও কোন প্রকার কারণ দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন। সুতরাং তাঁহার কোন নিশ্চিত আকার প্রকৃত পক্ষে নাই।[৬] পরন্তু নিরাকারের অর্চনা, ধ্যান কিম্বা স্তুতি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।১১।২—৩

২) নিরুক্ত, ৭।৬।১—৭।৭।৯ "দেবতা বিগ্রহবত্যবিগ্রহবতী চ যাস্কেনোক্তা" ('নীতিমঞ্জরী', ৭ পৃষ্ঠা)

৩) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯।২২—

৪) "পরমং রূপমৈশ্বরং"—(গীতা, ১১।৯·২)। আরও দেখ—"রূপং পরং" (ঐ, ১১।৪৭·১) ; "রূপং মহৎ" (১১।২৩·১)

৫) ঐ, ১১।৪৬ ও ৫১ দেখ। ৬) পরমসং, ৩।২

সেইহেতু (তাঁহার আকার কল্পনা করতঃ) সাকারের অর্চনা করা উচিৎ।[১] তিনি নিত্য নির্বিকার ; আপন স্বরূপ হইতে তিনি কখনও কিঞ্চিন্মাত্রও চ্যুত হন না। সুতরাং নিরাকার তিনি কখনও প্রকৃতই সাকার হন না। তথাপি, "ঐ হেতু সেই অচ্যুতকে পুরুষরূপে কল্পনা করতঃ ('পুরুষরূপেণ কল্পয়িত্বা') পরা ভক্তি সহকারে অভ্যর্চনা করতঃ মনুষ্যগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"[২] এইরূপে দেখা যায়, সাকার বিগ্রহ প্রকৃত না হইয়া কল্পিত হইলেও উহার পূজাদি ব্যর্থ নহে। কেননা, তাহার দ্বারা মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।[৩] 'পরমসংহিতা'য় অধিকন্তু ইহাও উক্ত হইয়াছে নিরাকার ভগবান্ ঐ কল্পিত সাকাররূপ ধারণ করিয়াই ভক্ত উপাসকের সম্মুখে প্রকটিত হন।

"ন তে রূপং ন চাকারো নায়ুধানি ন চাস্পদম্।
তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে॥"[৪]

'তোমার রূপ নাই, আকার নাই, আয়ুধসমূহ নাই এবং আস্পদও নাই। তথাপি তুমি ভক্তগণের নিকটে পুরুষাকারে প্রকটিত হও।' কথিত হইয়াছে যে অভীষ্ট ফলের ভেদ অনুসারে ভগবানের পুরুষাকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা কর্তব্য। যথা, নিঃশ্রেয়সার্থিগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্তির পূজা করিবে। তাহাতে পদ্ম সৃষ্টির, চক্র স্থিতির, গদা সংহারের এবং শঙ্খ মুক্তির নির্দেশক চিহ্ন।[৫] উহাতে অপর পক্ষে ইহাও কথিত হইয়াছে যে "রূপবন্তমুপাসীরন্ নান্যথা সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ" (রূপবানেরই উপাসনা কর্তব্য অন্যথা সিদ্ধি লাভ হইবে না')।[৬] অব্যক্তাদি-দেহপর্যন্ত যে সকল বস্তু মৎকর্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হইলেও এই (পরম) দেবকে শরীরবান্ বলিয়াই ভাবনা কর্তব্য। তাঁহার সর্ববস্ত্বাত্মক আকার ভক্তদিগকে অনুকম্পার্থই এবং যোগময় বলিয়া জানিবে, পরন্তু সত্যনিষ্ঠিত নহে ('ন তু সত্যেন নিষ্ঠিতম্')।"[৭] প্রথমে স্থূল বা মানুষরূপের, পরে সূক্ষ্ম বা বিরাট্‌রূপের উপাসনা কর্তব্য।[৮]

"যৎকৃতং পরমং রূপমনির্দেশ্যমলক্ষণম্।
ন তস্য পুরুষঃ পূজামিচ্ছেদ্বিবুধোঽপি সন্॥"[৯]

অর্থাৎ জ্ঞানী হইলেও মানুষ ভগবানের অলক্ষণ, সুতরাং অনির্দেশ্য পরম রূপের পূজা করিতে ইচ্ছা করিবেক না। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' আছে পরমপুরুষ প্রকৃতপক্ষে শব্দস্পর্শাদিবিহীন এবং নিরাকার বলিয়া উঁহার ভাবনা করা মনুষ্যগণের পক্ষে অতীব কঠিন। সেইহেতু তিনি সাকাররূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই সাকারের পূজা বিহিত হইয়াছে। সাকারেরই পূজাধ্যানাদি কার্য প্রশস্ত।[১০]

---

১) পরমসং, ৩।৭ ২) ঐ, ৩।৬ ৩) ঐ, ২৪।৪—৬

৪) ঐ, ২৩।৫০, ২৯।২৫ ('ত্বং' স্থলে চ পাঠান্তরে)

৫) "সৃষ্টিবীজং তথা পদ্মং চক্রং স্থিতিনিবন্ধনম্।
গদা সংহারবীজং তু শঙ্খং মুক্তিনিবন্ধনম্॥" —(পরমসং, ৩।১৭

৬) ঐ, ২৪।১৮.১ ৭) ঐ, ২৪।১৮.২—২০.১

৮) ঐ, ২৪।২০.২—২৫ ৯) ঐ, ২৪।২৬

১০) বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, ৩।৪৬।১—

প্রতিমাপূজা

দেবতার অর্চ্চা বা প্রতিমা পূজার পদ্ধতিও ভাগবতধর্মে কালক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্ম বিবরণে তাহার পরিষ্কার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে পরমভাগবত আবির্হোত্র রাজা নিমিকে বলেন, "(জীবভূত) পরাত্মার হৃদয়গ্রন্থি শীঘ্র বিনাশ করিতে যে ইচ্ছা করে, তন্ত্রোক্ত বিধিতেও[1] কেশবের পূজা করা তাহার উচিৎ। (সেবাদির দ্বারা) গুরুর কৃপা লাভ করতঃ তৎকর্তৃক প্রদর্শিত বিধি অনুসারে আপন অভিমত মূর্তিতে মহাপুরুষের পূজা করিবে।"[2] অনন্তর পূজার এক বিধিও তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।[3] উপসংহারে তিনি বলেন, "আপনাকে তন্ময় বলিয়া ধ্যান করতঃ হরির মূর্তি পূজা করিবে। ('আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্মূর্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ')। অনন্তর নির্মাল্য শিরে দিয়া পূজিত মূর্তিকে উঠাইয়া উহার নিজস্থানে (রাখিয়া দিবে)। এই প্রকারে অগ্নি, সূর্য্য, জল প্রভৃতিতে অতিথিতে এবং আপন হৃদয়েও যে ঈশ্বর ও আত্মার পূজা[4] করে সে অচিরে মুক্ত হয়।"[5] এই বচনের শেষভাগে অগ্নিসূর্য্যাদি অপর বস্তুতেও ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া পূর্বোক্ত বিধিতে পূজা করিবার বিধান থাকায় বুঝা যায় যে তখন প্রতীকপূজাও প্রচলিত ছিল। তাহাতে ইহাও জানা যায় যে তখন মূর্তিপূজার উপর বেশী জোর দেওয়া হইত না। উহা বৈকল্পিক ছিল। আর হৃদয়েপূজার উল্লেখ[6] থাকাতে বুঝা যায় যে মূর্তি কিম্বা প্রতীকও গৌণ, তদ্ব্যতীতও ঐ পদ্ধতিতে পূজা করা যাইতে পারিত। ভগবানের বর্ণ ও রূপ কোন্ যুগে কি প্রকার হয় এবং কোন্ কোন্ নামে আর কি কি বিধিতে তাহার পূজা করিতে হয় মহাত্মা করভাজন তাহাও বিবৃত করিয়াছেন।[7] গীতাতে মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল কিম্বা জল (অর্থাৎ যে কোন বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্রও) অর্পণ করে সংযতচিত্ত পুরুষের সেই ভক্তি-উপহার আমি (আনন্দের সহিত) ভক্ষণ করি।"[8] নারায়ণীয়াখ্যানেও দেবতাকে ঠিক সেই প্রকারে হব্যকব্যাদি অর্পণের এবং তৎসমস্ত তাঁহার চরণে উপস্থিতির কথা আছে।[9] কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে ঐ সকল বচনে সগুণ সাকার উপাসনা সূচিত হয়। কেননা, সগুণ সাকার ব্যক্তিকেই পত্রাদি উপহার প্রদানের এবং তৎকর্তৃক ঐ সকল ভক্ষণ বা গ্রহণের কথা হইতে পারে। পরন্তু তাহা বলিয়া, উহারা মূর্তিপূজার কিংবা প্রতীকপূজারও সূচনা করে বলিয়া প্রকৃত পক্ষে বলা যায় না।

মনস্তত্ত্বের বিচারে ইহা অবশ্যই অতি সত্য যে যে বিষয় যত সূক্ষ্ম, সেই বিষয়কে ধারণা

---

[1] মূলে আছে "বিধিনা…তন্ত্রোক্তেন চ।" টীকাকার শ্রীধরস্বামী মনে করেন যে চকার দ্বারা বৈদিক বিধিরও সহিত সমুচ্চয় বলা হইয়াছে।

[2] (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।৩।৪৭—৮

[3] ঐ, ১১।৩।৪৯—৫৩

[4] মূলে আছে "যজতি স্বমাত্মানং"। পূর্বোক্ত "আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্মূর্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ" বচন স্মরণ করিয়া বলিতে হয় যে এই বচনে আপন আত্মাকে ঈশ্বরময় বলিয়া ধ্যান করতঃ প্রতীকে ঈশ্বরের পূজাকে ঈশ্বর ও আত্মার পূজা বলা হইয়াছে।

[5] ঐ, ১১।৩।৫৪—৫

[6] আরও দেখ, "অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ" ইত্যাদি। (১১।৩।৫০)

[7] ঐ, ১১।৫।২০—

[8] গীতা, ৯।২৬

[9] মহাভা, ১২।৩৪৩।৬৩—৪

করা মানুষের পক্ষে তত কঠিন এবং যে বিষয় যত স্থূল সেই বিষয়কে ধারণা করা তত সহজ; আবার যাহার বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম সে তত সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহ অনায়াসে ধারণা করিতে পারে, যেগুলির ধারণা স্থূলবুদ্ধি সাধারণ লোকে কিছুতেই করিতে পারে না। সুতরাং নির্গুণ অপেক্ষা সগুণের ধারণা করা সাধারণ সাধকের পক্ষে অবশ্যই সহজ এবং সগুণ নিরাকার অপেক্ষা সগুণ সাকারের ধারণা করা আরও সহজ। তাই সাধনার সৌকর্য্যার্থ প্রাচীন ভাগবতধর্মে নির্গুণ নিরাকার ভগবানের সগুণ সাকার রূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যে প্রথমে বিরাট্পুরুষরূপের কল্পনা ও উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, পরে ক্ষুদ্রপুরুষরূপের অর্থাৎ মনুষ্য-পরিমাণ পুরুষরূপের কল্পনা ও উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। এই সকল পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপাসনাকে আরও সুসুখ এবং সুকর করিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় কালান্তরে কোন শিল্প-প্রিয় ঋষি ঐ ক্ষুদ্রপুরুষরূপের ধাতুময়, পাষাণময় কিম্বা মৃন্ময় প্রতিমা প্রস্তুত করেন। যদিও শুকদেব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভগবানের স্থূল হইতে স্থূলতর ("স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং") রূপ বলিয়াছেন, মূর্তি নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও অতি স্থূলতর। কালক্রমে ভাগবতধর্মে ঐ মূর্তিপূজার পদ্ধতিও চলিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র উক্ত ভাগবতধর্মবিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে ভগবানের উপাসনায় মূর্তিপূজার স্থান তখনও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। কেননা, তথায় পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে "যে কেবলমাত্র মূর্তিতেই ভগবানের পূজায় শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু তাঁহার ভক্তগণে এবং অপর সকলেতে (অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে) তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হয় না, সে প্রাকৃত (বা নিকৃষ্ট সাধারণ) ভক্ত বলিয়া স্মৃত হয়।"[১] তন্মতে উত্তমভাগবতের লক্ষণ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। ঐ পুরাণের অন্যত্র আছে যে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট "(ভগবান্) নারায়ণ (ঋষির) মুখ হইতে শ্রুত সনাতন ধর্ম" ব্যাখ্যা করেন।[২] ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "উনি (ভগবান্ হরি) দেবতা, ঋষি, মনুষ্য ও তির্যক্ (অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি নামে অভিহিত) পুরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। উনি ঐ পুরসমূহে জীবরূপে শয়ন করিয়া আছেন। সেইহেতু তিনি 'পুরুষ' (নামে অভিহিত হইয়া থাকেন)। হে রাজন্! ঐ পুরসমূহে ভগবান্ তারতম্যরূপে প্রকটিত আছেন। যে পুরে আত্মা যত অধিক প্রকটিত, সেই পুরুষ (পূজার) তত (শ্রেষ্ঠ পাত্র)। হে রাজন্! ঐ পুরুষগণের পরস্পরের মধ্যে অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া ত্রেতাদিযুগসমূহে তত্ত্বদর্শিগণ ভগবানের পূজাদির জন্য অর্চা (কল্পনা) করেন। তখন হইতে কেহ কেহ পরম শ্রদ্ধা সহকারে উপকরণাদির দ্বারা অর্চাতে হরির উপাসনা করিতেছে। পরন্তু যাহারা পুরুষ গণের প্রতি দ্বেষ করে, তাহারা (প্রতিমাতে হরির) উপাসনা করিলেও (তাহাদের) উপাসনা অর্থদ হয় না।"[৩] তাৎপর্য এই যে—ভগবান্ জীবরূপে অবস্থিত আছেন; সুতরাং জীবের পূজা ভগবানেরই পূজা,—জীবে ভগবানের পূজাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পূজা। আদিতে ভগবানের পূজার ঐ পদ্ধতিমাত্রই প্রচলিত ছিল। কালান্তরে মনুষ্যের বুদ্ধি মলিন হওয়াতে সাধারণে ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইল, তখন তাহারা জীবমাত্রকে ভগবানের রূপ, সুতরাং সর্বজীবের

---

[১] (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২।৪৭

[২] (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১১।৫—৬

[৩] ঐ, ৭।১৪।৩৭—৪

সেবাই ভগবানের সেবা, বলিয়া ধারণ করিতে পারিল না। তখন ঋষিগণ তাহাদের জন্য মূর্তিপূজা উদ্ভাবন করেন। 'শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে'ও সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে

"শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ॥"[১]

'যোগিগণ (আপন আপন) আত্মাতেই শিবকে দর্শন করিয়া থাকেন, প্রতিমাসমূহে নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই ভাবনার্থ প্রতিমা পরিকল্পিত হইয়াছে।' উহাতে মূর্তিপূজার নিন্দাও আছে।[২] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, কৃষ্ণ বলেন, যেই সকল মনুষ্য স্বল্পতপস্যা-সম্পন্ন, তাহারাই কেবল অর্চাতে দেবদৃষ্টি করিয়া থাকে ("স্বল্পতপসাং নৃণামর্চায়াং দেবচক্ষুষাং")।[৩]

প্রতিমা পূজার নিকৃষ্টতার উল্লেখ কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। যথা, 'বৃহৎ-পরাশরসংহিতা'য় আছে, জল, অগ্নি, হৃদয়, সূর্য, স্থণ্ডিল ও প্রতিমা—এই ছয় স্থলে হরির সম্যক্ অর্চনা মুনিগণ কর্তৃক বিহিত হইয়াছে। ক্রিয়াবান্‌গণ অগ্নিতে, যোগিগণ হৃদয়ে, মনীষিগণ দ্যুলোকে (বা সূর্যে), ভাবিতাত্মাগণ স্থণ্ডিলে এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রতিমায় হরির পূজা করিবে। যেহেতু জল হরির আয়তন, সেইহেতু জলে হরির পূজা সকলে সর্বদা করিতে পারে।[৪] 'শাতাতপস্মৃতি'তে আছে, "মনুষ্যগণের দেবতা জলে, মনীষিগণের দেবতা দ্যুলোকে, যোগিগণের দেবতা আত্মায় এবং মূর্খগণের দেবতা কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতে।" একটা বচনে আছে, "পাষাণ, লৌহ, মণি, মৃত্তিকা (প্রভৃতি) নির্মিত বিগ্রহসমূহে পূজা মুমুক্ষুর পুনর্জন্মভোগকরী। সেইহেতু যতি মুক্তিলাভার্থ বাহ্যবস্তুতে পূজা পরিত্যাগ করতঃ স্বহৃদয়েই অর্চনা করিবে।"[৫]

পক্ষান্তরে প্রতিমাপূজার প্রাশস্ত্যের উল্লেখও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যথা, 'গোপালোত্তরতাপিনী-উপনিষৎ' নামক এক বৈষ্ণব উপনিষদে আছে,—কৃষ্ণ বলেন যে, যে প্রতিমায় তাঁহার অর্চনা করে, সে ভুবনে তাঁহার প্রিয়তর; সুতরাং সর্বদা তাহাতে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের পূজা কর্তব্য।[৬]

এইখানে ইহা উল্লেখ করা উচিৎ মনে হয় যে প্রতিমা-পূজা এই দেশে কখন হইতে প্রচলিত হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলির উক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহার সময়ে,—খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে, মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন শিল্পী দেবপ্রতিমা বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। তিনি শিব, স্কন্দ এবং বিশাখের

---

[১] শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ, ৪।৫৯

[২] পরে দেখ। [৩] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮৪।১০·১

[৪] জীবানন্দের 'ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহে'র ২য় খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠা দেখ।
'ঋগ্বিধানে'ও তাহা আছে। দ্যা দ্বিবেদের 'নীতিমঞ্জরী'তে ধৃত
'ঋগ্বিধান' বচন। (৪ পৃষ্ঠা)

[৫] T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, Vol- I—Part 1' ভূমিকার ২৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ধৃত।

[৬] "যোঽর্চয়েত প্রতিমাং মাং চ স মে প্রিয়তরো ভুবি।
তস্যামধিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণরূপী পূজ্যস্ত্বয়া সদা॥"
—গোপালোত্তরতাপিনী উ, ৩)

প্রতিমার উল্লেখ করিয়াছেন।[১] তাঁহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' হইতে জানা যায় যে তৎকালে রাজধানীতে, তথা সমগ্র রাষ্ট্রের—গ্রামের ও নগরের, স্থানে স্থানে "দেবগৃহ" ছিল এবং উহাদিগেতে "দেবপ্রতিমা" প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২] তিনি বলিয়াছেন যে পুর-নির্মাণ সময়ে উত্তর ভাগে "নগররাজদেবতা"র স্থান নির্মাণ করাইতে হইবে; পুরমধ্যে অপরাজিতা, অপ্রতিহত, জয়ন্ত ও বৈজয়ন্ত—এই সকল বাস্তুদেবতার "কোষ্ঠক" নির্মাণ করাইবে এবং "ঐ সকল কোষ্ঠকালয়ে যথোদ্দেশ বাস্তুদেবতা স্থাপন করাইবে;" শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীদ্বয় এবং শ্রীর (বা লক্ষ্মীর) "মন্দিরগৃহ" নির্মাণ করাইতে হইবে; দিকে দিকে দিগ্‌দেবতাগণকে স্থাপন করিতে হইবে।[৩] দেবমূর্তিসমূহের সেবাপূজাদির সুপরিচালনের, তথা দেবসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের, সুব্যবস্থার জন্য রাজা একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করিতেন, উনি দেবতাধ্যক্ষ নামে অভিহিত হইতেন।[৪] কৌটিল্য ইন্দ্রপূজারও উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনাবৃষ্টিতে শচীনাথ, গঙ্গা, পর্বত ও মহাকচ্ছের পূজা করাইবে।"[৫]

'ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে'—(সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ব্রাহ্মণ)—দেবতায়তনের এবং দেবতাপ্রতিমার উল্লেখ আছে,—দেবতায়তনের কম্পনের কিম্বা দেবতাপ্রতিমার হাসি, কান্না, নৃত্য, প্রভৃতির কুফলের শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদির বিধান আছে।[৬] 'মহাভারতে' এবং 'রামায়ণে'ও ঐ প্রকারের কুলক্ষণের উল্লেখ আছে। যথা, 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে পরমর্ষি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সুমহান্ ক্ষয়ের যে সকল নিমিত্ত দেখা যাইতেছে, দেবতাপ্রতিমার হাসি কম্পনাদি উহাদের অন্যতম।[৭] মহাবীর ভীষ্মের পতনের প্রাক্কালেও ঐ প্রকার নিমিত্তসমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল নাকি,—তখনও নাকি দেখা গিয়াছিল যে "কৌরবেন্দ্রের দেবতায়তনস্থ দেবতাগণ কাঁপিতেছিলেন, হাসিতেছিলেন, নাচিতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন।"

---

১) "জীবিকার্থে চাপণ্যে"—পাণিনির এই সূত্রের (৫।৩।৯৯) ভাষ্যে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, "অপণ্য ইত্যুচ্যতে তত্রেদং ন সিধ্যতি। শিবঃ স্কন্দঃ বিশাখ ইতি। কিং কারণম্। মৌর্যৈর্হিরণ্যার্থিভির্চাঃ প্রকল্পিতাঃ। ভবেত্তাসু ন স্যাৎ। যস্ত্বেতাঃ সম্প্রতি পূজার্থাস্তাসু ভবিষ্যতি।" তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে দেবতার মূর্তিনির্মাণ মৌর্যগণ প্রচলিত করেন। পরন্তু ঐ অনুমান সঙ্গত হইবে না। কেননা, মূর্তিপূজা তদপেক্ষা প্রাচীনতর।

২) 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র', আর্ শামাশাস্ত্রী-সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, মহীশূর, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২।৩৫ (১৪২ পৃষ্ঠা); ২।৩৬ (১৪৪ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—৪।১৩ (২৩৬ পৃষ্ঠা); ১২।৫ (৩৯১ ও ৩৯৩ পৃষ্ঠা); ১৩।২ (৩৯৮ পৃষ্ঠা); ১৩।৩ (৪০২ পৃষ্ঠা)।

৩) ঐ, ২।৩ (৫৫-৬ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—**Dr. Binode Bihari Dutt, Townplanning in Ancient India,' Calcutta.**

৪) 'অর্থশাস্ত্র', ৫।২ (২৪৪ পৃষ্ঠা)। ৫) ৪।৩ (২০৮ পৃষ্ঠা)।

৫) "...দেবতায়তনানি কম্পন্তে দৈবতপ্রতিমা হসন্তি রুদন্তি নৃত্যন্তি স্ফুটন্তি খিদ্যন্ত্যুন্মীলন্তি নিমীলন্তি ...।" ('ষড়্বিংশব্রাহ্মণ, ৫।১০; জীবানন্দবিদ্যাসাগরসম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, ৩৭ পৃষ্ঠা।)

৬) "দেবতাপ্রতিমাশ্চৈব কম্পন্তি চ হসন্তি চ।
বমন্তি রুধিরং চাস্যৈঃ খিদ্যন্তি প্রপতন্তি চ॥"
—(মহাভা, ৬।২।২৬)।

৭) "দেবতায়তনস্থাশ্চ কৌরবেন্দ্রস্য দেবতাঃ।
কম্পন্তে চ হসন্তে চ নৃত্যন্তি চ রুদন্তি চ॥"
—(মহাভা, ৬।১১২।১১)।

দেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ নগরে এবং ঋষিমুনিদিগের তপোবনে, "দেবতায়তন", "দেবস্থান" বা "দেবগৃহ" প্রতিষ্ঠিত থাকার বহুল উল্লেখ 'মহাভারতে' ও 'রামায়ণে' পাওয়া যায়।[1] ঐ সকল দেবমন্দিরে নিয়মিতভাবে দেবতার পূজা হইত। 'মহাভারতে' আছে যে মহারাজ দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের তপোবনে গিয়া দেবতায়তনসমূহে দ্বিজগণ দ্বারা কৃত দেবতার পূজা দেখেন ("দেবতায়তনানাং চ প্রেক্ষ্য পূজাং কৃতাং দ্বিজৈঃ")।[2] এক শূদ্র সন্ন্যাসী এক কুটী বানাইয়া তাহাতে "বেদী, ভূমি এবং দেবতায়তনসমূহ স্থাপন করেন। এবং ঐ দেবতায়তনসমূহে অভিষেকাদি নিয়মসমূহ (করিবার পর), উপহার প্রদান এবং হবন করতঃ দেবতার পূজা করিতেন।"[3] রাজ্যের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ঐ সকল মন্দিরে বিশেষ পূজা ও উৎসবের ব্যবস্থা হইত। যথা, নলকে পুনরায় পাইয়া বিদর্ভনগরে মহান্ আনন্দোৎসব হয় এবং তখন "সমস্ত দেবতায়তনসমূহ (বিশেষভাবে) পূজিত হইয়াছিল।[4] পরীক্ষিতের জন্মের পর হস্তিনাপুরে যখন নানা উৎসবাদি হইয়াছিল, তখন "দেবতায়তনসমূহের সুবিবিধ পূজা" হইয়াছিল।[5] 'রামায়ণে' বর্ণিত হইয়াছে যে মহারাজ দশরথ, রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক উপলক্ষে, অযোধ্যায় নানা প্রকার মহোৎসব করিতে আদেশ দেন। তখন তিনি ইহাও বলেন যে "দেবতায়তন-চৈত্যসমূহে অন্নাদিভোজ্যবস্তু ও দক্ষিণাসহ, মাল্যযোগ্য বস্তুসমূহ পৃথক পৃথক উপস্থিত করা হউক।"[6] অর্থাৎ তখন দেবমন্দিরসমূহ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল; নানাবিধোপচারে দেবতাগণকে বিশেষভাবে পূজা করা হইয়াছিল; ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান ও দক্ষিণা প্রদান করা হইয়াছিল। রাম মাতা কৌশল্যার প্রাসাদে গিয়া দেখেন তিনি রেশমী কাপড় পড়িয়া দেবতাগারে গিয়া সংযতবাক্যে তাঁহার (রামের) কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছিলেন।[7] রাম, সীতাসহ, স্নান করতঃ নারায়ণের মন্দিরে গিয়া নমস্কার করতঃ ঘৃতপাত্র গ্রহণ করতঃ দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। অনন্তর হবিঃশেষ ভক্ষণ করতঃ "বিষ্ণুর আয়তনে"

দেবপ্রতিমার চলন যে কুলক্ষণ তাহা 'হরিবংশে'ও আছে; "চলিতা দেবতাঃ স্থানাৎ (২।২৩।৩২·২) আরও দেখ— "স্থাপয়ামাস ভাগেষু দেবতায়তনান্যপি।" (২।৩৮।১৬·১)।

[1] মহাভা, ২।৮০।৩০; ৩।১৬।৩; ৩।১৯০।৬৭; ৩।১৯১।৮; ৫।১৫২।২ কথিত হইয়াছে যে কলিযুগের অন্তে "এড়ূকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা" ('পৃথিবী এড়ূক-মণ্ডিত হইবে, দেবগৃহ-ভূষিত নহে') (ঐ, ৩।১৯০।৬৭); লোক দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করতঃ এড়ূকের পূজা করিবে (ঐ, ৩।১৯০।৬৫·২)। 'রামায়ণে' আছে যে অযোধ্যার জনপদে শত শত চৈত্য ছিল ও দেবস্থান ছিল।

> "...চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
> দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ ॥" (২।১০০।৪৩)

তখন লোকে পুষ্পমালা, মিষ্টদ্রব্য, প্রভৃতি উপহার দিয়া দেবতার পূজা করিত বোধ হয়। কেননা, অরাজক রাষ্ট্রের দোষসমূহ প্রদর্শন করিতে গিয়া বশিষ্টাদি ঋষিগণ বলেন, "অরাজক জনপদে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ দেবতার অভ্যর্চনার্থ মাল্য, মোদক ও দক্ষিণা সংগ্রহ করে না।" (ঐ, ২।৬৭।২৭) হস্তিনাপুরেও বহু দেবতায়তন ও চৈত্য ছিল। (মহাভা, ২।৮০।৩০)। দ্বারকায় ও "দেবতায়তনসমূহ" এবং "চৈত্যবৃক্ষসমূহ" ছিল। (মহাভা, ৩।১৬।৩)।

[2] মহাভা, ১।৭০।৪৯·১

[3] মহাভা, ১৩।১০।২০—২১

[4] মহাভা, ৩।৭৭।৮·১

[5] মহাভা, ১৪।৭০।১৬·২

[6] রামা, ২।৩।১৮·২—১৯·১

[7] রামা, ২।৪।৩০

কুশাসন বিছাইয়া মৌনধারণ করতঃ এবং সংযতচিত্তে নারায়ণদেবকে ধ্যান করিতে করিতে সীতা সহ শয়ন করেন।[১] রাষ্ট্রের শোকের সময়ে দেবমন্দিরসমূহ জনপরিত্যক্ত ও হতশ্রী হয়। যথা, ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে দেখেন যে দশরথের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন অযোধ্যার "দেবাগারসমূহ শূন্য"; "দেবতার মূর্তিসমূহ প্রবিদ্ধ"; এবং "দেবায়তনচৈত্যসমূহে পক্ষিগণ দীন বসিয়া আছে"।[২] 'মনুস্মৃতি'তেও দেবতাগার ও দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে যে "দেবতাগার-ভেদক"কে নির্বিচারে বধ (দণ্ড)কর্তব্য ("হন্যাদেবাবিচারয়ন্)[৪] এবং যে দেবপ্রতিমা ভঙ্গ করে ("প্রতিমানাং চ ভেদকঃ") তাহাকে উহা পুনরায় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করাইয়া দিতে হইবে।[৪] কৌটিল্য বলিয়াছেন যে দেবপ্রতিমা অপহরণকারীকে "উত্তম দণ্ড" দিতে হইবে, অথবা "শুদ্ধ বধ" করিতে হইবে।[৫]

'মহাভারতে' তীর্থযাত্রা বিবরণে বিভিন্ন তীর্থে রুদ্র, .বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কুমার প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার নিকটে 'অভিগমন' করার ("অভিগম্য") উল্লেখ আছে।[৬] কেহ কেহ মনে করেন যে দেবমন্দিরে গিয়া দেবদর্শনই দেবতার নিকটে অভিগমন। সুতরাং তখন তীর্থসমূহে রুদ্র বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মন্দির ও মূর্তি ছিল। পরন্তু তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কেননা, 'পাঞ্চরাত্রসংহিতা'সমূহে আছে যে সূর্যোদয়ের পূর্বে 'কর্ম, বাক্ এবং চিত্ত সংযত করতঃ জপ, ধ্যান, অর্চন এবং স্তোত্র দ্বারা……ভগবানের অভিগমন কর্তব্য'।[৭] প্রকরণ হইতে মনে হয় না যে ঐখানে বাস্তবতঃ দেবমন্দিরে গমনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৮] যাহা হউক তখন যে শিবাদি দেবতার মন্দির ও মূর্তিপূজা ছিল তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ আছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে জেষ্ঠীলতীর্থে "বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ মহাদ্যুতিম্" ('দেবী সহ মহাদ্যুতি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া') মনুষ্য মিত্রাবরুণের লোকে গমন করে।[৯] সুতরাং তথায় হরগৌরীর মূর্তি অবশ্যই ছিল। অন্যত্র শিবমূর্তির স্পষ্টোল্লেখ আছে। "নন্দীশ্বরস্য মূর্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যতে কিল্বিষৈঃ" ('নন্দীশ্বরের বা মহাদেবের মূর্তি দর্শন করিয়া পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয়')।[১০] মহাদেবের অর্চা এবং লিঙ্গ উভয়েরই অর্চনার কথা আছে। আরও কথিত হইয়াছে যে লিঙ্গে মহাদেবের অর্চনা বিগ্রহে অর্চনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। পরমর্ষি ব্যাস অশ্বথামাকে বলেন যে তিনি যুগে যুগে অর্চায় শিবের পূজা করিয়াছেন, আর কৃষ্ণ ও অর্জুন লিঙ্গে পূজা করিয়াছেন, সেই হেতু কৃষ্ণার্জুন তাঁহা

---

১) রামা, ২।৬।১—৪ ২) রামা, ২।৭১।৪০·২, ৪১·১ ও ৪৩·১ ৩) মনুস্মৃতি, ৯।২৮০

৪) ঐ, ৯।২৮৫

৫) "দেবপশুপ্রতিমামনুষ্যক্ষেত্রগৃহহিরণ্যসুবর্ণরত্নশস্যাপহারিণ উত্তমো দণ্ডঃ শুদ্ধবধো বা।" ('অর্থশাস্ত্র', ৪।১০।২২৮ পৃষ্ঠা)

৬) যথা দেখ—"অভিগম্য মহাদেবং বরদং রুদ্রমব্যয়ম্"—(মহাভা, ৩।৮৪।১২৭·২)
"অভিগম্য মহাদেবং বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্।"—(ঐ,)
"অভিগম্য হরিংদেবং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ"—(ঐ, ৩।৮৪।১৩১·১)
"অভিগম্য…ব্রহ্মাণং (৩।৮৪।১০৩·২)
"কুমারমভিগম্য"—(৩।৮৪।১৪৫·২)

৭) পূর্বে দেখ। ৮) মহাভা, ৩।৮৪।১৩৫ ৯) মহাভা, ১৩।২৫।৬১·১

১০) পূর্বে পাদটীকা দেখ।

অপেক্ষা জ্ঞানে ও শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ।[১] "প্রভু ভব সর্বরূপ ; ইহা জানিয়া যে লিঙ্গে তাঁহার অর্চনা করে, শাশ্বত আত্মজ্ঞান, ও শাস্ত্রজ্ঞান তাহাতে নিশ্চয় (থাকে)।"[২] "সর্বভূতকে ভব বলিয়া জানিয়া যে লিঙ্গকে অর্চনা করে, প্রভু বৃষভধ্বজ তাহার প্রতি অভ্যধিক প্রীতি করেন।"[৩] "দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাগণ তাঁহার (মহেশ্বরের) লিঙ্গ অর্চনা করেন। ঐ লিঙ্গ ঊর্ধ্বভাবে সমাস্থিত। সুতরাং তাহাতে পূজা করিলে মহেশ্বর আনন্দিত হন—শঙ্কর প্রহৃষ্ট হন এবং (তাঁহার কৃপায় পূজক) সুখী ও প্রীতিযুক্ত হন।"[৪]

"পূজয়েদ্বিগ্রহং যস্তু লিঙ্গং চাপি মহাত্মনঃ।
লিঙ্গং পূজয়িতা নিত্যং মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে॥"[৫]

'যে মহাত্মার (শিবের) বিগ্রহ পূজা করে, আর যে লিঙ্গ পূজা করে; (তাহাদের মধ্যে) লিঙ্গে-পূজক নিত্য মহতী শ্রী লাভ করে।' কথিত হইয়াছে যে নারায়ণতীর্থে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ঋষিগণ, প্রভৃতি সকলে, "জনার্দনকে উপাসনা করেন। (তথায়) শালগ্রাম নামে খ্যাত ('শালগ্রাম ইতিখ্যাত') অদ্ভুতকর্মক বিষ্ণু (আছেন)। (সেই) ত্রিলোকেশ, বরদ এবং অব্যয় বিষ্ণুকে অভিগমন করিয়া (মনুষ্য) অশ্বমেধ (যজ্ঞের ফল) প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে।"[৬] এইখানে বর্তমানের ন্যায় শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুকে পূজা করার প্রথার উল্লেখ হইয়াছে মনে হয়।

বাল্মীকির 'রামায়ণে' বিবৃত হইয়াছে যে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়া ব্রহ্মার, অগ্নির, বিষ্ণুর, মহেন্দ্রের, বিবস্বানের, সোমের, ভগের, কুবেরের, ধাতার, বিধাতার, বায়ুর, নাগরাজ অনন্তের, গায়ত্রীর, বসুগণের, বরুণের, কার্তিকেয়ের এবং ধর্মের "স্থান" দর্শন করেন।[৭] ঐ সকল দেবস্থান ঠিক দেবমন্দির কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অতীব কঠিন। উহারা ঐ সকল বিভিন্ন দেবতার জন্য নির্দিষ্ট বেদী বা চত্বর মাত্র হইতে পারে, অথবা কৌটিল্য যাহাকে "কোষ্ঠক" বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে। যাহা হউক, অযোধ্যায় যে "বিষ্ণুর আয়তন" ছিল, কৌশল্যা যে পট্টবস্ত্র পড়িয়া তথায় গিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্র যে যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্বদিনে নারায়ণের হবনধ্যানাদি করিয়া, সীতা সহ, তথায় রাত্রিবাস করিয়াছিলেন, সেই সকল পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঐ বিষ্ণুমন্দির ইক্ষ্বাকুরাজবংশের নিজস্ব ছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে অশ্বমেধযজ্ঞের পূর্বদিনে রামচন্দ্র "কৃতোদক (অর্থাৎ জল দ্বারা নিত্যকৃত্য করিয়া) ও শুচি হইয়া যথাকালে অগ্নিতে হবন করেন এবং শীঘ্র ইক্ষ্বাকুসেবিত পুণ্য দেবতাগারে গমন করেন। তথায় দেবতাগণকে, পিতৃগণকে এবং বিপ্রগণকে যথাবিধি অর্চনা করতঃ রাম (আপন) জনগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাহ্যকক্ষান্তরে গমন করেন।"[৮] এই দেবতাগার পূর্বোক্ত বিষ্ণুমন্দির হওয়াই সম্ভব। 'রামায়ণে'ও শিবলিঙ্গ পূজার উল্লেখ আছে।

---

১) মহাভা, ৭।২০১।৯২ ২) মহাভা, ৭।২০১।৯৩ ৩) মহাভা, ৭।২০১।৯৬

৪) মহাভা, ৭।২০২।১২৫-৬ ৫) মহাভা, ৭।২০২।১৪০ আরও দেখ—১৩।১৬১।১৬

৬) মহাভা, ৬।৮৪।১২৪—৫ এইখানে বিষ্ণুকে অভিগমন করার ("অভিগম্য…বিষ্ণুং") অর্থ অবশ্যই মন্দিরে গমন করিয়া শালগ্রাম নামক বিষ্ণুকে দর্শন এবং পূজাধ্যানাদি করা। সুতরাং 'মহাভারতে'র অন্যত্র ও 'অভিগমন' শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

৭) রামা, ৩।১২।১৭—২১ ৮) রামা, ৭।৩৭।১৩—৪

কথিত হইয়াছে যে পরমশিবভক্ত লঙ্কাধিপতি রাবণের সোণার শিবলিঙ্গ ছিল। তিনি যেখানে যেখানে যাইতেন সেইখানে সেইখানে উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং স্নানাদি করতঃ বালুকাদির দ্বারা বেদী নির্মাণ করিয়া তদুপরি উহাকে স্থাপন করতঃ সুগন্ধি পুষ্প, চন্দন প্রভৃতির দ্বারা উহার অর্চনা করিতেন। মহাদেবের সম্যক্ অর্চনা করিবার পর রাবণ হস্ত প্রসারণ করিয়া উঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেন ("প্রসার্য হস্তান্ প্রননর্ত চাগ্রতঃ")।[১]

'মহাভারতে' অন্যান্য দেবতার প্রতিমারও উল্লেখ আছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের রথের ধ্বজায় ধর্ম, মারুত, শক্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের "প্রতিমা" ছিল।[২] অর্জুনের ধ্বজায় হনুমানের ও গরুড়ের "প্রতিকৃতি" থাকিত।[৩] অবশ্য ঐ সকল পূজার্থ নহে। তখন গুরুর মূর্তির পূজার প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল দেখা যায়। নিষাদরাজপুত্র একলব্যকে আচার্য দ্রোণ ধনুর্বিদ্যা শিখাইতে অস্বীকার করেন। পরন্তু একলব্য মনে মনে তাঁহাকে আচার্য বলিয়া পরিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পায়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করতঃ অরণ্যে চলিয়া যান। তথায় দ্রোণের মহীময় মূর্তি নির্মাণ করতঃ উহাতে দৃঢ়ভাবে আচার্যবুদ্ধি করতঃ নিয়মাদিতে স্থিত হইয়া উহা হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে থাকেন।[৪] "পরমযোগ দ্বারা পরাশ্রদ্ধাযুক্ত তিনি (অস্ত্রসমূহের) বিমোচন, আদান এবং সন্ধানে পরম লঘুত্ব প্রাপ্ত হন।"[৫] যাঁহারা সাক্ষাৎ দ্রোণ হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন সেই অর্জুনাদিও একলব্যের অস্ত্রনিক্ষেপে লাঘব এবং শব্দবেধিত্ব দেখিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট এবং লজ্জিত হন।[৬] তাহাতে ইহা সিদ্ধ হয় যে চিত্তের পরম একাগ্রতা এবং পরা শ্রদ্ধা থাকিলে গুরুর মূর্তি হইতেও বিদ্যা সম্যক্ অর্জন করা যায়। 'রামায়ণে' আছে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা পূজা করিতেন।[৭]

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং কৌটিল্য বিষ্ণুমূর্তির পূজার উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু পতঞ্জলির সমকালের বা অত্যল্পকাল পরের বেস্‌নগরের শিলালিপিতে "ভগবানের প্রাসাদোত্তমের গরুড়ধ্বজে"র উল্লেখ আছে।[৮] মহাভারত পুরাণাদি হইতে জানা যায় যে গরুড় ভগবান্ বিষ্ণুরই বাহন। সুতরাং ঐ ভগবান্ বিষ্ণুই হইবেন। বিষ্ণুর প্রাসাদোত্তমের অভ্যন্তরে বিষ্ণুর মূর্তি কিম্বা শালগ্রামের ন্যায় কোন চিহ্ন থাকিবারই কথা। গরুড়ধ্বজে অবশ্য গরুড়ের মূর্তি ছিল। বিষ্ণুর বাহনের মূর্তি থাকাতে অনুমান হয় যে বিষ্ণুরও মূর্তি ছিল। কার্টিয়াস লিখিয়াছেন রাজা পুরু যখন গ্রীকবীর অলিকসন্দরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন হেরাক্লেশের এক মূর্তি ("an image of

---

১) রামা, ৭।৩১।৪২—৪

২) মহাভা, ৭।২৩।৮৮ ; ৪০।১৮। তদ্দ্বারা কে কাহার ঔরসজাত তাহা জানা যাইত।

৩) মহাভা, ৫।৫৬।৯।

৪) মহাভা, ১।১৩৪।৩২—৩৫ ৫) মহাভা, ১।১৩৪।৩৬ ৬) মহাভা, ১।১৩৪।৪২—৩

৭) রামা, ৩২।১১৫।২৫—৬

'মহাভারতে' ও 'রামায়ণে' দেবমন্দির ও দেবমূর্তি সম্বন্ধে E. H. Hopkins, Epic Mythology, Strassburg, 1915, pp. 70-ও দ্রষ্টব্য।

৮) পূর্বে দেখ।

Herakles") তাঁহার সৈন্যের অগ্রভাগে বহন করিয়া নেওয়া হইয়াছিল।[১] ঐ, হেরাক্লেশ কে? তাহা লইয়া ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে উনি কৃষ্ণ; অপরে মনে করেন যে উনি শিব। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ দেখাইয়াছেন যে উনি কৃষ্ণ হওয়াই সম্ভব।[২] ঘোসুণ্ডির শিলালেখে "নারয়ণবাটে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব ভগবান্‌দ্বয়ের" "পূজাশিলা"র উল্লেখ তাছে। 'অবদানশতক' নামে বৌদ্ধগ্রন্থেও নারায়ণের পূজার উল্লেখ আছে। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩] 'অবদানশতক' ১০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে রচিত হয়। ৩য় খ্রীষ্টশতকের প্রথমভাগে উহা চীনভাষান্তরিত হয়। উহার ৭ম অবদানে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ বুদ্ধের জন্মের পূর্বে শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ পুষ্প, ধূপ, সুগন্ধ, মালা ইত্যাদি দ্বারা "তীর্থিক দেবতাগণে"র পূজা করিতেন। এক দিন এক মালী রাজা প্রসেনজিতের জন্য নয়টি কমল লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক জন তীর্থিক ঐ কমল কিনিতে চাহে। উভয়ে অনাথপিণ্ডদের নিকট উপস্থিত হয়। তীর্থিক যত দাম দিতে চাহিয়াছিল, তিনি তাহার দ্বিগুণ দাম দিতে বলেন। এই প্রকারে পরস্পরে দাম বাড়াইতে বাড়াইতে লক্ষ মুদ্রা পর্যন্ত পৌঁছে। তখন মালী তীর্থিককে জিজ্ঞাসা করেন, কাহার জন্য তুমি এত বেশী দাম দিতে চাহিতেছ?' তিনি উত্তর করেন, "অহং ভগবতো নারায়ণস্যার্থে ইতি" ('অর্থাৎ আমি ভগবান্ নারায়ণের (পূজার) জন্যই (এত বেশী দাম দিয়া কমল কিনিতে চাহিতেছি')। ২৩শ অবদানে বিবৃত হইয়াছে যে রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী ব্যবসার্থ সমুদ্রপারে গমন করিলে, গৃহে তাহার যুবতী স্ত্রী ভগবান্ নারায়ণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া এই মানসিক করে যে, "আমার স্বামী যদি সত্বর (গৃহে) প্রত্যাবর্তন করে, আমি ভগবান্‌কে এক সুবর্ণ পাত্র উপহার প্রদান করিব।" যখন ঐ শ্রেষ্ঠী নিরাপদে এবং সফলকাম হইয়া ঘরে ফিরে তখন তাহার স্ত্রী এক সুবর্ণ পাত্র প্রস্তুত করাইয়া চক্র, ধূপ এবং পুষ্পসহ দেবকূলে (অর্থাৎ নারায়ণের মন্দিরে) গমন করে।

যে সকল ব্রাহ্মণ দেবমন্দিরে দেবপূজাদি করিয়া তল্লভ্য সামগ্রী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন,—দেবপূজাদিই যাঁহাদের বৃত্তি, তাঁহাদিগকে 'দেবলক' ব্রাহ্মণ বলা হয়। দেবলক ব্রাহ্মণের উল্লেখ 'মহাভারতে' এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে আছে।[৪] সর্বত্রই উঁহাদিগকে নিন্দিত ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

জীবসেবা ভগবৎসেবা—এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রবর্তিত সনাতনধর্ম মতে ভগবান্ জীবরূপে অবস্থিত আছেন; সুতরাং জীবের পূজা ভগবানেরই পূজা,—জীবে ভগবানের পূজাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ঐ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে যে ত্রিশধর্ম পালন করিলে সর্বাত্মা ভগবান্ পরিতুষ্ট হন,

---

১) Cunningham, Coins of Ancient India, p. VII

২) R. P. Chanda, "Archeology and Vaisnava Tradition", Memoirs of the Archeological Survey of India, No. 5, 1920, pp. 154-7

৩) R. P. Chanda, Indo-Aryan Races, Part I, Rajshahi, 1916, pp. 89—90

৪) মহাভা, ১৩৷৯০৷১১, ইত্যাদি; মনুস্মৃতি, ৩৷১৫২,১৮০ ইত্যাদি।

মানুষের সেই পরমধর্মসমূহের অন্যতম এই—সমস্ত প্রাণিদিগেতে, বিশেষতঃ মনুষ্যদিগেতে, আত্মবুদ্ধি ও ভগবদ্বুদ্ধি, এবং সেইহেতু অন্নাদির যথাযোগ্য সংবিভাগ।[১] "হে রাজন! স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত বিত্ত দ্বারা নিত্য প্রতি দেবতা, ঋষি, প্রাণিগণ, পিতৃগণ এবং আপনার (অর্থাৎ সর্বজীবের) পূজা করা (গৃহস্থের) উচিৎ। তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ (রূপে) পুরুষেরই (অর্থাৎ ভগবানেরই) পূজা হইয়া থাকে।"[২] "সেইহেতু ব্রাহ্মণ, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি (সর্বজীবে) যথাযোগ্য,—উহাদের উপযুক্ত, কোশাদির দ্বারা এই ক্ষেত্রজ্ঞের পূজা কর।"[৩] পূর্বে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে দেবমনুষ্যাদি পুরসমূহে ভগবান্ তারতম্যরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন; যে পুরে তিনি যত অধিক প্রকটিত, সেই পুরুষ তাঁহার পূজার তত শ্রেষ্ঠ পাত্র। অধিকন্ত ঐ ধর্মে সমস্ত পুরুষের মধ্যে ব্রাহ্মণকে ভগবানের পূজার শ্রেষ্ঠ পাত্র মানা হয়; কেননা, তপ; বিদ্যা এবং সন্তোষ প্রভৃতি সদ্গুণরাশির দ্বারা তিনি হরির বেদ (বা জ্ঞান) তনুকে ধারণ করেন।[৪] তাই বলা হয় যে দেবতাদি অপর পুরুষে ভগবানের পূজা ব্রাহ্মণে ভগবানের পূজা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহা আরও বিশেষ করিয়া খ্যাপনার্থ নারদ, অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা অধিকারী এবং সর্বযজ্ঞসম্পদ্‌বান ব্যক্তি কর্তৃক ভগবানের পূজার বিধান উল্লেখ করিবার পর, বলেন, "হে রাজন! সর্বযজ্ঞভুক্ এই ভগবান্ অগ্নিমুখে হুত হবি দ্বারা তেমন পূজিত হন না, যেমন ব্রাহ্মণমুখে হুত হবি দ্বারা হন।"[৫] ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে একমাত্র ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা হইবে। কেননা, তাহাতে এই বচনের প্রাগ্‌বর্তী ও পরাগ্‌বর্তী সর্বপ্রাণীর সেবা-বিষয়ক বচনসমূহের বিরোধ হইবে। নারায়ণীয়ধর্মের মতে, গৃহস্থ "ভোগ্যপদার্থসমূহ কুকুর, পতিত এবং চণ্ডাল পর্যন্ত (সর্ব প্রাণীতে) যথাযোগ্য সংবিভাগ করিতেন।"[৬]

ভগবান্ নারায়ণ ঋষি স্বয়ং নারদকে বলেন—

"যে যজন্তি পিতৄন দেবান্ গুরূংশ্চৈবাতিথীংস্তথা।
গাংশ্চৈ দ্বিজমুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং মাতরং যথা॥
কর্মণা মনসা বাচা বিষ্ণুমেব যজন্তি তে।
অন্তর্গতঃ স ভগবান্ সর্বসত্ত্বশরীরগঃ॥
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ঈশ্বরঃ সুখদুঃখয়োঃ।
মহান্ মহাত্মা সর্বাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ॥"[৭]

'যাহারা মন, বচন এবং কর্ম দ্বারা পিতৃগণ, দেবগণ, গুরুগণ, অতিথিগণ গোগণ এবং ব্রাহ্মণগণের, তথা পৃথিবীর এবং মাতার সেবা করে, তাহারা বিষ্ণুরই সেবা করে।

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১১।১০; আর দেখ, ৭।১৫।৬ ২) ঐ, ৭।১৪।১৫ ৩) ঐ, ৭।১৪।১৮ বাসুদেবভাবাপন্ন ঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে উপদেশ করেন যে, হে পুত্রগণ, চরাচর সর্বপ্রাণীতে মদ্‌বুদ্ধি করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে পদে পদে উহাদের সেবা করা তোমাদের উচিৎ। তাহাই আমার পূজা।" (৫।৫।২৬) সুতরাং তাঁহার মতেও জীবসেবাই ভগবানের সেবা।

৪) ঐ, ৭।১৪।৪১ ৫) ঐ, ৭।১৪।১৭; বাসুদেব-ভাবাপন্ন ঋষভদেবও সেই প্রকার বলেন। (৫।৫।২৩)

৬) "আশ্বাধান্তেবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্‌যথা।" (৭।১৪।১১'১) ৭) মাহাভা ১২।৩৪৫।২৬—৮

(কেননা,) সেই ভগবান্ (সর্ববস্তুর) অন্তর্গত,—সর্বপ্রাণীর শরীরের অন্তর্গত। তিনি সর্বভূতে সম(ভাবে অবস্থিত) এবং সুখ ও দুঃখের ঈশ্বর। নারায়ণ মহান্ মহাত্মা এবং সর্বাত্মা। ইহা আমরা শুনিয়াছি।’ তৎপূর্বে কেবল দৈব এবং পিত্র্য কর্মসম্পর্কে তিনি নারদকে সেইরূপ বলেন,—“ঐ যিনি সদ্‌সদাত্মক (ক্ষেত্রজ্ঞ), দৈব ও পিত্র্য কর্মে আমরা তাঁহাকেই পূজা করিতেছি ; কেননা; তিনিই দেবতা ও পিতা রূপে কল্পিত হন। হে দ্বিজ ! তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর দেবতা বা পিতা নাই। যেহেতু তিনি আমাদের আত্মা বলিয়া বিজ্ঞেয়, সেইহেতু আমরা তাঁহার পূজা করিতেছি।”[১] বরাহরূপধারী ভগবান্ নারায়ণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি সিদ্ধ করেন যে তিনিই (নারায়ণই) পিতৃগণ, এবং পিতৃগণের পূজা তাঁহারই পূজা। পিতৃকার্যমর্যাদা-স্থাপনার্থ বৃষাকপি স্বয়ং আহ্নিককালে পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করেন।[২] তিনি বলেন, “আমিই এই তিন পিণ্ডে পিতা, পিতামহ, এবং প্রপিতামহ রূপে সংস্থিত বলিয়া জান। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। সুতরাং অপর কে আমার নিজের পূজ্য ? সংসারে আমার পিতাই বা কে ? আমিই পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ। আমিই এই বিষয়ে কারণ।”[৩] এই বচনে পিতৃগণের নাম উপলক্ষণাত্মক মনে করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। নারায়ণ ঋষি বলেন, “দৈব এবং পিত্র্যকর্ম তাঁহারই (অর্থাৎ দেবতাগণের ও পিতৃগণের পূজা প্রকৃত পক্ষে ভগবানেরই পূজা [৪])—ইহা সতত তত্ত্বতঃ জানিয়া দ্বিজোত্তমগণ তাঁহা হইতে (অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে) আত্মার প্রাপ্তব্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন।”[৫] এই খানেও দেবতাগণ এবং পিতৃগণকে সর্বজীবের উপলক্ষণাত্মক বলিয়া মনে করা যায়। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে ভগবানের সেবা বলিয়া সতত তত্ত্বতঃ জানিয়া ব্রহ্মাদিকীটপর্যন্ত জীবগণের সেবা করিলে ভগবানের প্রসাদে জীবের সর্ববস্তুপ্রাপ্তি হয়।

গীতাতে ঐ সিদ্ধান্তের কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন, “সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা এবং সর্বভূত আমার পূজার স্থান (‘পূজাপদানি’)। বেদবিদ্যা দ্বারা সূর্য্যে, ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণে, যবতৃণাদি দ্বারা গো’তে, বন্ধুবৎ সৎকার দ্বারা বৈষ্ণবে, হৃদয়ে ধ্যান নিষ্ঠা দ্বারা আকাশে, মুখ্যপ্রাণ দ্বারা বায়ুতে, দ্রব্য পুরস্কার দ্বারা জলে, মন্ত্র দ্বারা স্থণ্ডিলে, ভোগ দ্বারা আত্মাতে এবং সমত্ব দ্বারা সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা আমার পূজা করিবে।”[৬] নারায়ণ ঋষি যে যথাযোগ্য অর্থাৎ যাহার যাহা উপযুক্ত তাহাকে সেই ভোগাদি প্রদান করিয়া সর্বজীবে ক্ষেত্রজ্ঞের পূজা করিবার বিধান দিয়াছেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ বিস্তার মাত্র।

---

[১] মহাভা, ১২।৩৩৪।৩২—৩ [২] ঐ, ১২।৩৪৫।১২—৭ [৩] ঐ, ১২।৩৪৫।২১—৩

[৪] নারায়ণ ঋষির এই অনুশাসন পরে নারদও বর্ণনা করিয়াছেন। (ঐ, ১২।৩৪৫।৪—৮·১)

[৫] ঐ, ১২।৩৩৪।৮

[৬] ‘(বিষ্ণু)ভাগ, ১১।১১।৪২—৫ ; পরে কৃষ্ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধর্ম সম্বন্ধে সেই প্রকার বলিয়াছেন—

“অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষু মাং পরম্।
অপৃথগ্‌ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্ব্যকল্মষঃ ॥” (ঐ, ১১।১৭।৩২)

শিব বলিয়াছেন, “আত্মমায়া দ্বারা মোহিত হইয়া (পরস্পর) বদ্ধবৈর প্রাণিগণের কৃপাকারী পুরুষের উপর সর্বাত্মা হরি প্রসন্ন হন। (৮।৭।৩৯·২—৪০·১)

"বাসুদেবঃ সর্বং"। "নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণং"। সুতরাং জগৎ ভগবানই। আরও বিশেষ করিয়া বলিলে, ভগবানই জীবরূপে অবস্থিত। অতএব জগতের সেবা,—জীবের সেবা প্রকৃত পক্ষে ভগবানেরই সেবা। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা বলা অবশ্য বাহুল্য যে জগতের কোন এক প্রাণীর সেবাও ভগবানেরই সেবা; কেননা, অংশের সেবা বস্তুতঃ অংশীরই সেবা। প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত মতে ব্রহ্ম বস্তুতঃ সর্বাত্মক নহে, তিনি নিষ্প্রপঞ্চ,—নির্বিশেষ অদ্বৈত; প্রতীয়মান সার্বাত্ম্য মায়িক। পরন্তু সাধককে ব্রহ্মের সার্বাত্ম্য মানিয়া লইতে হয়। তাই ভগবান্ নারায়ণ ঋষির সনাতন ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নারদ বলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর উচিৎ

"অগ্নৌ গুরাবাত্মনি স সর্বভূতেষ্বধোক্ষজম্।
ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ॥"[১]

অর্থাৎ যদিও ভগবান্ বাসুদেব প্রকৃত পক্ষে বিশ্বপ্রপঞ্চের কোন পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট নহে, সুতরাং উনি সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ হইতে অত্যন্ত পৃথক্, অতএব সর্বাত্মক নহে, তথাপি ব্যবহার ভূমিতে অগ্নিতে, গুরুতে, আপনাতে অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে উহাঁকে প্রাণীরূপে যেন প্রবিষ্ট বলিয়া দর্শন করিতে হইবে,—তাঁহাকে সর্বাত্মক বলিয়া মনে করিতে হইবে। ঐ দৃষ্টিতেই বলা হয় যে "বাসুদেবঃ সর্বং"। অপর কথায় সংক্ষেপে বলিলে,—যদিও তাহা পরমার্থতঃ সত্য নহে, তথাপি ব্যবহার-ভূমিতে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ভগবান্ জীবরূপে অবস্থিত আছেন! তাহার হেতুও প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রকার "চরন্ বিদিতবিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি" (অর্থাৎ আচরণ করিলে মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞানলাভ করত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়)।"[২] ভগবান্ ঋষভদেব বলেন, মন, বাণী, দৃষ্টি এবং অপর ইন্দ্রিয়চেষ্টারূপ কর্মদ্বারা চরাচর সব প্রাণীর পূজাই ভগবানের সাক্ষাৎ পরিবর্হণ। তদব্যতীত মনুষ্য মহাবিমোহ হইতে, কৃতান্তপাশ হইতে, বিমুক্ত হইতে সমর্থ হয় না।[৩]

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভগবানের সেবা ভাবিয়াই জীবের সেবা করিবার বিধান প্রাচীন ভাগবতধর্মে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা না ভাবিয়া ভিন্ন দৃষ্টিতে জীবসেবার নিন্দা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' দেখা যায়। যথা শুকদেব বলেন,

"যদ্‌যুজ্যতেঽসুবসুকর্মমনোবচোভি—
র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ
সর্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ॥"[৪]

'মনুষ্য আপন প্রাণ, ধন, কর্ম, মন, বাণী প্রভৃতির দ্বারা ভেদদৃষ্টিতে (অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে করিয়া) আপন দেহ, পুত্র, কন্যা, প্রভৃতির জন্য যাহা যাহা করে, সেই সকল অসৎ (বা ব্যর্থ) হয়। আর উহাদেরই দ্বারা অভেদদৃষ্টিতে (অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া দেহপুত্রাদির জন্য) যাহা যাহা করে, সেই সকল সৎ (অর্থাৎ মহাফলবান্) হয়। বৃক্ষের মূলে যাহা নিষিক্ত হয়, তাহা (শাখাপল্লবাদি) সকলেরই হয়। (উহাও তদ্বৎ)।

---

[১] (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১২।১৫ [২] ঐ, ৭।১২।১৬ [৩] ঐ, ৫।৫।২৭ [৪] ঐ, ৮।৯।২৯

আত্মসেবা ও ভগবৎসেবা—এইখানে একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিৎ বোধ হয়। ভগবান্ জীবরূপে অবস্থিত। সুতরাং যেমন অপর জীবরূপে তেমন নিজরূপেও,—প্রত্যেক মানুষের আপন স্বরূপেও ভগবান্ অবস্থিত। অতএব নিজের সেবা ও ভগবানের সেবা, এই প্রকারই মনে করিতে হইবে। ইহাই প্রাচীন ভাগবতধর্মের সিদ্ধান্ত। তাই ভাগবতধর্মের ব্যাখ্যা কালে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে স্বোপার্জিত বিত্ত দ্বারা যেমন দেবতাদি অপর জীবের, তেমন আপনারও, পূজা করা গৃহস্থগণের উচিৎ।[১] "দেবতাকে, ঋষিকে, পিতাকে এবং অন্য প্রাণীকে, তথা স্বজনকে এবং আপনাকেও ('আত্মনে স্বজনায় চ'), অন্ন সংবিভাগ করিবে এবং তখন তৎসকলকে (পরম) পুরুষরূপ বলিয়া দেখিবে।"[২] কৃষ্ণও বলিয়াছেন, যেমন সূর্য্যাদি অপর বিশেষ বস্তুসমূহকে এবং সর্বপ্রাণীকে, তেমন আত্মাকেও অর্থাৎ নিজেকেও ভগবান্-পূজার স্থান বলিয়া মানুষকে মনে করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে "ভোগৈরাত্মানমাত্মনি" অর্থাৎ যথোচিৎ ভোগ্যপদার্থসমূহ গ্রহণ করতঃ মানুষ আপনাতে পরমাত্মার পূজা করিবেক। //

শোচনীয় দুরুপযোগ—প্রাচীন ভাগবতধর্মের ঐ উত্তম ধার্মিক সিদ্ধান্তের কালান্তরে অতি শোচনীয় দুরুপযোগ হইয়াছিল। ভগবানই জীবরূপে অবস্থিত আছেন। সুতরাং যেমন ইহা বলা যায় যে জীবের সেবা করিলে ভগবানের সেবা হয়, তেমন পক্ষান্তরে ইহাও বলা যায় যে ভগবানের সেবা করিলে জীবের সেবা করা হয়। তাই ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রবর্তিত সনাতনধর্মের ব্যাখ্যায় নারদ তাহাও পরিষ্কার বলিয়াছেন। "জীবরাশি দ্বারা পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহান্ পাদপের মুল তিনিই (ভগবান অচ্যুতই)। সুতরাং, অচ্যুতের পূজাতে সর্বজীবাত্মার তর্পণ হয়।[৩] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অপর কোন কোন স্থলেও এই মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, শুকদেব বলেন, যজ্ঞে ভগবান্ তৃপ্ত হইলে, ব্রহ্মাদিতৃণপর্যন্ত দেবতা, মনুষ্য, তির্যক, বৃক্ষ, প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী সদ্যঃ তৃপ্ত হয়; কেননা, তিনিই "বিশ্বজীব"।[৪] সহদেব বলেন— "এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ" (অর্থাৎ কৃষ্ণ এক ও অদ্বিতীয়; এই জগৎ তদাত্মক।[৫] সুতরাং কৃষ্ণকে পূজা করিলে "সর্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ" (অর্থাৎ 'সমস্ত প্রাণীর, তথা আপনারও, পূজা হইয়া যাইবে)।[৬] কৃষ্ণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[৭] ব্রহ্মা বলিয়াছেন,

"যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্বেষামাত্মনশ্চ হি॥"[৮]

'যেমন বৃক্ষের মূলে যাহা সিঞ্চিত হয়, তাহা উহার স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতির হয়, তেমন বিষ্ণুর আরাধনা (দ্বারা) সকলেরই (অর্থাৎ সর্বপ্রণীরই), তথা আপনারও (আরাধনা) হয়।' শুদ্ধ দার্শনিক দৃষ্টিতে এই মত সম্পূর্ণ নির্দোষ। পরন্তু কালান্তরে কেহ কেহ উহার অতি শোচনীয় দুরুপযোগ করিয়াছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মে কালক্রমে দেবতার মূর্তিপূজার

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১৪।১৫। ; পূর্বে দেখ।
২) ঐ, ৭।১৫।৬
৩) ঐ, ৭।১৪।৩৬
৪) ৫।১৫।১৩
৫) ঐ, ১০।৭৪।২১'১
৬) ঐ, ১০।৭৪।২৩
৭) ঐ, ১০।৮১।৯
৮) ঐ, ৮।৫।৪৯

পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল।[১] তখন ক্রমে ক্রমে কেহ কেহ কেবল মূর্তিপূজাকেই ভগবানের তথা সর্বজীবের, পূজা মনে করিতে লাগিল এবং সেইহেতু, প্রকৃত জীবসেবাকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, অর্চাদিতে সর্বভূতে কিম্বা আত্মাতে (নিজেতে) যখন যেখানে শ্রদ্ধা তখন সেখানে লোকে তাঁহার অর্থাৎ ভগবানের অর্চনা করিতে পারে, তাহাতে কোন পার্থক্য হয় না, কেননা তিনি সর্বাত্মক।[২] 'গরুড়পুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি (অর্চাতে) পুরুষসূক্ত দ্বারা পুষ্পসমূহ এবং জল প্রদান করে তাহার দ্বারা এই চরাচর সমস্ত জগৎ নিশ্চয় অর্চিত হইয়াছে।[৩] তাহাতে লোকে কেবল অর্চাদিতেই ভগবানের পূজা করিতে লাগিল, সর্বভূতে ও আত্মাতে তাঁহার পূজা করিল না। কেবল প্রতিমাতেই দেবদৃষ্টি হেতু মানুষ জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সৎসঙ্গ এবং সেবা পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ উহার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, যাহারা কেবল পার্থিব মূর্তিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং কেবল জলবিশেষে তীর্থবুদ্ধি রাখে, জ্ঞানী মহাত্মাগণে পূজ্যবুদ্ধি এবং তীর্থবুদ্ধি রাখে না, তাহারা গোখর মাত্র।[৪] ঐ বিষয়ে ভগবান্ কপিলের বাণী অতীব তীব্র। তিনি বলেন, "আমি ভূতাত্মারূপে সর্বভূতে সদা অবস্থিত ; সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমা-পূজারূপ বিড়ম্বনা করে। সর্বভূতে আত্মারূপে বর্তমান ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করত যে (মনুষ্য) মুর্খতা বশতঃ মূর্তির পূজা করে, সে ভস্মেই হবন করে (অর্থাৎ তাহার পূজা ভস্মে হবনের ন্যায় বৃথা)। যে ভেদদর্শী প্রাণিগণের প্রতি বদ্ধবৈর এবং (সেইহেতু) অপর শরীরে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে, তাহার মন শান্তি পায় না। হে পাপহীনে, সর্বভূতকে অবমানকারী ব্যক্তি যদি উত্তম কিংবা সাধারণ নানা দ্রব্যসমূহ দ্বারা এবং নানা প্রকার ক্রিয়া দ্বারা মূর্তিতে আমার পূজাও করে, তথাপি আমি তাহার প্রতি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হই না। যে পর্য্যন্ত না এই জ্ঞান হয় যে আমি আপন হৃদয়ে এবং সর্বভূতে অবস্থিত, তাবৎপর্য্যন্ত মনুষ্য স্বকর্ম করত অর্চাদিতে ঈশ্বর আমার পূজা করিবেক। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ('আত্মনশ্চ পরস্যাপি') যে কিঞ্চিৎ মাত্রও অন্তর করে, সেই ভিন্নদর্শীর প্রতি আমি (পুনঃ পুনঃ) মৃত্যুরূপ ঘোর ভয় বিধান করি। সেই হেতু সর্বভূতে ভূতাত্মারূপে আলয়কৃত আমাকে দান, মান এবং মৈত্র্য দ্বারা অভেদ-দৃষ্টিতে ('অভিন্নেন চক্ষুষা') পূজা কর্তব্য।"[৫] শ্রীজাবাল দর্শনোপনিষদে' আছে, "শিব দেহে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মূর্খ ব্যক্তি সদা তীর্থে, দানে, জপে, যজ্ঞে,

---

[১] পূর্বে দেখ। আরও দেখ—(বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২৭ অধ্যায়। দেবমন্দিরে দেবপূজার কথা ও 'মহাভারতে' আছে। যথা দেখ—১।৭০।৪৯

[২] "অর্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ।
সর্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥" (১১।২৭।৪৮)

[৩] গরুড়পু, ১।২২৯।১'২—২'১

[৪] (বিষ্ণু)ভাগ, ১০।৮৪।১৩ ; আরও দেখ—১০।৮৬।৫৪'৭।

[৫] (বিষ্ণু)ভাগ, ৩।২৯।২১—৭ ; আরও দেখ—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥" —(৩।২৯।৩৪)

কবিও বলিয়াছেন, "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্র' প্রাণী, দিক্, বৃক্ষ, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতি যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই হরির শরীর। অতএব সকলকে অনন্যভাবে প্রণাম করিবে" (১১।২।৪১) কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অভিমান ও লোকলজ্জাকে পরিত্যাগ করত কুকুর, চাণ্ডাল এবং গাধাকে পর্য্যন্ত (সর্বপ্রাণীকে) ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। ইহা দেখিয়া যাহারা হাসিবে, তাহাদের উপেক্ষা করিবে।" (১১।২৯।১৬)

কাষ্ঠে এবং পাষাণে শিবকে দেখে। যে অন্তঃস্থ আমাকে পরিত্যাগ করত বহিঃস্থ আমাকে সেবা করে, সে আপন হস্তস্থিত (অন্ন) পিণ্ড পরিত্যাগ করত কূর্পরকে লেহন করে (মাত্র)।”[১]

সাম্যবাদ—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণীয়সনাতনধর্ম মতে প্রত্যেক গৃহস্থকে আপন বিত্ত দ্বারা যেমন নিজের তেমন অপর সর্বপ্রাণীর যথাযোগ্য সেবা করিতে হইবে,—প্রাপ্ত ভোগ্যপদার্থসমূহ আপনাকে লইয়া সর্বপ্রাণীর মধ্যে যথাযোগ্য সংবিভাগ করিতে হইবে। তন্মতে মানুষের বিত্ত প্রকৃত পক্ষে চতুর্বিধ—দিব্য, ভৌম, আন্তরিক্ষ এবং অচ্যুতনির্মিত। “টীকাকার বলেন,—বৃষ্ট্যাদির সহায়ে উৎপন্ন ধান্যাদি দিব্য বিত্ত ; ভূমি হইতে উৎপন্ন স্বর্ণাদি (খনিজ পদার্থ) ভৌম বিত্ত ; অকস্মাৎ প্রাপ্ত বিত্ত আন্তরিক্ষ বিত্ত ; এবং যাহা দৈবলব্ধ তাহা অচ্যুতনির্মিত বিত্ত। যাহা হউক, “তৎসর্বমুপভুঞ্জান এতৎ কুর্য্যাৎ স্বতো বুধঃ।”[২] অর্থাৎ তৎসমস্ত যেমন নিজের উপভোগে, তেমন জীবসেবাদি অপর কার্য্যেও স্বতই প্রয়োগ করা পণ্ডিতগণের উচিৎ। এখন প্রশ্ন—আপন বিত্তের কতটা নিজের উপভোগের জন্য, আর কতটা জীবসেবাদি অপর কার্য্যের জন্য, ব্যয় করা মানুষের উচিৎ ? এই বিষয়ে নারায়ণীয় সনাতনধর্মের সিদ্ধান্ত এই,—

“যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥”[৩]

‘(আপন বিত্তের) যাবন্মাত্র দ্বারা নিজের উদরপূর্তি হয়, মানুষের স্বত্ব অবশ্য তাবন্মাত্রের উপরই। তদপেক্ষা অধিকের উপরও স্বত্ব আছে বলিয়া যে মনে করে, সে চোর। (সুতরাং) সে দণ্ডনায়।’ এই বচনে উদরপূর্তিকে আক্ষরিক অর্থে না লওয়া যাইতে পারে। উহার তাৎপর্য্য এই মনে করা যাইতে পারে যে আপন সাধারণ প্রয়োজন যাহাতে নির্বাহ হয়, ততটা মাত্র ধনের উপর মানুষের অধিকার আছে, ততোধিকের উপর নহে। প্রয়োজন কম রাখিবার অভিপ্রায়েই উদরপূর্তির কথা বলা হইয়াছে। আপন প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ মানুষকে অপরের সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। ঐ বচনের অব্যবহিত পরে উক্ত হইয়াছে যে “হরিণ, উট, গাধা, বানর, ইন্দুর, সরীসৃপ, খগ, মক্ষিকা প্রভৃতিকে আপন পুত্রবৎ দেখিবে। পুত্র হইতে উহাদের পার্থক্য কতটা ?”[৪] অর্থাৎ আপন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আপন স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সকল প্রাণীর সেবায় সমভাবে লাগাইতে হইবে ; সকলেরই উহাতে সমান অধিকার আছে। ইহা দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে মনে করা হইত যে প্রত্যেক মানুষের নিজের প্রয়োজন এবং অধিকারও উহাদের প্রয়োজন এবং অধিকারের সমানই, ততোধিক নহে। ঐ দ্রব্যসাম্যভাবকে ‘দ্রব্যাদ্বৈত’ বলা হইত।

“আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্বদেহিনাম্
যৎস্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥”[৫]

‘আপনার, আপন স্ত্রীপুত্রাদির এবং অপর সর্বপ্রাণীর স্বার্থ এবং ভোগের যে ঐক্য (বা সাম্য), তাহাকে ‘দ্রব্যাদ্বৈত’ বলা হয়।’ এইরূপে দেখা যায় প্রাচীন ভাগবতধর্ম চরমে পরমসাম্যবাদী ছিল। সকল শরীরই পঞ্চভূতদ্বারা নির্মিত। সেই হিসাবে সমস্ত শরীর এক প্রকার সমানই। ততোধিক সমস্ত শরীরে ভোক্তারূপে একই পরমাত্মা অবস্থিত আছেন।[৬] সুতরাং সমস্ত ভোক্তাও

---

১) ‘শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ’ ৪।৫৭-৮
২) শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ, ৭।১৪।৭ ৩) ঐ, ৭।১৪।৮ ৪) ঐ, ৭।১৪।৯ ৫) ঐ, ৭।১৫।৬৫
৬) গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন—“অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥” (৮।৪·২) পূর্বে দেখ।

সমানই। এই দার্শনিক দৃষ্টি হইতে মনে করিতে হইবে যে সর্বজীবের স্বার্থ এবং ভোগ সমানই। সুতরাং ঐ পরম সাম্যবাদ ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী ফল। ব্যবহারভূমিতে ঐ দার্শনিক সিদ্ধান্তের পূর্ণ উপযোগ করিতে গিয়া ভাগবতধর্ম চরমে ঐ পরম সাম্যবাদে উপনীত হয়। ঐ ধর্মে অবশ্য ইহাও স্বীকৃত হইত বোধ হয় যে ঐ বাদ সর্বোত্তম অধিকারীর জন্য। যাহারা তদনুসারে ব্যবহার করিতে পারিত না উহাদের জন্য অপর দুই প্রকারের সাম্যবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছিল। পরন্তু ভাগবতধর্মের পরম ধ্যেয় ত এই ছিল যে মনুষ্য প্রথমবাদের স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তৃতীয় স্তরে পরমসাম্যবাদে উপনীত হয়।

জনকের সাম্যবাদ—ঐ সাম্যবাদে উপনীত হইতে ভাগবতধর্মের দীর্ঘ কাল লাগিয়াছিল বোধ হয়। কেননা, গীতানারায়ণীয়াখ্যানাদি উহার প্রাচীন গ্রন্থসমূহে তাহার উল্লেখ নাই। ঐ সকল গ্রন্থে সাম্যদৃষ্টি বা আত্মৌপম্যদৃষ্টির প্রশংসা আছে। আমরা পরে তাহা বর্ণনা করিব। পরন্তু উহা ঐ সাম্যবাদ হইতে অনেকটা ভিন্ন। 'অনুগীতা'তে এক প্রকার সাম্যবাদের উল্লেখ আছে।[১] কথিত হইয়াছে যে উহার প্রবর্তক মিথিলার রাজা জনক।[২] উনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। পরন্তু অপর সাধারণ রাজার ন্যায়—কিংবা এক সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার ক্ষেত্রে তিনি বিষয়দৃষ্টিপূর্ণই ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে রাজ্য তাঁহার নিজেরই,—উহাতে একমাত্র তাঁহারই অধিকার আছে, অপর কাহারও নহে। একদিন এক ব্রাহ্মণের কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। ঐ ব্রাহ্মণের প্রশ্নে তিনি বিচার করিতে আরম্ভ করেন তাঁহার অধিকার রাজ্যে কতটা? ঐ বিচারের ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে

"তদা ন বিষয়ং মন্যে সর্বো বা বিষয়ং মম।
আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী মম॥
যথা মম তথা অন্যেষামিতি মন্যে দ্বিজোত্তম।"[৩]

'হে দ্বিজোত্তম! তখন আমি মনে করি যে আমার রাজ্য (কোথাও) নাই, অথবা সমস্ত (পৃথিবীই) আমার রাজ্য; এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাতও আমার নহে, অথবা সমস্ত পৃথিবীই আমার। যেমন আমার, তেমন অন্যেরও (অর্থাৎ সর্ববস্তুতে সকলেরই সমান অধিকার আছে)।' পরে তিনি খুলিয়া বলেন যে কৈশোরযৌবনাদি দেহের অবস্থাসমূহ, আঢ্যত্বদরিদ্রত্বাদি অপর অবস্থাসমূহ,—এক কথায় কর্মানুযায়ী প্রাপ্তব্য সমস্ত অবস্থাসমূহ নশ্বর—এক দিন না এক দিন সমস্তেরই অন্ত হইবে; তাহা হইতে,—অধিকন্তু "কস্যেদং, কস্য স্বং" (এই বস্তু কাহার? এই ধন কাহার? অর্থাৎ কাহারও নহে)—এই বেদবচন হইতেও,—তিনি উপলব্ধি করেন যে কিছুই তাঁহার আপনার নহে।

---

১) মহাভা, ১৪।৬২ অধ্যায়

২) মিথিলার সকল রাজা জনক নামে খ্যাত। এই সাম্যবাদের প্রবর্তক জনক কে, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হয় নাই।

৩) মহাভা, ১৪।৩২।১১—১২'১ "আত্মাপি চায়ং" ইত্যাদি বচন "মন্যে দ্বিজোত্তম" স্থলে 'চিন্ত্য ন মে ব্যথা' পাঠান্তরে 'মহাভারতে'র অন্যত্রও (১২।১৭৪।১৪) আছে জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকাভিভূত রাজা সেনজিৎকে বলেন। ব্রাহ্মণ বলেন যে ঐ প্রকার ভাবনা করাতে তিনি ব্যথাতীত হন। 'ইতি পশ্যন্ন মুহ্যতি' পাঠান্তরে উহা ব্যাস যুধিষ্ঠিরে বলেন। (মহাভা ১২।২৫।১৯)

তাহাতে তিনি সর্ববিষয়ে নির্মম হন। যে বুদ্ধিতে তিনি সমস্ত পৃথিবীকে আপন মনে করেন তাহা এই—তিনি "আত্মার্থ" অর্থাৎ আপন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যই সমাগত গন্ধের আঘ্রাণ, রসের আস্বাদন, রূপের দর্শন, স্পর্শযোগ্য বিষয়ের স্পর্শন, শব্দের শ্রবণ কিম্বা মন্তব্য বিষয়ের মনন, করেন না। তাহাতে গন্ধাদি ইন্দ্রিয়বিষয় এবং মন সহ সর্ব ইন্দ্রিয় সর্বদা তাঁহার বশীভূত থাকে।

"দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽতিথিভিঃ সহ।
ইত্যর্থং সর্ব এবেতি সমারম্ভা ভবন্তি বৈ॥"[১]

'দেবগণ, পিতৃগণ, প্রাণিগণ এবং অতিথিগণ—নিশ্চয় ইঁহাদেরই অর্থে (আমার) সমস্তই সমারম্ভ (বা কর্ম) চলিতেছে, (কেবল আমার নিজের অর্থে নহে)।' শ্রুতিতে আত্মা সম্বন্ধে দুই দৃষ্টি আছে। এক দৃষ্টিতে আত্মা অসঙ্গ,—"অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ"। সুতরাং আত্মার আপনার বলিতে কিছুই নাই। অপর দৃষ্টিতে একই আত্মা সর্বশরীরোপাধিতে বর্তমান,—আত্মা সর্বাত্মক। সুতরাং সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই আত্মার। সর্ব শরীরে যখন একই আত্মা বর্তমান, তখন যাহা এক শরীরস্থ আত্মার তাহা অপর শরীরস্থ আত্মারও। যাহা হউক, তখন ঐ ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া রাজা জনককে বলেন যে—ঐ বিচারচক্র সত্ত্বনেমিনিরুদ্ধ (অর্থাৎ সত্ত্বগুণময়); উহা ব্রহ্মলাভের দুর্বার ও অনিবর্তী সাধন; এবং একমাত্র তিনিই উহার প্রবর্তক।[২] জনকের এই সাম্যবাদ কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট ব্যাখ্যা করেন। ইহা পূর্বোক্ত সাম্যবাদত্রয়ের পূর্বরূপ মনে হয়।

সম ব্যবহার গৃহ বা পরিবারের মধ্যেই প্রথমে আরম্ভ করা স্বাভাবিক। উহাকে পরে ধীরে ধীরে আরও বৃহৎ এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাই মহাত্মা ভীষ্ম বলেন, সমস্ত অতিথিদিগের, পোষ্য স্বজনদিগের এবং ভৃত্যদিগের সহিত "সামান্য ভোজন" অর্থাৎ একই প্রকার খাদ্য খাওয়া পরিবারের কর্তার পক্ষে প্রশস্ত।

ঈশ্বরার্থ কর্ম—সর্বজগৎ বাসুদেবই,—এই প্রকার সম্যক্ ধারণা করা অতীব কঠিন। 'গীতা'য় কৃষ্ণ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ মহাত্মা তাহা উপলব্ধি করেন এবং ঐ প্রকার মহাত্মা অতি দুর্লভ।[৩] ঐরূপ দৃঢ় ভাবনা করা সহজও নহে। সুতরাং বাসুদেবের সেবা মনে করিয়া জগতের সেবা অতি অল্প লোকেই করিতে পারে। সেই হেতু সাধারণের জন্য প্রাচীন ভাগবতধর্মে কর্মের আর এক প্রকার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহাতে মনে করিতে হয় যে সমস্ত জগৎ বাসুদেবেরই; তিনিই সর্বজগতের একমাত্র অধিপতি; সুতরাং সমস্ত কর্ম তাঁহারই কর্ম; তিনি যখন যে জীবকে ইচ্ছা তখন সেই জীবকে দিয়া আপন সেই সেই কর্ম করাইয়া লইতেছেন। জীবের পক্ষ হইতে এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা করিতে হয় যে 'বাসুদেব আপন তত্তৎ কর্ম করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন; সেই হেতু, তাঁহার ঐ নির্দেশ অনুসারে, তাঁহার অনুগত আমি তাঁহার সেই সকল কর্ম করিতেছি মাত্র, পরন্তু আমার নিজের প্রয়োজনে কোন কর্ম করিতেছি না। অধিকন্তু আমার নিজের জন্য যাহা কিছু করিতেছি, সেই

---

১) মহাভা, ১৪।৩২।২৪

২) "ত্বমস্য ব্রহ্মলাভস্য দুর্বারস্যানিবর্তিনঃ।
সত্ত্বনেমিনিরুদ্ধস্য চক্রস্যৈকঃ প্রবর্তকঃ" —(মহাভা, ১৪।৩২।২৬)

৩) ঐ, ৭।১৯

সকলও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই কর্ম। কেননা, আমিও তাঁহারই। এই প্রকার ভাবনাতে কর্ম করাকে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বা ঈশ্বরার্থ কর্ম করা বলা হয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন,

"ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥"[১]

'অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সর্ব কর্ম আমাতে সম্যক্ প্রকারে ন্যাস (বা অর্পণ) করতঃ আশা এবং মমতা রহিত হইয়া তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ কর।'

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"[২]

'হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হবন, দান এবং তপ কর, তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ কর।' তাঁহার এই প্রকার উক্তি আরও অনেক আছে।[৩] আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "কর্তা আমি ঈশ্বরার্থ ভৃত্যবৎ (সর্ব কর্ম) করিতেছি";[৪] তদর্থে (ঈশ্বরার্থে) কর্ম করিতেছি অর্থাৎ ভৃত্যের ন্যায় স্বামীর জন্যই সর্ব কর্ম করিতেছি"[৫]—এই দৃঢ় ভাবনা সহকারে কর্ম করাই ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে বা ঈশ্বরার্থ কর্ম করা। নারায়ণীয়াখ্যানের একটি বচন দ্বারা এই ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। ভগবান্ নারায়ণের ভক্ত, পরমভাগবত রাজা উপরিচর বসু সম্বন্ধে তথায় কথিত হইয়াছে যে "নিজ রাজ্য, ধন, স্ত্রী, বাহন প্রভৃতি যাহা কিছু, 'ভাগবতং সর্বং' ('সমস্তই ভাগবত অর্থাৎ ভগবানের')—সদা এই মনে করিয়া তৎকর্তৃক প্রোক্ষিত (অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত) হইয়াছিল"[৬] স্ত্রীপুত্রবিত্তাদিতে মমত্ব বুদ্ধিই প্রত্যেক মানুষে স্বভাবতঃ বিদ্যমান আছে। উহাকে পরিত্যাগ করত সেইগুলিকে ভগবানের বলিয়া ধারণা করিলে তাহাদিগকে ভগবানে অর্পণ করাই হয়। তখন তাহাদের জন্য যাহা কিছু কর্ম, সেই সকল আপন কর্ম না হইয়া ভগবানেরই কর্ম হয়। জগতের সমস্ত কর্ম তাঁহারই, কিছুই আপন নহে। তাঁহার কর্ম সাধ্যানুসারে করিয়া দেওয়াই একমাত্র আপন কর্ম। ঐ প্রকার ভাবনাতে কর্মকারীকে ভগবান্ কৃষ্ণ "মৎকর্মকৃৎ" (অর্থাৎ 'আমার কর্মকারী') বলিয়াছেন।[৭] তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ঐ প্রকারে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বা ঈশ্বরার্থ কর্ম করে তাহার কোন দোষ হয় না;[৮] সে শুভাশুভফলরূপ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়;[৯] এবং তাহাতে সে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[১০] ঈশ্বরার্থ কর্মকে 'সৎ' বলা হয়।[১১]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্ম বিবরণে আছে, "(ভাগবতধর্মী) শরীর, বাণী, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ বা বুদ্ধি দ্বারা, অথবা আপন প্রবৃত্তি বশতঃ কিম্বা স্বভাবের অনুসরণে, যাহা কিছু কর্ম

---

[১] ঐ, ৩।৩০ [২] ঐ, ৯।২৭

[৩] যথা দেখ—ঐ, ১২।৬; ১৮।৫৭

[৪] ঐ, ৩।৩০ (ভাষ্য) [৫] ঐ, ৫।১০ (ভাষ্য)

[৬] মহাভা, ১২।৩৩৫।২৩; 'প্রোক্ষিত' স্থলে 'প্রেক্ষিত' পাঠও হইতে পারে।

[৭] গীতা, ১১।৫৫ (পূর্বে দেখ)। আরও দেখ—১২।১০

[৮] ঐ, ৫।১০ [৯] ঐ, ৯।২৮; ১১।৫৮

[১০] ঐ, ১২।১০ [১১] ঐ, ১৭।২৭·২

করে, তৎসমস্তই 'নারায়ণার্থই' মনে করিয়া পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেক।"[১] "তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্" (অর্থাৎ 'সমস্ত চেষ্টা তাঁহারই জন্য')[২] করিয়া,—"যজ্ঞ, দান, তপ, ধর্মাচরণ, প্রভৃতি যাহা কিছু করা হয়, এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ, প্রভৃতি যাহা কিছু আপন প্রিয়,—তৎসমস্তই পর(ব্রহ্ম)কে নিবেদন"[৩] করিয়া অজিতেন্দ্রিয় এবং স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যও সহজে ঐশ্বরী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।[৪] নারদ বলেন যে নারায়ণঋষির সনাতনধর্ম মতে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি তদুচিত সমস্ত কর্ম বাসুদেবার্পণ বুদ্ধিতে করিবেক।[৫] "হে পার্থ! মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মকে যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে সমর্পণ,—তাহাকে ক্রিয়াদ্বৈত বলা হয়।"[৬]

প্রবৃত্তি-প্রবণ লোকের পক্ষে কর্মের এই উপায়-কৌশল অতীব মূল্যবান্। কেননা, ইহাতে প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের প্রতি, তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের প্রতি, তাহার আত্মীয়স্বজনের প্রতি, তাহার নিজ সমাজের প্রতি, তাহার স্বদেশ এবং স্বরাষ্ট্রের প্রতি, অপর সমাজ, দেশ-রাষ্ট্রাদির প্রতি, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি এবং বিশ্বের প্রতি কর্তব্য কর্মসমূহ যথাযথ করিতে পারে। তাহাকে এই ধারণা মাত্র সতত মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সমস্ত কর্ম ভগবানেরই নির্দেশে এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থ করা হইতেছে, কোন প্রকার স্বার্থবশতঃ নহে; এই সমস্ত জগৎ ভগবানেরই; ইহার সৃজনপোষণশাসনাদি সমস্তই তাঁহারই কর্ম; তাঁহার কতিপয় কর্ম করিবার ভার তিনি স্বেচ্ছায় আমার উপর সমর্পণ করিয়াছেন। কেননা, আমিও তাঁহারই; তাঁহারই প্রীত্যর্থ আমি তাঁহার সেই ভার সানন্দে বহন করিতেছি। ইহাতে কর্ম বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক সাবধানতার সহিত এবং সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা থাকিবে। কেননা, তখন এই ভয় থাকিবে যে নিজের অসাবধানতা বশতঃ কর্মে কোন ত্রুটি হইলে এবং কোন কর্তব্য পালন উপেক্ষিত থাকিলে ভগবান্ প্রীত হইবেন না। এই প্রকারে কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেরও স্মরণ থাকে বলিয়া কর্ম ভগবানেরই উপাসনা হয়; তাহতে কল্যাণ লাভ হয়। তাই 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"[৭]

'যাঁহা হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (=উৎপত্তি বা চেষ্টা) হয়, এবং যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, স্বকর্ম দ্বারা তাঁহার পূজা (বা আরাধনা) করিয়া মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।'

এই ঈশ্বরার্পণ বা ঈশ্বরার্থ বুদ্ধিতে জগতের সেবাও এক প্রকার ভগবানেই সেবা। কেননা, সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত কর্ম যখন তাঁহারই,—যখন তিনিই জগতের প্রভু, পাতা এবং বিধাতা, তখন তাঁহার লোকের সেবা করা এবং তাঁহারই কর্ম করিয়া দেওয়া প্রকারান্তরে তাঁহারই সেবা করা হয়। তবে জগৎ ব্রহ্মই—এই বুদ্ধিতে জগতের সেবা সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মের সেবা হয়, আর জগৎ ব্রহ্মেরই—এই বুদ্ধিতে জগতের সেবা গৌণভাবে ব্রহ্মের সেবা হয়। পক্ষান্তরে এই শেষোক্ত বুদ্ধিতে জগতের সেবার জন্য, ঈশ্বরের প্রীতি লাভ হইবে বলিয়া, যেমন চোদনা থাকে, পূর্বোক্ত বুদ্ধিতে তজ্জন্য তেমন কোন চোদনা থাকে না।

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২।৩৬ ২) ঐ, ১১।৩।২৭'২
৩) ঐ, ১১।৩।২৮ ৪) ঐ, ১১।৩।১৭,৩৩
৫) ঐ, ৭।১৪।২ ৬) ঐ, ৭।১৫।৬৪ ৭) গীতা, ১৮।৪৬

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে যে ঈশ্বরে অনর্পিত কর্ম, নিষ্কারণ (বা নিষ্কাম) হইলেও কিংবা অত্যুত্তম হইলেও, শোভা পায় না,—ব্যর্থই।[১] ঈশ্বরার্পণ-বিরহিত তপস্যা, দান, যজ্ঞ, বিচার, প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য "ক্ষেম লাভ করিতে পারে না" ('ক্ষেমং ন বিন্দতি বিনা যদর্পণম্')।[২] পক্ষান্তরে ইহা কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ ঈশ্বর ব্রহ্মে "ভাবিত" কর্ম জীবের তাপত্রয়ের বিনাশক ঔষধ হয়।[৩] একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে। যে দ্রব্য সেবন হেতু যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যের অধিক সেবন দ্বারা সেই রোগের বৃদ্ধিই হয়, উপশম হয় না। পরন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে ভাবিত করিয়া লইয়া পরে সেবন করা যায়, তবে সেই রোগের উপশম হইয়া থাকে। সেইরূপ, মানুষের ভবরোগ কর্মজনিত বলিয়া সাধারণতয়া পুনঃকৃত কর্মসমূহ দ্বারা তাহার বৃদ্ধিই হয়,—উপশম হইতে পারে না। পরন্তু পরমেশ্বরে "কল্পিত" হইলে ঐ সকল কর্মই "আত্মবিনাশে"র (অর্থাৎ ব্রহ্মনির্বাণের) হেতু হইয়া থাকে।[৪]

নিষ্কামকর্ম—যাহারা ভগবৎকর্মকৃৎ হইতেও সমর্থ নহে, তাহাদিগের জন্য নিষ্কাম কর্মরূপ অপর কৌশল বিহিত হইয়াছে।[৫] কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১৫।১২ ; ১২।১২।৫২ ২) ঐ, ২।৪।১৭
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৫।৩২ ৪) ঐ, ১।৫।৩৩—৪

৫) অচার্য্য মধুসূদন স্বরস্বতী মনে করেন যে 'গীতা'র "মষ্যের মন আধৎস্ব" ইত্যাদি ভগবানে মনসমর্পণ বিধায়ক বচনে (১২।৮) সগুণোপাসনার বিধান করা হইয়াছে। যাহারা সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানেও অশক্ত তাহাদিগের জন্য অশক্তির তারতম্য অনুসারে পর পর তিনটি সাধন বিহিত হইয়াছে। প্রথমে প্রতিমাদি বাহ্যবস্তুতে ভগবানের ধ্যানের অভ্যাস। (১২।৯) তাহাতে অশক্তদিগের জন্য শ্রবণকীর্তনাদি ভাগবতধর্মসমূহেয় অনুষ্ঠান। (১২।১০) এবং তাহাতেও অসক্তদিগের জন্য সর্বকর্মফলত্যাগ। (১২।১১) পরন্তু '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত মহাভাগবত উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ হইতে বোধ হয় যে মধুসূদনের ঐ অনুমান সর্বাংশে সত্য নহে। কৃষ্ণ বলেন যে সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চককে ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ পূর্বকই তাঁহাতে মন সমর্পণ করিতে হইবে।

"এবং জিজ্ঞাসয়াঽপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্বগে॥" (১১।১১।২১)

পরে তিনি আবার বলেন যে জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অসৎ বলিয়া উহার অভিধ্যান পরিত্যাগ করত তাঁহাতে মন সমাহিত করিতে হইবে,—সদা তদ্ভাবভাবিত হইতে হইবে।

"তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥" (১১।১১।২৮)

তাহাতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মে মন সমর্পণ বা সমাধান নির্গুণ উপাসনাই, সগুণ উপাসনা নহে। কেননা, সগুণ উপসনায় দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ ভ্রম বা অসৎ নহে। যাহারা ঐ প্রকারে ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে মন স্থির করিতে সমর্থ নহে' তাহাদেরই জন্য নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবার বিধান কৃষ্ণ দিয়াছেন। (১১।১১।২২) তাহাতে যে কেবল শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ, তাঁহার চরিত্রের,—জন্ম ও কর্মের, গান, স্মরণ ও বারংবার অভিনয় করিতে হইবে (১১।১১।২৩), অর্থাৎ, যেমন মধুসূদন মনে করেন, কেবল যে শ্রবণকীর্তনাদি ভাগবতধর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে, কৃষ্ণ বলেন, তদ্ব্যপাশ্রিত হইয়া তদর্থে ধর্ম, অর্থ এবং কামের আচরণ করিতে হইবে।

"মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।" (১১।১১।২৪'১) ; আরও দেখ—১১।২৯।৯

ঐ প্রকার আচরণ দ্বারা সনাতন ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়। (১১।১১।২৪'২) ঐ ভক্তি দ্বারা পরমপদ লাভ হয়। (১১।১১।২৫) নিষ্কামকর্ম ঈশ্বরার্থ কর্ম বা ঈশ্বরার্পিত কর্ম হইতে ভিন্ন। (১১।২৫।২৩) গীতার "মন্মনা ভব" ইত্যাদি বচনে

"অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥"[১]

'অথবা যদি তুমি মদ্যোগ (অর্থাৎ মদর্থে বা ঈশ্বরার্থে কর্ম-করণ-রূপ যোগ) আশ্রয় করিয়া কর্ম করিতেও অসমর্থ হও, তবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সর্বকর্মের ফল ত্যাগ কর।' একান্তধর্মে আত্মজ্ঞান এবং বিশ্বসেবার ন্যায় নিষ্কামকর্মের, তথা অহিংসারও, অনেক মহিমা দেখা যায়। যথা, একান্ত ধর্মের মহত্ত্ব খ্যাপন করিতে গিয়া মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন,

"একান্তিনো হি পুরুষাঃ দুর্লভাঃ বহবো নৃপ।
যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন॥
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিরাশীঃকর্মবিবর্জিতাঃ॥"[২]

'হে নৃপ! একান্তী পুরুষ বহু পাওয়া কঠিন। হে কুরুনন্দন! যদি আত্মবিৎ, অহিংসক এবং সর্বভূতহিতপরায়ণ একান্তী পুরুষগণ দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ হয়, তবে আশীঃকর্ম (বা সকাম কর্ম) বিবর্জিত হইয়া (পুনঃ) সত্যযুগ উপস্থিত হইবে।' এমন কি, ভগবান্ নারায়ণের স্বস্থানকেও কখন কখন "নিরাশীঃকর্ম" বলা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে চতুর্থ কল্পের আদিতে ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করত প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ দেন এবং সত্যযুগ স্থাপনার্থ তাঁহাকে "সাত্বতধর্ম" উপদেশ করেন।[৩] এইরূপে ব্রহ্মাকে যুগধর্মের কর্তা করিয়া ভগবান্ "তমের পরপারে যেখানে অব্যক্ত ব্যবস্থিত 'নিরাশীঃকর্ম' নামে অভিহিত সেই স্থানে গমন করেন।"[৪] মহাপ্রলয়ে জগৎ অবক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন কিছুরই জ্ঞান হয় না বলিয়া উহাকে 'তমঃ' বলা হয়।[৫] যাহা তাহারও পরে, সুতরাং চিৎস্বরূপ এবং সদা কূটস্থরূপে স্থিত, তাহাই পরম অব্যক্ত।[৬] নিষ্কামকর্ম দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় বলিয়া[৭] তাহা 'নিষ্কামকর্ম' নামে অভিহিত হয়। চিৎস্বরূপ, সুতরাং স্বপ্রকাশ, বলিয়া তাহা 'দেব নামেও অভিহিত হয়।[৮] নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে তাঁহার ভক্ত চতুর্বিধ।

"তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈবানন্যদেবতা
অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃকর্মকারিণাম্॥"[৯]

'তন্মধ্যে যাহারা অনন্যদেবতা (অর্থাৎ একমাত্র আমি ভিন্ন অপর কোন দেবতার ভক্ত নহে) সেই একান্তিগণই শ্রেষ্ঠ। নিষ্কামকর্মকারী তাহাদিগের একমাত্র গতি আমিই।' "অপর ত্রিবিধ ভক্ত ফলকামী। তাহারা সকলে চ্যবনধর্মী। পরন্তু প্রতিবুদ্ধ শ্রেষ্ঠভাক্।"[১০] তাহাতে দেখা যায়,

---

(১০।৩৪ ; ১৮।৬৫) অবশ্যই সগুণোপাসনা বিহিত হইয়াছে। মন্যেব মন আধৎস্ব" ইত্যাদি বচনকে তদনুরূপ মনে করিয়া মধুসূদন মনে করেন যে উহাতেও সগুণোপাসনার বিধান হইয়াছে।

১) গীতা, ১২।১১ ২) মহাভা, ১২।৩৪৮।৬২—৩

৩) ঐ, ১২।৩৪৮।২৬—৩১ ৪) ঐ, ১২।৩৪৮।৩২

৫) ঐ, ১২।৩৪২।৩—৮ ও ৩৪৭।১৬—৭ দেখ। ৬) পূর্বে দেখ।

৭) "ভগবন্তমজং দিব্যং বিষ্ণুমব্যক্তসংজ্ঞিতম্।
ভাবেন যান্তি শুদ্ধা যে জ্ঞানতৃপ্তা নিরাশিষঃ॥"—(মহাভা, ১২।২১৭।৩২)

৮) মহাভা, ১২।৩৪৪।২২ ও ৩৪৯।২৮'১ দেখ ৯) ঐ, ১২।৩৪১।৩৪ ১০) ঐ, ১২।৩৪১।৩৫

একান্তীভক্ত অনন্যদেবতা, নিষ্কামকর্ম্মকারী ও প্রতিবুদ্ধ ; এবং সেই হেতু অপর ত্রিবিধ ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ।[১] তিনি আরও বলেন যে তিনি স্বয়ং "নিরাশীঃকর্মসংযুক্ত"।[২] এইরূপে দেখা যায়, একান্তধর্ম নিষ্কামকর্মের বিশেষ সমর্থক এবং একান্তিগণ নিষ্কামকর্ম-কারী। যুধিষ্ঠির নিষ্কামকর্মী ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে অতি স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন,[৩]—তিনি ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিতেন না। শাস্ত্রের বিধান আছে—দান কর্তব্য, যজ্ঞ কর্তব্য। একমাত্র সেই হেতুতেই তিনি দান করিতেন এবং যজ্ঞ করিতেন। শাস্ত্রে যাহা যাহা কর্তব্য বলিয়া বিধান হইয়াছে, তাহা তাহা তিনি সর্বাবস্থায় যথাশক্তি করিতেন। উহাদের ফল আছে কি নাই,—হইবে কি হইবে না, সে বিষয়ে তিনি চিন্তা করিতেন না। সুতরাং ধর্মের ফল লাভের আশাতে তিনি ধর্মাচরণ করিতেন না।

"আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ ॥
ধর্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধ্রুতম্।"[৪]

'হে কৃষ্ণে! শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া (অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করিয়া) এবং সদ্ব্যক্তিগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আমি স্বভাবতই আমার মনকে ধর্মে ধারণ করিয়াছি (অর্থাৎ ধর্মাচরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি)।' যে ধর্মব্যাপারী সে ধর্মবাদিগণের মধ্যে হীন,—জঘন্য" ইত্যাদি।

কর্মযোগ—কর্মবাদ এদেশের সমস্ত দার্শনিকেরই মান্য। ঐ কর্মবাদ অনুসারে,—কর্ম কৃত হইলে নিশ্চয়ই পুণ্য কিম্বা পাপময় ফল প্রসব করে ; ঐ ফল কর্মকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; কারণ ভোগ ব্যতীত কর্মফলের ক্ষয় কখনও,—এমনকি কল্প-কল্পান্তরেও, হয় না।[৫] প্রত্যেক মনুষ্য পূর্বের বহু জন্মজন্মান্তরে,—পূর্বে কত জন্ম ব্যতীত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, সুতরাং অনাদি কাল হইতে অসংখ্য জন্ম ধরিয়া—অসংখ্য কর্ম করিয়া অসংখ্য-পরিমাণ ফল সঞ্চয় করিয়াছে। তৎসমস্তেরই ভোগ তাহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কোন এক জন্মে তৎপূর্বজন্মার্জিত সমস্ত কর্মফল ভোগ করিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। প্রতি জন্মে মনুষ্য যেমন পূর্বসঞ্চয়ের কতকটা ভোগ দ্বারা খরচ করে, তেমন নূতন কর্ম করত কিছু অর্জনও করে। নূতন-কৃত-কর্মের ফল দ্বারা পূর্ব-কৃত-কর্মের ফলের ক্ষয় হইতে পারে না। সুতরাং সঞ্চয় বাড়িতে থাকে। অতএব প্রতি জীবনের অন্তে অনেক কর্মফল ভোক্তব্য থাকে এবং সেই হেতু মনুষ্যকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে সাধারণ কর্ম দ্বারা জীবের আবার আগমন বন্ধ হইতে পারে না—সে মুক্ত হইতে পারে না। বরং তাহার বন্ধন আরও বাড়িতে থাকে,—সুদৃঢ় হইতে থাকে, সুতরাং মুক্তি দূরে হটিতে থাকে। যদি এমন ভাবে কর্ম করা যায় যে নূতন ফল সঞ্চয় কম হয়, পরন্তু পূর্বসঞ্চয়ের ভোগ বেশী হয়, তবে কোন না কোন কালে সমস্ত

---

১) 'গীতা'র, ৭।১৬—৭ দেখ।

২) মহাভা, ১২।৩৪২।৭৮·১ ; গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ন মে কর্মফলে স্পৃহা। (৪।১৪·১)

৩) মহাভা, ৩।৩১।২—

৪) ঐ, ৩।৩১।৪·২—৫·১

৫) "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥"

সঞ্চয় অবশ্যই নিঃশেষ হইবে,—তাহাতে মানুষ মুক্ত হইবে। পরন্তু পূর্ব-সঞ্চয়ের পরিমাণ অসংখ্য বলিয়া সেই কাল অত্যন্ত দীর্ঘ হইবারই কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন, ইহজন্মেই যদি মুক্তি পাওয়া যায় তবে ভাল, নতুবা সর্বনাশ।[১] অর্থাৎ যাহাতে অতি অল্প সময়ে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা কর্তব্য। তাহার জন্য, ইহা সহজেই বুঝা যায় যে যাহাতে পূর্বসঞ্চয়ের যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষয় হয়, এবং নূতন সঞ্চয় না হয়, সেই প্রকার চেষ্টা কর্তব্য। শ্রুতি মতে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে,—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব সঞ্চয়ের বিনাশ হয় এবং ক্রিয়মাণ কর্মের ফল লাগে না। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ প্রাচীন কাল হইতে কেহ কেহ চাতুর্বর্ণ্যবিহিত গার্হস্থধর্ম পরিত্যাগ,—সাংসারিক সর্ব-কর্ম সংন্যাস করত একমাত্র ব্রহ্মোপাসনায় রত হইতেন। ঐ মার্গ অবশ্যই অতি কঠিন। তাই প্রাচীন কালে অপর এক কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে কৌশল অনুসারে চাতুর্বর্ণ্যবিহিত ধর্মসমূহ যথাবিধি করিতে থাকিলেও মনুষ্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। প্রাচীন ভাগবতধর্মে ঐ কর্মকৌশল বা কর্মযোগ[২] বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। তন্মতে, কর্ম এমনভাবেও করা যায়, যাহাতে উহা বন্ধনের হেতু হয় না, বরং কর্মবিনাশের, সুতরাং মুক্তির, হেতু হয়। তাই উহাকে "কর্মণা কর্মনির্হারঃ" (বা 'কর্ম দ্বারা কর্মবিনাশ') বলা হয়। 'গীতা'য় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "পরন্তু, হে পার্থ! (কর্ম) যোগ বিষয়ে তুমি আমার এই বুদ্ধি শুন যেই বুদ্ধি যুক্ত হইলে তুমি (কর্ম করিয়াও) কর্মবন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।"[৩] এই খানে 'কর্মবন্ধ' শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবে 'সমস্ত কর্মবন্ধ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে কেবল যে ক্রিয়মাণ কর্মের ফল জনিত বন্ধন পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে, তৎপূর্বে জন্ম-জন্মান্তরে কৃত কর্ম জনিত বন্ধনও বিনষ্ট হইবে—এমন মনে করিতে হইবে। অন্যথা কেবল ক্রিয়মাণ কর্মের ফল পরিত্যাগ হয় মনে করিলে কর্ম দ্বারা মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না। তাই আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ঐ বচনের তৎপর্য এই যে ঐ প্রকার বুদ্ধিতে কর্ম করিলে ঈশ্বরের প্রসাদে জ্ঞানলাভ হইবে এবং তাহাতে সমস্ত কর্মবন্ধ বিনষ্ট হইবে। জ্ঞানোদয়ে যে সর্ব-কর্মের বিনাশ হয়, তাহা 'গীতা'তেই বর্ণিত হইয়াছে— "হে অর্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করে, তেমন জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মকে ভস্মসাৎ করে।"[৪] প্রাচীন ভাগবত ধর্মের ঐ প্রকারের তিনটি কর্মকৌশল পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা,—(১) প্রথম, জগদ্ব্রহ্মবুদ্ধিতে কর্ম করা, (২) দ্বিতীয়, জগৎব্রহ্মের-বুদ্ধিতে,

---

[১] "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"— (কেনউ, ২।৫·১)

[২] "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"—(গীতা. ২।৫০·২)

[৩] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮৪।২৯·৩৫

[৪] গীতা, ২।৩৯

[৫] গীতা, ৪।৩৭ আরও দেখ
"সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥"—(গীতা, ২।৩৬·২)

এইখানে 'বৃজিন' (বা পাপ অধর্ম) শব্দ পুণ্যের বা ধর্মেরও উপলক্ষণাত্মক বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞান দ্বারা পাপও পুণ্য; অধর্মও ধর্ম উভয়কে অতিক্রম করা যায়। অথবা যেমন শঙ্কর বলিয়াছেন "ধর্মঃ অপি ইহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে।"

অথবা, ঈশ্বরার্পণ বা ঈশ্বরার্থ-বুদ্ধিতে কর্ম করা ; (৩) এবং তৃতীয় নিষ্কাম-বুদ্ধিতে বা নিষ্কামভাবে কর্ম করা। 'গীতা'য় ঐ প্রকারের আরও কতিপয় কর্মযোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে।[1] কর্মকর্তার অধিকার ভেদেই প্রধানতঃ কর্মযোগের ভেদ হইয়াছে। সামর্থ্যভেদকেই পূর্বে অধিকারভেদের হেতু বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বলা হইয়াছে যে যাহারা সর্বোত্তম অধিকারী তাহাদের প্রথম কর্মযোগ অবলম্বন কর্তব্য ; যাহারা তাহাতে সমর্থ নহে তাহাদের জন্য দ্বিতীয় কর্মযোগ ; আর যাহারা তাহাতেও সমর্থ নহে তাহাদের জন্য তৃতীয় কর্মযোগ। পরন্তু ঐ বিষয়ের তত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে আরও গূঢ়। অধিকার ভেদের অপর হেতুও আছে এবং ঐ হেতু অতি ব্যাপকরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা এখন সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিব।

যেমন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মবিবর্তবাদ এবং ব্রহ্মপরিণামবাদ উভয়বাদ অনুসারেই জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্মই—যদিও উভয় বাদে পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিতে তাহা মানা হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ প্রথমবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা ভেদাভেদবাদী দার্শনিকগণ—ক্রমভেদাভেদবাদী এবং সমভেদাভেদবাদী উভয়েই—দ্বিতীয় বাদ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার দ্বৈতাদ্বৈতবাদই। সুতরাং তাহার পৃথক্ নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তাঁহারা সকলেই প্রথম কর্মযোগ অবলম্বন করিতে পারেন। পরন্তু দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ,—যাঁহারা ব্রহ্মকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র বলিয়া মানিয়া থাকেন, কিন্তু উপাদান কারণও বলিয়া মানেন না, তাঁহাদের মতে জগৎ ব্রহ্ম নহে। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বীরশৈবদার্শনিকগণও জগদ্ব্রহ্মবাদ মানেন না। সেইহেতু, তাঁহাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া, তাঁহারা প্রথম কর্মযোগ আশ্রয় করিতে পারেন না। পরন্তু দ্বিতীয় কর্মযোগ তাঁহারা অনুসরণ করিতে পারেন। কেননা, উহার মূলভূত দার্শনিক তত্ত্ব,—জগৎ ব্রহ্মেরই,—ব্রহ্ম জগতের একমাত্র প্রভু,—তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জগতের সৃষ্ট্যাদিকর্তা ঈশ্বরের সদ্ভাব মানেন না, অথচ কর্মবাদ সম্পূর্ণতঃ মানিয়া থাকেন, সেই নিরীশ্বরবাদিগণও তৃতীয় কর্মযোগ আশ্রয় করিতে পারেন। একান্তধর্মিগণ

---

[1] যথা,

১) যজ্ঞার্থ-কর্ম—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।"—(৩।৯'১)

২) সাম্যভাবে কর্ম—

"যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥"—(৪।২২—৩)

৩) নির্লেপত্ব-বোধে কর্ম—

"ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥"—(৪।১৪)

৪) "যোগসংন্যস্তকর্মানং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥"—(৪।৪১)

ঈশ্বরবাদী। সেই কারণে নিরীশ্বরবাদের উল্লেখ এইখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তাঁহাদের উদ্ভাবিত কর্মযোগবিশেষের কর্মবাদী দার্শনিকগণমাত্রেরই আশ্রয়যোগ্যতা প্রদর্শনার্থ আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অদ্বৈতবাদিগণও সাধক অবস্থায় এবং ব্যবহার-কালে কখন কখন দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের মত এবং কখন কখন দ্বৈতবাদিগণের মত চলিয়া থাকেন এবং উঁহাদেরই মত জগৎ ব্রহ্মের বলিয়া মানিয়া থাকেন। সেই হেতু তখন তাঁহারাও দ্বিতীয় কর্মযোগ আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৃতীয় কর্মযোগ সর্ববাদী সাধকের পক্ষে সরল ও সহজ সাধন। তবে ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে 'গীতা'র মতে ভগবদ্‌ভক্তি-যুক্ত নিষ্কামকর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। //

আরও দেখ, ব্রহ্মপরিণামবাদ অনুসারে জগৎ বস্তুতঃ সত্য। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মই, কিম্বা জগৎ ব্রহ্মেরই,—এই বুদ্ধি ঐ বাদিগণের বরাবর থাকে। সুতরাং তাঁহারা যাবজ্জীবন কর্ম করিতে পারেন।

আরও একটা কথা বলা উচিৎ। ভাগবতধর্মে নিষ্কাম কর্মের বিশেষ মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইলেও সকাম কর্ম একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। কেননা, কথিত হইয়াছে যে সাত্বতধর্মের চিত্রশিখণ্ডি-বিরচিত মূলশাস্ত্রে প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং পশ্চাৎ মোক্ষ কীর্তিত হইয়াছিল।[১] ভগবান্ নারায়ণের স্বোক্তিমতে, অপর শাস্ত্র সমূহ হইতে ঐ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে উহা যেমন অর্থ এবং ধর্মের জনক, তেমন উত্তম রহস্যও।[২] ঐ ধর্মের শেষ, খুব সম্ভবতঃ প্রধানতম,[৩] আচার্য্য রাজা উপরিচর বসু কাম্য কর্ম করিতেন। তিনি "সমাহিতভাবে সাত্বতবিধি অনুসারে কাম্য এবং নৈমিত্তিক যজ্ঞ সম্বন্ধীয় সমস্ত পরম ক্রিয়া করিতেন।[৪] তিনি "অত্যর্থ ভাগবত" ছিলেন। ফলকামী ভক্তের যে নিন্দা দেখা যায়,[৫] তাহা তাঁহার পক্ষে অবশ্যই খাটে না। এইরূপে দেখা যায়, একান্তী ভক্ত সকাম কর্মও করিতে পারে। ইহার রহস্য এই মনে হয়,—সমস্তই ভগবানের,—ইহার বিবৃতি প্রসঙ্গে নারায়ণীয়াখ্যানের এক স্থলে বলা হইয়াছে যে—

"যদ্বৈ লোকে বৈদিকং কর্ম সাধু
আশীর্যুক্তং তদ্ধি তস্যৈব ভাব্যম্ ॥"[৬]

'সংসারে যে সকাম উত্তম বৈদিক কর্ম আছে, তাহা নিশ্চয় তাঁহারই বলিয়া ভাবনা করিবে।' তাহাতে মনে হয়, ভগবানের কর্ম,—এই ধারণা করিয়া, সুতরাং দ্বিতীয় কর্মযোগ অনুসরণকারী একান্তভক্ত সকাম কর্মও করিতে পারে। কথিত হইয়াছে যে চতুর্থ কল্পে ব্রহ্মা লোকহিতকামনায়

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৫।৩৩ 'ঈশ্বরসংহিতা'য় ও (১।৩৭'২—৩৮'১) তৎসম্বন্ধে ভাষান্তরে ঠিক সেই কথা উক্ত হইয়াছে।

২) ঐ, ১২।৩৩৬।৪৯

৩) কেননা, কথিত হইয়াছে বসুর যজ্ঞে ভগবান্ উপস্থিত হইলে একমাত্র বসুই তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার গুরু বৃহস্পতিপ্রমুখ সাত্বতধর্মের অপর আচার্য্যগণের ভগবদ্দর্শন হইল না। (পরে দেখ) তাহাতে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য খ্যাপিত হয়।

৪) মহাভা, ১২।৩৩৫।২৪ ৫) পূর্বে দেখ।

৬) মহাভা, ১২।৩৫১।১৯'২

("লোকানাং হিতকাম্যয়া") ধর্মপ্রতিষ্ঠা হেতু স্বারোচিষ মনুকে সাত্বতধর্ম উপদেশ করেন।[১] গীতায়, তথা নারায়ণীয়াখ্যানে, আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তের উল্লেখ আছে। উহারা অবশ্যই সকাম পরন্তু তথায় উহাদিগকেও উদার বলা হইয়াছে, নিন্দা করা হয় নাই।

পূর্বে যথাস্থলে উক্ত হইয়াছে যে উক্ত কর্মযোগত্রয়ের প্রত্যেকটির দ্বারা সাধক ভগবানকে লাভ করিতে পারে,—মুক্তি পাইতে পারে। ঐ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্তব্য। দেবর্ষি নারদ নারায়ণ ঋষিকে বলেন,

"যাঃ ক্রিয়াঃ সম্প্রযুক্তাশ্চ একান্তগতবুদ্ধিভিঃ।
তাঃ সর্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বৈ স্বয়ম্ ॥"[২]

'একান্তগতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দ্বারা যে সকল ক্রিয়া সম্যক্ সম্প্রযুক্ত হয়, নারায়ণ স্বয়ং ঐ সকলকে শির পাতিয়া প্রতিগ্রহণ করেন।' জনমেজয় সেইরূপ বলেন, "অহো! ভগবান্ হরি সমস্ত একান্তিগণের উপর প্রসন্ন হন; এবং (তাঁহাদের) বিধি-পূর্বক প্রযুক্ত পূজা ("বিধিপ্রযুক্তাং পূজাং") ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করেন।"[৩] বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন,

"ধর্মজ্ঞানেন চৈতেন সুপ্রযুক্তেন কর্মণা।
অহিংসাধর্মযুক্তেন প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ ॥"[৪]

'এই ধর্মজ্ঞান অনুসারে উত্তমরূপে প্রযুক্ত অহিংসাধর্মযুক্ত কর্ম দ্বারা ঈশ্বর হরি প্রীত হন।' এই বচনত্রয়ে "সম্প্রযুক্ত", "বিধিপ্রযুক্ত" এবং "সুপ্রযুক্ত" শব্দত্রয়ে উক্ত কর্মযোগত্রয়কে বা উহাদের কোন একটিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাতে নিশ্চিত হয় যে উক্ত কর্মযোগত্রয় দ্বারা ভগবান্ প্রসন্ন হয়। যাহার উপর ভগবান্ প্রসন্ন হন, তাহাকে তিনি নিজেকেও দিয়া বসেন।[৫] অর্থাৎ তাহার ভগবল্লাভ হয়, সুতরাং মুক্তিলাভ হয়। আমরা পরে এক প্রকরণে দেখাইব যে একান্তধর্ম মতে মুক্তি একমাত্র ভগবৎ প্রসাদলভ্য।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত মতে একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই জীবের সর্বকর্মক্ষয় ও মুক্তিলাভ হইতে পারে এবং বাসুদেব একমাত্র জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হন। এইখানে বলা হইল যে কর্মযোগ দ্বারা ভগবদ্দর্শন, সর্বকর্মক্ষয় এবং মুক্তিলাভ হয়। উভয়ের সমন্বয় এই প্রকারে হয় যে কর্মযোগ দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ জ্ঞান প্রদান করেন এবং সেই জ্ঞান দ্বারা ভগবানের দর্শনলাভ, কর্মের ক্ষয় ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥"[৬]

'হে পার্থ! নিখিল সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়,' অর্থাৎ যথোচিত কৌশল করিলে সমস্ত কর্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। "যোগিগণ (কেবল) শরীর দ্বারা, (কেবল) মন দ্বারা, (কেবল) বুদ্ধি দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও, আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ, আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করে।"[৭]

---

১) ঐ, ১২।৩৪৮।৩৬
২) ঐ, ১২।৩৪৩।৬৪
৩) ঐ, ১২।৩৪৮।১
৪) ঐ, ১২।৩৪৮।৫৬
৫) "যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥"—((বিষ্ণু)ভাগ, ১১।২।৩১'২)
৬) গীতা, ৪।৩৩'২
৭) ঐ, ৫।১১

"কেবল' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে 'মমত্ব-বুদ্ধি-রহিত হইয়া একমাত্র ঈশ্বরার্থই, ফলাদির কামনায় নহে।' কায়িক, বাচিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার কর্মই যোগী ঐ প্রকার ভাবনা-পরায়ণ হইয়া করে এবং তাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধ হইলেই জ্ঞানোদয় হয়। "প্রযত্ন সহকারে উদ্যোগ করিতে করিতে (কর্ম) যোগী (ক্রমে) পাপ হইতে সম্যক্ শুদ্ধ হইয়া অনেক জন্মে সম্যক্ সিদ্ধ হয়, অনন্তর পরমগতি লাভ করে।[1] সুতরাং কর্ম দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাতে জ্ঞানলাভ হইয়া মুক্তি হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, ভগবানকে পরিতোষণার্থ কৃত কর্ম ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান উৎপাদন করে।[2] //

নিষ্কামকর্মযোগরহস্য—প্রাচীন ভাগবতধর্মের নিষ্কামকর্মযোগের অপর কতিপয় রহস্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা এখানে ঐ সকলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

(১) নিষ্কামকর্মযোগের একটি বিশেষ রহস্য এই যে অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠীয়মান কর্ম সিদ্ধ বা সফল হউক বা না হউক উভয়েতে সম অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া একই ভাবে থাকিতে হইবে। যথা, 'গীত'ায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে ধনঞ্জয়! (কর্ম ও ফলে) আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক (কর্মের) সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ে সম হইয়া যোগে স্থিত হইয়া কর্ম কর। (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমত্ব (বুদ্ধি)কেই যোগ' বলে।"[3] সাত্ত্বিক কর্তার এক লক্ষণ এই যে "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো-নির্বিকারঃ" ('সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার')[4] অর্থাৎ কৃত কর্ম সিদ্ধ বা সফল কিংবা অসিদ্ধ বা নিষ্ফল হউক, তাহাতে সাত্ত্বিক কর্তার মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন"[5]—অর্জুনের এই উক্তি হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে সাম্যবুদ্ধি সহ কর্মযোগের কথাই কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। 'গীতা'য় ঐ কর্মযোগের প্রশংসা আছে। কথিত হইয়াছে যে সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্ম অপেক্ষা অপর কর্ম নিকৃষ্ট;[6] সাম্যবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পাপ ও পুণ্য উভয়কে পরিত্যাগ করে;[7] কৃতকর্মের পুণ্যাপুণ্য ফলে লিপ্ত হয় না বলিয়া সাম্যবুদ্ধিযুক্ত কর্মী জন্মবন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।[8] "যে যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত, বিমৎসর এবং (কর্মের) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম, সে কর্ম করিয়া ও বন্ধনগ্রস্ত হয় না।"[9] কর্মের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া উহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকা সমীচীনই হয়।

(২) যেহেতু, কর্মবিশেষের প্রতিও আসক্তি থাকিবে না, সেই হেতু অমুক কর্ম করিব, আর অমুক কর্ম করিব না,—এই প্রকার কোন ইচ্ছাও মনে রাখিতে নাই। সুতরাং কোন কর্মবিশেষ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্পও করিতে নাই। ইহাকে গীতা বলিয়াছেন 'সর্বারম্ভপরিত্যাগ'। তন্মতে নিষ্কামকর্মী "সর্বারম্ভপরিত্যাগী"।[10] আচার্য্য শঙ্কর "যাহা আরম্ভ করা যায় তাহাই 'আরম্ভ'। ইহকালে এবং পরকালে ফলভোগের কামনা হেতুতে আরম্ভকৃত কর্মসমূহই 'সর্বারম্ভসমূহ'। উহাদের পরিত্যাগ করিতে যাহার স্বভাব সে 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'।"[11]

---

[1] গীতা, ৬।৪৫

[2] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৫।৩৫

[3] ঐ, ২।৪৮

[4] ঐ, ১৮।২৬

[5] ঐ, ৬।৩৩·১

[6] ঐ, ২।৪৯·২

[7] ঐ, ২।৫০·১

[8] ঐ, ২।৫১

[9] ঐ, ৪।২২

[10] ঐ, ১২।১৬·২ ; ১৪।২৫·২

[11] ঐ, ১২।১৬ (শঙ্করভাষ্য)

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলার্থ কর্মসমূহ আরম্ভ করা যায়। সুতরাং উহারা 'আরম্ভসমূহ'। সমস্ত আরম্ভকে পরিত্যাগ করিতে যাহার স্বভাব সেই 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'। উহার অর্থ এই যে দেহধারণমাত্র নিমিত্ত ব্যতিরেকে সর্বকর্মপরিত্যাগী।"[১] সমুচ্চয়বাদিগণ এই অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' অর্থ 'সর্বকর্মপরিত্যাগী' নহে, 'সর্বকাম্যকর্মপরিত্যাগী'। কৃষ্ণ বলিয়াছেন "যাহার সমস্ত সমারম্ভ (অর্থাৎ কর্ম) কামসঙ্কল্পবর্জিত (অর্থাৎ কামনা এবং উহার কারণ সঙ্কল্প বিরহিত) এবং যাহার কর্মসমূহ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, বিদ্বান্‌গণ তাহাকেই 'পণ্ডিত' বলেন।"[২] "যখন (সাধক) ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে ও কর্মসমূহে অনুষক্ত হয় না, তখন তাহাকে সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ও যোগারূঢ় বলা হয়।"[৩] "হে কৌন্তেয়! সহজকর্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করা (কখনও) উচিত নহে। কেননা, যেমন অগ্নি ধূমযুক্তই থাকে, তেমন সর্ব আরম্ভ (বা কর্ম কোন না কোন প্রকার) দোষযুক্ত থাকে।"[৪] তাহাতে মনে হয়, সহজ কর্ম ব্যতীত অপর কোন কর্ম আরম্ভ করিবার কামনা এবং সঙ্কল্প যে পরিত্যাগ করিয়াছে সেই 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী'। ইহাই 'গীতা'র নিষ্কামকর্মযোগের দ্বিতীয় রহস্য।

(৩) উহার তৃতীয় রহস্য শুভাশুভ পরিত্যাগ। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে (শুভবস্তু প্রাপ্তিতে) হৃষ্ট হয় না (অশুভ বস্তু প্রাপ্তিতে) দ্বেষ করে না, (প্রাপ্ত বস্তু নাশে) শোক করে না এবং (অপ্রাপ্তবস্তুর) আকাঙ্ক্ষা করে না—(এইরূপে) যে শুভাশুভপরিত্যাগী, সেই ভক্তিমান্ পুরুষ আমার প্রিয়।"[৫] "(কর্ম ও ফলে আসক্তি) ত্যাগী, সত্ত্বসমাবিষ্ট (=সাম্যবুদ্ধিযুক্ত), মেধাবী এবং ছিন্নসংশয় ব্যক্তি অকুশল কর্মে দ্বেষ করে না, এবং কুশল কর্মে অনুষক্ত হয় না।"[৬] কর্মযোগীর চরমে পাপপুণ্যবোধ থাকে না। কেননা, কর্মদ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানোদয়ে সমস্তই বাসুদেব বলিয়া উপলব্ধি হয়; সুতরাং তখন পুণ্য ও পাপ, শুভ ও অশুভ, ইত্যাদি ভেদবোধ থাকিতে পারে না এবং সেই হেতু কর্ম শুভ কি অশুভ—তাহা বিচারের কোন অবসর থাকে না। তাহার অব্যবহিত পূর্বে উচ্চাবস্থা-প্রাপ্ত সাধক অপবাদ দ্বারা শুভাশুভ পরিত্যাগ করিতে পারে। যাহা হউক, শ্রুতিতেও সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে,—

"এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপমকরবমিতি"[৭]

'আমি কেন পুণ্য কর্ম করি নাই, আমি কেন পাপ কর্ম করিয়াছি—(এই প্রকার চিন্তা) তাঁহাকে (ব্রহ্মানন্দবিদ্ পুরুষকে) সন্তপ্ত করে না।'

ক) গীতোক্ত কর্মযোগের চতুর্থ রহস্য কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ অর্থাৎ আমি কর্ম করিতেছি এই বোধ না থাকা। গীতায় সাংখ্যদর্শনের ভাষায় বলা হইয়াছে যে আত্মা বা পুরুষ এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; পুরুষ স্বরূপতঃ নির্গুণ, উদাসীন ও অকর্তা, আর প্রকৃতি সমস্ত কিছুই

---

১) গীতা, ১৪।২৫ (শঙ্করভাষ্য); আরও দেখ—১৮।৩ (শঙ্করভাষ্য)

২) ঐ, ৪।১৯ ৩) ঐ, ৬।৪

৪) ঐ, ১৮।৪৮ ৫) ঐ, ১২।১৭

৬) গীতা, ১২।১৭ ৭) তৈত্তিউ, ২।৯

করিতেছে ; পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির কর্মকে আপন কর্ম বলিয়া মনে করিতেছে ;[১] এবং সেই হেতু বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে।[২] "যে ইহা জানে যে সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে কেবল প্রকৃতিরই দ্বারা কৃত হইতেছে এবং আত্মা অকর্তা (অর্থাৎ কিছুই করে না), সেই (যথার্থ তত্ত্ব) জানিয়াছে।"[৩] ঐ জ্ঞান হইলে পুরুষও মুক্ত হয়।[৪] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' পক্ষান্তরে উক্ত হইয়াছে যে কর্তৃত্বাভিমান থাকিলে অনাসক্ত কর্ম দ্বারাও মানুষ মুক্ত হইতে পারে না। ঐ বিষয়ে ভগবান্ কপিল ব্রহ্মার, তথা সনকাদি মহর্ষির এবং যোগ-প্রবর্তক সিদ্ধগণের, দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

"ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্মণা।
কর্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্॥
স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্তিনা।
জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্বং প্রজায়তে॥"

ইত্যাদি।[৫] তাঁহারা নিঃসঙ্গভাবে কর্ম করিলে ভেদদৃষ্টি বশতঃ কর্তৃত্বাভিমান হেতু পুরুষোত্তম বা সগুণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাকে) প্রাপ্ত হন এবং পরে প্রলয়কালের অবসানে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যখন ঈশ্বরের মূর্তি কাল দ্বারা গুণের ব্যতিকর হয়, তখন পূর্বের ন্যায় পুনঃ উৎপন্ন হন। সুতরাং তাঁহারা মুক্ত হন না। তাই মুমুক্ষু সাধককে 'আমি করিতেছি',—এই বোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কৃষ্ণ বলেন, "তত্ত্বজ্ঞ যোগীকে ইহা বুঝিতে হইবে যে 'আমি কিছুই করি না' ; দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে, আঘ্রাণ লইতে, খাইতে, চলিতে, শুইতে, নিশ্বাসপ্রশ্বাস লইতে, বলিতে, বিসর্জন করিতে, গ্রহণ করিতে এবং চোখের পলক খুলিতে ও বন্ধ করিতে তাঁহাকে এই ধারণা করিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইতেছে মাত্র।"[৬] এই অকর্তৃত্ব-বোধের সুত্যর্থ তিনি বলেন, "'আমি কর্তা'—এই ভাব যাহার নাই এবং যাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সেই যদি এই সমস্ত প্রাণিগণকে হত্যাও করে, তথাপি (বুঝিতে হইবে যে) সে হত্যা করে নাই এবং (তৎকার্য্য হেতু) বন্ধনগ্রস্ত হয় না।"[৭] এই বিষয়ে তিনি কৌষীতকি-শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। তথায় ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলেন ;

"স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্মণা লোকো মীয়তে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণ-হত্যয়া নাস্য পাপং।"[৮]

যাহা হউক, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যথার্থতঃ না বুঝিয়া কেহ যেন মনে না করে যে ইহাতে জ্ঞানীকে অন্যায় কর্ম করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ঐ অকর্তৃত্বাত্মবোধের দৃষ্টান্তরূপে

---

১) গীতা, ৩।২৭ ; আরও দেখ—৫।১৩—৪ ; ১৮।১৪—৬

২) ঐ, ১৩।১৯—২১ ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে গীতায় এই প্রকারে সাংখ্যদর্শনের ভাব ও পরিভাষা প্রায় প্রযুক্ত হইলেও, সাংখ্যদর্শনের ন্যায় উহাতেও প্রকৃতি এবং পুরুষকে ভিন্ন দুই পরমতত্ত্ব মানা হয় না। উহা সাংখ্যদর্শনের ন্যায় অনীশ্বরবাদীও নহে। উহার মতে ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব এবং পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার 'প্রকৃতি' (৭।৪-৬) 'মায়া' (৭।১৪) বা 'যোনি' (১৪।৩), সুতরাং অংশ (১৫।৭)

৩) গীতা, ১৩।২৯ ৪) ঐ, ১৪।১৯—২০

৫) (বিষ্ণু)ভাগ, ৩।৩২।১৩—৫ ৬) গীতা, ৫।৮—৯

৭) ঐ, ১৮।১৭ ৮) কৌষীউ, ৩।১ বৌদ্ধ 'ধর্মপদে'ও ইহার প্রতিধ্বনি আছে।

কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর জগতের সৃষ্ট্যাদি করিয়াও প্রকৃতপক্ষে অকর্তা এবং অব্যয়।[১] যতদিন অকর্তৃত্ববোধ না আসে,—কর্তৃত্ববোধ থাকে, ততদিন শাস্ত্রবিহিত কর্ম[২] বা স্বকর্ম, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া, সুতরাং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার থাকিয়া, ধৈর্য্য এবং উৎসাহ সহকারে করিতে হইবে। কেননা, শাস্ত্র দ্বারা নিযুক্ত হইয়া, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া এবং রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া অর্থাৎ তদ্বশে নহে, কেবল কর্তব্য বোধে, কৃত কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।[৩] আর যাহার কর্মে এবং তৎফলে আসক্তি নাই, যে 'আমি করিতেছি' ও 'আমার কর্ম' বলিয়া দম্ভ করে না, কর্মে সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে যে নির্বিকার, অথচ পূর্ণ ধৃতি এবং উৎসাহের সহিত কর্তব্য কর্ম যে করে, সে সাত্ত্বিক কর্তা।[৪] যাহা সাত্ত্বিক, তাহা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এবং কর্ম করিবার স্বাতন্ত্র্যও মনুষ্যের আছে। কেননা, কৃষ্ণ বলিয়াছেন "(মনুষ্য) আপনিই আপনার উদ্ধার করিবেক; আপনি আপনাকে অবসন্ন করিবেক না। কেননা, (মনুষ্য) নিজেই নিজের বন্ধু (বা হিতকারী) এবং নিজেই নিজের শত্রু (বা অহিতকারী)।"[৫]

এইরূপে দেখা যায়, 'গীতা'র মতে কর্ম দ্বিবিধ—(১) কর্তৃত্বাভিমান-রহিত ও (২) কর্তৃত্বাভিমান-সহিত ঈশ্বরার্থ কর্ম, নিষ্কামকর্ম, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম, প্রভৃতিতে কর্তৃত্বাভিমান অবশ্যই থাকে। সুতরাং কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেই যে দোষ হইবে, তাহা নহে। কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগের জন্য জ্ঞান আবশ্যক। নিষ্ক্রিয়-আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান অবগত হইলে মনুষ্য কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে। সাংখ্যবাদী ও অদ্বৈতবেদান্তী উভয়েরই মতে আত্মা নিষ্ক্রিয়। জ্ঞানোদয়ে উভয়েই সমদর্শী হয়। বেদান্তীর তখন 'বাসুদেবঃ সর্বং' জ্ঞানও হয়। ঈশ্বরার্থ কর্ম ভক্তই করিতে পারে। কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগার্থ ভক্ত অপর এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহা 'শরণাগতি' নামে অভিহিত হয়। তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।[৬] তাহাতে কর্ম আরও প্রকৃষ্টতররূপে ঈশ্বরেরই হয়। নিষ্কামকর্ম এবং লোকসংগ্রহার্থ কর্ম অনীশ্বরবাদীও করিতে পারে।

স্বকর্ম বা স্বধর্ম—এই মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে যে গীতার মতে কর্মযোগীকে কোন কর্মবিশেষ আরম্ভ করিবার কামনা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাতে প্রশ্ন হয়—তবে তিনি কোন কর্ম করিবেন? গীতা বলেন, স্বকর্ম,—প্রত্যেক মনুষ্য তাহার স্বকর্ম করিবে। উহাকে "স্বভাবজ" কর্ম, "স্বভাবনিয়ত কর্ম" বা "সহজ কর্ম"ও বলা হইয়াছে।[৭] স্বকর্ম ব্যতীত অপর কোন কর্ম আরম্ভ করিবার কামনা ও সঙ্কল্প পরিত্যাগের অনুশাসনই গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে। চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য বিহিত কর্মই তাহার স্বকর্ম। এই বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের কর্ম উহার "স্বভাবপ্রভব গুণসমূহ" অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।[৮] 'স্বভাব'

---

১) গীতা, ৪।১৩ ২) ঐ, ১৬।২৪ দেখ

৩) গীতা, ১৮।২৩ ৪) ঐ, ১৮।২৬ ৫) ঐ, ৬।৫ ৬) পরে দেখ।

৭) ঐ, ১৮।৪১—

৮) ঐ, ১৮।৪১ অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "চারিবর্ণের ব্যবস্থা আমি গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে নির্মাণ করিয়াছি। (ঐ, ৪।১৩.১)

শব্দের অর্থ, শঙ্কর বলেন, ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া, "অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেন অভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ" ('অথবা, প্রাণিদিগের জন্মজন্মান্তরে কৃত কর্মসমূহের যে সংস্কার বর্তমান জন্মে আপন কার্য্যাভিমুখী হইয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহাই 'স্বভাব')। অর্থাৎ 'প্রকৃতিগত সত্ত্বাদিগুণত্রয় অথবা সংস্কারজ গুণসমূহ অনুসারেই বর্ণচতুষ্টয়ের কর্মসমূহ প্রবিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং, যে মনুষ্য যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহ, গীতার মতে, তাহার 'স্বকর্ম' 'সহজকর্ম' বা 'স্বভাবনিয়ত কর্ম'। "যাহারা চুরি করে না, তথা অপর কোন পাপকর্ম করে না, সেই (রজকচর্মকারাদি) অন্ত্যজ, (চাণ্ডালাদি) অন্তেবসায়ী, প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর জাতিদিগের বৃত্তি তত্তৎ কুলপরম্পরাগত হয়।"[১] স্বকর্মকে 'স্বধর্ম'ও বলা হয়। উহাকে 'শাস্ত্রোক্তকর্ম'ও বলা হয়। সত্ত্বাদি গুণবিশেষ-সাপেক্ষ হইয়াই, গুণাপেক্ষা-ব্যতীত নহে, শাস্ত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কর্মসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রপ্রবিভক্ত কর্মকে গুণপ্রবিভক্ত কর্ম বলা যায়।[২] তাই কৃষ্ণ বলিয়াছেন, কোন্ কর্ম কর্তব্য এবং কোন্ কর্ম অকর্তব্য তাহা নির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র; শাস্ত্রবিহিত স্বকর্মকে জানিয়া তদনুসারে কর্ম করাই মানুষের উচিৎ।[৩] স্বকর্ম দ্বারাই মনুষ্য ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করিতে পারে। নারায়ণীয় সনাতনধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে রাজন্! বেদদ্রষ্টা ঋষিগণ যুগে যুগে মনুষ্যগণের প্রায় স্বভাববিহিত ধর্ম স্মরণ (অর্থাৎ আবিষ্কার) করিয়াছেন। ঐ সকল উহাদের ইহলোকে এবং পরলোকে হিতকারী।"[৪] তাই ভাগবতধর্মে শাস্ত্রবিহিতধর্ম ত্যাগের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। 'গীতা'য় আছে, "যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করতঃ যথাকাম কর্ম করে, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, এবং পরাগতি (বা মোক্ষ) প্রাপ্ত হয় না।"[৫] (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণের ভাগবতধর্মবিবরণে আছে, "যে নিজে অজ্ঞ বা অজিতেন্দ্রিয় এবং (সেইহেতু) বেদোক্ত কর্ম আচরণ করে না, অবিহিত কর্মাচরণ জনিত পাপ হেতু সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হয়)।"[৬] কৃষ্ণ আরও বলেন "হে কৌন্তেয়! সহজ কর্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করা (কখনও) উচিৎ নহে। কেননা, যেমন অগ্নি ধূমযুক্তই থাকে, তেমন সর্ব আরম্ভ (বা কর্ম কোন না কোন প্রকার) দোষযুক্ত থাকে।"[৭]

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥"[৮]

'উত্তমরূপে সম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বধর্ম, বিগুণ (অর্থাৎ দোষযুক্ত এবং মন্দরূপে সম্পাদিত) হইলেও, শ্রেয়স্কর। (পরধর্ম আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা) স্বধর্মে (স্থিত থাকিয়া) মৃত্যু (বরণ করা) শ্রেয়। (কেননা,) পরধর্ম ভয়াবহ।'

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১১।৩১ ২) গীতা, ১৮।৪১ (শঙ্করভাষ্য) ৩) ঐ, ১৬।২৪ ৪) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১২।৩১
৫) গীতা, ১৬।২৩ ৬) (বিষ্ণু)ভাগ, ১১।৩।৪৫ ৭) গীতা, ১৮।৪৮
৮) ঐ, ৩।৩৫

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"[১]

'উত্তমরূপে সম্পাদিত পরধর্ম অপেক্ষা, স্বধর্ম, বিগুণ হইলেও, শ্রেয়স্কর। স্বভাব দ্বারা নিয়ত কর্ম করিলে (মনুষ্য) পাপগ্রস্ত হয় না।' যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জুনকে উহাতে প্রবৃত্ত করাইতে কৃষ্ণ যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, উহাদের একটি এই স্বধর্ম। গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে বধের, তথা জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নাশের, ভয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। ঐ সকল ভাবিয়া তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। কৃষ্ণ বলেন যে অর্জুন ক্ষত্রিয়; সুতরাং যুদ্ধ করা তাঁহার স্বধর্ম; স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার ভীত ও কম্পিত হওয়া উচিত নহে;[২] অধিকন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করিলে, তিনি পাপগ্রস্ত হইবেন।[৩] তিনি আরও বলিয়াছেন

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"[৪]

'নিজ নিজ (স্বাভাবিক গুণসমূহ অনুসারে প্রাপ্ত বর্ণোচিত) কর্মসমূহে অভিরত (অর্থাৎ সর্বপ্রকারে নিরত) থাকিয়াও মনুষ্য সংসিদ্ধি লাভ করে।[৫] স্বকর্মে নিরত (থাকিয়া মানুষ) কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শুন। যাঁহা হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (=উৎপত্তি বা চেষ্টা) হয় এবং যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, স্বকর্ম দ্বারা তাঁহার পূজা (বা আরাধনা) করিয়া মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।' পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভাগবতধর্মমতে, ঈশ্বরার্পণ বা ঈশ্বরার্থ বুদ্ধিতে কৃত কর্ম ভগবানের একপ্রকার পূজা বা উপাসনা হয়। এইখানে আরও বিশেষ করিয়া ব্যক্ত হইল যে ঐ বুদ্ধিতে যদি স্বকর্মও করে, তথাপি মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। এই প্রকারে স্বকর্ম দ্বারাও যখন মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তখন উহা পরিত্যাগ করত পরধর্ম আশ্রয় করার প্রয়োজন কি?

এইখানে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করা উচিৎ মনে হয়। ভাগবতধর্মের উপলব্ধ প্রাচীন গ্রন্থসমূহের কোনটাতে উহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, তবে উহাকেও প্রাচীন ভাগবতধর্মের অঙ্গ বলিয়া অবশ্যই মনে করিতে হইবে। 'মহাভারতে' কোন কোন স্থলে উহা পাওয়া যায়। উহা এই—সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম পালনে সমান অধিকার আছে; সুতরাং স্বধর্ম আচরণে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রাখিতে হইবে,

---

[১] গীতা, ১৮।৪৭ [২] ঐ, ২।৩১ [৩] ঐ, ২।৩৩ [৪] ঐ, ১৮।৪৫—৬

[৫] কৌটিল্যও বলিয়াছেন, "স্বধর্মঃ স্বর্গায়ানন্ত্যায় চ। তস্যাতিক্রমে লোকঃ সঙ্করাদুচ্ছিদ্যেত……স্বধর্মং সন্দধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি॥" (অর্থশাস্ত্র, শামাশাস্ত্রী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, ১।৩; ৮ পৃষ্ঠা) তিনি আরও বলিয়াছেন যে চারিবর্ণের ও আশ্রমের প্রত্যেকের স্বধর্ম বেদ স্থাপন করে। (ঐ, ৭ পৃষ্ঠা); এবং তাহা করে বলিয়াই বেদ জগৎকে রক্ষা করে,—জগৎ প্রসন্ন হয়, অবসন্ন হয় না।

"ব্যবস্থিতার্যমর্য্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
ত্রয্যা হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি॥" (ঐ, ৮ পৃষ্ঠা)

কেননা, উহা সেই পর ব্যক্তির স্বধর্ম, সুতরাং উহা আচরণে তাহার সেই প্রকার অধিকার আছে, যেমন নিজের স্বধর্ম আচরণে নিজের অধিকার আছে। তাই হনুমান ভীমকে বলেন,

"মা তাত সাহসং কার্ষীঃ স্বধর্মং পরিপালয়।
স্বধর্মস্থঃ পরং ধর্মং বুধ্যস্ব গময়স্ব চ ॥[১]

'হে তাত! তুমি স্বধর্ম পরিচালন কর। স্বধর্মে স্থিত থাকিয়া পরধর্মকে (অর্থাৎ পরের স্বধর্মকে) বুঝ এবং (তাহার সহিত তাহা রক্ষা করিয়া) চল। (তাহা উপেক্ষা করিয়া) দুঃসাহস করিও না।' ভগবতী সতী দক্ষকে বলেন, "স্ব এব ধর্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ" (অর্থাৎ নিজের স্বধর্মে স্থিত ব্যক্তি পরকে, যে তাহার নিজের স্বধর্মে স্থিত তাহাকে নিন্দা করিবেক না)।[২]

যজ্ঞার্থ কর্ম—'গীতা'য় উক্ত হইয়াছে যে যজ্ঞার্থ কর্ম ভিন্ন অপর কর্ম করিয়া মানুষ বন্ধনগ্রস্ত হয়; সেই হেতু মানুষের উচিৎ সঙ্গমুক্ত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম করা।[৩] পরে আছে, "সঙ্গরহিত, (রাগদ্বেষাদি হইতে) মুক্ত, (প্রকৃত তত্ত্ব)জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত এবং যজ্ঞার্থ আচরণকারী ব্যক্তির (সমস্ত) কর্ম ফলের সহিত বিনষ্ট হয়।"[৪] সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইলে, ভোগের কিছু আর থাকে না। সুতরাং বর্তমান দেহ নিপাত হইলে, পুনরায় নূতন দেহ গ্রহণ করিতে হয় না। অতএব মুক্তিলাভ হয়। এইরূপে দেখা যায়, যজ্ঞার্থ কর্ম, ফলাসক্তি রহিত হইয়া কৃত হইলে, বন্ধনের হেতু না হইয়া, মুক্তিলাভেরই হেতু হয়। 'গীতা'য় স্পষ্টতঃ তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে যজ্ঞশেষভোজী সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করে।[৫] পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহাদের কোথাও সুখ শান্তি হয় না।[৬] এখন প্রশ্ন 'যজ্ঞার্থ কর্ম' কি? বা 'যজ্ঞ' কি?

আচার্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের এক স্থলে বলিয়াছেন, "'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'—এই শ্রুতি হইতে (সিদ্ধ হয় যে) 'যজ্ঞ' (শব্দের অর্থ) 'ঈশ্বর'; তদর্থে যাহা কৃত হয়, তাহা যজ্ঞার্থ কর্ম।"[৭] এই ব্যাখ্যা মতে যজ্ঞার্থ কর্ম = ঈশ্বরার্থ কর্ম। পরবর্তী অপর কোন কোন টীকাকারও সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীন ভাগবতধর্ম মতে, ঈশ্বরার্থ কর্ম দ্বারা যে মনুষ্য বন্ধনগ্রস্ত হয় না, বরং মুক্ত হয়, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিলক ঐ ব্যাখ্যাকে কষ্ট-কল্পিত মনে করেন।

'গীতা'তে 'যজ্ঞ' শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।[৮] যথা,—

---

১) মহাভা, ৩।১৫০।২৫
২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।৪।১৯.২
৩) গীতা, ৩।৯
৪) গীতা, ৪।২৩
৫) গীতা, ৩।১৩ ; ৪।৩০·২—৩১·১
৬) গীতা, ৪।৩১·২
৭) গীতা, ৩।৯ (শঙ্কর-ভাষ্য)

৮) 'যজ্ঞ' শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ বেদেও পরিদৃষ্ট হয়। 'ঋগ্বেদে' যজ্ঞ দেবতাকে উপাসনার,—তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে বা তাঁহার প্রসাদে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার এক সাধন বিশেষ ছিল। 'অথর্ববেদে' (১১।৫।৪) আছে, "তেষাং প্রজ্ঞানায় যজ্ঞমসৃজত" (অর্থাৎ দেবলোকসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্যই প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরন্তু 'যজুর্বেদে' যজ্ঞের মহিমা এবং প্রাধান্য অনেক বেশী দেখা যায়। উহাতে মনে করা হইয়াছে যে যজ্ঞ দ্বারা পুরোহিত যজমানকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে দেবতাকে বাধ্য করিতে পারেন। তখন দেবতা যজ্ঞের বা যজ্ঞকারীর যেন অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তখন যথাবিধি যজ্ঞকারীকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করা বা না করা দেবতার ইচ্ছার বা দয়ার উপর নির্ভর করে না, দেবতা যেন প্রদান করিতে বাধ্য। 'যজুর্বেদে' যজ্ঞকে কখন কখন বিষ্ণু বলা হইয়াছে। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" (তৈত্তিসং, ১।৭।৪)। ২।৫।৭।৩ ব্রাহ্মণগ্রন্থেও যজ্ঞকে কখন কখন বিষ্ণু বা প্রজাপতি বলা হইয়াছে। "যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ"

(১) ‘গীতা’র কোন কোন বচন[১] হইতে জানা যায় যে যজ্ঞ দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করত তাঁহাদের অনুগ্রহে ধনজনাদি অভীষ্ট ভোগ্যবস্তুসমূহ লাভ করত ইহসংসারে অভ্যুদয়, তথা পরলোকে স্বর্গ, লাভ করার বিধি-নির্দিষ্ট সাধন বিশেষ। ঐ যজ্ঞ ‘বৈদিক যাগযজ্ঞ’, ‘হবন’ বা ‘দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে দ্রব্যার্পণ’। উহাই ‘যজ্ঞ’ শব্দের প্রাচীন বৈদিক প্রয়োগ। ঐ অর্থে ‘যজ্ঞ’ শব্দের ব্যবহার ভাগবতধর্মের অপর প্রাচীন গ্রন্থ ‘নারায়ণীয়াখ্যানে’ও পাওয়া যায়।[২]

(২) ‘গীতা’র এক স্থলে আছে, “যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভব” (৩।১৪·২), আর “কর্ম ব্রহ্ম-(বা বেদ) সমুদ্ভব” (৩।১৫·১)। তথা হইতে আরও বুঝা যায় যে ঐ যজ্ঞ জগচ্চক্রপ্রবর্তনের হেতু বা

“প্রজাপতির্বৈ যজ্ঞঃ” (ঐতব্রা, ২।১৭) “ব্রহ্ম বৈ যজ্ঞঃ” (ঐতব্রা, ৭।২২) আরও দেখ শতব্রা (মাধ্য), ১।১।১।১৩; ১।১।২।১০; ১।১।৩।১; ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞ কেবল সাধন মাত্র নহে, সাধ্য। আগে দেবতাই সাধ্য ছিল, যজ্ঞ সাধন ছিল, তখন যজ্ঞ সাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং যজ্ঞকে দেবতার সমকক্ষ বা সমান মনে করা হইতে লাগিল। অথবা তাহার কারণ ইহা হইতে পারে যে যজ্ঞ বিষ্ণুকে বা প্রজাপতিকে লাভের প্রকৃষ্টতম উপায়। ‘তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে’ আছে, বিষ্ণু “যজ্ঞস্য রাধ্যো হবিষ্মতঃ” (‘হবির্যুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আরাধনীয়’)। (২।৪।৩।৯) সাধনকে সাধ্যের নামে অভিহিত করার রীতি ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে দেখা যায়। যথা, ‘তৈত্তিরীয়োপনিষদে’ (৩।২—৫) বরুণ আপন পুত্রকে বলেন, “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্ম।” এই বচনের প্রথম ভাগে তপকে ব্রহ্মকে জানিবার সাধন বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ভাগে ঐ সাধনকে সাধ্যের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। “সৈষা ত্রয়ী বিদ্যা যজ্ঞঃ।” (শতব্রা (মাধ্য), ১।১।৪।৩) যজ্ঞকে কেবল সাধ্যের নহে, কখন কখন সাধকেরও সমান বলা হইয়াছে। যথা, শতপথব্রাহ্মণে আছে,—

“পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ। পুরুষস্তেন যজ্ঞো যদেনং পুরুষস্তনুত এষ বৈ তায়মনো যাবানেব পুরুষস্তাবানের বিধীয়তে তস্মাৎ পুরুষো যজ্ঞঃ।”—(শতব্রা (মাধ্য), ১৩।২।১; ৩।৫।৩।১)

‘পুরুষই যজ্ঞ। সেই কারণে পুরুষ যজ্ঞ যে কারণে পুরুষ (যজ্ঞকে) বিস্তার করে (অর্থাৎ সম্পাদন করে)। এবং যখন তায়মান হয় (তখন) পুরুষ যে পরিমাণ ঠিক সেই পরিমাণ (বেদী প্রভৃতি) বিধান করা হয়। সেই কারণেই পুরুষ যজ্ঞ।’ (আরও দেখ—ঐ, ১০।২।২।৬) ‘কৌষীতকীব্রাহ্মণে’ আছে, প্রজাপতি যজ্ঞ, বিশ্বজিৎ প্রজাপতি, সুতরাং বিশ্বজিৎ যজ্ঞ (২৬।৩); যজ্ঞকর্তা প্রজাপতি, বশিষ্ঠ যজ্ঞকর্তা,—যজ্ঞের বিস্তার করেন, সেইহেতু বশিষ্ঠ প্রজাপতি। (২৬।১৫; ২৫।২) ‘শতপথব্রাহ্মণে’ (মাধ্য) আছে যে যজমান=যজ্ঞদেবতা। “ইন্দ্রো বৈ যজমানঃ……ইন্দ্রো যজ্ঞস্য দেবতা” (২।১।২।১১); “ইন্দ্রো বৈ যজমানঃ” (৫।১।৪।২,৩)।

বেদে ‘যজ্ঞ’ শব্দ অপর ব্যাপক অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও সৃষ্টিকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। (ঋক্ সং, ১০।৯০।১৬; ১০।১৩০।৩; প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী, ১ম ভাগ,)। উপনিষদে পুরুষের জীবনযাত্রাকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উহা ‘পুরুষযজ্ঞ’। (ছান্দোগ্যউ, ৩।১৬—৭ খণ্ড) আবার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জন্ম পর্যন্ত সময়ে জীব যে যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত ব্যাপারকেও যজ্ঞ বলা হইয়াছে। উহাও এক যজ্ঞচক্র। উহাকে ‘পঞ্চাগ্নিবিদ্যা’ বলা হয়। (বৃহউ, ৬।২।৯—১৩; ছান্দোগ্যউ, ৫।৪—৯) অশ্বমেধাদি প্রাচীন দ্রব্যযজ্ঞসমূহের রূপক ব্যাখ্যাও উপনিষদে পাওয়া যায়। ‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’র প্রারম্ভে বিশ্বপ্রপঞ্চকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ অশ্বমেধযজ্ঞ বেদান্তে প্রপঞ্চবিলয়ই। ‘নির্ঘণ্টু’র মতে বেদে ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থ ‘বিষ্ণু’, ‘প্রজাপতি’ এবং ‘ধর্ম’ও হইতে পারে। (‘নির্ঘণ্টু’, ৩।১৭)

১) দেখ, ‘গীতা’, ৩।১০—২; ৯।১৬, ২০; ১৭।২৩—৮

২) সংস্কৃত ‘যজ্ঞ’ শব্দ ‘যজ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভট্টোজী দীক্ষিত লিখিয়াছেন, “যজ্ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু।” (‘সিদ্ধান্তকৌমুদী’, নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

সহায়ক।[১] আচার্য শঙ্কর বলেন, ঐ 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'অপূর্ব',[২]—যাহা পূর্বোক্ত হবনরূপ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়।

(৩) 'গীতা'তে দৈবযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, প্রভৃতি নানাপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং কথিত হইয়াছে যে ঐ সকল যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞবিদের পাপ বিনষ্ট হয়।[৩] 'মহাভারতে রণযজ্ঞ শস্ত্রযজ্ঞ প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে।[৪] ঐ সকল স্থলে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'বিধিবদ্ধ ক্রিয়াবিশেষ' মাত্র।[৫] পরন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য যে 'দ্রব্যযজ্ঞ' অর্থ প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যময় যজ্ঞ ("দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাৎ"[৬]) বা 'দ্রব্যরূপ সাধন দ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞ'। যে যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে পূজা করা হয়,—পরিতুষ্ট করা হয়, তাহা 'দৈবযজ্ঞ' বা 'দেবযজ্ঞ'। জ্ঞানচর্চা 'জ্ঞানযজ্ঞ'। পূর্বোক্ত হবনরূপ যজ্ঞ বা দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যার্পণরূপ যজ্ঞ এক প্রকার দৈবযজ্ঞ।

---

১) বৈদিক যজ্ঞ যে চরাচর সর্বভূতের ধারক ও সমৃদ্ধি-কারক "ঋতের যোনি" ("যজ্ঞো বৈ ঋতস্য যোনিঃ" —শতব্রা (মাধ্য), ১।৩।৪।১৬) তাহা গীতার ন্যায়, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা, 'মনুস্মৃতি'তে আছে,

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" (৩।৭৬)

'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ৫।৩।৫।১৭, ১৪।৩।২।১) আছে

"অগ্নের্বৈ ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্‌বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে"

'অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হয়, ধূম হইতে অভ্র ও অভ্র হইতে বৃষ্টি। সুতরাং অগ্নি হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হয়।' (আরও দেখ—গোপথব্রা, ১।৩৬) তাই বোধ হয় উহার অন্যত্র (১৪।৩।২।১) উক্ত হইয়াছে

"সর্বেষাং বা এষ ভূতানাং সর্বেষাং দেবানামাত্মা যদ্‌যজ্ঞস্তস্য সমৃদ্ধিমনু যজমানঃ প্রজয়া পশুভিঃ ঋধ্যতে।"

'যজ্ঞ সমস্ত প্রাণীর, তথা সমস্ত দেবতার আত্মা। উহার সমৃদ্ধির পরে যজমান প্রজাগণ ও পশুসমূহ দ্বারা ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

'কপিষ্ঠলসংহিতা'য় আছে

"বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞো বৈষ্ণবো যজমানঃ। বিষ্ণুনৈব যজ্ঞেনাত্মানমুভয়তঃ সযুজং কুরুতে। (৩৫।৯) 'যজ্ঞ বিষ্ণুই; যজমান বৈষ্ণব। যজ্ঞরূপ বিষ্ণু দ্বারাই (যজমান) আপনাকে (ইহলোক ও পরলোক) উভয়ত্র সমানযোগ্য করে।' তাই বলা হইয়াছে যে

"যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম" (কপিসং, ৪৬।৬) কাঠকসং, ৩০।১০

'বাজসনেয়সংহিতা'য় আছে, যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এই মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষণ করিবে,—

"বিষ্ণোঃ শর্মাসি শর্ম যজমানস্য"—(বাজসং, ৪।১০)

'শতপথব্রাহ্মণে' ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে

"উভয়ং বা এষোঽত্র ভবতি যো দীক্ষতে বিষ্ণুশ্চ যজমানশ্চ যদহ দীক্ষতে তদ্বিষ্ণুর্ভবতি যদ্‌যজতে তদ্‌যজমানস্তস্মাদাহ 'বিষ্ণোঃ শর্মাসি শর্ম যজমানস্যে'তি।" (মাধ্য, ৩।২।১।১৭)

২) গীতা, ৩।১৪ (শঙ্করভাষ্য)   ৩) গীতা, ৪।২৫—৩০

৪) 'শস্ত্রযজ্ঞ'—মহাভা, ৫।১৪১।২৯—৫১; 'রণযজ্ঞ'—মহাভা, ২।২২।১৭; ৫।১৫৭।৪; ইত্যাদি; 'চিন্তাযজ্ঞ' মহাভা, ১৪।৯২।১৮'১; 'স্পর্শযজ্ঞ'—মহাভা, ১৪।৯২।১৯'১; 'বীজযজ্ঞ'—মহাভা, ১৪।৯২।২০'২; 'দানযজ্ঞ'—মহাভা, ১৫।১৪।১৬'১; 'শ্রাদ্ধযজ্ঞ'—মহাভা, ১৫।১৪।৭'১। রণযজ্ঞের বর্ণনার জন্য মহাভা, ৫।৫৮।১২—দেখ। ৫।১৫৭।৪; ইত্যাদি।

৫) "যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষান্" (গাতা, ৪।২৪ শঙ্করভাষ্য)

৬) গীতা, ৪।৩৩'১

আর দ্রব্যসাধ্য বলিয়া দ্রব্যযজ্ঞও। তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, প্রভৃতিও দৈবযজ্ঞ হইতে পারে, পরন্তু দ্রব্যযজ্ঞ নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞও নহে, দৈবযজ্ঞও নহে।

(৪) "ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥"[১]

'অপরে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞকে যজ্ঞ দ্বারা হবন করে।' আচার্য শঙ্করের মতে, ঐখানে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'আত্মা'। তিনি বলেন,—আত্মার পর্যায়বাচক নামসমূহের মধ্যে 'যজ্ঞ' শব্দের উল্লেখ আছে।[২] তাহা হইতে জানা যায় যে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ 'আত্মা'। আত্মা পরমার্থতঃ ব্রহ্মই। পরন্তু বুদ্ধ্যাদি উপাধিসমূহ সংযুক্ত হইয়া,—উপাধির ধর্মসমূহ উহাতে অধ্যস্ত হইয়া, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ হইয়াছে। ঐ আত্মারূপ যজ্ঞই আহুতিরূপ। উহাকে যজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ ঐ আত্মা দ্বারা ব্রহ্মে হবন করে। তাৎপর্য এই যে সোপাধিক আত্মাকে নিরুপাধিক পরব্রহ্মস্বরূপে যে দর্শন তাহাই উহাতে তাহার হোম। ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ তাহা করে। এইরূপে, শঙ্করের মতে, ব্রহ্মে আত্মাকে বিলয় করাকেই ঐখানে যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ যজ্ঞের অগ্নি ব্রহ্ম, আহুতি আত্মা এবং হোতাও আত্মা স্বয়ং। এই রূপক-কল্পনা 'গীতা'তে বেদের 'পুরুষসূক্ত' হইতে গৃহীত হইয়াছে। বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব মতে ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হন। তাহাকে বিরাট্ যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া নারায়ণ ঋষি 'পুরুষসূক্তে' বলিয়াছেন, "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" ইত্যাদি।[৩] যাহা হউক, এই অর্থে যজ্ঞ বা যজ্ঞার্থ কর্ম যে মুক্তিপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৫) 'গীতা'য় আছে "ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ কর্ম (নামে) অভিহিত (হয়)"।[৪] শঙ্কর বলেন, দেবতার উদ্দেশ্যে চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্যসমূহের পরিত্যাগ বা বিসর্জনই কর্ম। সুতরাং ঐ বিসর্গ একপ্রকার যজ্ঞই,—দৈবযজ্ঞ বা দ্রব্যযজ্ঞ। উহা 'কর্ম' নামেও অভিহিত হয়। ঐ যজ্ঞ বা কর্ম হইতে স্থাবরজঙ্গম সর্বপ্রাণীর উদ্ভব হয়। সুতরাং ঐ যজ্ঞ বা কর্ম সর্বভূতের সমৃদ্ধি হিত সাধক। তাহা হইতে 'যজ্ঞ' শব্দের ব্যাপক অর্থ 'সর্বভূতের সমৃদ্ধি এবং হিত সাধক কর্ম মাত্র' বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সর্বভূতের হিত সাধন প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরেরই কর্ম। তিনি সর্বভূতের সুহৃদ—সেই হেতু সর্বভূতের হিতসাধনে সর্বদা নিরত। যদি কোন মনুষ্য সর্বভূতের হিতসাধক কর্ম বা যজ্ঞ করে তবে সে ঈশ্বরেরই কর্ম করিয়া থাকে। এইরূপে যজ্ঞার্থ কর্ম ঈশ্বরার্থ কর্মই। শঙ্করও তাহা বলিয়াছেন। যাহা হউক সর্বভূতের সমৃদ্ধি ও হিত সাধন রূপ যজ্ঞ কর্ম করিয়া মনুষ্য বন্ধনগ্রস্ত হয় না।

গীতার কোথাও কোথাও বৈদিক যজ্ঞের তীব্র নিন্দাও দেখা যায়।[৫] ঐ সকল স্থলে স্বর্গাদি ও তত্রস্থ দিব্যভোগসুখাদি লাভের লালসায়—এবং ততোধিক কিছু নাই মনে করিয়া—কৃত সকাম যজ্ঞের, তথা দম্ভাভিমানার্থ কৃত আসুরী যজ্ঞের নিন্দা করা হইয়াছে মাত্র, সকল যজ্ঞের বা যজ্ঞমাত্রের নিন্দা করা হয় নাই। প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে ইহা বলা হয় নাই

---

১) গীতা, ৪।২৫·২

২) দেখ—যাস্কের 'নিরুক্ত', ১৩।১৪

৩) ঋক্ সং, ১০।৯০।১৬

৪) গীতা, ৮।৩·২

৫) গীতা, ২।৪২—৫ ; ৯।২০—১ ; ১৬।৭— আরও দেখ—৮।২৮ ; ১১।৪৮, ৫৩ ; ১৭।১২—৩

যে সকাম যজ্ঞ বৃথা বা নিষ্ফল,—তদ্দ্বারা ঈপ্সিত স্বর্গভোগাদি লাভ হয় না। পক্ষান্তরে ইহা বলা হইয়াছে যে যথাবিধি সম্পাদিত ঐ যজ্ঞও ভগবদুপাসনার এক উপায়,—তদ্দ্বারা ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে ঈপ্সিত স্বর্গভোগাদি লাভ করা যায়। তবে এই কারণে উহার নিন্দা করা হইয়াছে যে ঐ ফল বিনশ্বর,—স্বর্গে দিব্যভোগাদির কালান্তরে ক্ষয় হয়, ভোগক্ষয়ান্তে মনুষ্যকে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সকামভাবে কৃত যজ্ঞ দ্বারা মানুষের জন্মমৃত্যুবন্ধন ছিন্ন হয় না—মুক্তিলাভ হয় না। রাজস ও তামসভাবে দম্ভাভিমান সহকারে কৃত যজ্ঞ যে তদপেক্ষাও অতি নিকৃষ্টতর তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গীতা বলেন, আসুরী প্রকৃতি লোক দম্ভবশতঃ শাস্ত্রোক্ত বিধি পরিত্যাগ করত আপন মন-মানা উপায়ে যজ্ঞ করিয়া থাকে। সুতরাং সে নামে মাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে।[১] সেই কারণে যজ্ঞ করিয়া তাহার অধোগতি হয়।[২] "(ভগবানের) রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি (অতি) মোহিনী। যাহাদের চিত্ত তদ্দ্বারা ভ্রমগ্রস্ত হয় তাহারাই উহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের জ্ঞান মোঘ (বা ভ্রমপূর্ণ), কর্ম মোঘ (বা নিষ্ফল) এবং আশা মোঘ (বা ব্যর্থ)।"[৩] যজ্ঞ করা ঈশ্বরের বিধান, সুতরাং তাহা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য—কেবল এইমাত্র বুদ্ধিতে, কোন প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষায় নহে,—ফলাসক্তি পরিত্যাগ করত, সমাহিত চিত্তে শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে সম্পাদিত যজ্ঞ, গীতার মতে, সাত্ত্বিক।[৪] ঐ সাত্ত্বিক যজ্ঞ দ্বারা জগতের কল্যাণ হয়। উহা জগৎচক্রের সুপরিচালনের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ঐ অঙ্গের অভাবে বা ন্যূনতায় সমস্ত চক্র বিকল হয়। সেই কারণে, গীতা বলেন, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি করা অত্যাবশ্যক।[৫] পক্ষান্তরে, জগতের ধারণার্থ ভগবান্ কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রকে সুষ্ঠুরূপে চালাইয়া রাখিতে যে সহায়তা করে না,—যজ্ঞ সম্পাদন করে না, তাহাকে 'গীতা'য় এই বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যই সে জীবন ধারণ করে, সুতরাং তাহার জীবন পাপময়, অতএব ব্যর্থ।[৬] এইরূপে সমষ্টি দৃষ্টিতে সমষ্টির কল্যাণার্থ বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পাদনের অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদন করত 'গীতা' উপসংহারে ব্যষ্টিদৃষ্টিতে ব্যষ্টির কল্যাণার্থ ও উহার প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়াছেন। কোন কোন মনীষিগণের মত এই যে কর্ম দোষযুক্ত, সেইহেতু উহা সর্বথা ত্যাজ্য। অপর কোন কোন মনীষিগণ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে।[৭] ঐ দ্বিবিধ মতের উল্লেখ করত, গীতা ঐ বিষয়ে আপন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। "যজ্ঞ, দান ও তপ রূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নহে। তাহা (ঐ কর্ম) করাই উচিৎ। কেননা যজ্ঞ, দান ও তপ মনীষীদিগের (অর্থাৎ কুশল বুদ্ধিতে সম্পাদনকারী মনুষ্যদিগের) পাবন (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকারক)।"[৮] ঐ কুশল বুদ্ধি কি তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে।

"এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যাণীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥"[৯]

---

১) গীতা, ১৬।১৭ দেখ
২) গীতা, ১৬।১৯—২০
৩) গীতা, ৯।১২
৪) গীতা, ১৭।১১
৫) গীতা, ৩।৮—
৬) গীতা, ৩।১৬
৭) গীতা, ১৮।৩
৮) গীতা, ১৮।৫
৯) গীতা, ১৮।৬

'পরন্তু এই সমস্ত (যজ্ঞদানাদি) কর্মসমূহ (উহাদের কোন একটার প্রতি) আসক্তি পরিত্যাগ করত (যথাবিহিত সমস্তই) এবং (উহাদের) ফলসমূহে আসক্তি পরিত্যাগ করত ঈশ্বর বিহিত বলিয়া অবশ্য কর্তব্য। কেবল এই বুদ্ধিতে যথা শাস্ত্র কর্তব্য। হে পার্থ! ইহাই আমার নিশ্চিত মত (এবং ইহা) উত্তম।' চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং ঐ কৌশলে কৃত বৈদিক যাগযজ্ঞাদি বন্ধনকারক না হইয়া মুক্তিপ্রদ হয়। //

(৬) 'গীতা'য় আছে, "যাহারা যজ্ঞশেষ (অর্থাৎ যজ্ঞ করিবার পর যাহা শেষ থাকে, সেই অন্ন) ভোজন করে, সেই সাধুগণ সর্ব পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা কেবল নিজেরই জন্য (অন্ন) পাক করে (যজ্ঞের জন্য নহে), সেই সকল পাপিগণ পাপ ভোগ করে।"[১] "যাহারা যজ্ঞশেষ (রূপ) অমৃত ভোজন করে, তাহারা সনাতন ব্রহ্মে গমন করে।"[২] ঐখানে 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে প্রত্যেক বৈদিক গৃহস্থকে প্রতিদিন পাঁচ মহাযজ্ঞ অবশ্যই করিতে হইবে,—ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হবন দেবযজ্ঞ, বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা নরযজ্ঞ।[৩] প্রতিদিন যে অন্ন পাক করা হয় তাহা হইতে প্রথমে দেবগণকে বলি দিতে হইবে। অনন্তর দিবাচর ও রাত্রিচর ভূতগণকে, তথা সর্বভূতকে বলি দিতে হইবে। অতঃপর পিতৃগণকে বলি দিতে হইবে। তাহার পর কুকুর, পতিত ব্যক্তি, চণ্ডাল, পাপরোগী, কাক, কীট প্রভৃতিকে অন্ন প্রদান কর্তব্য। এই প্রকারে "সর্বভূতকে" বলি প্রদান করত, পরে অতিথিকে ভোজন করাইবে এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এই সকলের পর ঐ অন্নের যাহা শেষ থাকে, তাহা গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবে।[৪] "দেবতাগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, এবং গৃহদেবতাগণকে পূজা করিবার পর (অর্থ পঞ্চযজ্ঞের পর) শেষ অন্ন গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবেক। যে কেবল নিজেরই জন্য (অন্ন) পাক করে সে কেবল পাপ ভোজন করে। যজ্ঞশিষ্টাশন সাধুব্যক্তিগণের অন্ন বলিয়া বিহিত হইয়াছে।"[৫] 'গীতা'র ন্যায় উহাতেও যজ্ঞশেষকে 'অমৃত' বলা হইয়াছে। এবং আরও বলা হইয়াছে যে দ্বিজগণ নিত্য অমৃতভোজী হইবেক।[৬]

"এবং যঃ সর্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্তিঃ পথর্জুনা ॥"[৭]

---

[১] গীতা, ৩।১৩

[২] গীতা, ৪।৩১'১

[৩] মনুস্মৃতি, ৩।৬৯—৭০ ; আরও দেখ—৪।২১

[৪] ঐ, ৩।৪৮—

ঐ পঞ্চযজ্ঞের উল্লেখ 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য' ১১।৫।৬।১—) ও আছে,—

"পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ" ইত্যাদি। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে ও (২।১০।১—৬) তাহার সেই প্রকার বিবৃতি আছে।

[৫] মনুস্মৃতি, ৩।১১৭—৮ আরও দেখ—৩।৭২

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও আছে যে "দেবতা, পিতৃ, অতিথি ও ভৃত্যকে অন্ন প্রদান এবং শেষভোজন ত্রয়ীধর্ম মতে গৃহস্থের স্বধর্ম। (১।৩ ; ৭ পৃষ্ঠা)

[৬] মনুস্মৃতি, ৩।২৮৫ ; মহাভা, ৩।২।৬১

[৭] মনুস্মৃতি, ৩।৯৩

'যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এই প্রকারে সর্ব প্রাণিগণকে (অন্ন দ্বারা) অর্চনা করে, সে তেজঃস্বরূপ তেজোময় রূপ ধারণ করত (বা হইয়া) সরলপথে পরম স্থানে গমন করে।' 'ঋগ্বেদে' দেখা যায়, যে দেবাদি অপর কাহাকেও দান না করিয়া অন্ন ভোজন করে ঋষি ভিক্ষু তাহাকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন,—"অপ্রচেতা (অর্থাৎ অপরকে দান করিতে যাহার চিত্ত চাহে না) সে বৃথাই অন্ন লাভ করে। আমি সত্যই বলিতেছি। উহা নিশ্চয় তাহার মৃত্যু (স্বরূপ)। যে অর্যমা (প্রভৃতি দেবগণকে) পোষণ করে না, (অতিথি, অভ্যাগত, প্রভৃতি) মিত্রবর্গকেও (পোষণ করে) না, সে 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' (যে কেবল নিজেই অন্ন ভক্ষণ করে, সে কেবল পাপবান্ হয়, অর্থাৎ তাহার পাপমাত্রই সার হয়)।"[১]

সমদৃষ্টি—এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎপ্রপঞ্চ বাসুদেবই—যাঁহারা ইহা তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই জ্ঞানী মহাত্মাগণের দৃষ্টিতে সর্বভূত অবশ্যই সমান। তাই 'গীতা'য় বলা হইয়াছে,

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥"[২]

'যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তিনি আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখেন।' তিনি আপনাকে বাসুদেব বলিয়া উপলব্ধি করেন ; এবং সর্বভূত বাসুদেবই ; সেই-হেতু তিনি আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখেন। কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন, "পণ্ডিতগণ (অর্থাৎ জ্ঞানিগণ[৩]) বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর এবং চণ্ডালে (অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উচ্চ ও নীচ বলিয়া পরিগণিত সর্বপ্রাণীতে) সমদর্শী। যাঁহাদিগের মন (এই প্রকার) সাম্যে স্থিত, তাঁহারা এইখানেই অর্থাৎ ইহসংসারেই বা ইহজীবনেই) স্বর্গকে (অর্থাৎ জন্মমৃত্যুপ্রবাহকে) জয় করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, সেইহেতু তাহারা ব্রহ্মে স্থিত।"[৪] "যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন" (অর্থাৎ যোগীর দৃষ্টিতে মাটি, পাথর ও সোনা সমান)।[৫] "সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, (অর্থাৎ নিজের অপ্রিয়), বন্ধু, সাধু, এবং পাপীর বিষয়ে যে সমবুদ্ধি, সে উত্তম (অথবা বিমুক্ত হয়)।"[৬] পরমেশ্বর সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত।[৭] সুতরাং যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, সে সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবত পুরাণে'ও সমদৃষ্টির অত্যন্ত প্রশংসা দেখা যায়। মহাভাগবত প্রহ্লাদের মতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টি করাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে তিনি বলেন,

"সমং মনো ধৎস্ব……তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্ ॥"[৮]

---

[১] ঋক্‌সং, ১০।১১৭।৬ 'বোধায়নধর্মসূত্রে' আছে। "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী। মোঘমন্নং বিন্দতে ইতি।" (২।১৩।২)

[২] গীতা, ৬।২৯ ; আরও দেখ—৪।৩৫ ; ৬।৩০ , ১৩।২৭-৮

[৩] অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায় যে এইখানে 'পণ্ডিত' শব্দ 'পরমাত্মজ্ঞানী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যাহার 'পণ্ডা' বা 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি' আছে, সেই পণ্ডিত।

[৪] গীতা, ৫।১৮—৯ ; দেখ মহাভা, ১২।২৩৯।১৯—২২ [৫] ঐ, ৬।৮'২

[৬] ঐ, ৬।৯ অধুনা উপলব্ধ পাঠ 'বিশিষ্যতে'। আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, উহার 'বিমুচ্যতে' পাঠান্তরও আছে।

[৭] ঐ, ১৩।২৭ [৮] (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।৮।১০

'মনকে সমভাবে ধারণ কর (অর্থাৎ সমদর্শী কর),…কেননা, তাহাই (ভগবান্) অনন্তের শ্রেষ্ঠ আরাধনা।' ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন,

মষ্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥"[১]

'যে সমস্ত আমাকে অর্পণ করিয়াছে (সেইহেতু স্বয়ং অকর্তা বা কর্তৃত্বাভিমানরহিত) এবং যে আপন চিত্ত একমাত্র আমাতেই অর্পণ করিয়াছে (সেইহেতু সর্বত্র একমাত্র আমাকেই দেখে বলিয়া সমদর্শী), সেই অকর্তা এবং সমদর্শী পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী আমি দেখিতেছি না।' এইরূপে দেখা যায়, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই কপিলের মতে সমদর্শনের হেতু। কৃষ্ণও সেই প্রকার মনে করেন। তিনি উদ্ধবকে বলেন, "হে মহাদ্যুতি! যেমন আকাশ (সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র সমভাবে বর্তমান), যে নির্মলচিত্ত (ব্যক্তি) আত্মস্বরূপ আমাকেই তেমনভাবে সর্বভূতের তথা আপনার অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃতরূপে বর্তমান বলিয়া দেখেন এবং সর্বভূতকে মদ্রূপ মানিয়া সৎকার করেন, কেবল জ্ঞানাশ্রিত (সেই ব্যক্তি) ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, ব্রহ্মজ্ঞে ও চোরে, সূর্যে ও বিস্ফুলিঙ্গে, তথা দয়ালুতে ও নিষ্ঠুরে, সমদৃক্। (তিনিই) পণ্ডিত (বলিয়া) মান্য হয়।"[২] ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন, "আমিই জগতের পরম কারণ। আমিই, ব্রহ্মা, শিব, আত্মা (অর্থাৎ জীবাত্মা), ঈশ্বর এবং উপদ্রষ্টা। আমিই স্বপ্রকাশ এবং অবিশেষণ। হে দ্বিজ! আমি গুণময়ী আত্মমায়াতে সমাবিষ্ট হইয়া বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করত (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন) ক্রিয়োচিত সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছি। অজ্ঞ জনই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বা কেবল পরমাত্মাতে ব্রহ্মা, রুদ্র, (বিষ্ণু) এবং ভূতসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ('ভেদেন') দেখিয়া থাকে। যেমন শির, হাত, প্রভৃতি আপন অঙ্গসমূহে কখনও 'ইহা আমা হইতে ভিন্ন'—এই প্রকার বুদ্ধি করে না, সেই প্রকার মৎপর ব্যক্তি প্রাণিগণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করে না।"[৩]

সর্বত্র সমদর্শীর আপন-পর-ভেদ-বুদ্ধি থাকিতে পারে না। তাই, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্ম-বিবরণে, উত্তম ভাগবতের এক লক্ষণ এই বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে যে সর্বভূতে সমদৃষ্টি হেতু তাঁহার, ধনে কিম্বা শরীরে, 'ইহা আপন, ইহা পরের'—এই প্রকার ভেদভাব থাকে না।[৪] আপন-পর-ভেদভাব-রাহিত্যই ভাগবতধর্মের মুখ্য লক্ষণ,—সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। কেননা, ভগবান্ সঙ্কর্ষণের স্তুতিতে রাজা চিত্রকেতু বলেন, তিনি যে "অনবদ্য ভাগবতধর্ম" উপদেশ করিয়াছেন,—"নিকিঞ্চন এবং আত্মারাম মুনিগণও অপবর্গার্থ যাহাকে আশ্রয় করে,"

"বিষমমতির্ন যত্র নৄণাং
ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র।"[৫]

'অর্থাৎ উহাতে মনুষ্যদিগের আমি, তুমি, তথা আমার, তোমার,—এই প্রকার বিষমমতি থাকেনা,

---

[১] (বিষ্ণু) ভাগপু, ৩।২৯।৩৩ [২] ঐ, ১১।২৯।১২—১৪

[৩] ঐ, ৪।৭।৫০—৩

[৪] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২।৫২ [৫] ঐ, ৬।১৬।৪১'১

যাহা অন্যত্র বা অপর ধর্মে[১] আছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন যে ঐ সমমতিই ভাগবতধর্মের অনবদ্যতার প্রথম হেতু।[২] চিত্রকেতু আরও বলেন, যাঁহারা চরাচর সমস্ত প্রাণীতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সকল আর্যগণই ভাগবতধর্ম আশ্রয় করেন।[৩] পক্ষান্তরে তিনি বিষমদৃষ্টির এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন যে "যাহা বিষমবুদ্ধিতে রচিত, তাহা নিশ্চয় অবিশুদ্ধ ও অধর্মবহুল, (সুতরাং) ক্ষয়িষ্ণু।"[৪] প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, সদসৎ সমস্তই যখন ভগবানই, তখন "মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা" ('এই যে আপন-পর-(ভেদ)বুদ্ধি, তাহা অসদ্বস্তু বা মিথ্যাবস্তু')।[৫]

সর্বত্র সমদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতে স্পর্ধা, অসূয়া, তিরস্কার, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষসমূহ অচিরে দূরে পলায়ন করে।[৬] তিনি নিজেকে কিম্বা পরকে দ্রোহ করেন না।[৭] পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,

"সিধ্যন্তি চাস্য সর্বার্থা বিজ্ঞানং চ প্রবর্ততে।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু লব্ধালব্ধেন বর্তয়ন্॥"[৮]

'লব্ধ ও অলব্ধ—উভয় বিষয়ে যে সর্বভূতে সমান আচরণ করে তাহার সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানও উদয় হয়।' মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—"সমাহিতচিত্তে সৎ ও অসৎ সমস্ত বস্তুকে আত্মাতে সম্যক্ দর্শন করিবে। কেননা, সর্বকে আত্মাতে সম্যক্ দর্শন করিলে, মন অধর্মের প্রতি যায় না।"[৯] "যে এই প্রকারে নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা ('আত্মনা') সর্বভূতে আত্মাকে দেখে, সে সর্বসমতা লাভ করত পরমপদ ব্রহ্মের অভিমুখে গমন করে।"[১০]

আত্মৌপম্য দৃষ্টি—অপর এক বিচারেও সমদর্শী হওয়ার কথা আছে। সুখ কিম্বা দুঃখ আপনার ন্যায় অপর সর্বপ্রাণীরই অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, এবং যাহা আপনার অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, তাহা অপরেরও অনুকূল বা প্রতিকূল হয়—এই ভাবনা করত মানুষের সর্বভূতে

---

[১] টীকাকার শ্রীধরস্বামী মনে করেন যে 'অন্যত্র' শব্দে 'বেদোক্তধর্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অপর এক স্থলে শুকদেব বলিয়াছেন, "ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যং চ গুণাশ্রয়ম্" (৬।২।২৪'২) অর্থাৎ বেদোক্তধর্ম গুণাশ্রিত, আর ভাগবতধর্ম নিগুর্ণ তাহা শুদ্ধ।

[২] অনবদ্যতার দ্বিতীয় হেতু, তাঁহার মতে, নিজের ও পরের উভয়ের প্রতি অদ্রোহ। পরবর্তী (৬।১৬।৪২) শ্লোকে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

[৩] (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।১৬।৪৩

মূলে আছে "যদ্দ্বারা ভাগবতধর্ম অভিহিত তোমার (সেই) দৃষ্টি ব্যভিচরিত হয় না।" শ্রীধর স্বামী বলেন, উহার তাৎপর্য এই—বেদধর্মে যেমন পারমার্থিক তত্ত্বের কথা আছে, তেমন ব্যবহারিক তত্ত্বের ও কথা আছে। কামাসক্ত ব্যক্তিগণকে সোপানক্রমে পরমার্থতত্ত্বে উপনীত করিবার উপায়কৌশল্যরূপে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কাম্যধর্মেরও বিধান তথায় আছে। পরন্তু ভাগবতধর্মে একমাত্র পরমার্থ দৃষ্টিই আশ্রিত হইয়াছে ; কোন হেতুতে,—এমন কি উপায় কৌশল্য রূপেও, ঐ দৃষ্টি পরিত্যক্ত হয় না। (দেখ, ১।৫।১৪—)।

[৪] ঐ, ৬।১৬।৪১'২ [৫] ঐ, ৭।৯।৩১'১ ; পূর্বে দেখ

[৬] ঐ, ১১।২৯।১৫ [৭] ঐ, ৬।১৬।৩২

"স্বদ্রোহাত্তব কোপঃ পরসংপীড়য়া চ তথাধর্মঃ (অর্থাৎ নিজের প্রতি দ্রোহ করিলে ভগবান্ কুপিত হন, অপরের প্রতি দ্রোহ করিলে অধর্ম হয়)। স্বদ্রোহে যে ভগবান্ কুপিত হন, গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। (দেখ—'গীতা', ১৬।১৮—২০ ; ১৭।৫—৬)

[৮] মহাভা, ১২।২৪০।১২ [৯] মনুস্মৃতি, ১২।১১৮

[১০] ঐ, ১২।১২৫

সমদর্শী হওয়া উচিৎ। এই আত্মৌপম্য দ্বারা সমদৃষ্টিকে ভাগবতধর্মে খুব প্রশংসা করা হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে অর্জুন! সুখ কিম্বা দুঃখ, যাহাই হউক্ না কেন, যে আত্মৌপম্য দ্বারা সর্বভূতে সম দেখে, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ (বলিয়া অভি)মত।"[১] এই প্রকারে সমদৃষ্টিতে ব্যবহারের রূপ এই যে—মানুষ আপনার প্রতি যেমন আচরণ করিয়া থাকে, অপর সকলেরও প্রতি ঠিক সেই প্রকার আচরণ করিবেক; যেমন আপনার অনুকূল আচরণই মনুষ্য করিয়া থাকে, প্রতিকূল আচরণ করে না, তেমন অপরেরও প্রতি তাহার অনুকূল আচরণ করাই মানুষের উচিৎ, প্রতিকূল আচরণ করা উচিৎ নহে। 'গীতা'য় ইহা পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া বলা হয় নাই বটে। তথাপি উহার উক্ত বচনের তাৎপর্য ইহাই। 'মহাভারতে'র অন্যত্র ঐ আত্মৌপম্য দৃষ্টিতে ব্যবহারের কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা, দেবগুরু বৃহস্পতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "যে পুরুষ সর্বভুতে আত্মোপম হয় (অর্থাৎ আপনার প্রতি যেমন, সর্বভুতেরও প্রতি তেমন আচরণ করিয়া থাকে; সুতরাং) জিতক্রোধ ও ন্যস্তদণ্ড হয় (অর্থাৎ যেমন আপনার প্রতি ক্রোধ করে না, তেমন অপরেরও প্রতি ক্রোধ করে না; এবং সেইহেতু, যেমন আপনাকে দণ্ড দেয় না, তেমন অপরকেও দণ্ড দেয় না), সে পরলোকে সুখপ্রাপ্ত হয়।"[২] অনন্তর তিনি বিশেষ করিয়া বলেন,

"ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে॥"[৩]

'যাহা নিজের প্রতিকূল (বলিয়া মনে হয়, সেইহেতু নিজের প্রতি যে ব্যবহার মনুষ্য করে না), অপরের সহিত তাহা করিবে না। ইহাই সংক্ষেপত ধর্ম (অর্থাৎ ইহাই সমস্ত ধর্মের বা আচরণ-নীতির সার)। অন্য প্রকার ব্যবহার কামবশতই প্রবর্তিত হয়।' বিদুরও ধর্ম সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে বলেন

"তস্মাদ্ধর্মপ্রধানেন ভবিতব্যং যতাত্মনা।
তথা চ সর্বভুতেষু বর্তিতব্যং যথাত্মনি॥"[৪]

'সেইহেতু ধর্মকে মুখ্যতম বলিয়া মানিয়া (সুতরাং) ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া জীবন যাপন করা উচিৎ। নিজের প্রতি যেমন, সমস্ত প্রাণিগণেরও প্রতি তেমন ব্যবহার করা উচিৎ।'

অত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে ব্যবহারের আর একটা রূপ আছে। যেমন যুধিষ্ঠিরের প্রতি পূর্বোক্ত ধর্মোপদেশের উপসংহারে বৃহস্পতি বলেন, "আদান বা প্রত্যাখ্যান, সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়—এই সকল বিষয়ে পুরুষ আত্মৌপম্য দ্বারা প্রমাণ অধিগত হয়। (অর্থাৎ অপরের প্রতি নিজের কোন ব্যবহার তাহার গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, সুখকর কি দুঃখকর, প্রিয় কি অপ্রিয় হইবে

---

১) "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"
—(গীতা, ৬।৩২)

২) মহাভা, ১৩।১১৩।৬; আরও দেখ—৩।৮২।১২

৩) মহাভা, ১৩।১১৩।৮ 'এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ' স্থলে 'সংগ্রহেণৈষ ধর্মঃ স্যাৎ' তৃতীয় চরণের এই পাঠান্তরে ঐ বচন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন। (৫।৩৯।৭২·২—৭৩·১) তাহাতে বুঝা যায় যে ঐ ধর্মনীতি অতি প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রচলিত।

৪) মহাভা, ১২।১৬৭।৯

তাহা নিরূপক প্রমাণ একমাত্র এই যে নিজের প্রতি কৃত অপরের সেই ব্যবহার নিজের গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, সুখকর কি দুঃখকর, প্রিয় বা অপ্রিয় বোধ হইবে তাহা বিবেচনা)। একে অপরের প্রতি যেমন আচরণ করে, অপরেও তাহার প্রতি সেই প্রকার আচরণ করিয়া থাকে। ইহা স্মরণ রাখিয়া যথোচিৎ আচরণ করাকেই মনুষ্যগণের ধর্ম বলিয়া (ধর্মে) নিপুণ ব্যক্তিগণ উপদেশ করিয়াছেন।"[১] ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া মহামতি ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরকে সেই প্রকার বলিয়াছেন,[২]—আমার অপ্রিয় বলিয়া যেই ব্যবহার অন্যকে আমার প্রতি করিতে আমি ইচ্ছা করি না, অন্যের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করা আমারও উচিৎ নহে। সুতরাং যে স্বয়ং বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, সেইহেতু যে চাহে না যে অন্যে তাহাকে মারুক, তাহারও উচিৎ নহে যে অন্যকে মারা।

"যদ্‌যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥"[৩]

'নিজের জন্য যাহা যাহা ইচ্ছা কর, অপরেরও জন্য তাহা তাহা ইচ্ছা করিও।'

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিৎ যে পূর্বোক্ত সমদৃষ্টিতে এবং এই আত্মৌপম্যে সমদৃষ্টিতে ব্যবহারের বেশী পার্থক্য না থাকিলেও উহাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমোক্ত সাম্যদৃষ্টি একজীববাদমূলক। পরব্রহ্মই উপাধি অঙ্গীকার করিয়া জীব সাজিয়াছেন; অথবা, আরও প্রকৃত বলিলে ব্রহ্মই উপাধি সম্পর্কে জীবরূপে প্রতীতিগোচর হইতেছেন। সুতরাং জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্মই। পরব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং জীবও স্বরূপতঃ এক এবং অদ্বিতীয়। উপাধির বহুত্ব এবং পরস্পর ভিন্নত্ব হেতু একই ব্রহ্ম (বা প্রকৃত জীব) পরস্পর ভিন্ন বহু জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। উপাধি আগন্তুক এবং মিথ্যা। সুতরাং জীবভেদও আগন্তুক এবং মিথ্যা। ঐ মিথ্যা ভেদদৃষ্টির নিরসনার্থ প্রকৃততত্ত্বোপলব্ধিকামী সাধকের উচিত সতত সমদৃষ্টিতে ব্যবহার করা। তাহাতে সে ক্রমে ব্রহ্ম হয়। পরমর্ষি ব্যাস শুককে বলেন, "সমস্ত শরীরে অশরীর এবং নিরিন্দ্রিয় তিনিই,—যিনি শব্দ নহেন, স্পর্শ নহেন, রূপ নহেন, রস নহেন ও গন্ধ নহেন; এবং যিনি অব্যয়—আছেন বলিয়া নিরীক্ষণ করিবে। মরণশীল সর্বদেহে এক পরম অব্যক্তই নিবাস করিতেছে। যে ইহা অনুদর্শন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মভবনে সমর্থ হয়। পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও অভিজন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হাতী, কুকুর এবং চণ্ডালে (অর্থাৎ জাগতিক ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উচ্চ ও নীচ বলিয়া পরিগণিত সর্বপ্রাণীতে) সমদর্শী। স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতে একই মহান্ আত্মা নিবাস করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা ইহা (—এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত। ভূতাত্মা (অর্থাৎ জীবভূত আত্মা) যখন আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখে, তখন ব্রহ্ম হয় ('ব্রহ্ম সম্পদ্যতে') //

'যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি।
য এবং সততং বেদ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥'[৪]

যে ইহা সততই উপলব্ধি করে যে—আমার শরীরে আত্মা যতটা আছে, অপরের শরীরেও আত্মা

---

[১] মহাভা, ১৩।১১৩।৯—১০

[২] মহাভা, ১২।২৫৯।২০, ২১

[৩] মহাভা, ১২।২৫৯।২১'১

[৪] মহাভা, ১২।২৩৯।১৭—২৩

ঠিক ততটাই আছে, সে অমৃতত্ব (বা মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ হয়। সর্বভূতাত্মভূত, সর্বভূতহিতে রত এবং বিভু অপদের পদাভিলাষী ব্যক্তির মার্গে দেবতাগণও মোহপ্রাপ্ত হয়।"

"দ্বন্দ্বৈর্ন যত্র বাধ্যন্তে মানসেন চ কর্মণা।
সমাঃ সর্বত্র মৈত্রাশ্চ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥"[১]

অর্থাৎ ঐ দৃষ্টিতে সাধকগণের ভাবনায় এবং কর্মেতে কোন প্রকারের ভেদভাব থাকে না। তাহারা সর্বদা সর্ব প্রাণীতে সমভাবাপন্ন এবং মিত্রভাবযুক্ত হয়। তাহারা সর্বভূতহিতে নিরত থাকে।

যাহারা ঐ একজীববাদ মানে না, যাহারা আত্মা বস্তুতঃ বহু বলিয়া মানে, তাহাদিগকেও অন্য দৃষ্টিতে সমদর্শী হইতে হইবে। কাপিল সাংখ্যসিদ্ধান্ত মতে এবং পাতঞ্জল যোগসিদ্ধান্ত মতে আত্মা বা পুরুষ প্রকৃত পক্ষে বহু। পরন্তু সকল জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়; সুতরাং সম্যগ্‌রূপে সমান। যে মতে জীবকে ব্রহ্মের বাস্তবিক অংশ মানা হয়, সেই মতেও জীব প্রকৃত পক্ষে বহুই।—এই অংশবাদের উল্লেখ 'গীতা'য়ও আছে।[২] তবে তথায় ইহা স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই যে ঐ অংশ বাস্তবিক, না ঔপাধিক। তবে তথায় ইহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে বলা হইয়াছে, যে "নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" ('ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম অর্থাৎ সর্বত্র একরস')।[৩] সুতরাং উহার অংশসমূহ, বাস্তবিক কিংবা ঔপাধিক যাহাই হউক না কেন, স্বরূপতঃ সমানই। এইরূপে যে সকল মতে জীব বস্তুতঃ বহু, অথচ সকলে স্বরূপতঃ সম্যগ্‌রূপে সমান, সেই সকল বহুজীববাদ মতেও যেমন, একজীববাদমতেও তেমন, জীবে জীবে প্রতীয়মান উচ্চনীচাদি ভেদসমূহ আগন্তুক, অতএব মিথ্যা। সেই সকল বাদী তত্ত্বজ্ঞানীও সমদর্শী হয়। তাই তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু সাধককে সমদৃষ্টিতে ব্যবহার করিতে হইবে। পরমর্ষি ব্যাসের ভাষায় বলিলে, ঐ সাধককেও ইহা অনুভব করিতে হইবে যে তাহার শরীরে যতটা আত্মা আছে, অপরের শরারেও ততটা আত্মা আছে; অর্থাৎ অপর সমস্ত জীব তাহার সমান। ইহাই আত্মৌপম্যে সমদৃষ্টি।

কোন কোন বহুজীববাদে জীবগণ স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন কোটির, সমান নহে। ঐ সকল মতানুযায়িগণ অবশ্যই সর্বজীবে সমদর্শী হইতে পারে না। তবে এক এক কোটিস্থ জীবগণের মধ্যে তাহারা সমদৃষ্টি করিতে পারে। বৌদ্ধমতে সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই অনিত্য। তাই কোন নিত্য সত্তার সদ্ভাব বৌদ্ধগণ মানেন না। সুতরাং আত্মা নামে কোন নিত্য পদার্থের সদ্ভাব তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনাত্মবাদী বলিয়া খ্যাত। তথ:পি সমদর্শিতার মহিমা বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে। 'সুত্তনিপাতে' আত্মৌপম্য-দৃষ্টির কথা আছে। বুদ্ধ বলেন,

"যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহম্।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্যা, ন ঘাতয়ে॥"[৪]

---

[১] মহাভা, ১২।২৪১।১৪ [২] গীতা, ১৫।৭ [৩] গীতা, ৫।১৯'২

[৪] 'সুত্তনিপাত', নালকসুত্ত (২৭) এই বচনের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি 'ধম্মপদে' যথাযথ পাওয়া যায়। "সকলেই দণ্ড হইতে ত্রাস পায়। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। আপনাকে উপমা করিয়া হত্যা করিবে না, কিংবা হত্যা করাইবে না। সকলেই দণ্ড হইতে ত্রাস পায়। জীবন সকলেরই প্রিয়। আপনাকে উপমা করিয়া হত্যা করিবে না কিংবা করাইবে না।" (ধম্মপদ, ১২৯, ১৩০)

'যেমন আমি তেমন ইহারা (অর্থাৎ অপর প্রাণিসমূহ), যেমন ইহারা তেমন আমি। (এই প্রকারে) আপনাকে উপমা (অর্থাৎ আপনার সদৃশ মনে) করিয়া (কোন প্রাণীকে) হত্যা করিবে না, কিম্বা হত্যা করাইবে না।' 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে' আছে যে ভগবান্ বুদ্ধ ভগবান্ বেদব্যাসের ন্যায় বলিয়াছেন

"সর্বধর্মসমতাববোধাদ্ধি কাশ্যপ নির্বাণম্"[১]

হে কাশ্যপ! সর্বধর্মসমতাববোধ হইতেই নির্বাণ (লাভ হয়)।

"সর্বধর্মাঃ সমাঃ সর্বে সমাঃ সমসমাঃ সদা।
এবং জ্ঞাত্বা বিজানাতি নির্বাণমমৃতং শিবম্॥"[২]

'সর্ববস্তু সমান; সকলে সমান; সর্বদা সমসম (অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে সমান)। এই প্রকার জানিয়া (মনুষ্য) অমৃত এবং শিব নির্বাণ বিজ্ঞাত হয়।'

ভক্তিযোগ—প্রাচীন ভাগবতধর্মে ভক্তিকে অতি প্রাধান্য দেওয়া হইত,—ভগবদ্‌লাভের প্রায় শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া মানা হইত। 'মহাভারতে'র 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মপ্রকরণে' একায়নধর্মের যে বিবরণ আছে তাহাতে ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই বটে।[৩] পরন্তু অপর সর্বত্র উহার মহত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন, "বেদসমূহ এবং আশ্রমসমূহ (অর্থাৎ বেদানুযায়ী সমস্ত আশ্রমের লোকগণ) নানা মতে সমাস্থিত হইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহার (ক্ষেত্রজ্ঞ পরমপুরুষের) সম্যক্ পূজা করে। এবং (তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া) তিনি শীঘ্র তাহাদিগকে (সদ্)গতি প্রদান করেন।"[৪] নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মাগণ ভক্তিরই দ্বারা জগৎকারণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন[৫]; রাজা উপরিচর বসু ব্রাহ্মণদিগের শাপে পৃথিবীর তলদেশে নিপতিত হইলেও একমাত্র হরিতে ভক্তি হেতু তৎকর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন।[৬] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্ম-বিবরণে আছে যে মায়াবশত জীবের অস্মৃতি (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞান) এবং বিপর্যয় (অর্থাৎ ব্রহ্মকে জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিপরীত জ্ঞান) হয়; (অনন্তর ব্রহ্ম ভিন্ন) দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হেতু ভয় উৎপন্ন হয়; "অতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যেকয়েশং" ('সেইহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিৎ একান্ত-ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরের ভজন করা')।[৭] "যেমন (অন্ন) ভোজনকারীর তুষ্টি, পুষ্টি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি—তিনই একই সাথ প্রতিগ্রাসে হইয়া থাকে, তেমন (ভগবদ্) ভজনশীলের ভক্তি, পরেশানুভব এবং অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনই এককালেই হয়। হে রাজন্! অনুবৃত্তিতে (অর্থাৎ বুদ্ধির প্রত্যেক বৃত্তির দ্বারা নিরন্তর) অচ্যুতের চরণের ভজনকারী ভাগবতের এই প্রকারে ভক্তি, ভগবৎপ্রবোধ এবং বৈরাগ্য নিশ্চয়

---

[১] 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', অধ্যাপক ওগিহারা এবং টি সুচিদা কর্তৃক সম্পাদিত, টোকিয়ো, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৩ পৃষ্ঠা

[২] ঐ, ৫।৮৩ (১৩০ পৃষ্ঠা)

[৩] উহাতে নানা প্রকার উপাসনার সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। (মহাভা, ১২।২১৭।১৪—) টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে "যুক্তং ধারণয়া সম্যক্ সতঃ কেচিদুপাসতে" (১২।২১৭।২৬·১)—উহার এই বচনে সাকার উপাসনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

[৪] মহাভা, ১২।৩৩৪।৪৩

[৫] মহাভা, ১২।৩৩৫।১২

[৬] মহাভা, ১২।৩৩৬।৬৩-৫; ৩৩৭।২৯-৪০

[৭] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২।৩৭; র্বে দেখ।

হয়। তাহাতে সে সাক্ষাৎ পরা শান্তি প্রাপ্ত হয়।"[১] মহাত্মা প্রবুদ্ধ বলেন যে ভাগবতধর্মসমূহ অভ্যাস করিলে ভক্তি উৎপন্ন হয়; তাহাতে মনুষ্য নারায়ণপরায়ণ হয় এবং তাহাতে দুস্তর মায়া সহজে এবং শীঘ্র অতিক্রম করে।[২]

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মে নিষ্কামকর্মকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইত। 'গীতা'য় আছে, ভক্তিযুক্ত নিষ্কামকর্মীই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলেন,

"যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"[৩]

'সকল (নিষ্কামকর্ম) যোগিগণের মধ্যেও সেই আমার মতে যুক্ততম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম যোগী) যে আমাতে অন্তঃকরণ রাখিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ভজন করে।'[৪] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' আরও বাড়াইয়া বলিয়াছে, ভগবদ্ভক্তিবিরহিত নিষ্কামকর্ম শোভা পায় না, তাহা ব্যর্থ।[৫] তথায় ইহাও বলা হইয়াছে যে দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, এবং ইন্দ্রিয়সংযম, তথা অপর যে যে নানাবিধ শ্রেয়োজনক কর্ম আছে,—তৎসমস্তেরই একমাত্র সাধ্য ভগবানে ভক্তি।[৬]

ভক্তির মহিমা খ্যাপনার্থ কৃষ্ণ বলেন, "আমি সর্বজীবের প্রতি সম(ভাবাপন্ন)। কেহ আমার (অধিক) প্রিয় নহে, কেহ আমার দ্বেষ্যও নহে। তথাপি যাহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজন করে, তাহারা আমাতে, আর আমিও তাহাদিগেতে (বর্তমান)। যদি কেহ অতি দুরাচারীও হয়, তথাপি সে যদি অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করা উচিৎ।[৭] কেননা, সে যথার্থ নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিযুক্ত হইয়াছে। সে সত্বরই ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি দৃঢ় নিশ্চয় কর যে আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কেননা, হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, বা শূদ্র, অথবা (অন্ত্যজাদি) কোন পাপযোনিই বা হউক না কেন, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পরা গতি প্রাপ্ত হয়॥ সুতরাং পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ভক্তগণের আর কথা কি?"[৮] অতঃপর কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবানের ভক্ত হইতে উপদেশ করেন।

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"[৯]

---

[১] ঐ, ১১।২।৪২—৩ [২] ঐ, ১১।৩।৩৩; পূর্বের ২৩-৩২ শ্লোকে ঐ ভাগবতধর্মসমূহ বিবৃত হইয়াছে।

[৩] গীতা, ৬।৪৭

[৪] শঙ্করাদি কোন কোন ভাষ্যকারের মতে 'গীতা'র এই বচনে কৃষ্ণ রুদ্রাদিত্যাদি অপর দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ যোগী অপেক্ষা বাসুদেবভক্তিপরায়ণ যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন।

[৫] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৫।১২; ১২।১২।৫২; পরে দেখ। [৬] ঐ, ১০।৪৭।২৪

[৭] ইহার তাৎপর্য কেহ যেন এই মনে না করে যে ভগবানের ভক্ত যদি দুরাচারীও হয়, সে ভগবানের প্রিয় হয়। পরের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে ভগবদ্ভক্ত দুরাচারী হইতেই পারে না। কেননা, যে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সত্বর ধর্মাত্মা হয়; সুতরাং আর দুরাচারী থাকে না। যে পূর্বে দুরাচারী ছিল, পরে ভক্ত হইয়াছে, উহাকে পূর্ব কর্ম হেতু নিন্দা না করার কথাই এইখানে বলা হইয়াছে।

[৮] গীতা, ৯।২৯—৩৩'১ [৯] গীতা, ৯।৩৩'২—৩৪

'এই অনিত্য এবং অসুখ (অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ) লোককে প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া) আমাকে ভজন কর। আমাতে মন নিবিষ্ট কর। আমার ভক্ত হও। আমার পূজক হও। এবং আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে চিত্তকে আমাতে যুক্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া তুমি নিশ্চয় আমাতেই আগমন করিবে।' 'গীতা'র উপসংহারে কৃষ্ণ আর একবার অর্জুনকে সেই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন।[১]

ভগবানের ভক্তগণ কিপ্রকারে ভাবযুক্ত হইয়া তাঁহার ভক্তি করে, তাহা কৃষ্ণ এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, "(তাহারা) দৃঢ়ব্রত এবং (ইন্দ্রিয় সংযমাদি বিষয়ে) যত্নশীল হইয়া সতত আমার (লীলাদি) কীর্তন করে এবং আমাকে নমস্কার করে। (এইরূপে) ভক্তিদ্বারা নিত্যযুক্ত (হইয়া তাহারা) আমার উপাসনা করে ;[২] "(তাহারা) মচ্চিত্ত এবং মদ্‌গতপ্রাণ হইয়া নিত্য পরস্পরকে (আমার তত্ত্ব) বুঝাইয়া থাকে এবং আমার (লীলাদি) কীর্তন করিয়া থাকে তাহাতেই তাহারা প্রীতিলাভ করে এবং পরিতৃপ্ত থাকে।"[৩] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' ঐ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভাগবত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, ভক্তি সহকারে গুরুর সেবা, সমস্ত প্রাপ্ত বস্তু ভগবানে সমর্পণ, সাধু ও ভক্তজনের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণের ও কর্মের কীর্তন, তাঁহার চরণকমলের ধ্যান, তাঁহার লিঙ্গের দর্শনপূজনাদি, এবং সর্বভূতে ভগবান্ আছেন ভাবিয়া মনে মনে উহাদের প্রতি সম্মান ও বাহিরে অভিলষিত ভোগ্যপদার্থাদির দ্বারা উহাদের সেবা—এই সকলই নারায়ণ ঋষির প্রোক্ত ভগবানের ভক্তি ; যাহারা কামাদি ষড়রিপুকে জয় করিয়া ঐ প্রকারে ভগবানের ভক্তি করে, তাহারা ভগবান্ বাসুদেবে রতি সম্যক্ লাভ করে। প্রহ্লাদ আরও বলিয়াছেন যে সংসারের বীজ অজ্ঞান বিনাশক চিত্তনিরোধরূপ যোগের সহস্র উপায়সমূহের মধ্যে ইহাই,—ভগবান্ ঈশ্বরে রতিই নারায়ণ ঋষি-প্রোক্ত উপায়।[৪] দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুজ্ঞতা, দান, তপ, যজ্ঞ, শৌচ, এবং ব্রত প্রভৃতির কিছুই ভগবান্‌কে প্রীত করিতে সমর্থ নহে। নির্মল ভক্তি দ্বারাই তিনি প্রীত হন। তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত কিছু বিড়ম্বনা মাত্র।[৫] সর্বপ্রাণীকে আপনার সমান মানাই সর্বভূতাত্মা পরমেশ্বর ভগবান্ হরির ভক্তি।[৬] পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিই আত্মলাভের নির্দোষ উপায়।[৭]

ভগবান কপিল বলেন যে ভক্তের স্বভাব এবং গুণ অনুসারে ভক্তির, তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক এই তিন প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। ভেদদর্শীর ক্রোধ-বশতঃ অপরের প্রতি হিংসা, দম্ভ কিংবা মাৎসর্য হেতু ভগবানে ভক্তি 'তামস'। বিষয়সমূহ, যশ কিম্বা ঐশ্বর্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিমাদিতে ভেদভাবে ভগবানের ভক্তি 'রাজস'। কর্মনিহার, ঈশ্বরে কর্মার্পণ, কিংবা শাস্ত্রের আদেশ (অর্থাৎ স্বধর্ম) পালন উদ্দেশ্যে পৃথক্‌ভাবে ভক্তি 'সাত্ত্বিক'।[৮] এতত্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর এক প্রকার ভক্তি আছে। উহা 'নির্গুণ ভক্তি' নামে অভিহিত হয়। যেমন গঙ্গা

---

১) গীতা, ১৮।৬৫ ; পরে দেখ। ২) ঐ, ৯।১৪. ৩) ঐ; ১০।৯

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।৭।২৮-৩২ ; পূর্বে দেখ। ৫) ঐ, ৭।৭।৫১-২

৬) "ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥"—(ঐ, ৭।৭।৫৩)

৭) ঐ, ৭।৭।৪০-২ ৮) ঐ, ৩।২৯।৭-১০

স্বভাবতঃই অবিছিন্ন ভাবে নিরন্তর সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্র তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই যে তেমন অবিচ্ছিন্ন মনোগতি,—যাহা অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা—তাহাই নির্গুণ ভক্তি।[1] নিত্যশঃ স্বধর্মের পালন, শাস্ত্রোক্ত মহৎ এবং নাতিহিংস্র ক্রিয়াযোগের নিষ্কামভাবে নিষেবন, ভগবানের মূর্তির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি ও অভিবন্দন, সর্বপ্রাণীতে ভগবান্‌-ভাবনা, সত্য, অসঙ্গতা, মহদ্ব্যক্তিদিগকে বহুমান, দীনগণের প্রতি অনুকম্পা, আপনার সমান ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী, যম, নিয়ম, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনুশ্রবণ, ভগবানের নাম সঙ্কীর্তন; আর্জব; সাধুসঙ্গ এবং নিরহঙ্কার—এই সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্মী পুরুষের চিত্ত সম্যক্‌ পরিশুদ্ধ হয় এবং ভগবদ্‌গুণ শ্রবণমাত্র অনায়াসে এবং শীঘ্র তাঁহাতে নিবিষ্ট হয়;[2] সুতরাং ঐ সকলই কপিলের মতে নির্গুণ ভক্তিলাভের সুগম সাধন। তিনি আরও বলেন যে নির্গুণ ভক্তি দ্বারা মনুষ্য ত্রিগুণকে অতিক্রম করত ভগবদ্ভাব লাভ করে ("অতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে")।[3] গুণত্রয়কে অতিক্রম করিবার উপায় 'গীতা'তেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"[4]

'যে আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করে, সে ঐ সমস্ত গুণসমূহ অতিক্রম করত ব্রহ্মভবনে সমর্থ হয়।' উহার অন্যত্র আছে, "বিশুদ্ধ বুদ্ধি"[5] সম্পন্ন (ব্যক্তি) ধৈর্য সহকারে (কার্যকরণসংঘাতরূপ) আত্মাকে নিয়মন করত, শব্দাদি (ইন্দ্রিয়) বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করত, এবং রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করত, বিবিক্তসেবী, লঘ্বাশী, যতবাক্‌কায়মানস, নিত্যধ্যানযোগ-পরায়ণ এবং বৈরাগ্যসমুপাশ্রিত হইয়া, তথা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত নির্মম (অর্থাৎ অহন্তামমতাভিমানরহিত) এবং শান্ত হইয়া, ব্রহ্মভবনে সমর্থ হয় ('ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'।"[6] ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা পুরুষ কোন কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে না, কিংবা কোন বস্তুর হানি হইলে শোক করে না, "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌" (সর্বভূতে সম হইয়া আমার পরা ভক্তি লাভ করে)।[7]

"ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্‌ কর্মভির্ন স বধ্যতে॥"[8]

'সে আমাতে পরাভক্তি করিয়া কর্মসমূহ দ্বারা বদ্ধ হয় না।'

"যদনুধ্যানাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্‌।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো নু কুর্য্যাৎ কথারতিম্‌॥"[9]

---

[1] (বিষ্ণু) ভাগপু, ৩।২৯।১১-২

[2] (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।২৯।১৫-৯

[3] ঐ, ৩।২৯।১৪; (কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন। (১১।২৫।৩২—৬)

[4] গীতা, ১৪।২৬

[5] 'গীতা'তে পূর্বে বুদ্ধির তিন প্রকার ভেদ করা হইয়াছে,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। (১৮।৩০—২) যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধ ও মোক্ষ—এই সকলকে জানে সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। (১৮।৩০) ঐ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিকেই এইখানে 'বিশুদ্ধ বুদ্ধি' বলা হইয়াছে বোধ হয়।

[6] গীতা, ১৮।৫১-৩

[7] গীতা, ১৮।৫৪

[8] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৯।২৮·২

[9] ঐ, ১।২।১৫

'তাঁহার অনুধ্যান রূপ অসি দ্বারা বিবেকী জ্ঞানিগণ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধন ছিন্ন করেন।' সুতরাং তাঁহার কথায় কে রতি করিবে না?

একান্তভক্তি—ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন যে ঐকান্তিকশ্রেষ্ঠগণ ব্যতীত অপরে তাঁহার দর্শন পায় না। তিনি (নারদ) ঐকান্তিকোত্তম, সেই হেতু তিনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন।[১] পরে তিনি বলিয়াছেন "একান্তগতবুদ্ধি" বলিয়া নারদ তাঁহার যেই রূপ দর্শন করিয়াছেন, এমন কি ব্রহ্মাও সেই রূপের দর্শন পান না;[২] শ্বেতদ্বীপে আকাশস্থ অশরীরী দেবতা (অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ংই) একতাদি মহর্ষিগণকে ঠিক সেই কথা বলেন,—যে সকল ভক্ত একান্তিত্ব লাভ করিয়াছে তাহারাই ("একান্তিত্বমুপাগতৈঃ") ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হয়।[৩] তৎপূর্বে ক্ষীরোদসাগরের তীরে অশরীরী বাণী তাঁহাদের বলেন যে জিজ্ঞাসুভক্তও ভগবানের দর্শন পায় না।[৪] সুতরাং আর্ত ও অর্থার্থিভক্তগণের কথা আর কি? কথিত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপবাসী ভক্তগণ, যাঁহারা ভগবানের দর্শন পাইয়া থাকেন, "একান্তী" বা "একান্তভাবোপগত" তাঁহারা একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করেন।[৫] এই একান্তভাবের স্বরূপ কি? কৃষ্ণ বলেন, একান্তিভক্তগণ "অনন্যদেবতা";[৬] তাহারা "প্রতিবুদ্ধ"।[৭] নারদ বলিয়াছেন, শ্বেতদ্বীপবাসী সকল একান্তিগণ পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জিত, প্রতিবুদ্ধ এবং পুরুষোত্তমের ভক্ত; তাঁহারা সতত নারায়ণের অর্চনা করেন এবং তিনি তাঁহাদের সহিত রমণ করেন।[৮] পরন্তু এই সকল বর্ণনা হইতেও একান্তভাবের স্বরূপ যথার্থতঃ অবগতি হয় না 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্ত চতুর্বিধ আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী; তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; কেননা জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি।[৯] কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞানী চরমে উপলব্ধি করেন যে "বাসুদেবঃ সর্বম্" ('সমস্ত বাসুদেবই')।[১০] তাহাতে মনে হয়, সর্বত্র এক বাসুদেবকে দর্শনই, কৃষ্ণের মতে, একভক্তি গীতার জ্ঞানী ভক্তই নারায়ণীয়াখ্যানের একান্তী ভক্ত।[১১] সুতরাং জানা যায় যে সর্বত্র বাসুদেব দর্শনই একান্ত ভক্তির লক্ষণ। প্রহ্লাদ স্পষ্টতঃই তাহা বলিয়াছেন

"একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্"[১২]

'সর্বত্র তাঁহাকে দর্শনই গোবিন্দে একান্তভক্তি।' একতাদি মহর্ষিগণ বলেন যে ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারা যখন শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার অসংখ্য নিবাসিগণের মধ্যে—উহাঁরা সকলেই—"একান্তী" বা "একান্তভাবোপগত" ছিলেন,—"কেহই মন কিংবা দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে সম্মান করিলেন না। একভাবব্রতী এবং আত্মস্থ সেই মুনিগণ ব্রহ্মভাব অনুষ্ঠানে স্থিত বলিয়া আমাদের প্রতি ভাব দিলেন না।"[১৩] এই বর্ণনা হইতে সহজে অবগতি হয় যে যাহাদের

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।১৩
২) ঐ, ১২।৩৩৯।১০৭'২—১০৮'১
৩) ঐ, ১২।৩৩৬।৫৪—৫
৪) ঐ, ১২।৩৩৬।২৬—৭
৫) ঐ, ১২।৩৩৯।১৯—২০ ; ৩৩৬।২৮—৩০
৬) ঐ, ১২।৩৪১।৩৪'১ ; পূর্বে দেখ।
৭) ঐ, ১২।৩৪১।৩৫'২
৮) ঐ, ১২।৩৪৩।৫৩—৫৫'১
৯) গীতা, ৭।১৭'১
১০) ঐ, ৭।১৯
১১) মহাভা, ১২।৩৪১।৩৪ দেখ ; পূর্বে দেখ
১২) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৭।৫৫'২
১৩) মহাভা, ১২।৩৩৬।৫০—৫১'১

মনে এক ব্রহ্মভাব ব্যতীত অপর কোন ভাবের কিঞ্চিন্মাত্র ও ভান হয়না,—অর্থাৎ যাহাদের চিত্তবৃত্তি এক ব্রহ্মাকারা ব্যতীত অপর কোন বিষয়াকারা কখনও হয় না, তাহারাই ব্রহ্মে একভাবগত, একান্তভাবোপগত বা একান্তী।[১] এই একান্তভক্তিকেই গীতাতে "একভক্তি[২] অব্যভিচারীভক্তি;[৩] বা অনন্যা ভক্তি'[৪] বলা হইয়াছে। 'পরাভক্তি'[৫] উহার পরাকাষ্ঠা।

গীতায় কৃষ্ণ জ্ঞানী বা একান্ত ভক্তের অপর এক লক্ষণ দিয়াছেন যে তিনি 'নিত্যযুক্ত'। ইহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ সংজ্ঞার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়াছেন। যে "অনন্যচিত্ত হইয়া সতত এবং নিত্যশঃ" ভগবানের স্মরণ করেন সে তাঁহাতে নিত্যযুক্ত।[৬] তাহার চিত্তবৃত্তি একভগবদাকারা ব্যতীত অপর কোন বিষয়াকারা হয় না বলিয়া, তাহার ভক্তি 'অনন্যাভক্তি'। তাহার ভক্তি বা ভগবদাকারা চিত্তবৃত্তি কখনও ব্যভিচরিত বা ছিন্ন না বলিয়া, 'অব্যভিচারী ভক্তি' ভগবানের অনন্য এবং অব্যভিচারী ভক্ত অবশ্যই তাঁহাতে নিত্যযুক্ত।

শরণাগতি—প্রাচীন ভাগবতধর্মে আর এক প্রকার ভক্তির কথা আছে, যাহা শরণাগতি নামে অভিহিত হয়। শরণাগতভ ক্তকে দৃঢ় ভাবনা করিতে হয় যে ভগবান্ যন্ত্রী সে যন্ত্রমাত্র; ভগবান্ বাজীকর, সে তাঁহার হাতের কাঠপুতুল মাত্র; যন্ত্রী যেমন আপন যন্ত্রকে স্বেচ্ছানুসারে চালাইয়া থাকে, ভগবান্ তেমন তাহাকে স্বেচ্ছানুসারে চালাইতেছে; বাজীকর যেমন পর্দার আড়ালে থাকিয়া লোকচক্ষুর অদৃশ্য সূত্র দ্বারা কাঠপুতুলকে দর্শকের সমক্ষে নানাভাবে,—যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে, নাচাইয়া থাকে, ভগবান্ তেমন অদৃশ্য থাকিয়া তাহাকে সংসাররঙ্গমঞ্চে যথেচ্ছ খেলাইতেছে। "হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। তিনি মায়াদ্বারা সর্বপ্রাণীকে যন্ত্রারূঢ় (পুত্তলিকাদির) ন্যায় ঘুরাইতেছেন। হে ভারত, তুমি সর্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।[৭] কিঞ্চিৎপরে তিনি পুনরায় তাঁহার "সর্বগুহ্যতম পরম বাণী" বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"[৮]

আমাতে মন নিবিষ্ট কর। আমার ভক্ত হও। আমার পূজাপরায়ণ হও। আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। (সেই হেতু) তোমার নিকট আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে (এই প্রকারে) তুমি নিশ্চয় আমাতে আগমন করিবে। সমস্ত ধর্ম

---

১) অন্য বিষয়ে একান্তভাবগত হওয়ার কথাও 'মহাভারতে' আছে। যথা, দেখ—১২।২৩৭।৪

২) গীতা, ৭।১৭ ৩) গীতা, ১৩।১০; ১৪।২৬

৪) ঐ, ৮।২২; ১১।৫৪ ৫) ঐ, ১৮।৫৪—৫, ৬৮

৬) "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"—(ঐ, ৮।১৪)

- আরও দেখ—৯।১৪ ও ১০।৯ (পূর্বে দেখ)

৭) গীতা, ১৯।৬১—২ ৮) ঐ, ১৮।৬৮'১—৬

পরিত্যাগ করত তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।[১] আমি তোমাতে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। (অতএব) আর শোক করিও না।' গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম 'অর্জুনবিষাদযোগ'। তাহাতে বিবৃত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত মহাবীর অর্জুন অত্যন্ত শোকাতুর হন। তিনি এই ভাবিয়া তীব্র শোকগ্রস্ত হন যে ঐ যুদ্ধে তাঁহাকে ভীষ্ম-দ্রোণাদির ন্যায় পরম গুরুজনকে, তথা অপর গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে বধ করিতে হইবে; তাহাতে তাঁহার পাপ হইবে,[২]—গুরুজনাদির বধ-রূপ, কুলক্ষয়রূপ এবং মিত্রদ্রোহরূপ পাপ হইবে; কুলক্ষয় হেতু সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে জাতিধর্মও বিনষ্ট হইবে; ফলে তাঁহাকে নরকে যাইতে হইবে।[৩] ঐ তীব্র শোকে জর্জরিত হইয়া তিনি বলেন, "পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধিশালী রাজ্যও, এমনকি (স্বর্গে) দেবতাদিগের অধিপতিত্বও, যদি আমার মিলিয়া যায়, তথাপি আমি এমন কিছু দেখিনা, যাহা আমার ইন্দ্রিয়-শোষণকারী এই শোককে অপনীত করিতে পারে।[৪] তখন তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করত বসিয়া পড়েন। অর্জুনের ঐ শোককে বিদূরিত করত তাঁহাকে প্রতিবুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে কৃষ্ণ তাঁহাকে গীতাতত্ত্বের উপদেশ করেন। উহার উপসংহারে উক্ত পরম-বাণীতে যে শোকের উল্লেখ আছে,—"শোক করিও না" বলিয়া যাহা পরিত্যাগের উপদেশ কৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়াছেন।[৫] তাহা অর্জুনের সেই শোকই যাহা গীতার প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে। অধিকন্তু ঐ চরম বচনে কৃষ্ণ সেই সকল ধর্মকে এবং পাপকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহাদের উল্লেখ অর্জুন, গীতার প্রারম্ভে, তাঁহার ঐ শোকের কারণ রূপে করিয়াছিলেন এবং যাহাদের হেতু তিনি যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন।[৬] সুতরাং ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই—'জাতিধর্ম, কুলধর্ম প্রভৃতি ধর্মসমূহের চিন্তা তুমি পরিত্যাগ কর, তোমার মনকে একমাত্র আমাতে নিবিষ্ট কর। তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগত হও,—আমার উপর নির্ভর কর। আমি যেমন বলি তেমন কর। যুদ্ধ কর।[৭] যুদ্ধ করিলে গুরুজন, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি বধ হেতু, তথা ঐ সকল ধর্মের নাশ হেতু,

---

[১] শঙ্কর বলেন "'মামেকং' সর্বাত্মানং সমং সর্বভূতস্থমীশ্বরমচ্যুতং গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জিতং অহমেব ইত্যবং একং 'শরণং ব্রজ' ন্ মত্তঃ অন্যদস্তীত্যাধারয় ইত্যর্থঃ।"

[২] গীতা, ১।৩৬, ৩৮-৯ দেখ [৩] ঐ, ১।৪০—দেখ [৪] ঐ, ২।৮

[৫] ইহার পূর্বেও একবার কৃষ্ণ অর্জুনকে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।" (ঐ, ১৬।৫) আর দেখ—২।১১

[৬] আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন যে উক্ত গীতবচনে 'ধর্ম' শব্দে 'অধর্ম'ও গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ধর্ম ও অধর্ম উভয়কে পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে, যেমন অন্য কোন কোন শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে। "সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করত" অর্থ, তাঁহার মতে "সমস্ত কর্মের সন্ন্যাস করত"। পক্ষান্তরে তিলক মনে করেন যে পরমেশ্বর-প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রে যে অনেক ধর্মের উল্লেখ আছে, যথা—অহিংসাধর্ম, সত্যধর্ম, মাতৃ-পিতৃ-সেবা-ধর্ম, গুরুসেবাধর্ম, যাগযজ্ঞধর্ম, দানধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম প্রভৃতি 'ধর্ম' শব্দে সেই সকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে,—উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন। এই উভয় ব্যাখ্যার কোনটাই প্রকরণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া করা হয় নাই। তিলকের অনুমানের আরও দোষ এই যে উহাতে কৃষ্ণকে শাস্ত্রবিরোধী করা হইয়াছে।

[৭] গীতাতত্ত্ব উপদেশের স্থলে স্থলে আরও কয়েকবার কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। যথা, দেখ—২।১৮, ৩৮, ৫০; ৩।৩০; ১১।৩৪

তোমার যে সকল পাপ হইবে, সেই সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। সুতরাং তোমাকে নরকে যাইতে হইবে না। পক্ষান্তরে আমার আনুগত্য হেতু তুমি নিশ্চয় আমাতে আগমন করিবে,—আমাতে আসিয়া মিলিবে। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক তাহা বলিতেছি। অতএব তাহাতে সংশয় করিও না। সুতরাং তোমার শোক করিবার আর কোন কারণ থাকিল না বলিয়া তুমি আর শোক করিও না।'

এই শরণাগতিবাদের মূলে নিহিত যে দার্শনিক তত্ত্ব,—মানুষ স্বয়ং কিছু করে না, ঈশ্বর তাহাকে দিয়া যাহা করায় সে তাহাই করে মাত্র, সে ঈশ্বরের হাতের কাঠপুতুলমাত্র, ঈশ্বর তাহাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিতে পারে—তাহার বিরোধী বচনও গীতায় আছে। যথা,—প্রভু ("অর্থাৎ দেহস্বামী পরমাত্মা) লোকের কর্তৃত্বকে, তাহার কর্মসমূহকে এবং কর্মফলের সংযোগকে উৎপন্ন করে না। পরন্তু স্বভাবই (অর্থাৎ অহংভাব বা মায়াই) প্রবর্তিত হইতেছে (অর্থাৎ সমস্ত কিছু করিতেছে এবং করাইতেছে। বিভু কাহারও পাপ কিংবা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত। সেইহেতু জীবগণ (অহন্তামমতারূপ) মোহগ্রস্ত হয় (এবং তদ্বশতঃ নানা কর্ম করে)।"[১] "হে কৌন্তেয়! অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরস্থ হইলেও কোন কর্ম করে না, (সুতরাং) লিপ্তও হয় না (অর্থাৎ কর্মফলবন্ধনগ্রস্ত হয় না।"[২] আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব এবং নির্লেপত্ব বুঝাইতে কৃষ্ণ আকাশ এবং সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।[৩] এই সকল বচন কৃষ্ণ পরমার্থ দৃষ্টিতে বা পরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে বলিয়াছেন। ভাগবতধর্মের মূল দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে—পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নির্গুণ; নির্গুণ বলিয়া তিনি নিষ্ক্রিয়, অকর্তা এবং নির্লেপ বা অসঙ্গ। এই দৃষ্টিতেই কৃষ্ণ ঐ প্রকার বলিয়াছেন। উহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি, পরমার্থ সত্য। পরন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে,—মানুষের দিক্ হইতে ঐ পরমতত্ত্ব—নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন,—তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদিকর্তা বলিয়া নিরূপিত হন। ঐ ঈশ্বরতত্ত্বকে অবলম্বন না করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিতে গিয়া বেদান্তশাস্ত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া তাঁহার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।[৪] যতক্ষণ জগতের বোধ থাকে, উহার ব্যবহার থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ঐ ব্যবহার ভুমিতে জীবেরও কর্তৃত্ব থাকে। তাই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে "কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ"।[৫] ঐ কর্তৃত্ববোধ জীবের স্বাভাবিক সংস্কারগত। পরন্তু প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব যেমন বাস্তব নহে, তেমন জীবের কর্তৃত্বও বাস্তব নহে, অজ্ঞান বশতঃই ঐ কর্তৃত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণও তাহা বলিয়াছেন। ঐ কর্তৃত্বাভিমান বিদূরিত না করিলে প্রকৃততত্ত্বের বোধ হইতে পারে না। কি জ্ঞানযোগী, কি কর্মযোগী, বা কি ভক্তিযোগী,—কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ,—অকর্তৃত্ববোধ সকলেরই ইষ্ট। জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার দ্বারা অথবা সাংখ্য-বেদান্তের প্রকৃতিবাদের সহায়ে বিচার দ্বারা তাহা পরিত্যাগ করেন।[৬] আর ভক্তিযোগী তদর্থে মনে করেন যে সর্বকর্তৃত্ব ঈশ্বরেরই, মনুষ্যের নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই; ঈশ্বরই তাহাকে দিয়া কর্ম করাইতেছেন, সে নিজে কোন কর্ম করে না। এই প্রকার

---

১) গীতা, ৫।১৪—৫ ২) ঐ, ১৩।৩১ ৩) ঐ, ১৩।৩২—৩; পূর্বে দেখ।
৪) ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২ ৫) ঐ, ২।৩।৩৩ ৬) পূর্বে দেখ।

দৃঢ় ভাবনা দ্বারাও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যক্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং তাহাতে অনহঙ্কারিতা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা প্রভৃতি জ্ঞান-সাধনও[১] সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ঐ মতবাদ এক সুন্দর কৌশল।

'মহাভারতে'র বহু স্থলে ঐ ঈশ্বর-কারয়িতা-বাদের উল্লেখ আছে। নানা জনে নানা উদ্দেশ্যে উহার উপযোগ করিয়াছেন। যথা, শোকগ্রস্ত অর্জুনকে সান্ত্বনা দিতেও কৃষ্ণ ঐ মতবাদের উপযোগ করিয়াছেন। পরমর্ষি ব্যাসও উহার সেই প্রকার উপযোগ করিয়াছেন দেখা যায়। যুধিষ্ঠির আপনাকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে গুরুজনের, তথা আত্মীয়স্বজনের, বধের এবং যাহারা তাহাতে বাঁচিয়াছিল তাহাদের সকলের দুঃখের ও শোকের, কারণ মনে করিয়া ভীষণ শোকগ্রস্ত হন। তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পরমর্ষি ব্যাস বলেন, "হে যুধিষ্ঠির! (যেহেতু তুমি এই প্রকার শোক করিতেছে, সেইহেতু) তোমার বুদ্ধি সম্যক্ নহে,—ইহাই আমার বিচার। কেননা, মনুষ্য কখনও স্বয়ং স্ববশে থাকিয়া কর্ম করে না। ঈশ্বরেরই দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সে পুণ্য বা পাপ কর্ম করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে (অর্থাৎ পাপকর্ম করিয়াছে বলিয়া) শোক কি? (অর্থাৎ শোক করা বৃথা)।[২] পুত্রস্নেহবশতঃ দুর্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনিই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সর্বনাশের কারণ হইয়াছেন এই বলিয়া যখন ধৃতরাষ্ট্র শোক করিতেছিলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে সঞ্জয় বলেন, "পুরুষ শুভাশুভকর্মের কর্তা নিশ্চয় নহে। কেননা, পুরুষ কাঠপুতুলের মত অস্বতন্ত্র-রূপে কর্ম করে।"[৩] যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্মিক এবং সৎকর্মকারী ব্যক্তিকে মহান্ দুঃখে পড়িতে দেখিয়া দ্রৌপদী শোকগ্রস্ত হইয়া সেই প্রকার আক্ষেপ করিয়াছেন।[৪] দুর্যোধন স্বকৃত কুকর্মের দায়িত্ব এড়াইবার দুরভিসন্ধিতে,[৫] তথা শত্রুর পুরুষকারকে নিন্দা করিয়া তাহার উদ্যম ভঙ্গ করিবার অভিসন্ধিতে[৬] ঈশ্বর-কারয়িতাবাদের উপযোগ করিয়াছেন। কেহ কেহ ঈশ্বরের পরিবর্তে স্বভাবকে, দৈব বা যদৃচ্ছা প্রভৃতিকেও ঐ প্রকারে কারয়িতা বলিয়াছেন।[৭] গীতাতে কৃষ্ণও উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] ঈশ্বর-কারয়িতা-বাদের এই মহান্ দোষ এই যে তাহাতে

---

১) ব্রহ্মসূত্র, ১৩।৭—১১ দেখ ২) মহাভা, ১৪।৩।১-২ ৩) ঐ, ৫।১৫৯।১৪

৪) ঐ, ৩।৩০।২২'২—

৫) দুর্যোধন বিদুরকে বলেন যে তিনি কর্তা নহেন, ঈশ্বরই তাঁহাকে দিয়া যথেচ্ছা কার্য্য করাইতেছেন।

"একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা
গর্ভে শয়ানং পুরুষং শাস্তি শাস্তা।
তেনানুশিষ্টঃ প্রবণাদিবাম্ভো
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা ভবামি॥" ইত্যাদি—(মহাভা, ২।৬৪।৮—)

স্বল্পবিস্তর পাঠান্তরে এই বচন অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা—স্কন্দপু, ১।২।৪২।১৭১ (পাঠান্তরে);

৬) যথা দেখ—মহাভা, ৫।১৫৯।১৫; ১৬০।৫৭'২—৫৮'১, ১০৯; ১৬০।২৭

৭) মহাভা, ৫।১৫৯।১৫

৮) ঈশ্বরকর্তৃত্ববাদ-খ্যাপনের অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণ স্বভাব-কর্তৃত্ববাদ খ্যাপন করিয়াছেন।

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"—(গীতা, ১৮।৫৯—৬০)

ঈশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ উপস্থিত হয় এবং জীবের অকৃতাভ্যাগম দোষ উপস্থিত হয়।[১] দ্রৌপদী বলিয়াছেন, কৃতকর্মের ফল যদি কর্তাকেই ভুগিতে হয়, অপরকে নহে, তবে মানুষের দুষ্কৃতের শাস্তি ঈশ্বরেরই হওয়া উচিৎ, কেননা, তিনিই প্রকৃত কর্তা ; আর কৃত কর্মের ফল যদি কর্তাকে ভুগিতে না হয়, তবে বলিতে হইবে যে বলই তাহার হেতু, সুতরাং দুর্বলের অবস্থা বড় শোচনীয়।[২] তাই বেদান্তসূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"।[৩] তাই 'গীতা'তে কৃষ্ণ আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবাদও খ্যাপন করিয়াছেন, ("মনুষ্য) নিজে নিজের উদ্ধার করিবেক। নিজে নিজেকে (কখনও) অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে না। (মানুষ) নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু" ইত্যাদি ;[৪] "কর্ম করাতে মাত্র তোমার অধিকার আছে" ইত্যাদি।[৫] তাই দ্রৌপদী পরে বলিয়াছেন যে যাহারা ঈশ্বর, স্বভাব প্রভৃতিকে কারয়িতা বলে, তাহারা শঠ "কর্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে" ('কর্মকরণার্থ বুদ্ধিই প্রশংসনীয় ;[৬] যাহারা অপরের ভরসায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে, তাহারা দুর্বুদ্ধি, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ;[৭]

"এবং হঠাচ্চ দৈবাচ্চ স্বভাবাৎ কর্মণস্তথা।
যানি প্রাপ্নোতি পুরুষস্তৎফলং পূর্বকর্মণাম্ ॥
ধাতাঽপি হি স্বকর্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভাজ্যেহ ফলং পূর্বকৃতং নৃণাম্ ॥"

ইত্যাদি।[৮]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণে আছে, মহাভাগবত করভাজন বলেন, যে আপন কর্তব্য কর্মসমূহ পরিত্যাগ করত সর্বান্তঃকরণে শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করে সে দেব, ঋষি, পিতৃগণ, সাধুসজ্জন, ভূত (বা অপর প্রাণী) এবং আপন আত্মীয়স্বজন—কাহারও নিকট ঋণী থাকে না, কাহার ও কিঙ্কর থাকে না।[৯] তাৎপর্য এই যে দেবাদির প্রতি কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত কর্মসমূহের অকরণ হেতু ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তির দোষ হয় না। তিনি আরও বলেন তাহার দ্বারা যদি কখনও কোন "বিকর্ম" (বা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম) অকস্মাৎ হইয়াও পড়ে, তবে ভগবান্ তাহার অপরাধ মার্জনা করেন।[১০] প্রহ্লাদ বলেন, নারায়ণ ঋষির ভাগবত ধর্ম মতে, ধর্ম অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, (বা বেদের কর্মকাণ্ড), ন্যায়, দণ্ডনীতি এবং বিবিধ বার্তা—নিগমের এই সমস্ত গুণ স্বসুহৃদ পরমপুরুষে স্বাত্মার্পণপরক হইলেই সত্য হয় (অন্যথা

আরও দেখ—৬।২৭ ও ৩৩

'গীতা'র ২।৩২ শ্লোকে তিনি যদৃচ্ছাবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

১) "নম্বেবমীশ্বরস্য কারয়িতৃত্বে সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামকৃতাভ্যাগমশ্চ জীবস্যেতি।" (ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।৪২ সূত্রের শঙ্করভাষ্যের ভূমিকা)

২) মহাভা, ৩।৩১।৪৩—৪

৩) ব্রহ্মসূ, ২।৩।৪২ ; আরও দেখ—২।১।৩৪

৪) গীতা, ৬।৫—৬

৫) ঐ, ২।৪৭

৬) মহাভা, ৩।৩২।১৭

৭) ঐ, ৩।৩২।১৪—

৮) ঐ, ৩।৩২।২০—

৯) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৫।৪১

১০) ঐ, ১১।৫।৪২

ব্যর্থই)।[১] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, মর্ত্য মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব লাভ করত ভগবৎস্বরূপ-ভবনে সমর্থ হয়।[২]

"সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥
আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।"[৩]

'সংসাররূপকূপে নিপতিত, বিষয়সমূহ দ্বারা নষ্টদৃষ্টি এবং কালরূপ সর্প দ্বারা গ্রস্ত আত্মাকে (জীবকে) পরিত্রাণ করিতে (আত্মা স্বয়ং ব্যতীত) অপর কে সমর্থ? আত্মাই আত্মার রক্ষক (হয়) যখন অখিল জগৎপ্রপঞ্চ হইতে নির্বিণ্ণ হয়।' কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগতঃ আত্মনা-আত্মানমুদ্ধরেৎ" ('(নানা) কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও শ্রেয়াভিলাষী ব্যক্তি নিজেই নিজের উদ্ধার করিবেক)[৪]

ভক্তি দ্বারা মুক্তি—এই মাত্র পূর্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে গীতার মতে, যাহারা সর্বভাবে ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করে তাহারা তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হয়,—তাহারা তাঁহাতে গমন করে। সুতরাং তাহারা মুক্ত হয়। উহার অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, একমাত্র অনন্যা ভক্তি বা পরাভক্তি দ্বারাই পরমপুরুষকে জানা যায় এবং তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়। "পরন্তু হে পার্থ, ভূতসমূহ যাঁহার অন্তঃস্থ এবং যাঁহার দ্বারা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত (জগৎ) ব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষ অনন্যা ভক্তি দ্বারা লভ্য।"[৫] "হে অর্জুন, হে পরন্তপ, তুমি আমাকে যেরূপে (অর্থাৎ বিশ্বরূপে) দেখিয়াছ, বেদসমূহ, তপস্যা, দান কিম্বা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ দেখিতে কেহ সমর্থ হয় না। পরন্তু অনন্যাভক্তি দ্বারাই আমাকে এবংবিধ তত্ত্বতঃ জানিতে দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।"[৬] "আমি যাবান্ এবং যাহা, (ব্রহ্মভূত পরা)ভক্তি দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ পরিজ্ঞাত হয়। অনন্তর আমাকে জানিবার পর আমাতে প্রবেশ করে।"[৭]

"মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"[৮]

'আমার ভক্ত ইহা (অর্থাৎ এই প্রকারে উক্ত ক্ষেত্র, জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞানলাভের উপায়সমূহ) জানিয়া আমার স্বরূপ লাভ করে।' এইরূপে দেখা যায় যে গীতার মতে ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধন। প্রকৃত পক্ষে উহাতে আরও স্পষ্ট বাক্যে তাহা নির্দেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যে সকল উপায় তথায় বিবৃত হইয়াছে[৯] ভগবানে অনন্যভাবে অব্যভিচারিণীভক্তি ("ময়ি চানন্য-যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী") উহাদের অন্যতম। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। তাই বলা হয় যে ভক্তি দ্বারাও মুক্তি হয়।

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।৬।২৬
২) ঐ, ১১।২৯।৩৪
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৮।৪১—২'১
৪) ঐ, ১১।২২।৫৮'২
৫) গীতা, ৮।২২
৬) ঐ, ১১।৫৩—৪; আর দেখ ১১।৪৮

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"-(ঐ, ১৮।৫৫)

এই বচনের 'অভি' উপসর্গের উপর জোর দিয়া 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' (১৫শ সূত্র) ইহা দেখাইতে প্রযত্ন করা হইয়াছে যে উহার শ্রুতার্থ ভক্তি জ্ঞানের সাধন, অভিপ্রেতার্থ বা প্রকৃতার্থ নহে। তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র।

৭) ঐ, ১৩।১৮'২
৮) ঐ, ১৩।৭—১১
৯) ঐ, ১৩।১৩'১

নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে একান্তী ভক্তগণ বাসুদেবে প্রবেশ করে। নারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন "বেদসমূহ এবং আশ্রমসমূহ (অর্থাৎ তত্তদনুযায়িগণ) নানামত সমাস্থিত হইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে পূজা করে। তিনি শীঘ্র তাহাদিগকে সদ্‌গতি প্রদান করেন। পরন্তু সংসারে যাহারা তদ্ভাবিত (হইয়া) একান্তিত্বে সমাস্থিত তাহাদের এই আধিক্য আছে যে তাহারা পুনঃ তাঁহাতে প্রবেশ করে।"[১] পরেও তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা সমাহিতমনস্ক, নিয়ত, সংযতেন্দ্রিয় এবং একান্তভাবোপগত, তাহারা বাসুদেবে প্রবেশ করে।"[২] ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলা উচিৎ যে একান্তিগণের পরম গতি শ্বেতদ্বীপ-প্রাপ্তিমাত্র নহে। কেননা, ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াছেন যে শ্বেতদ্বীপবাসী একান্তিগণ সিদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাতে প্রবেশ করিবেন।[৩] ভীষ্ম বলিয়াছেন, "যে মনুষ্য একান্তভাবোপগত এবং একান্তে সমাহিত, সে শ্বেতদ্বীপে গমন করত চন্দ্রপ্রভ হইয়া সহস্রার্চ্চিযুক্ত সেই দেবতায় প্রবেশ করিবে; তাহাতে সংশয় নাই।"[৪] এই ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে শ্বেতদ্বীপবাসিগণ এখনও বাসুদেবে প্রবেশ করেন নাই। আরও দেখ, শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ বাসুদেব নিত্য থাকেন না। তিনি সেখানে কখন কখন আবির্ভূত হন মাত্র।[৫] নারদ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ শ্বেতদ্বীপের পরে, উহা 'তেজ' বলিয়া অভিবিখ্যাত।[৬] একতাদি মহর্ষিগণ শ্বেতদ্বীপে গিয়াও ভগবানের দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসেন।[৭] এইরূপে নিশ্চিত হয় যে শ্বেতদ্বীপে গমন বাসুদেবে প্রবেশ নহে। ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন। শ্বেতদ্বীপে গমন মুক্তিও নহে। কারণ উহা মুক্তি হইলে একতাদি মহর্ষিগণের এবং দেবর্ষি নারদের তথা হইতে প্রত্যাবর্তন হইত না। যাহা হউক, যতক্ষণ বাসুদেবে প্রবেশ হয় নাই, ততক্ষণ মুক্তি হয় নাই। এই বাসুদেবে প্রবেশের প্রকৃত তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। যাহারা একান্তী তাহাদিগকে 'প্রতিবুদ্ধ'ও বলা হয়।[৮] 'প্রতিবুদ্ধ' শব্দ বিশেষ অর্থগর্ভ। একান্তধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই,—ব্রহ্মই অজ্ঞানজ শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন; অজ্ঞান বশতঃই জীব আপন স্বরূপকে জানিতে পারিতেছে না। জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানের নাশ হইলে জীব আপন প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ পুনঃ অবগত হয়। ইহাকেই বলা হয় যে জ্ঞানোদয়ে জীব 'প্রতিবুদ্ধ' হয়। সুতরাং একান্তীর 'প্রতিবুদ্ধ' সংজ্ঞা হইতে বুঝা

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৪৩—৪

২) ঐ, ১২।৩৪৪।১৯ আর ও দেখ—৩৪৯।৭২ (বৈশম্পায়নোক্তি)

৩) ঐ, ১২।৩৩৯।২০,৪৯ ; আরও দেখ—৩৩৬।২৮—৯

৪) ঐ, ১২।৩৩৯।১২৯—১৩০'১

৫) যথা দেখ—ঐ, ১২।৩৩৬।৩৯'২—

৬) ঐ, ১২।৩৪৩।৫৭, ৭) ঐ, ১২।৩৩৬।৫৮ ; ৩৩৯।১২—১৩'১

৮) "একান্তভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥"—(ঐ, ১২।৩৩৬।২৮'২)
"প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সর্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমম্ ॥"—(ঐ, ১২।৩৪৩।৫৩'২)
আরও দেখ —১২।৩৪১।৩৪—৫ ; ৩৪৩।৬৪—৫ ; ৩৪৮।৬৭'১

ব্যর্থই)।[১] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, মর্ত্য মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব লাভ করত ভগবৎস্বরূপ-ভবনে সমর্থ হয়।[২]

> "সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
> গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥
> আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।"[৩]

'সংসাররূপকূপে নিপতিত, বিষয়সমূহ দ্বারা নষ্টদৃষ্টি এবং কালরূপ সর্প দ্বারা গ্রস্ত আত্মাকে (জীবকে) পরিত্রাণ করিতে (আত্মা স্বয়ং ব্যতীত) অপর কে সমর্থ? আত্মাই আত্মার রক্ষক (হয়) যখন অখিল জগৎপ্রপঞ্চ হইতে নির্বিণ্ণ হয়।' কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগতঃ আত্মনা-আত্মানমুদ্ধরেৎ" ("(নানা) কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও শ্রেয়াভিলাষী ব্যক্তি নিজেই নিজের উদ্ধার করিবেক)[৪]

ভক্তি দ্বারা মুক্তি—এই মাত্র পূর্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে গীতার মতে, যাহারা সর্বভাবে ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করে তাহারা তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হয়,—তাহারা তাঁহাতে গমন করে। সুতরাং তাহারা মুক্ত হয়। উহার অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, একমাত্র অনন্যা ভক্তি বা পরাভক্তি দ্বারাই পরমপুরুষকে জানা যায় এবং তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়। "পরন্তু হে পার্থ, ভুতসমূহ যাঁহার অন্তঃস্থ এবং যাঁহার দ্বারা এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্ত (জগৎ) ব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষ অনন্যা ভক্তি দ্বারা লভ্য।"[৫] "হে অর্জুন, হে পরন্তপ, তুমি আমাকে যেরূপে (অর্থাৎ বিশ্বরূপে) দেখিয়াছ, বেদসমূহ, তপস্যা, দান কিম্বা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ দেখিতে কেহ সমর্থ হয় না। পরন্তু অনন্যাভক্তি দ্বারাই আমাকে এবংবিধ তত্ত্বতঃ জানিতে দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।"[৬] "আমি যাবান্ এবং যাহা, (ব্রহ্মভুত পরা) ভক্তি দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ পরিজ্ঞাত হয়। অনন্তর আমাকে জানিবার পর আমাতে প্রবেশ করে।"[৭]

> "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"[৮]

'আমার ভক্ত ইহা (অর্থাৎ এই প্রকারে উক্ত ক্ষেত্র, জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞানলাভের উপায়সমূহ) জানিয়া আমার স্বরূপ লাভ করে।' এইরূপে দেখা যায় যে গীতার মতে ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধন। প্রকৃত পক্ষে উহাতে আরও স্পষ্ট বাক্যে তাহা নির্দেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের যে সকল উপায় তথায় বিবৃত হইয়াছে[৯] ভগবানে অনন্যভাবে অব্যভিচারিণীভক্তি ("ময়ি চানন্য-যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী") উহাদের অন্যতম। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। তাই বলা হয় যে ভক্তি দ্বারাও মুক্তি হয়।

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।৬।২৬
২) ঐ, ১১।২৯।৩৪
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৮।৪১—২'১
৪) ঐ, ১১।২২।৫৮'২
৫) গীতা, ৮।২২
৬) ঐ, ১১।৫৩—৪; আর দেখ ১১।৪৮

> "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"-(ঐ, ১৮।৫৫)

এই বচনের 'অভি' উপসর্গের উপর জোর দিয়া 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' (১৫শ সূত্র) ইহা দেখাইতে প্রযত্ন করা হইয়াছে যে উহার শ্রুতার্থ ভক্তি জ্ঞানের সাধন, অভিপ্রেতার্থ বা প্রকৃতার্থ নহে। তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র।

৭) ঐ, ১৩।১৮'২
৮) ঐ, ১৩।৭—১১
৯) ঐ, ১৩।১৩'১

নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে একান্তী ভক্তগণ বাসুদেবে প্রবেশ করে। নারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন "বেদসমূহ এবং আশ্রমসমূহ (অর্থাৎ তত্তদনুযায়িগণ) নানামত সমাস্থিত হইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে পূজা করে। তিনি শীঘ্র তাহাদিগকে সদ্‌গতি প্রদান করেন। পরন্তু সংসারে যাহারা তদ্ভাবিত (হইয়া) একান্তিত্বে সমাস্থিত তাহাদের এই আধিক্য আছে যে তাহারা পুনঃ তাঁহাতে প্রবেশ করে।"[১] পরেও তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা সমাহিতমনস্ক, নিয়ত, সংযতেন্দ্রিয় এবং একান্তভাবোপগত, তাহারা বাসুদেবে প্রবেশ করে।"[২] ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলা উচিৎ যে একান্তিগণের পরম গতি শ্বেতদ্বীপ-প্রাপ্তিমাত্র নহে। কেননা, ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াছেন যে শ্বেতদ্বীপবাসী একান্তিগণ সিদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাতে প্রবেশ করিবেন।[৩] ভীষ্ম বলিয়াছেন, "যে মনুষ্য একান্তভাবোপগত এবং একান্তে সমাহিত, সে শ্বেতদ্বীপে গমন করত চন্দ্রপ্রভ হইয়া সহস্রার্চ্চিযুক্ত সেই দেবতায় প্রবেশ করিবে; তাহাতে সংশয় নাই।"[৪] এই ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে শ্বেতদ্বীপবাসিগণ এখনও বাসুদেবে প্রবেশ করেন নাই। আরও দেখ, শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ বাসুদেব নিত্য থাকেন না। তিনি সেখানে কখন কখন আবির্ভূত হন মাত্র।[৫] নারদ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ শ্বেতদ্বীপের পরে, উহা 'তেজ' বলিয়া অভিবিখ্যাত।[৬] একতাদি মহর্ষিগণ শ্বেতদ্বীপে গিয়াও ভগবানের দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসেন।[৭] এইরূপে নিশ্চিত হয় যে শ্বেতদ্বীপে গমন বাসুদেবে প্রবেশ নহে। ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন। শ্বেতদ্বীপে গমন মুক্তিও নহে। কারণ উহা মুক্তি হইলে একতাদি মহর্ষিগণের এবং দেবর্ষি নারদের তথা হইতে প্রত্যাবর্তন হইত না। যাহা হউক, যতক্ষণ বাসুদেবে প্রবেশ হয় নাই, ততক্ষণ মুক্তি হয় নাই। এই বাসুদেবে প্রবেশের প্রকৃত তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। যাহারা একান্তী তাহাদিগকে 'প্রতিবুদ্ধ'ও বলা হয়।[৮] 'প্রতিবুদ্ধ' শব্দ বিশেষ অর্থগর্ভ। একান্তধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই,—ব্রহ্মই অজ্ঞানজ শরীরে প্রবেশ করিয়া জীব সাজিয়াছেন; অজ্ঞান বশতঃই জীব আপন স্বরূপকে জানিতে পারিতেছে না। জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানের নাশ হইলে জীব আপন প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ পুনঃ অবগত হয়। ইহাকেই বলা হয় যে জ্ঞানোদয়ে জীব 'প্রতিবুদ্ধ' হয়। সুতরাং একান্তীর 'প্রতিবুদ্ধ' সংজ্ঞা হইতে বুঝা

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৪৩—৪

২) ঐ, ১২।৩৪৪।১৯ আর ও দেখ—৩৪৯।৭২ (বৈশম্পায়নোক্তি)

৩) ঐ, ১২।৩৩৯।২০,৪৯ ; আরও দেখ—৩৩৬।২৮—৯

৪) ঐ, ১২।৩৩৯।১২৯—১৩০·১

৫) যথা দেখ—ঐ, ১২।৩৩৬।৩৯·২—

৬) ঐ, ১২।৩৪৩।৫৭,   ৭) ঐ, ১২।৩৩৬।৫৮ ; ৩৩৯।১২—১৩·১

৮) "একান্তভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥"—(ঐ, ১২।৩৩৬।২৮·২)
"প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সর্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমম্ ॥"—(ঐ, ১২।৩৪৩।৫৩·২)
আরও দেখ—১২।৩৪১।৩৪—৫ ; ৩৪৩।৬৪—৫ ; ৩৪৮।৬৭·১

যায় যে তাহার 'বাসুদেব-ভবন' বা 'স্বীয় বাসুদেবস্বরূপে পুনঃ অবস্থিতি'কেই 'বাসুদেব প্রবেশ' বলা হইয়াছে।

ভক্তি দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মপ্রবেশ বা ব্রহ্মভবন হয়, তাহা 'গীতা'য় কৃষ্ণ অতি স্পষ্টবাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ভাবযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজন করে।[১] "(তাহারা) মচ্চিত্ত এবং মদ্‌গতপ্রাণ হইয়া নিত্য পরস্পরকে (আমার তত্ত্ব) বুঝাইয়া থাকে এবং আমার (লীলাদি) কীর্তন করিয়া থাকে। তাহাতেই তাহারা প্রীতিলাভ করে এবং পরিতৃপ্ত থাকে। (এই প্রকারে) নিত্যযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনকারী তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) প্রদান করি যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতেই আমি তাহাদের অন্তঃকরণে স্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা (তাহাদের) অজ্ঞানজ অন্ধকার বিনাশ করি।"[২] অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্তের অন্তঃকরণে আপন স্বরূপের পূর্ণজ্ঞান জানাইয়া দেন; তাহাতে তাহার মনের অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং সে ভগবানে প্রবেশ করে, অর্থাৎ ভগবান্ হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, বাসুদেবের প্রতি ভক্তি শীঘ্রই সংসারে বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান উৎপাদন করে।[৩] উহাতে পরমভাগবত প্রহ্লাদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে

"যস্য নারায়ণো দেবো ভগবান্ হৃদগতঃ সদা।
ভক্ত্যা কেবলয়াজ্ঞানং ধুনোতি ধ্বান্তমর্কবৎ ॥[৪]

তাঁহার কেবল ভক্তি হেতু জ্যোতির্ময় ভগবান্ নারায়ণ সদা তাঁহার হৃদয়স্থ থাকিয়া তাঁহার অজ্ঞানকে তেমনভাবে বিনাশ করেন, যেমন সূর্য অন্ধকারকে বিনাশ করে। উহার ভাগবতধর্মবিবরণে আছে যে ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হয়। "ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ প্রাপ্তির এষণা দ্বারা (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) তীব্র ভক্তি(রূপ অগ্নি দ্বারা মনুষ্যের) গুণকর্মজ চিত্তমলসমূহ দগ্ধ হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে (মনুষ্য) আত্মতত্ত্ব তেমন সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি করে, যেমন নির্মল নেত্র সূর্যের, প্রকাশ (উপলব্ধি করে)।"[৫] উহার একাধিক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের বা তাঁহার লীলাবতারের চরিত্র শ্রবণ, স্মরণ, কীর্তন প্রভৃতি করিয়া মনুষ্যগণ অনায়াসে অজ্ঞানান্ধকার ("তম")উত্তীর্ণ হইতে পারে।[৬] অজ্ঞাননাশ হইলেই জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানোদয়ে মুক্তি হয়।

প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, ভগবানের লীলাবতারগণের অতুল কর্মসমূহ, বীর্যসমূহ ও গুণসমূহ শুনিয়া যখন মনুষ্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয় এবং কণ্ঠ গদ্গদ হয় এবং উৎকণ্ঠাবশত সে কখন উচ্চস্বরে গান করে, কখন কাঁদে এবং কখন নাচে, যখন সে গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় তন্ময় হইয়া নিঃসঙ্কোচে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন ধ্যান করে,

---

১) গীতা, ১০।৮·২ ২) ঐ, ১০।৯—১১

৩) "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যত্তদহৈতুকম্ ॥"
—((বিষ্ণু)ভাগপু, ১।২।৭)

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১৩।২১ ৫) ঐ, ১১।৩।৪০

৬) ঐ, ১১।৬।২৪, ৪৮—৯; ১১।২৩।৫৮·২

কখন লোককে নমস্কার করে, এবং কখন দীর্ঘ শ্বাস লইতে লইতে 'হে হরি! হে জগৎপতি, হে নারায়ণ' বলিতে থাকে, তখন প্রবল ভক্তিপ্রয়োগ বশত তাহার অন্তঃকরণাদি ভগবদ্‌ভাবে রসিত হইয়া যাওয়াতে, তাহার (কর্ম)বীজানুশয় নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, সে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ভগবানে এক হইয়া যায় ("সমেতি")।[1] কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন, "যেমন স্বর্ণ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে মলকে পরিত্যাগ করত আপন উজ্জ্বল স্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তেমন আত্মা মদ্ভক্তিযোগ দ্বারা কর্মানুশয় পরিত্যাগ করতঃ আপন স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়।"[2]

ভক্তিদ্বারা মায়া-নাশ—ভাগবতধর্ম্ম মতে মানুষ ভগবানে ভক্তি দ্বারা মায়াকে সম্যক্ বিনাশ করিতে পারে। 'গীতা'তে কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"[3]

'যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করে তাহারা এই মায়াকে নিশ্চয় অতিক্রম করে।' '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণেও আছে যে ভাগবতধর্মসমূহ অভ্যাস করিলে ভক্তি উৎপন্ন হয়; তাহাতে মানুষ নারায়ণপরায়ণ হয় এবং তাহাতে দুস্তর মায়া সহজে এবং শীঘ্র অতিক্রম করে।[4] উহার অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে বিষ্ণুর মায়া ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফলদাতা ত্রিলোকাধীশ্বরগণরূপে রাজা রন্তিদেবের সম্মুখে প্রকটিত হয়। "তিনি নিস্পৃহ এবং নিঃসঙ্গ হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করত ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিসহকারে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন! অপর কোন্ বস্তুর আশা না করিয়া চিত্তকে (একমাত্র) ঈশ্বরের আশ্রিত করাতে গুণময়ী মায়া (তাঁহার সম্মুখ হইতে) স্বপ্নবৎ প্রলীন হইল।"[5] অন্যত্র আছে, ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হইলে কামলোভাদি তামসিক এবং রাজসিক ভাবসমূহ বিনষ্ট হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া প্রসাদপ্রাপ্ত হয়। ঐ প্রকারে প্রসন্নচিত্ত এবং মুক্তসঙ্গ ভগবদ্‌ভক্তের অন্তরে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান উদয় হয়।[6]

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥"[7]

'আত্মার বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে, ইহার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয় হয়।' আচার্য শঙ্কর বলেন 'হৃদয়গ্রন্থি' অর্থ "অবিদ্যাবাসনাপ্রচয়, বুদ্ধ্যাশ্রয় কাম।" সুতরাং ভক্তির ফল ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান এবং তাহার ফল অবিদ্যাবিনাশ, অতএব

---

[1] (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।৭।৩৪—৬

[2] ঐ, ১১।১৪।২৫; আরও দেখ—"মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ" (১১।২৮।২৭·২); ১২।৩।৪৭

[3] গীতা, ৭।১৪·২

[4] (বিষ্ণু)ভাগ,

[5] ঐ, ৯।২১।১৬—১৭

[6] ঐ, ১।২।১৯—২০

[7] ঐ, ১।২।২১; এই বচন চতুর্থ চরণের "দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" স্থলে "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" পাঠান্তরে 'মুণ্ডকোপনিষদে' (২।২।৮) পাওয়া যায়।

মুক্তি।[১] মহর্ষি মৈত্রেয় বলেন, নিরস্তিধর্ম, বাসুদেবের কৃপা এবং ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারাই মায়া তথা তজ্জনিত জীবভাব, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি, প্রভৃতি ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়।[২]

সকাম ও নিষ্কামভক্তি—প্রাচীন ভাগবতধর্ম মতে ভগবানের ভক্ত চতুর্বিধ—আর্ত অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী বা একান্তী।[৩] তন্মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী এবং জিজ্ঞাসু এই ত্রিবিধ ভক্তকে নারায়ণীয়াখ্যানে ফলকামী এবং চ্যবনধর্মী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, আর জ্ঞানী বা একান্তী ভক্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে।[৪] সুতরাং ভাগবতধর্মে যেমন সকাম কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, তেমন সকাম বা হৈতুকী ভক্তি অপেক্ষা নিষ্কাম বা অহৈতুকী ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। পরন্তু ঐ প্রসঙ্গে আচার্য শৌনকের একটা মত উল্লেখযোগ্য মনে করি। তিনি বলিয়াছেন ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে ঋষি দেবতার নিকট, 'ইহা আমার হউক'-এই বলিয়া কোন না কোন বস্তু যাচ্ঞা করিয়াছেন; আর কোন কোন মন্ত্রে ঋষি ভক্তি সহকারে দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। দেবতার নাম, রূপ, কর্ম, বান্ধব (অর্থাৎ অপরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ); প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা স্তুতি হয়; আর স্বর্গ, আয়ু, ধন, পুত্র, প্রভৃতির প্রার্থনা দ্বারা আশীঃ হয়। যদি এক ব্যক্তি অপর কাহারও স্তুতি করে, তবে সেই অপর জন ইহা বুঝে যে 'এই ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছে।' যদি এক ব্যক্তি অপরের নিকট কোন বস্তু যাচ্ঞা করে, তবে সেই অপর জন ইহা মনে করে যে 'এই ব্যক্তি আমার নিকট বস্তু যাচ্ঞা করিয়া প্রকারান্তরে আমার স্তুতিই করিয়াছে; কেননা, সে ইহা স্বীকার করিয়াছে যে ঐ বস্তু প্রদানের সামর্থ্য আমার আছে।' সকলেই এই তত্ত্ব জানে। তাই, শৌনক বলেন, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ স্তুতিই করুক, অথবা বস্তু-যাচ্ঞাই করুক, উহাদের একটার দ্বারা অপরটাও বলা হইয়া যায়; কেননা, "উভয়ং হ র্থতঃ সমং" ('তদুভয়ই বস্তুতঃ সমানই')।[৫] আচার্য্য শৌনক যাহাকে স্তুতি বলিয়াছেন, তাহাতে আধুনিক কালের অহৈতুকী ভক্তি এবং ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ কর্ম উভয়েই অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং তাঁহার আশীঃ সকাম ভক্তিই। সুতরাং তাঁহার ঐ মতবাদানুসারে নিষ্কাম ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ কর্মের এবং সকাম ভক্তির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে পার্থক্য নাই। অধিকন্তু তন্মতে নিষ্কামভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক সকাম ভক্তি হয়। কেননা, মানুষ সাধারণতঃ অল্পজ্ঞ। সেইহেতু তাহার ইহপারলৌকিক কল্যাণ, তথা পরমকল্যাণ, কিসে হইবে, সে তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না। তাই সে ভগবানের নিকট কোন বস্তু যাচ্ঞা করত পাইলে তদ্দ্বারা তাহার অভীষ্ট সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ না হইতেও পারে। তাহাতে বলিতে হয় যে ঐ যাচ্ঞা দ্বারা সে আপন স্বার্থের হানি করিয়াছে। পক্ষান্তরে কোন বস্তুবিশেষের প্রার্থনা না করিয়া ভগবানের প্রীতির

---

১) 'মুণ্ডকোপনিষদে' (৩৷২৷৯) "স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ··তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩৷৭৷৯—১২

৩) গীতা ৭৷১৬, মহাভা, ১২৷৩৪১৷৩৩:২

৪) পূর্বে দেখ

৫) 'বৃহদ্দেবতা' ১৷৬—১০

জন্য মাত্র প্রযত্ন করিলে,—তাঁহার স্তুতি করিলে কিংবা তদর্থে কর্ম করিলে, যাহাতে ভক্তের ইহপারলৌকিক সর্বপ্রকার কল্যাণ হয়, তাহার স্বার্থ সম্পূর্ণতঃ রক্ষা হয়,—ভগবান্ তাহা করিবেন।

জপ—প্রাচীন ভাগবতধর্মে জপকে খুব মহিমা দেওয়া হইত মনে হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে এমন কি শ্বেতদ্বীপবাসী শ্রেষ্ঠভক্ত মহাত্মাগণও নিত্য পূর্বমুখে স্থিত হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত মনে মনে জপ করিতেন। তাঁহাদের ঐ জপ 'মানস জপ' নামে খ্যাত হইত।[১] "তেনৈকাগ্রমনস্ত্বেন প্রাতো ভবতি বৈ হরিঃ" (উহার দ্বারা মন একাগ্র হয়; সেইহেতু হরি নিশ্চয় প্রীত হন')।[২] যখন ভগবান্ প্রকটিত হইতেন, তখন তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে 'নমঃ নমঃ' বলিতেন; অনন্তর একসঙ্গে বিপুল ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিয়া শিক্ষাক্ষরসমন্বয়ে এই বলিয়া স্তুতি করিতেন :—

"জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্বজ ॥"[৩]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' এই মন্ত্রকে "মহাপুরুষবিদ্যা" বলা হইয়াছে।[৪] পাঞ্চরাত্রধর্মে এই স্তুতির বহু মহত্ব ছিল। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উহাকে "জিতন্তাখ্যমহামন্ত্র" বলা হইয়াছে এবং উহার স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর—এই ত্রিবিধ অর্থ ব্যখ্যাত হইয়াছে।[৫] 'জয়াখ্যসংহিতা', 'পৌষ্করসংহিতা', 'পরমসংহিতা', প্রভৃতিতে উহার উল্লেখ আছে।[৬] কোন কোন বৈখানসাগমেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] পরমভাগবত উপরিচর বসু ব্রাহ্মণদিগের শাপে পৃথিবীর তলদেশে নিপতিত হইয়াও সতত নারায়ণপরায়ণ হইয়া "নারায়ণজপ" করিতেন এবং তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে আনয়ন করেন।[৮] ভগবান্ নারায়ণ ঋষির নিকট উপদেশ প্রাপ্তির পর দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া বহুবৎসর উগ্র তপস্যা করেন এবং নারায়ণপরায়ণ হইয়া নারায়ণের বহু মন্ত্র বিধিবৎ জপ করেন।[৯] মহর্ষি ব্যাস "নারায়ণ উচ্চারণ করত পরম জপ্য (মন্ত্র) জপ করেন।"[১০] ভীষ্মের নিকট নারায়ণীয়াখ্যান শ্রবণ করত যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৬।৩৬

২) মহাভা, ১২।৩৩৬।৩৭'১

৩) মহাভা, ১২।৩৩৬।৪৪ ; নারদপু, ১।৭১।১২৮'২—৯'১ (মহাপুরুষ তে নমঃ পাঠান্তরে)

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৭।৩০ শ্রীধরস্বামীর টীকা

৫) 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা,' ৫৩শ অধ্যায়। উপসংহারে উক্ত হইয়াছে

"নানাবিধমহার্থোঽয়ং জিতন্তাখ্যো মহামনুঃ।
চক্ররূপং চিত্ররূপং বক্তি দেবং সনাতনম্ ॥" (ঐ, ৫৩।৭৬)

আরও উক্ত হইয়াছে যে যাহা প্রোক্ত হইয়াছে তাহা সামান্যই। (৫৪।১)

৬) 'জয়াখ্যাসংহিতা' ১৩।২২৩'২—৪'১ ; আরও দেখ ২০।৩৪৬'২—; 'পরমসংহিতা' ২৩।৪৬ ; ২৯।২১ ; 'পৌষ্করসংহিতা', ৩২।৭৪, ৩৬।৭০ ; পাদ্মসং, ৪।১৩।৪৩ সাত্বতসং, ৭।২৫—৮

৭) যথা দেখ—'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ৩০।২৯'২—৩০'১

৮) মহাভা, ১২।৩৩৬।৬৩—৫ ; আরও দেখ—১২।৩৩৭।২৯—; পরে দেখ।

৯) জজাপ বিধিবন্মন্ত্রান্নারায়ণগতান্ বহূন্।"—(মহাভা, ১২।৩৪৪।২৬'২)

১০) মহাভা, ১২।৩৩৯।১৩৬

ভাইও "জিতং ভগবতা তেন পুরুষেণ", নিত্য ইহা জপ-পরায়ণ হয়।[১] কথিত হইয়াছে যে দীর্ঘতমা নামে সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ; পরন্তু পরে, সনাতন চারি বেদ সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠ করিবার পর, যথাবিধি 'কেশব' নামজপ করত চক্ষুষ্মান্ হন।[২] 'গীতা'তে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ।"[৩] সুতরাং তন্মতে জপ অপর সমস্ত কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।

ইহা বোধ হয় বলা উচিৎ যে জপকে এত মহত্ত্ব প্রদান ভাগবতধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে মনে হয়। কেননা, 'মনুস্মৃতিতেও জপের আত্যন্তিক মহিমা আছে।

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"[৪]

'পরন্তু ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি (অর্থাৎ মুক্তি) লাভ করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। (ততোধিক) অপর কিছু করুক বা না করুক। যে মৈত্র (অর্থাৎ সর্বভূতের মিত্র) তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।' এই বচন 'মহাভারতে'ও আছে।[৫] পরন্তু যাহারা স্বধর্ম পরিত্যাগ করত কেবল ভগবানের নাম জপ করে 'বিষ্ণুপুরাণে' তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ধর্ম সংস্থাপনার্থই হরি জন্মগ্রহণ করেন ; যেহেতু তাহারা ধর্ম পরিত্যাগ করে, সেইহেতু তাহারা হরির দ্বেষী,-পাপী।[৬] যাহা হউক, 'মনুসংহিতায়' আরও উক্ত হইয়াছে যে "(দর্শপৌর্ণমাসাদি) বিধিযজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ। উপাংশু (জপ) শতগুণ . এবং মানস (জপ) সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হয়। বিধিযজ্ঞসমন্বিত যে চারি পাকযজ্ঞ উহারা সকলে (মিলিয়াও) জপযজ্ঞের ষোড়শাংশেরও সমান হইতে পারে না।"[৭] 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বের ১৯৬-৯তম অধ্যায়ে জপের রহস্য, বিধিও ফল বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে জপ দ্বারা জাপক আপন ইচ্ছানুসারে সদ্যোমুক্তি কিংবা ক্রমমুক্তি লাভ করিতে পারে।[৮] পক্ষান্তরে যাহারা যথাবিধি পূর্ণাঙ্গ জপ করে না, কেবল "একদেশক্রিয়াপর," যাহারা অশ্রদ্ধার সহিত জপ করে,—তাহাতে প্রসন্ন ও হর্ষিত হয় না, যাহারা অহঙ্কার পূর্বক জপ করে এবং যে সকল জাপক পরাবমানী-তাহারা সকলেই নরকে গমন করে।[৯] যাহারা কোন ফলবিশেষ লাভের অভিসন্ধিতে,-- অর্থাদি বা ঐশ্বর্যাদি লাভের কামনায় জপ করে, তাহারা সেই সকল বিষয় অবশ্যই পাইয়া থাকে। পরন্তু ঐ কামনা তাহাদের পক্ষে নিরয় স্বরূপই।[১০] সাংখ্য বা বেদান্ত এবং যোগ এই—মার্গদ্বয়ের

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।১৩৪—১৩৫.১ ২) মহাভা, ১২।৩৪১।৫৪—৬

বেদ দ্বারা যাহা হয় না, ভগবন্নামজপ দ্বারা তাহা হয়—ইহাও ঐ বচনে ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিনা বিবেচ্য। যদি ঐ ইঙ্গিত প্রকৃত পক্ষে করা হইয়া ও বা থাকে, তবে তাহাকে অর্থবাদ মনে করা কর্তব্য।

৩) গীতা, ১০।২৫.২ ৪) 'মনুস্মৃতি,' ২।৮৭

৫) আরও দেখ—১২।২৩৮।১২—৩ ;

৬) "অপহায় নিজং কর্ম কৃষ্ণ কৃষ্ণেতিবাদিনঃ।
তে হরেদ্বে ষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ॥"
—(বিষ্ণুপু,

৭) 'মনুস্মৃতি,, ২।৮৫।৬ ৮) মহাভা, ১২।১৯৬।২১—২

৯) মহাভা, ১২।১৯৭।৩—৫ ১০) মহাভা, ১২।১৯৭।৬—

মধ্যে সাংখ্য বা বেদান্ত মার্গে জপত্যাগ বিহিত হইয়াছে। কেননা, "বেদবাদাশ্চ নির্ব্বৃত্তাঃ শান্তা ব্রহ্মণ্যবস্থিতাঃ"।[১] টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে উহার তাৎপর্য এই যে—সমস্ত শ্রুতিবচন পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনপরক, উপাসনাদির বিধিপ্রতিপাদনপরক নহে। অধিকন্তু উহারা নির্ব্বৃত্তি-প্রধান এবং শান্ত। উপাসনা মানসক্রিয়া। সুতরাং তৎপরক হইলে শ্রুতিবচনসমূহকে শান্ত ও নির্ব্বৃত্তিপরক বলা যাইত না। মানান্তর দ্বারা যাহার অবগতি হয় না,—হইতে পারে না বেদান্তবাক্যসমূহ সেই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ সিদ্ধার্থপরক, সেইহেতু উহাদিগেতে জপের অপেক্ষা নাই। তবে এই প্রকার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের উদয়ে জপের সাক্ষাৎ উপকারিতা না থাকিলেও, গৌণ উপকারিতা আছে। কেননা, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের তাৎপর্যজ্ঞানের আলম্বনরূপে জপ পরোক্ষভাবে উপকার করিয়া থাকে। তাই ভীষ্ম অনন্তর বলিয়াছেন যে সাংখ্য এবং যোগ এই উভয়মার্গ জপের সঙ্গে সংশ্রিতও অসংশ্রিতও।[২] ইন্দ্রিয়জয় এবং মনঃসমাধি উভয়ত্র অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য জপের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিপরিচর্যা, মিতাহার, মিতবচন, সত্যবচন; একান্তবাস, তপস্যা, সম, দম, ক্ষান্তি, অনসূয়া, বিষয় প্রতিসংহার এবং ধ্যানও আবশ্যক। এই সকল জাপক ব্রহ্মচারীর "প্রবর্তক যজ্ঞ" অনন্তর তাহার "নিবর্তক কর্ম" আরম্ভ হয়। তখন, "ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত কিছুরই আশ্রয় রহিত "নির্বৃত্তমার্গ" অবলম্বন করত তাহাকে এই সমস্ত নিঃশেষে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্থির আসনে বসিয়া বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিবেক, আর উহাদের ভাবনা করিবেক না। মন দ্বারা সাম্য উৎপাদন করত মনেতেই মন নিবিষ্ট করা কর্তব্য। কল্যাণপ্রদ সাবিত্রীসংহিতা জপ করিতে করিতে ব্রহ্মের ধ্যান করিবেক। অনন্তর সংহিতা জপও সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করত সমাধিগ্রস্ত হইবেক। ধ্যান দ্বারা সমাধি উৎপন্ন করত ক্রমে ধ্যানও পরিত্যাগ কর্তব্য। "সর্বত্যাগী তিনি ঐ অবস্থায় সুখ (আস্বাদনও) ইচ্ছা করে না; প্রাণসমূহ পরিত্যাগ করত ব্রাহ্মী তনুতে সম্যক্ প্রবেশ করে।[৩] উপসংহারে এক জাপক ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়া ভীষ্ম ঐ সমস্ত বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।[৪] বৈদিক সাহিত্যের অপর প্রাচীনতর গ্রন্থেও জপের বিধান আছে।[৫] সুতরাং উহাকে ভাগবতধর্মের বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। //

ভগবৎপ্রসাদ—একান্তধর্ম মতে মুক্তি একমাত্র ভগবৎপ্রসাদলভ্য। নারায়ণ ঋষি বলেন, "ব্রাহ্মণগণ তাঁহা হইতে (অর্থাৎ নারায়ণের প্রসাদে) আত্মার প্রাপ্তব্য বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন।"[৬] পরে তিনি আরও বলিয়াছেন, "স্বর্গবাসী যে সকল দেহীও তাঁহাকে নমস্কার করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রসাদে ('তৎপ্রসাদাৎ') তদাদিষ্ট গতি প্রাপ্ত হন।"[৭] কৃষ্ণ বলেন, "আমি যাহার পূর্ণ আশ্রয় সে সদা সর্বকর্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রসাদে ('মৎপ্রসাদাৎ') শাশ্বত এবং অব্যয়

---

১) মহাভা, ১২।১৯৬।৭ ২) মহাভা, ১২।১৯৬।৮

৩) মহাভা, ১২।১৯৬।৯— ৪) মহাভা, ১২।১৯৯ তম অধ্যায়।

৫) যথা দেখ—'বৃহদ্দেবতা', ৭।১৫, ৯০—১; ৮।১৩৫, ১৩৬; শাঙখায়নশ্রৌতসূত্র, ১।১।১৮; ৩।১৬।১৯—২০ ১৭।১২।৪; ইত্যাদি।

৬) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৮'২; পূর্বে দেখ।

৭) ঐ, ১২।৩৩৪।৩৯

পদ প্রাপ্ত হয়।"[১] "আমাতে চিত্ত নিহিত করিলে আমার প্রসাদে সর্বসঙ্কট পার হইবে।"[২] "হে ভারত! তুমি সর্বভাবে তাঁহারই (ঈশ্বরেরই) শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।"[৩]

এই বিষয়ে নারায়ণীয়াখ্যানে একটা আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে সাত্বতধর্মাচার্য্য পরমভাগবত রাজা উপরিচর বসুর অশ্বমেধ যজ্ঞে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ঐ যজ্ঞে বসুর গুরু সাত্বতধর্মাচার্য্য বৃহস্পতি ঋষি হোতা ছিলেন; প্রজাপতির পুত্র মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত সদস্য ছিলেন; ধনুষাখ্য, রৈভ্য, প্রভৃতি ১৬ প্রসিদ্ধ ঋষি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সাত্বতধর্মের প্রবর্তক চিত্রশিখণ্ডিগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরন্ত একমাত্র বসুই ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন, অপর কেহ পান নাই। তাহাতে বৃহস্পতি ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে বসু এবং মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন যে

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে॥
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।"[৪]

'হে বৃহস্পতি! আপনি কিম্বা আমরা (কেহই স্ববলে) তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহি। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, সেই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়।' অনন্তর একত, দ্বিত, ত্রিত এবং চিত্রশিখণ্ডিগণ বৃহস্পতিকে বলেন যে একদা তাঁহারা ভগবান্ নারায়ণের দর্শনার্থ এবং নিঃশ্রেয়সলাভার্থ সুমেরু পর্বতের উত্তরভাগে ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়া অতি সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করেন। তখন এক অশরীরী বাণী বলে, যে "হে বিপ্রগণ! তোমরা প্রসন্ন অন্তঃকরণে উত্তম তপ করিয়াছ বটে; পরন্ত তোমরা জিজ্ঞাসু ভক্ত। সুতরাং তোমরা কি প্রকারে ভগবান্‌কে দর্শন করিবে?"[৫] অনন্তর ঐ বাণীর নির্দেশানুসারে তাঁহারা ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তচ্চিত্ত হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করেন। তথায় ভগবানের তেজে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয়, তাঁহারা ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহাদের "এই দৈবযোগজ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইল যে যে তপস্যা করে নাই, সে উঁহাকে শীঘ্র দর্শন করিতে সমর্থ হয় না"[৬] সুতরাং তাঁহারা তথায় পুনঃ শত বৎসর তপস্যা করেন। ব্রতাবসানে তাঁহারা শ্বেতদ্বীপবাসী একান্তী পুরুষগণকে দেখিতে পাইলেন বটে, পরন্ত, তথাপিও, ভগবানের মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইলেন না। এক অশরীরী দেবতা তাঁহাদের বলেন,

"ন স শক্যস্ত্বভক্তেন দ্রষ্টুং দেব কথঞ্চন॥
কামং কালেন মহতা একান্তিত্বমুপাগতৈঃ॥
শক্যো দ্রষ্টুং স ভগবান্ প্রভামণ্ডলদুর্দশঃ।"[৭]

অর্থাৎ যাহারা একান্তভক্ত নহে, তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিলেও ভগবান্‌কে দর্শন করিতে কোন

---

[১] গীতা, ১৮।৫৬
[২] ঐ, ১৮।৫৮'১
[৩] ঐ, ১৮।৬২
[৪] মহাভা, ১২।৩৩৬।১৯'২—২০'১
[৫] ঐ, ১২।৩৩৬।২৬'২—২৭'১
[৬] ঐ, ১২।৩৩৬।৩৩'২—৩৪'১
[৭] ঐ, ১২।৩৩৬।৫৪—৫৫'১; আরও দেখ ৩৩৯।১৩

প্রকারে সমর্থ হয় না। দীর্ঘ কাল ভগবানের ভক্তি করিতে করিতে যাহারা একান্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই তাঁহার দর্শন পায়। উপসংহারে তাঁহারা বৃহস্পতিকে বলেন যে ঐ প্রকার কঠোর তপস্যা এবং হব্যকব্যসমূহ দ্বারাও যখন তাঁহারা নারায়ণের দর্শন পান নাই, তখন তিনি (বৃহস্পতি) কি প্রকারে তাঁহার দর্শন পাইবেন?[১] যাহা হউক, এই প্রকারে সান্ত্বনা লাভ করিয়া বৃহস্পতি সকলের অনুরোধে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে একান্তধর্ম মতে (১) যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্‌কে দেখা যায় না, (২) তপস্যা দ্বারা ভগবান্‌কে দেখা যায় না, (৩) একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে দেখা যায়।[২] এই অনুমান সম্যক্‌রূপে সত্য নহে। কেননা, তাহাতে মনে হইতে পারে যে একান্তধর্ম মতে ভগবদ্দর্শনের জন্য যজ্ঞ ও তপস্যা করা বৃথা। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে তন্মতে যজ্ঞ ও তপস্যা ভগবদ্দর্শনে আবশ্যক বটে, পরন্তু যথেষ্ট নহে। এমন কি যাহাদের ভক্তি একান্তিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, সেই সকল ভক্তও তাঁহার দর্শন পায় না।[৩] একতাদি ঋষিগণ কঠোর তপস্বী হইলেও জিজ্ঞাসু ভক্ত ছিলেন। সেইহেতু তাঁহারা ভগবানের দর্শন পান নাই। অশরীরী বাণী তাহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। বসুর ভক্তি একান্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই তিনি দর্শন পান। তিনি যজ্ঞও করিতেন। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে একান্তীভক্তের পক্ষেও যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া করা নিষিদ্ধ নহে। যাহা হউক, ঐ আখ্যায়িকার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ যাহাকে কৃপা করিয়া দর্শন দেন, একমাত্র সেই তাঁহার দর্শন পায়, অপরে নহে। নর এবং নারায়ণ ঋষি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা হইয়াছে,—তপস্যার তেজ হেতু তাঁহারা দেবতাদিগেরও দুর্নিরীক্ষ্য ছিলেন; তাঁহারা যাহার উপর প্রসাদ করিতেন কেবল সেই তেজোময় তাঁহাদিগকে ("দেবৌ") দর্শন করিতে সমর্থ হইত।[৪]

মহর্ষি বৈশম্পায়ন পরিষ্কার বলিয়াছেন,

"জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকস্তু স বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষে চ নিশ্চিতঃ॥"[৫]

'যে জন্মমরণশীল পুরুষের প্রতি মধুসূদন দৃষ্টিপাত করেন, সেই সাত্ত্বিক বলিয়া বিজ্ঞেয়। সে মোক্ষে নিশ্চিত হয়'

"নারায়ণেন দৃষ্টস্তু প্রতিবুদ্ধো ভবেৎ পুমান্।
এবমাত্মেচ্ছয়া রাজন্ প্রতিবুদ্ধো ন জায়তে॥"[৬]

'হে রাজন্! নারায়ণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলেই পুরুষ প্রতিবুদ্ধ হয়। নিজের ইচ্ছায় কেহ প্রতিবুদ্ধ হইতে পারে না।' এই প্রকার মতবাদের আধার নিম্নোক্ত শ্রুতি,—

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৬।৫৮·২—৫৯·১

২) R. G. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, Strassburgs 1918, p. 7

৩) অশরীরী দেবতা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন ৪) মহাভা, ১২।৩৩৪।১২-১৩·১ ৫) ঐ, ১২।৩৪৮।৭৩

৬) ঐ, ১২।৩৪৮।৭৫

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"[1]

'প্রবচন, মেধা কিম্বা বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন সেই আত্মাকে লাভ করিতে পারে,—তাহারই নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।' '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, ভগবানের মায়া বশতঃই জীব আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নানা গুণ ও কর্ম নিবন্ধন সংসারমার্গে ঘুরিতেছে; সেই কারণে তাঁহার মহৎ অনুগ্রহ ব্যতীত অপর কোন উপায়ে তাহার নষ্টস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে না;—তাহার স্বরূপপ্রাপ্তি হইতে পারে না।[2]

ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, সেই তাঁহার দর্শন পায় এবং মুক্তিলাভ করে,—এই কথা সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইলেও ইহা জিজ্ঞাস্য থাকে যে জীবের উপর ভগবানের কৃপা কি বিনা হেতুতেই, অর্থাৎ জীবের কোন সাধন ব্যতীতই হয়? না তদর্থে জীবকে সাধনও করিতে হয়? এই বিষয়ে একান্তধর্ম কি বলে? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে যদি একান্তধর্ম মতে সাধন ব্যতীত স্বতঃই ভগবৎপ্রসাদ এবং মুক্তি লাভ হইত, তবে উহার শাস্ত্রসমূহে নানাবিধ সাধনপদ্ধতিসমূহ বিবৃত হইত না, উহার প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ নারায়ণ ঋষিকে, তথা নর ঋষিকে এবং নারদব্যাসাদি অপর আচার্য্যগণকে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া কঠোর তপস্যা করিতে হইত না। নারায়ণীয়াখ্যানেই আছে যে একতাদি মহর্ষিগণের শ্বেতদ্বীপে এই বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় যে যে তপস্যা করে নাই সে ভগবানের দর্শন পায় না এবং তদনুসারে শত বৎসর তপস্যা করিয়া তাঁহারা সাধনপথে অগ্রসরও হন।[3] ততোধিক কথিত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপবাসী মহাভাগ্যবান্ সিদ্ধ মহাত্মাগণ, যাঁহারা ভগবানের একান্তভক্ত, তাঁহারাও "পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া জোড়হস্তে নিত্য ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রণব) জপ করেন; ঐ সকল মহাত্মাগণ যে জপ করেন, তাহা 'মানস জপ'।

'তেনৈকাগ্রমনস্ত্বেন প্রীতো ভবতি বৈ হরিঃ।'

"তদ্দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয় এবং সেইহেতু হরি নিশ্চয় প্রীত হন।"[4] তাঁহারাও ভগবান্‌কে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করেন, উপহারাদির দ্বারা পূজা করেন এবং স্তুতি করেন।[5] —তাঁহারাও পরম ভক্তি সহকারে মন, বাণী এবং কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করেন;[6] তাঁহারাও একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করেন।[7] তাঁহাদিগকেও যখন ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিতে সাধন করিতে হয়, তখন অপরের কথা আর কি? গীতায় কৃষ্ণ পরিষ্কার বলিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাতে নিত্যযুক্ত তাঁহাদিগকেই তিনি কৃপা করিয়া জ্ঞান দেন।[8] তাই শ্রুতিতে আছে যে তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে শ্বেতাশ্বতর ঋষি ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন।[9]

---

১) কঠউ, ১।২।২২ ; মুণ্ডকউ, ৩।২।৩ ২) (বিষ্ণু)ভাগ, ৩।৩১।১৫

৩) পূর্বে দেখ। ৪) মহাভা, ১২।৩৩৬।৩৬-৩৭·১ ৫) ঐ, ১২।৩৩৬।৪১-৪৬·১

৬) ঐ, ১২।৩৩৬।৪৬·২-৪৭·১ ; আরও দেখ—৩৩৫।১২·১ ৭) ঐ, ১২।৩৩৯।১৯

৮) পূর্বে দেখ। ৯) শ্বেতউ, ৬।২১·১

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বারংবার উক্ত হইয়াছে যে মনুষ্যের উপর ভগবানের কৃপা বিনা কারণে হয় না, তাহার ভক্ত্যাদি সাধন হেতুতেই হয়। যথা, পরমভাগবত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন যে ভগবান্ সর্ব প্রাণীর আত্মা, সেই হেতু সুহৃৎ অর্থাৎ সদা অনুগত তথাপি

"সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥"[১]

কল্পবৃক্ষের ন্যায় তাঁহার প্রসাদ সম্যক্ সেবার দ্বারাই লাভ হয়। সেবার অনুরূপেই জীবের প্রতি তাঁহার কৃপার উদয় হয়। উহাতে জাতিগত বা অপর কোন প্রকারের উচ্চতা বা নীচতা ভেদের বিচার নাই। মহাত্মা উদ্ধব বলিয়াছেন, কোন নিমিত্ত বিনা স্বতঃই মানুষের জ্ঞান, ভক্তি কিংবা বৈরাগ্য হয় না। সেইহেতু বিদ্বান্‌গণ উহাদের নিমিত্তসমূহ (অর্থাৎ সাধনসমূহ) নির্দেশ করিয়াছেন।[২] এই বিষয়ে কৃষ্ণের উক্তি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন, "অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষের আত্মজ্ঞান স্বতঃ (হওয়া) সম্ভব নহে। সেই হেতু অন্য তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদ হন। ঐ বিষয়ে পুরুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই। সুতরাং অন্য কল্পনা অপার্থ"[৩] এই বচনের শেষাংশের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত। এইরূপ ভগবৎ-প্রসাদ জ্ঞানিপ্রসাদই,—ভগবান জ্ঞানিরূপে প্রসাদ করেন। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা দ্বারাই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী হইতে জ্ঞান লাভ করা যায়।[৪]

অহিংসা—পূর্বে নিষ্কামকর্ম-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে একান্তধর্মে অহিংসাকেও অনেক মহিমা দেওয়া হয়। পরে কর্মযোগ-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে তন্মতে অহিংসা-ধর্মযুক্ত কর্ম দ্বারাই ভগবান্ নারায়ণ প্রীত হন। এখানে সে বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। নারায়ণীয়াখ্যানে কথিত আছে যে সাত্বতধর্মাচার্য্য পরম ভাগবত রাজা উপরিচর বসু "সর্বভূতে অহিংসক" ছিলেন।[৫] তাঁহার অশ্বমেধ মহাযজ্ঞেও পশুবধ হয় নাই ("ন তত্র পশুঘাতোঽভূৎ")।[৬] "তিনি সর্বকর্মে অহিংস্র, শুচি, অক্ষুদ্র এবং নিষ্কাম বলিয়া সংস্তুত" ছিলেন।[৭] তাঁহার ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগ্রন্থানুসারে সমস্ত যজ্ঞভাগ কল্পিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাগ পুরোডাশ গ্রহণ করেন।[৮] অনন্তর এক সময়ে দেবতাগণ এবং ঋষিগণের মধ্যে যজ্ঞ সম্বন্ধে এক বিবাদ উপস্থিত হয়।[৯] বেদে আছে, "অজেন যষ্টব্যং" (অর্থাৎ 'অজ দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত')। দেবতাগণ বলেন, ঐখানে 'অজ' শব্দের অর্থ 'ছাগল', অপর কোন পশু নহে। সুতরাং, তাঁহাদের মতে, যজ্ঞে ছাগ-বধ কর্তব্য। অপর পক্ষে ঋষিগণ বলেন, ঐখানে 'অজ' শব্দের অর্থ 'বীজ' (—যে বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে,

---

[১] (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৯।২৭

[২] "নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘ সূরিভিঃ।
স্বতো জ্ঞানং কুতঃপুংসাংভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ ॥"—(ঐ, ৩।৭।৩৯)

[৩] ঐ, ১১।২২।১০-১

[৪] গীতা,

[৫] মহাভা, ১২।৩৩৫।২০·২

[৬] ঐ, ১২।৩৩৫।১০·২

[৭] ঐ, ১২।৩৩৫।১১

[৮] ঐ, ১১।৩৩৫।১২-৩

[৯] ঐ, ১২।৩৩৭ তম অধ্যায় ; ১৪।৯১।৮-২৩

সুতরাং যাহা হইতে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে না, সেই বীজই 'অজ')। সুতরাং, তাঁহাদের মতে, যজ্ঞে ছাগল বা অপর কোন পশু বধ করা উচিত না। তাঁহারা বলেন, "হে দেবগণ, যাহাতে পশু বধ করা হয়, তাহা সাধুগণের ধর্ম নিশ্চয় নহে। এই কৃতযুগ শ্রেষ্ঠ যুগ। (সুতরাং এই যুগে) কি প্রকারে পশুবধ হইবে?"[১] এইরূপে দেবগণ এবং ঋষিগণের মধ্যে যজ্ঞে পশুবধের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে রাজা বসু ঘটনাক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। "শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী ও দানপতি এবং সর্বভূতহিতপ্রিয়" তিনি যথার্থই বলিবেন এই মনে করিয়া উভয় পক্ষ তাঁহাকে ঐ বিবাদে মধ্যস্থ মানেন। উভয় পক্ষের মত জানিয়া লইয়া বসু দেবতাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া ("পক্ষসংশ্রয়াৎ") বলেন, অজ অর্থাৎ ছাগল দ্বারাই যজ্ঞ কর্তব্য। তাহাতে ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন। তদ্ধেতু বসু ভূগর্ভে প্রবেশ করেন। সেখানে থাকিয়াও তিনি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া নারায়ণ-মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। "অনন্যভক্ত, নারায়ণপরায়ণ, জিতাত্মা এবং সাধু" বসুর ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ নারায়ণ কৃপা করত তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান এবং তথা হইতে তিনি মুক্ত হন।[২] বসুর এই আখ্যায়িকা হইতে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধ হয় যে প্রাচীন ভাগবতধর্মে সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। সেই সকল ব্রাহ্মণগ্রন্থোক্ত বিধান অনুসারে যথাযথ অনুষ্ঠিত হইত। পরন্তু ভাগবতধর্ম তাহাতে এইমাত্র পরিবর্তন অবলম্বন করে যে ব্রাহ্মণোক্ত পদ্ধতিতে যেখানে যেখানে পশুবধের বিধান ছিল, ভাগবতধর্মে তত্তৎস্থলে পশুবধ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং পশুর পরিবর্তে ধান্যপুরোডাশাদি প্রদান করা হইত। ঐ বিষয়ে প্রাত্যক্ষিক প্রমাণ আরও আছে। নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে লোকমধ্যে সমস্ত যজ্ঞক্রিয়া প্রচার করিতে আদেশ করেন।[৩] সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে "এখন কৃতযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল প্রবর্তিত হইয়াছে। এই যুগে যজ্ঞীয় পশুসমূহ অহিংস্য থাকিবে ('অহিংস্যা যজ্ঞপশবো যুগেঽস্মিন্')। তাহার অন্যথা হইবে না।"[৪] "অনন্তর ত্রেতাযুগ (প্রবর্তিত হইবে)। তখন ত্রয়ী (=তিন বেদ বা ধর্মের তিন পাদ) বর্তমান থাকিবে। তখন প্রোক্ষিত পশুসমূহ যজ্ঞে বধ করা হইবে।"[৫] পরে দেবতাদিগের ও ঋষিদিগের প্রার্থনায় তিনি তাঁহাদিগকে বলেন যে কলিকালে ধর্মের এক পাদ মাত্র অবশেষ থাকিবে, তখন "যথায় বেদসমূহ এবং যজ্ঞসমূহ, তপঃ, সত্য, দম ও অহিংসা ধর্ম-সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হইবে তোমাদের সেই দেশে বাস কর্তব্য। তাহা হইলে অধর্ম তোমাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ করিবে না।"[৬] কালদৃষ্টিতে এই সকল বচন বসুর সময়ের পূর্বেকার বলিয়া বোধ হয়। কেননা, এই গুলিতে সত্যযুগে যজ্ঞে পশু প্রোক্ষণের বিধান আছে, কেবল বধই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বসুর সময়ে যজ্ঞে পশুপ্রোক্ষণও বন্ধ হইয়াছিল; তখন পশুর পরিবর্তে ধান্যপুরোডাশাদি প্রদত্ত হইত। যাহা হউক ঐ নূতনত্বের অবতারণা হেতু বৈদিক যজ্ঞ নিষ্ফল হয় নাই। বসুর পশুহিংসা-রহিত অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বয়ং ভগবানের উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যজ্ঞভাগ পুরোডাশ গ্রহণ

---

[১] মহাভা, ১২।৩৩৭।৬ [২] ঐ, ১২।৩৩৬।৬৩-৫ ; ৩৩৭।২৯-৪০

[৩] মহাভা, ১২।৩৪০।৮০ [৪] ঐ, ১২।৩৪০।৮২ [৫] ঐ, ১১।৩৪০।৮৪ [৬] ঐ, ১২।৩৪০।৮৮'২-৮৯

হইতে তাহা প্রকৃষ্ট রূপে সিদ্ধ হয়। ঐ আখ্যায়িকা হইতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও জানা যায় যে বসুর সময়েও ঐ নূতনত্ব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল না। ঐ দেব-ঋষি-বিবাদের দেবগণ প্রাচীনযজ্ঞপন্থী এবং ঋষিগণ নবীনযজ্ঞপন্থী বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তখনও প্রাচীনপন্থীদিগের এবং নবীনপন্থীদিগের যজ্ঞে পশুবধের কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে বাদ-বিবাদ হইত।[১] বসুর ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন অহিংসাবাদী ভাগবতধর্মাচার্য্যকে ঐ বিবাদে হিংসাবাদী প্রাচীনপন্থীগণের সম্মতি দিতে দেখিয়া অধিকন্তু মনে হয় যে তখনও প্রাচীন পক্ষ সমাজে খুব প্রবল ছিল; নবীন অহিংসাবাদিগণ তখনও প্রাচীন হিংসাবাদিগণের নিকট কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে থাকিত। অন্যথা বসুর ন্যায় "সম্ভাবিত", "সত্যধর্ম্মপরায়ণ", "ধর্মাত্মা এবং সংশিতব্রত" ব্যক্তির ঐ প্রকার বিপরীত কার্য্যের কারণ আর কি বলা যায়?[২] 'বৃদ্ধহারীতসংহিতা' নামক বেদানুসারী বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞে যথাবিধি পশুহিংসার বিধান আছে, তদ্ব্যতীত অন্যত্র পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।[৩]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণে আছে—বেদোক্ত কর্মসমূহ অবশ্যই কর্তব্য। যে অজ্ঞ এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐ সকল কর্ম করে না, সে বিকর্ম রূপ অধর্ম হেতু বারংবার জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হয়।[৪] পরন্তু সাধারণ লোকে উহাদের প্রকৃত রহস্য না জানিয়া বিপরীত আচরণ করে, আপন ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পশুবধ করে।[৫] মদ্য, মাংস এবং মৈথুনের প্রতি লোকের জন্মগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে মাত্র; বেদে উহাদের প্রতি কোন চোদনা নাই।[৬] বৈদিক যজ্ঞাদিতে পশুর আলভন (বা স্পর্শ) মাত্রের বিধান আছে, হিংসার নহে।[৭] পশুহিংসা-নিবারণার্থ তথায় এই ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, যে ইহকালে পশুহিংসা করে, পরকালে সেই পশু তাহাকে ভক্ষণ করে; নশ্বর এই শরীরাদির প্রতি মোহমমতা বশতঃ যে অন্যশরীরস্থ স্বীয় আত্মা ভগবান্ হরিকে দ্বেষ করে সে নিশ্চয় অধোগতিপ্রাপ্ত হয়।[৮] কৃষ্ণও উদ্ধবকে সেই প্রকার বলেন।[৯] নারায়ণীয় সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যায় নারদ বলেন, যাহারা ধর্মের তত্ত্ব জানে তাহারা শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে মাংস প্রদান করিবেক না এবং স্বয়ংও মাংস খাইবেক না। মুন্যন্ন (অর্থাৎ মুনিজনোচিত ব্রীহি প্রভৃতি অন্ন) দ্বারা পিতৃগণের যেমন পরা প্রীতি হয়, পশুহিংসা

---

১) মহাভা, ১৪৷৷৯২৷৪—দেখ। মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞে অহিংসার প্রচারক ছিলেন। প্রাচীনপন্থী ঋষিগণ তাঁহাকে বলেন,

"ভবতঃ সম্যগিষ্টা তু বুদ্ধির্হিংসাবিবর্জিতা।
এতামহিংসাং যজ্ঞেষু ব্রূয়াস্ত্বং সততং প্রভো।"—১৪৷৯২৷৩৩'২-৩৪'১)

২) নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে—নারায়ণের পরম ভক্ত বসু দেবতাদিগের রাজা ইন্দ্রের সখা ছিলেন; দেবরাজ তাঁহাকে আপনার সাথে "একশয্যাসন" দিতেন। (ঐ, ১২৷৩৩৫৷১৭, ২২) অন্যত্র আছে যে ইন্দ্র তাঁহাকে এক বিমান দিয়াছিলেন, যাহাতে চড়িয়া তিনি আকাশ পথে বিচরণ করিতেন; তাহাতে তাঁহার 'উপরিচর' খ্যাতি হয়। বলা যাইতে পারে যে সেই কারণেই তিনি দেবতাদিগের পক্ষপাত করিয়াছিলেন।

৩) "ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি যজ্ঞেষু বিধিনা বিনা।"
—(বৃদ্ধহারীতসংহিতা, ৮৷১৫'১ ('স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ', ২৭৯ পৃষ্ঠা))

৪) (বিষ্ণু) ভাগ, ১১৷৩৷৪৫ ৫) ঐ, ১১৷৫৷৮ ৬) ঐ, ১১৷৫৷১১ ৭) ১১৷৫৷১৩'১

৮) ঐ, ১১৷৫৷১৪-৫ ৯) ঐ, ১১৷২১৷২৩; ২৯-৩০ তম শ্লোক বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দ্বারা তেমন হয় না। মন, বাণী কিম্বা শরীর দ্বারা প্রাণিগণকে কষ্ট প্রদান পরিত্যাগের মত পরম ধর্ম সদ্ধর্মাভিলাষী মনুষ্যগণের নাই। সেইহেতু কোন কোন যজ্ঞবিত্তম জ্ঞানী নিষ্কাম হইয়া কর্মময় যজ্ঞ পরিত্যাগ করত জ্ঞানোদ্দীপ্ত আত্মসংযম-যজ্ঞ করেন। দ্রব্যময় যজ্ঞকারী মনুষ্যকে দেখিয়া পশুগণ এই ভাবিয়া ভীত হয় যে অতত্ত্বজ্ঞ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিপরায়ণ এবং অকরুণ এই ব্যক্তি আমাদিগকে নিশ্চয় হত্যা করিবে। সেইহেতু ধর্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত মুন্যন্ন দ্বারাই সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিদিন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিবেক।[১]

'অনুগীতা'তে কৃষ্ণ অহিংসার অতি প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "অহিংসা পরমোধর্মো হিংসা চাধর্মলক্ষণা" ('অহিংসা পরমধর্ম, আর হিংসা অধর্ম')।[২] "(বিদ্বান্‌গণের) মত এই যে অহিংসা সর্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠতম কৃত্য। উহা অনুদ্বিগ্ন পদ এবং ধর্মের বরিষ্ঠ লক্ষণ।"[৩] পক্ষান্তরে যাহারা হিংসাপরায়ণ তাহারা নিশ্চয় নরকে গমন করে।[৪]

ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত মতে ভগবান্ বাসুদেবই জীবরূপে অবস্থিত আছেন। সুতরাং কোন জীবকে হিংসা করিলে প্রকৃত পক্ষে বাসুদেবকেই হিংসা করা হয়। প্রত্যেক জীব নিজেও যখন বাসুদেব, তখন অপর জীবকে হিংসা করিলে প্রকৃত পক্ষে তাহার নিজেকেই হিংসা করা হয়। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেই ভাগবতধর্মে জীব-হিংসা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, অহিংসা-ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। সাধারণ মনুষ্যের ঐ তত্ত্ববোধ নাই। পরন্তু জ্ঞানী বা একান্তী ভক্ত তাহা সম্যক্ জানেন,—তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে "বাসুদেবঃ সর্বং" ('সমস্তই বাসুদেব')। সেইহেতু তাঁহারা সর্বত্র সমদর্শী হন এবং কাহাকেও হিংসা করেন না 'গীতা'তে আছে

"সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"[৫]

'সর্বত্র একভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে সমভাবে দর্শন করিয়া (জ্ঞানী মনুষ্য) নিজে নিজেকে হিংসা করেন না। সেই তিনি পরা গতি (অর্থাৎ মুক্তি) প্রাপ্ত হন।' ভগবান নৃসিংহও সেই প্রকার বলিয়াছেন, প্রশান্ত এবং সমদর্শী ভক্তগণ উচ্চনীচ সর্বপ্রাণীতে সমভাবে আত্মদৃষ্টি হেতু কাহাকেও হিংসা করে না।[৬] ভগবানের উপাসনার গীতাশাস্ত্রসম্মত প্রশস্ত উপায়সমূহের অন্যতম সর্বভূতে নির্বৈরতা।[৭] তন্মতে যে ভক্ত কোন প্রাণীর প্রতি দ্বেষ রাখে না, পক্ষান্তরে সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করে এবং সকল দুঃখীর প্রতি করুণাবান্, সে ভগবানের প্রিয়।[৮] মহর্ষি অগস্ত্য সতত যজ্ঞে অহিংসা প্রচার করিতেন।[৫'১] //

সর্বভূতহিতে রতি—ভাগবতধর্মিগণ কেবল যে কোন প্রাণীকে হিংসা করেন না, তাহা নহে, অধিকন্তু তাহারা সর্বপ্রাণীর কল্যাণ সাধনে যথাসাধ্য তৎপর থাকেন। তাই একান্তধর্মের মাহাত্ম্য খ্যাপন প্রসঙ্গে মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে ঐ ধর্মিগণ অহিংসক এবং সর্বভূতহিতে

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১৫।৭-১১ ২) মহাভা, ১৪।৪৩।২১'১ ৩) ঐ, ১৪।৫০।২'২-৩'১ ৪) ঐ, ১৪।৫০।৪
৫) গীতা, ১৩।২৮ ৬) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।১০।১৯-২০ ৭) গীতা, ১।৫৫
৮) ঐ, ১২।১৩ ৯) মহাভা, ১৪।৯২।৩৩-৪

রত।[১] গীতায় আছে যে এমন কি অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকগণও সর্বভূতহিতে রত থাকিবেন।[২] যাঁহাদের পাপাদি দোষ বিনষ্ট হইয়াছে, সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত হইয়াছে এবং যাঁহারা সর্বভূতহিতে রত, সেই সকল ঋষিগণ (অর্থাৎ সম্যগ্‌দর্শিগণ) ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।"[৩] আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন যে "সর্বভূতহিতে 'রত" অর্থ "সর্বভূতের আনুকুল্যে রত অর্থাৎ অহিংসক"। স্থতরাং তন্মতে 'সর্বভূতহিত' ও 'অহিংসা'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 'মহাভারতে'ও আছে, "অহিংসা ও সত্যবচন সর্বভূতের পরম হিত।"[৪] পরন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কিছু পার্থক্য আছে। তাই উহাদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইয়া থাকে। নারায়ণীয়াখ্যানে কথিত আছে যে রাজা উপরিচর বসু যে কেবল "সর্বভূতে অহিংসক" ছিলেন, তাহা নহে, তিনি "সর্বভূতহিতপ্রিয়"ও ছিলেন।[৫] (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে আছে, আত্মমায়া দ্বারা মোহিত প্রাণিগণ পরস্পরের প্রতি বদ্ধবৈর ; যে মনুষ্য উহাদের উপর কৃপা করে, সর্বাত্মা হরি তাহার উপর প্রসন্ন হন।[৬] শুকদেব বলিয়াছেন যে জীবের দুঃখে দুঃখী হওয়াই সর্বাত্মা হরির পরম আরাধনা।[৭] প্রকৃত কথা এই যে ভাগবতধর্ম মতে ভগবান্ সর্বভূতের সুহৃৎ ;[৮] স্থতরাং সর্বভূতহিতে রতি ভগবদ্ভাবেরই অনুকৃতি মাত্র। অসুরবালকগণকে ভাগবতধর্মের উপদেশ দিতে গিয়া প্রহ্লাদ বলেন, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সর্বপ্রাণীতে একই পরমাত্মা বর্তমান—তিনিই সর্বপ্রাণী। "সেইহেতু আসুরভাব পরিত্যাগ করত সর্বপ্রাণীতে দয়া এবং সৌহৃদ্য কর, যাহাতে ভগবান্ তুষ্ট হন।"[৯]

"ভাগবতা নিত্যং ভূতানুগ্রহকাতরাঃ"[১০]

অসাম্প্রদায়িকতা—প্রাচীন ভাগবতধর্মে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। যদিও তন্মতে বাসুদেব, নারায়ণ বা বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, স্থতরাং তিনি সকলেরই উপাস্য এবং তাঁহারই উপাসনা শ্রেষ্ঠ তথাপি তাহাতে অন্য দেবতার উপাসনার নিন্দা করা হইত না, বরং মনে করা হইত যে সর্বদেবতার পূজা নারায়ণেরই পূজা। নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে ব্রহ্মা নারায়ণের প্রসাদজ এবং রুদ্র তাঁহার ক্রোধজ।[১১] ভগবান্ নারায়ণ নাকি ব্রহ্মাকে এই বর দেন যে তিনি সর্বলোকের অধ্যক্ষ হইবেন ; তাঁহার দ্বারা কৃত মর্যাদা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না ; তিনি সুর, অসুর পিতৃ, ঋষি, প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের উপাস্য হইবেন এবং বরাকাঙ্ক্ষিগণের বরদাতা হইবেন।[১২] তাহার তাৎপর্য এই যে প্রাচীন ভাগবতধর্মিগণ ব্রহ্মার উপাসনার বিরোধী ছিলেন না ; বরং উহার সমর্থক ছিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদি- দেবগণ এবং ঋষিগণ সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ হরির পূজা করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বপ্রাণিগণের নিত্য সেব্য এবং পূজ্য ; এবং বিষ্ণুই হব্যদ, শরণদ, বরদ ও হব্যকব্যভুক্, স্থতরাং তিনি সকলের নমস্য।[১৩] এই রূপে নারায়ণের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিলেও তিনি বলিয়াছেন যে "কপর্দী, জটিল, মুণ্ড,

---

১) পূর্বে দেখ ২) গীতা, ১২।৪·২ পূর্বে দেখ)। ৩) ঐ, ৫।২৫ ৪) মহাভা, ৩।২০৬।৭৩

৫) ঐ, ১২।৩৩৭।৮·২ ৬) (বিষ্ণু)ভাগ, ৮।৭।৩৯·২—৪০·১ ৭) ঐ, ৮।৭।৪৪

৮) যথা দেখ—গীতা, ৫।২৯ ; ৯।১৮ ৯) (বিষ্ণু)ভাগ, ৭।৬।২৪ ১০) ঐ, ৬।৫।৩৯·১

১১) মহাভা, ১২।৩৩৫।৪১ ; ৩৩৯।৫০—১ ; ৩৪১।১৭—৯ ; ৩৮২।১২৮ ১২) ১২।৩৩৯।৬২—৪

১৩) ঐ, ১২।৩৪১।৩০·২—৩৩·১

শ্মশানবাসী, উগ্রব্রতচারী, পরম দারুণ যোগী, দক্ষযজ্ঞহর এবং ভগনেত্রহর রুদ্র নারায়ণাত্মকই,"[১]

"তস্মিন্ হি পূজ্যমানে বৈ দেবদেবে মহেশ্বরে ॥
সম্পূজিতো ভবেৎ পার্থ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ।"[২]

'হে পার্থ! দেবদেব সেই মহেশ্বর পূজিত হইলে প্রভু নারায়ণ দেব নিশ্চয় সম্যক্ পূজিত হন।' পরে তিনি বলিয়াছেন যে রুদ্র তাঁহার আত্মা; শিবপূজা সংসারে প্রচলিত করিতেই তিনি স্বয়ং ঈশান ও বরদ শিবের পূজা করেন, কেননা, লোকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু তিনি শিবের পূজা না করিলে কেহ তাঁহার আত্মা শিবের পূজা করিবে না।[৩] একই সত্ত্ব রুদ্র ও নারায়ণ—এই দ্বিধাকৃত রূপে ব্যক্তিত্ব হইয়া সংসারে সর্বকর্মে বিচরণ করিতেছে; যে রুদ্রকে জানে সে নারায়ণকেও জানে এবং যে রুদ্রের অনুগত, সে নিশ্চয় নারায়ণেরও অনুগত।[৪] কিঞ্চিৎ পরে তিনি আরও বলিয়াছেন,

"ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠং চ যাশ্চান্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
প্রবুদ্ধচর্য্যাঃ সেবন্তো মামেবৈষ্যন্তি যৎ পরম্ ॥"[৫]

'যাহারা প্রবুদ্ধ এবং সেইভাবে আচরণকারী[৬] তাহারা ব্রহ্মাকে শিবকে কিংবা অপর যাহারা দেবতা বলিয়া (শাস্ত্রে) স্মৃত হন (তাঁহাদিগের কাহাকেও) উপাসনা করিয়া পরমতত্ত্ব আমাকেই পায়।' মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, "সর্বলোকে যে সকল দৈব ও পিতৃকর্ম কৃত হয়, যে সকল দান প্রদত্ত হয় এবং যে সকল তপস্যা কৃত হয়, তৎসমস্তেরই অবলম্বন বিষ্ণুই। কেননা, তিনিই ঐশ্বর বিধিতে (অর্থাৎ সর্বরূপে) আস্থিত। সর্বভূতকৃতাবাস (অর্থাৎ সর্বভূতে তিনি আবাস করিয়াছেন; বলিয়া তিনি 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।"[৭] ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্তই বাসুদেব। সুতরাং সমস্ত দেবতাও প্রকৃত পক্ষে বাসুদেবই। অথবা অপর কথায়, সমস্ত দেবনাম বাসুদেবেরই বিভিন্ন নামমাত্র। বেদে তাহা পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ইত্যাদি।[৮] সুতরাং যে কোন দেবতারই পূজা করা যাক্ না কেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে বাসুদেবেরই পূজা হইয়া থাকে। অতএব ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত প্রথম কর্মযোগেরই এক রূপবিশেষ মাত্র।

গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সেই সেই কামনা দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতি (অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরার্জিত সংস্কার) দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই সেই (দেবতার আরাধনা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ) নিয়ম অবলম্বন করত অন্যদেবতার শরণ গ্রহণ করে। যে যে ভক্ত যে যে (দেবতা) রূপকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার তাহার সেই সেই শ্রদ্ধাকেই আমি অচলা করিয়া দিই। সে আমার দ্বারা অচলা কৃত) সেই শ্রদ্ধাতে যুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনায় তৎপর হয় এবং তাঁহা হইতে (তাহার অভীষ্ট) কামসমূহ প্রাপ্ত হয়, কেননা, সেইগুলি আমারই দ্বারা বিহিত। পরন্তু স্বল্পবুদ্ধি লোকদিগের সেই ফল নাশবান্ হয়।

---

১) ঐ, ১২।৩৪১।২০·২—২২·১ ২) ঐ, ১২।৩৪১।২২.২—২৩·১

৩) ঐ, ১০।৩৪১।২৪—২৬·১ ; ২৮—৩০·১ ৪) ঐ, ১২।৩৪১।২৬·২—২৭ ৫) ঐ, ১২।৩৪১।৩৬

৬) এইখানে ১২।৩৪১।৩৪ শ্লোকের (পূর্বে দেখ) অনন্যদেবতা একান্তী বা প্রতিবুদ্ধ ভক্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৭) ঐ, ১২।৩৪৭।৯৩—৪ ৮) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী', ১ম খণ্ড, দেখ।

দেবতোপাসকগণ দেবগণের নিকটে গমন করে, আর আমার ভক্তগণ আমার নিকটে আগমন করে।[১] পরে তিনি আবার বলিয়াছেন,

> "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥"[২]

'হে কৌন্তেয়! যাহারা অন্য দেবতাগণের ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তাঁহাদের যজন করে, তাহারাও (প্রকৃত পক্ষে) আমারই যজন করে, (পরন্ত) অবিধিপূর্বক (করে)।' "কেননা, সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং স্বামী আমিই। পরন্ত তাহারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানে না; সেই জন্য তাহাদের পতন হয়। দেবব্রতগণ দেবতাদিগের নিকট, পিতৃব্রতগণ পিতৃগণের নিকট, ভূতগণের যজনকারিগণ ভূতগণের নিকট গমন করে, এবং আমার যজনকারিগণ আমার নিকটে আসে।"[৩] কেহ কেহ মনে করে যে কৃষ্ণ এই সকল বচনে এক তাঁহার ভিন্ন অপর দেবতার পূজার নিন্দা করিয়াছেন,—উহাকে অশাস্ত্রীয় ("অবিধিপূর্বকম্") বলিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে ঐ অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়। পরন্ত ঐখানে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অন্য ছিল বলা যায়। শ্রুতিতে আছে,

> "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি"[৪]

'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সে তাহাই হয়।' 'মহাভারতে'ও আছে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বিনিশ্চিত মতি রাখে, সে সেই ভাবেই জ্ঞান লাভ করে এবং তদনুরূপ ফল পায়।[৫] কৃষ্ণও গীতায় সেইরূপ বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (অর্থাৎ 'যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, আমি তাহাকে সে প্রকারেই ফল দিই')।[৬] সমস্ত দেবতা বস্তুতঃ ভগবানই,—তিনি ভিন্ন কোন দেবতা নাই, সমস্ত দেব-নাম তাঁহারই কর্ম-নাম মাত্র। সুতরাং যে দেবতারই পূজা করা হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই পূজা করা হয়,[৭] সেই দেবতা-কর্তৃক প্রদত্ত ফল বস্তুত ভগবানেরই প্রদত্ত। যাহারা এই প্রকৃত তত্ত্ব স্মরণ না রাখিয়া নামভেদ ও কর্মভেদ দৃষ্টে দেবতাগণকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে এবং সেইভাবে উপাসনা করে, কৃষ্ণ তাহাদেরই নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদের পূজাকে "অবিধিপূর্বক" (অর্থাৎ অশাস্ত্রীয়) পূজা বলিয়াছেন এবং তাহাদের উপাসনার ফল ভিন্ন ভিন্ন ও অনিত্য বলিয়াছেন। আরও দেখ, গীতা যে কেবল উপাস্যৈকত্ববাদী তাহা নহে; তন্মতে উপাস্য এবং উপাসকও প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন নহে; তথা উপাসনার উপকরণসমূহও উপাস্য হইতে ভিন্ন নহে। কেননা, "বাসুদেবঃ সর্বম্।" এই বাসুদেবাদ্বৈতভাবসম্পন্ন হইয়া যজন করাই গীতার বিধি।[৮] যে অন্য প্রকারে

---

[১] গীতা, ৭।২০—৩ [২] ঐ, ৯।২৩ [৩] ঐ, ৯।২৪—৫ [৪] বৃহউ,

[৫]
> "যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্।
> স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভারতসত্তম॥"—(মহাভা, ১২।৩৫২।৩)

[৬] গীতা, ৪।১১·১

[৭] তাই কৃষ্ণ বলিয়াছেন "মম বর্ত্মানুবর্ততন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ" (ঐ, ৪।১১·২) অর্থাৎ মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারেই তাঁহার পথে চলিতেছে,—যে যে ভাবে যাঁহারই উপাসনা করুক না কেন, সে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই অভিমুখে চলিয়াছে; কেননা, সকল তিনিই।

[৮] বিদ্বান্‌গণ ঐ প্রকার ভাবসম্পন্ন হইয়াই ভগবানের উপাসনা করেন। (দেখ—গীতা, ১০।৮)

ভেদবোধে যজন করে সে অবিধিপূর্বক করে। অজ্ঞানজ ভেদদৃষ্টিমূলক বলিয়া ঐ সকল উপাসনার ফল যে পরম হইতে পারে না তাহা সত্যই। সুতরাং কৃষ্ণের ঐ সকল উক্তিমূলে বলা যায় না যে গীতায় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রচারিত হইয়াছে। শঙ্করাদি কোন কোন ভাষ্যকারের মতে গীতার "যোগিনামপি সর্বেষাং" ইত্যাদি বচনে রুদ্রাদিদেবতা-ভক্তি অপেক্ষা বাসুদেবভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।[১] তাঁহাদের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয় যে গীতায় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আছে।

বর্তমান নারায়ণীয়াখ্যানের এক স্থলে শৈব ও বৈষ্ণবের বিরোধের কিঞ্চিৎ আভাস আছে মনে হয়। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, যে সময়ে নর ও নারায়ণ ঋষি বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করেন।[২] ঐ যজ্ঞে দক্ষ রুদ্রের ভাগ কল্পনা করেন নাই। সেই হেতু রুদ্র, মহর্ষি দধীচির প্রার্থনায়, ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ প্রজ্বলিত শূল নিক্ষেপ করেন। ঐ শূল দক্ষযজ্ঞকে ভস্মসাৎ করত মহাবেগে বদরিকাশ্রমে গিয়া নারায়ণঋষির বক্ষে নিপতিত হয়। ঐ শূলের তেজে নারায়ণের সমস্ত কেশ মুঞ্জবর্ণ হয়। পরন্তু তাঁহার তেজে প্রত্যাহত হইয়া উহা রুদ্রের হাতে ফিরিয়া যায়। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্রদেব বেগে নারায়ণ ঋষির প্রতি ধাবিত হন। তখন রুদ্রদেব এবং নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তাহাতে জগতের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতে থাকে। "তখন সর্বলোক সহসা সর্বপ্রকারে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। যজ্ঞসমূহে শুদ্ধ অগ্নি সুহুত হবি গ্রহণ করিল না। ভাবিতাত্মা ঋষিদিগের মনে বেদ প্রতিভাত হইল না। তখন বেদসমূহে রজ ও তম গুণ সমাবিষ্ট হইল। পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল।" ইত্যাদি।[৩] এই সর্বনাশ দেখিয়া ব্রহ্মা দেবগণ এবং মহাত্মা ঋষিগণ সহকারে ঐ ঘটনাস্থলে গিয়া রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং "জগতের হিতকামনায়" সংগ্রাম বন্ধ করিতে বলেন। তিনি বলেন যে নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় পরমদেবতার অবতার। যাহা হউক, ব্রহ্মার প্রার্থনায় রুদ্র ক্রোধ পরিত্যাগ করত ঋষি নারায়ণের শরণাপন্ন হন। তখন নারায়ণ ঋষি, রুদ্র, ব্রহ্মা, ঋষিগণ এবং দেবতাগণ দ্বারা সম্পূজিত হইয়া রুদ্রকে বলেন "যে তোমাকে জানে, সে আমাকে জানে। যে তোমার অনু(গত), সে আমার অনু(গত)। আমাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্তর নাই। এই বিষয়ে তোমার অন্যথা বুদ্ধি যেন না হয়। আজ হইতে এই শূলচিহ্ন আমার শ্রীবৎসচিহ্ন হইবে, আমার পাণিদ্বারা অঙ্কিত হইয়া[৪] তুমি শ্রীকণ্ঠ হইবে।"[৫] তখন হইতে রুদ্রের সহিত নরঋষি ও নারায়ণঋষির "অতুল সখ্য" স্থাপিত হয়। এই আখ্যায়িকা কতটা গ্রহণযোগ্য বলা যায় না। কেননা, রুদ্র কর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংসের যে বর্ণনা 'মহাভারতে'র অন্যত্র পাওয়া যায়,[৬] তাহা হইতে এখানকার বর্ণনা অনেক ভিন্ন ; তার পর শিবের নীলকণ্ঠ আখ্যার অন্যত্র ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। তথাপি

---

১) পূর্বে দেখ। ২) মহাভা, ১২।৩৪২।১০৭

৩) মহাভা, ১২।৩৪২।১১৯—

৪) কথিত আছে যে ঐ সংগ্রামে নারায়ণ ঋষি আপন পাণি দ্বারা রুদ্রের কণ্ঠ চাপিয়া ধরেন। তাহাতে রুদ্রের কণ্ঠ নীলবর্ণ হয় ; এবং তখন হইতে তিনি "শিতিকণ্ঠ" বা নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হন। (১২।৩৪২।১১৪—১১৫)

৫) মহাভা, ১২।৩৪২।১৩৩—৪ ৬) মহাভা, ১২।২৮৩।২৪—

ঐ আখ্যায়িকার মধ্যে একটা মাত্র তত্ত্ব নিহিত আছে বোধ হয়—যখন নারায়ণ ঋষি ভাগবতধর্ম প্রথম প্রবর্তন করেন, তখন শিবভক্তগণ উহার তীব্র বিরোধ করেন। উঁহাদের ঐ সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফলে দেশের ও ধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। জগতের ঐ অকল্যাণ দেখিয়া বৈদিকধর্মানুযায়ী কতিপয় ঋষি,—তাঁহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মার উপাসক ছিলেন—নারায়ণঋষির অবতারত্ব খ্যাপন করত উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তখন হইতে সর্বধর্মানুযায়িগণের মধ্যে "অতুল সখ্য" স্থাপিত হয়।

ভাগবতধর্মসমূহ—প্রাচীন ভাগবতধর্মের কতিপয় অঙ্গের স্বল্পবিস্তর আলোচনা এই পর্য্যন্ত করিয়াছি। পরিশেষে সমস্ত অঙ্গের নামোল্লেখ মাত্র করিতে ইচ্ছা করি। ঐ বিষয়ে প্রাচীন ভাগবতধর্মতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদও দেখা যায়। তবে তাহা অধিক নহে। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণে মহাত্মা প্রবুদ্ধ এই গুলিকে "ভাগবতধর্মসমূহ" বলিয়াছেন,[১]—(১) সর্ববিষয়ে মনের অসঙ্গ[২] (২) সাধুগণের সঙ্গ, (৩-৫) প্রাণিগণের প্রতি দয়া, মৈত্রী ও বিনয়,[৩] (৬) শৌচ, (৭) তপ, (৮) তিতিক্ষা (৯) মৌন, (১০) স্বাধ্যায়, (১১) আর্জব, (১২) ব্রহ্মচর্য্য, (১৩) অহিংসা, (১৪) (শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি) দ্বন্দ্বে সমত্ব, (১৫) সর্বত্র আত্মেশ্বর দর্শন[৪], (১৬) কৈবল্য (বা একান্তশীলতা), (১৭) অনিকেততা, (১৮) বিবিক্তচীরসেবন,[৫] (১৯) যাহা মিলে তাহাতে সন্তোষ, (২০) ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা, (২১) অপর শাস্ত্রের অনিন্দা, (২২) মন, বাণী ও কর্মের দণ্ড (অর্থাৎ সংযম), (২৩) সত্য, (২৪) শম, (২৫) দম), (২৬-৮) অদ্ভুতকর্মা হরির জন্ম, কর্ম ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান, (২৯) সমস্ত কর্ম ঈশ্বরার্থ করা ("তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং"), (৩০) যজ্ঞ, দান, তপ, জপ ও সদাচার (যাহা কিছু করা যায় তৎসমস্তকে) এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ, প্রভৃতি যাহা কিছু আপন প্রিয় তৎসমস্ত পরমাত্মাকে সমর্পণ, (৩১) ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি সৌহৃদ্য, (৩২) স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণীর, বিশেষতঃ মনুষ্যগণের, তন্মধ্যে বিশেষতঃ সাধুগণের (অর্থাৎ স্বধর্মশীলগণের) ততোধিক আবার মহাত্মাগণের সেবা, এবং (৩৩) মহাত্মাগণের সঙ্গে মিলিয়া পরস্পরে ভগবানের পবিত্রকারী যশ অনুকথন—যাহাতে পরস্পরের মধ্যে রতি, তুষ্টি এবং সুখদুঃখনিবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রবুদ্ধ বলেন, এই সকল ধর্মে মনুষ্যগণের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়; ঐ সকল সাধন ভক্তি দ্বারা তাহারা প্রেমলক্ষণ পরাভক্তি লাভ করে; তখন ভগবানের যশ স্মরণ করিয়া এবং অপরকে স্মরণ করাইয়া তাহারা উৎপুলকিত হয়,—তাহারা কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন নাচে, কখন গান করে, কখন আনন্দিত হয়, কখন অলৌকিক কথা বলে, আর কখন পরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়,—উপশান্ত হইয়া মৌন হয়।[৬] ঐ ভাগবতধর্মসমূহের অনুশীলন দ্বারা লব্ধ পরা ভক্তি দ্বারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া মনুষ্য দুস্তর

---

১) '(বিষ্ণু)ভাগ, ১১।৩।২৩—৩০ ২) এইটিকে ভাগবতধর্মের সর্বপ্রথম অঙ্গ মনে করা হয়।

৩) টীকাকার বলেন, প্রাণিগণের হীনদিগের প্রতি দয়া, সমানদিগের প্রতি মৈত্রী এবং উৎকৃষ্টদিগের প্রতি বিনয় কর্তব্য।

৪) টীকাকার বলেন, সচ্চিৎরূপে আত্মদর্শন এবং নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বরদর্শন।

৫) "বিজনে পতিত শুদ্ধ বস্ত্রখণ্ডসমূহের বা বল্কলের পরিধান" (টীকাকার)

৬) '(বিষ্ণু)ভাগ, ১১।৩।৩১—৩২

মায়াকে অনায়াসে পার হইয়া যায়।[1] প্রকৃত কথা এই যে, যে নিষ্কপটচিত্তে উহাদের অনুশীলন করে ("অমায়য়ানুবৃত্ত্যা") তাহাকে ভগবান্ আপনাকে প্রদান করেন, অর্থাৎ তাহার নিকট আপন প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহাতে সে তাঁহার মায়া অতিক্রম করে।[2] দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে ভগবান্ নারায়ণঋষি কর্তৃক প্রপঞ্চিত সনাতন ধর্ম এই ত্রিশ লক্ষণ যুক্ত—(১) সত্য, (২) দয়া, (৩) তপ, (৪) শৌচ, (৫) তিতিক্ষা, (৬) ঈক্ষা (বা বিচার), (৭) শম, (৮) দম, (৯) অহিংসা, (১০) ব্রহ্মচর্য্য, (১১) ত্যাগ, (১২) স্বাধ্যায়, (১৩) আর্জব, (১৪) সন্তোষ, (১৫) সমদৃষ্টি, (১৬) সেবা, (১৭) গ্রাম্যেহোপরম, (১৮) মনুষ্যের ভাগ্য বিপর্যয় বিচার, (১৯) মৌন, (২০) আত্মবিচার, (২১) সমস্ত প্রাণীদিগেতে, বিশেষতঃ মনুষ্যদিগেতে, আত্মবুদ্ধি ও ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং সেইহেতু অন্নাদির যথাযোগ্য সংবিভাগ, (২২-৩০) ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য এবং আত্মসমর্পণ (=নবধা ভক্তি)। এইগুলিই মনুষ্যগণের পরম ধর্ম এবং উহাদের পালন করিলে সর্বাত্মা হরি সন্তুষ্ট হন।[3] 'মহাভারতে' আছে "দান, ভূতদয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ, ধৃতি এবং ক্ষমা "সনাতনধর্মের সনাতন মূল।"[4]

---

[1] ঐ, ১১।৩।৩৩;

[2] ঐ, ১১।৩।১৭, ২২

[3] ঐ, ৭।১১।৮—১২

[4] মহাভা, ১৪।৯১।৩৩—৩৪.১

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মসন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্য

(১) কর্মসন্ন্যাস

কেহ কেহ মনে করেন যে নারায়ণীয়ধর্মের বা ভাগবতধর্মের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্মসন্ন্যাস বা চাতুর্বর্ণ্য-বিহিত শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের পরিত্যাগ করিতে হয় না ; কেননা তন্মতে, অনাসক্তভাবে সমস্ত ব্যবহার যথাযথ করিতে থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইতে পারে ; অধিকন্তু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও আমরণ সমস্ত ব্যবহার পূর্ববৎ যথাযথভাবে অবশ্যই করিতে হইবে। আধুনিক কালে এই মতের সর্ব প্রধান প্রচারক স্বর্গীয় মনীষী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক।[১] তিনি বলেন, "ভাগবতধর্মের উপদেশ এই যে, শুধু ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাহ্মণদিগকেও নিবৃত্তিমার্গের শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম করিবার প্রযত্ন করিতে হইবে।"[২] "কেবল কর্তব্য বলিয়া পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সমস্ত কাজ করিতে থাকিয়া তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের যজন কিংবা উপাসনা আমরণান্ত বজায় রাখিবার এই যে গীতা-প্রতিপাদিত জ্ঞানযুক্ত প্রবৃত্তিমার্গ কিংবা কর্মযোগ ইহাকেই ভাগবতধর্ম বলে।"[৩] তিনি মনে করেন যে ভাগবতধর্মের নিষ্কামকর্মের রহস্য উহাই। ইহার ভাগবতধর্মের বা নারায়ণীয়-ধর্মের] বিচারকালে ['মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে] দুই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে,—

'নারায়ণপরো ধর্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ' ॥[৪]

এই নারায়ণীয়ধর্ম পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষপ্রদ এবং প্রবৃত্তিপরও বটে। ইহার পর এই ধর্ম কিরূপে প্রবৃত্তিপর মহাভারতে তাহার পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ চাতুর্বর্ণ্য-বিহিত নিষ্কাম কর্মেই রত থাকা এই অর্থে 'প্রবৃত্তি' শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। তাই, গীতাতে অর্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাগবত ধর্মেরই উপদেশ, এবং উপরি উক্ত ধর্ম প্রবৃত্তিপর হওয়া প্রযুক্ত ঐ উপদেশ প্রবৃত্তিপর বলিয়াই মহাভারতকার বুঝিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।"[৫] "পরাকাষ্ঠার [অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের] নিষ্কামত্বের এই অবস্থা

---

১) গীতার তাৎপর্য সম্বন্ধে ঐ প্রকার মত প্রাচীন। আচার্য শঙ্করের গীতাভাষ্যে তাহার উল্লেখ আছে। তিনি জনৈক প্রাচীন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"সর্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতঃ অর্থঃ"

"যাবজ্জীব-শ্রুতিচোদিতানি কমাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ইতি এতদেকান্তেন এব প্রতিষিদ্ধম্।"

শঙ্কর ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। (গীতার ৩য় অধ্যায়ের ভাষ্যের ভূমিকা)

২) 'ভগবদ্গীতারহস্য বা কর্মযোগশাস্ত্র', বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাংলাভাষান্তরিত, কলিকাতা, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

৩) ঐ, ৫০৫ পৃষ্ঠা   ৪) মহাভা, ১২।৩৪৭।৮২·২-৮৩.১   ৫) 'ভগবদগাতারহস্য,' ১০ পৃষ্ঠা

এবং এই সংসারিক কর্ম ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই পরস্পর-বিরোধ থাকা প্রযুক্ত যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সে কর্ম হইতে স্বতঃই মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়, এই রূপ অনেকে বলেন। কিন্তু এ মত গীতার মান্য নহে; স্বয়ং পরমেশ্বর যেরূপ কর্ম করেন, সেইরূপ জীবন্মুক্তেরও নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ আমরণ সমস্ত ব্যবহার করাই অধিক শ্রেয়স্কর, কারণ নিষ্কামত্ব ও কর্ম এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত।”[১]

মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থসমূহে চাতুরাশ্রম্যের বিধান আছে। তন্মতে প্রত্যেক দ্বিজকে গৃহস্থাশ্রমের পর কৃতনিশ্চয় ও বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া বনে বাস করিতে হইবে। চর্মের শিথিলতাও কেশের পক্বতা হইলে, এবং পৌত্রের মুখ দেখিলে, গৃহস্থকে বনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে,—বানপ্রস্থী হইতে হইবে।[২] তথায় নানাবিধ তপস্যার দ্বারা দেহের এবং উপনিষদ্‌বিদ্যা অর্জন দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ ক্ষেপণ করত পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে।[৩] ইহা হইতে তিলক বলেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্ন্যাসী এইরূপ আশ্রমের পর পর উচ্চ চার পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই ‘স্মার্ত’ অর্থাৎ ‘স্মৃতিকারগণের প্রতিপাদিত’ মার্গ বলে। তিনি মনে করেন যে ভাগবত মার্গ বা ভাগবতধর্ম উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, চাতুরাশ্রম্য, বিশেষতঃ সর্বকর্মসন্ন্যাস রূপ চতুর্থাশ্রম উহাতে স্বীকৃত হয় না,—উহার মতে চাতুর্বর্ণ্য বিহিত কর্মসমূহ আমরণ করিতে হইবে। “কিন্তু যাঁহার দৃষ্টিতে স্মৃতিগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আশ্রম-ব্যবস্থা অনুসারে যৌবনকালে যথাশাস্ত্র সংসার করিবার পর, বার্ধক্যে সমস্ত কর্মত্যাগ করিয়া চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ চরম সাধ্য ছিল তিনিই স্মার্ত, এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহস্থাশ্রমের কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে হইবে এইরূপ যিনি বুঝিতেন তিনিই ভাগবত বলিয়া উক্ত হইতেন। ইহাই এই দুই শব্দের মূল অর্থ; এবং এই হেতু এই দুই শব্দ সাংখ্য ও যোগ কিংবা সন্ন্যাস ও কর্মযোগের সহিত অনুক্রমে সমানার্থক।”[৪] “তাই কর্ম কর ও কর্ম ছাড়ো এই উভয়বিধ বেদবচনের মিল করিবার জন্যই স্মৃতিকারগণ আশ্রমের ক্রমোচ্চ শ্রেণীপরম্পরা স্থাপন করিলেও এই বিভিন্ন বেদবাক্যসমূহের সমন্বয় করিবার নির্বিবাদ অধিকার স্মৃতিকারদিগেরই ন্যায়,—এমন কি তাহাদের হইতেও অধিক—যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আছে, তিনিই ভাগবতধর্ম নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। ভাগবতধর্মে শুধু অধ্যাত্মবিচারের উপরেই নির্ভর না করিয়া বাসুদেব-ভক্তির সুলভ সাধনারও উপর ভর দেওয়া হইয়াছে।…ভাগবতধর্ম ভক্তিমূলক হইলেও, তাহাতে পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে পর কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশা ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষদিগকেও লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে আচরণ করিতে হইবে, জনকমার্গের এই মহৎ তত্ত্বটি বজায় আছে; তাই কর্মদৃষ্টিতে এই দুই মার্গ একই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াত্মক কিংবা প্রবৃত্তিমূলক।”[৫]

---

১) ঐ, ৩০৩ পৃষ্ঠা আরও দেখ ২০০ পৃষ্ঠা।

২) ‘মনুস্মৃতি’, ৬।১-২

৩) ঐ, ৬।৩৩ আরও দেখ, ঐ, ৬।৯৫—৬

৪) ‘ভগবদ্‌গীতারহস্য’, ৩৪৬ পৃষ্ঠা

৫) ঐ, ৩৪৪ পৃষ্ঠা

"তাই, শুধু বাসুদেবভক্তি ভাগবতধর্মের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া মানা যায় না। যে সাত্বত জাতির মধ্যে ভাগবতধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই জাতির সাত্যকি-আদি ব্যক্তি, পরম-ভগবদ্ভক্ত ভীষ্মার্জুন, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও খুব পরাক্রমী ছিলেন, এবং অন্যের দ্বারা পরাক্রমের কার্য করাইবার লোক ছিলেন। এই জন্য অন্য ভগবদ্ভক্তের উচিত যে, তাহারাও এই আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত চাতুর্বর্ণ্যানুসারে যুদ্ধাদি সমস্ত ব্যাবহারিক কর্ম করিবে—ইহাই মূল ভাগবতধর্মের মুখ্য বিষয় ছিল। ভক্তিতত্ত্ব স্বীকার করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে সংসারত্যাগী ব্যক্তি তখন একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা কিছু সাত্বতদিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতধর্মের মুখ্য তত্ত্ব নহে। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর জ্ঞান হইলে পর ভগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের ধারণপোষণার্থ সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সার। উপনিষৎ কালে জনক প্রভৃতি ইহাই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্কাম ধর্ম করা অনুচিত নহে। কিন্তু সে সময়ে তাহার মধ্যে ভক্তির সমাবেশ করা হয় নাই; তা ছাড়া জ্ঞানোদয়ের পর কর্ম করা কিংবা না করা, প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্বিত ছিল অর্থাৎ বৈকল্পিক বলিয়া ধরা হইত (বেদান্তসূত্র, ৩-৪-১৫)। বৈদিকধর্মের ইতিহাসে ভাগবতধর্ম এই একটি মহত্ত্বপূর্ণ এবং স্মার্তধর্ম হইতে বিভিন্ন কাজ করিয়াছেন যে, উহা (ভাগবতধর্ম) আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নিবৃত্তি অপেক্ষা নিষ্কামকর্মমূলক প্রবৃত্তিমার্গকে (নৈষ্কর্ম্য) অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের সহিত শুধু নহে, ভক্তিরও সহিত কর্মের উচিত মিলন স্থাপন করিয়াছেন। এই ধর্মের মূল প্রবর্তক নর ও নারায়ণ ঋষিও এইরূপই সমস্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতেন, এবং মহাভারতে বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের ন্যায় সকলেরই এইরূপ কর্ম করাই কর্তব্য (উদ্যো ৪৮-২১-২২)। নারায়ণীয়াখ্যানে তো ভাগবতধর্মের এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে 'প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ' অর্থাৎ নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক বা কর্মমূলক। নারায়ণীয় কিংবা মূল ভাগবতধর্মের যে নিষ্কাম প্রবৃত্তিতত্ত্ব তাহারই নাম 'নৈষ্কর্ম্য', এবং ইহাই মূল ভাগবতধর্মের মুখ্য তত্ত্ব।"

আধুনিক কালের অপর কোন কোন লেখকও লোকমান্য তিলকের ঐ সিদ্ধান্ত স্বল্পবিস্তর মানিয়াছেন। যথা, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলেন যে ভক্তির এবং কর্মের অনুসরণ সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য বলিয়া ভাগবতধর্মে বিহিত হইয়াছে, উহা সন্ন্যাস দাবী করে না।[১] অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন যে গীতার মতে জ্ঞানীকেও সাধারণ লোকের মত স্বকর্ম বরাবর করিতে হইবে।[২]

তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ মনীষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও লোকমান্য তিলকের ঐ সিদ্ধান্ত আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ভাগবতধর্ম মতে, কর্মদ্বারাও

---

১) **S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, p. 491**

তিলকের ন্যায় তিনিও মনে করেন যে "প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ" 'মহাভারতে'র এই বচন উহা সমর্থন করে।

২) **S. N. Dusgupta in the Legacy of India, edited by G. T. Garratt, Oxford, 1937, p. 112**

চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হয় এবং তাহাতে মুক্তি লাভ হয়। তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বিষয়ে তিলকের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। তবে তিনি যে অধিকন্তু বলিয়াছেন জ্ঞানোদয়ের পরেও সমস্ত ব্যবহার আমরণ পূর্ববৎ যথাযথভাবে অবশ্যই করিতে হইবে—ইহাই ভাগবতধর্মের মুখ্য তত্ত্ব সেই বিষয়ে আমাদের মনে অত্যন্ত শঙ্কা হয়। ঐ শঙ্কার হেতু আমারা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি।

(১) প্রথমতঃ, 'মহাভারতে'র তদুদ্ধৃত ঐ বচনের তাৎপর্য যাহা বলিয়া তিলক বলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বলিয়া আমাদের মনে হয় না,—তাঁহার ব্যাখ্যা বক্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, উহার সরল অর্থ এই,—'পুনরাবৃত্তিদুর্লভধর্ম (অর্থাৎ যাহাতে পুনর্জন্ম দুর্লভ হয় অর্থাৎ হয় না, সেই নিবৃত্তিধর্ম) নারায়ণ পর এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মও অবশ্য নারায়ণাত্মক।' উহার প্রকরণ আলোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ বচন মহর্ষি বৈশম্পায়নের। তাঁহার সম্পূর্ণ উক্তি এই, "এই শ্রীমান্ (=ভগবান্ নারায়ণ) বেদনিধি এবং ইনিই তপস্যার নিধি। এই হরি সাংখ্য, যোগ, পরব্রহ্ম এবং বিভু। বেদসমূহ নারায়ণপর। যজ্ঞসমূহ নারায়ণাত্মক। তপ নারায়ণপর। গতি নারায়ণপর। সত্য নারায়পর। ঋত নারায়ণাত্মক। পুনরাবৃত্তিদুর্লভধর্ম নারায়ণপর এবং প্রবৃত্তিলক্ষণধর্মও অবশ্য নারায়ণাত্মক। ভূমিতে যে শ্রেষ্ঠতম গন্ধ তাহা নারায়ণাত্মক বলিয়া স্মৃত হয়। হে রাজন্, অপের গুণ রসও নারায়ণাত্মক। অগ্নির পরম রূপও নারায়ণাত্মক বলিয়া স্মৃত হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শও নারায়ণাত্মক বলিয়া স্মৃত হয়। আকাশ-সম্ভব শব্দও নারায়ণাত্মক। অব্যক্তগুণলক্ষণ মনও তাহা হইতে উৎপন্ন (সুতরাং তদাত্মকই)। কাল এবং জ্যোতিষ্কগণের অয়ন নারায়ণপর। কীর্তি, শ্রী, লক্ষ্মী, ও দেবতা নারায়ণপর। সাংখ্য নারায়ণপর। যোগ নারায়ণাত্মক।"[১] ইহার সহজ তাৎপর্য এই যে সমস্তই নারায়ণ বা নারায়ণাত্মক। উহা বলাই বক্তার অভিপ্রায় ছিল। এবং উহা যে নারায়ণীয়ধর্মের এক মুখ্য সিদ্ধান্ত তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[২] কিঞ্চিৎ পরে বৈশম্পায়ন পুনরায় আরও সংক্ষেপে সেই কথা বলিয়াছেন। "হে রাজন্, সাংখ্য ও যোগ—এই দুই (শাস্ত্র) সনাতন। সমস্ত বেদ ও (সনাতন)। সমস্ত (সনাতন) শাস্ত্র এবং ঋষিগণ কর্তৃক (একবাক্যে) নিরুক্ত হইয়াছে যে এই পুরাণ বিশ্ব নারায়ণই।"[৩] কিঞ্চিৎ পরে প্রদর্শিত হইবে যে নারায়ণীয়াখ্যানে ভগবান্ নারায়ণের উক্তি মতে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ উভয়ই প্রচলিত হইয়াছিল,—মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন, আর সনৎকুমার প্রভৃতি অপর সাত মানসপুত্র নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন ;[৪] এবং মরীচি-আদি সপ্তর্ষি প্রণীত সাত্বতশাস্ত্রে উভয়ই অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং এক এক করিয়া সমস্তকে নারায়ণ বা নারায়ণাত্মক বলিতে হইলে, তদুভয়কেও অবশ্যই বলিতে হইবে। এবং বৈশম্পায়ন তাহাই করিয়াছেন। কৃষ্ণও সেইরূপে বলিয়াছেন যে প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম উভয়ই তিনি। তিনি

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৭।৮০—৭ এই প্রকার উক্তি '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও আছে। (২।২।২৮—৯ ; ২।৫।১৫—৬)

২) পূর্বে দেখ। ৩) মহাভা, ১২।৩৪৯।৭৩

৪) মহাভা, ১২।৩৪০।৬৯—৭৪

অর্জুনকে বলেন, "হে কৌন্তেয়, তুমি ও আমি নর ও নারায়ণ বলিয়া, পরন্তু (পৃথিবীর) ভার অবতারণার্থই আমরা মনুষ্যদেহ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, স্মৃত হই। হে ভারত, আমি অধ্যাত্মযোগসমূহ,—আমি কি এবং কোথা হইতে (আসিয়াছি), তৎসমস্তই জানি। আমি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, তথা আভ্যুদয়িক (ফলপ্রদ প্রবৃত্তিধর্ম)ও॥ একমাত্র সনাতন আমিই নরগণের অয়ন বলিয়া খ্যাত।"[১]

(৩) দ্বিতীয়ত—তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে নিষ্কামকর্মীর দৃষ্টান্তরূপে তিলক জনক, সাত্যকি, ভীষ্ম, অর্জুন এবং কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু বর্তমান 'মহাভারত' পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও অর্জুনের দৃষ্টান্ত প্রকৃত পক্ষে তাঁহার আনুকুল্য করে না। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে উঁহারা সকলেই মহাপরাক্রমী ছিলেন এবং পরাক্রমের অনেক কার্য যেমন নিজে করিয়াছিলেন, তেমন অপরের দ্বারাও করাইয়াছিলেন। পরন্তু কৃষ্ণ ও অর্জুন শেষ বয়সে নির্বিণ্ন হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন।

(ক) প্রভাসে যদুবংশীয়গণের ভীষণ পরস্পর-হত্যাকাণ্ড দেখিয়া বলরামের নির্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি নির্জন বনান্তে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হন।[২] তাহা দেখিয়া কৃষ্ণেরও নির্বেদ উপস্থিত হয়।[৩] পরন্তু তাঁহাদের অভাবে দ্বারকাস্থ স্ত্রীগণের যে দুরবস্থা হইবে, তাহা তাঁহার মনে উদয় হয় এবং উঁহাদিগকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা হয়। এতটা কর্তব্যবুদ্ধি তখনও তাঁহার ছিল। তাই তখন তিনি অর্জুনকে আনয়ন করিতে দারুককে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন এবং বভ্রুকে বলেন দ্বারকায় গিয়া অর্জুনের আগমন পর্যন্ত স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে, যাহাতে দস্যুগণ বিত্তলোভে উহাদিগকে হিংসা না করে। পরন্তু তৎক্ষণাৎ বভ্রুর মৃত্যু হয়। সুতরাং কৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকায় গমন করেন। তথায় পিতা বসুদেবকে অর্জুনের আগমন পর্যন্ত স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে বলেন এবং আরও বলেন,

> "দৃষ্টং ময়েদং নিধনং যদূনাং রাজ্ঞাং পূর্বং কুরুপুঙ্গবানাম্।
> নাহং বিনা যদুভির্যাদবানাং পুরীমিমামশকং দ্রষ্টুমদ্য॥
> তপশ্চরামি নিবোধ তন্মে রামেণ সার্ধং বনমভ্যুপেত্য।"[৪]

'আমি পূর্বে কুরুবীরদিগের ও অপর রাজগণের এবং অধুনা যদুবংশীয়গণের এই নিধন দেখিয়াছি। যাদবগণরহিত তাঁহাদের এই পুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আমি সমর্থ নহি। আমি বনে

---

১) মহাভা, ১২।৩৪১।৩৭·২—৩৯

২) মহাভা, ১৬।৪।১ কথিত হইয়াছে বলরামও প্রথমে ঐ হত্যাকাণ্ডে ভাগ লইয়াছিলেন। ৬।৩।৩৩

৩) কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণও ঐ হত্যাকাণ্ডে ভাগ লইয়াছিলেন। শিষ্য সাত্যকির এবং পুত্রগণের মৃত্যু দেখিয়া তিনি অবিচলিত থাকিতে পারেন নাই। ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি অপরকে মারিতে লাগিয়া যান এবং প্রায় সকলকে নিঃশেষ করিয়া আনেন। (১৬।৩।৩৫—৬, ৪৪—) বলরামের আগেই নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি আগেই ঐ স্থল হইতে অন্যত্র একান্তে সরিয়া পড়েন। বভ্রু ও দারুক ক্রোধোন্মত্ত কৃষ্ণকে রামের অনুসরণ করিতে বলেন। তখন যেন কৃষ্ণের হুঁস হয় এবং তিন জনে মিলিয়া বলরামের নিকটে গমন করেন।

৪) মহাভা, ১৬।৪।৯—১০·১

গমন করিয়া রামের সহ তপশ্চর্য্য করিব। তাহা আপনি নিশ্চিতরূপে জানুন।' এই বলিয়া পিতার পায়ে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ ত্বরিতগতিতে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যান। পুরবাসী সমস্ত স্ত্রী ও বালকগণ উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া উঠে। ঐ মহানিনাদ শুনিয়া কৃষ্ণের হৃদয় কিঞ্চিৎ যেন বিগলিত হইল। তিনি প্রত্যাবর্তন করত উহাদিগকে বলেন, 'পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন আসিয়া তোমাদের দুঃখ মোচন করিবে।' এইমাত্র সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণ বনের প্রতি ধাবিত হন। অর্জুন দ্বারকায় আগমন করিলে পর বসুদেব তাঁহাকে বলেন যে "আমি ধীমান রামের সহিত কোন পুণ্য দেশে নিয়মে আস্থিত হইব। (তাহার) কাল (সমুপস্থিত হইয়াছে)। (সুতরাং) আমি করিবই। ইহা নিশ্চয় সত্য।' আমাকে এই বলিয়া অচিন্ত্যপরাক্রম প্রভু হৃষীকেশ বালকগণের সহিত আমাকে পরিত্যাগ করত কোন এক দিকে গমন করিয়াছে।"[১] ইহার পরে কৃষ্ণ যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না, সে ভিন্ন কথা। তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহার পরিবারের কি শোচনীয় দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় বলিবার নহে। আমাদের কর্তব্য ত এইমাত্র যে ভাগবতধর্মের পুনরুজ্জীবক ও পুনঃপ্রচারক কৃষ্ণ,—যিনি উহার আদি প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষির অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন, এবং যিনি অতি মহান্ কর্মী বলিয়া সুবিখ্যাত, তিনি স্বয়ং সংসারের অনিত্যতা এবং দুঃখ দেখিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন এবং তপস্যার্থ গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন।[২] লোক এবং সমাজের জন্য তাঁহার প্রয়োজন যখন অতিমাত্রায় ছিল, তখনই তিনি উহাদের পরিত্যাগ করেন। 'মহাভারতে' ইহাও কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁহার রুক্মিণীজাম্ববতী প্রমুখ পাঁচ স্ত্রী অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং সত্যভামা প্রমুখ অপর প্রিয় স্ত্রীগণ তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়া বনে গমন করেন (বনং প্রবিবিশুঃ···তাপস্যে কৃতনিশ্চয়াঃ)। অক্রূরের স্ত্রীগণও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ("প্রবব্রজুঃ")।[৩] তাহাতেও মনে হয় যে কৃষ্ণ সন্ন্যাসধর্মের বিরোধী ছিলেন না।

(খ) যদুবংশের শোচনীয় মৃত্যুতে, বিশেষতঃ কৃষ্ণের দেহত্যাগে, পরম নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া অর্জুন এবং তাঁহার অপর চারি ভাই ও স্ত্রী দ্রৌপদী গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কথিত হইয়াছে যে সর্ব প্রথমে যুধিষ্ঠিরই গৃহপরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে সঙ্কল্প করেন ("প্রস্থানে মতিমাধায়")।[৪] তিনি প্রথমে অর্জুনের নিকট উহা প্রকাশ করেন এবং অর্জুন তাহাতে স্বীকৃত হন। পরে অন্যেও তাহাতে সম্মত হন। এইরূপে ধর্মকামনায় প্রব্রজ্যা করিতে ("প্রব্রজন ধর্মকাম্যয়া")[৫] সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিয়া, আত্মীয়স্বজনগণের এবং প্রজাগণের সনির্বন্ধ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহারা বনে গমন করিতে ইচ্ছা করেন। "অনন্তর কুরুবংশীয় রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গ হইতে আভরণসমূহ খুলিয়া ফেলিয়া বল্কলধারণ করেন। হে নরাধিপ, ভীম, অর্জুন, নকুল,

---

১) মহাভা, ১৬।৬।২৪·২—২৬·১

২) 'গীতা'য় তিনি অর্জুনকে বলেন,

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥"—(৯।৩৩·২)

৩) . মহাভা, ১৬।৭।৭২—৪

৪) মহাভা, ১৭।১।২·২

৫) মহাভা, ১৭।১।৬·১

সহদেব এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই সেই প্রকারে বল্কল পরিধান করেন। হে ভরতর্ষভ, অনন্তর সেই নরপুঙ্গবগণ সকলে যথাবিধি নৈষ্ঠিকী ইষ্টি করাইয়া অগ্নিসমূহকে জলে সমুৎসর্গ করিয়া প্রস্থান করেন।"[১]

যোগযুক্তা মহাত্মানস্ত্যাগধর্মমুপেয়ুষঃ।
অভিজগ্মুর্বহূন্ দেশান্ সরিতঃ সাগরাংস্তথা॥"[২]

'মহাত্মগণ (পাণ্ডবগণ) যোগযুক্ত হইয়া ত্যাগধর্ম গ্রহণ করেন এবং বহু দেশ, নদী ও সাগরে গমন করেন।' অর্থাৎ তাঁহারা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হন। তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রাদিও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে যে "যোগধর্মী তাঁহারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।"[৩] পরন্তু 'মহাভারতে'র কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবৃতি হইতে জানা যায় যে তাঁহারা বস্তুতঃ সমস্ত আর্যাবর্তের প্রদক্ষিণা করিয়াছিলেন। সর্বসংগ্রহাধ্যায়েও বিবৃত হইয়াছে যে অর্জুনের নির্বেদপ্রাপ্তি এবং সন্ন্যাস মৌষল পর্বের এক বিষয়।

…নির্বেদমাপন্নো ব্যাসবাক্যপ্রচোদিতঃ।
ধর্মরাজং সমাসাদ্য সন্ন্যাসং সমরোচয়ৎ॥"[৪]

'নির্বেদ প্রাপ্ত হন এবং ব্যাসের বাক্য দ্বারা প্রচোদিত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে সন্ন্যাসে রুচি প্রকট করেন।' মহাপ্রস্থানিকপর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে "পুরুষর্ষভ পাণ্ডবগণ দেবী দ্রৌপদীর সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করত মহাপ্রস্থান করেন।"[৫]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে কৃষ্ণের স্বতঃই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। "বিশ্বাত্মা ভগবান্ হইয়াও (কৃষ্ণ) লৌকিক এবং বৈদিক মার্গের অনুগামী হইয়া দ্বারাবতীতে সাংখ্য(জ্ঞানে) আস্থিত হইয়া অনাসক্তভাবে কামসমূহ ভোগ করেন।…বহু সংবৎসর এই প্রকারে রমমাণ তাঁহার গৃহধর্মীয় কামোপভোগসমূহে সম্যক্ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল।"[৬]

(৩) মহাবীর ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নিহত হন। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ। তিনি চিরকুমার ছিলেন। সুতরাং স্ববর্ণের শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম না করিলেও অনেক কর্ম করিতেন। তিনি যে যাবজ্জীবন ব্যাবহারিক কর্মী ছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পরন্তু তাহা বলিয়া তিনি তিলকের ব্যাখ্যানুযায়ী নিষ্কামকর্মবাদী ছিলেন কিনা সন্দেহ। 'মহাভারতে'র মোক্ষধর্মপর্বে বিবৃত আছে যে "গার্হস্থ্য পরিত্যাগ না করিয়া বুদ্ধির বিলয় রূপ মোক্ষতত্ত্ব কে লাভ করিয়াছে" তাহা বর্ণনা করিতে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে অনুরোধ করেন।[৭] তাহাতে ভীষ্ম মিথিলার রাজা ধর্মধ্বজ জনক এবং বিদুষী সন্ন্যাসিনী সুলভার সংবাদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে ধর্মধ্বজ "সন্ন্যাসফলিক" ছিলেন ;[৮] তিনি বেদে, মোক্ষশাস্ত্রে ও রাজশাস্ত্রে কৃতবিদ্য

---

১) মহাভা, ১৭।১।১৯·২—২২·১ ২) মহাভা ১৭।১।৩০
৩) মহাভা, ১৭।১।৪৬·২ ৪) মহাভা, ১।২।৩৬২
৫) মহাভা, (১।২।৩৬৫
৬) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৩।৩।১৯,২২
৭) মহাভা, ১২।৩২০।১ ৮) ঐ, ১২।৩২০।৪·১

ছিলেন ; এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহিত করত পৃথিবী শাসন করিতেন।[১] মোক্ষধর্মে সুবিজ্ঞ বলিয়া মুমুক্ষু সমাজে তাঁহার প্রসিদ্ধিও ছিল।[২] ঐ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে সৎসঙ্গ করিবার জন্য,—মোক্ষতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার্থ ভিক্ষুকী সুলভা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন।[৩] জনক ভিক্ষু পঞ্চশিখের শিষ্য ছিলেন। উঁহার মতে, বৈরাগ্যই মোক্ষের পরম সাধন এবং জ্ঞান হইতেই সেই মোক্ষপ্রাপক বৈরাগ্য লাভ হয়। জ্ঞান দ্বারা লোক যত্ন করে ; যত্ন দ্বারা মহৎ (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হয় ; মহৎ প্রাপ্ত হইলে দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয় ; এবং তাহাতে পুনর্জন্মকে জয় করে।[৪] যেমন জলসিক্ত মৃন্ময় ক্ষেত্রে পতিত বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমন কর্ম হইতে মানুষের পুনর্জন্ম হয়। পরন্তু যেমন ভৃষ্ট বীজ হইতে, এবং জলসিক্ত সুকর্ষিত মৃত্তিকায় রোপণ সত্ত্বেও, অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমন বাসনা এবং আসক্তি বিরহিত বুদ্ধিতে কৃতকর্ম দ্বারা পুনর্জন্ম হয় না। ইহাই ভিক্ষু পঞ্চশিখের সিদ্ধান্ত।[৫] তিনি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন।[৬] তাই তিনি ধর্মধ্বজকে মোক্ষের উপদেশ দিলেও রাজকার্য পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই।[৭] তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে, ধর্মধ্বজ "মুক্তরাগ", "নির্দ্বন্দ্ব", "গতমোহ" এবং "মুক্তসঙ্গ" হইয়া রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন।[৮] তিনি একাধিক বার সুলভাকে বলেন যে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি মুক্ত।[৯] পঞ্চশিখ দ্বারা "তাহার জ্ঞান (বুদ্ধি) অবীজ কৃত হইয়াছে, সেইহেতু বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না।"[১০] মুক্তির জন্য গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের এবং দণ্ডকমণ্ডল্বাদিধারণের প্রতি তিনি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন।[১১] ভিক্ষুকী সুলভার প্রতি তিনি কঠোর শ্লেষ করিয়াছেন।[১২] প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুকী সুলভা রাজা ধর্মধ্বজ জনকের মতবাদের, তথা আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "হে রাজন্, যদি তুমি পঞ্চশিখ হইতে উপায়, উপনিষৎ, উপাসঙ্গ এবং নিশ্চয় সহ সম্পূর্ণ মোক্ষ(তত্ত্ব) শুনিয়া থাক এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করত মুক্তসঙ্গ হইয়া থাক, তবে ছত্রাদি (রাজোচিত) বিশেষসমূহে তোমার সঙ্গ কেন ? যদিও তুমি বলিতেছ যে তুমি মোক্ষশাস্ত্র শুনিয়াছ, আমার বোধ হয় তুমি মোক্ষশাস্ত্র শুন নাই ; অথবা শুনিয়া থাকিলেও মিথ্যাই শুনিয়াছ (অর্থাৎ উহার তাৎপর্য ঠিক ঠিক গ্রহণ

---

১) মহাভা, , ১২।৩২০।৫ ২) ঐ, ১২।৩২০।৮,৩৭

৩) ঐ, ১২।৩২০।১৮৬ ৪) ঐ, ১২।৩২০।২৯—৩০

৫) ঐ, ১২।৩২০।৩২—৪

৬) ঐ, ১২।৩২০।৩৮—৪০ ৭) ঐ, ১২।৩২০।২৭'২

৮) ঐ, ১২।৩২০।২৮,৩১ ৯) ঐ, ১২।৩২০।৫১—৩'২

১০) ঐ, ১২।৩২০।৩৪ ১১) ঐ, ১২।৩২০।৪১—৫০

"ত্রিদণ্ডাদিষু যদ্যস্তি মোক্ষো জ্ঞানে ন কস্যচিৎ।
ছত্রাদিষু কথং ন স্যাত্তুল্যহেতৌ পরিগ্রহে ॥৪২".

'যদি কাহারও মোক্ষ জ্ঞানে না হইয়া ত্রিদণ্ডাদিতেই হয়, তবে ছত্রাদিতে কেন হইবে না ? পরিগ্রহ রূপ হেতু উভয়েই তুল্য।' "যে গার্হস্থ্যে দোষদর্শী হইয়া আশ্রমান্তরে গমন করে, সে (গার্হস্থ্যের) পরিত্যাগ এবং (আশ্রমান্তরের) পরিগ্রহণ করিয়া সঙ্গ (দোষ) হইতে মুক্ত হয় না।" (৪৪) ইত্যাদি

"কাষায়ধারণং মৌণ্ড্যং ত্রিবিষ্টব্ধং কমণ্ডলুম্।
লিঙ্গান্যুৎপথভূতানি ন মোক্ষায়েতি মে মতিঃ ॥৪৭"

১২) ঐ, ১২।৩২০।৫৩'২—

করিতে পার নাই ; তাই তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ) ; অথবা মোক্ষশাস্ত্র সদৃশ অপর কোন শাস্ত্র শুনিয়াছ। এই লৌকিক ব্যবহারে তুমি প্রাকৃত জনেরই মত প্রতিষ্ঠিত আছ, সুতরাং উহাদেরই মতন অভিষঙ্গ এবং অবরোধ দ্বারা বদ্ধ আছ।"[১] তিনি আরও বলেন ধর্মধ্বজের জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে অবীজ হয় নাই, যদিও তিনি হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন।[২] "তুমি গার্হস্থ্য হইতে চ্যুত হইয়াছ, আর দুর্জ্ঞেয় মোক্ষতত্ত্বকেও জান নাই ; মোক্ষ-বার্তিক মাত্র হইয়া উভয়ের অন্তরালে বর্তমান আছ।"[৩] রাজা ধর্মধ্বজ জনক এবং সন্ন্যাসিনী সুলভার ঐ বাদ-প্রতিবাদের বর্ণনার উপসংহারে ভীষ্ম বলেন যে "ঐ সকল হেতুমান্ এবং অর্থবান্ বাক্যসমূহ শুনিয়া রাজা অতঃপর আর কিছু (উত্তর) খুঁজিয়া পাইলেন না।"[৪] তৎপূর্বে ধর্মধ্বজের বাক্যসমূহকে তিনি "অসুখ, অযুক্ত এবং অসমঞ্জস" বলিয়াছেন।[৫] তাহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ভীষ্ম সুলভার মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন ; সুতরাং তিনি সুলভার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাস বা সর্বকর্ম ত্যাগ করত একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া একান্ত আবশ্যক ; সংসারের সমস্ত ব্যবহার যথাবৎ করিতে থাকিয়া কেহ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অতএব যুধিষ্ঠিরের পূর্বোক্ত প্রশ্নের তৎপ্রদত্ত উত্তর এই দাঁড়াইল যে গার্হস্থ্য পরিত্যাগ না করিয়া কেহ মোক্ষতত্ত্ব অধিগত হইতে পারে নাই ; যিনি অধিগত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং মনে করিতেন এবং তৎসমকালীন মুমুক্ষুমণ্ডলীতে যাঁহার ঐ সম্বন্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধিও ছিল, সেই বিদেহরাজ ধর্মধ্বজ জনক ভিক্ষুকী সুলভার নিকট পরাভূত হন।

ভীষ্ম সাক্ষাদ্ভাবেও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে মোক্ষলাভার্থ সন্ন্যাস অত্যাবশ্যক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শরশয্যাগত "সর্ববিদ্যার আধার" ভীষ্মের নিকট হইতে নানা বিষয়ের মধ্যে চাতুরাশ্রম্যেরও উপদেশ গ্রহণ করিতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে ভীষ্ম দেহত্যাগ করিলে ঐ সকল জ্ঞান লুপ্ত হইবে ; সেইজন্যই সেইগুলি লিখিয়া রাখিতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণা করিতেছেন।[৬] অনন্তর তিনি ভীষ্মকে বলেন, "হে ভারত, যে সকল চাতুরাশ্রম্যসংযুক্ত ধর্ম চাতুর্বর্ণ্যের বলিয়া সমাখ্যাত সেই সমস্ত নিশ্চয় তোমার বিদিত আছে। হে ভারত, চাতুর্বিদ্যায় ও চাতুর্হোত্রে যাহা যাহা প্রোক্ত হইয়াছে, সাংখ্যে ও যোগে যে সকল সনাতন ধর্ম নিয়ত হইয়াছে এবং যে যে ধর্ম চাতুর্বর্ণ্যের বিরুদ্ধ নহে বলিয়া উক্ত হয় এবং সেবিত হয়, তৎসমস্তই ব্যাখ্যার সহিত তোমার বিদিত আছে। যাহা প্রতিলোমপ্রসূত বর্ণসমূহের ধর্ম বলিয়া স্মৃত হয় তাহা এবং দেশ, জাতি ও কুলের উচিত ধর্মের লক্ষণ তুমি জান। যাহা বেদোক্ত এবং যাহা শিষ্টোক্ত, তৎসমস্ত সততই তোমার বিদিত আছে। ইতিহাস পুরাণসমূহের তাৎপর্য সম্পূর্ণই তোমার বিদিত আছে। সকল ধর্মশাস্ত্র তোমার মনে নিত্য

---

১) মহাভা, ১২।৩২০।১৬২'২—১৬৬'১

২) মহাভা, ১২।৩২০।১৭৩

৩) ঐ, ১২।৩২০।১৭৪

৪) মহাভা, ১২।৩২০।১৯০

৫) মহাভা, ১২।৩২০।১৭৬

৬) মহাভা, ১২।৪৬।২২—৩

পরমর্ষি ব্যাস বলেন যে ভীষ্ম মহর্ষি "মার্কণ্ডেয়ের মুখ হইতে সম্পূর্ণ যতিধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (মহাভা, ১২।৩৭।১৩'১)

স্থিত আছে।”[১] ভীষ্মও স্বীকার করেন যে, দৈহিক কষ্ট হেতু সেই সমস্ত পূর্বে বিস্মৃত হইলেও কৃষ্ণের প্রসাদে সদ্য তাঁহার স্মৃতি উদিত হইয়াছে। “যে ধর্মসমূহ বেদোক্ত এবং যে সকল বেদান্তাধিগত, তৎসমস্তই, হে অচ্যুত! তোমার বরদানে সম্যক্ দর্শন করিতেছি। যে ধর্ম শিষ্টগণ কর্তৃক প্রোক্ত, উহাও আমার হৃদয়ে বর্তমান আছে। হে জনার্দন! আমি দেশ, জাতি ও কুলের উচিত ধর্মের জ্ঞাতা। চারি আশ্রমের ধর্মসমূহে যে অর্থ, উহা আমার হৃদয়ে স্থিত আছে।”[২] পরে ভীষ্ম শান্তিপর্বের ৬০তম অধ্যায়ে চারিবর্ণের ধর্ম এবং ৬১-৬৬তম অধ্যায়ে চারি আশ্রমের ধর্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, “মহাশ্রম গার্হস্থ্য”, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্যচর্য। “আত্মবান্ এবং সংযতেন্দ্রিয় (ব্রাহ্মণ) কৃতকৃত্য হইয়া, স্ত্রীর সহিত কিংবা স্ত্রীকে ব্যতীত, গৃহাশ্রম হইতে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবেন। তথায় আরণ্যকশাস্ত্রসমূহ সম্যক্ অধ্যয়ন করত এবং তিনি ধর্মবিৎ ঊর্দ্ধরেতা হইয়া প্রব্রজ্যা করত অক্ষর-সাত্মতা লাভ করেন (‘প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্’)।”[৩] “বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্” (‘ক্ষেমাশ্রম প্রাপ্ত বিপ্রই অক্ষরসাত্বতা লাভ করেন’)।[৪] তিনি আরও বলেন যে মোক্ষকামী ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে, মধ্যের দুই আশ্রম গ্রহণ ব্যতীতও, ভৈক্ষচর্যাশ্রমগ্রহণে অধিকার প্রশস্ত।[৫] অনন্তর গার্হস্থ্যাশ্রমের ধর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে ভীষ্ম মহানুভব মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রোক্ত “মহান্ অর্থ এবং অত্যন্ত তপ প্রযুক্ত” ‘নারায়ণগীত’ বর্ণনা করেন,

> “সত্যার্জবং চাতিথিপূজনং চ
> ধর্মস্তথাঽর্থশ্চ রতিঃ স্বদারৈঃ।
> নিষেবিতব্যানি সুখানি লোকে
> হ্যস্মিন্ পরে চৈব মতং মমৈতৎ॥”[৬]

‘সত্য, আর্জব, অতিথিপূজন (প্রভৃতি) ধর্ম, অর্থ এবং স্বীয় স্ত্রীগণের সহিত রতি (অর্থাৎ কাম—এই ত্রিবর্গ) নিষেবণ কর্তব্য। কেননা, (তাহাতে) ইহলোকে, তথা পরলোকে, নিশ্চয় সুখসমূহ লাভ হয়। ইহা আমার মত।’[৭] এই ‘নারায়ণগীতে’র তাৎপর্য এই মনে হয় যে নারায়ণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে সদ্য ভৈক্ষ্যচর্যাশ্রমে প্রবেশ সঙ্গত মনে করিতেন না। চাতুরাশ্রম্যের মর্যাদা যথাযথ রক্ষা করা তিনি উচিত বলিয়া মনে করিতেন। ভীষ্ম অনন্তর বলেন, “যে ব্রাহ্মণ এই প্রকারে যজ্ঞশীল হইয়া গার্হস্থ্য যথাবৎ অধ্যাবাস করেন, তিনি গৃহস্থবৃত্তি সম্যক্ প্রবিশোধন করত স্বর্গে বিশুদ্ধ ফল প্রাপ্ত হন। দেহ পরিত্যাগের পর তাহার অভীষ্ট কামসমূহ অক্ষয় হয়,—

---

১) মহাভা, ১২।৫০।৩১·২—৩৬

২) মহাভা, ১২।৫৪।১৯—২১·১ ৩) মহাভা, ১২।৬১।৪—৫

৪) মহাভা, ১২।৬১।৯·১ আরও দেখ—১২।৬২।৬—৭

৫) “চরিতব্রহ্মচর্যস্য ব্রাহ্মণস্য বিশাম্পতে।
ভৈক্ষ্যচর্যাস্বধিকারঃ প্রশস্ত ইহ মোক্ষিণঃ॥”—(মহাভা, ১২।৬১।৭)

৬) মহাভা, ১২।৬১।১৪

৭) “মতং মমৈতৎ” (‘ইহা আমার মত’) এই বাক্যকে প্রাচীন নারায়ণগীতে’র অংশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অথবা উহাকে ভীষ্মের স্বোক্তি বলিয়াও গ্রহণ করিলে, বুঝা যাইবে যে ভীষ্ম নারায়ণের মত মানেন।

সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখ হইয়া অনন্ত হইয়া উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করা হয়।”[১] ভীষ্মের এই বিবরণ হইতে দেখা যায়, একমাত্র ভৈক্ষ্যচর্যাশ্রমী ব্রাহ্মণই অক্ষর-সাত্মতা লাভ করেন, সদ্‌গৃহস্থ স্বর্গে অনন্ত বিশুদ্ধ ফলসমূহ লাভ করেন মাত্র। সুতরাং মোক্ষলাভ করিতে হইলে ভৈক্ষ্যচর্যাশ্রম গ্রহণ করিতেই হইবে।

ভীষ্ম পরে বলেন যে ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত ঐ চারি আশ্রম ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণত্রয় অনুবর্তন করিতে চাহে না।[২] পরন্তু তাঁহার মত এই মনে হয় যে মনুষ্যমাত্রেরই উহা গ্রহণ করা উচিত। তাই তিনি উহাদিগকে “চারি মানবাশ্রম” বলিয়াছেন।[৩] তিনি স্পষ্টতওঃ বলিয়াছেন যে, স্বধর্মাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও জন্য ভৈক্ষ্যচর্যাশ্রম বিহিত হইয়াছে।[৪] ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে বেদসমূহ ও রাজশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবে; সন্তানোৎপাদনাদি কর্ম করিবে; সোমপান করিবে; ধর্মানুসারে সমস্ত প্রজাকে পালন করিবে; রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞসমূহ করিবে এবং তাহাদিগেতে ব্রাহ্মণগণকে বিদ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে; সংগ্রামে অল্প বা বহু বিজয় লাভ করিবে; এবং অন্তকাল সম্প্রাপ্ত হইলে, হে পাণ্ডব, হে ক্ষত্রিয়র্ষভ, প্রজাপালনসমর্থ পুত্রকে কিংবা অন্যগোত্রীয় প্রশস্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে স্থাপন করত পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃগণকে, (দেব)যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে এবং বেদসমূহ দ্বারা ঋষিগণকে যত্নতঃ যথাবিধি সম্যক্ অর্চনা করত আশ্রমান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিবে। হে রাজন্, সে অনুপূর্বী অনুসারে আশ্রমসমূহে গমন করত সিদ্ধি লাভ করে। হে রাজেন্দ্র, গৃহধর্ম পরিত্যাগী (ক্ষত্রিয়) রাজর্ষিরূপে কেবল জীবনরক্ষার আকাঙ্ক্ষায় ভৈক্ষ্যচর্যা আচরণ করিবে, ভোগের আকাঙ্ক্ষায় নহে।”[৫] ভীষ্ম ইহাও বলেন যে কাহারও কাহারও মতে চাতুরাশ্রম্য ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের জন্য বৈকল্পিক,—বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয় তাহারা গ্রহণ না করিতেও পারে।[৬] উঁহাদেব মতে, সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে সম্প্রলীন হয়, যেমন হাতীর পদচিহ্নের মধ্যে অপর সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন সম্প্রলীন হইয়া থাকে।[৭] “হে পাণ্ডব, চাতুরাশ্রম্যধর্ম, যতিধর্ম এবং লোকবেদোত্তরধর্মসমূহ ক্ষাত্রধর্মে সমাহিত।”[৮] ঐ বিষয়ে তাহারা মহারাজ মান্ধাতা ও দেবরাজ ইন্দ্রের রূপধারী বিষ্ণুর সংবাদ বর্ণনা করিয়া থাকেন।[৯] ক্ষাত্রধর্মের প্রশংসা করিয়া ইন্দ্র বলেন, “এই (ক্ষাত্র)ধর্মে সমস্ত ধর্ম প্রবিষ্ট। সেইহেতু (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) ইহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেন।”[১০] তবে তিনি ইহাও বলেন যে ব্রাহ্মণ বেদধর্মসমূহ এবং চাতুরাশ্রম্যধর্মসমূহ অবশ্যই পালন করিবেক, অন্য কোন ধর্ম আচরণ করিবেক না; অন্য প্রকার ধর্মাচরণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে।[১১] রাজধর্মের প্রশংসা করিয়া ভীষ্ম পরে বলেন যে রাজা ধর্মানুসারে সদ্ভাবে আপন কর্তব্য পালন করিলে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয়ও তাঁহার

---

১) মহাভা, ১২।৬১।১৬।৭

২) মহাভা, ১২।৬২।২

৩) মহাভা, ১২।৬৬।১

৪) মহাভা, ১২।৬৩।১৪

৫) মহাভা, ১২।৬৩।১৬—২২

৬) মহাভা, ১২।৬৩।২৩

৭) মহাভা, ১২।৬৩।২৫

৮) মহাভা, ১২।৬৪।১

৯) মহাভা, ১২।৬৪।১১—

১০) মহাভা, ১২।৬৪।২২'১ ; আরও দেখ—১২।৬৪।১৩০ ; ৬৫।১

১১) মহাভা, ১২।৬৫।৮—

হইয়া যায়।[১] কাম ও দ্বেষ রহিত এবং সর্বভূতে সমদর্শী রাজার দণ্ডনীতি দ্বারা ভৈক্ষ্যাশ্রমপদ হয়। যে রাজা জ্ঞানবিসর্গ এবং নিগ্রহানুগ্রহ জানে এবং সেই প্রকারে আচরণ করে, সেই ধীর ব্যক্তির ক্ষেমাশ্রমপদ হয় ইত্যাদি। "হে ভারত, যাঁহারা বনে আশ্রমসমূহে ধর্ম আচরণ করে, তাঁহারা যে ফল লাভ করেন, রাজা (প্রজা) রক্ষণ হইতে তাহার শতগুণ ধর্ম লাভ করে।[২] রাজধর্মের এই উচ্চ প্রশংসা করিলেও ইহা বলা যায় না যে রাজধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তর অবলম্বন করত বনে গমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উচিত নহে বলিয়া ভীষ্ম মনে করিতেন। কেননা, পরে আপদ্ধর্ম বর্ণনা কালেও তিনি আবার সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন। "জ্ঞানযুক্ত এবং জিতেন্দ্রিয় (ব্যক্তি গৃহ হইতে) নিষ্ক্রমণ করতঃ বনে আস্থিত হইয়া কালাপেক্ষী হইয়া আচরণ করিবে। ঐ প্রকারে সে ব্রহ্মভবনে সমর্থ হয়।"[৩] "হে রাজন্, যে গৃহ পরিত্যাগ করত একমাত্র মোক্ষেরই শরণ গ্রহণ করে, তাহার লোকসমূহ তেজোময় হয় এবং (এমন কি) কল্পান্তে (ও অর্থাৎ) শাশ্বতী সমা (থাকে)। প্রসন্নাত্মা, আত্মবিৎ এবং শুচি-কামে অনাবৃত্ত বলিয়াই শুচি, ব্যক্তি //

'সংন্যস্য সর্বকর্মাণি সংন্যস্য বিধিবত্তপঃ।
সংন্যস্য বিবিধা বিদ্যাঃ সর্বং সংন্যস্য চৈব হি॥'[৪]

সর্বকর্ম সংন্যাস করত, বিধিবৎ তপস্যা সংন্যাস করত এবং বিবিধ বিদ্যা সংন্যাস করত—সমস্তই সংন্যাস করত—ইহলোকে সৎকার লাভ করিয়া স্বর্গে সুমভিগমন করে।"[৫] সে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরাবর্তন করে না।[৬] অতঃপর তপস্যার প্রশংসায় তিনি বলিয়াছেন যে "সংন্যাসঃ পরমং তপঃ' ('সন্ন্যাসই পরম তপ')।[৭]

মোক্ষধর্ম বর্ণনার সময়েও ভীষ্ম বলিয়াছেন যে মোক্ষলাভের জন্য প্রব্রজ্যা অত্যাবশ্যক। "যে প্রকৃত কর্ম পরিত্যাগ করত নিত্য আত্মরতি(বান্) এবং মুনি (বা মননশীল) হয়, এবং সেইহেতু সর্বভূতের আত্মস্বরূপ হয়, সে উত্তমগতি লাভ করে।"[৮] পরে আবার যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, "কি প্রকার শীল, কি প্রকার সমাচার ও কি প্রকার বিদ্যা সম্পন্ন এবং কিংপরায়ণ ব্যক্তি যাহা প্রকৃতির পরে এবং ধ্রুব সেই ব্রহ্মের স্থান প্রাপ্ত হয়?"[৯] ভীষ্ম উত্তর করেন, "যে ব্যক্তি লঘ্বাহারী, জিতেন্দ্রিয় এবং মোক্ষধর্মসমূহে নিরত, সে যাহা প্রকৃতির পরে এবং ধ্রুব সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। স্বগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করত পরিব্রাজ্য গ্রহণ করিবে। লাভালাভে সম, সমুপোঢ় কামসমূহে নিরপেক্ষ এবং মুনি হইবে।" ইত্যাদি।[১০] এইরূপে

---

১) মহাভা, ১২।৬৫।৪—

২) মহাভা, ১১।৬৬।৪১ ৩) মহাভা, ১২।১৬০।২৫

৪) মহাভা, ১২।১৬০।৩০

৫) মহাভা, ১২।১৬০।২৯—৩১ ৬) মহাভা, ১২।১৬০।৩২—৩

৭) মহাভা, ১২।১৬১।১৯·২ ৮) মহাভা, ১২।১৯৪।৪৬

৯) মহাভা, ১২।২৭৮।১ ; ১২।২২৯।১ ('কিংপরায়ণ' স্থলে 'কিংপরাক্রম' পাঠান্তরে)।

১০) মহাভা, ১২।২৭৮।২—'পরমং' স্থলে 'ব্রহ্মণঃ' পাঠান্তরে ১২।২৭৮।২ শোক অন্যত্রও (১২।২২৯।২) আছে।

তিনি "পরিব্রাজক-আশ্রমে" অবশ্য পালনীয় ধর্মসমূহ বর্ণনা করেন।[১] ঐ আশ্রমস্থ ব্যক্তি পুনরায় "গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ আশ্রমে কখনও সংসক্ত হইবে না।"[২] "বিদ্বান ব্যক্তিদিগের এই কৃৎস্ন মোক্ষযান (মহর্ষি) হারীত বলিয়াছেন। ঐ মোক্ষ জ্ঞানীদিগেরই জন্য। অজ্ঞানীদিগের (উহাতে প্রযত্ন করা কেবলমাত্র) শ্রমই হইবে। যে সর্বভূতকে অভয় প্রদান করত গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করে, তাহার লোকসমূহ তেজোময় হয় এবং সে আনন্ত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।"[৩] এই প্রকারে মোক্ষলাভার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ অত্যাবশ্যক বলিয়া শুনিয়া যুধিষ্ঠির আক্ষেপ করিয়া বলেন, "হে পিতামহ, কখন আমরা দুঃখ বলিয়া খ্যাত (এই সংসারধর্মের) সংন্যাস করিব? ইহা শরীরিগণের পক্ষে দুঃখই। হে পিতামহ, সংশিতব্রত মুনিগণ (পঞ্চ) ইন্দ্রিয়ার্থ এবং (তিন) গুণ—এই অষ্ট হইতে, (উহাদের) হেতুভূত পঞ্চ (মহাভূত) হইতে এবং সপ্তদশ (অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর) হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। হে পরন্তপ, কখন আমরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিব?"[৪] উত্তরে ভীষ্ম উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে বলেন। "কালেনৈব গমিষ্যথ" ('কালে তোমরা নিশ্চয় গমন করিবে')।[৫] ইহার পর আর বলা যায় না যে ভীষ্ম গার্হস্থ্যপরিত্যাগ করত প্রব্রজ্যা অবলম্বনের বিরোধী ছিলেন,—তিনি তিলকের ব্যাখ্যানুযায়ী নিষ্কামকর্মবাদী ছিলেন। অন্যত্র ভীষ্ম এই বলিয়া প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের নিন্দা করিয়াছেন, "পরন্ত আমি অপর এক প্রমাণ বলিতেছি। উহা পুরাণ, বিধি কর্তৃক নির্মিত, বেদসমূহে পরিনিষ্ঠিত এবং ঋষিগণ কর্তৃক সেবিত। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম প্রজার্থিগণেরই জন্য উদাহৃত। পরন্ত, হে রাজশার্দুল, যেমন (পূর্বে) উক্ত হইয়াছে, উহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের জন্য নহে।"[৬]

(৪) এখন জনকের দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যাইবে। ঐ দৃষ্টান্তটি 'গীতা'য়ও প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে আসক্তি রহিত হইয়া কর্তব্য কর্ম করিয়া লোক পরম পদ বা মোক্ষ পাইতে পারে।[৭] তাহার দৃষ্টান্তরূপে তিনি জনকাদির নাম করিয়াছেন।

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।"[৮]

'কেননা, জনকাদি কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধিতে (বা মোক্ষে)[৯] আস্থিত।' 'আদি' পদে আচার্য শঙ্কর উপনিষদে প্রসিদ্ধ (কেকয়-রাজ) অশ্বপতির নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ বচনের অক্ষরার্থ, তাঁহার মতে, এই,—জনক, অশ্বপতি, প্রভৃতি বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়গণ কর্ম দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থ প্রবৃত্ত

---

[১] মহাভা, ১২।২৭৮।১৮ [২] মহাভা, ১২।২৭৮।২০·১ [৩] মহাভা, ১২।২৭৮।২১—২ [৪] মহাভা, ১২।২৭৯।৩—৫

[৫] মহাভা, ১২।২৭৯।৭ [৬] মহাভা, ১১।১১৫।৫০—১ [৭] গীতা, ৩।১৯·২ [৮] ঐ, ৩।২০·১

[৯] 'মহাভারত'-কালে 'সংসিদ্ধি' শব্দ কেবল 'মোক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হইত কিনা সন্দেহ। কেননা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে মহাবীর ভীষ্ম স্বপক্ষীয় বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ, তোমাদিগের স্বর্গলাভার্থ ইহাই মহান্ মুক্ত পথ। ইহার দ্বারা ইন্দ্রের ও ব্রহ্মার সহলোকতায় গমন কর। ইহাই পূর্ব পূর্বতর ব্যক্তিগণ দ্বারা কৃত তোমাদিগের শাশ্বত পন্থা। সুতরাং অব্যগ্রচিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ, নৃগ (প্রভৃতি) সংসিদ্ধগণ ঈদৃশ কর্মসমূহ দ্বারা পরম স্থানে গিয়াছেন।" (মহাভা, ৬।১৭।৮-১০) পূর্বাপর বিচার দ্বারা অবগতি হয় যে ঐখানে ইন্দ্রলোক বা ব্রহ্মলোককে 'পরম স্থান' এবং তৎপ্রাপ্তিকে 'সংসিদ্ধি'-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং 'সংসিদ্ধি' মোক্ষ নহে। অন্যপ্রকারেও তাহা জানা যায়। ঐ বচন মতে নাভাগাদি 'সংসিদ্ধ'। মহাভারতপুরাণাদি হইতে জানা যায় যে উঁহারা স্বর্গেই গিয়াছিলেন এবং সেইখান হইতে উঁহাদের পতনও হয়। সুতরাং উঁহারা মুক্ত ছিলেন না।

হইয়াছিলেন। তিলকের মতে, উহার ভাবার্থ এই যে জনকাদি কর্ম দ্বারা সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। ইহার উপরে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী "অশ্বপতি কিংবা জনক রাজকার্য ছাড়িয়া কর্মপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এই রূপ কোথাও বর্ণনা নাই" ইত্যাদি।[১] মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতে আজকাল অনেকেই কথায় কথায় জনকের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। বিশেষভাবে সেই কারণেই উহার প্রকৃত মর্ম আলোচনা করা উচিত মনে করি।

জনকের দৃষ্টান্তটি যে প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'যোগবশিষ্ঠ মহারামায়ণে'ও উহার উল্লেখ আছে। তাহাতে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে জনকরাজার ন্যায় বিহার করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। "হে রাঘব, যেমন জনক রাজা জ্ঞেয়কে জ্ঞাত হইয়াও বিহার করেন, তেমন তুমিও আত্মজ্ঞানাভ্যাসপর হইয়া বিহার কর। জাগ্রতে ও (নিদ্রিত থাকিতে এবং চলিতেও) স্থিত থাকিতে, (সংসারব্যবহাররূপ) কার্যে এবং (নিদ্রা ও সমাধিরূপ) অকার্যে বিহারশীল তাঁহার এই নিশ্চয় (অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধির জন্য আত্মজ্ঞানাভ্যাস দ্বারা হৃদয়স্থ অবিদ্যাকে ছেদন করিতে দৃঢ় নিশ্চয়) হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার জ্ঞান (উদয় হয়) এবং তদ্দ্বারা (স্বরূপের) সত্যতা (সিদ্ধি হয়)।'[২] একটা স্মৃতিবচনও আছে,—

"বিবেকী সর্বদা মুক্তঃ কুর্বতো নাস্তি কর্তৃতা।
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণজনকৌ যথা॥"[৩]

'বিবেকী ব্যক্তি সর্বদা মুক্ত। সর্ব কর্ম করিতে থাকিলেও নির্লেপতা আশ্রয় হেতু তাহার কর্তৃতা নাই। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং জনক।'[৪]

পরন্তু ঐ জনক কে? পুরাণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির তনয় 'জনক' নামে প্রসিদ্ধ হন। অতঃপর তাঁহার বংশীয় সকল রাজাই 'জনক' নামে অভিহিত হইতে থাকেন।[৫] 'মহাভারতে'র মোক্ষধর্মপর্বে কতিপয় জনক রাজার নাম পাওয়া যায়; যথা জনদেব জনক, ধর্মধ্বজ জনক, করাল জনক, দৈবরাতি জনক, প্রভৃতি। কোন কোন পুরাণ হইতে ইহাও জানা যায় যে প্রায় সকল জনক অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন।[৬] পরন্তু সকল জনকই যে জ্ঞানোত্তরও রাজকার্যাদি যথাপূর্ব করিতেন তাহা নহে। কোন কোন জনক সন্ন্যাসও করিয়াছিলেন। 'মহাভারতে'ই তাহার উল্লেখ আছে। তাই প্রশ্ন হয় 'গীতা'তে কোন্ জনককে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এক জন জনক রাজা শ্রুতিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ দেখা যায়।[৭] তাঁহার সভায় ব্রহ্মবিদ্শ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অপর ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণের ব্রহ্মবিচার এবং তাঁহার প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' লিপিবদ্ধ আছে। ঐ উপদেশ লাভের পরে ঐ জনক কি করেন, তাহা তথায় বিবৃত হয় নাই। 'জাবালোপনিষদে' আছে,[৮] বৈদেহ জনক

---

১) ভগবদ্গীতারহস্য, বাংলাভাষান্তর, ৩১৭ পৃষ্ঠা; আরও দেখ—৩১৪ ও ৩১৬ পৃষ্ঠা

২) 'যোগবাশিষ্ঠমহারামায়ণ,' ৬(১)।১১।৭—৮

৩) 'কঠোপনিষদে'র (২।১৯) শঙ্করভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি এই স্মৃতিবচনটি অনুবাদ করিয়াছেন।

৪) শ্রীপতিও (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বলিয়াছেন। "জনকাদিব্রহ্মবিদামপি পূর্ববদ্ব্যবহারো দৃশ্যতে।" (শ্রীকরভাষ্য, ৪৮ পৃষ্ঠা)

৫) যথা, দেখ—দেবীভাগপু, ৬।১৫।৩০

৬) যথা, বিষ্ণুপু, ৪।৫।৩৫; (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।১৩।২৭

৭) যথা, শতব্রা (মাধ্য), ১১।৩।১।২; ১১।৪।৩।২০; ৬।২।১; ইত্যাদি; বৃহউ, ৩।১।১, ৪।১।১; ইত্যাদি; জৈমিব্রা, ১।১৯।২; কৌষীব্রাউ, ৪।১

৮) জাবালউ, ৪

যাজ্ঞবল্ক্যকে সন্ন্যাস বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন ("ভগবন্ সন্ন্যাসং ব্রূহীতি")। তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস-সমর্থক সেই সুপ্রসিদ্ধ বচনটি বলেন।

"ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্‌বা বনাদ্‌বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ।"

জনক তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। সুতরাং জনক সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন, বলা যায় না। 'মহাভারতে' দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যিনি ব্রহ্মোপদেশ পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম দৈবরাতি জনক এবং ঐ উপদেশ প্রাপ্তির পর তিনি রাজপাট পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। "মিথিলাধিপ তখন পুত্রকে বিদেহরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যতিধর্ম অবলম্বন করত বাস করিতে লাগিলেন ইত্যাদি।[১] এক জন সন্ন্যাসী জনকের উল্লেখ 'মহাভারতে' অর্জুন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরে যখন যুধিষ্ঠির নিহত আত্মীয়-স্বজনগণের শোকে অভিসন্তপ্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করত বনে যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহাকে প্রতিবাধা দিতে গিয়া অর্জুন সন্ন্যাসী জনক ও তাঁহার ভার্যার সংবাদরূপ পুরাবৃত্ত বর্ণনা করেন।[২] "বিদেহরাজ জনক পুত্র, কলত্রসকল, ধনসমূহ, বিবিধরত্নসমূহ এবং (ইহপরলোকে অভ্যুদয়লাভের) পন্থা পাবককে পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করেন ('মৌঢ্যমাস্থিতঃ')।"[৩] তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করত "নিষ্ক্রিয় হইয়া পরিব্রজ্যা করিতেন।"[৪] তাঁহার কুণ্ডিকা ও ত্রিদণ্ড ("ত্রিবিষ্টব্দং") ছিল।[৫] একদিন তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে মুষ্টি মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্বের স্ত্রী কৌশল্যা কঠোর ভৎর্সনা করেন। অর্জুন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে "তত্ত্বজ্ঞো জনকো রাজা লোকেঽস্মিন্নিতি গীয়তে".('রাজা জনক তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন')।[৬] সুতরাং জ্ঞানোত্তর কর্মসন্ন্যাসী জনকের প্রবাদ জ্ঞানোত্তর কর্মী জনকের প্রবাদেরই মত প্রাচীন। কর্মী জনকের দৃষ্টান্ত কৃষ্ণ অর্জুনকে, আর সন্ন্যাসী জনকের দৃষ্টান্ত অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে দেন।

'বিষ্ণুপুরাণে' রাজা কেশিধ্বজ জনক এবং রাজা খাণ্ডিক্য জনকের কথা আছে।[৭] কথিত হইয়াছে যে তাঁহাদের সময়ে কেশিধ্বজ অদ্বিতীয় অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ এবং খাণ্ডিক্য অদ্বিতীয় কর্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। কেশিধ্বজ হইতে অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ পাইয়া খাণ্ডিক্য রাজ্য ত্যাগ করত বনে গমন করেন এবং সাধনবলে ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হন, আর কেশিধ্বজ বিমুক্ত্যর্থ স্বকর্মক্ষেপণোন্মুখ হইয়া বিষয়সমূহ ভোগ করেন এবং অনাসক্তভাবে ('অনভিসংহিতম্') কর্ম করেন। কল্যাণপ্রদ উপভোগসমূহ দ্বারা তাঁহার পাপ ও মল ক্ষয় হইলে তিনি তাপ(ত্রয়)-ক্ষয়-ফলিক আত্যন্তিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।"[৮]

'মহোপনিষদে'[৯] এবং 'মহাভারতে'[১০] তথা পুরাণাদি অপর কোন কোন গ্রন্থে, বর্ণিত

---

১) মহাভা, ১২।৩১৮।৯৭- ২) মহাভা, ১২।১৮ অধ্যায়। ৩) মহাভা, ১২।১৮।৪ ৪) মহাভা, ১২।১৮।১০, ১৬

৫) মহাভা, ১২।১৮।১৯ ৬) মহাভা, ১২।১৮।৩৭·১ ৭) বিষ্ণুপু, ৬।৬-৭ অধ্যায়।

৮) বিষ্ণুপু, ৬।৭।১০৩-৬ ৯) মহোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়। ১০) মহাভা, ১২।৩২৫-৬ অধ্যায়।

আছে যে পরমর্ষি ব্যাস আপন "মোক্ষধর্মবিশারদ" পুত্র শুককে "নিখিল মোক্ষার্থের" জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শেষে মিথিলার রাজা জনকের নিকট পাঠান। ঐ জনকের নাম উল্লিখিত নাই। তবে তিনি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন এবং "মোক্ষধর্মবিশারদ" বা "মোক্ষধর্ম্মার্থকোবিদ" ছিলেন। ব্যাস এই বলিয়া শুককে জনকের নিকট পাঠান যে "তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে তোমার সংশয় ছেদন করিবেন।"[১] "মোক্ষার্থ ব্রাহ্মণের ইহসংসারে কি করা উচিত? মোক্ষের স্বরূপ কি? মোক্ষ কি প্রকারে পাওয়া যায়? জ্ঞানের দ্বারা, কিংবা তপস্যার দ্বারা?"[২] শুকের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে জনক চাতুরাশ্রম্যের কথা বলেন—ব্রাহ্মণকে পূর পর ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বন্যাশ্রম এবং ব্রহ্মাশ্রম আশ্রয় করিতে হইবে।[৩] তখন শুক জিজ্ঞাসা করেন, 'যাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মচর্যাবস্থায় শাশ্বত জ্ঞান ও বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই হেতু যে নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছে তাহাকেও কি পরবর্তী আশ্রমত্রয়ে যথাক্রমে অবশ্যই বাস করিতে হইবে? ঐ বিষয়ে বেদার্থতত্ত্ব কি?'[৪] জনক উত্তর করেন, "লোকসমূহের অনুচ্ছেদার্থ এবং (লোকযাত্রানির্বাহক) কর্মসমূহের অনুচ্ছেদার্থ চাতুরাশ্রম্যধর্ম প্রাচীনগণ কর্তৃক আচরিত (হইত এবং তাহাই সাধারণত সকলের অনুসরণ করা উচিত)। কর্মসমূহের এই ক্রমযোগ দ্বারা বহুজন্মে শুভাশুভ কর্ম পরিত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হয়। এই সংসারে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া সম্ভাবিত ইন্দ্রিয় দ্বারা (কর্ম করিয়া) এই জীব চিত্তশুদ্ধি লাভ করে এবং তাহাতে প্রথমাশ্রমেই মোক্ষ লাভ করে। তাহা লাভ করিলে, মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ এবং পরমার্থাকাঙ্ক্ষী বিদ্বানের অপর তিন আশ্রমে আর কি প্রয়োজন?"[৫] জনক আরও বলেন যে মোক্ষ বিষয়ে রাজর্ষি যযাতি কর্তৃক গীত গাথা মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ দ্বিজগণ ধারণা করিয়া থাকেন।[৬] কোন্ অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হয় ("ব্রহ্ম সম্পদ্যতে") বা ব্রহ্মত্ব লাভ করে ("ব্রহ্মত্বমশ্নুতে") যযাতি তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। উহাতেও ভিক্ষুর উল্লেখ আছে।[৭] 'মহাভারতে'র এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে ঐ ব্যাসের শিষ্য জনক,—যিনি শুকদেবকে উপদেশ করেন,[৮] তিনি চাতুরাশ্রম্যবাদী ছিলেন,—মোক্ষলাভার্থ কর্মসন্ন্যাস কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। 'মহোপনিষদে' আছে, জনক শুকের নিকট যে বিজ্ঞান

---

১) মহাভা, ১২।৩২৬।১১ ২) মহাভা, ১২।৩২৬।১৩

৩) মহাভা, ১২।৩২৬।১৪-৯ ৪) মহাভা, ১২।৩২৬।২০-১ ৫) মহাভা, ১২।৩২৬।২৪-৭

৬) মহাভা, ১২।৩২৬।৩২-৪০ ৭) মহাভা, ১২।৩২৬।৩৯

৮) এখানে বোধ হয় বলা উচিৎ যে জনকের নিকটে গমনের পূর্বেই শুক তিনি স্বয়ং যতটা মনে করিতেছিলেন তদপেক্ষা "অধিক বিজ্ঞান, অধিক গতি এবং অধিক ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। জনক নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (মহাভা, ১২।৩২৬।৪৪) উহার কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"বাল্যাদ্বা সংশয়াদ্বাঽপি ভয়াদ্বাঽপ্যবিমোক্ষজাৎ।
উৎপন্নে চাপি বিজ্ঞানে নাধিগচ্ছতি তাং গতিম্॥ (মহাভা, ১২।৩২৬।৪৫)

'বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও,হয়ত বাল্য, অথবা সংশয়, অথবা অবিমোক্ষ (অর্থাৎ মোক্ষ হয় নাই বলিয়া ধারণা) জনিত ভয় হেতু, তুমি সেই গতি বুঝিতে পরিতেছ না।

"ভবাংশ্চোৎপন্নবিজ্ঞানঃ স্থিরবুদ্ধিরলোলুপঃ।
ব্যবসায়াদৃতে ব্রহ্মন্নাসাদয়তি তৎপরম্॥ (ঐ, ১২।৩২৬।৪৭)

দ্বারা মনুষ্য সদ্য জীবন্মুক্তত্ব লাভ করে, তাহা এবং জীবন্মুক্তের লক্ষণ বর্ণনা করেন।[১] উহাতে কর্মসন্ন্যাসের যেমন সপক্ষে তেমন বিপক্ষেও কিছুই নাই। উহার এক বচন এই,—

"যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্যপি নিস্পৃহঃ।
পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥"[২]

'যে সমস্ত জাগতিক বিষয়ের ব্যবহার করিতে থাকিলেও উহাদিগের প্রতি, যেমন পরার্থের প্রতি তেমন, নিস্পৃহ, (সুতরাং) পূর্ণাত্মা সে জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হয়।' এই বচন হইতে ইহা জানা যায় যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জাগতিক ব্যবহার করিতেও পারে। পরন্তু ইহাও বলা যায় না যে জীবন্মুক্তকে সাংসারিক ব্যবহার যথাপূর্ব করিতেই হইবে বলিয়া জনক মনে করিতেন। কথিত হইয়াছে যে তাঁহার নিকট উপদেশ প্রাপ্তি পর শুক মেরুপর্বতের শিখরে গিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হন এবং কালান্তরে তৈলহীন দীপবৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হন,—সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায় অমল পরমাত্মায় একতা প্রাপ্ত হন।[৩] 'মহাভারতে'ও আছে যে জনকের নিকট উপদেশ প্রাপ্তির পর শুক হিমালয় পর্বতে চলিয়া যান। জনকের নিকট গমনের পূর্বেই শুকের "ভোগেভ্যো হ্যরতির্জাতা দৃশ্যাদ্বা সকলাদিহ"।[৪]

এইরূপে দেখা যায়, কোন কোন জনক জ্ঞানোত্তর সংসার ব্যবহার পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসী হইয়াছেন; আর কেহ কেহ মোক্ষলাভার্থ কর্মসন্ন্যাস অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, আর কেহ কেহ জ্ঞানোত্তর কর্ম করিয়াছেন। তিলক একবার বলিয়াছেন যে গীতার পূর্বোদ্ধৃত বচনে ধর্মধ্বজ জনককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।[৫] অন্যত্র তাঁহার লেখা হইতে মনে হয় যে উনি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ জনকই।[৬] এইখানে তিনি ভুল করিয়াছেন। কেননা, 'মহাভারত' হইতে জানা যায় যে শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ জনক এবং ধর্মধ্বজ জনক ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি লিখিয়াছেন, 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে জনকের মার্গ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াত্মক ছিল।[৭] কিঞ্চিৎমাত্র পূর্বে উল্লিখিত 'মহাভারতে'র প্রমাণে তাঁহার এই উক্তিও ভুল সিদ্ধ হয়। ধর্মধ্বজ জনক জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন এবং তিনি অনাসক্তভাবে ব্যবহারিক কর্ম করিতেন, সত্য।

'হে ব্রহ্মন্, তোমার বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে এবং তোমায় মনে বাসনালোলুপতা নাই। পরন্তু ব্যবসায় ব্যতীত তুমি সেই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করিতেছ না।' 'মহোপনিষদে'ও আছে জনক শুককে সেই প্রকার বলেন, "(সেই পরমতত্ত্ব তুমি স্বয়ংই জানিয়াছ এবং পুনঃ গুরু (ব্যাস) হইতেও শুনিয়াছ। পরন্তু স্বসঙ্কল্পবশতই বদ্ধ আছ। নিঃসঙ্কল্প হইলেই মুক্তি হয়। যেই পরমাত্মাকে জানিতে হয়, তাঁহার দ্বারা (অর্থাৎ তাঁহার কৃপায়) তুমি স্বয়ংই জানিয়াছ। কেননা, সমস্ত ভোগ্য বস্তুতে,—এমন কি ইহসংসারের সমস্ত দৃশ্য বস্তুতে তোমার অরতি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণচিত্ত তোমার দ্বারা অখিল প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্, তুমি স্বরূপে স্থিত আছে। তুমি মুক্ত। ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর।" (২।৭০-৭২) জনক শুকের মনের সংশয় দূর করেন মাত্র। তাহাতে শুক বিশুদ্ধ ব্যবসায় দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করত পরম গতি প্রাপ্ত হন। (মহাভা, ১২।৩২৬।৪৬)

১) মহোপনি, ২।৩৭—

২) মহোপনিষৎ, ২।৬২ ৩) ঐ, ২।৭০-৭ ৪) ঐ, ২।৭২˙২

৫) 'ভগবদ্গীতারহস্য, বাংলাভাষান্তর, ৩২৬ পৃষ্ঠা। কাশ্মীরের প্রাচীন গীতাভাষ্যকার রামকণ্ঠের (৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) মতও তাহাই।

৬) ঐ, ৫৫১ ও ৫৬২ পৃষ্ঠা দেখ। ৭) ঐ, ৫৫১ পৃষ্ঠা

পরন্তু 'মহাভারতে' আছে যে তাঁহার মতবাদ ভিক্ষুকী সুলভা কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছিল। উপরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 'মহাভারত'কারের মতে তিনি কর্ম দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে প্রাচীন নারায়ণীধর্মকে প্রবৃত্তিপরক বলিয়া সিদ্ধ করিতে 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যান হইতে যে প্রমাণ তিলক উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রমাণে তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য সিদ্ধ হয় না ; কেননা উহার তাৎপর্য যেরূপ বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপ নহে, ভিন্ন। অধিকন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে স্বমতের সমর্থনে যে পাঁচটি দৃষ্টান্ত তিলক দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান তিনটি, বিশেষ পর্যালোচনা করিলে, তাঁহার মতের প্রতিকূলে বলিয়া সিদ্ধ হয়। যাহা হইক, এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে তিলকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের,—অর্থাৎ নারায়ণীয়ধর্ম প্রকৃত পক্ষে আমরণ প্রবৃত্তিপরক কিনা,—তন্মতে চাতুর্বর্ণ্যবিহিত সমস্ত শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ না করিয়া অনাসক্তভাবে আমরণ, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেও, করিতে হয় কিনা, উহাতে চাতুরাশ্রম্যবাদ অস্বীকৃত হইয়াছে কিনা, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সাত্বতধর্মের আদি প্রবর্তক মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি। ভগবান্ নারায়ণ বলেন, তাঁহারা মুখ্য বেদবিৎ এবং বেদাচার্য (রূপে) কল্পিত। তাঁহারা প্রবৃত্তিধর্মীও ; এবং প্রজাপতিরূপে কল্পিত।”[১] নারায়ণ ঋষিও তাঁহাদিগকে, তথা অপর ১৪ জনকে প্রজাপতি বলিয়াছেন।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন যে উঁহারা দৈব এবং পিত্র্যকর্মের কর্তব্যতা বিষয়ে ভগবান্ নারায়ণের সনাতন ধর্মের মর্যাদার সম্মান করিতেন।[৩] প্রাচীনকালে যাঁহারা প্রবৃত্তিধর্মে থাকিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'প্রজাপতি' বলিয়া খ্যাত হন। সাত্বতধর্মের আদি প্রবর্তক মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি এবং উহার তদর্বাক অন্যতম প্রবর্তক স্বায়ম্ভুব মনু এই আট জন 'অষ্ট প্রকৃতি' বলিয়া খ্যাত হন ; কেননা, সাংখ্যের অষ্ট প্রকৃতির ন্যায় তাঁহাদিগেতে, পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, "লোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত" ; লোকপিতামহ ব্রহ্মা "লোকসিদ্ধ্যর্থ" "বেদবেদাঙ্গসংযুক্ত এবং যজ্ঞযজ্ঞাঙ্গসংযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করেন ; এবং "এই সমস্ত জগৎ ঐ অষ্ট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।”[৪] ভীষ্মও সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৫] ঐ সকল উক্তির তাৎপর্য এইমাত্র যে তাঁহারা সংসারের সমস্ত ব্যবহার সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন এবং তদ্দ্বারা সমাজশৃঙ্খলা উত্তমরূপে পরিচালিত হইতে থাকে, তাহাতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাহা হইতে সহজে অনুমান হইবে যে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্তিত শাস্ত্র প্রবৃত্তিবিষয়কই। ভীষ্মও বলিয়াছেন তাহারা "অনুত্তম লোকধর্ম" রচনা করেন।[৬]

নারায়ণীয়ধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি, তথা নর ঋষি, আহ্নিক ক্রিয়া এবং দৈব ও পিত্র্য কর্ম করিতেন।[৭] তখন তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থা,—তাঁহাদের ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ হইয়াছে।[৮] ঐ

---

১) মহাভা, ১২।৩৪০।৭০ ২) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৫-৭·১ ৩) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৭·২ (পূর্বে দেখ)।

৪) মহাভা, ১২।৩৪০।৩৪-৬ ৫) মহাভা, ১২।৩৬৫।২৯-৩০

৬) মহাভা, ১২।৩৩৫।২৯·১ ; আর ও দেখ—১২।৩৩৫।৩২-৩

৭) যথা দেখ—মহাভা, ১২।৩৩৪।১৫·১, ১৯·২-২০, ২২·১ ৮) পূর্বে দেখ।

অবস্থায়ও তাঁহাদিগকে আহ্নিকাদি করিতে দেখিয়া নারদ অতীব বিস্মিত হন এবং তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা উত্তর করেন, "হে ব্রহ্মন্, তাঁহার (ভগবান্ নারায়ণের) দ্বারা এই লোকভাবিনী মর্যাদা প্রথিত হইয়াছে যে 'দৈব ও পিত্র্য কর্ম কর্তব্য।'—ইহাই তাঁহার অনুশাসন।"[১] তাঁহারা ভগবানের অনুশাসন পালন করিতেছেন মাত্র। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহাদের মতে জীবসেবা ভগবৎসেবা, এবং জ্ঞানপূর্বক তাহা করিলে ভগবৎপ্রসাদে মানুষের পরমার্থলাভ হয়। তাঁহাদিগের এই প্রকার মতবাদ হইতে, তথা তাঁহাদিগের আচরণ হইতে মনে হয়, তাঁহাদিগের মতে, সিদ্ধাবস্থার পরেও সমস্ত ব্যবহার পূর্ববৎ যথাযথ অবশ্যই কর্তব্য। সুতরাং তাঁহাদের কর্তৃক প্রবর্তিত ভাগবতধর্মের সিদ্ধান্তও তাহাই বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। ভীষ্ম বলিয়াছেন—

"প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমৃষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ।"[২]

'ঋষি নারায়ণ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলিয়াছেন।' '(বিষ্ণু)ভাগবৎপুরাণে' আছে, ভগবান্ নারায়ণ, নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে "নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম" ('নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ উপদেশ করিয়াছেন এবং কর্ম আচরণ করিয়াছেন')।[৩]

এই সকল হইতে মনে হইবে যে প্রাচীন ভাগবতধর্ম কেবল প্রবৃত্তিপরকই ছিল। পরন্তু আরও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ঐ অনুমান সমীচীন নহে। আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব।

(১·১) নারায়ণীয়াখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে সপ্তর্ষিগণ সাত্বতশাস্ত্র রচনা করত প্রথমে ভগবান্ নারায়ণকে শুনান। ভগবান্ বলেন, উহা উত্তম হইয়াছে।

"লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ধর্মঃ প্রবর্ততে।
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি॥"[৪]

'কেননা, উহা হইতে সম্পূর্ণ লোকতন্ত্রের ধর্ম প্রবর্তিত হইবে, যেহেতু উহা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় পক্ষেই যাইবে।' উহা দ্বারা ব্রহ্মবাদিগণ, মরীচ্যাদি ঋষিগণ এবং অপর সকলে নিজ নিজ অধিকারে বর্তমান থাকিবে।[৫] ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে মূল সাত্বতশাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ উভয়ই সমর্থিত হইয়াছিল। উক্ত বচনে ভগবান্ যে লোকতন্ত্রের 'কৃৎস্ন' বিশেষণ দিয়াছেন তাহার মর্মের প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। লোকতন্ত্রে প্রবৃত্তিপরায়ণ এবং নিবৃত্তিপরায়ণ উভয় প্রকৃতিরই লোক আছে। সাত্বতধর্ম কেবল প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ক হইলে উহাকে কৃৎস্ন লোকতন্ত্রের ধর্ম বলা যাইতে পারিত না। যেহেতু উহা উভয়বিষয়কই সেই হেতু ভগবান্ বলিয়াছেন যে উহা সম্পূর্ণ লোকতন্ত্রের ধর্ম এবং সেই কারণে উহা উত্তম। ভীষ্ম

---

[১] মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৪

[২] মহাভা, ১২।২১৭।২·২ তিলকের মতে, এই বচনের তাৎপর্য এই যে নারায়ণ ঋষিদ্বারা প্রবর্তিত ধর্ম—আমরণ প্রবৃত্তিমূলক। ('ভগবদ্গীতারহস্য', বাংলা—ভাষান্তর, ৩৪৪ পৃষ্ঠা) বেঙ্কটনাথ (জন্ম ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) "নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমৃষির্নারায়ণেঽব্রবীৎ" পাঠ ধরিয়াছেন। (পরে ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১ম পাদটীকা দেখ)

[৩] (বিষ্ণু) ভাগপু, ১১।৪।৬

[৪] মহাভা, ১২।৩৩৫।৩৯·২-৪০·১ [৫] মহাভা, ১২।৩৩৫।৪১-৪৬·১

বলিয়াছেন, "সর্বধর্মপ্রবর্তক এবং সর্বলোকের ধারণা-(কারক ঐ সপ্তর্ষিগণ) সাঙ্গোপনিষৎ (সাত্বত) শাস্ত্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে সমর্পণ পূর্বক তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া ('তপসে কৃতনিশ্চয়াঃ') যথাভিলষিত দেশে গমন করেন।"[১] সুতরাং মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণ প্রথমে প্রবৃত্তিধর্মপরায়ণ হইলেও পরে নিবৃত্তিধর্মপরায়ণ হন। বোধ হয় এইখানেই ব্রহ্মার অপর সাত মানস পুত্র,—সনৎকুমারাদি সপ্তর্ষি, হইতে উঁহাদের পার্থক্য। সনৎকুমারাদি প্রথম হইতেই নিবৃত্তিধর্মপরায়ণ হন। "উহাদের বিজ্ঞান স্বয়ং (বা স্বভাবতঃই) উৎপন্ন হয়। (তাই উহারা) নিবৃত্তিধর্মে আস্থিত হন; উঁহারা মুখ্য যোগবিৎ, সাংখ্য-জ্ঞানবিশারদ, ধর্মশাস্ত্রসমূহে আচার্য এবং মোক্ষধর্মপ্রবর্তক।"[২] আর মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি—ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র, "বেদবিৎ ও বেদাচার্য" ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে প্রবৃত্তিধর্মপরায়ণ হন,[৩] পরে সাধন বলে বিজ্ঞান লাভ করত নিবৃত্তিধর্ম আশ্রয় করেন।

(১·২) শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন যে তিনি সাধারণতঃ পরমনিবৃত্তিভাবে থাকেন।[৪] 'নিবৃত্তি' সংজ্ঞার ব্যাখ্যাও তিনি করেন।

"নির্বাণং সর্বধর্মাণাং নিবৃত্তিঃ পরমা স্মৃতা।"[৫]

সর্বধর্মের নির্বাণ পরম নিবৃত্তি বলিয়া স্মৃত হয়।' তিনি আরও উপদেশ করেন,—

"তস্মান্নিবৃত্তিমাপন্নশ্চরেৎ সর্বাঙ্গনির্বৃতঃ॥"[৬]

'সেইহেতু (মুমুক্ষু) নিবৃত্তি আশ্রয় করত সর্বপ্রকারে নির্বৃতভাবে বিচরণ করিবেক।' মুক্তিকে 'নির্বাণ' বা 'ব্রহ্মনির্বাণ'ও বলা হয়। উহা লাভের জন্য সাধককে যে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া ক্রমে সর্বধর্মের নির্বাণ করিতে হয়, তাহা স্বাভাবিকই। যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ নিবৃত্তিধর্মেরও উপদেশ নারদকে দিয়াছিলেন। সুতরাং মূল পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে নিবৃত্তিধর্মের বিধানও ছিল।

(১·৩) নারায়ণীয়াখ্যানে সাক্ষাদ্ভাবেও তাহা উক্ত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলেন, হে নৃপোত্তম, যতিদিগের যাহা ধর্ম তাহাও ('যতীনাং চাপি যো ধর্মঃ স') পূর্বে 'হরিগীতা'য় সমাসবিধি, রীতিতে তোমায় কথিত হইয়াছে। হে নৃপ!—এই ধর্ম, সরহস্য এবং সসংগ্রহ, সাক্ষাৎ জগন্নাথ নারায়ণ হইতে নারদ কর্তৃক সুসংপ্রাপ্ত" ইত্যাদি।[৭] গার্হস্থ্যত্যাগী, সংসারব্যবহারত্যাগী বা নিবৃত্তিমার্গী ব্যক্তিকে এই বচনে 'যতি' বলা হইয়াছে। সুতরাং তন্মতে নিবৃত্তিমার্গের বা কর্মসন্ন্যাসের উপদেশ গীতায় আছে। 'অপি' শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য এই যে প্রবৃত্তিমার্গের বা কর্মযোগের উপদেশও উহাতে আছে। গীতায় যে ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা নারদ নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হন।[৮] সুতরাং মূল পাঞ্চরাত্রধর্মে প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম উভয়েরই উপদেশ ছিল।

(১·৪) মূল নিবৃত্তিধর্ম এবং প্রবৃত্তিধর্ম পরস্পর বিরোধী। সুতরাং একই ভগবান্ তদুভয়ের উপদেশ কেন দিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে মহর্ষি শৌনকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়।

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৫।৫৪·২-৫৫

২) মহাভা, ১২।৩৪০।৭৩·২-৭৪

৩) মহাভা, ১২।৩৪০।৬৯-৭১·১

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬৬·২

৫) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬৭·১

৬) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬৭·২

৭) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৩ (পূর্বে দেখ)।

৮) পূর্বে দেখ।

সৌতির নিকটে তিনি তাহা প্রকাশ করেন। 'সেই ভগবান্ প্রভু এবং সর্বশক্তিমান্; যজ্ঞসমূহে অগ্রহর এবং সতত যজ্ঞধারী ও বেদবেদাঙ্গবিৎ। তবে কি প্রকারে বলা হয় যে তিনি পরম-নিবৃত্তিভাবে থাকেন? তিনি স্বয়ং যদি প্রকৃতপক্ষে নিবৃত্তিধর্মেই আস্থিত হন, তবে যে তিনি নিবৃত্তিধর্মের বিধান করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। তবে তিনি দেবতাগণকে প্রবৃত্তি-ধর্মসমূহে ভাগার্হ করিয়াছেন কেন? আবার প্রবৃত্তিধর্মই যদি তাঁহার ঈপ্সিত হয়, তবে ব্যাবৃত্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে (অর্থাৎ যাহাদের চিন্তা বহির্বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে) তিনি নিবৃত্তিধর্মপরায়ণ করিয়াছেন কেন?[1] তাহাতে সৌতি উত্তর করেন যে পূর্বে মহারাজা জনমেজয়ও মহর্ষি বৈশম্পায়নের নিকট ঐ প্রকার সংশয় করিয়াছিলেন। জনমেজয় বলেন, "ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া, সুর, অসুর এবং মনুষ্য পর্যন্ত সমস্ত লোকগণ অভ্যুদয়ফল কর্মসমূহে সর্বপ্রকারে আসক্ত দেখা যায়। হে ব্রহ্মন্, আপনি বলিয়াছেন যে নির্বাণই মোক্ষ,—উহা পরমসুখস্বরূপ; ইহসংসারে যাহারা পুণ্যপাপবিবর্জিত হয় তাহারাই মুক্ত; তাহারা চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে। আমরা (ধীর ব্যক্তিগণের নিকট) ইহা শুনিয়াছি। ঐ সনাতন মোক্ষধর্ম নিশ্চয় দুরনুষ্ঠেয়। সেই কারণেই (বোধ হয়) দেবতাগণ তাহা পরিত্যাগ করত হব্যকব্যভুক্ হইয়াছেন। অধিকন্তু…(ব্রহ্মাদি দেবতাগণ)…(হয়ত) আত্মার পরিনির্মিত প্রলয় জানেন না। সেইহেতু (বোধ হয়) তাঁহারা ধ্রুব, অক্ষর এবং অব্যয় (নিবৃত্তি) মার্গ আশ্রয় করেন না; তাঁহারা স্মৃতিকালপরিমাণ প্রবৃত্তিতে সম্যক্ স্থিত হন। ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণের কালপরিমাণে এই মহান্ দোষ (আছে)। হে বিপ্র, এই সংশয় আমার হৃদয়ে শল্যের ন্যায় অর্পিত হইয়াছে। আপনি তাহা ছেদন করুন" ইত্যাদি।[2] আপন গুরু পরমর্ষি ব্যাসের মুখে ঐ বিষয়ে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট বিবৃত করেন। উহার সংক্ষিপ্ত সার, ব্যাসের ভাষায়, এই যে ভগবান্ নারায়ণ

> "নিবৃত্তিং চাস্থিতো ধর্মং গতিমক্ষয়ধর্মিণাম্।
> প্রবৃত্তিং বিদধে কৃত্বা লোকস্য চিত্রতাম্॥"[3]

'(স্বয়ং) অক্ষয়ধর্মীদিগের গতি নিবৃত্তিধর্মে আস্থিত। (তবে) লোকের বিচিত্রতা করিতে তিনি প্রবৃত্তিধর্মেরও বিধান করিয়াছেন।' শৌনকাদির এই প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ভগবান্ নারায়ণ প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম উভয়েরই বিধান করিয়াছিলেন![4] অধিকন্তু উহাদের ফল ভিন্ন ভিন্ন;—নিবৃত্তিধর্মের ফল ধ্রুব, অক্ষয় এবং অব্যয়, আর প্রবৃত্তিধর্মের ফল পরিমিতকালস্থায়ী। ভগবান্ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে যজ্ঞাদি প্রবৃতিধর্মের ফল "আবৃত্তিলক্ষণ",[5] সুতরাং তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, আর নিবৃত্তিধর্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

---

[1] মহাভা, ১২।৩৪০।১-৩

[2] মহাভা, ১২।৩৪০।৭-১৬

[3] মহাভা, ১২।৩৪০।৯৯

[4] মহাভা, ১২।৩৪৭।২'২ দেখ।

[5] মহাভা, ১২।৩৪০।৫৯'১

আরও একটা বিচার এখানে করা উচিত হইবে মনে করি। নারায়ণীয়ধর্ম নিবৃত্তিমার্গবিরোধী হইলে, অথবা তন্মতে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত প্রবৃত্তিধর্ম নিবৃত্তিধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে শৌনকের পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে সৌতি, জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈশম্পায়ন, কিংবা শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস পরিষ্কার তাহা বলিতেন। ঐ কথা বলিবার প্রকৃষ্ট অবসর তত্তৎসময়ে হইয়াছিল। ততোধিক অবসর উপস্থিত হইয়াছিল যখন জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করেন "একান্তিগণের চর্য্যা কি ?"[১] পরন্তু তখনও বৈশম্পায়ন সেই কথা বলেন নাই। তিনি ইহা বলিয়াছেন বটে, "এই ধর্মানুসারে সুপ্রযুক্ত অহিংসাযুক্ত কর্ম দ্বারা হরি প্রাত হন।"[২] উহার তাৎপর্য, খুব বলিলে, এই মাত্র হইতে পারে যে—এই ধর্ম মতে লোক যুক্তিপূর্বক কর্ম করিয়াও ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে পারে। পরন্তু তাহাতে, নিবৃত্তিমার্গের নিন্দা হওয়া ত দূরে থাক, ইহাও বলা যায় না যে, ভগবৎপ্রাপ্তির পরেও মরণ পর্যন্ত যথাপূর্ব কর্ম অবশ্যই করিতে হইবে। পক্ষান্তরে ঐ প্রসঙ্গে বৈশম্পায়ন এই বলিয়া সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছেন যে

"মনীষিণো হি যে কেচিদ্‌যতয়ো মোক্ষধর্মিণঃ।
তেষাং বিচ্ছিন্নতৃষ্ণাণাং যোগক্ষেমবহো হরিঃ॥"[৩]

'যে সকল মোক্ষধর্মী মনীষী যতিগণ বিচ্ছিন্নতৃষ্ণ, তাঁহাদিগের যোগক্ষেম হরি বহন করেন।' আর এই বলিয়া তিনি প্রবৃত্তিধর্মের নিন্দা করিয়াছেন যে, রজ এবং তম গুণ মিশ্রিত বলিয়া "প্রবৃত্তিলক্ষণযুক্ত পুরুষকে হরি স্বয়ং রক্ষা করেন না। ঐ জায়মান পুরুষের প্রতি লোকপিতামহ ব্রহ্মা দৃষ্টি করেন।"[৪]

(১·৫) বদরিকাশ্রমে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণ ঋষিকে বলেন, "হে দেব, ইহসংসারে গার্হস্থ্যমূলক চারি আশ্রম (অবলম্বী মনুষ্যগণ) অহরহ নানামূর্তিতে সমাস্থিত তোমাকে পূজা করে।"[৫] নারায়ণ ঋষিও নারদকে বলেন, "বেদসমূহ এবং নানামত সমাস্থিত আশ্রমসমূহ ভক্তি সহকারে তাঁহাকে (ভগবান্ নারায়ণকে) সম্যক্ পূজা করে। এবং তিনি শীঘ্র তাহাদিগকে (যথোচিত) গতি প্রদান করেন।"[৬] তাহাতে জানা যায় যে প্রাচীন নারায়ণোপাসকদিগের মধ্যে চাতুরাশ্রম্য প্রচলিত ছিল।

(২) 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে'ও পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম উভয়েরই উপদেশ করিয়াছিলেন।

"প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমৃষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ॥
তত্রৈবাবস্থিতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।"[৭]

'ঋষি নারায়ণ প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম বলিয়াছেন। চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য উহাতেই অবস্থিত।'

"প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।"[৮]

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৮।৭·১ ২) ঐ, ১২।৩৪৮।৫৬

৩) মহাভা, ১২।৩৪৮।৭২ ৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।৭৩ ৫) মহাভা, ১২।৩৩৪।২৬·২-২৭·১

৬) মহাভা, ১২।৩৩৪।৪৩

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী বা ভিক্ষুককে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হইবে ? কাহার কৃপায় উহার স্বর্গ বা মুক্তি লাভ হয় ? ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নসমূহের উত্তরে ভীষ্ম নারায়ণীয়ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। নারায়ণ ঋষির এই উক্তিতে ঐ সকল প্রশ্নেরই উত্তর হইয়াছে। সুতরাং তিনি চাতুরাশ্রম্য মানিতেন।

৭) মহাভা, ১২।২১৭।২·২-৩·১ ৮) মহাভা, ১২।২১৭।৪·১

'অনন্তর প্রজাপতি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলিয়াছেন।' ঐ প্রজাপতি বোধ হয় প্রজাপতি দক্ষই। দক্ষ ভাগবতধর্মের প্রচারক প্রাচীন আচার্যদিগের অন্যতম। তিনি ভগবান্ নারায়ণ ঋষি হইতে উহার উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই সকল পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল সাত্বতশাস্ত্রের প্রণেতা মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিও প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত। উক্ত বচনে হয়ত তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহা হউক, নারায়ণ ঋষি নিবৃত্তিলক্ষণধর্মও উপদেশ করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার মতে

"নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমব্যক্তং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥"[২]

'নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম শাশ্বত অব্যক্ত ব্রহ্ম (অর্থাৎ উহার সাধন)।'

"প্রবৃত্তিঃ পুনরাবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ পরমা গতিঃ।
তাং গতিং পরমামেতি নিবৃত্তিপরমো মুনিঃ।
জ্ঞানতত্ত্বপরো নিত্যং শুভাশুভনিদর্শকঃ ॥"[৩]

'প্রবৃত্তি পুনরাবৃত্তি (ফলদায়ক), আর নিবৃত্তি পরমগতি (বা মোক্ষ প্রদায়ক)। জ্ঞানতত্ত্বপরায়ণ, নিত্য শুভাশুভনিদর্শক, এবং পরমনিবৃত্তিপ্রাপ্ত মুনি সেই পরমগতি প্রাপ্ত হন।' 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে'র অন্যত্র আছে, "দুরন্ত ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া মনুষ্যগণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু যে সকল মহাত্মা উহাদিগেতে আসক্ত নহেন, তাঁহারা পরমগতি প্রাপ্ত হন। এই সমস্ত লোককে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, প্রভৃতি (শারীরিক) দুঃখসমূহ, তথা মানসিক দুঃখসমূহ, দ্বারা সম্যক্ নিপীড়িত দেখিয়া মোক্ষলাভার্থ প্রযত্নপরায়ণ হওয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের উচিত। তিনি কায়, বাণী ও মনে শুচি হইবেন এবং নিরহঙ্কার হইবেন। তিনি প্রশান্ত, জ্ঞানবান্ এবং নিরপেক্ষ ভিক্ষু হইয়া সুখে বিচরণ করিবেন। ভূতানুকম্পা দ্বারা মনের সঙ্গ যদি দেখা যায়, কর্মের ফলে জগৎ (প্রাপ্তি হয়) জানিয়া তাহাতেও উপেক্ষা করিবেন।" ইত্যাদি।[৪] তিনি "নিঃসন্দিগ্ধ, অনীহ, সর্বপরিগ্রহ হইতে মুক্ত, বিবিক্তাচারী, লঘ্বাশী, তপস্বী এবং সংযতেন্দ্রিয়" হইবেন।[৫] যোগসিদ্ধি লাভ হইলে উপজীবিকা লাভের জন্য তাহার ব্যবহার কখনও করিবেন না। বরং কণ, কুল্মাষ, পিণ্যাক, শাক, যাবক, সক্তু, কিম্বা ফলমূল ভিক্ষা দ্বারা যখন যাহা পাওয়া যায়, তখন তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিবেন। সুতরাং 'বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্মে' মোক্ষলাভার্থ ভৈক্ষ্যচর্যাশ্রম অবলম্বনের সুস্পষ্ট বিধান আছে।

---

[১] দেখ—

"ব্যক্তাব্যক্তং চ যত্তত্ত্বং সম্প্রোক্তং পরমর্ষিণা ॥
ব্যক্তং মৃত্যুমুখং বিদ্যাদব্যক্তমমৃতং পদম্।"—(মহাভা, ১২।২১৭।১·২-২·১)

বেদান্তাচার্য বেঙ্কটনাথ (জন্ম ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) মনে করেন যে নারায়ণ ঋষি কেবল নিবৃত্তিধর্মই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, প্রবৃত্তিধর্ম প্রজাপতি ব্যাখ্যা করেন। উহার সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।
নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মমৃষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ ॥"

('স্তোত্ররত্ন-ভাষ্য, ৪র্থ শ্লোক ; গীতার ১৮।৩০
শ্লোকের রামানুজভাষ্যের তাৎপর্যচন্দ্রিকা)

[২] মহাভা, ১২।২১৭।৩·২

[৩] মহাভা, ১২।২১৭।৪·১-৫

[৪] মহাভা, ১২।২১৫।১-৪

[৫] মহাভা, ১২।২১৫।১৬

(৩) এখন আমরা দেখিব, ভাগবতধর্মের অপর প্রাচীন গ্রন্থ 'গীতা' ঐ বিষয়ে কি বলে। যেমন 'বাষ্কেঁয়াধ্যাত্মে', তেমন 'গীতা'য়ও চাতুরাশ্রম্যের স্পষ্টোল্লেখ নাই। তবে কর্মসন্ন্যাসের বা সন্ন্যাসাশ্রমেরও উল্লেখ আছে।' কিঞ্চিৎমাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'নারায়ণীয়াখ্যানে'র মতে 'গীতা'য় প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ বা কর্মযোগ ও কর্মসংন্যাস—উভয়েরই উপদেশ আছে। 'গীতা'র নিজের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। যথা, উহার ৫ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন বলিয়াছেন,—

"সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।"[১]

'হে কৃষ্ণ, তুমি (একবার) কর্মসমূহের সংন্যাস, আবার (কর্মসমূহের) যোগও উপদেশ করিতেছ।' তৎপূর্বে ৩য় অধ্যায়ের প্রারম্ভে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "হে নিষ্পাপ (অর্জুন), আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহলোকে (মনুষ্যগণের) দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে। সাংখ্যদিগের (নিষ্ঠা) জ্ঞানযোগে, (আর) যোগিগণের (নিষ্ঠা) কর্মযোগে।"[২] 'পূর্বেই' ("পুরা") অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তথায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" (অর্থাৎ সাংখ্যে বা জ্ঞানযোগ অনুসারে তোমাকে এই বুদ্ধি বা জ্ঞান অভিহিত হইল; পরন্তু এখন যোগে বা কর্মযোগ অনুসারে এই বুদ্ধি বা জ্ঞান শুন)।[৩]

'গীতা'য় ইহাও উক্ত হইয়াছে যে উভয় মার্গ দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং মুক্তিলাভ হয়। যথা, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "(কর্ম)সংন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়েই নিঃশ্রেয়স্কর।"[৪] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে "কেহ কেহ ধ্যান দ্বারা (একাগ্রীভূত) অন্তঃকরণ দ্বারা আপনাতে আত্মাকে দেখে। অন্যে সাংখ্যযোগ দ্বারা, অপরে কর্মযোগ দ্বারা (আপনাতে আত্মাকে দেখে)। পরন্তু অন্যে" ইত্যাদি।[৫] এই বচনে তিনি আত্মদর্শনের চারিটি পৃথক্ উপায়ের কথা বলিয়াছেন। উহাদের তিনটির নাম তিনি পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ। চতুর্থটির নাম উল্লিখিত হয় নাই। তবে উহার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে উহা শ্রদ্ধাযোগ বা ভক্তিযোগ। যাহা হউক, এই বচন হইতেও জানা যায় যে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ উভয়েরই দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়। যে সকল যজ্ঞ দ্বারা মনুষ্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মে গমন করে, উহাদের মধ্যেও জ্ঞানযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং কর্মযজ্ঞের উল্লেখ আছে।[৬] জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? গীতার মতে "সর্বং কর্মাখিলং পার্থজ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" (অর্থাৎ যথোচিত কৌশল করিলে সমস্ত কর্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়)[৭] ভক্তি দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।[৮]

যেহেতু উভয়ের দ্বারা প্রাপ্য ফলে অন্তর নাই, সেইহেতু কৃষ্ণ বলেন যে উভয়ের মধ্যে

---

১) গীতা, ৫।১·১

২) "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥"— (ঐ, ৩।৩)

৩) ঐ, ২।৩৯·১

৪) ঐ, ৫।২·১

৫) ঐ, ১৩।২৪-৫

৬) গীতা, ৪।২৩ (পূর্বে দেখ)।

৭) ঐ, ৪।৩৩·২ (পূর্বে দেখ)

৮) ঐ, ১০।৯-১১ (পূর্বে দেখ)

কোন ভেদ নাই। যাহারা ঐ দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে করে,—অপর কথায় যাহারা মনে করে যে জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগর প্রাপ্য ফল ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদিগকে তিনি মুর্খ বা অজ্ঞানী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। "মুর্খগণই বলে যে সাংখ্য এবং যোগ ভিন্ন ভিন্ন। পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। উভয়ের কোন একটিতে সম্যক্ আস্থিত হইলে (মনুষ্য নিঃশ্রেয়স) ফল প্রাপ্ত হয়। সাংখ্যগণ যেই স্থান প্রাপ্ত হয়, যোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাংখ্যকে এবং যোগকে এক দেখে, সে (যথার্থই) দেখে।"[১] 'ব্রাহ্মীস্থিতি" বা 'ব্রহ্মনির্বাণ'কেই ঐখানে 'স্থান' বলা হইয়াছে।

প্রাপ্য ফলে ভেদ না থাকিলেও অপর কোন না কোন বিষয়ে উহাদের মধ্যে ভেদ অবশ্যই আছে। নতুবা উহারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গ বলিয়া পরিগণিত হইত না। তখন প্রশ্ন হয় সেই ভেদ কি? অধিকন্তু ঐ ভেদ হেতু উভয়ের তারতম্যের বিচারও মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। কোন্‌টা আশ্রয় করা সাধকের উচিত? অন্ততঃ অর্জুনের মনে সেই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তিনি তখনও জানিতেন না যে উভয়ের দ্বারা একই পরম শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। সেই কারণে তিনি কৃষ্ণকে বলেন, "তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্" ('যাহা দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একটি নিশ্চয় করিয়া বল')।[২] পরে তিনি আবার সেইপ্রকার বলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি (একবার) কর্মসমূহের সংন্যাস, আবার (কর্মসমূহের) যোগ ও উপদেশ করিতেছ। সেই দুইয়ের মধ্যে যেইটি শ্রেয়ঃ (কারক) বলিয়া সুনিশ্চিত, সেই একটি আমাকে বল।"[৩]

---

[১] ঐ, ৫।৪-৫

'গীতা'র অন্যত্রও 'সংন্যাস' এবং 'যোগ'কে অভিন্ন বলা হইয়াছে। "যে কর্মফলকে আশ্রয় না করিয়া (অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য রহিত হইয়া, "কর্মফলহেতু" কর্মকারী না হইয়া) কর্তব্য কর্ম করে সে যোগী এবং সে সন্ন্যাসীও। নিরগ্নি (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপরিত্যাগী) এবং অক্রিয় (অর্থাৎ অপর ব্যবহারিক কর্ম পরিত্যাগী) (প্রকৃত সন্ন্যাসী) নহে। হে পাণ্ডব, যাহাকে সংন্যাস বলা হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়া জান। কেননা, যে (ফলবিষয়ক) সঙ্কল্প সংন্যাস করে নাই, সে কখনও যোগী হয় না।" ('গীতা' ৬।১-২) এইখানে কর্মের ফলাশার সংন্যাসকে 'সংন্যাস' বলা হইয়াছে; যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে "কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।" ('কাম্য কর্মসমূহের ন্যাসকেই কবিগণ 'সংন্যাস' বলিয়া জানেন')। (ঐ, ১৮।২˙১) পরন্তু ৫।৪-৫ শ্লোকে সর্বকর্মসংন্যাসকেই 'সংন্যাস' বলা হইয়াছে।

'সংন্যাস' ও যোগে'র একত্ব বিষয়ক উক্তি 'মহাভারতে'র অন্যত্রও আছে। যেমন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন

> "যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
> একং সাংখ্যং যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"—(গীতা, ৫।৫),

তেমন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা করাল জনককে বলেন,

> "যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈস্তদনুগম্যতে।
> একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্॥"—(মহাভা, ১২।৩০৬।১৯);

এবং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা দেবরাতি জনককে বলেন,

> "যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি তৎসাংখ্যৈরপি দৃশ্যতে।
> একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ॥"—(মহাভা, ১২।৩১৬।৪)

পরন্তু বশিষ্ঠ এবং যাজ্ঞবল্ক্য 'কাপিল সাংখ্যমত'কেই 'সাংখ্য' এবং 'পাতঞ্জল যোগমত'কেই 'যোগ' বলিয়াছেন।

[২] গীতা, ৩।২˙১

[৩] ঐ, ৫।১

অর্জুন প্রথমে বুঝিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ জ্ঞানযোগকে কর্মযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। অথচ তাঁহাকে যুদ্ধরূপ কর্ম করিতে বার বার আদেশ দিতেছেন[১] দেখিয়া তিনি বলেন, "হে জনার্দন, হে কেশব, বুদ্ধি (বা জ্ঞানযোগ) কর্ম(যোগ) হইতে শ্রেষ্ঠ—ইহাই যদি তোমার অভিমত হয়, তবে কেন আমাকে (যুদ্ধরূপ) ঘোর কর্মে নিযুক্ত করিতেছ ? ব্যামিশ্রবৎ বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করিতেছ। যাহা দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইব, সেই একেকে নিশ্চয় করিয়া বল।"[২] ইহার সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণ জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা—এই দুই প্রকার নিষ্ঠার সম্ভাবের,—কর্মযোগের ও কর্মসংন্যাসের বা জ্ঞানযোগের উপদেশ করেন। তখন অর্জুন আবার বলেন, "সেই দুইয়ের মধ্যে যেইটি শ্রেয়ঃ(কারক) বলিয়া সুনিশ্চিত সেই একটি আমাকে বল।" তখন কৃষ্ণ বলেন যে উহাদের উভয়েই নিঃশ্রেয়স্‌কর।

"তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥"[৩]

'পরন্তু সেই দুইয়ের মধ্যে কর্মযোগ কর্মসংন্যাস হইতে বিশিষ্ট।' কর্মযোগের ঐ বিশিষ্টতা কি প্রকারে তাহাও কৃষ্ণ নির্দেশ করিয়াছেন। উভয়ের প্রাপ্যফল এক হইলেও,

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥"[৪]

'পরন্তু, হে মহাবাহু, (কর্ম)যোগ ব্যতীত (প্রকৃত কর্ম)সংন্যাস প্রাপ্ত হইতে দুঃখ (হয়)। যোগযুক্ত মুনি অচিরে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।' তাৎপর্য এই যে যথার্থ কর্মসংন্যাস লাভ করা অতীব কঠিন। সুতরাং সংন্যাসমার্গে ব্রহ্মলাভ করা কঠিন। তাই তাহাতে অনেক দেরী লাগে। কর্মযোগ তত কঠিন নহে। সেইহেতু উহা দ্বারা অচিরে ব্রহ্মলাভ করা যায়। আরও দেখ, কর্মযোগ ব্যতীত প্রকৃত কর্মসংন্যাস লাভ করা কঠিন,—অথবা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং কর্মসংন্যাস করিতে হইলেও প্রথমে কর্মযোগ আশ্রয় করিতেই হইবে। ঐ আশ্রয়ে থাকিয়া গেলে সরল পথে সহজে ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। পরন্তু অর্ধপথে উহাকে ছাড়িয়া কর্মসংন্যাস আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মে আসিতে অনেক দুঃখ উঠাইতে হইবে, অনেক কঠিনতার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে ; তাই অধিক সময় লাগিবে। ঐ কারণেই কর্মযোগমার্গ কর্মসংন্যাসমার্গ হইতে বিশিষ্ট। শ্রুতিতে আছে যে কর্ম দ্বারা প্রাপ্তব্য লোকসমূহের সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত নির্বেদ প্রাপ্ত হয়[৫] অর্থাৎ কর্ম করিয়া তাহার ফলভোগার্থ নানা লোকে গমন করিয়া সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভের পরই মনুষ্য কর্ম বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া স্বতঃই কর্ম ত্যাগ করে। উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া 'গীতা' বলিয়াছে যে কর্মযোগ ব্যতীত প্রকৃত কর্মসন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। পরন্তু ঐ বচনে আরও যে বলা হইয়াছে কর্মযোগী অচিরে ব্রহ্মলাভ করে তাহা

---

১) যথা দেখ—"তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত"—(ঐ, ২।১৮·২)
"তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"—(ঐ, ২।৩৭·১)
"ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব"—(ঐ, ২।৩৮·১)

২) গীতা, ৩।১—২ ৩) ঐ, ৫।২·২ ৪) ঐ, ৫।৬ ৫) মুণ্ডকউ, ১।২।১২·১

অনেকটা অর্থবাদ বলিয়া মনে হয়। কেননা, অন্যত্র আছে কর্মযোগী অনেক জন্মে সম্যক্ সিদ্ধ হয়।

> "প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
> অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"[1]

'প্রযত্ন সহকারে উদ্যোগ করিতে করিতে (কর্ম)যোগী (ক্রমে) পাপ হইতে সম্যক্ শুদ্ধ হইয়া অনেক জন্মে সিদ্ধ হয়, অনন্তর পরাগতি লাভ করে।'[2] জ্ঞানবান্‌ও সেই প্রকারে বহু জন্মে উপলব্ধি করে যে "বাসুদেবঃ সর্বম্"।[3] এই বচনে আরও বলা হইয়াছে যে ঐ প্রকার অনুভবী জ্ঞানযোগী "মহাত্মা সুদুর্লভ"। গীতার আদর্শ কর্মযোগীও সুলভ নহে। মহাভারতপুরাণাদিতে দৃষ্টান্ত খুঁজিলে আদর্শ কর্মযোগী অপেক্ষা অনুভবী জ্ঞানযোগীর দৃষ্টান্ত বেশী পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই দৃষ্টিতেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগের বিশিষ্টতা সিদ্ধ করা যায় না। তাই বোধ হয় শঙ্কর-রামানুজাদি প্রাচীন গীতাভাষ্যকারগণ কর্মযোগের বিশিষ্টতার কথাকে অর্থবাদ বলিয়াছেন।[4] লোকমান্য তিলক সেই জন্য তাঁহাদিগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গীতার কর্মযোগের বিশিষ্টতা এই যে তন্মতে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেও পূর্বের সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম আমরণ যথাযথ করিতে হয়, পরিত্যাগ করিতে হয় না। 'গীতা'র কোন্ বচনে তাহা উক্ত হইয়াছে, তিনি নির্দেশ করেন নাই। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। শঙ্কর মনে করেন যে "যোগযুক্ত মুনি অচিরে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়" সেই কারণে বলা হইয়াছে যে "কর্মযোগো বিশিষ্যতে"। তিলক সেই প্রকার মনে করেন না,—অপর কথায় বলিলে শঙ্করের ন্যায় তিলক মনে করেন না 'কর্মযোগো বিশিষ্যতে' বলার হেতু কৃষ্ণ "সংন্যাসস্তু মহাবাহো" ইত্যাদি বচনে নির্দেশ করিয়াছেন।

'গীতা'র উপসংহারের দিকে,—অন্তিম অধ্যায়ের প্রারম্ভে কর্মের ত্যাজ্যতা ও অত্যাজ্যতা বা কার্যতা সম্বন্ধে এক বিচারের মীমাংসা আছে। কোন কোন মনীষী বলেন যে কর্ম দোষের ন্যায় ত্যাজ্য—যেমন রাগাদি দোষসমূহ পরিত্যাগ করা মুমুক্ষুর উচিত, তেমন সমস্ত কর্মও পরিত্যাগ করা উচিত। অপর কোন কোন মনীষী বলেন যে অন্য কর্মসমূহ ত্যাজ্য হইলেও যজ্ঞ, দান এবং তপ—এই তিন কর্ম ত্যাজ্য নহে। ঐ বিষয়ে 'গীতা'র নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে যজ্ঞ, দান এবং তপ—এই তিন কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, করাই উচিৎ; কেননা, ঐ তিন কর্ম মনীষীদিগকে অর্থাৎ সুবিচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পবিত্র করিয়া থাকে ("পাবনানি মনীষিণাম্")—তাঁহাদের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া থাকে।[1] ঐ সকল আবার আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা

---

১) গীতা, ৬।৪৫ ২) ঐ, ৬।৩৩-৪৫ দেখ।

৩) "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥"—(ঐ, ৭।১৯)

৪) শঙ্কর বলিয়াছেন, "কর্মযোগো বিশিষ্যতে' ইতি কর্মযোগং স্তৌতি।"

৫) 'গীতা'র মতে যাহারা দম্ভাভিমানাদি সহকারে যজ্ঞাদি করে তাহাদের চিত্ত আরও মলিন হয়। (১৬।১৫—) যাহারা শ্রদ্ধারহিত হইয়া করে, তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হয়। (১৭।২৮) রাজস এবং তামস ভাবে কৃত যজ্ঞাদি নিন্দিত। (১৭।৪—৫, ১২—৩, ১৮—৯, ২১—২) সাত্ত্বিক যজ্ঞাদিই শ্রেষ্ঠ। এই সকল বিচার করিয়া যাহারা

রহিত হইয়া অনুষ্ঠান করাই উচিৎ।//কথিত হইয়াছে যে কর্মের কার্যতা বিষয়ে উহাই ‘গীতা’র সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। অপর কথায় বলিলে, প্রথমোক্ত বাদিগণ মনে করে যে কর্ম দোষ[১]; সুতরাং কর্ম ত্যাগ না করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না। আর অপর বাদিগণ, তথা ‘গীতা’ মনে করে যে আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম করিলে তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞাদিকর্ম পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। ইহারা কর্মযোগী আর প্রথমোক্ত বাদিগণ কর্মসন্ন্যাসী। ‘গীতা’র অন্যত্র আছে যে কর্মযোগী সমস্ত কর্মই চিত্তশুদ্ধ্যর্থ করিয়া থাকে। “(কর্ম) যোগিগণ (কেবল) শরীর দ্বারা, (কেবল) মন দ্বারা, (কেবল) বুদ্ধি দ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও, আসক্তি পরিত্যাগ করত, আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করে।”[২] ‘কেবল’ শব্দের অর্থ ‘মমত্ববুদ্ধিরহিত হইয়া একমাত্র ঈশ্বরার্থই, নিজের ফলাদি কামনায় নহে।’ কায়িক, বাচিক এবং মানসিক—সর্বপ্রকারেরই কর্ম যোগী ঐরূপ ভাবনা-পরায়ণ হইয়া করে এবং তাহাতে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং কর্মযোগীর এই সিদ্ধান্ত মতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ কর্ম পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই; কেননা, আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া,—একমাত্র ঈশ্বরার্থ, কর্ম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে কর্মের কর্তব্যতা প্রতিপাদন করিতে ঐখানে এইমাত্র হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা কর্তা পবিত্র হইয়া থাকে,—তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। লোকসংগ্রহাদি অপর যে সকল হেতু তৎপূর্বে স্থানে স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে, উহাদের কোনটি সেই স্থলে প্রদত্ত হয় নাই। তাহাতে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যাওয়ার পর,—এবং তাহার ফলে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরও কর্ম করার প্রয়োজন কি? তখনও কর্মানুষ্ঠানের চোদনা কি থাকে? ঐ প্রসঙ্গে ‘গীতা’য় ইহাও আছে যে “নিয়ত কর্মের সংন্যাস (বা পরিত্যাগ) যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশতঃ উহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।”[৩] কোন্ অবধি নির্দিষ্ট না থাকাতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে নিয়ত কর্ম অনবধিক কাল অর্থাৎ আমরণ করিতে হইবে বলাই গীতার অভিপ্রায় ছিল। পরন্তু পূর্বের উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে ইহাও বলা যাইতে পারে যে চিত্তশুদ্ধি পর্যন্তই নিয়ত কর্ম করিতে বলা হইয়াছে,—তৎপূর্বে উহাকে পরিত্যাগ করা তামস বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ বচন দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিশ্চয় করা যায় না যে ‘গীতা’র মতে কর্ম চিত্তশুদ্ধির পরেও অবশ্য কর্তব্য কিনা। অন্যত্র আছে

“তস্মাদসক্ত সততং কার্যং কর্ম সমাচর।”[৪]

শ্রদ্ধার সহিত সাত্ত্বিক ভাবে যজ্ঞাদি করে তাহাদেরই চিত্ত উহাদের দ্বারা শুদ্ধ হয়, অপরের নহে। তাই বলা হইয়াছে মনীষিদিগকেই পবিত্র করিয়া থাকে।

[১] কর্মে প্রবৃত্তি রজগুণে কার্য। (গীতা, ১৪।৭, ৯, ১২) রজের ফল দুঃখ ও লোভ। (ঐ, ১৪।১৬—৭) সেই কারণেই বোধ হয় উহারা কর্মকে দোষ মনে করে।

[২] গীতা, ৫।১১

[৩] “নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”—(ঐ, ১৮।৩)

[৪] ঐ, ৩।১৯

'সেই হেতু কার্য কর্ম অনাসক্তভাবে সর্বদা সমাচরণ কর।' এইখানে 'সর্বদা' ("সততং") শব্দের প্রয়োগ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে কর্ম আমরণ করিতে হইবে। পরন্তু তাহাতে শঙ্কা করিবার হেতুও আছে। কথিত হইয়াছে যে

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥[১]

'বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতাত্মভূতাত্মা যোগযুক্ত (ব্যক্তি) কর্ম করিতে থাকিলেও (অর্থাৎ এমন কি যদি কর্ম করিতে থাকেও তথাপি) (তৎফল দ্বারা) লিপ্ত হয় না।' এইখানে উল্লিখিত 'যোগযুক্ত (ব্যক্তি)' কর্মযোগীই। প্রকরণ হইতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীতি হয়। তিনি 'বিশুদ্ধাত্মা' অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে। তিনি 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' অর্থাৎ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াছেন অর্থাৎ সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বা সম্যগ্‌দর্শী।[২] দেহেন্দ্রিয়াদি জিত না হইলে চিত্তশুদ্ধিও হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানও উদয় হয় না।[৩] সুতরাং উক্ত বচনের তাৎপর্য এই যে 'বিশুদ্ধচিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞানী কর্মযোগী কর্ম করিতে থাকিলেও (অর্থাৎ এমন কি যদি কর্ম করিতে থাকেও তথাপি) (তৎফল দ্বারা) লিপ্ত হন না।' শ্রুতিতে আছে যে ব্রহ্মজ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হয় এবং ক্রিয়মান কর্মের ফল তাঁহাতে শ্লিষ্ট হয় না। ভগবান্ বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্রে' বেদান্তের সিদ্ধান্ত তাহাই বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে।[৪] 'গীতা'য়ও সেই সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হইয়াছে। "হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে।"[৫] পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে ক্রিয়মান ('কুর্বন্') কর্মের ফল তাহাতে লাগে না, সুতরাং তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। উহাতে 'কুর্বন্' শব্দের সঙ্গে 'অপি' শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে অধিকন্তু ইহাও বুঝা যায় যে কর্ম যে তখনও যোগীকে অবশ্যই করিতে হইবে,—তখনও যে উঁহার কর্তব্য কার্য থাকে, তাহা নহে। কর্ম যদি তখনও উঁহার অবশ্য কর্তব্য থাকিত,—সকল কর্মযোগীই যদি ব্রহ্মজ্ঞানোদয়োত্তরও কর্ম করিতে থাকিত কিংবা উঁহাদিগকে করিতেই হইত, তবে 'অপি' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। অবশ্যকর্তব্যতা না থাকিলেও যদি কোন না কোন হেতু বশতঃ—পূর্ব সংস্কার বশতঃ বা যদৃচ্ছা ক্রমে কোন ব্রহ্মজ্ঞানী কর্মযোগী কোন কর্ম করিয়া ফেলেন, অথবা তাঁহার দ্বারা অবুদ্ধিপূর্বক কোন কর্ম হইয়া যায়,

---

১) গীতা, ৫।৭ ২) ঐ, ৪।৩৪—৫ দেখ।

(৩) মূলে 'যোগযুক্ত' শব্দ আছে। অন্যত্র আছে "বিজিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থ এবং সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন যোগী 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হয়;" (৬।৮) "বিশেষভাবে সংযত চিত্ত যখন সমস্ত (দৃষ্টাদৃষ্ট) কাম্যবস্তুসমূহে স্পৃহা-রহিত হইয়া একমাত্র (নিজের) আত্মাতে অবস্থিত হয়, তখন উহা 'যুক্ত' বলিয়া বলা হয়।" (৬।১৮) ঐ অবস্থা-প্রাপ্ত কর্মীকে 'যোগযুক্ত' বলা হইয়াছে।

৪) বেদান্তসূত্র, ৪।১।১৩—৫ সূত্র

৫) গীতা, ৪।৩৭ ; আরও দেখ—"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং" (৪।১৯) ; ৪।৪১

তথাপি তাঁহাকে সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না। ইহাই পূর্বোদ্ধৃত বচনের মর্মার্থ। অন্যত্র সেই প্রকারে বলা হইয়াছে যে

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"[১]

'যাহার (মনে) এই ভাব নাই যে আমি কর্তা' এবং যাহার বুদ্ধি (কোন বিষয়ে) লিপ্ত হয় না, সে এমন কি যদি এই সমস্ত লোককে হনন করেও তথাপি (প্রকৃত পক্ষে) হনন করে না এবং (সেই হেতু ঐ কর্ম দ্বারা) বন্ধনগ্রস্ত হয় না।' 'হত্বাঽপি' বাক্যে এই বুঝিতে হইবে না যে সে অথবা ঐ প্রকার প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণতঃ হনন করিয়া থাকে, কিংবা হনন তাহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। উহাতে হত্যার বিধান নাই। উহার তাৎপর্য এই যে ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি কখনও যদি হত্যা করিয়াও ফেলে অথবা তাহার দ্বারা যদি কখনও অবুদ্ধিপূর্বক হত্যা হইয়া যায়, তবে উহার দোষ তাহাতে লাগিবে না। পূর্বোদ্ধৃত বচনের 'কুর্বন্নপি' বাক্যের তাৎপর্যও ঠিক সেই প্রকারই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'গীতা'র আরও কতিপয় স্থলেও ঐ প্রকার অর্থেই 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।[২] সুতরাং ইহা আর বলা যায় না যে 'গীতা'র সিদ্ধান্ত মতে সমস্ত কর্মযোগীকে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও আমরণ, সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম পূর্ববৎ অবশ্যই করিতে হইবে।

অন্যত্র আরও স্পষ্ট বাক্যে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্ম কর্তব্য থাকে না।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥"[৩]

'পরন্তু যে মনুষ্য কেবল আত্মরতি (অর্থাৎ যাহার কেবল আত্মাতেই রতি বা প্রেম আছে, অপর বিষয়ে নহে),[৪] আত্মতৃপ্ত (অর্থাৎ আত্মাতেই তৃপ্ত, সুতরাং অপর বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা নাই)[৫], এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার (কোন কর্তব্য) কার্য থাকে না। ইহসংসারে কর্মকরণে

---

১) গীতা, ১৮।১৭ ; যোগবাশিষ্ঠ, ৬(১)।৬।১৯

২) গীতা, ৪।২০, ২২ ; ৬।৩১

৩) গীতা, ৩।১৭।-৮

৪) পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,

"সংগুপ্তান্যাত্মনো দ্বারাণ্যপিধায় বিচিন্তয়ন্।
যো হ্যাস্তে ব্রাহ্মণঃ শিষ্টঃ স আত্মরতিরুচ্যতে॥" (মহাভা, ১২।১৫১।১৯)

অর্থাৎ যে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিজয়সমূহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করত অন্তর্মুখীন করিয়া একমাত্র আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, সে 'আত্মরতি'।

৫) পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,

তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। (আর) না করিলে কোন অর্থ নাই (অর্থাৎ প্রত্যবায় হয় না)। সর্বভূতে তাঁহার কোন অর্থব্যপাশ্রয় নাই।’[1]

“সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্॥”[2]

‘জিতেন্দ্রিয় দেহী (=দেহবান্ ব্যক্তি, পুরুষ) সমস্ত কর্মসমূহকে মন দ্বারা সংন্যাস (বা পরিত্যাগ) করিয়া, (কোন কর্ম স্বয়ং) না করিয়া এবং (অপরকে দিয়াও) না করাইয়া আনন্দে স্থিত থাকে।’

এইরূপে প্রদর্শিত হইল যে ভাগবতধর্মের অধুনা উপলব্ধ প্রাচীনতম গ্রন্থত্রয়ের প্রত্যেকটিরই মতে উহাতে প্রথম হইতেই প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ বা -কর্মযোগ ও কর্মসংন্যাস উভয়েরই বিধান ছিল। নারায়ণীয়াখ্যান হইতে জানা যায় যে প্রাচীন নারায়ণীয়োপাসকদিগের মধ্যে চাতুরাশ্রম্যও প্রচলিত ছিল। অপর দুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। নারায়ণীয়াখ্যানে এবং বার্ষ্ণেয়াধ্যায়ে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে মোক্ষলাভার্থ নিবৃত্তিমার্গ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। মূল সাত্বতশাস্ত্রের রচয়িতা মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণ প্রথমে প্রবৃত্তিধর্মপরায়ণ হইলেও পরে নিবৃত্তিধর্ম আশ্রয় করেন। পরন্তু গীতার মতে মনুষ্য কর্মযোগ দ্বারাও সঙ্গ এবং ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া ঈশ্বরার্থ বুদ্ধিতে কর্ম করিয়াও, চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সুতরাং মুক্তি লাভ করিতে পারে।

“তানি সর্বাণি সন্ধায় মনঃষষ্ঠানি মেধয়া।
আত্মতৃপ্ত ইবাসীত বহুচিন্ত্যমচিন্তয়ন্॥”—(মহাভা, ১২।২৫০।৫)

১) ইহার অব্যহিত পরের শ্লোকে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—“তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর (‘সেইহেতু কার্য কর্ম অনাসক্তভাবে সর্বদা সমাচরণ কর’)। এই ‘তস্মাৎ’ (‘সেইহেতু’) শব্দ হইতে লোকমান্য তিলক মনে করেন যে এই বচনেই ৩।১৭-৮ শ্লোকদ্বয়েই ঐ হেতু বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং উহাতে কর্মের কর্তব্যতারই বিধান কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা সিদ্ধ করিতে তিনি ‘তস্য কার্যং ন বিদ্যতে’ বাক্যাংশের ‘তস্য’ পদের অর্থ করিয়াছেন ‘তাহার নিজের জন্য’। তাঁহার মতে উহার তাৎপর্য এই যে তাহার নিজের জন্য কিছু করিবার থাকে না, পরন্তু অপরের জন্য তাহাকে করিতেই হইবে।’ (গীতারহস্য, ৩৬২ পৃষ্ঠা)। ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র,—শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষদুষ্ট। ঐ দুই শ্লোকে ব্যাখ্যাত তত্ত্বকে হেতু করিয়া ‘সেইহেতু’, শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়াই তাঁহাকে ঐ প্রকার কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে। বস্তুত ‘তস্মাৎ’ পদের সম্পর্ক উহাদের অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকের সঙ্গে,—উহাতে সেইহেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে।

তথায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥”—(গীতা, ৩।১৬)

‘এই বচনে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রবর্তিত যজ্ঞচক্রের ত্যাগকে,—সাধারণতঃ বলিতে কর্মত্যাগীকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন। পরে “যস্ত্বাত্মরতিরেব” ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত বচনে ‘তু’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া পক্ষ ব্যাবর্তন করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য এই যে একমাত্র আত্মরতি এবং আত্মতৃপ্ত ব্যক্তিরই কোন কর্তব্য থাকে না; সুতরাং কর্ম না করিলে কোন দোষ হয় না। অনন্তর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ বলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানী ব্যতীত অপর সকলেরই কর্ম না করিলে দোষ হয়, এবং যে হেতু তুমি সেই প্রকার আত্মজ্ঞানী নহ, সেইহেতু তুমি কর্ম না করিলে দোষ হইবে, তুমি ‘সেইহেতু কার্য কর্ম অনাসক্তভাবে সর্বদা কর’। ‘তস্মাৎ’ শব্দ প্রয়োগের সুসঙ্গতি এই প্রকারে হয় বলিয়া ‘তস্য কার্যং ন বিদ্যতে’ পদের অর্থ ঐ প্রকার কষ্ট কল্পনা করিয়া করিতে হয় না। উহার সরলার্থ এই যে ‘তাহার (কোন কর্তব্য) কার্য থাকে না’।

২) গীতা, ৫।১৩

সেই হেতু উহার মতে মোক্ষলাভার্থ কর্মসংন্যাসমার্গ আশ্রয় করা অত্যাবশ্যক নহে। উহাতে অধিকন্তু কর্মযোগমার্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে বোধ হয়; পরন্তু কর্মসংন্যাসমার্গকে নিন্দা করা হয় নাই।[১] ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেও, নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহ দৃষ্টিতে এবং লোকহিতার্থ সমস্ত ব্যবহার— কি শাস্ত্রীয়, কি লৌকিক—অনাসক্তভাবে সকলকেই আমরণ অবশ্যই করিতে হইবে, এমন কথা প্রাচীনতম গ্রন্থত্রয়ের কোথাও নাই। গীতায় বরং ইহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্তব্য কার্য থাকে না ("তস্য কার্যং ন বিদ্যতে")। সর্বভূতে তাঁহার কোন অর্থব্যপাশ্রয় থাকে না সুতরাং লোকহিতার্থ বা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করার কথাও তাঁহার পক্ষে উঠিতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে যে, ইহসংসারে কর্মকরণে তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি বিধিনিষেধের অতীত হন। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে কোন ব্রহ্মজ্ঞানী যদি কোন না কোন হেতু বশতঃ,—পূর্বসংস্কার বশতঃ কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে কোন কর্ম করেন, তবে তাঁহাকে সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না, তাই উহাতে তাঁহার বন্ধন হয় না।

অপরাপর গ্রন্থে ঐ বিষয়ে কি সন্ধান পাওয়া যায় এখন আমরা তাহা দেখিব। অনুগীতা'য় চাতুরাশ্রম্যের বিধান আছে। কথিত হইয়াছে যে মনীষিগণ একই নিত্যধর্মকে চতুষ্পদ বলিয়া মনে করেন। ধর্মার্থাদি চারি বিদ্যা, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রম উহার চারি পাদ। ব্রহ্মচর্য প্রথম পদ, গার্হস্থ্য দ্বিতীয় পদ, বানপ্রস্থ তৃতীয় পদ, এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ "অধ্যাত্ম পরম পদ"।[২] গার্হস্থ্যাশ্রমের এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে চারি আশ্রমই তন্মূলক;[৩] উহা আশ্রমের আদি।[৪] আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে মোক্ষলাভার্থ অধ্যাত্ম আশ্রম

'মনসা' শব্দের উপর জোর দিয়া, তিলক মনে করেন যে মন হইতে কর্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে, বস্তুত কর্মসংন্যাসের কথা বলা হয় নাই। তাহাতে "নৈব কুর্বন্ না কারয়ন" বাক্যের সঙ্গে সুসঙ্গতি থাকে না। শঙ্কর বলেন 'মনসা'=বিবেকবুদ্ধি দ্বারা। যে কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিরুদ্ধ করত মনে মনে ('মনসা)' কর্মের ও তদ্‌ভোগের স্মরণ করিতে থাকে সে 'গীতা'র মতে মিথ্যাচারী (৩৬) তাই বর্তমান শ্লোকে বলা হইয়াছে বিচার দ্বারা মন হইতেও কর্মবৃত্তি সংন্যাস করিতে হইবে।

১) লোকমান্য তিলকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "কিন্তু কর্মযোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহার জন্য গীতাতে কোথাও সন্ন্যাসমার্গের নিন্দা করা হয় নাই। বরং উহাও মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যায় যে জগতের আরম্ভে সনৎকুমারাদি এবং পরে শুক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি যে মার্গ স্বীকার করিয়াছেন তাহাকে ভগবান্‌ও সর্বথৈব ত্যাজ্য কিরূপে বলিবেন? সাংসারিক ব্যবহার কাহারও নিকট নীরস বা মিষ্ট লাগা অংশত উহার প্রারব্ধ কর্মানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাবের উপর নির্ভর করে। এবং জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ না হইলে নিষ্কৃতি নাই ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাই এই প্রারব্ধকর্মানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাব হেতু কোন জ্ঞানী পুরুষের মনে সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ায় তিনি যদি সংসার ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কোন ফল নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে সিদ্ধপুরুষের বুদ্ধি নিঃসঙ্গ ও পবিত্র হইয়াছে তিনি অন্য কিছু করুন বা না করুন, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে তিনি মানব বুদ্ধির শুদ্ধতার পরম সীমা এবং স্বভাবতই বিষয়লুব্ধ দুর্ধর মনোবৃত্তিকে আপনার অধীনে রাখিবার সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা সকল লোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দেন। তাঁহার এই কাজ লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও ছোট নহে। সন্ন্যাস সম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদর বুদ্ধি আছে, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ; এবং মোক্ষ দৃষ্টিতে গীতারও ইহার অভিমত।" ('ভগবদ্‌গীতারহস্য', বাংলা ভাষান্তর, ৪৭৪-৫ পৃষ্ঠা) আরও দেখ—৪৪০-১ পৃষ্ঠা)।

২) মহাভা, ১৪।৩৫।৩৬— ৩) মহাভা, ১৪।৪৫।।১৩

৪) "আশ্রমাণাং চ সর্বেষাং গার্হস্থ্যং নাত্র সংশয়ঃ।" (মহাভা, ১৪।৪৪।১৭'১)

অবশ্যই আশ্রয় করিতে হইবে। "গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থী, যে মোক্ষে আস্থিত হইতে ইচ্ছা করে, সে উত্তম বৃত্তি (বা সংন্যাসাশ্রম) আশ্রয় করিবেক"[১]। পক্ষান্তরে ইহাও কথিত হইয়াছে যে (মনুষ্য) যাবৎপর্যন্ত (পরম আশ্রম) অধ্যাত্মকে আশ্রয় না করে, তাবৎ পর্যন্ত আকাশ, আদিত্য অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, প্রজাপতি, (প্রভৃতি) এই সমস্ত হইতে ভিন্ন (পরমতত্ত্বকে) দর্শন করিতে পারে না, (এই সমস্তকে দর্শন করিয়া থাকে)।"[২] সংন্যাসের বহু প্রশংসা আছে। যথা, জিতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থ সমস্ত লোক জয় করে, আর পরম স্থান আশ্রিত ব্যক্তি জন্মমরণবান্ যোনিসমূহে সংসরণ করে না ; অর্থাৎ মুক্ত হয়।[৩] "নিশ্চিতবাদী" বৃদ্ধগণ সংন্যাসকে (উত্তম) তপ বলেন। ব্রহ্মযোনিস্থ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন।"[৪] সংন্যাসীর আচার ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।[৫] কথিত হইয়াছে যে যাহা যাহা কামনাযুক্ত এবং হিংসাযুক্ত, তৎসমস্তই তথা লোক সংগ্রহধর্মও, (সংন্যাসী স্বয়ং আচরণ) করিবে না এবং (অপরকে দিয়াও)করাইবে না।"[৬]

"হিত্বা গুণময়ং সর্বং কর্ম জন্তুঃ শুভাশুভম্।
উভে সত্যানৃতে হিত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥"[৭]

'শুভ এবং অশুভ গুণময় সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করত, তথা সত্য ও অনৃত উভয়কে পরিত্যাগ করত, মনুষ্য মুক্ত হয়। 'তাহাতে সংশয় নাই।' কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মুমুক্ষু ব্রহ্মচারী কিংবা গৃহস্থ, মধ্যবর্তী আশ্রম গ্রহণ ব্যতীতও, সোজাসুজি চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে। সেই প্রকার ইহাও কথিত হইয়াছে ব্রহ্মচারী আপন আশ্রম কর্ম সমাপন করত "গ্রামান্নিষ্ক্রম্য চারণ্যে মুনিঃ প্রব্রজিতে বসেৎ" ('গ্রাম হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক অরণ্যে প্রব্রজ্যা করত মুনি হইয়া বাস করিবে')।[৮]

'অনুগীতা'য় নিবৃত্তিমার্গের প্রশংসায় বলা হইয়াছে যে "ইহাকে একপদ এবং সুখস্বরূপ ব্রহ্মময় বৃত্ত বলে।"[৯] "বিষয়াভিলাষী সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধ এবং জনপদত্যাগ দ্বারা মুনির অধ্যাত্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়।"[১০] "যোগ প্রবৃত্তিলক্ষণ। জ্ঞান সংন্যাসলক্ষণ। সেই হেতু ইহসংসারে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞান অঙ্গীকার করত সংন্যাস করিবেক। জ্ঞানসংযুক্ত সংন্যাসী পরম গতি প্রাপ্ত হয়।"[১১] প্রবৃত্তিমার্গের এই বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে যে "কোন কোন মন্দবুদ্ধিরত মনুষ্য

---

১) "গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথবা পুনঃ।
য ইচ্ছেন্মোক্ষমাস্থাতুমুত্তমাং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ ॥"—(মহাভা, ১৪।৪৬।১৭)

২) মহাভা, ১৪।৩৫।৪১ ৩) মহাভা ১৪।৪৬।৮

৪) মহাভা, ১৪।৪৭।১ আরও দেখ

"জ্ঞানং ত্বেব পরং বিদ্মঃ সংন্যাসং তপ উত্তমম্।
যস্তু বেদ নিরাবাধং জ্ঞানতত্ত্বং বিনিশ্চয়াৎ।
সর্বভূতস্থমাত্মানং স সর্বগতিরিষ্যতে ॥"—(মহাভা, ১৪।৩৫।১৬)

'ত্বেব পরং বিদ্মঃ' স্থলে 'বৈ পরমং বিদ্যাৎ' এবং 'নিরাবাধং জ্ঞানতত্ত্বং বিনিশ্চয়াৎ' স্থলে 'নিরাধারং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়াৎ' পাঠান্তরে এই বচন পরেও আছে। (১৪।৩৭।৫'২—৬)

৫) মহাভা, ১৪।৪৬।১৯— ৬) মহাভা, ১৪।৪৬।৩৯ ৭) মহাভা, ১৪।৪৭।১১

৮) মহাভা, ১৪।৪৬।৯ ৯) মহাভা, ১৪।৪২।৪৯'২ ১০) মহাভা, ১৪।৪২।৫২

১১) মহাভা, ১৪।৪৩।২৬-২৭.১ আরও দেখ—১৪।৫০।৩—৪.১

কর্মকে প্রশংসা করে। পরন্তু যাঁহারা বৃদ্ধ মহাত্মা তাঁহারা কর্মকে প্রশংসা করেন না। কর্ম দ্বারা মনুষ্য ষোড়শাত্মক মূর্তিমান্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বিদ্যা (সেই) পুরুষকে গ্রাস করে। তাহাকে গ্রহণ করা অমৃতাকাঙ্ক্ষীদিগের উচিত। সেইহেতু যাহারা যাহারা পারদর্শী তাঁহারা কর্মসমূহে নিঃস্নেহ। এই মনুষ্য বিদ্যাময় বলিয়া পরন্তু কর্মময় নহে বলিয়া স্মৃত।"[১] "যাহারা জ্ঞানপরিনিষ্ঠিত সেই সকল মুক্তগণের গতি এই প্রকারই। তাঁহারা সমস্ত প্রবৃত্তিকে পরিণামজ বলিয়া দেখেন। বিরক্তদিগের এই গতি আর ইহাই সনাতন ধর্ম।"[২] বিবিধ শুভ কর্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য কেবল পুণ্য লাভ করে এবং তাহার ফলে দেবলোকে গমন করে। পরন্তু কোথাও আত্যন্তিক সুখ লাভ করে না, এবং শাশ্বতী স্থিতিও লাভ করে না। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুন মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয়।[৩] ঐ প্রকারে ভুগিতে ভুগিতে মনুষ্য কদাচিৎ নির্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং তখন নিরাকারকে আশ্রয় করত লোকতন্ত্র পরিত্যাগ করে।[৪] "যে কেহ শত্রুরহিত, মিত্ররহিত, পুত্র (দারাদি) রহিত, ধর্ম, অর্থ ও কাম (এই ত্রিবর্গ) পরিত্যাগী এবং নিরাকাঙ্ক্ষী সেই মুক্ত হয়।"[৫] এবং "অকর্মবান্" "বৈরাগ্যবুদ্ধি" ব্যক্তিই অচিরে মুক্তিলাভ করে।[৬]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র বর্ণনা হইতেও জানা যায় যে প্রাচীন নারায়ণীয়ধর্মে বা ভাগবতধর্মে চাতুর্বর্ণ্যের ন্যায় চাতুরাশ্রম্যও প্রচলিত ছিল। "(ভগবান্) নারায়ণের মুখ হইতে শ্রুত সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যায় দেবর্ষি নারদ চাতুরাশ্রম্যের বিবরণ দিয়াছেন।[৭] তন্মতে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে থাকিয়া "সাঙ্গোপনিষদ্ বেদ" অর্থ সহ যথাযথ অধ্যয়ন করত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, গুরুর আজ্ঞা লইয়া,

"গৃহং বনং প্রবিশেৎ প্রব্রজেত্তত্র বা রসেৎ ॥"[৮]

'গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেক, কিংবা বনে প্রবেশ করিবেক, কিংবা প্রবজ্যা অবলম্বন করিবেক অথবা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া যাবজ্জীবন) তথায় (=গুরুগৃহে) বাস করিবেক।' নারদ বলেন যে দ্বিজগণের কাহাকে কাহাকে জ্ঞাননিষ্ঠ, কাহাকে কাহাকে যোগনিষ্ঠ, কাহাকে কাহাকে তপোনিষ্ঠ, কাহাকে কাহাকে স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কাহাকে কাহাকে প্রবচননিষ্ঠ, আর কাহাকে কাহাকে কর্মনিষ্ঠ দেখা যায়।[৯] পরন্তু "যে চিত্তবিজয়ে উদ্যত, সে নিঃসঙ্গ, অপরিগ্রাহী, একা এবং বিবিক্তশরণ ভিক্ষালব্ধ মিতাহারী ভিক্ষু হইবেক" ইত্যাদি।[১০] "বৈদিক কর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত(কর্ম) দ্বারা (মনুষ্য) পুনরাবর্তন করে, আর নিবৃত্ত (কর্ম) দ্বারা মোক্ষলাভ করে।"[১১] ভাগবতধর্মের বিবরণে মহাত্মা চমস বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ বিরাট্-পুরুষের মুখাদি হইতে আশ্রমসমূহ সহ উৎপন্ন হয়।[১২] যদিও নারদ বলিয়াছেন যে চিত্ত-

---

[১] মহাভা, ১৪।৫১।৩০—২ [২] মহাভা, ১৪।৫১।৩৭—৩৮·১ [৩] মহাভা, ১৪।১৬।২৯—

[৪] মহাভা, ১৪।১৬।৩৮ আরও দেখ—১৪।১৯।৩১—৫ [৫] মহাভা, ১৪।১৯।৬

[৬] মহাভা, ১৪।১৯।৮—৯

[৭] (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১২—৫ অধ্যায়। [৮] ঐ, ৭।১২।১৪·২ ; কৃষ্ণও সেই প্রকার বলিয়াছেন (১১।১৭।৩৮,৫৫)

[৯] ঐ, ৭।১৫।১ [১০] ঐ, ৭.১৫।৩০— [১১] ঐ, ৭।১৫।৪৭

[১২] ঐ, ১১।৫।২ পরন্তু কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন যে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার জঙ্ঘা হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য, বক্ষ হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাস আশ্রম প্রকটিত হইয়াছে। (ঐ. ১১।১৭।১৩—৪) মহর্ষি মৈত্রেয় উদ্ধবকে বলেন যে বিরাট

বিজয়ার্থ ভিক্ষু হইতে হইবে, তিনি উহা একান্তিক মনে করিতেন না বোধ হয়। কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী কিংবা যতি,—যে বিজ্ঞেয় পরমতত্ত্বকে জানিয়াছে,-সর্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করে,—তিনি সর্ববস্তুতে প্রকৃতপক্ষে প্রবিষ্ট না হইলেও যেন প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া দর্শন করেন ("পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ") এবং তদনুসারে আচরণ করেন তিনি পরব্রহ্মে অধিগমন করেন।[১] উপসংহারে নারদ বলেন, "হে রাজা (যুধিষ্ঠির), তাহাতে ভক্তিমান্ মনুষ্য এই সমস্ত, তথা অন্য বেদোক্ত, স্বকর্মসমূহ দ্বারা (অর্থাৎ অনুষ্ঠান করত) গৃহে বর্তমান থাকিলেও তাঁহার গতি প্রাপ্ত হয়।" [২]

"ধর্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ।
গৃহস্থো যেন পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ॥"[৩]

'গৃহস্থদিগের পাপনাশন ধর্ম তোমার নিকট বর্ণিত হইল, যাহার দ্বারা গৃহস্থ অনায়াসে সংন্যাসীগের (প্রাপ্য) স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে।'

নারায়ণোপাসক যতিগণ

নারায়ণীয়াখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে 'গীতায়' যেমন একান্তধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমন যতিধর্মও সমাসবিধিরীতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ যতিগণ নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসী। পূর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এখন তাহার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে যতিগণ একান্তিগণ হইতে ভিন্ন। নারায়ণীয়াখ্যানের অপর এক উক্তি হইতে আরও জানা যায় যে যতিগণ একান্তিগণ হইতে কথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। কেননা, কথিত হইয়াছে যে একান্তিগণের গতি যতিগণের গতি অপেক্ষা "বিশিষ্টা" (বা উত্তম)।[৪] যতিগণ আত্মবিৎ ("যতীনামাত্মবেদিনাম্")।[৫] বৈশম্পায়ন বলেন, মহাভাগ নারদ তাঁহার গুরু ব্যাসকে "শ্বেতানাং যতীনাং চাহ একান্তগতিমব্যয়াম্" ('শ্বেতদিগের ও যতিদিগের অব্যয় একান্তগতি ব্যাখ্যা করেন')।[৬] টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে 'শ্বেতগণ' গৃহস্থাদি (যাহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে), আর 'যতিগণ' কাষায়ধারী। এই ব্যাখ্যা ঠিক হইলে,—তাহা ঠিকই মনে হয় (পরে দেখ)—বলিতে হইবে যে যতিগণ সন্ন্যাসী ছিলেন।[৭] 'মহাভারতে'র অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে[৮] মেরু পর্বতের পূর্বদিকে, "ব্রহ্মার সদনে"র উর্ধ্বে কিম্বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট,[৯] "নারায়ণস্থান" আছে। ঐখানে ভগবান্ নারায়ণ বা বিষ্ণু থাকেন।[১০] তিনি "সর্বভূতের প্রকৃতির প্রকৃতি",[১১]

পুরুষের পূর্বদক্ষিণাদিক্রমে চারি মুখ হইতে যথাক্রমে বিদ্যা, দান, তপ ও সত্য-ধর্মের এই চারিপাদ, এবং বৃত্তিসমূহের সহিত (ব্রহ্মচর্যাদি) চারি আশ্রম নির্গত হইয়াছে।

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১২।১৫—৬ ২) ঐ, ৭।১৫।৬৭ ৩) ঐ, ৭।১৫।৭৪

৪) মহাভা, ১২।৩৪৮।৩—৬ ৫) মহাভা, ১২।৩৪৭।৯২ ৬) মহাভা, ১২।৩৪৮।৮৫

৭) হপ্‌কিন্‌স বলিয়াছেন, শ্বেতগণ ও যতিগণ পাঞ্চরাত্র-সাংখ্য-ধর্মের দুই সম্প্রদায়িগণ। E. W. Hopkins, Epic Mythology, p. 186

৮) মহাভা, ৩।১৬৩।১৭—

৯) মূলে আছে, "ব্রহ্মণঃ সদনাত্তস্য পরং স্থানং প্রকাশতে।" (মহাভা, ৩।১৬৩।১৮.১)

১০) অন্যত্র ঐস্থানকে "সেই বিষ্ণুর পরম পদ" ও "সনাতন শুদ্ধ জ্যোতি পরব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। (মহাভা, ৩।২৬১।৩৭—)।

১১) "যমাহু সর্বভূতানাং প্রকৃতেঃ প্রকৃতিং ধ্রুবম্।
অনাদিনিধনং দেবং প্রভুং নারায়ণং পরম্॥"—(মহাভা, ৩।১৬৩।১৭)

“ভূতেশ্বর…সর্বপ্রকৃতি ও আত্মভূ” ।[১] ব্রহ্মর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ ঐ নারায়ণস্থানে যাইতে পারেন না। একমাত্র যতিগণই তথায় গমন করিয়া থাকেন, এবং তথা হইতে আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না।

“যতয়স্তত্র গচ্ছন্তি ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্ ॥
পরেণ তপসা যুক্তা ভাবিতাঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ।
যোগসিদ্ধা মহাত্মানস্তমোমোহবিবর্জিতাঃ ॥”[২]

‘যতিগণ ভক্তি দ্বারা তথায় নারায়ণ হরির নিকটে গমন করেন। তাঁহারা পরম তপস্যা দ্বারা যুক্ত, শুভ কর্মসমূহ দ্বারা ভাবিত এবং তমোমোহবিবর্জিত যোগসিদ্ধ মহাত্মা।’ সুতরাং যতিগণ নারায়ণ-ভক্ত তপস্বী ও যোগী।[৩] ‘জয়াখ্যসংহিতা’র মতে, যতি ও একান্তী ভাগবত-ধর্মীদিগের দুই উপভেদ; উভয়েই অপ্রতিগ্রাহী এবং ভিক্ষান্নভোজী; যতিগণ ‘কাষায়-বাসধারী”।[৪] সুতরাং যতিগণ সন্ন্যাসী। মহাত্মা ভীষ্ম মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট হইতে যতিধর্ম শিক্ষা করেন।[৫] ভীষ্ম বলিয়াছেন “চাতুরাশ্রম্যধর্মাশ্চ” যতিধর্মাশ্চ।[৬] তাহাতে যতিগণ ভৈক্ষচর্যা বা প্রব্রজ্যা নামক চতুর্থাশ্রমিগণ হইতে ভিন্ন মনে হয়। ভীষ্ম বলেন, “ক্ষেমাশ্রম প্রাপ্ত বিপ্র অক্ষরসাত্মতা লাভ করেন।”[৭] আর পূর্বে বলা হইয়াছে যে যতিগণ নারায়ণস্থানে গমন করেন। তবে তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন (“যতীনামূর্ধ্বরেতসাম্”).[৮]

কৌটিলের ‘অর্থশাস্ত্রে’ সঙ্কর্ষণ দেবতার উপাসক সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে গুপ্তচর ঐ প্রকার সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করত ইত্যাদি। ঐ সন্ন্যাসগিণ মুণ্ডিতমস্তক কিংবা জটাধারী হইত।[৯]

---

১) মহাভা, ৩।১৬৩।২০·২ ২) মহাভা, ৩।১৬৩।২৩·২—২৪

৩) ‘মহাভারতে’র অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরাদিকে বলেন, যে ভগবান্ বালমুকুন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

“যতয়ঃ শান্তিপরমা যতাত্মানো বুভুৎসবঃ ॥
কামক্রোধদ্বেষমুক্তা নিঃসংজ্ঞা বীতকল্মষাঃ।
সত্ত্বস্থা নিরহঙ্কারা নিত্যমধ্যাত্মকোবিদাঃ ॥
মামেব সততং বিপ্রাশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে।”—(মহাভা, ৩।১৮৯।১৫·২—১৭·১)

ইহা হইতেও জানা যায় যে যতিগণ নারায়ণোপাসক।

৪) পূর্বে দেখ।

৫) মহাভা, ১২।৩৭।১৩·১ ৬) মহাভা, ১২।৬৪।১

৭) “বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্ ॥”—(মহাভা, ১২।৬১।৯·২)

আরও দেখ—১২।৬১।৫

৮) মহাভা, ২।৫২।৪৭

৯) সঙ্কর্ষণদৈবতীযোগো বা মুণ্ডজটিলব্যঞ্জনঃ” ইত্যাদি। (‘কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র’, আর শামাশাস্ত্রী-সম্পাদিত, মহীশূর, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩।৩ অধ্যায় ৪০৩ পৃষ্ঠা)। আরও দেখ—“মুণ্ডো জটিলো বা বৃত্তিকাম-স্তপসব্যঞ্জনঃ। স নগরাভ্যাশে প্রভূতমুণ্ডজটিলান্তেবাসী শাকং” ইত্যাদি। (ঐ, ১৯ পৃষ্ঠা)

(২) নৈষ্কর্ম্য

প্রাচীন ভাগবতধর্মে নৈষ্কর্ম্যের অতি মহত্ব ছিল মনে হয়। কোন কোন পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদ হইয়া 'সাত্বততন্ত্র' প্রবর্তিত করেন, যাহা হইতে "কর্মসমূহের নৈষ্কর্ম্য" হয়;[১] এবং নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে "নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ কর্ম উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়াছেন।"[২] 'গীতা'য়ও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির কথা আছে।

> "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
> নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥"[৩]

'যাহার বুদ্ধি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত এবং যে জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ, সে সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।'

> "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥"[৪]

'কর্মসমূহের প্রারম্ভ না করিয়াই পুরুষ নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর সংন্যাস হইতেই কেহ সিদ্ধি লাভ করে না।' এই শেষোদ্ধৃত বচনের 'সিদ্ধি' শব্দের অর্থ পূর্বোদ্ধৃত বচনের 'পরম-নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' মনে হয়। তাহাতে উভয় বচনের মধ্যে এক বিরোধাভাস হয়,—এই শেষের বচনে বলা হইয়াছে যে সংন্যাসের দ্বারা পরমনৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না, আর পূর্বের বচনে বলা হইয়াছে যে সংন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কম্যসিদ্ধি হয়। উহা পরিহারার্থ গীতার টীকাকারগণ 'সংন্যাস' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী টীকাকারগণ মনে করেন যে কর্মের ফল এবং কর্মবিশেষ উভয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—যেমন গীতার অন্যত্র আছে "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ"[৫] তেমনই ভাবে—আমরণ, এমন কি সম্যগ্‌জ্ঞানোদয়ের পরেও, কর্ম যথাপূর্ব করিতে থাকাই গীতার মতে 'নৈষ্কর্ম্য'। তাঁহাদের আধুনিক কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে চাতুর্বর্ণ্যবিহিত সমস্ত কর্মই,—কি পারিবারিক, কি সামাজিক বা কি স্বারাষ্ট্রিক—যথাযথভাবে যাবজ্জীবনই অবশ্যই করিতে হইবে, ইহাই গাতোক্ত নিষ্কামকর্মযোগের রহস্য। যাহা হউক, তাঁহাদের সকলেই সেই হেতুতে মনে করেন যে প্রথমোদ্ধৃত বচনে 'সংন্যাস 'শব্দের অর্থ 'কর্মফলের সংন্যাস' আর শেষোদ্ধৃত বচনে 'সংন্যাস' শব্দের অর্থ 'কর্মের সংন্যাস' বা 'কর্মের প্রারম্ভের সংন্যাস' বা 'চাতুরাশ্রম্যগত সংন্যাস'। যে স্থিতিতে কর্ম করিতে থাকিলেও কর্তাকে ফল ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং তিনি যেন অকর্তাই থাকেন[৬] অথবা যেন কর্মরহিতই থাকেন তাহাই, তাঁহাদের মতে, গীতোক্ত 'নৈষ্কর্ম্য'। আচার্য শঙ্কর বলেন, "নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসংবোধ' হেতু যাহার হইতে কর্মসমূহ নির্গত (বা নিবৃত্ত) হইয়া গিয়াছে, সে নিষ্কর্মা; তাহার ভাব নৈষ্কর্ম্য; আর নৈষ্কর্ম্যরূপ যে সিদ্ধি তাহাই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। অথবা নৈষ্কর্ম্যের সিদ্ধি (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি); অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থান রূপ লক্ষণের সিদ্ধি বা

---

১) "তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্টে নৈষ্কর্ম্যং কর্মাণাং যতঃ।"—((বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৩।৮·২)

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৪।৬ ৩) গীতা, ১৮।৪৯ ৪) ঐ, ৩।৪ ৫) ঐ, ১৮।৬·১

৬) দেখ—"তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্"—(ঐ, ৪।১৩); আরও দেখ—ঐ, ১৩।২৯

নিষ্পত্তিই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি"।[১] সুতরাং, তাঁহার মতে 'নৈষ্কর্ম্য' অর্থ 'কর্মশূন্যতা'। তাঁহার মতে, প্রথম বচনে 'সংন্যাস' শব্দের অর্থ 'সম্যগ্‌দর্শন বা তৎপূর্বক-কৃত সর্বকর্মসংন্যাস'। আর শেষোক্ত বচনে 'সংন্যাস' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান বিনা কেবল কর্মপরিত্যাগ'। আমরা মনে করি—বলপূর্বক স্বেচ্ছায় কর্ম-ত্যাগকে, অর্থাৎ নিজের অন্তরে স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা প্রবল থাকিতেও কোন না কোন কারণে জোর করিয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া কর্ম না করাকে, অথবা, অপর কথায় বলিলে, যে কর্মসংন্যাসের প্রকৃত অধিকারী নহে, তাহার দ্বারা কৃত কর্মসংন্যাসকে শেষোদ্ধৃত বচনে সংন্যাস বলা হইয়াছে; আর প্রথমোদ্ধৃত বচনের 'সংন্যাস' 'স্বাভাবিক বা স্বতঃ সংন্যাস', অর্থাৎ কর্মপ্রবৃত্তির স্বতঃ নিরোধ বশত কর্মের পরিত্যাগ। শ্রুতিতে আছে যে কর্ম দ্বারা প্রাপ্তব্য লোকসমূহের সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ কর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত নির্বেদ প্রাপ্ত হয়[২]; অর্থাৎ কর্ম করিয়া উহার ফলভোগার্থ নানা লোকে গমন করিয়া সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভের পরই পুরুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে কর্ম দ্বারা পরমার্থ লাভ হয় না এবং তখনই সে কর্ম বিষয়ে প্রকৃত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া স্বতঃই কর্ম ত্যাগ করে। ইহাকেই 'গীতা'য় বলা হইয়াছে (কর্ম) সংন্যাস দ্বারা মনুষ্য নৈষ্কর্ম্য লাভ করে,—তাহার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়। যখন ঐ অবস্থা সম্যক্ পরিপক্ক হয়,—যখন কর্মপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়, সুতরাং আর কখনও জাগে না,—নিবৃত্তি সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বা সুদৃঢ় হয়, তখন পরমনৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়। পূর্বের প্রথমোদ্ধৃত গীতা-শ্লোকে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইয়াছে। আত্মার অসঙ্গত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে,—নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ না হইলে ঐ পরম অবস্থা লাভ হইতে পারে না। তাই আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে নৈষ্কর্ম্যের বা কর্মশূন্যতার পরম সিদ্ধি সম্যগ্‌দর্শনের বা নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মৈক্যসংবোধের পরে হয়। পক্ষান্তরে যে এখনও কর্ম আরম্ভ করে নাই, সুতরাং নানা লোকে গমন করে নাই, অতএব তথাকার নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই, অথবা কর্ম আরম্ভ করিলেও বেশী কর্ম করে নাই, সেই হেতু নানা লোকে বারংবার গমন করে নাই, অতএব তথাকার পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই, কর্ম বিষয়ে তাহার প্রকৃত নির্বেদ হইতে পারে না। তাহার অন্তরে কর্মপ্রবৃত্তি কোন না কোন ভাবে কিছু না কিছু থাকিয়া যায়। তথাপিও যদি সে কোন না কোন বাহ্য ঘটনা বশত কর্মসংন্যাস করে, তাহার নৈষ্কর্ম্য পরম হইতে পারে না। পূর্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় গীতা শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।

'অনুগীতা'তে 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দ 'কর্মাভাব' বা 'কর্মসংন্যাস' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে "গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থী, যে মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে উত্তম বৃত্তি আশ্রয় করিবেক। সর্বভূতকে অভয় প্রদান করত সর্বভূতসুখ(দায়ক), মৈত্র্য, সর্বেন্দ্রিয়যত এবং মুনি হইয়া নৈষ্কর্ম্য আচরণ করিবেক" ইত্যাদি।[৩] ঐ উত্তম বৃত্তি অবশ্যই চাতুরাশ্রম্যগত চতুর্থাশ্রম সংন্যাসাশ্রম বা ভৈক্ষচর্যাশ্রমই।[৪] সুতরাং ঐ নৈষ্কর্ম্য কর্মসংন্যাসই। উহার অন্যত্র

---

[১] গীতা, ১৮।৪৯ (শঙ্করভাষ্য)

[২] মুণ্ডকউ, ১।২।১২

[৩] মহাভা, ১৪।৪৬।১৭—

[৪] যথা, কথিত হইয়াছে যে "চরেদ্‌ভৈক্ষ্যং" (১৪।৪৬।১৯); "ভৈক্ষ্যং লিপ্সেত মোক্ষবিৎ" (৪৬।২০) ইত্যাদি।

আছে জ্ঞানবিজ্ঞানপারগ জনৈক ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত ("ন্যস্তকর্মাণং") একান্তে বসিয়া থাকিতেন। এক দিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলেন, 'তোমাকে পতি পাইয়া আমার কোন্ গতি হইবে? আমি কোন্ লোকে যাইব? আমি শুনিয়াছি পতি যেই লোকে যায়, স্ত্রীও সেই লোকে যায়। তুমি ত কোন কর্ম করিতেছ না। সুতরাং কোন উত্তম লোকে তোমার গতি হইবে না। তোমার সুগতি না হইলে, আমার কি প্রকারে হইবে?' তখন ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, "হে সুভগে, হে নিষ্পাপে, তোমার এই বাক্যের জন্য আমি তোমাকে অসূয়া করিতেছি না।

'গ্রাহ্যং দৃশ্যং চ সত্যং বা যদিদং কর্ম বিদ্যতে।
এতদেব ব্যবস্যন্তি কর্ম কর্মেতি কর্মিণঃ॥
মোহমেব নিযচ্ছন্তি কর্মণা জ্ঞানবর্জিতাঃ।
নৈষ্কর্ম্যং ন চ লোকেঽস্মিন্ মুহূর্তমপি লভ্যতে।[1]

কর্মিগণ 'কর্ম কর্ম' (বলিতে বলিতে) গ্রাহ্য, দৃশ্য বা সত্য এই যাহা কিছু কর্ম আছে, তৎসমস্ততে দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে। (পরন্তু) তাহারা জ্ঞানবর্জিত হইয়া মোহই নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হয়, এক মুহূর্তের জন্যও ইহসংসারে নৈষ্কর্ম্য লাভ করে না। মন, বাণী (ও কায়) দ্বারা শুভ বা অশুভ কর্ম করিয়া জন্মাদিমূর্তিভেদান্ত কর্ম (দ্বারা প্রাপ্ত) প্রাণিগণের মধ্যে বর্তমান থাকে।" ইত্যাদি।[2] এইখানে 'নৈষ্কর্ম্য' অর্থ 'কর্মাভাব' বা 'কর্মশূন্যতা'। মহাত্মা বিদুরও ঐ অর্থে 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।[3]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণে আছে, "নিঃসঙ্গভাবে এবং ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বেদোক্ত কর্ম (অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যবিহিত স্বকর্ম) করিয়াই (মনুষ্য) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করে। ফলশ্রুতি রোচনার্থ।"[4] ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারে যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির জন্য কর্মসংন্যাস করিতে হয় না,—নৈষ্কর্ম্য অর্থ কর্মশূন্যতা নহে। পরন্তু তাহাদের ঐ অনুমান বিচারে টিকিবে না। কেননা, রাজা নিমির যে প্রার্থনার উত্তরে পরমভাগবত আবির্হোত্র ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"কর্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয় স্বানি কর্মাণি নৈষ্কর্ম্যং বিন্দতে পরম্॥"[5]

'যাহা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া মনুষ্য স্বকর্মসমূহ বিশেষভাবে পরিত্যাগ করত পরম নৈষ্কর্ম্য লাভ করে, সেই কর্মযোগ আমাকে বলুন।' ইহাতে সহজে বুঝা যায় যে চিত্তশুদ্ধিলাভার্থই কর্ম করিতে হয়,[6] চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হইবে; অন্যথা পরম নৈষ্কর্ম্য লাভ হইবে না। যেহেতু নিমির এই অনুরোধে নৈষ্কর্ম্যলাভার্থ কর্মপরিত্যাগের উল্লেখ আছে এবং আবির্হোত্রের উত্তরে স্পষ্টবাক্যে তাহার প্রতিবাদ নাই, সেইহেতু তাহা মহাত্মা আবির্হোত্রও অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে। উত্তরে ঐ বচনের কিঞ্চিৎ (এক শ্লোক) পূর্বে তিনি বলিয়াছেন, "কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম—ইহারা বেদবাদ (অর্থাৎ বেদগম্য), লৌকিক নহে। বেদের

---

১) মহাভা, ১৪।২০।৬—৭ ২) মহাভা, ১৪।২০।৫২ ৩) মহাভা, ৫।৬৩।২২ ৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৩।৪৬
৫) ঐ, ১১।৩।৪১ ৬) যেমন গীতায় স্পষ্টবাক্যে বলা হইয়াছে। (পূর্বে দেখ)

ঈশ্বরাত্মত্ব হেতু (এমন কি) সূরিগণও (বেদের তাৎপর্য বিষয়ে) মোহপ্রাপ্ত হয়, (সুতরাং স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কথা আর কি ?)।

> পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
> কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।'[1]

বেদ পরোক্ষবাদ।[2] ইহা (অর্থাৎ কর্ম করিতে বেদের বিধান) বালকদিগের অনুশাসন। যেমন (মাতা রুগ্ন বালককে) ঔষধ (খাওয়াইতে মিশ্রি প্রভৃতি দিয়া প্রলোভন দিয়া থাকে, তেমন বেদ) কর্মপরিত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই কর্মসমূহের (অনুষ্ঠানের) বিধান দিয়া থাকেন।"[3] ইহার পর আর কোন সন্দেহ থাকে না যে '(বিষ্ণু)ভাগপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণে 'কর্মশূন্যতা' অর্থেই 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "নৈষ্কর্ম্যং কর্মনিবৃত্তিসাধ্যং জ্ঞানম্।" নারায়ণীয় সনাতনধর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "স্বভাব-কৃত বৃত্তি অনুসারে স্বকর্ম-কারী (মনুষ্য) ক্রমে ক্রমে ঐ স্বভাবজকর্ম পরিত্যাগ করত নির্গুণতা লাভ করে।"[4] ঐ বিষয়ে তিনি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।

কোন জমিতে বার বার ফসল উৎপাদন করিলে উহা ক্রমে নিবীর্য হয়,—উহার প্রজনন শক্তি ক্রমে বিনষ্ট হয়। তখন উহাতে বীজ বপন করিলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় না বিনষ্টই হয়। সেই প্রকার কামাশয় চিত্ত কামসমূহের অত্যধিক সেবন দ্বারা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। ("কামানামতিসেবয়া বিরজ্যতে"), স্বল্প কামভোগ দ্বারা তাহা হয় না। ঐ বিষয়ের অপর দৃষ্টান্ত অগ্নি। অগ্নিতে অল্প অল্প ঘৃত ঢালিলে উহা নির্বাপিত হয় না, বরং অত্যধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। পরন্তু একসঙ্গে অত্যধিক ঘৃত ঢালিলে অগ্নি নির্বাপিতই হয়।[5] এইরূপে দেখা যায়, নারায়ণীয় ধর্মের সিদ্ধান্ত এই যে স্বকর্ম বা স্বধর্ম পালন করিতে করিতে উহার প্রতি স্বতঃ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়; তখন উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং তখনই নৈর্গুণ্য লাভ হইবে।

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অন্যত্র আছে, ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু বলেন, "এই জগতে যাহা কিছু জগৎ আছে, তৎসমস্তই আত্মা দ্বারা আবিষ্ট। সেই হেতু ত্যাগ দ্বারা ভোগ করিবে। কাহারও ধনের প্রতি লোভ করিও না।"[6] পরমাত্মা "অজ আত্মশক্তি (মায়া) দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চে জন্মাদি বিধান করিয়া থাকেন। (আবার) বিদ্যা দ্বারা তাহাকে পরিত্যাগ করত নিরীহ (=নিষ্কাম বা নৈষ্কর্ম্য ভাবে) থাকেন। সেই হেতু ঋষিগণ অকর্ম লাভের উদ্দেশ্যে

---

[1] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৩।৪৪

[2] এক অর্থকে গোপনার্থ অন্যথা বা বিপরীত বলাকে 'পরোক্ষবাদ' বলা হয়। বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কর্ম পরিত্যাগ করান, অথচ বেদ কর্ম করিতে বিধান দিয়াছেন। সেইহেতু বেদ পরোক্ষবাদ।

[3] (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৩।৪৩—৪৪ [4] ঐ, ৭।১১।৩২

[5] ঐ, ৭।১১।৩৩—৪ পরন্তু ঐ, বিষয়ে রাজর্ষি যযাতির অনুভব অন্য প্রকারের। তিনি বলেন—

> "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥"
> —(মহাভা……, (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।১৯।১৪)

[6] "আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"—(বিষ্ণু)ভাগপু, ৮।১।১০)

'আত্মা' স্থলে 'ঈশ' পাঠান্তরে এই বচন 'ঈশাবাস্যোপনিষদে' (১) পাওয়া যায় এবং তথা হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমে কর্মসমূহ (করিতে) ঈহা করিয়া থাকেন। ঈহমান পুরুষ প্রায় অনীহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ ঈশ্বর ঈহা করিয়া থাকেন, (পরন্তু) তাহাতে আসক্ত হন না। যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করে তাহারা আত্মলাভ করত পূর্ণার্থ হয়, অবসাদগ্রস্ত হয় না।”[১] এইখানে নিরীহা, ‘অনীহা’ (বা নিষ্কামতা) শব্দ ‘অকর্ম’ (বা নৈষ্কর্ম্য) অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ শিবাদ্বয়বাদী আচার্য অভিনবগুপ্ত (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন,

“সংসারকারণং কর্ম সংসারাঙ্কুর উচ্যতে॥
চতুর্দশবিধং ভূতবৈচিত্র্যং কর্মজং যতঃ॥
অতএব সাংখ্যযোগপাঞ্চরাত্রাদিশাসনে॥
অহংমমেতি সংত্যাগো নৈষ্কর্ম্যায়োপদিশ্যতে।”[২]

তাঁহার টীকাকার জয়রথ (১২০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বলিয়াছেন; “যঃ কশ্চিৎ পরব্রহ্মণি আহিতচিত্তঃ সর্বমপি কুর্বন্ ‘নাহং কিঞ্চিৎ করোমি’ ইত্যভিমানাদহন্তাং সন্ত্যজেৎ, তত্র চ সঙ্গাভাবাৎ ‘ন মমানেন কৃতেন কশ্চিদর্থঃ’ ইতি মমতাগ্রহমপি, স নৈষ্কর্ম্যং, প্রাপ্নুয়াৎ”। তিনি ঐ বিষয়ে ‘গীতা’র ৪।১৪, ২০; ৫।৭-১০ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং অভিনবগুপ্তের মতে গীতোক্ত নৈষ্কর্ম্যের তাৎপর্য কর্মে অহন্তা-মমতা-ত্যাগ, কর্ম-ত্যাগ নহে। পরন্তু তাঁহার প্রাক্কালীন জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী গীতা-ভাষ্যকার আচার্য রামকণ্ঠ (৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) মনে করেন যে গীতোক্ত ‘নৈষ্কর্ম্য’ সংজ্ঞার অর্থ “অবিদ্যমানকর্মত্ব”,[৩] “সর্বকর্মাভাব”,[৪] বা “সর্বকর্মত্যাগিত্ব”।[৫] তাঁহার মতে ‘গীতা’র ৫।২৬-৭ শ্লোকে নৈষ্কর্ম্যযোগী অপেক্ষা কর্মযোগীর বিশেষ (বা শ্রেষ্ঠতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে ইহা অতি নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় যে, তাঁহার মতে, নৈষ্কর্ম্য ‘গীতা’র কর্মযোগ বা নিষ্কামকর্মযোগ বা অনাসক্তিযোগ হইতে ভিন্ন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে নৈষ্কর্ম্যাভিমানিগণ ব্রহ্মচারীর এবং যতিরই সংন্যাসিতা এবং যোগিতা মানিয়া থাকে, তাহারা মনে করে যে, যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই, দারপরিগ্রহপূর্বক গৃহস্থ না হইয়া এবং তদাশ্রমোচিত শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহ না করিয়া, পরিব্রাজকধর্ম আশ্রয় করে, সেই ব্রহ্মচারী, কিংবা যে আশ্রমত্রয়বিহিত শাস্ত্রীয় কর্মসমূহ যথাক্রমে অনুষ্ঠান করিবার পর, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করত নিরাশিষাশ্রম আশ্রয় করে, সেই যতিই “সন্ন্যাসী এবং যোগী”।[৬] উহাদিগকে তিনি “কেবলজ্ঞানবাদী” বা “জ্ঞানমাত্রবাদী” বলিয়াছেন।[৭] রামকণ্ঠ মনে করেন যে চাতুর্বর্ণ্যবাদের ন্যায় চাতুরাশ্রম্যবাদও ‘গীতো’ক্ত কর্মযোগীর মান্য।[৮]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৮।১।১৩·২—১৫।

২) ‘তন্ত্রালোক’, ৯।৮৮·২—৯০·১

৩) গীতা, ৩।৪ রামকণ্ঠের ভাষ্য।

৪) ঐ, ৩।৫

৫) “নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং·· সর্বকর্মত্যাগিত্বফলং পরমাত্মাসমাপত্তিস (হল)ক্ষণং—(ঐ, ১৮।৪৯।১২

৬) গীতাভাষ্য, ৬।১

৭) ঐ, ৬।২; আরও দেখ—৩।২

৮) যথা, তিনি বলিয়াছেন, “যৎকর্ম কায়বাঙ্মনোভির্নির্বত্যব্যাপারবিশেষাত্মকং বর্ণাশ্রমবিভাগেন দেশকালাবস্থাপেক্ষমুখ্যগৌণবিবিধেতিকর্তব্যতাকলাপেন নিত্যাদিভেদেনাবশ্যকর্তব্যতয়া শাস্ত্রেষু বিহিতং তস্মিন্নধিকারঃ কর্তৃত্বং ভবতুঃ;” (ঐ, ২।৪৮) “তস্মাৎ কর্মযোগিনঃ তত্তদ্বর্ণাশ্রমক্রমাগতাং তাং তাং শাস্ত্রচোদিতাং ক্রিয়ামনতিক্রম্যস্ত এব সর্বসাম্যভাবনাঽত্র বিবক্ষিতা,” (ঐ, ৬।৯) ‘গীতা’য় আছে “নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং ইত্যাদি। (৩।৮) রামকণ্ঠ উহাকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “নিয়তং বর্ণবিভাগেনাশ্রমবিভাগেন চ শাস্ত্রেন নিয়ন্ত্রিতং কর্ম তাং তাং ক্রিয়াং কুরু অনুতিষ্ঠ, মা কদাচন ত্যাক্ষীঃ” ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যূহবাদ ও অবতারবাদ

(১) ব্যূহবাদ

নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত প্রাচীন ভাগবতধর্মের এক বিশেষত্ব ব্যূহবাদ। তথায় উক্ত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন যে সনাতন বাসুদেব পৃথিব্যাদি-পঞ্চমহাভূতাত্মক শরীরে প্রবেশ করত 'জীব', 'শেষ' ও 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া পরিসংখ্যাত হন।[১] "তাহা (সঙ্কর্ষণ) হইতে যে স্বীয় কর্ম দ্বারা সনৎকুমারত্ব লাভ করে এবং যাহাতে মহাপ্রলয়ে সর্বভূত প্রলীন হয়, সেই সর্বভূতের মন (উৎপন্ন হয়)। উহা 'প্রদ্যুম্ন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[২] তাহা (প্রদ্যুম্ন) হইতে যাহা প্রসূত হয়, উহা কর্তা, কারণ এবং কার্য। উহা হইতে স্থাবরজঙ্গম সর্বভূত উৎপন্ন হয়। উহাই অনিরুদ্ধ, উহাই ঈশান এবং উহাই সর্বকর্মে ব্যক্ত।"[৩] অনন্তর তিনি আবার সংক্ষেপে বলেন, "যিনি নির্গুণাত্মক বাসুদেব তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, সঙ্কর্ষণ, ভগবান্ ও প্রভু বলিয়া জানিও। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (উৎপন্ন হয়) এবং উহা 'মন' বলিয়াও কথিত হয়। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (উৎপন্ন হয়) এবং উহাই 'অহঙ্কার'—উহাই 'ঈশ্বর'। হে নারদ, সৎ ও অসৎ, অক্ষর ও ক্ষর এবং স্থাবর ও জঙ্গম—সমস্তই আমা হইতেই নিশ্চয় উৎপন্ন হয়।"[৪] কিঞ্চিৎ পরে সৃষ্টি প্রলয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেন, "তাহার (প্রলয়ের) পর পুনরায় বিদ্যা দ্বারা আমি সর্বজগৎ উৎপন্ন করিব। ইহাতে (আমার) যে চতুর্থী মূর্তি (বাসুদেব) তাহা অব্যয় শেষকে সৃষ্টি করে ('অসৃজৎ')। সে 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়াও প্রোক্ত হয়। সে (সঙ্কর্ষণ) প্রদ্যুম্নকে জন্ম দেয় ('অজীজনৎ')। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহং (উৎপন্ন হয়)। (এই প্রকারে) আমার সৃষ্টি (ও প্রলয়) পুনঃ পুনঃ (হয়)। সেই প্রকারে অনিরুদ্ধ হইতে,—তাহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে চরাচর সর্বভূতবর্গ (উৎপন্ন হয়)।"[৫] সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই তিনটি বাসুদেবের তিন ব্যূহ। কখন কখন বাসুদেবকে লইয়া ব্যূহ-সংখ্যা চার বলা হয়। ভগবান্ নারায়ণ উঁহাদিগকে তাঁহার "মূর্তিচতুষ্টয়" বলিয়াছেন।[৬] সুতরাং তিনি স্বয়ং পঞ্চম। পরন্তু তখন তাঁহাকে মূর্তির বা ব্যূহের মধ্যে গণনা করা হয় না। তাই ব্যূহের সংখ্যা চারই থাকিয়া যায়। তন্মধ্যে বাসুদেব নির্গুণ, আর সঙ্কর্ষণাদি সগুণ।

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৩-৬ ; পূর্বে দেখ।

২) কথিত হইয়াছে যে মহৌজা সনৎকুমারই কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে অবতীর্ণ হন। (মহাভা, ১।৬৭।১৫৩·২) 'হরিবংশে'র মতে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নই পুরাণে 'সনৎকুমার' বলিয়া পরিগীত হয়। (হরিবংশ, ২।১০৪।২)

৩) মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৭-৯ ৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।৪০-২ ৫) মহাভা, ১২।৩৩৯।৭২-৪

৬) "ময়ৈতৎ কথিতং সম্যক্ তব মূর্তিচতুষ্টয়ম্ ॥" (মহাভা, ১২।৩৩৯।৪৬·২)

পূর্বোদ্ধৃত তৃতীয় বচনে (১২।৩৩৯।৭২-৪) ভগবান্ বাসুদেবকে তাঁহার "চতুর্থী মূর্তি" বলিয়াছেন। তাহাতেও জানা যায় যে তাঁহার 'মূর্তি' চারিটি। অন্যত্রও ভগবান্ বলিয়াছেন, নারায়ণ "সদা চতুর্মূর্তিধারী।" (মহাভা, ১২।৩৪০।১০৬.২)

নারায়ণ ঋষির এক উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার জানা যায়। মুক্ত পুরুষের গতি বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন, "সর্বলোকের তমোনাশক আদিত্যকে তাঁহাদিগের পথের দ্বার বলা হয়। আদিত্য দ্বারা তাঁহাদিগের সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। তাহাতে তাঁহারা কখনও কাহারও দৃশ্য হন না। তাঁহারা পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই দেবে (আদিত্যে) প্রবেশ করেন। অনন্তর তথা হইতে নির্মুক্ত হইয়া তাঁহারা অনিরুদ্ধ তনুতে স্থিত হন। অতঃপর মনস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে প্রবেশ করেন এবং পরে প্রদ্যুম্ন হইতে নির্মুক্ত হইয়া সাংখ্যবিপ্রগণও ভাগবতগণ সহ (ঐ মুক্ত পুরুষগণ) জীবে বা সঙ্কর্ষণে প্রবেশ করেন। অনন্তর সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ত্রৈগুণ্যহীন হইয়া শীঘ্র নির্গুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞে বা পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। সর্বাবাস বাসুদেবকেই তত্ত্বতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও।"[১] যে হেতু এইখানে বলা হইয়াছে যে কেবল বাসুদেবে প্রবেশের সময়েই মুক্ত জীব ত্রৈগুণ্য হয়, সেই হেতু বুঝা যায় যে একমাত্র বাসুদেবই ত্রৈগুণ্যরহিত, আর সঙ্কর্ষণাদি ত্রৈগুণ্য-যুক্ত। বাসুদেব যে নির্গুণাত্মক তাহা সাক্ষাদ্ভাবে যেমন নারায়ণ ঋষির এই বচনে, তেমন ভগবান্ নারায়ণের পূর্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় বচনে উক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত 'ব্যূহ' শব্দের অর্থ 'সমূহ', 'বিন্যাস' বা 'নির্মাণ', 'মূর্তি' ও 'দেহ'। এইখানে 'ব্যূহ' শব্দকে 'মূর্তি' বা 'দেহ' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই উপরে উদ্ধৃত কোন কোন বচনে সঙ্কর্ষণাদিকে বাসুদেবের 'মূর্তি' বা 'তনু' বলা হইয়াছে। নারায়ণীয়াখ্যানের অপর কোন কোন স্থলেও অনিরুদ্ধকে বাসুদেবের 'তনু' বলা হইয়াছে।[২] পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও বাসুদেবাদিকে ভগবানের "মূর্তি", "রূপ" বা "আত্মা" বলা হইয়াছে।[৩] তথায় 'ব্যূহ' শব্দকে 'বিন্যাস' অর্থেও গ্রহণ করা যায়। কেননা, তন্মতে অখিল ষাড়্গুণ্যযুক্ত একই বিষ্ণু গুণব্যতিকর-বশতঃ দুই দুই গুণপ্রধান সঙ্কর্ষণাদি অপর তিন রূপেও বিন্যস্ত হয়।[৪]

ভগবান্ নারায়ণের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিত্রয়ের বিশেষ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি সর্বত্রই সমভাবে বলিয়াছেন যে সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। পরন্তু সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিত্রয়ের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ অন্তর দেখা যায়। দ্বিতীয় বচনে আছে, যিনি বাসুদেব, তিনিই সঙ্কর্ষণ বা জীব ("যো বাসুদেবঃ……স এব…জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ"); আর তৃতীয় বচনে আছে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণকে সৃষ্টি করেন ("অসৃজৎ")। সুতরাং এই বচনদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়; কেননা, একটার মতে সঙ্কর্ষণ উৎপন্ন হন না, অপরটার মতে হন। পরন্তু ভগবানের প্রথম উক্তিদ্বারা এই বিরোধাভাসের সহজে পরিহার হয়। কেননা, উহাতে ভগবান্ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে পঞ্চভূতাত্মক শরীরে প্রবেশ করিয়াই বাসুদেব সঙ্কর্ষণ বা জীব নামে অভিহিত হন। শরীরে প্রবেশ করত শারীর চেষ্টা করিয়া প্রভু "উৎপন্ন এব ভবতি" ('উৎপন্নই হন')।[৫] সুতরাং বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি শরীরোপাধি সম্পর্কেই, স্বরূপতঃ বা বস্তুতঃ নহে। বস্তুতঃ যিনি বাসুদেব তিনিই সঙ্কর্ষণ। বেদান্তশাস্ত্রে জীবকে

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৪।১৪-৮ ; আরও দেখ—৩৪৮।২-৪

২) পূর্বে দেখ।

৩) যথা দেখ—'পৌষ্করসংহিতা', ৮।৩৫, ৩৭ ; ১০।৪, ১০ ; ১৯।৭৫— ; ৩৩।১— ; ৩৯।২১— ;

৪) "চাতুরাত্ম্যস্থিতির্নিষ্কোগুর্ণব্যতিকরোদ্ভবম্।"—('অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', ৫।২১)

৫) মহাভা, ১২।৩৩৯।৩৪·২—৩৫·১

নিত্য ও নির্বিকার এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়াও যেই প্রকারে উহার জন্ম ও মৃত্যুর কথা বিবৃত হইয়া থাকে, সঙ্কর্ষণের উৎপত্তিও ঠিক সেই প্রকারের। বাসুদেব স্বরূপতঃ নিরুপাধিক এবং নির্গুণ। পরন্তু শরীরোপাধি ত্রিগুণাত্মক। সেইহেতু সঙ্কর্ষণ বা সোপাধিক বাসুদেব সগুণ।

নারায়ণীয়াখ্যানের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মা রুদ্রকে বলেন,

“চতুর্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি।”[১]

‘(বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই) চারি প্রকারে বিভক্ত সেই (পরম)পুরুষ যেমন ইচ্ছা করেন, তেমন ক্রীড়া করেন।’ সুতরাং এইখানে এক হইতে অপরের উৎপত্তির কথা নাই। যেমন শ্রুতিতে আছে, “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা” ইত্যাদি (‘তিনি এক প্রকার হন, তিন প্রকার হন, পাঁচ প্রকার, সাতপ্রকার” ইত্যাদি)[২] ঐ কথাটাও সেই প্রকারের,—বাসুদেব নিজে নিজেই চারি ব্যূহরূপ ধারণ করেন। পরন্তু অন্যত্র ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা-কৃত নারায়ণের বা বাসুদেবের স্তুতিতে নারায়ণের যে পরম গুহ্যতত্ত্ব যথাতথা উদ্গীত হইয়াছে, তন্মতে বাসুদেব নিজে নিজেকে সঙ্কর্ষণ দেবরূপে সৃষ্টি করত (“সৃষ্ট্বা”) পরে নিজেই সঙ্কর্ষণ হইতে আত্মসম্ভব প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করেন (“অস্রাক্ষীঃ”)। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে বা অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন। অনিরুদ্ধ লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। বাসুদেবময় ব্রহ্মা বাসুদেব দ্বারাই বিনির্মিত।[৩] ঐ প্রসঙ্গে ভীষ্ম বলিয়াছেন, অব্যয় বাসুদেব “সর্বভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণকে কল্পনা করেন (‘অকল্পয়ৎ’)। তাহা হইতে দেবদেব সনাতন নারায়ণ উৎপন্ন হন। তাঁহার নাভিতে সর্বলোকের উৎপত্তি হেতু কমল উৎপন্ন হয়। উহাতে পিতামহ (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হন এবং তাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়।”[৪] অন্যত্র তিনি কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে নারায়ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলেন যে নারায়ণ ‘বিভু’ ‘কেশব’ ‘ভগবান্’, ‘ঈশ্বর’, ‘প্রভু’, ‘পুরুষ’, ‘সর্ব’ (অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ) ইত্যাদি বহু প্রকারে শ্রুত হইয়া থাকেন।[৫] অনন্তর তিনি বলেন, ভূতাত্মা, মহাত্মা, সর্বভূতেশ্বর ও প্রভু পুরুষোত্তম আকাশাদি পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করত জলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাতে শয়ান সর্বতেজোময় পুরুষোত্তম সর্বভূতের অগ্রজ এবং আশ্রয় সঙ্কর্ষণকে “মনসা” (মন সহ, অথবা মনে মনে) কল্পনা করেন (“অকল্পয়ৎ”)। তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ সর্বভূতকে ধারণ করেন। তাঁহার নাভি

---

১) মহাভা, ১২।৩৫১।২২'২

২) ছান্দোগ্যউ, ৭।২৬।২

৩) ব্রহ্মা বলেন,

“সৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
কৃষ্ণ ত্বমাত্মনাঽস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং চাত্মসম্ভবম্ ॥
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধং ত্বং যং বিদুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অনিরুদ্ধোঽসৃজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্ ॥
বাসুদেবময়ঃ সোঽহং ত্বয়ৈবাস্মি বিনির্মিতঃ।” (মহাভা, ৬।৬৫।৭০-৭২'১)

৪) মহাভা, ৬।৬৭।১১-২

৫) মহাভা, ১২।২০৭।৫

হইতে কমল উৎপন্ন হয় এবং উহাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়।[১] অন্যত্র ভীষ্ম বলিয়াছেন, "বিশ্বাবাস নির্গুণ বাসুদেবকে (পণ্ডিতগণ) জীবভূত সঙ্কর্ষণ বলেন। তাহা হইতে প্রদ্যুম্ন এবং (প্রদ্যুম্ন হইতে) চতুর্থ অনিরুদ্ধ (উৎপন্ন হয়) বলেন।"[২]

কখন কখন সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পুরুষপ্রধানমহদাদির সঙ্গে সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নাদির সমীকরণ করা হইয়া থাকে। যথা, নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে পরমর্ষি ব্যাস তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন, "সাংখ্য-যোগবিদ্‌গণ যাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলেন, তিনি স্বীয় কর্ম হেতু ("স্বেন কর্মণা") 'মহাপুরুষ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতে 'অব্যক্ত' প্রসূত হন। পণ্ডিতগণ উঁহাকে (অব্যক্তকে) 'প্রধান' বলিয়াও জানেন। ঈশ্বর অব্যক্ত হইতে লোকসৃষ্ট্যর্থ 'ব্যক্ত' উৎপন্ন হন। লোকমধ্যে তিনি (ব্যক্ত) 'অনিরুদ্ধ' এবং 'মহান্ আত্মা' বলিয়াও কথিত হন। ঐ যিনি ব্যক্তত্ব প্রাপ্ত হন এবং পিতামহকে উৎপন্ন করেন, তিনি 'অহঙ্কার' বলিয়াও কথিত হন। তিনি সর্বতেজোময়। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি অহঙ্কার-প্রসূত পঞ্চমহাভূত।"[৩] এইখানে দেখা যায়, অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার, অব্যক্ত বা প্রধান হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় উহা 'মহত্তত্ত্ব'। পরন্তু তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষি বলেন[৪] যে প্রলয়ে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন ব্যক্তে, ব্যক্ত অব্যক্তে, অব্যক্ত পুরুষে এবং পুরুষ সর্বগতে (বা বাসুদেবে) ক্রমে বিলীন হয়। তখন "তম এবাভবৎ সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন" (অর্থাৎ 'সমস্তই তম হইল, কিছুরই জ্ঞান রহিল না')। ঐ তম "মূল-অমৃতাত্মক" (অর্থাৎ 'কারণ সলিল')। উহা হইতে ব্রহ্ম সম্ভূত হইল।

"তদ্বিশ্বভাবসংজ্ঞান্তং পৌরুষীং তনুমাশ্রিতম্ ॥
সোঽনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তস্তং প্রধানং প্রচক্ষতে।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং ত্রিগুণং…………॥"[৫]

'উনি (ব্রহ্ম) 'বিশ্বভাব' নামক 'পৌরুষী তনু'তে আশ্রিত। তিনি 'অনিরুদ্ধ' বলিয়া প্রোক্ত হন এবং তাঁহাকেই 'প্রধান' বলা হয়। তিনিই 'অব্যক্ত' ও 'ত্রিগুণ' বলিয়া জ্ঞেয়। বিদ্যাসহায়বান্ সেই দেব, প্রভু বিষ্বক্‌সেন হরি, বহুগুণোদ্ভব বিচিত্র জগতের সৃষ্টির কথা চিন্তা করিতে করিতে যোগনিদ্রা অবলম্বন করত জলে (অর্থাৎ কারণসলিলে) শয়ন করিয়া রহিলেন। এইরূপে সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণ তাঁহার আত্মগুণ 'মহৎ' বলিয়া স্মৃত হয়। তাহা (মহৎ) হইতে অহঙ্কার (বা অনিরুদ্ধ) উৎপন্ন হয়। সর্বলোকপিতামহ চতুর্মুখ বন্ধা বা ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ অনিরুদ্ধ (বা অহঙ্কার) হইতে (তাঁহার নাভি হইতে সমুদ্ভূত) কমলে সম্ভূত হয়। এইখানে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কারকে মহৎ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে এবং অব্যক্ত বা প্রধানকেও 'অনিরুদ্ধ' বলা হইয়াছে। জগতের সৃষ্ট্যাদির মূল কারণকে কৃষ্ণ তাঁহার "পরা প্রকৃতি" এবং 'অনিরুদ্ধ' বলিয়াছেন।[৬] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, ভগবান্ কপিল বলেন,

---

[১] মহাভা, ১২।২০৭।৮-১৩

[২] মহাভা, ১৩।১৫৮।৩৯

[৩] মহাভা, ১২।৩৪০।২৮'২-৩২

[৪] ঐ, ১২।৩৪৭।১৪-২২

[৫] ঐ, ১২।৩৪৭।১৭'২-১৮

[৬] ঐ, ১২।৩৪১।১৪-১৬'১

“যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃপদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥”[১]

যাহাকে সত্ত্বগুণময় স্বচ্ছ ও শান্ত ভগবৎ-পদ (অর্থাৎ ভগবানের উপলব্ধি স্থান) ‘বাসুদেব’ নামক চিত্ত বলা হয়, তাহাই মহত্তত্ত্ব। যেমন স্বচ্ছত্ত্ব, শান্তত্ব ও অবিকারিত্ব—এই লক্ষণ(ত্রয়) দ্বারা জলের পরা প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া থাকে, তেমন স্বচ্ছত্ব, শান্তত্ব ও অবিকারিত্ব বৃত্তিসমূহ দ্বারা (মহদাত্মক) চিত্তের লক্ষণ প্রোক্ত হইয়া থাকে। বিকারগ্রস্ত ভগবদ্বীর্য্যসম্ভূত মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রিয়াশক্তি অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। উহা বৈকারিক, তৈজস ও তামস—এই ত্রিবিধ ; এবং উহা হইতে মন ইন্দ্রিয়সমুহ এবং মহাভূতসমূহের উৎপত্তি হয়। (পণ্ডিতগণ ভূতেন্দ্রিয় মনোময় ‘সঙ্কর্ষণা’খ্য পুরুষকে (বা অহঙ্কারকে) সাক্ষাৎ ‘সহস্রশির অনন্ত’ বলিয়া থাকেন। কর্তৃত্ব, কারণত্ব ও কার্য্যত্ব, অথবা শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব অহঙ্কারের লক্ষণ। বৈকারিক অহঙ্কার বিকারগ্রস্ত হইলে মনস্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। উহার সঙ্কল্প-বিকল্প হইতে কামনার উৎপত্তি হয় ; এবং উহা ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর ‘অনিরুদ্ধ’ নামেও প্রসিদ্ধ।[২] ইহাতে দেখা যায়, বাসুদেব = মহত্তত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ = অহঙ্কার এবং অনিরুদ্ধ = মন।

বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি ব্যূহের এবং পুরুষপ্রধানাদি সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বের সমীকরণ সম্বন্ধে এই প্রকার বহুল মতান্তর থাকিলেও ঐ প্রচেষ্টা হইতে ব্যূহবাদপরিকল্পনার উৎপত্তির কারণ অনুমান করা যায়। বেদান্তশাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনুসারে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হয় ; পরে ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম সন্মাত্র। সুতরাং উঁহার উৎপত্তি সম্ভব নহে। ‘ব্রহ্মসূত্রে’ ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তের সৃষ্টিক্রম এই প্রকার বলিয়াই মীমাংসা করিয়াছেন।[৩] সাংখ্যশাস্ত্র-মতে, নির্গুণ পুরুষ এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি উভয়েই অজ ও নিত্য ; পুরুষ অপরিণামী বা কূটস্থ নিত্য, আর প্রকৃতি পরিণামী নিত্য ; নির্বিকার পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হইয়া মহত্তত্ত্বকে উৎপন্ন করে ; মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় ; এবং অহঙ্কার হইতে, ঠিক বেদান্তোক্ত ক্রমে, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। প্রাচীন ভাগবতধর্মে ঐ সৃষ্টিক্রম-দ্বয়ের সমন্বয় করা হইয়াছিল। নারায়ণীয়াখ্যানেই উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক নারদকে ব্যাখ্যাত “পাঞ্চরাত্রানুশব্দিত মহোপনিষৎ” যেমন “চতুর্বেদ সমন্বিত”, তেমন “সাংখ্য-যোগকৃত”।[৪] তাই উহাতে সাংখ্যের নির্গুণ ও নির্বিকার পুরুষকে বাসুদেব মনে করা হয় ; এবং আরও মনে করা হয় যে ঐ নির্গুণ পুরুষ বা বাসুদেব হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত বা প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। ভগবান্ নারায়ণ এবং নারায়ণ ঋষি স্পষ্টতঃই তাহা বলিয়াছেন।[৫] ভগবান্ নারায়ণ আরও বলিয়াছেন যে ঐ অব্যক্ত বা প্রকৃতিই অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট পুরুষই সঙ্কর্ষণ বা শেষ নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মহত্তত্ত্ব = প্রদ্যুম্ন এবং অহঙ্কার = অনিরুদ্ধ। এই সমীকরণ অনুসারে সঙ্কর্ষণ এক দৃষ্টিতে জন্মবান্। আবার কখন কখন মনে করা হয় যে অব্যক্ত পুরুষেরই

---

১) (বিষ্ণু)ভাগ, ৩।২৬।২১

২) ঐ, ৩।২৬।২১-২৮·১ ; আরও দেখ—৪।২৪।৩৪-৬

৩) ‘ব্রহ্মসূত্র’, ২।৩।১-১২ সূত্র।

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।১১১·২-১১২

৫) পূর্বে দেখ।

বিভাববিশেষ। অপর কথায় বলিলে,—পরমতত্ত্বের দুই বিভাব,—এক নির্গুণ ও নির্বিকার এবং অপর সগুণ ও সবিকার। নির্গুণ ও নির্বিকার বিভাব 'বাসুদেব' নামে এবং সগুণ ও সবিকার বিভাব 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত হয়। নির্বিকার বিভাবও অবশ্যই অব্যক্ত। তাই 'গীতা'য় উহাকে "সনাতন অব্যক্ত" এবং "অক্ষর অব্যক্ত" বলা হইয়াছে।[১] সবিকার বিভাবে পরমতত্ত্ব 'অব্যক্ত', অধিকন্তু 'মহাপুরুষ' নামে অভিহিত হয়। তিনি ঠিক সাংখ্যোক্ত প্রকারে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে অব্যক্ত সমস্ত জগৎকে আপনাতে সম্যক্ প্রকারে আকর্ষণ করত বিলীন করে, অথবা আকর্ষণ করত আপনাতে সম্ বা একীভাব প্রাপ্ত করায়। তাই উহা 'সঙ্কর্ষণ' নামে অভিহিত হয়। 'মহাভারতে' ভীষ্ম পরিষ্কার তাহা বলিয়াছেন, যে যুগের ক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয় সমুপস্থিত হইলে পরমাত্মা 'সঙ্কর্ষণ' নামে প্রোক্ত হন।[২] 'ভাগবতপুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে যে "অহং'—এই অভিমান যাঁহার লক্ষণ বলা হয়, আপনাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্যক্ কর্ষণ হেতু সাত্বতগণ তাঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলেন।"[৩] সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিলয় হইলেও ঐ অব্যক্ত ব্রহ্ম শেষ রহিয়া যায়। তাই উহা 'শেষ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' দেবকীকৃত কৃষ্ণস্তুতিতে আছে, "দ্বিপরার্ধ (কালের) অবসানে (অর্থাৎ কল্পান্তে) কালবেগবশতঃ (ত্রি) লোক নষ্ট হইলে, মহাভুতসমূহ অধিভুতে গত হইলে, ব্যক্ত অব্যক্তে গমন করিলে, একমাত্র শেষ নামক তুমিই (অব)শেষ থাকে।"[৪] 'নারদপুরাণে'ও তাহা উক্ত আছে, "যুগান্তে রৌদ্ররূপ দ্বারা (ব্রহ্মাণ্ড গ্রসিত হইলে), স্থাবর-জঙ্গম নষ্ট হইলে এবং জগৎ একার্ণবীভূত হইলে ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসসংহিত ভগবান্ হরি শেষরূপে বটপত্রে শয়ন করেন।"[৫] একটা অর্বাচীন বচনে তাহা অতি সুন্দরভাবে এবং পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।[৬] এইরূপে দেখা যায়, প্রলয়ে জগৎ নিঃশেষে শূন্যে পর্যবসিত হয় না। উহার কিছু শেষ থাকে। যাহা শেষ থাকে, তাহা আর অধিক "ন হীয়তে" (অর্থাৎ হীনতা বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না)। সেই হেতু উহাকে "অহি" বলা হয়।[৭] উহার অন্ত হয় না। সেই হেতু, উহাকে 'অনন্ত' বলা হয়।

---

১) গীতা, ৮।২০-১

২) মহাভা, ১২।৪৭।৩১-২ ; আরও দেখ—শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৪।১১।২৭ ; গরুড়পু, ১।২।২০. ; বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ১।৫২।২৩-১

৩) দেবীভাগপু, ৮।২০।১৯ ; (বিষ্ণু)ভাগপু, ৫।২৫।১

৪) (বিষ্ণু)ভাগপু. ১০।৩।২৫

৫) নারদপু, ১।৪।৪৩-৪

৬) "ততো দ্বিতীয়মিহ বস্তু যদস্তি কিঞ্চি-
তত্তদ্বিচারপদবীমবতারিতং চেৎ। আরও দেখ—শাণ্ডিল্যসংহিতা, ৪।১১।২৬
গন্ধর্বপত্তনমিবোপলয়ং প্রযাতি
ত্বং শিষ্যসে ধ্রুবমতস্তব শেষসংজ্ঞা ॥"
—('স্পন্দপ্রদীপিকা'য় ধৃত, ২০ পৃষ্ঠা)

৭) 'জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে' (৩।৭৭) আছে, শ্বিত্র আঙ্গিরস, 'অহি' নামে খ্যাত হন। কেননা তিনি "অহায়ত"। "অথ যদহীয়ত তদহীনামহিত্বম্।" সেই দৃষ্টিতে প্রলয়াবস্থাগত ব্রহ্মকে 'অহি' বলা যায়।

উহা পূর্ণ স্তিমিতাবস্থায় থাকে। উহাতে কোন প্রকার স্পন্দন থাকে না। সুতরাং উহা চলে না “ন অগতি”। তাই উহাকে ‘নাগ’ বলা হয়। এইরূপে জগৎপ্রপঞ্চের প্রলয়ের বিচারে সঙ্কর্ষণ = শেষ = অনন্ত = অহি = নাগ। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই সৎকার্যবাদী। প্রলয়ে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ ঐ শেষ বা অনন্তের মধ্যে বীজরূপে থাকে। যেমন ‘ছান্দোগ্যোপনিষদে’ মহর্ষি উদ্দালক আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন যে এক অতিক্ষুদ্র ন্যগ্রোধবীজের মধ্যে মহান্ ন্যগ্রোধবৃক্ষ অণিমারূপে রহিয়াছে,[১] তেমনই এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ শেষের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে নিহিত আছে ; শেষ উহা বীজরূপে ধারণ করিতেছে। তাই বলা হয় যে শেষ বা অনন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে,—উহা বিশ্বরূপ।[২] স্থিতিকালে সর্ববস্তুকে সম্যক্‌রূপে কর্ষণ বা স্বীয় আকর্ষণী শক্তি দ্বারা নিয়মন করতঃ জগতে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন বলিয়াও উহাকে ‘সঙ্কর্ষণ’ বলা যায়। নেতি নেতি করিয়া সদসৎ সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চকে নিষেধ করিলে তিনিই শেষ থাকেন। সেইহেতু তিনি ‘শেষ’। সর্বনিষেধেও তাঁহার অন্ত (বা শেষ) হয় না বলিয়া তিনি ‘অনন্ত’ (বা ‘অশেষ’)[৩] ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ আছে, “তিনিই আবার সর্ববস্তুতে বস্তুস্বরূপ, সর্বেশ্বর, সকলজগৎকারণ (ভূত অব্যক্তমহত্তত্ত্বাদিরও) কারণভূত, সর্বপ্রত্যগাত্মত্বহেতু সর্বগুণাভাসোপলক্ষিত একই (বলিয়া) পর্যবশেষিত। সুতরাং তিনি প্রকৃতপক্ষে ‘শেষ’ই। কোথাও কোথাও উদয়কে, অব্যক্ত ব্রহ্মের জগদ্রূপে অভিব্যক্তিকে সঙ্কর্ষণ বলা হইয়াছে।[৪] জগদ্রূপে পরিণাম সত্ত্বেও ব্রহ্ম আপন স্বরূপে যথাবৎ শেষ থাকেন। শ্রুতিতে তাহা অতীব পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে।

“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥[৫]

উহা (ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্ম) পূর্ণ। ইহা (ইন্দ্রিয়গোচর জগৎপ্রপঞ্চ) পূর্ণ। পূর্ণ (পরব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ (জগৎপ্রপঞ্চ) উদয় হয়। পূর্ণ (পরব্রহ্ম) হইতে পূর্ণ (জগৎপ্রপঞ্চ) গ্রহণ করিলে পূর্ণ (পরব্রহ্মই) নিশ্চয় অবশেষ থাকে।’ সুতরাং সৃষ্টি দৃষ্টিতে ব্রহ্মের নির্বিকার স্বরূপকে ‘শেষ’ বলা যায়। আপন স্বরূপ হইতে হীন বা চ্যুত হয় না বলিয়া উহা ‘অহি’ বা ‘অচ্যুত’। স্বরূপের অন্ত বা নাশ হয় না বলিয়া উহা ‘অনন্ত’।[৬] এইরূপে সৃষ্টির বিচারেও সঙ্কর্ষণ = শেষ = অহি = অনন্ত। যাহা হউক, এই প্রকার বিচারে বাসুদেব এবং সঙ্কর্ষণ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব—একই তত্ত্বের দুই বিভাব মাত্র। সুতরাং যিনি বাসুদেব বস্তুতঃ তিনিই সঙ্কর্ষণ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া উপাধি সম্পর্কেই নির্গুণ ও নির্বিকার বাসুদেব সগুণ ও সবিকার সঙ্কর্ষণ হন।

---

১) “যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সৌম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি।”
—(ছান্দোগ্য, ৬।১২।২)

২) “শেষং চাকল্পয়দ্দেবমনন্তং বিশ্বরূপিণম্।
যো ধারয়তি ভূতানি ধরাং চেমাং সপর্বতাম্ ॥”—(মহাভা, ৬।৬৭।১৩)

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।৯।৩৮

৪) পূর্বে এবং পরে দেখ।

৫) বৃহউ, ৫।১

৬) ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ (৫।১৭।২১-১) আছে, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিহীন বলিয়াই সঙ্কর্ষণকে ঋষিগণ ‘অনন্ত’ বলেন। দেখ—মহাভা ১৩।১৪৮।২০ ; ১৩।৮৫।১১— ; ১৪।১৩।১২

বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার কাল বর্তমান,—ব্রহ্ম বহু হইতে কামনা করিলেন ("অকাময়ত") এবং তাহাতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি বলিয়াছেন যে উহা "মনসো রেতঃ" (অর্থাৎ 'মনের বীজ') এবং উহা প্রথম হইতেই ছিল। সৃষ্টির আদিতে, শ্রুতি বলেন, স্রষ্টা ঈক্ষণ করিলেন ("তদৈক্ষত")। সুতরাং বীজ বা শেষ হইতে প্রথমে ঈক্ষণ, বা মন বা কাম উৎপন্ন হইল। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে "কামো জজ্ঞে প্রথমঃ" ('কাম প্রথমে উৎপন্ন হইল)।[১] নারায়ণীয় ধর্মে ঐ কামকে প্রদ্যুম্ন বলা হয়।[২] 'শিবপুরাণে'ও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মোদ্ভূত কামই;[৩] অতঃপর শিবের নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত ঐ কামদেব কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করে।[৪] যাহা হউক সেই হেতু বলা হয় যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ বা শেষ হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হয়। শ্রুতি বলেন, ঈক্ষণের পরে স্রষ্টা "অহং বহু স্যাম" এই সঙ্কল্প করেন। উহাই অহঙ্কার। নারায়ণীয়ধর্মে ঐ অহঙ্কারকে 'অনিরুদ্ধ' বলা হয়। 'শিবপুরাণে'ও আছে ভগবান্ হর নিজে নিজেকে সর্ব বলিয়া চিন্তা করত প্রথমে মনকে সৃষ্টি করেন, পরে অহঙ্কারকে; অনন্তর অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূতকে উৎপন্ন করেন; এইরূপে অষ্ট প্রকৃতিও ষোল বিকার সৃষ্টি করেন।[৫]

বেদান্তের সৃষ্টিক্রমের সহিত সাংখ্যের সৃষ্টিক্রমের সমন্বয় সাধনের ঐ প্রচেষ্টা 'গীতা'য়ও করা হইয়াছে। তবে উহা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। 'গীতা'র এক স্থলে সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই বাসুদেবের 'প্রকৃতি' বলা হইয়াছে; সাংখ্যের প্রকৃতি বাসুদেবের 'অপরা প্রকৃতি', আর সাংখ্যের পুরুষ বাসুদেবের 'পরা প্রকৃতি'।[৬] অপর এক স্থলে উভয়কেই 'পুরুষ' বলা হইয়াছে; সাংখ্যের প্রকৃতি পরিণামশীলা, তাই উহাকে 'ক্ষর পুরুষ' এবং সাংখ্যের পুরুষ কূটস্থ নিত্য বলিয়া উহাকে 'অক্ষর পুরুষ, বলা হইয়াছে। তখন বাসুদেবকে 'উত্তম পুরুষ' বা "পুরুষোত্তম" বলা হয়।[৭] আবার কোথাও বা সাংখ্যশাস্ত্রের সংজ্ঞাদ্বয় যথাযথ রাখিয়া বাসুদেবকে "পর পুরুষ"[৮] "পরম পুরুষ"[৯] বা "আদ্য পুরুষ"[১০] বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "পৃথিবী, জল; তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার অপরা প্রকৃতি বিভক্ত।"[১১] আচার্য শঙ্কর বলেন, এইখানে 'মন' শব্দে উহার কারণ 'অহঙ্কার'কে 'বুদ্ধি' শব্দে "অহঙ্কারের কারণ মহত্তত্ত্বকে" এবং 'অহঙ্কার' শব্দে "অবিদ্যাসংযুক্ত অব্যক্ত"কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ মনে করিলেই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। ভগবানের উক্ত প্রকৃতিদ্বয় হইতে চিদচিৎ জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি হইতে অচিৎ উৎপন্ন হয়,[১২] আর পরা প্রকৃতি জীব হয়। এবং তৎকর্তৃক এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে।[১৩] অপরা প্রকৃতি পরিণামশীলা।

---

১) 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী', ১ম খণ্ড, দেখ

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৫৫।১-২

৩) শিবপু, ধর্মসং, ৮।২৮-৩০

৪) শিবপু, জ্ঞানসং, ১১।২৪-৫ ; ধর্মসং, ৮।৪৩—

৫) শিবপু, সনৎকুমারসং, ২।২৯-৩০

৬) গীতা, ৭।৪-৫

৭) গীতা, ১৫।১৬-৭

৮) গীতা, ৮।১০, ২২ ; ১৩।২২

৯) গীতা, ৮।৮

১০) গীতা, ১৫।৪

১১) গীতা, ৭।৪

১২) গীতা, ৭।৬ ; ১৫।১৬

১৩) গীতা, ৭।৫

প্রবৃত্তি উহার স্বভাব।[১] পরন্তু পরা প্রকৃতি সেই প্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। তাই উহাকে কূটস্থ, অক্ষর ও অব্যয় বলা হইয়াছে।[২] উহা সর্বগত বা বিভু[৩]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে 'গীতা'র ঐ সমন্বয় স্বল্পপরিবর্তিত আকারে অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা, 'বিষ্ণুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ ও প্রকৃতি, তথা কাল, বিষ্ণুর রূপবিশেষ ; বিষ্ণু স্বয়ং ঐ রূপত্রয়ের পরম।[৪] উহা শুদ্ধ, কূটস্থ, নিত্য, অব্যয় ও একরস।[৫] পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই লয় পায়।[৬] পুরুষ এক, শুদ্ধ, নিত্য, বিভু এবং অক্ষর। প্রকৃতির ন্যায় উহাও পরমাত্মার অংশ।[৭] কোথাও পুরুষকে পরমাত্মার শক্তি বলা হইয়াছে[৮] 'পাদ্মসংহিতা'য়ও উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ ও প্রকৃতি ভগবান্ বাসুদেবের রূপদ্বয়।[৯] তবে উহাতে কালের পৃথক্ উল্লেখ নাই।

যাহা হউক, ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়,—এই শ্রুতিবচনের গৌরব রক্ষার্থ এই সমন্বয়ে কখন কখন মনে করা হয় যে বাসুদেবাদি চতুষ্টয় একই পরমতত্ত্বের চারি মূর্তি, দেহ বা ব্যূহ বিশেষ। নারায়ণীয়াখ্যানে বাসুদেবাদিকে যে স্পষ্টতঃই নারায়ণের বা পর বাসুদেবের 'মূর্তি' বা 'তনু' বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[১০] 'গীতা'য় কোন কোন স্থলে প্রকৃতিকে প্রকারান্তরে বাসুদেবের 'দেহ' বলা হইয়াছে।[১১] তাহাতে প্রকৃতিজ মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারও তাঁহার দেহ হয়, যেমন নারায়ণীয়াখ্যানে স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে।[১২] সুতরাং তখন অনিরুদ্ধ ব্যূহ হইতে আকাশের উৎপত্তি বলাও তাহাই হয়, পরমাত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি বলা যাহা। তাই বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও ব্রহ্মা ক্রমে উৎপন্ন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে তিনি "বাসুদেবময়" এবং বাসুদেব দ্বারাই বিনির্মিত।[১৩] সুতরাং বাসুদেব হইতে উৎপন্ন সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও সেই প্রকারে বাসুদেবময়,—বস্তুতঃ বাসুদেবই। 'মুদ্গলোপনিষদে' অনিরুদ্ধকে স্পষ্টতঃ "পাদনারায়ণ" ও "অনিরুদ্ধ নারায়ণ" বলা হইয়াছে। সুতরাং বাসুদেব সঙ্কর্ষণ এবং প্রদ্যুম্ন ও নারায়ণ,—প্রত্যেকে "পাদনারায়ণ"। নারায়ণীয়াখ্যানে ভগবান্ বলিয়াছেন, অনিরুদ্ধ লোকস্রষ্টারই নামান্তর।[১৪]

পুরাণে বিবৃত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় আছে শেষশায়ী বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মার জন্ম হয় এবং তিনিই আকাশাদিক্রমে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। উহারও সঙ্গে সমন্বয় সাধনার্থ নারায়ণীয়ধর্মে

---

১) গীতা, ১৫।৪

২) গীতা, ২।২১ ; ১৫।১৬

৩) গীতা, ২।২৪ ; আরও দেখ—২।১৭, ১৮

৪) বিষ্ণুপু, ১।২।১৪-৬

৫) বিষ্ণুপু, ১।২।১৩

৬) বিষ্ণুপু, ১।১৭।৩০ ও ৬।৪।৩৮

৭) বিষ্ণুপু, ৬।৪।৩৬

৮) বিষ্ণুপু, ৬।৭।৬১-৮

৯) পাদ্মসং, ১।৫।৯

১০) পূর্বে দেখ।

১১) গীতা, ৭।২১ ও ১১।৭, ১৩ দেখ।

১২) প্রকৃতি অনন্তরূপা। সুতরাং প্রকৃতিজ সমস্ত পদার্থ প্রকৃতিরই অন্তর্গত থাকে। সেই হেতু প্রকৃতিকে ভগবানের দেহ বলাতে তজ্জাত সমস্ত পদার্থও ভগবানের দেহ হয়।

১৩) পূর্বে দেখ।

১৪) "অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তো লোকসর্গকরঃ প্রভুঃ ॥"—(মহাভা, ১২।৩৪০।৭১'২
আরও দেখ—মহাভা, ১২।৩৪১।১৪—১৬'১

কখন কখন বলা হইত যে 'বিষ্ণু' অনিরুদ্ধেরই নামান্তরবিশেষ;[১] অনিরুদ্ধের নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন কমলে ব্রহ্মার জন্ম হয় এবং তিনিই চরাচর সর্বজগৎ সৃষ্টি করেন।[২]

বেদান্তের সৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্মের চারি রূপের পরিকল্পনাও আছে—অক্ষর, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্। উহার সহিত সমন্বয় রক্ষার্থ নারায়ণীয়ধর্মে অক্ষরকে বাসুদেব এবং বিরাট্পুরুষকে অনিরুদ্ধ বলা হইয়াছে।[৩] অন্তর্যামী এবং সূত্রাত্মা সম্বন্ধে কিছু উল্লিখিত না হইলেও নারায়ণীয়াখ্যানে ইহা বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে যে অক্ষর ব্রহ্মই বাসুদেব এবং তিনি যখন "অনিরুদ্ধতনুতে স্থিত" হন, তখনই তিনি বিশ্বরূপ বা বিরাট্ পুরুষ,—তখনই তিনি হয়শিরাদিরূপ হন।[৪] তাহাতে বলিতে হয় যে অন্তর্যামী=সঙ্কর্ষণ এবং সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ=প্রদ্যুম্ন। 'সঙ্কর্ষণ' নামের এক অর্থ যে 'অন্তর্যামী' হইতে পারে, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নারায়ণীয়াখ্যানের উপসংহারে আছে যে ব্রহ্মা রুদ্রের নিকট সাংখ্যমত ও যোগমত অনুসারে তত্ত্বজ্ঞান যথাযথ বর্ণনা করেন।[৫] তিনি বলেন

> "চতুর্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি।
> এবং স ভগবান্ স্বেন জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ ॥"[৬]

চতুর্ধা বিভক্ত সেই পুরুষ যেমন ইচ্ছা করেন, তেমন ক্রীড়া করেন। এই প্রকারে (জীবভূত) সেই ভগবান্ স্বীয় (স্বরূপের) জ্ঞান দ্বারা প্রতিবোধিত (হইয়া জীবভাব পরিত্যাগ করতঃ পুনঃ বাসুদেব হন)।' উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি বলিয়াছেন,

> "অচিন্ত্যং চাপি তং জ্ঞাত্বা ভাবসূক্ষ্মং চতুষ্টয়ম্।
> বিচরেদ্‌যোঽসমুন্নদ্ধঃ স গচ্ছেৎ পুরুষং শুভম্ ॥"[৭]

'তাঁহাকে অচিন্ত্য জানিয়া যে চতুষ্টয় ভাবসূক্ষ্মে বিচরণ করে,[৮] সেই অত্যন্ত শান্ত ব্যক্তি শুভ পুরুষে গমন করে।' পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে 'পুরুষে গমন করে' অর্থ 'পুরুষভাব প্রাপ্ত হয়' বা 'পুরুষ হয়'। পরন্তু পরপুরুষের উক্ত চতুর্ধা বিভাগ,—সূক্ষ্ম ভাবচতুষ্টয় কি? টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন,

"ভাবস্য সত্তামাত্রস্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মরূপভূতং চতুষ্টয়মনিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণবাসুদেবাপরপর্যায়মধিদৈবং বিরাট্সূত্রাত্মান্তর্যামিশুদ্ধব্রহ্মরূপমধ্যাত্মং। বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতুরীয়মবস্থাচতুষ্টয়ং"

অন্যত্র তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন,—

---

[১] "প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধং ত্বং যং বিদুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।"—(মহাভা, ৬।৬৫।৭১·১)

[২] পূর্বে দেখ।

[৩] যথা দেখ—

> "তপো যজ্ঞশ্চ যষ্টা চ পুরাণঃ পুরুষো বিরাট্ ॥
> অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তো লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।"—(মহাভা, ১২।৩৪১।১৫·২—১৬·১)

[৪] বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং নারদকে বলেন যে তিনি অনিরুদ্ধ—"প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং" (মহাভা, ১২।৩৩৯।৭৬·২)

[৫] মহাভা, ১২।৩৫১।২৩ [৬] মহাভা, ১২।৩৫১।২২ [৭] মহাভা, ১২।৩৫১।১২

[৮] "বিচরেৎ……সঞ্চরেৎ; স্থূলসূক্ষ্মপ্রবিলাপনক্রমেণ যো নিত্যং সমাধিমনুতিষ্ঠেদিত্যর্থঃ।" (নীলকণ্ঠ)

"অকারার্থে বিরাজি অনিরুদ্ধাখ্যেঽহঙ্কারে······উকারার্থ সূত্রাত্মনি প্রদ্যুম্নাখ্যে মনসি······ মকারার্থে অন্তর্যামিসঙ্কর্ষণাখ্যে জীবে শুদ্ধত্বম্পদার্থে···অর্দ্ধমাত্রার্থে শুদ্ধে ব্রহ্মণি বাসুদেবাখ্যে···"[১]

কোষ্ঠক মধ্যে সাজাইলে সমীকরণ এইরূপে দাঁড়ায়,—

প্রণবমাত্রা	অবস্থা	অধ্যাত্ম	অধিদৈব	
অ ×	বিশ্ব ×	বিরাট্	অনিরুদ্ধ	অহঙ্কার
উ ×	তৈজস ×	সূত্রাত্মা	প্রদ্যুম্ন	মন
ম ×	প্রাজ্ঞ	অন্তর্যামী	সঙ্কর্ষণ	(অব্যক্ত) = পুরুষ = জীব
অর্ধমাত্র	তুরীয়	শুদ্ধব্রহ্ম	বাসুদেব	(নির্গুণ)

নারায়ণীয়াখ্যানে এই সকল সমীকরণ সম্পূর্ণতঃ বিবৃত না হইলেও উহাদের কোন কোন অংশ পরিষ্কার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উহারা তখন সমগ্রতঃ জানা ছিল এবং পূর্বোক্ত বচনে উহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে,—নীলকণ্ঠের এই অনুমান সমীচীনই হইয়াছে মনে হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও অল্পাধিক পরিষ্কাররূপে তাহার উল্লেখ আছে,[২]—"হে ব্রহ্মন্, (পরম) পুরুষ স্বয়ং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই (চারি) মূর্তিব্যূহ(রূপে) অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই ভগবানই অর্থ (=বাহ্য বিষয়), ইন্দ্রিয় (বা মন), আশয় (অর্থাৎ বিষয় ও মনের সংস্কারযুক্ত অজ্ঞান) এবং জ্ঞান (বা ঐ তিনের সাক্ষী)—এই (চারিটির অবগাহী) বৃত্তিসমূহ দ্বারা (যথাক্রমে) বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়রূপে পরিভাবিত হইয়া থাকেন।[৩] এই প্রকারে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ, আভূষণযুক্ত ভগবান্ ঈশ্বর হরি (বাসুদেবাদি) চতুর্মূর্তি হইয়া (তুরীয়াদি) রূপচতুষ্টয় ধারণ করেন।"[৪] 'গোপালোত্তরতাপিনী-উপনিষদ্' নামে এক অর্বাচীন উপনিষদে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের সমীকরণ আছে। তন্মতে, "ব্রহ্ম প্রথমে এক ও অদ্বিতীয়ই ছিল। তাহা হইতে অব্যক্ত একাক্ষর (উৎপন্ন হইল)। সেই অক্ষর হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রসমূহ। উহাদের হইতে ভূতসমূহ। উহাদের দ্বারা অক্ষর আবৃত।" অক্ষর ওঙ্কার, অজর, অমর, অভয় ও অমৃত ব্রহ্ম। সত্তামাত্র চিৎস্বরূপ, প্রকাশ, তথা ব্যাপক। ব্রহ্ম (স্বরূপতঃ) এক ও অদ্বয়ই; এবং মায়া দ্বারা চতুষ্টয়। রোহিণীতনয় (সঙ্কর্ষণ) বিশ্ব অকারাক্ষরসম্ভব। তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষর-সম্ভব। প্রজ্ঞাত্মক অনিরুদ্ধ মকারাক্ষর-সম্ভব। যাহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত (সেই অক্ষর বা তুরীয়) কৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক

---

[১] মহাভা, ১২।৩৪৫।১-১৯ (নীলকণ্ঠের টীকা)

[২] (বিষ্ণু)ভাগ, ১২।১১।২১-৩

[৩] প্রকৃত বলিলে, তুরীয়কে বৃত্ত্যবগামী বলা যায় না। তুরীয়ে বৃত্তি থাকিতে পারে না। তবে সাধারণতঃ ব্রহ্মাকারা বৃত্তির কথা বলা হইয়া থাকে।

[৪] জাগতিক বস্তুসমূহকেই ভগবানের অঙ্গোপাঙ্গাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।১১।৫—দেখ; পূর্বে দেখ।

কৃষ্ণাত্মিকা রুক্মিণী জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি।”[১] ‘বিশ্বক্‌সেনসংহিতা’য় বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়কে যথাক্রমে তুরীয়সুষুপ্ত্যাদি সংজ্ঞক বলা হইয়াছে; “স্বপ্নাদ্যবস্থাজীবানামধিষ্ঠাতার এব তে”।[২]

বেঙ্কটনাথ ‘হৈরণ্যগর্ভাদিসিদ্ধান্ত’ হইতে একটা বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[৩] প্রণবের অর্থ প্রপঞ্চিত করার পর উহাদিগেতে উক্ত হইয়াছে যে “ত্রিরাত্মা, ত্রিস্বভাব এবং ত্রিব্যূহই। পঞ্চরাত্রে উহা ঐ প্রকারে ভগবানের বাচক বলিয়া স্মৃত। বল, বীর্য এবং তেজ ত্রিরাত্মা বলিয়া সংজ্ঞিত। জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও শক্তি ত্রিস্বভাব বলিয়া স্মৃত। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ ত্রিব্যূহ বলিয়া নির্দিষ্ট। এইরূপে ওঙ্কার অব্যয় বিষ্ণু। উহা ভগবানের বাচক, তথা প্রকৃতির বাচক বলিয়া প্রোক্ত হয়। ব্যক্তাব্যক্ত বাসুদেব প্রভব এবং প্রলয়।”

এইখানে প্রসঙ্গবশতঃ একটা কথা বলা যাইতে পারে। অক্ষর ব্রহ্ম এবং অন্তর্যাম্যাদির সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ নানা প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মনে করিতেন যে অন্তর্যামী অক্ষর ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষ। অপরে মনে করিতেন যে শক্তি। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন যে অবয়ব বা বিকার। আচার্য শঙ্কর উক্ত মতচতুষ্টয়ের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অন্তর্যামী এবং অক্ষরের ভেদ ঔপাধিক;—নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধিবিশিষ্ট পরমাত্মা ‘অন্তর্যামী’ ঈশ্বর; তিনিই (“স এব”) নিরুপাধিক কেবল শুদ্ধ স্বভাব ‘অক্ষর’ বা ‘পর’ বলিয়া কথিত হন।[৪] ভগবান্ নারায়ণও ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের ভেদ ঔপাধিক মাত্র,—বস্তুতঃ যিনি বাসুদেব, তিনিই সঙ্কর্ষণ। এইমাত্র পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বাসুদেব = অক্ষর ব্রহ্ম এবং সঙ্কর্ষণ = অন্তর্যামী। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে অক্ষর ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামীর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে আচার্য শঙ্করের মতই নারায়ণীয়াখ্যানের বা ভগবান্ নারায়ণের সম্মত।

চতুর্ব্যূহবাদের উৎপত্তি অন্য প্রকারে হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। বৈদিক ঋষিগণ মনে করিতেন যে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সম্যক্ সামঞ্জস্য আছে।[৫] পিণ্ডের অন্তঃকরণ ক্রিয়াভেদে চতুর্বিধ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে; যথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃকরণও ঐ প্রকার চতুর্বিধ বলিয়া মনে করিতে হইবে। চিত্ত = বাসুদেব, অহঙ্কার = সঙ্কর্ষণ, বুদ্ধি = প্রদ্যুম্ন এবং মন = অনিরুদ্ধ। ‘(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে’ স্পষ্টতঃই তাহা উক্ত হইয়াছে।[৬] সাংখ্যের অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্বের জন্য যথাক্রমে অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং মন সংজ্ঞা গীতায়ও প্রযুক্ত হইয়াছে।[৭] হয়ত তথায়ও পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডে-সামঞ্জস্যের কথাই ভগবান্ কৃষ্ণের মনে

---

[১] ‘গোপালোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ’, ৯-১২

“গোপালোঽহমজো নিত্যঃ প্রদ্যুম্নোঽহং সনাতনঃ ॥
রামোঽহমনিরুদ্ধোঽহমাত্মানং চার্চয়েদ্ বুধঃ।” (ঐ, ৫·২—৬·১)

[২] তত্ত্বত্রয়, ১১১ পৃষ্ঠা

[৩] গীতা, ৮।১২-৩ বেঙ্কটনাথের ‘তাৎপর্যচন্দ্রিকা’ দেখ।

[৪] বৃহউ, ৩।৮।১২ (শঙ্কর-ভাষ্য)

[৫] ‘প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী’, ১ম ভাগ, দেখ।

[৬] পূর্বে দেখ।

[৭] পূর্বে দেখ।

ছিল। ব্রহ্মের অক্ষরাদি এবং তুরীয়াদি চারি রূপের পরিকল্পনার মূলেও পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-সামঞ্জস্যবাদ নিহিত আছে।

পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র ভাষ্যকার ব্যাস চিকিৎসাশাস্ত্রের এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও "চতুর্ব্যূহে"র উল্লেখ করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য (বা রোগ-নাশ) এবং ভৈষজ্য (বা রোগ-নাশোপায়)। অধ্যাত্মশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ—সংসার, সংসার-হেতু, মোক্ষ (বা সংসার-নাশ) এবং মোক্ষোপায়।[1] অধ্যাত্মশাস্ত্রের দৃষ্টিতে সংসারই জীবের মহারোগ। যাহাকে সাধারণতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্র বা 'আয়ুর্বেদ' বলা হয় তাহা শারীরিক রোগের চিকিৎসাশাস্ত্র, আর অধ্যাত্মশাস্ত্র আধ্যাত্মিক মহারোগের চিকিৎসাশাস্ত্র। সুতরাং উভয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে ঐ সামঞ্জস্য থাকা ঠিকই হইয়াছে। বৌদ্ধ অধ্যাত্মশাস্ত্রে উহাদিগকে "চতুঃ-আর্য-সত্য" বলা হইয়াছে—দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখনির্বাণ ও নির্বাণোপায়।

পুরাণে চতুর্ব্যূহের আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা, 'বায়ুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে,[2] পরমাত্মার দুই রূপ,—এক স্বরূপ, অপর স্বয়ম্ভূ বা প্রজাপতি রূপ। স্বয়ম্ভূ বা প্রজাপতি রূপে তাঁহার তিন অবস্থা বা রূপ। তিনি ব্রহ্মা-রূপে জগতের সৃষ্টি করেন, কাল বা অগ্নি (বা রুদ্র) রূপে সংহার করেন, এবং সহস্রশীর্ষ পুরুষ বা বিষ্ণু রূপে উদাসীন থাকেন। তাঁহার গুণবৃত্তি ত্রিবিধ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্ববৃত্তিতে তিনি বিষ্ণু, রজোবৃত্তিতে ব্রহ্মা এবং তমোবৃত্তিতে কাল হন। কেননা, "ব্রহ্মা রজঃপ্রকাশক ও স্রষ্টৃত্বে ব্যবস্থিত, অগ্নি তমঃপ্রকাশক ও কালত্বে ব্যবস্থিত, এবং বিষ্ণু সত্ত্বপ্রকাশক ও ঔদাসীন্যে ব্যবস্থিত।"[3] "যেহেতু তিনি লোকে ত্রিধা বর্তমান আছেন, সেইহেতু 'ত্রিগুণ' বলিয়া কথিত হন। যেহেতু তিনি চতুর্ধা প্রবিভক্ত, সেইহেতু 'চতুর্ব্যূহ' বলিয়া প্রকীর্তিত হন।"[4] সুতরাং তন্মতে, নির্গুণ স্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কাল বা রুদ্র—এই চারিটিই পরমাত্মার 'চতুর্ব্যূহ'। 'কূর্মপুরাণে'ও প্রায় সেই প্রকার উক্তি আছে। "নির্গুণ ও সগুণ ব্যাপী (বিষ্ণু) চতুর্ধা সংস্থিত। ভগবানের এক মূর্তি জ্ঞানরূপ, শিব, অমল, গুণাতীত এবং সুনিষ্কল। উহা 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হয়। অপর দ্বিতীয় মূর্তি তামসী। উহা 'কাল' ও 'শিব' নামে উক্ত হয়। বিষ্ণুর সেই পরম-তনু কল্পান্তে সকলেরই নিহন্ত্রী। তৃতীয় মূর্তি সত্ত্বোদ্রিক্তা এবং 'প্রদ্যুম্ন' বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। বিষ্ণুর সেই ধ্রুবা প্রকৃতি বিশ্বজগৎকে সংস্থাপন করেন। বাসুদেবের চতুর্থ মূর্তি 'ব্রহ্মা' বলিয়া কথিত হয়। উহা রাজসী এবং অনিরুদ্ধের পুরুষসৃষ্টিকারিতা। যে প্রভু অখিল প্রপঞ্চকে বিলয় করত প্রদ্যুম্ন সহ নিদ্রিত হন, তিনি নারায়ণাখ্য ব্রহ্মা,—তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন। যে শুভ নারায়ণ-তনু 'প্রদ্যুম্ন' নামে স্মৃত হন, তিনি দেবতা, অসুর এবং মানুষসহ বিশ্বকে সম্মোহিত করেন। সেইহেতু তিনি জগন্মূর্তি 'প্রকৃতি' বলিয়া পরিকীর্তিত। বাসুদেব বা হরি অনন্তাত্মা, কেবল এবং নির্গুণ।

---

১) "যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্—রোগো রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি। এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্। তদ্যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি।"—('যোগসূত্র', ২।১৫, ব্যাসভাষ্য)

২) বায়ুপু, ১।৫।১৩—৩০ ; আরও দেখ—শিবপু, বায়ুসংহিতা, ১।৮।২৬—৯

৩) বায়ুপু, ১।৫।১৪—৫ ; আরও দেখ—২।৫।৮৫—

৪) বায়ুপু, ১।৫।৩১ ; আরও দেখ—শিবপু, বায়ুসংহিতা, ১।৮।২৯

প্রধান, পুরুষ এবং কাল—এই অনুত্তম সত্ত্বত্রয় নিত্য বাসুদেবাত্মক। ইহা জানিলে মুক্তি হয়। অচ্যুত এক হইলেও এই প্রকারে চতুর্ধা চতুষ্পাদ।"[১] 'অগ্নিপুরাণে'র মতে, যিনি জ্ঞানস্বরূপ,—যাঁহাতে অব্যাকৃত বিলীন হয়, তিনি 'বাসুদেব' বলিয়া কথিত হন। তিনি পরমতত্ত্ব। "সিসৃক্ষা বশতঃ তিনি অব্যাকৃতকে বা মায়াকে অবষ্টম্ভন করত (শব্দাত্মা বাসুদেব হন)। সেই শব্দাত্মা প্রভু স্পর্শাখ্য সঙ্কর্ষণকে সৃজন করেন ('অসৃজৎ')। তিনি মায়াকে (অথবা মায়াত্মক শব্দাত্মাকে) ক্ষুভিত করত তেজোরূপ প্রদ্যুম্নকে, (এবং ক্রমে) রসমাত্র অনিরুদ্ধকে ও গন্ধরূপ ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। সেই ব্রহ্মা অনিরুদ্ধই (অর্থাৎ অনিরুদ্ধাত্মক) এবং তিনি প্রথমে অপ্‌কে সৃষ্টি করেন।"[২] 'মৎস্যপুরাণে'র মতে, বাসুদেবাদি বিষ্ণু বা নারায়ণেরই কর্মনামসমূহ মাত্র। যেহেতু কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মাদি সর্বভূত তাঁহাতে বাস করে, অথবা (সৃষ্টিকালে) তিনি সর্বভূতে বাস করেন, সেইহেতু তিনি 'বাসুদেব' বলিয়া কথিত হন। যেহেতু তিনি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ ভূতসমূহকে সঙ্কর্ষণ করেন, সেইহেতু তিনি 'সঙ্কর্ষণ' নামে প্রোক্ত হন। তিনি দেবতা, অসুর এবং রাক্ষসসহ প্রতিব্যূহ দ্বারা ("প্রতিব্যূহেন") অবস্থান করেন এবং সর্বধর্মের প্রবিত্থ্য। সেইহেতু তিনি 'প্রদ্যুম্ন' বলিয়া অভিহিত হন। যেহেতু ভূতবর্গের মধ্যে তাঁহার নিরোদ্ধা কেহই নাই, সেইহেতু মহর্ষিগণ তাঁহাকে 'অনিরুদ্ধ' বলেন।[৩] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র এক স্থলেও সেই প্রকার উক্তি আছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে পরমাত্মা শান্ত, কূটস্থ এবং স্বয়ংপ্রকাশ রূপে 'বাসুদেব', সূক্ষ্ম এবং দুরন্ত জগৎ-সংহারক রূপে 'সঙ্কর্ষণ', বিশ্বপ্রবোধক অন্তরাত্মা রূপে 'প্রদ্যুম্ন' এবং হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মারূপে 'অনিরুদ্ধ'।[৪] বোধ হয় বিশ্বসংহারক বলিয়াই উহাতে সঙ্কর্ষণকে "চতুর্মূর্তি ভগবান্ মহাপুরুষের তুরীয় তামসী মূর্তি" বলা হইয়াছে।[৫] যাহা হউক, পরমপুরুষ স্বয়ংই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। সেইহেতু উহাদিগকে তাঁহার মূর্তি বা ব্যূহ বলা হয়।[৬] 'স্কন্দপুরাণে' চতুর্ব্যূহের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে কল্পসৃষ্টির অন্তে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ প্রাণী পর্যন্ত—এমন কি পূর্বকল্পের বিমুক্ত, জীবন্মুক্ত প্রভৃতিগণও—সমস্ত জীবসংঘ বিষ্ণুর কুক্ষিতে সুপ্ত বা ধ্যানস্থ ভাবে থাকে। পরকল্পের সৃষ্টির আদিতে বিষ্ণু পূর্বসদ্‌গুণসমূহবশতঃ বাসুদেব ব্যূহগ হইয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করেন। তদনন্তর মহাত্মাগণকে সাযুজ্যতত্ত্বজ্ঞান দেন। কাহাকে কাহাকে সারূপ্য, কাহাকে কাহাকে সামীপ্য এবং কাহাকে কাহাকেও সালোক্য মুক্তি প্রদান করেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ (ব্যূহ) বশে অবশিষ্ট সমস্ত লোকসমূহকে অবলোকন করেন। প্রদ্যুম্নের বশে গিয়া তিনি সৃষ্টি করিতে মন দেন। তখন হরি স্বয়ং মায়া, জয়া, কৃতি ও শান্তিকে গ্রহণ করেন। সৃষ্টির অন্তে পুনঃ যোগমায়ায় সমাশ্রিত বিষ্ণু সঙ্কর্ষণ ব্যূহগত হইয়া

---

[১] কূর্মপু, ১।৫১।৩৯—৪৭

[২] অগ্নিপু, ৫৯।৬—৮ উহার অন্যত্র সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব "আদিমূর্তি। তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয় ('অভবৎ')।" (৪৮।১৩) 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের বাসুদেব নামক রূপ শব্দবিগ্রহ ("বাসুদেবাভিধানেন মদ্রূপঃ শব্দবিগ্রহঃ") ৮।৩৫·১

[৩] মৎস্যপু, ২৪৮।৪৫·২—৪৯·১   [৪] '(বিষ্ণু)ভাগপু,

[৫] ঐ, ৫।১৭।১৬   [৬] ঐ, ১২।১১।২১

চরাচরকে হরণ করেন।[১] অবশ্য ইহাতেও বাসুদেবাদি চারি ব্যূহ বিষ্ণুর চারি অবস্থাগত কর্মনাম।

'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' চতুর্ব্যূহের একাধিক প্রকার ব্যাখ্যা ও সমীকরণ পাওয়া যায়। উহার প্রারম্ভে এক স্থলে আছে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চারিটি "প্রভাব" বলিয়া কথিত হয়—"চারি বাসুদেব বলিয়া প্রকীর্তিত হয় ("চত্বার এতে……বাসুদেবা প্রকীর্তিতাঃ")। অব্যক্ত সঙ্কর্ষণ, আত্মা প্রদ্যুম্ন, সর্বগততত্ত্ব অনিরুদ্ধ, এবং সত্য, অচ্যুত ও অব্যয় পরপুরুষ বাসুদেব বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই চারি বাসুদেব "ভগবচ্ছব্দবাচ্য এবং সর্বভূতভবোদ্ভব"। অনিরুদ্ধ সর্বলোকের নাথ এবং সৃষ্টিসংহারকারক।[২] পরে কথিত হইয়াছে যে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেব চতুরাত্মা। অনিরুদ্ধ বায়ুমূর্তি। তিনি "সর্বত্র অরুদ্ধমার্গ এবং সর্বশ অপরাজিত।" (বোধ হয়, সেইহেতুতেই তিনি 'অনিরুদ্ধ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন)। প্রদ্যুম্ন হুতাশন-মূর্তি। তিনি তেজস্বী এবং লোকসমূহ প্রদ্যোতিত করেন ("লোকান্ প্রদ্যোতয়তি")। (সেই কারণেই, তিনি 'প্রদ্যুম্ন' নামে কথিত হইয়া থাকেন, বোধ হয়) তিনি কামদেব ও জগদ্‌যোনি। সঙ্কর্ষণ রুদ্রমূর্তি। জগতের কর্ষণ হেতু তাঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলা হয়। তিনি কাপাল, অরিদমন, সর্বভূতের শঙ্কর এবং বিশ্বযোনি। বাসুদেব সর্বাবাস, সর্বগ, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, পুরুষ, পরমেশ্বর ইত্যাদি।[৩] পরে আছে

> "মনো জগত্তথা কামং কর্ম চৈতে ক্রমাৎ স্মৃতাঃ।
> বাসুদেবোঽচ্যুতশ্চৈব প্রদ্যুম্নশ্চ মহাভুজঃ।
> তথা চৈবানিরুদ্ধশ্চ ক্রমেণৈতে প্রকীর্তিতাঃ॥"[৪]

এই মতে বাসুদেব = মন, অচ্যুত বা সঙ্কর্ষণ = জগৎ, প্রদ্যুম্ন = কাম এবং অনিরুদ্ধ = কর্ম। অন্যত্র আছে, "সঙ্কর্ষণাত্মা ভগবান্ অজ্ঞানের বিনাশন। সঙ্কর্ষণদেব জগতের বাক্, মন ও কায়-সম্ভূত, এই ত্রিবিধ মল সদা উৎপাটন করেন। হরি সঙ্কর্ষণাংশে নরসিংহবপুধর। হরি জগতের ত্রিবিধ তমের নাশন।"[৫] অনিরুদ্ধ ঐশ্বর্য এবং ভগবান্ বরাহ। ঐশ্বর্যশক্তি দ্বারা তিনি দ্রংষ্ট্রাগ্র দ্বারা বসুন্ধরাকে সমুদ্ধৃত করেন।[৬] কথিত হইয়াছে যে ধর্মকাম মনুষ্য অনিরুদ্ধের, অর্থকাম সঙ্কর্ষণের, কামকাম প্রদ্যুম্নের এবং মোক্ষকাম ব্যক্তি বাসুদেবের পূজা করিবেক।[৭]

'পদ্মপুরাণে' দুই প্রকার চতুর্ব্যূহবাদ পাওয়া যায়। এক বাদ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,— "সেই পরমাত্মাই অব্যক্তরূপ হইয়া ব্যবস্থিত। স্বয়ং ব্রহ্মাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ে প্রবৃত্ত হন। ঐ সনাতন বাসুদেব ষাড়্‌গুণ্যপরিপূর্ণ। ত্রৈগুণ্যহেতু তিনি নিজের রূপ চতুর্ধা করেন এবং জগৎ (সৃষ্ট্যাদি) করেন। সর্বৈশ্বর্যসমন্বিত প্রদ্যুম্নমূর্তি ভগবান্ ব্রহ্মার, প্রজাপতিগণের, কালের এবং জনের অন্তর্যামিত্ব আপন্ন হইয়া সম্যক্ সৃষ্টি করেন। অনন্তর (তিনি)

---

[১] স্কন্দপু, ২।৭।২০।৪০—৫১

[২] বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ১।৬৩।৩৪—

[৩] ঐ, ২।১০৮।১৫—২২ ; আরও দেখ—"ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ" (১।৫২।২৩'১) ;
"যমং সঙ্কর্ষণং বিদ্ধি তামসীং তনুমাশ্রিতম্॥" (৩।৫১।৭'২

[৪] ঐ, ৩।৫৪।৮

[৫] ঐ, ৩।৭৮।৫'২—৭ ; আরও দেখ ৩।১১৬।১৫ নৃসিংহ জ্ঞান (৩।৭৮।১), আর হিরণ্যকশিপু অজ্ঞান। (৩।৭৮।৫'১

[৬] ঐ, ৩।৭৯।১

[৭] ঐ, ৩।১১৮।২—৪'১

সেই মহাত্মাকে (ব্রহ্মাকে) ইতিহাসসহ বেদসমূহ প্রদান করেন। লোকপিতামহ ঐ ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নের অংশভাগ। পদ্মসম্ভব সমস্ত জগৎসর্গস্থিতি করেন। ভগবান্ অনিরুদ্ধ শক্তি-তেজ-সমন্বিত। ঐ ভগবান্ মনুদিগের, পার্থিবদিগের, কালের এবং জনের অন্তর্যামিত্বে আস্থিত হইয়া (সৃষ্ট জগতের) স্থিতি করেন। মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণ বিদ্যা-বল-সমন্বিত। ঐ প্রভু রুদ্রের যমের, কালের এবং সর্বভূতের অন্তর্যামিত্বে আস্থিত হইয়া জগৎ সংহার করেন। এই প্রকারে অন্তর্যামী-অবস্থায় আত্মার অন্তর্যামিত্ব।"[১] ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে রুদ্র সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণের অংশে সংহারার্থে উৎপন্ন।[২] এই চতুর্ব্যূহবাদ পাঞ্চরাত্রমত-প্রভাবিত,—হয়ত পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্র হইতে পরিগৃহীত। কিঞ্চিৎ পরে তাহা সম্যক্ বুঝা যাইবে। দ্বিতীয় প্রকারের চতুর্ব্যূহবাদ এই[৩]—বৈকুণ্ঠলোক, বিষ্ণুলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং ক্ষীরসাগর—এই চারি স্থানে বাসুদেবের চার রূপই চার ব্যূহ। "এবং চতুর্ধা ব্যূহস্তু সম্যগুক্তো মহর্ষিভিঃ" ('পরন্তু ব্যূহ এই প্রকারে চতুর্ধা বলিয়া মহর্ষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে')। বাসুদেবের পরাবস্থা ষাড়্গুণ্য এবং ব্যূহসমূহ তাঁহা হইতে "দীপাদুৎপন্নদীপবৎ" ('দীপ হইতে উৎপন্ন দীপবৎ) বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।[৪] তাৎপর্য এই যে ব্যূহের উৎপত্তি হেতু বাসুদেবের পরাবস্থার কোন হানি হয় না। যাহা হউক, 'পদ্মপুরাণে' অনন্তর ঐ চারি ব্যূহের অতি বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[৫] কথিত হইয়াছে যে "বৈকুণ্ঠলোকের পূর্বে বাসুদেবের মন্দির, অগ্নিকোণে লক্ষ্মীর লোক, দক্ষিণে সঙ্কর্ষণালয়, নৈঋতকোণে সরস্বতীলোক, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন-লোক, বায়ুকোণে রতি-লোক, উত্তরে অনিরুদ্ধলোক এবং ঈশানকোণে শান্তিলোক।"[৬] শান্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও রতি যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের শক্তি।[৭] ব্যূহের সংখ্যা কখন কখন চার অপেক্ষাও অধিক বলিয়া 'পদ্মপুরাণে' উক্ত হইয়াছে। যথা, এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব "পঞ্চাবস্থস্বরূপী" ও "পঞ্চ-নব-ব্যূহভেদরূপ"।[৮]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র প্রারম্ভে আছে দেবর্ষি নারদ পরমর্ষি ব্যাসকে বলেন, "ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, আমি তোমাকে ধ্যান করিতেছি। তথা সঙ্কর্ষণকে, প্রদ্যুম্নকে ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার; (আমি তোমাকে ধ্যান করিতেছি)।'—যে পুরুষ এই প্রকারে মূর্তিনাম দ্বারা মন্ত্রমূর্তি,—(প্রকৃত পক্ষে) মূর্তিরহিত ('মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্')—যজ্ঞপুরুষকে যজন করে, সে সম্যগ্‌দর্শী।"[৯] ইহা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে পরমপুরুষের বাসুদেবাদি ধ্যেয়মূর্তি কল্পিত মাত্র। তিনি

---

১) পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৫৭।৩২—৪০·১; আরও দেখ—তত্ত্বত্রয়, ৯৫—৬ পৃষ্ঠা।

২) ঐ. ২৫৭।২৪ ৩) ঐ, ২৫৭।৪৩—৪ ৪) ঐ, ২৫৭।৪২

আরও দেখ—

"দীপাদুৎপান্ততে দীপো যথা তদ্বত্তবিস্থতি।
পরাবস্থাঃ পরেশস্ত ব্যূহাশ্চ বিভবাদয়ঃ॥" (২৫৮।৪)

এই দৃষ্টান্ত পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। যথা দেখ—'পাদ্মতন্ত্র', ১।২।২১ 'বিষ্বক্সেনসংহিতা' (তত্ত্বত্রয়, ১১২ পৃষ্ঠা)

৫) ঐ, ২৫৭।৪৫—১৭৯ ৬) ঐ, ২৫৬।৫৬—৫৮·১

৭) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p.36

৮) পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৫৬।৮৫—৬ ৯) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৫।৩৭—৮

স্বয়ং "অমূর্তিক" বা মূর্তিশূন্য। অতএব চতুর্ব্যূহবাদ কল্পিত মাত্র। উপাসনার সৌকর্যার্থই ভগবানের ঐ সকল মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল।

'বামনপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণু এক, তথা অব্যক্ত এবং সর্বগ, হইলেও চতুর্মূর্তি। আদি মূর্তি বাসুদেব অপ্রতর্ক্য, অনির্দেশ্য, শুক্ল ও শান্ত পরম পদ। উহা অব্যক্ত।[১] অপর তিন মূর্তি ব্যক্ত। উহারা অব্যক্ত হইতে সম্ভূত হয়। দ্বিতীয় মূর্তি সাত্ত্বিক, চতুর্বর্ণ, চতুর্মুখ, চতুর্বাহু এবং শ্রীবৎসধর। তৃতীয় মূর্তি তামস। উহা শেষমূর্তি, সহস্রধা, সহস্রবদন, শ্রীমান্ এবং প্রজাপ্রলয়কারক। চতুর্থ মূর্তি রাজস। উহা রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজ, মালাধর, সৃষ্টিকৃৎ এবং আদিপুরুষ।[২]

আচার্য মধ্ব 'কপিলউপপুরাণ' হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "প্রকৃতির ক্ষোভক দৈব রূপ নারায়ণাভিধ। প্রকৃতি হইতে মহতের স্রষ্টা পরমপুরুষ বলিয়া মত যে উনিই মহাতত্ত্বের নিয়ামক দৃষ্টিতে বাসুদেব। সঙ্কর্ষণাখ্য হরি সূক্ষ্ম-অহঙ্কারের নিয়ামক, আর প্রদ্যুম্ন নামক বিষ্ণু স্থূল-অহঙ্কারের নিয়ামক। অনিরুদ্ধ (নামে) ভগবান্ হরি মনস্তত্ত্বের নিয়ন্তা।"[৩] মধ্বের নিজের মতে, একই ভগবান্ জীবের মুক্তিপ্রদাতারূপে বাসুদেব এবং চরাচর-জগৎপ্রপঞ্চের সংহারকরূপে সঙ্কর্ষণ, স্রষ্টারূপে প্রদ্যুম্ন এবং স্থিতিকারকরূপে অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত হন। ভগবানের শক্তি তখন যথাক্রমে মায়া, জয়া, কৃতি ও শান্তি নামে অভিহিত হন।[৪]

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে চতুর্ব্যূহের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে অল্পাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। উহাদের রত্নত্রয়ের অন্যতম বলিয়া খ্যাত 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব "ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ" বা "ষাড়্গুণদেহ"।[৫] তিনি বিভু, অব্যয়, অচ্যুত এবং সর্বেশ্বর। শব্দ তাঁহার অপৃথক্ লক্ষণ অর্থাৎ তিনি "শব্দবিগ্রহ" বা "শব্দমূর্তি"।[৬] তিনি স্বেচ্ছায় আপনাকে জ্ঞানাত্মসংজ্ঞকরূপে উপনীত করেন। তিনি স্ববশ এবং আপ্তকাম। সুতরাং তিনি যে অপরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, কিংবা স্বীয় বাসনারবশে বা প্রয়োজনের তাড়নায় ঐ প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তাহা নহে। উহা তাঁহার স্বভাব। ঐ স্বভাববশতঃই তিনি স্বয়ং আপনাতে জ্ঞানাংশে অভিমানাত্মক শক্তিময় মহদ্গুণ পরিগ্রহণ করেন। শব্দমূর্তি সেই ভগবান্ স্বয়ং স্বেচ্ছায় জ্ঞানমূর্তিতে আসিয়া বিশ্রান্ত হন। তখন তিনি সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হন। জ্ঞানমূর্তি সঙ্কর্ষণ অনন্তবীর্য আপনার মধ্যে মূর্চ্ছিত বা অব্যক্ত রাখেন। ঐ শক্তিময় বীর্যগুণ যখন সঞ্জীবিত বা ব্যক্ত হয়,—তিনি তদভিমানী হন, তখন তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন হয়। বিদ্যুৎপ্রভোজ্জ্বল শাস্ত্র দ্বারা নিঃশ্বসিত হয়,

---

১) বামনপু, ৬০।৬৩—৪ ২) ঐ, ৬১।৬৮—৭১'১

৩) 'ভাগবততাৎপর্যতত্ত্বনির্ণয়' মধ্বাচার্য প্রণীত, ৩।২৭।২২ ও ২৭ (গ্রন্থাবলী, ৮৩৮'১ পৃষ্ঠা)

৪) 'মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়', মধ্বাচার্য প্রণীত, ১।৬—৮ (গ্রন্থাবলী, ৯২৮ পৃষ্ঠা)।

৫) পৌষ্করসং, ৯।১২৬'২—("ষাড়্গুণ্যবিগ্রহেণ"); ৩৬।২৬৯'১ ("ষাড়্গুণদেহসংজ্ঞেন"); ৩৩।২৪'২ ("ষাড়্গুণ্যমূর্তিনা") আরও দেখ—৩৩।৭৪

৬) "বাসুদেবাভিধানেন মন্ত্ররূপঃ শব্দবিগ্রহঃ" (ঐ, ৮।৩৫'১

এবং বীর্যমূর্তি প্রদ্যুম্ন স্বয়ং উহাদিগেতে প্রবিষ্ট হন। অনন্তর ঐ বীর্যাত্মা মহান্ তেজের প্রসার উৎপন্ন করেন এবং অনিরুদ্ধ নাম ধারণ করেন। প্রদ্যুম্ন শাস্ত্রকে উদ্‌গারবৎ ত্যাগ করেন এবং অনিরুদ্ধ তাহা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন। অনিরুদ্ধ গুণব্যক্তিময় বাগীশদেবকে সৃষ্টি করেন ("অসৃজৎ")।[১] এইরূপে দেখা যায়, 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে, শব্দাত্মা বাসুদেবই পর পর ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা শক্তি অভিমানী হইয়া সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ হন। বাসুদেব "শব্দমূর্তি", সঙ্কর্ষণ "জ্ঞানমূর্তি", প্রদ্যুম্ন "বীর্যমূর্তি" এবং অনিরুদ্ধ "তেজোমূর্তি"। যে যে মূর্তিতে সাধককে ইঁহাদের ধ্যান করিতে হইবে সে সকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সকলেরই ধ্যাতব্য মূর্তি চতুর্ভুজ। সকলেরই এক হাতে—ডাহিনের উপরের হাতে, অভয় বা বর, বামদিগের উপরের হাতে শঙ্খ। পরন্তু অপর দুই হাতের আয়ুধ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন,—যথাক্রমে বামে ও দক্ষিণে বাসুদেবের কালচক্র ও গদা, সঙ্কর্ষণের লাঙ্গল ও মুসল, প্রদ্যুম্নের ধনু ও শর এবং অনিরুদ্ধের খেটক ও নন্দক।[২] বাসুদেবের ধ্বজার লাঞ্ছন গরুড়, সঙ্কর্ষণের তালবৃক্ষ, প্রদ্যুম্নের মকর এবং অনিরুদ্ধের কুরঙ্গ।[৩]

রত্নত্রয়ের অন্যতম,—হয়ত প্রাচীনতম, 'জয়াখ্যসংহিতা'র সত্য, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পঞ্চদেবতাকে 'সত্যাদিপঞ্চক' বলা হইয়াছে। উহাদের পাঁচ মন্ত্র আছে। সেই গুলিও 'সত্যাদিপঞ্চক' নামে উক্ত হইয়াছে।[৪] এবং উহারা 'উপাঙ্গ' নামেও কথিত হয়।[৫] উহাঁদের ধ্যান হইতে জানা যায় যে—সত্য শতচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল সিতবর্ণ ("সিতমিন্দুশতাকৃতিম্"); বাসুদেব "প্রশান্তহুতভুগ্‌রূপ" (বা অরুণবর্ণ); সঙ্কর্ষণ সিতও নহে, অতি অরুণও নহে" (অর্থাৎ উভয়মিশ্রিত বর্ণ); প্রদ্যুম্ন "পীতচম্পকবর্ণাভ" এবং অনিরুদ্ধ "শরদ্‌গগনসঙ্কাশ"; সত্য দ্বিভুজ, বরদাভয়হস্ত, সিতকৌশেয়বসনপরিহিত, সিতচন্দনলিপ্তাঙ্গ ও সিতপুষ্পবিভূষিত; আর বাসুদেবাদি চতুষ্টয়ের ভুজ, আভরণ ও লাঞ্ছন সমান,—তাঁহারা সকলে চতুর্ভুজ,—শঙ্খ, পদ্ম, বর ও অভয় ধারী।[৬] সত্য সম্বন্ধে দুই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। এক স্থলে কথিত হইয়াছে যে সত্য আদিদেব বিষ্ণুরই নাম।[৭] আবার অন্যত্র আছে যে বাসুদেব হইতে অচ্যুত, অচ্যুত হইতে সত্য এবং সত্য হইতে পুরুষ বা অনন্ত ক্রমে উৎপন্ন হয়। প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় তেজ দ্বারা আপনাকে ক্ষুভিত এবং বিদ্যুদ্বৎ স্বাদীপ্ত করত অচ্যুতকে সৃষ্টি করেন ("অসৃজৎ")। যেমন আকাশে মেঘদলের আশ্রয়ে সূর্যকিরণ আপন স্বরূপ প্রকট করে, তেমন অচ্যুততেজা সেই অচ্যুত বাসুদেবকে আশ্রয় করত আপন স্বরূপ বিস্তার করেন। তিনি নিজের স্বরূপকে ক্ষুভিত করত, সমুদ্র যেমন বুদ্‌বুদ উৎপন্ন করে, সেই প্রকারে ভাস্বরবিগ্রহ সত্যকে উৎপন্ন করেন ("উৎপাদয়ামস")। সত্য আবার ঐ প্রকারে পুরুষ নামক অনন্তকে উৎপন্ন করে। ঐ পুরুষ সর্বভূতের আশ্রয় ও অন্তর্যামী। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, তেমন তাহা হইতে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীতও ("অনিচ্ছত") অর্থাৎ স্বভাবতঃই দেবমনুষ্যাদি প্রাগ্‌বাসনানিবদ্ধ জীবনিবহ উৎপন্ন হয়। সমস্ত আদ্য অবতারগণ তাঁহারই অংশ।[৮] বাসুদেব, অচ্যুত, সত্য ও পুরুষ-

---

১) ঐ, ৩৯।২১— ২) ঐ, ৩৬।১৩৯—১৪৪ ৩) ঐ, ৩৬।১৮৬—৯

৪) যথা দেখ—'জয়াখ্যসংহিতা, ১৬।৯৪·১ ; ২০।১৫২·২, ১৮৩·১ ; ২৫।৫,৭৮ ; ৩১।৪৭·২

৫) ঐ, ৬।১৯৮ ৬) ঐ, ১৩।১৫৮·২—১৬৫·১

৭) "আদিদেবস্তু বৈ বিষ্ণোঃ সত্যাখ্যস্য মহাত্মনঃ। মহাবিভবসংজ্ঞস্ত" (ঐ, ৬।১৯৫) ৮) ঐ, ৪।৩—১১

ইহাঁরা পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন নহেন। "পরন্তু তিনি (পুরুষ) সত্য হইতে অভিন্ন, সত্যও তাঁহা হইতে সেই প্রকারই (অর্থাৎ অভিন্নই)। অনন্তর যাহা উভয়ের একাত্মরূপ তাহা অচ্যুত হইতে অভিন্ন। (অচ্যুত) তদুভয় দ্বারা সর্বদাই অভেদে আশ্রিত এবং সংস্থিত। পুরুষ, সত্য ও অচ্যুত—এই চিদ্রূপ ত্রিতয় শান্তিসংবিৎস্বরূপ বাসুদেবে অবস্থিত আছে। অন্তর্যামী, প্রকাশাত্মা এবং চিদ্রূপ তিনি (বাসুদেব) ত্রিতয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তথারূপ।[১] বাসুদেবাদি সকলেই সঙ্কল্পরহিত। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকটি উহার পূর্ববর্তীটি হইতে তাঁহার অনিচ্ছায় উদিত হয় এবং সকলে অনিচ্ছায় পরস্পরে সংক্রান্ত হয়।[২] তিনটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ অসাঙ্কল্পিক সৃষ্টি, পরস্পর সংক্রান্তি এবং অভেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দীপ যেমন সঙ্কল্প ব্যতীতও নিজেকে এবং পরকে আলোকিত করে, সেই প্রকারে উহাদের একে অন্যরূপে সংস্থিত। দর্পণসমূহ যেমন অতীব নির্মলতা হেতু পরস্পরের প্রতিবিম্ব অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, উহাদের পরস্পর সংক্রান্তিও তদ্বৎ। ব্যোম ও স্ফটিকের পরস্পরের ভেদ যেমন প্রতীতিগোচর হয় না, প্রকাশাত্মা উহাঁদের অভিন্নতাও তদ্রূপ।[৩] এই বিবরণ হইতে অবগতি হইবে যে বাসুদেব কখন শান্ত থাকেন এবং কখন ক্ষুভিত হন। তাই কখন বলা হইয়াছে যে তিনি "শান্তসংবিৎস্বরূপ", আবার কখন বলা হইয়াছে যে তিনি নিজেকে ক্ষুভিত করিয়া ("ক্ষোভয়িত্বা") অচ্যুতকে উৎপন্ন করেন। পরন্তু পরম তত্ত্ব কূটস্থ নিত্য,—"অক্ষর এবং অক্ষোভ্য"। সেই পরমতত্ত্ব পর ব্রহ্ম।[৪] কখন কখন তাহাকেও "অব্যয় বাসুদেব বলা হইয়াছে।[৫] পরন্তু পরব্রহ্ম বা অব্যয় বাসুদেব পূর্বোক্ত বাসুদেব হইতে ভিন্ন, আবার অভিন্নও।[৬] নারদকৃত ভগবৎস্তুতিতে আছে যে অচ্যুতই সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—তিনি জ্ঞানীদিগের সঙ্কর্ষণ, কামীদিগের কুসুমায়ুধ (বা প্রদ্যুম্ন) এবং সকলের জীবত্বরূপে অনিরুদ্ধ।[৭] এক স্থলে উক্ত হইয়াছে সত্যপূর্ব অনিরুদ্ধ পর্যন্ত পাঁচটি শক্তিরূপে বর্তমান ("শক্তিত্বেন চ বর্তন্তে") সুতরাং শক্তিমানের সহিত উহাঁদের সম্বন্ধ অবশ্যই ভেদাভেদ।

'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'র মতে, পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম নিত্য নির্মল ও নিরুপম পরম মহ (বা জ্যোতি)। উহা অব্যক্ত, অচ্যুত ও অক্ষর। সুতরাং উহা নির্বিকার। উহার কোন আকার নাই, কোন বর্ণ নাই। উহা বিভু ও মহান্ এবং তমের অতীত। একমাত্র মুমুক্ষুগণই তাঁহাকে জানিতে পারে, অপর কেহ নহে। কোন কারণ বশতঃ তিনি সাকার হন। ইনি চিদ্ঘন, স্ফটিকপ্রভ এবং অনেক চন্দ্রসূর্যাদির তেজোরাশির ন্যায় অমল। ইনি ভানুচক্রান্তর্গত, দ্বিহস্ত, চক্রধর, কিরীটহারকেয়ূরশ্রীবৎসবনমালাবিভূষিত, মঞ্জীরপীতবসন এবং চারুকুণ্ডলমণ্ডিত। ইনি বাসুদেব নামক মহ এবং যোগিগণের ধ্যেয়। তাঁহা হইতে চারিজন পুরুষোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। উহাঁরা ব্যূহ নামে অভিহিত হন। উহারা সকলে চতুর্ভুজ, সর্বশক্তিময়, সর্বালঙ্কারসংযুক্ত, শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্ক ও

---

১) জয়াখ্যসং, ৪।১২—১৫'১ ২) ঐ, ৪।১৫

৩) ঐ, ৪।১৬—৮ এই সকল দৃষ্টান্তের গূঢ় রহস্য আলোচনার জন্য 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ৩য় খণ্ড, দেখ।

৪) জয়াখ্যসং, ১।২১'২—

৫) "স ব্রহ্মপরমমেতি বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্"॥—(ঐ, ৩৬।৫৯'২)

৬) ঐ, ৪।৩ উভয় বাসুদেবের সম্বন্ধের জন্য, "প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী"র ৩য় খণ্ড দেখ।

৭) ঐ, ২।১৫'২—১৬'১ ৮) ঐ, ১০।২২

নিত্যানন্দস্বরূপ। উহাঁরা তমালকাশকুসুমনীলাব্জসমতেজস্ক। উহাঁদের মধ্যে বাসুদেব প্রথম, সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয়, প্রদ্যুম্ন তৃতীয় এবং অনিরুদ্ধ চতুর্থ। ইহাঁরাই ‘ব্যূহমূর্তি’।[১]

‘পরমসংহিতা’য় উক্ত হইয়াছে যে সমস্ত দেবতা, জাগতিক সমস্ত বস্তু পরমপুরুষের শক্তি। তিনি বিশ্বরূপ। সুতরাং তাঁহার শক্তি অসংখ্য। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, গো (=শিব) এবং বিষ্ণু—এই তিন প্রধান। উহাঁরা ‘পুরুষ’ বলিয়া অভিহিত হন। উহাদের মধ্যে আবার সত্ত্ববৃত্তি দ্বারা জগতের সংরক্ষণ করেন বলিয়া এবং অপবর্গকরত্ব হেতু বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ। গুণকর্মভেদে তিনি ‘পুরুষোত্তম’, ‘নারায়ণ’, ‘বাসব’, ‘বাসুদেব’ এবং ‘হরি’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।[২] “পরন্তু সেই দেব ধর্মাদিতে পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া (জগতের) হিতকামনায় চতুর্ব্যূহরূপে ভুবনসমূহে অধিষ্ঠিত আছেন। বাসুদেব ধর্ম বলিয়া স্মৃত হন। সঙ্কর্ষণ জ্ঞান বলিয়া স্মৃত হন। প্রদ্যুম্ন বিমুক্ত (=বৈরাগ্যযুক্ত) এবং অনিরুদ্ধ সর্বেশ্বর (অর্থাৎ ঐশ্বর্য-যুক্ত)।[৩] পরেও উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব “ধর্মমূর্তি”, সঙ্কর্ষণ “জ্ঞানমূর্তি”, প্রদ্যুম্ন “বৈরাগ্যাত্মা” এবং অনিরুদ্ধ “ঐশ্বর্যমূর্তি”।[৪] কথিত হইয়াছে যে “ঐ চারি ভুবনেশ্বর বেদসমূহের, বর্ণসমূহের’, আশ্রমসমূহের, এবং দিক্‌সমূহের বিভাগ করিয়া থাকেন।”[৫] ধর্মজ্ঞানাদি চতুষ্টয় সত্ত্বগুণজাত।[৬] পূর্বে ব্যাখ্যাত ব্যূহবাদ হইতে এই চতুর্ব্যূহবাদের এক পার্থক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পূর্বের ব্যূহবাদে ব্যূহসমূহ পরমদেবতারই বা পরমাত্মারই পরন্তু এই নবীন ব্যূহবাদে ব্যূহসমূহ পরমাত্মার নহে, পরমাত্মার অসংখ্য শক্তিসমূহের অন্যতম শক্তি বিষ্ণুরই। শক্তির ব্যূহসমূহকে অবশ্যই শক্তিমানের ব্যূহ বলা যায়। তথাপি সর্বশক্তিময় পরমদেবতার সাক্ষাৎ ব্যূহসমূহ হইতে উহার এক শক্তির ব্যূহসমূহের পার্থক্য অবশ্যই করিতে হইবে।

‘বিষ্ণুসংহিতা’য় ব্যাখ্যাত ব্যূহবাদ অনেকাংশে ঐরূপই। তাঁহার (বিষ্ণুর) ধর্মজ্ঞানাদি ভেদে বেদবর্ণযুগাশ্রয় বাসুদেবাদি চারি মূর্তি (বলিয়া) বিজ্ঞেয়।[৭] মূলের “বেদবর্ণযুগাশ্রয়াঃ” স্থলে “বেদবর্ণদিগাশ্রয়াঃ” প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিলে এবং ‘বণ’কে বর্ণ ও আশ্রম উভয়ের উপলক্ষণাত্মক মনে করিলে ‘পরমসংহিতা’র ঐ বচনের সঙ্গে এই বচনের তাৎপর্যের সম্যক্ সামঞ্জস্য থাকে।[৮] তবে ‘বিষ্ণুসংহিতা’র মতে বিষ্ণু স্বয়ং পরমাত্মাই,—তাঁহার শক্তিবিশেষমাত্র নহে। সুতরাং ‘পরমসংহিতা’ হইতে উহার এই বিষয়ে মতভেদ আছে। সঙ্কর্ষণাদি নামের নিরুক্তি এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—“আদিমূর্তির সমাকৃষ্ট বলিয়া ‘সঙ্কর্ষণ’, দ্যুম্নপুষ্টত্ব হেতু ‘প্রদ্যুম্ন’ এবং অনিরোধন হেতু ‘অনিরুদ্ধ’ (বলিয়া) স্মৃত।”[৯]

কথিত হইয়াছে বাসুদেবাদি দিক্‌সমূহ বিভাগ করিয়া থাকেন। তাহা কি প্রকারে বিবেচ্য। বিষ্ণু বা পরমাত্মার মানস পূজাপদ্ধতির বর্ণনায় আছে যে প্রথমে এক যাগপীঠ কল্পনা

---

১) বিষ্ণুতিলকসং, ২।৫—

২) পরমসং, ২।৯৪·২—৯৯·১

৩) ঐ, ২।৯৯·২—১০১·১

৪) ঐ, ৪।২৯—৩১

৫) ঐ, ২।১০৩·২—১০৪·১

৬) ঐ, ২।৪৩·২

৭) বিষ্ণুসং, ৩।৪·২—৫·১

৮) পরের উক্তি হইবে যে ঐ তাৎপর্যই মূলের অভিপ্রেত ছিল

৯) বিষ্ণুসং, ৩।৫৬

করিতে হইবে। // মনে করিতে হইবে যে বাসুদেবাদি চতুষ্টয় ঐ যাগপীঠের চারিপাদ। "ধর্মমূর্তি বাসুদেব অগ্নিকোণে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানমূর্তি সঙ্কর্ষণদেব নৈঋতকোণে স্থিত। বৈরাগ্যাত্মা প্রদ্যুম্ন বায়ুকোণে ব্যবস্থিত। এবং ঐশ্বর্যমূর্তি অনিরুদ্ধ ঈশানকোণে ব্যবস্থিত।"[১] ঐ যাগপীঠের উপর দ্বাদশদলপদ্ম মধ্যে পরমাত্মার "শুদ্ধস্ফটিকনির্মল" চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিগ্রহ অনুধ্যান করত তাহাতে অচ্যুত পরমাত্মকে আবাহন করিতে হইবে। 'জয়াখ্যসংহিতা' 'পৌষ্করসংহিতা' প্রভৃতিতে বর্ণিত মানসযাগেও প্রায় সেই প্রকার বর্ণনা আছে। কথিত হইয়াছে যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য—এই চারিটিকে যাগপীঠের আগ্নেয়াদি ঈশান পর্যন্ত কোন চতুষ্টয়ে বিন্যাস করিতে হইবে।[২] বাসুদেবাদি চতুষ্টয় চারি কোণে দিক্‌সন্ধিস্থলে অবস্থিত বলিয়া, সত্যই দিক্‌বিভাগ করিয়াছেন।

'সাত্বতসংহিতা'য় আর এক প্রকার চতুর্ব্যূহবাদ পাওয়া যায়। তন্মতে বাসুদেব "ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহদেব"[৩] অর্থাৎ জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, শক্তিও তেজ—এই ছয় গুণ তাঁহাতে সম্পূর্ণতঃ বিদ্যমান। তিনি আপন স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও ("অনুজ্‌ঝিতস্বরূপঃ") নিজে নিজেকে দুই দুই গুণ প্রধান সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই তিন রূপে বিভক্ত করেন। সঙ্কর্ষণে জ্ঞান ও বল গুণদ্বয়, প্রদ্যুম্নে ঐশ্বর্যও বীর্য গুণদ্বয় এবং অনিরুদ্ধে শক্তি ও তেজ গুণদ্বয় বর্তমান।[৪] এই তিনটি বাসুদেবের তিন 'ব্যূহ' নামে অভিহিত হয়।[৫] প্রত্যেক ব্যূহে মুখ্যবৃত্তিতে দুই গুণ থাকিলেও আবার অপর চারিগুণও আছে।[৬]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ও 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় ঐ ব্যূহবাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। জ্ঞানাদি ষট্‌গুণ বাসুদেবে সম্পূর্ণতঃ বিদ্যমান।[৭] সেইহেতু তিনি "ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহদেব"।[৮] "বিষ্ণু ষাড়্‌গুণ্যরূপী"।[৯] সৃষ্টির পূর্বে উক্ত ছয় গুণ বাসুদেবে সম্যক্ স্তিমিতভাবে থাকে। তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া হয়।[১০] তখন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে 'বিষ্ণু' বলা হয়। সৃষ্টিতে প্রথমে ঐ ছয় গুণের যুগপৎ উন্মেষ হয়।[১১] তখন শক্তির ও শক্তিমানের ভেদদৃষ্টিতে তিনি 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হন।[১২] অনন্তর কার্যবশে দুই দুই গুণের আধিক্যযুক্ত তাঁহার অপর তিন রূপ ক্রমে প্রকটিত হয়। যাঁহাতে জ্ঞান ও বল বা উহাদের কার্য সমধিক স্ফুট তিনি 'সঙ্কর্ষণ' নামে, যাঁহাতে ঐশ্বর্য ও বীর্য বা উহাদের কার্য সমধিক স্ফুট তিনি 'প্রদ্যুম্ন'

---

১) ঐ, ৪।২৮·২—৩১·১ ; পরমসং, ৪।২৯·২—৩১·১ আরও দেখ—পাদ্মসং, ৪।৭।০৮

২) জয়াখ্যসং, ১২।৫·২—৮, পৌষ্করসং, ২৩।৩৩·২—৩৪·১ ;

'অগ্নিপুরাণে'ও ঐ যোগপীঠের উল্লেখ আছে। উহাতেও উক্ত হইয়াছে যে "ধর্মং জ্ঞানং চ বৈরাগ্যমৈশ্চর্যং বহ্নিদিক্ষু্খান্" (অগ্নিপু, ২৩।১১·১)

৩) সাত্বতসং, ১।২৫.১ ৪) ঐ, ৩।৫—৮ ; পরে দেখ।

৫) ঐ, ১।২৬.২—২৭.১ ৬) ঐ, ৩।১৩.২—১৪

৭) "সম্পূর্ণষড়্‌গুণস্তেষু বাসুদেবো জগৎপতিঃ।"—বিষ্বক্‌সেনসং ('তত্ত্বত্রয়ভাষ্য'), ১০৩ পৃষ্ঠা)।

৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ৬।২৫

"জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহঃ"—(ঐ, ৩৩।১৪.২)

৯) "বিষ্ণোঃ ষাড়্‌গুণ্যরূপিণঃ" (অহির্বুধ্ন্যসং, ৮।১৯.২)

"পরমাত্মা পরো দেব একঃ ষাড়্‌গুণ্যমুজ্জ্বলঃ॥"—(অহির্বুধ্ন্যসং, ৮।১০.২)

১০) ঐ, ৫।৩, ৩৩.১ ১১) ঐ, ৫।৪—৫, ৩৩.২ ১২) ঐ, ৫।২৬.২—২৯.১

নামে, আর যাঁহাতে শক্তি ও তেজ সমধিক স্ফুট তিনি 'অনিরুদ্ধ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই তিনটি বাসুদেবের তিন 'ব্যূহ'। ইহা বোধ হয় বিশেষ ভাবে বলা উচিত যে সঙ্কর্ষণাদি প্রত্যেক বূহে যে কেবল উক্ত দুই দুই গুণই আছে, তাহা নহে। অপরাপর গুণ চতুষ্টয়ও উহাদের প্রত্যেকে অবশ্যই থাকে। সুতরাং ব্যূহত্রয়েই ষড়্গুণের অনুবৃত্তি আছে। সেইহেতু উহাদিগকেও কখন কখন "ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ দেবগণ" বলা হয়।[১] তবে প্রত্যেক ব্যূহে দুই গুণ বা উহাদের কার্য বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়।[২] সেইহেতু উহা অপরাপর ব্যূহ হইতে, তথা বাসুদেব হইতে, ভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পররূপ বাসুদেব এবং তিন ব্যূহরূপ লইয়া বিষ্ণুর "চাতুরাত্ম্য"[৩]। ঐ চাতুরাত্ম্য হইতে ব্যূহান্তরবিভবাদি সঙ্কল্প-কল্পিত ভেদসমূহ উৎপন্ন হয় বলিয়া রহস্যাম্নায়বিদ্‌গণ উপদেশ করিয়া থাকেন।[৪]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তির ক্রম এবং কালও সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে সর্বশক্তিময় বাসুদেব সিসৃক্ষা বশতঃ নিজে নিজেকে বিভক্ত করেন। তখন তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ উৎপন্ন হন। সূর্য উদয়শৈলস্থ হইলে তাঁহার প্রভা যেমন বিচ্ছুরিত হয়, তেমন বাসুদেবরূপ সূর্য উদয়স্থ (অর্থাৎ ব্যক্তোন্মুখ) হইলে, সঙ্কর্ষণাত্মিকা তাঁহার প্রভা বিকশিত হয়। সাক্ষাৎ বিজ্ঞানবলবারিধি সঙ্কর্ষণাত্মিকা শক্তি প্রকটিত হইবার পর ১৬০০ বৎসর "অব্যাপৃত" ভাবে থাকে।[৫] এইরূপে ১৬০০ থাকিবার পর স্বসঙ্কল্পপ্রচোদিত সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হন। "অংশাংশে উদিত ঐ প্রাদ্যুম্নী বৎসর শক্তি,—ভগবৎপ্রভা ১৬০০ বৎসর পর্যন্ত অব্যাপৃত ও তূষ্ণীভাবে থাকে।[৬] "অনন্তর শক্তিময় দেব, পুরুষোত্তম প্রদ্যুম্ন, ১৬০০ বৎসর (ঐরূপে) থাকিয়া স্বসঙ্কল্পপ্রচোদিত হইয়া পুনঃ অনন্ত ভগবান্ অনিরুদ্ধ হন। অংশাংশে উদিত ঐ অনিরুদ্ধীশক্তি,—হরির প্রভা,—১৬০০ বৎসর অব্যাপৃত ও তূষ্ণীভাবে অবস্থান করে। ১৬০০ বৎসর (ঐরূপে) থাকিবার পর শক্তিমানস অনিরুদ্ধ পূর্বদ্বয়ের সহিত সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত হন।"[৭] এইরূপে দেখা যায় এক এক ব্যূহ উৎপত্তির পর ১৬০০ বৎসর অব্যাপৃত ও তূষ্ণীভাবে অবস্থান করে। তৎপরে উহা নিজের সঙ্কল্প দ্বারা প্রচোদিত হইয়া পরবর্তী সৃষ্টিকার্যেও ব্যাপৃত হয়। কথিত হইয়াছে যে প্রথমে তাহার ঠিক বিপরীত ক্রিয়া হয়। প্রলয়ে সর্বজগৎ ক্রমে কূটস্থ পুরুষে এবং কূটস্থ পুরুষ অনিরুদ্ধে লয় পায়। ১৬০০ বৎসর পরে অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নে, তাহার ১৬০০ বৎসর পরে প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণে এবং তাহার ১৬০০ বৎসর পরে সঙ্কর্ষণ বাসুদেবে লয় পায়।[৮]

এইরূপে দেখা যায়, 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে ষাড়্গুণ্যশক্তির দুই অবস্থা,—এক পূর্ণ স্তিমিত দশা বা নিস্তরঙ্গ দশা,[৯] অপর উন্মেষ দশা বা সতরঙ্গ দশা। উন্মেষ দশার আবার দুই অবস্থা,—

---

১) ঐ, ৫।১৯.১ ; "ষাড়্গুণ্যবিগ্রহৈর্ব্যূহৈঃ" (৯।৩২.২)

২) ঐ, ৫।১৬—২০ ; বিষ্বক্‌সেনসং ('তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১০৩-৬ পৃষ্ঠা)

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।২৫.২—২৬.১ ; ৪০.২

৪) ঐ, ৫।৪৫

৫) ঐ, ৫।২৯.২—৩২.২

৬) ঐ, ৫।৩৪.২—৭.১

৭) ঐ, ৫।৩৭.২—৪০

৮) ঐ, ৪।৫৯—৬৮.১

৯) এই দশাকে কখন কখন মেঘবিহীন আকাশের সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে। (অহির্বুধ্ন্যসং, ৯।৩৮)

প্রথম যখন ছয় গুণের যুগপৎ সমভাবে উন্মেষ হয়; দ্বিতীয় যখন তাহার সুদীর্ঘ কাল—১৬০০ বৎসর পরে পরে দুই দুই গুণের আধিক্যের উন্মেষ হয়। তাই বলা হয় যে চাতুরাত্ম্যের তিন অবস্থা। "বিষ্ণুর গুণব্যতিকরোদ্ভূত চাতুরাত্ম্যস্থিতি ত্রিধা—ব্যাপ্তিমাত্র, গুণোন্মেষ এবং মূর্তাকার[1] চারি ব্যূহ বা চাতুরাত্ম্য নির্দোষ, নিরনিষ্ট, নিরবদ্য, সনাতন, অনন্ত এবং অক্ষয়। (ব্যাপ্তিমাত্র বা) নিস্তরঙ্গদশায় উহাঁরা নিঃসক্ত ও সক্তচিন্ময়; গুণোন্মেষদশায় উহাঁরা শক্ত্যাত্মকরূপে ব্যবস্থিত; আর স্থূলদশায় উহাঁরা ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত হন।[2]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র বর্ণনাও প্রায় সেই প্রকার। তবে তন্মতে ষড়্‌গুণ লক্ষ্মীরই, সুতরাং ব্যূহভেদও লক্ষ্মীরই। লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "যেমন বজ্ররত্ন হইতে প্রভা সর্বতঃ পরিস্ফুরিত হয়, তেমন আমার স্বরূপ হইতে শুদ্ধময় মার্গ স্ফুরিত হয়। আমার অমেয়াকাশসংকাশ,—নিষ্পন্দোদধিসদৃশ জ্ঞানঘনরূপ হইতে শুদ্ধ সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। প্রথমে নির্ব্যাপার, সদানন্দ, সর্বাত্মক, শুদ্ধ এবং পর জ্ঞান ব্যক্ত হয়। উহা সঙ্কর্ষণ বলিয়া কথিত হয়।…আমার যে ঐশ্বর্য তাহা পুরুষোত্তম প্রদ্যুম্ন।…আমার অব্যাহত চিচ্ছক্তি অনিরুদ্ধ বলিয়া প্রবর্তিত। বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং শক্তিস্বরূপ পুষ্করেক্ষণ চিন্ময় ঐ পুরুষগণ আমারই রূপ। উহারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা। আমার (পরম) রূপ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তুল্য কিংবা নির্মেঘ আকাশের সদৃশ। যখন সিসৃক্ষমাণ আমা হইতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য বীর্য ও তেজ তুল্যভাবে এবং অশেষতঃ উন্মেষিত হয়, তখন বাসুদেব বলিয়া কথিত হয়। বাসুদেব সমাত্মক। যখন উহাদের জ্ঞান ও বলের (আধিক্যের) উন্মেষ হয়, তখন সঙ্কর্ষণ বলিয়া কথিত হয়।…বীর্যৈশ্বর্যসমুন্মেষ হইলে প্রদ্যুম্ন বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।…শক্তিতেজসমুন্মেষ হইলে অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত হয়।"[3]

'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'র মতে, প্রত্যেক ব্যূহে এক এক গুণের আধিক্য আছে, দুই দুই গুণের নহে। কথিত হইয়াছে যেমন প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণসামান্য, তেমন বাসুদেব জ্ঞানাদিগুণসামান্য; গুণসমূহের বৈষম্যে যেমন প্রকৃতি হইতে মহদাদি উৎপন্ন হয়, তেমন বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদি উৎপন্ন হয়। সঙ্কর্ষণ জ্ঞানাধিক, প্রদ্যুম্ন বলাধিক এবং অনিরুদ্ধে ঐশ্বর্যাধিক।[4]

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'তে বিবৃত হইয়াছে যে জ্ঞানাদিষড়্‌গুণবান্ বা ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ করেন। দুই দুই গুণ অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি সৃষ্ট্যাদি করেন এবং সেইহেতু প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হন। ঐশ্বর্য-বীর্য-বান্ হইয়া তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন এবং প্রদ্যুম্ন হন ("পর্যপদ্যত") তেজ ও শক্তিতে সমাবিষ্ট হওত অনিরুদ্ধ হইয়া সৃষ্ট জগৎ পালন করেন। জ্ঞান ও বলে অধিষ্ঠিত হওত সঙ্কর্ষণ হইয়া সৃষ্টি জগৎ সংহার করেন।[5] তাহাতে দেখা যায়, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ যথাক্রমে পুরাণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের বরাবর; ব্রহ্মা = জগতের স্রষ্টা = প্রদ্যুম্ন, বিষ্ণু = জগতের পালক = অনিরুদ্ধ, আর রুদ্র = জগতের সংহারক = সঙ্কর্ষণ। সুতরাং প্রদ্যুম্নাদি ব্রহ্মাদিরই সংজ্ঞান্তরবিশেষ।

---

১) ঐ, ৫।২০.২—২১.১ ২) ঐ, ৫।৪১—৩

৩) লক্ষ্মীতং, ৪।৬—১৬ আরও দেখ—২।৩৭—; ৬।৩—; ১০।২৯—; ২৯।১০.২—

৪) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।১৩।১০৬—১১০ ৫) 'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি', ৬।১৭২—৫

আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিগণের মতে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—ইহাঁরা সকলেই ঈশ্বর ; কেননা, উহাদের সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ—এই ঐশ্বর ধর্মসমূহযুক্ত। অধিকন্তু উহাদের মধ্যে ঐ সকল গুণের তারতম্য জনিত কোন ভেদ নাই। সুতরাং উহাঁদের সকলেই বাসুদেব।[১] কোন পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে তিনি ঐ মত পাইয়া থাকিবেন। পরন্তু কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আমরা ঐ মত দেখি নাই। তবে 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে, "যদিও একগুণোন্মেষ তথাপি উহারা নিশ্চয় ষড়্‌গুণ(যুক্ত)। সকলে বাসুদেব হইতে ন্যূনও নহে, অধিকও নহে এবং সনাতন।"[২]

প্রত্যেক ব্যূহের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব শ্বেতবর্ণ, সঙ্কর্ষণ "রুক্মাভ", প্রদ্যুম্ন "ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশ" এবং অনিরুদ্ধ "তাদাত্মিকঘনপ্রভ" বলিয়া সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকেন।[৩] পরন্তু তাহা সত্য নহে। কেননা, 'জয়াখ্যসংহিতা'য় দেখা যায়, বাসুদেব "প্রশান্তহুতভুগ্‌রূপ" (অর্থাৎ অরুণবর্ণ), সঙ্কর্ষণ "সিতও নহেন, অরুণও নহেন" (তদুভয়মিশ্রিত রূপ), প্রদ্যুম্ন "পীতচম্পকবর্ণাভ" এবং অনিরুদ্ধ "শরদ্‌গগনসঙ্কাশ" (অর্থাৎ নীলবর্ণ)।[৪] 'পাদ্মসংহিতা'র মতে, বাসুদেবের বর্ণ কৃতযুগে বলক্ষ (অর্থাৎ স্ফটিকাভ), ত্রেতাযুগে অরুণ, দ্বাপরযুগে পীত এবং কলিযুগে ঘনশ্যাম। পরন্তু কৃতাদি চারি যুগেই সঙ্কর্ষণ রক্তবর্ণ, প্রদ্যুম্ন কণকপ্রভ এবং অনিরুদ্ধ শ্যাম।[৫] ঐ বিষয়ে 'সাত্বতসংহিতা'র বিবরণ অতি বিস্তৃত। তাহা কিঞ্চিৎ পরে প্রদত্ত হইবে।[৬]

মহাভারতপুরাণাদিতেও উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের বর্ণ যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যথা 'মহাভারতে'র,[৭] তথা 'হরিবংশে'র[৮] মতে, ভগবান্ নারায়ণ কৃতযুগে শ্বেত, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত এবং কলিতে কৃষ্ণ বর্ণ হন। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে আছে যে ভগবান্ কৃতযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ এবং কলিতে কৃষ্ণবর্ণ।[৯]

'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণাদি প্রত্যেক ব্যূহের দুই দুই কার্য। সঙ্কর্ষণের কার্য শাস্ত্রপ্রবর্তন ও জগৎসংহার। তিনি "জ্ঞান (গুণ) দ্বারা বেদশাস্ত্র নামে খ্যাত সর্বসিদ্ধান্তগোচর শাস্ত্র, বিশেষতঃ পঞ্চরাত্র (শাস্ত্র) বিস্তার করেন। বলগুণ দ্বারা এই নিখিল

---

১) "ঈশ্বরা এবৈতে সর্বে জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিরৈশ্বরৈর্ধর্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে—বাসুদেবা এবৈতে সর্বে নির্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চেতি" ('ব্রহ্মসূত্র', ২।২।৪৪ শঙ্করভাষ্য) "ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্বাসুদেবাদিষেকস্মিন্ সর্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্‌ভেদোঽভ্যুপগম্যতে, বাসুদেবা এবা হি সর্বে ব্যূহা নির্বিশেষা ইষ্যন্তে।" (ঐ, ২।২।৪৫ শঙ্করভাষ্য)

২) লক্ষ্মীতং, ৪।২১ ; আরও দেখ, ৬।১২.২

৩) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

৪) জয়াখ্যসং, ১৩।১৬১'২—১৬৪.১ (পূর্বে দেখ)

৫) পাদ্মসং, ৩।১৪।৬৭—৬৭.১

৬) পরে দেখ।

৭) মহাভা, ৩।১৪৯।১৭, ২৪, ২৭ ও ৩৪

এক স্থলে (মহাভা, ৩।১৮৯।৩২) আছে, ভগবানের বর্ণ কৃতযুগে শ্বেত, ত্রেতাযুগে পীত, দ্বাপরে রক্ত এবং কলিযুগে কৃষ্ণ। ঐ স্থলে যে ত্রেতাযুগের ও দ্বাপরযুগের বর্ণের বিপর্যয় দৃষ্ট হয়, তাহা লেখকদোষও হইতে পারে।

৮) 'হরিবংশ', ২।৭১।৩১

৯) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৫।২১, ২৪, ২৭ ও ৩২ দেখ।

(জগৎ) হরণ করেন।”[১] প্রদ্যুম্নের কাজ জগৎসৃষ্টি ও ধর্মপ্রবর্তন। “ঐশ্বর্যগুণ দ্বারা উনি চরাচর (জগৎ) সৃষ্টি করেন। বীর্য দ্বারা সর্বধর্মসমূহ সর্বপ্রকারে প্রবর্তন করেন।”[২] অনিরুদ্ধের কাজ জগতের সংরক্ষণ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞাপন। “হরি (অনিরুদ্ধ) শক্তি দ্বারা এই সমস্তকে,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিরন্তর ধারণ ও পালন করেন, যেমন বিরাট প্রস্তরশিখর অণুককে, তেজ দ্বারা আত্মার নিখিল তত্ত্ব জ্ঞাপন করেন।”[৩]

এইরূপে দেখা যায়, সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহত্রয়ের প্রত্যেকের এক কর্ম নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের সহিত সম্পর্কিত,—উহার সৃষ্টি, স্থিতি বা লয় বিষয়ক, অপর কর্ম বিশেষভাবে সাংসারিক মনুষ্যদিগের সহিত সম্পর্কিত,—উহাদের ধার্মিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ক। প্রদ্যুম্ন জগৎ সৃষ্টি করেন, অনিরুদ্ধ উহাকে ধারণ ও পালন করেন, আর সঙ্কর্ষণ উহা সংহার করেন। সঙ্কর্ষণ শাস্ত্র রচনা ও প্রচার করেন, প্রদ্যুম্ন মনুষ্যগণকে তদুক্ত ধর্মে প্রবর্তিত করেন এবং অনিরুদ্ধ ধর্মের চরমফল আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন। স্থূলতঃ তাহা বলিয়া, অতঃপর ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে উহাদের প্রত্যেকে কিছু কিছু সৃষ্টি কর্মও করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে সঙ্কর্ষণ প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীন জীবতত্ত্বকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করেন, অনন্তর প্রদ্যুম্ন শুদ্ধমনুষ্যবর্গ সৃষ্টি করেন, এবং অনিরুদ্ধ কাল ও মিশ্রবর্গ অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ গুণ মিশ্রিত মনুষ্যবর্গ সৃষ্টি করেন। কিঞ্চিৎ পরে তাহা বিবৃত হইবে।[৪] এইখানে সংক্ষেপে ইহা বলা উচিত মনে করি যে অনিরুদ্ধ মনুষ্যকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেও, কথিত হইয়াছে যে, তিনি চাহেন না যে সমস্ত মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যাউক। কেননা, তাহা হইলে, তাঁহার স্বোক্তি মতে, “সৃষ্টিক্ষয়ো মহানাসীন্নারকী ভূস্তৃণাবৃতা” (অর্থাৎ—“মহান্‌সৃষ্টিক্ষয় হওয়াতে, পৃথিবী জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া নরকে পরিণত হইল”)।[৫] তাঁহার জগৎস্থিতি-কর্মের সহিত তাঁহার ঐ অনিচ্ছার সঙ্গতি আছে বটে, পরন্তু তাঁহার আত্মজ্ঞান-প্রদান-কর্মের সহিত উহার পূর্ণ সঙ্গতি অবশ্যই থাকে না। বরং ঐ দৃষ্টিতে তাঁহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই প্রকারে সঙ্কর্ষণের সংহার-কর্মের সহিত তাঁহার জীবসৃষ্টি-কর্মের ও শাস্ত্র-প্রবর্তন-কর্মের কি সঙ্গতি আছে, বিবেচ্য।

যাহা হউক, অপরাপরসংহিতায় ঐ সকল বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। যথা, ব্যূহের জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে ‘অহির্বুধ্ন্যসংহিতা’য় বিবৃত হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণ চিদচিদাত্মক বিশ্বকে তিলকালকবৎ ধারণ করেন।”[৬] বিশ্ব তাঁহাতে তিলকালকবৎ অবস্থিত আছে।[৭] সুতরাং তিনি বিশ্বাধার। তিনি বিশ্বকে সমুন্মীলনের পূর্বে ধারণ করেন।[৮] তাঁহাতেই বিশ্ব প্রকটিত হয়। তিনি জগৎকে ব্যক্ত হইতে গতিমান্ করেন বা প্রেরিত করেন।[৯] তিনি “বিশ্বভাবন” নামে অভিহিত হন।[১০] “প্রদ্যুম্নপূর্বক চেতনা-

---

‘শ্যাম’ এবং ‘কৃষ্ণ’ প্রায় সমানার্থক। উভয়ের পার্থক্য রক্ষার্থ টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে শ্যাম=“অতসীপুষ্পসঙ্কাশ”, কৃষ্ণ=“ইন্দ্রনীলমণিবৎ”।

১) ‘তত্ত্বত্রয়ভাষ্য’, ১০৪ পৃষ্ঠা ২) ঐ, ১০৫ পৃষ্ঠা ৩) ঐ, ১০৬ পৃষ্ঠা

৪) পরে দেখ। ৫) তত্ত্বত্রয়ভাষ্য, ১০৮ পৃষ্ঠা। ঐ বচন ‘পাদ্মসংহিতা’য় (১।১।৩৯) ও আছে।

৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৯।২৪ ৭) ঐ, ৫৩।২৯.১ ; ৫৫।৩৬.১

৮) ঐ, ৫৯।৩০ ৯) ঐ, ৫৯।২৩ ১০) ঐ, ৫৩।২২.২

চেতনাত্মক বিশ্বকে (সঙ্কর্ষণ)দেব অনিশ ভাবিত করেন ('ভাবয়তি')। সেইহেতু তিনি 'বিশ্বভাবন' বলিয়া কথিত হন। তিনি ব্যক্ত বিশ্বকে ভাবিত করেন এবং যথার্থতঃ জানেন। সেইহেতু শব্দবিত্তমগণ কর্তৃক তিনি 'বিশ্বভাবন' ও 'সর্বজ্ঞ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। মহাবল বলদেব বিশ্বকে পাইয়া অনিশ ধারণ করেন, অনন্তর বিশ্ব হন ; সেইহেতু 'বিশ্বভাবন' বলিয়া উদ্দিষ্ট হন। ইত্যাদি।[1] তিনি বিশ্বকারণ বা বিশ্ববীজ। বিশ্ববীজ বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হইয়াছে তিনি বিশ্ব হন। বিশ্বের প্রলয় রাত্রি এবং সৃষ্টি দিন। রাত্রি বাসুদেব আর দিন সঙ্কর্ষণ।[2] "যেহেতু সঙ্কর্ষণদশায় হরির সম্পূর্ণ উদয় হয়, সেইহেতু সঙ্কর্ষণ 'উদ্দাম' বা 'উদয়' বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন।"[3] পর বাসুদেবকেও 'উদ্দাম' বা 'উদয়' বলা হইয়া থাকে। কেননা, তিনি "নিত্যোদিতস্বরূপ"।[4] সুতরাং ইহা পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন দৃষ্টি। প্রদ্যুম্নকে "জগদ্‌যোনি" বলা হয়।[5] সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি ভুবন কর্ম প্রসব করেন।[6] তিনি নিজ সঙ্কল্প বলে আপন শরীর হইতে অষ্ট মনু এবং গুণ উৎপন্ন করেন। ঐ মনুদিগের সমষ্টি 'পুরুষ' নামে এবং গুণ-সাম্য 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত হয়।[7] তাই বলা হয় যে প্রদ্যুম্ন প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক্ করেন,[8]—"মানবসর্গ" করেন। তিনি ত্রয়ী বিদ্যাকে প্রেরিত করেন। সেই হেতু বলা হয় যে তিনি "বৈদ্যসর্গ"ও করেন।[9] অনিরুদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতিকে বহু করেন। জলে শয়ান অনিরুদ্ধ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বৃদ্ধির জন্য স্বনাভিকমলোদরে অবকাশ প্রদান করেন।[10] সৃষ্টি ও সংহার উভয়কেই তিনি স্বনাভিকমলোদরে ধারণ করেন।[11] তিনি চিদচিৎ জগতের "অধ্যক্ষ", "অতিস্বামী" ও "শাসিতা"।[12] তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের এবং জীবগণের পরিত্রাণের হেতু,[13] এবং সৃষ্টিস্থিত্যাদি অপরিমেয় কার্যসমূহ করেন।[14] তাহাতে অপর কোন কিছুর সাহায্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। "সহকারীর অনপেক্ষা" 'তেজ' বলিয়া কথিত হয়। এবং "জগৎপ্রকৃতিভাব" বা জগতের উপাদানতা 'শক্তি' বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।[15] তাই কথিত হয় যে অনিরুদ্ধে শক্তি ও তেজ বা উহাদের কার্য সমধিক স্ফুট। প্রদ্যুম্ন সূক্ষ্মকাল এবং অনিরুদ্ধ স্থূল বা ব্যক্তকাল সৃষ্টি করেন।[16] 'সাত্বতসংহিতা'য়ও সঙ্কর্ষণকে "বিশ্বভাবন ও সর্বজ্ঞ", প্রদ্যুম্নকে "সর্বেশ্বর জগন্ময়" এবং অনিরুদ্ধকে "স্থিত্যুৎপত্তিলয়ত্রাণহেতু" বলা হইয়াছে।[17] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' ঐ বিষয়ে 'সাত্বতসংহিতা'কে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছে,—উহাতে উক্ত সংজ্ঞাসমূহের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছে। বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র মতে, সঙ্কর্ষণ কাল, রুদ্র, যম এবং সর্বভূতের অন্তর্যামিত্বে আস্থিত হইয়া জগৎ সংহার করেন ; প্রদ্যুম্ন কাল, যম, ব্রহ্মা ও প্রজাপতি-গণের অন্তর্যামিত্বে আস্থিত হইয়া সৃষ্টি করেন ; এবং অনিরুদ্ধ কাল, যম, মনুগণ এবং রাজাগণের

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৩।২৪—৩০ ২) ঐ, ৪।৬৮—৭৮ ও ৮।৩৮— (পূর্বে দেখ)
"অহঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তো বাসুদেবস্ত তত্ত্বতঃ।" (ঐ, ৫৩।৮৩.১

৩) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫২।৭৯.২—৮০.১ ৪) ঐ, ৫৩।১৭

৫) ঐ, ৫২।৮৩.১ ৬) ঐ, ৫২।৭৮.২ ৭) ঐ, ৬।৮—; পরে দেখ।

৮) ঐ, ৫৯।৩১.২ ৯) ঐ, ৫৫।১৭ ১০) ঐ, ৫২।৮১.২—৮২

১১) ঐ, ৫২।৭৪.২—৭৫ ১২) ঐ, ৫৩।৫৩, ৫৪ ও ৫৫।৪৪.১

১৩) ঐ, ৫৩।৬৯.১ ১৪) ঐ, ৫৫।২২

১৫) ঐ, ২।৫৭.২, ৬১.১ ১৬) ঐ, ৬।১২— ১৭) সাত্বতসং, ৭।২৬—৮

অন্তর্যামিত্বে আস্থিত থাকিয়া সৃষ্ট জগতের স্থিতি করেন।[১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে অনিরুদ্ধ জগৎসৃষ্টি করেন, প্রদ্যুম্ন সৃষ্ট জগতের পালন করেন, এবং সঙ্কর্ষণ সংহার করেন।[২] আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির এবং পুরুষের পার্থক্য প্রদ্যুম্ন করেন। "ভোক্তৃ-ভোগ্য-সমষ্টিস্তু নিলীনা তত্র তিষ্ঠতি।" (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন ভোক্তৃ-ভোগ্য-সমষ্টির অধিষ্ঠিতা)।[৩] সঙ্কর্ষণ "স্বতঃই সকল বিশ্বকে তিলকালকবৎ ধারণ করেন।"[৪] সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহত্রয়ের অপর কার্য শাস্ত্র, শাস্ত্রার্থ এবং তৎফল।[৫] "শাস্ত্র সঙ্কর্ষণ হইতেই নির্ঘাতশব্দবৎ ভাত হয়। উহার সকল ক্রিয়া প্রদ্যুম্ন দেব হইতে সন্তুত হয়। অশেষ ক্রিয়া ফল অনিরুদ্ধ হইতে হয় বলিয়া কথিত হয়।"[৬] "সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য দ্বারা এবং শাস্ত্র, ধর্ম ও ফল দ্বারা ঐ দেবগণ স্বয়ং সদা অনুগ্রহ বিধান করেন।"[৭]

ব্যূহের ধার্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ইহা উক্ত হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণ জ্ঞানগুণ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন ঐকান্তিকমার্গ অভিব্যক্ত করেন, প্রদ্যুম্ন উহাতে শাস্ত্রার্থভাবে স্থিত (অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন), আর অনিরুদ্ধ সাধকগণকে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ শাস্ত্রার্থের ফল প্রাপ্তি করান।[৮] এইরূপে "হরির এই শক্তিময় ব্যূহগণ,—পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষগণ, শাস্ত্র, শাস্ত্রার্থ এবং তৎসাধ্যফলের নির্বাহক।"[৯] সুতরাং এই বিষয়ে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মত প্রায় 'বিষ্বক্সেনসংহিতা'র মতের ন্যায়। উভয়ের মধ্যে এই মতভেদ আছে যে 'বিষ্বক্সেনসংহিতা'র মতে সঙ্কর্ষণ সমগ্র বেদশাস্ত্র, বিশেষতঃ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র, প্রবর্তন করেন, আর 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, তিনি কেবল ঐকান্তিকমার্গ প্রকট করেন। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় পরে পরে আরও কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণ সাত্বতশাস্ত্র উদ্গীরণ ও নিগীরণ করেন; তাহাতেই তাঁহার আনন্দ।[১০] তিনি "সম্যগ্‌জ্ঞানোপদেশ দ্বারা সর্বদেহীর শঙ্কর।"[১১] দিব্যশাস্ত্রোপদেশ দ্বারা তিনি সংসাররোগ ধ্বংস করেন।[১২] বন্ধক্ষয়কারক জ্ঞানের উপদেষ্টারূপে তিনি জীবের অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভের, বা স্বরূপাবির্ভাবের ঈশান।[১৩] প্রদ্যুম্নকে 'হৃষীকেশ' বলা হয়। তাহার অনেক ব্যুৎপত্তিগত হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদ্যুম্ন জ্ঞানকে নির্মল করতঃ জীবকে হর্ষিত করেন বলিয়া তিনি হৃষীকেশ। অথবা 'হৃষীকে'র বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 'ঈশ' বা অন্তর্নিয়ামক বলিয়া তিনি হৃষীকেশ। ইত্যাদি।[১৪] "প্রদ্যুম্ন ভগবদ্ধর্মরূপ অমৃতের আধার বা সমাশ্রয়,—সদ্ধর্মের অধিষ্ঠাতা, ধর্মসংশ্রয়। 'মায়া' অর্থ জ্ঞান। যেহেতু মায়া দ্বারা বিদ্যাকে সম্বোধিত করেন এবং বীরবর্ণসমূহ দ্বারা তমোময় বিদ্যাদোষকে অনলবৎ দহন করেন, সেইহেতু দেব 'প্রদ্যুম্ন' বলিয়া পরিকীর্তিত হন।"[১৫] তিনি শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে নির্মল কর্ম ব্যাপার

---

১) বৃহদ্ব্রহ্মসং, ৩।২।৬৫—৭৬ ২) লক্ষ্মীতন্ত্র, ৪।১১, ১৯, ২০ ৩) ঐ, ৬।১০

৪) ঐ, ৪।১৪ আরও দেখ—৬।৬—৭

"ব্যক্তজ্ঞানবলাখ্যায়াং পূর্বং সঙ্কর্ষণাত্মনি ॥
তিলকালকবৎ সর্বো বিকারো ময়ি তিষ্ঠতি।"—(২।৪১.২—৪২.১)

৫) ঐ, ২।৫৪.১ ৬) ঐ, ৪।১৭.২—১৮ ৭) ঐ, ৪।২০

৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।২১.১—২৪.১ ৯) ঐ, ৫।২৪.২—২৫.১ আরো দেখ—১০।১৩—১৪.১

১০) ঐ, ৫৫।১৬ ১১) ঐ, ৫৩।৩২.১ ১২) ঐ, ৫৫।৩৬.২

১৩) ঐ, ৫৯।২৭.২—২৮ ১৪) ঐ, ৫৩।৪০— ১৫) ঐ, ৫৫।৩৯—৪১.১

করেন।[1] তিনি বিশ্বের উপকারের প্রচেষ্টা করেন।[2] অবশ্য অনিরুদ্ধও জগতের হিত করেন।[3] তিনি স্বয়ং জীবগণকে স্বীয় রূপে প্রাদুর্ভূত করেন ("স্বেন রূপেণ···তান্ প্রাদুর্ভাবয়তি স্বয়ম্)"।[4] অনিরুদ্ধ জীবগণকে তাহাদের ক্রিয়ার্জিত ফলসমূহ প্রদান করেন।[5] 'সাত্বতসংহিতা'য়ও প্রদ্যুম্নকে 'হৃষীকেশ' বলা হইয়াছে।[6] ব্যূহের ধার্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মত[7] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতের ন্যায়। তবে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, 'বিম্বক্‌সেনসংহিতা'র মতের ন্যায়, সঙ্কর্ষণ জ্ঞানগুণ দ্বারা শাস্ত্র প্রবর্তন করেন, আর 'লক্ষ্মীতন্ত্রে'র মতে তিনি বলগুণ দ্বারা ঐ কর্ম করেন।

নারায়ণীয়াখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে যে (১) সঙ্কর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার, তথা (২) সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হয় এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে'ও ভাগবতধর্মের সমালোচনায় উক্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে।[8] তাহাতে মনে হয় যে উহা ভাগবতধর্মের এক অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত। পরন্তু পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে উহার প্রথমাংশ যথাযথ দেখা যায় না,—এক প্রকার পরিত্যক্ত কিংবা পরিবর্তিত হইয়াছিল। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে যে সমস্ত জীব সঙ্কর্ষণে স্থিত;[9] প্রদ্যুম্ন হৃষীকেশ বা "জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্তর্নিয়ামক", বা 'চেতন জীববর্গের পতি'।[10] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' আছে যে সঙ্কর্ষণদেব অহংমানী; প্রদ্যুম্ন তাঁহার "বুদ্ধিবৎ বর্তমান আছেন"; এবং অনিরুদ্ধ তাঁহার অহঙ্কাররূপে স্থিত।[11] "সঙ্কর্ষণাদি এই তিন পুরাতন দেব (যথাক্রমে) জীব, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার নামে প্রকীর্তিত হন। পরন্তু উঁহারা নিশ্চয় প্রাকৃত দেব নহেন, শুদ্ধচিদাত্মকই। আদিব্যূহ বাসুদেব দেবের দিব্যতা তত্তৎকার্যকরত্ব হেতু তত্তৎ নামে নিরূপিত হয়।"[12] 'বিম্বক্‌সেনসংহিতা'র মতে সঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবগণের অধিষ্ঠাতা ("সোঽয়ং সমস্তজীবানামধিষ্ঠাতৃতয়া স্থিতঃ"),—জীব নহেন; আর প্রদ্যুম্ন মনের অধিষ্ঠাতা ও মনোময় ("মনসোঽয়মধিষ্ঠাতা মনোময় ইতীরিতঃ")।[13] অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে উহাতে সেই প্রকার কোন উক্তি নাই মনে হয়।[14] শ্রেডার বলেন, তথাপি উক্ত সংহিতাতে অনিরুদ্ধকে "মিশ্রবর্গে"র অর্থাৎ রজ ও তম গুণ প্রভাবিত মনুষ্যবর্গের স্রষ্টা বলিয়া ঘোষিত হওয়াতে বুঝা যায় যে উহার রচয়িতা তাঁহাকে কার্যতঃ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিতেন।[15] কোন কোন সংহিতার মতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ যথাক্রমে

---

১) ঐ, ৫৫।১৮.২
২) ঐ, ৫৯।৩২.১
৩) ঐ, ৫৩।৫৬.১
৪) ঐ, ৫৩।৬৬
৫) ঐ, ৫৯।৩৪
৬) সাত্বতসং, ৭।২৭
৭) লক্ষ্মীতন্ত্র, ৪।১৫—২০
৮) ব্রহ্মসূত্র, ২।২।৪২—; পরে দেখ।
৯) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৪।৪০.১
১০) ঐ, ৫৩।৪১.২—৪২.১, ৪৬.২—৪৭
১১) লক্ষ্মীতন্ত্র, ৬।৬—১২.১
১২) ঐ, ৬।১২.২—৪
১৩) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য' ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা
১৪) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্যে' বর্বরমুনি 'বিম্বক্‌সেনসংহিতা' হইতে সেই রকমের কোন বচন অনুবাদ করেন নাই বলিয়াই আমরা এই প্রকার অনুমান করিতেছি।
১৫) Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. 40

আকাশ, তেজ, জল ও বায়ুতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা।[১] 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে যে পরমেশ্বর ত্রৈগুণ্য-সাম্যরূপ অব্যক্তে,—তদভিমানিরূপে স্থিত; চতুর্মূর্তি অব্যক্তে বুদ্ধিতত্ত্বে স্থিত; কেশবাদি মূর্ত্যন্তরগণ অব্যক্ত অহঙ্কারে সমাশ্রিত; হংসাদি ছয় অবতার মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করত স্থিত; ইত্যাদি।[২] রামানুজ লিখিয়াছেন, পঞ্চরাত্র মতে, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ যথাক্রমে জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা; এবং সেই হেতু উহারা কখন কখন জীব, মন ও অহঙ্কার নামে যথাক্রমে অভিহিত হইয়া থাকে।[৩] তাঁহার পূর্বে যামুনও সেই কথা বলিয়াছেন।[৪] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে যে অনিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর।[৫] পরে আছে, বাসুদেব শান্ত, কূটস্থ ও স্বপ্রকাশ, তথা ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মা; সঙ্কর্ষণ সূক্ষ্ম ও দুরন্ত অন্তক; প্রদ্যুম্ন বিশ্বপ্রবোধ অন্তরাত্মা; আর অনিরুদ্ধ হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মা।[৬]

এবার আমরা ব্যূহত্রয়ের উৎপত্তি এবং উহাদের সৃষ্টিকর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। 'বিষ্বক্সেনসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ বাসুদেব নিজে নিজেই পর পর সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ হন। "ভগবান্ (বাসুদেব) হইতে পঞ্চায়ুধপরিস্কৃত (পুরুষ) আবির্ভূত হন। তদেকান্তবপুধর তিনি (বাসুদেব) এই সঙ্কর্ষণাখ্য হন। তিনি (সঙ্কর্ষণ) অমলরুক্মাভ বলিয়া সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। (অনন্তর) তদেকান্তবপুধর তিনি প্রদ্যুম্ননামা হন। তিনি (প্রদ্যুম্ন) ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশ বলিয়া শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত হইয়াছেন। হে মুনে, অনন্তর তদেকান্তবপুধর তিনি নিজে নিজেই ('স্বয়মেব') অনিরুদ্ধনামক হন। (উনি) তাদাত্মিক-ঘনপ্রভ।"[৭] পরে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে যে "দেবেশ সঙ্কর্ষণ অনন্তর জগৎ সৃষ্টি করিতে মন করিয়া (প্রলয়ে প্রকৃতিতে প্রলীন) জীবতত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া উহাতে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করেন।[৮] বিবিক্তিকরণের পর সেই দেব প্রদ্যুম্নত্ব প্রাপ্ত হন ('প্রদ্যুম্নত্বমবাপ')।"[৯] "জগৎপতি (প্রদ্যুম্ন আপন) মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণাদির সর্গদ্বার চারি মনুর সর্গ করেন। ব্রাহ্মণমিথুন, ক্ষত্রমিথুন, বৈশ্যমিথুন এবং চতুর্থের (শূদ্রের) মিথুন,—ইহারাই মনুচতুষ্টয়। মনুগণ হইতে স্ত্রী ও পুরুষের মৈথুন দ্বারা শত শত মানব উৎপন্ন হয়। উহাদের হইতে সেই প্রকারে স্ত্রীপুরুষমৈথুন দ্বারা এক এক বর্ণভেদে সহস্র সহস্র মানবমানব উৎপন্ন হয়। অনন্তর উহাদের হইতে মনুষ্যগণ (জন্মগ্রহণ করে)। (ইহারা সকলে) বীতমৎসর হইল। কেননা, ইহারা শুদ্ধসত্ত্বস্থ এবং আমরণ অনন্যযাজী (অর্থাৎ বাসুদেব ব্যতীত অপর কাহারও যজন করে না)। নিষ্কামভাবে কর্ম করে বলিয়া তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ত্রয্যন্তসমূহে নিষ্ণাত এবং

---

১) পাদ্মসং, ২; শ্রীপ্রশ্নসং, ৩।৭৫—৮৬

২) পৌষ্করসং, ৩৬।২৭৪.৭—

৩) 'শ্রীভাষ্য', ২।২।৪১

৪) 'আগমপ্রামাণ্য', ৫৫ পৃষ্ঠা।

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।২৬।২৮

৬) ঐ, ৪।২৪।৩৪—৬

৭) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য' ১০৩ পৃষ্ঠা

৮) "প্রকৃতৌ লীনং জীবতত্ত্বমধিষ্ঠায় তেনাধিষ্ঠানবিশেষেণ তৎপ্রকৃতের্নামরূপবিশেষো যথা ভাসতে, তথা বিবিচ্য" (বর্বরমুনি)

৯) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১০৪ পৃষ্ঠা

দ্বাদশাধ্যাত্মচিন্তক[1] তাহারা সতত জগৎপতির ব্যূহসমূহের অনুবৃত্তি করে। ঐ পুরুষর্ষভগণ স্বয়ং তৃতীয় জগদ্ধাতা (=প্রদ্যুম্ন) কর্তৃক সঙ্কল্পবলে ('মনসা') নির্মিত এবং গুণপ্রধানযোগে নিষ্ঠিত। ইহা শুদ্ধবর্গ।”[2] “অনন্তর (অনিরুদ্ধ) ত্রুট্যাদিদ্বিপরার্ধ পর্য্যন্ত কাল সৃষ্টি করেন।” “এই তুরীয় জগন্নাথ পুন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে সেই স্বয়ম্ভু কর্তৃক সৃষ্ট, চতুর্বিধ ভূতসর্গ উৎপন্ন হয়। তথা ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ রজঃপ্রাচুর্যযুক্ত হয়। ত্রয়ীমার্গসমূহে নিষ্ণাত তাহারা ফলবাদে রমণ করে। তাহারা দেবাদিকেই মানে, (উহাদের হইতে) পর আমাকে মানে না। অধিকন্তু তাহাদের কেহ কেহ তমঃপ্রায় হইয়া আমার নিন্দা করে। আরাধ্য এবং নিয়ন্তাকে না জানিয়াও (তাঁহার বিষয়) পরস্পরে ব্যগ্রভাবে সংলাপ করে। বেদবাদসমূহে নিষ্ঠিত তাহারা মোহবশতঃ আমাকে জানে না এবং আমার ভক্তিতে পরাঙ্মুখ হয়। উহারা স্বর্গাদিতে রমণ করে এবং (তথাকার ভোগের) অবসানে (এই পৃথিবীতে) পতিত হয়। হে মহাভাগ, কামাত্মা এবং জরা-মরণযোগী ঐ সকল দ্বিজগণ মোহবশতঃ নিশ্চয় এই সংসারবর্ত্মে বিচরণ করে (তথা হইতে মুক্ত হইতে পারে না)। ইহা মিশ্রসর্গ (অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ গুণ মিশ্রিত মনুষ্যবর্গের সৃষ্টি)।”[3] ভগবান্ সর্বজ্ঞ হইয়াও শুদ্ধসৃষ্টি ব্যতীত মিশ্রসৃষ্টিও কেন করেন? তাহাতে কি তাঁহাকে নির্দয় মনে হয় না? গণনাথ বিষ্বক্সেন কর্তৃক ঐ প্রকারে পৃষ্ট হইয়া ভগবান্ স্বয়ং বলেন, “হে গণনাথ, শুদ্ধসর্গ ব্যতীত মিশ্রসর্গেরও কারণ তুমি শোন। সর্বজ্ঞ আমি দয়ালু, নির্দয় নহি। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি আমি (মিশ্রবর্গ) সৃষ্টি করি। অনাদ্যবিদ্যাসংসৃষ্টবুদ্ধিসংযুক্ত নরগণকে দেখিয়া, তথা তাহাদের অজ্ঞানসঙ্গ, বিহিতাকরণ এবং নিষিদ্ধকরণ অপরাধসমূহ দেখিয়া, আমি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দ্বারা

---

১) “দ্বাদশাক্ষরীমুখেনাধ্যাত্মচিন্তকান্” (বর্বরমুনি) 'ত্রিপাদবিভূতিমহানারায়ণোপনিষদে' পাঁচটি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রের উল্লেখ আছে,—নারায়ণের (“ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়”), বাসুদেবের (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়), মহাবিষ্ণুর (ওঁ নমো ভগবতে মহাবিষ্ণবে), রামের (ওঁ হ্রীং ভরতাগ্রজ রাম ক্লীং স্বাহা) এবং কৃষ্ণের (শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ)। ঐখানে বাসুদেবমন্ত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বোধ হয়।

২) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১০৫

এই বচনে প্রদ্যুম্ন হইতে উৎপন্ন, তাঁহার মানসজাত (নির্মিতা মনসা স্বয়ম্”) শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান আদি মিথুনচতুষ্টয়কে “মনুচতুষ্টয়”, “চারি মনু” বলা হইয়াছে এবং আরও কথিত হইয়াছে যে উহাদের হইতেই “শ্রীপুংমিথুনতঃ” শুদ্ধসত্ত্বস্থ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সমস্ত মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। 'গীতা'য় ভগবান্ হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার মানসজাত (“মদ্ভাবা মানসজাতা”) চারি মনু (“চত্বারো মনবঃ”), তথা সাত মহর্ষির, উল্লেখ আছে, যাঁহাদের হইতে উক্ত ইহলোকের সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে (“যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ”)। (গীতা ১০।৬) চারি মনু কে কে, তাহা লইয়া 'গীতা'র টীকাকারদিগের, তথা আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, সমালোচকদিগের, নানা জনে নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন। শ্রেডার বলেন, উঁহারা 'বিষ্বক্সেনসংহিতো'ক্ত “মনুচতুষ্টয়” বলিয়া বোধ হয়। (Introduction to the Pancaratra, ৬১ পৃষ্ঠার ২য় পাদটিকা)। এই অনুমান নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, 'বিষ্বক্সেনসংহিতা' অপেক্ষা প্রাচীন 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় প্রদ্যুম্ন সৃষ্ট এক এক মিথুনকে দুই মনু বলা হইয়াছে। সুতরাং উহার মতে মনু আট, চার নহে। (পরে দেখ। 'বায়ুপুরাণে' আছে, চারিবর্ণের সংস্থাপক চারি মনু প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সুব্রতার পুত্র। উঁহারা 'সাবর্ণ মনু' বলিয়া খ্যাত হন। (বায়ুপু, ১০০।৪২—)

৩) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য, ১০৬ পৃষ্ঠা

ঐ প্রকারে মিশ্রসর্গ করি এবং সুকৃতলেশ হেতু আমি শুদ্ধসর্গ করি। এই শুদ্ধসর্গ মনুপ্রমুখসর্গ বলিয়া মৎকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। (উহারা) সকলে শুদ্ধ সত্ত্বময় ও সদা মদ্ভক্তিনিরত। সকলে মমার্চনপর ও মদ্ধ্যানপরিবৃংহিত। হে মহামুনি, (সেই সকল) মহাভাগ এবং জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ পরম ভক্তিসহকারে এবং প্রপত্তিসহকারে আমাকে নমস্কার করে। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাতে থাকিয়া অব্যয় তাহারা (ইহ সংসারে) নিবর্তন করে না। সমস্ত মনুষ্যগণ মুমুক্ষু হইয়া ঐ প্রকার করিলে মহান্ সৃষ্টিক্ষয় হইবে,—নরকসমূহ তৃণাবৃত হইবে। ইহা জানিয়া আমি লীলাবশতঃ মিশ্রসৃষ্টি করি।"[1]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় আছে যে প্রদ্যুম্ন হইতে মনু উৎপন্ন হয়। পরন্তু উহার মতে মনু চার নহে, আট। কথিত হইয়াছে যে প্রদ্যুম্নের মুখ হইতে, তাঁহার সঙ্কল্প দ্বারা চোদিত ("স্বসঙ্কল্পেন চোদিতং") ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মিথুন উৎপন্ন হয়। উহারা মনুদ্বয়। সেইরূপে তাঁহার বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয় মনুদ্বয়, উরু হইতে বৈশ্য মনুদ্বয় এবং পাদ হইতে শূদ্র মনুদ্বয় উৎপন্ন হয়। ঐ মনুদিগের সমষ্টিকে 'পুরুষ' বলা হয়। সুতরাং "পুরুষ দ্বিচতুর্ময়"। প্রদ্যুম্নের ললাট, ভ্রূ ও কর্ণ হইতে সূক্ষ্মকাল ও গুণসাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। পুরুষ, কাল ও গুণ—এই তিনটি বিষ্ণুর ভূতিশক্তির শুদ্ধেতর স্ফূর্তি। উহার শুদ্ধময়ী স্ফূর্তি ব্যূহ ও বিভব। তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যাহা হউক, পুরুষাদিকে সৃষ্টি করিবার পর প্রদ্যুম্ন উহাদিগকে বৃদ্ধি করিতে অনিরুদ্ধকে আদেশ করেন। অনিরুদ্ধ সেই আদেশ পালন করেন। "যাহার অভ্যন্তরে পুরুষ স্থিত আছে, স্বমূর্তিগা সেই শক্তিকে (=গুণময়ী প্রকৃতিকে) গ্রহণ করত অনিরুদ্ধ স্বীয় তেজবলে যোগ দ্বারা উহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন।" অনিরুদ্ধ হইতে তাঁহার সঙ্কল্প দ্বারা চোদিত হইয়া প্রথমে শক্তি, অনন্তর শক্তি হইতে নিয়তি, পরে নিয়তি হইতে কাল উৎপন্ন হয়। কথিত হইয়াছে পূর্বোক্ত 'মনুগণ' চারিশত মিথুনীভূত 'মানব' সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদের হইতে অসংখ্য 'মানবমানব' উৎপন্ন হয়।[2]

বিশেষ প্রণিধান করিলে উপরের বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে বাসুদেব পর কি ব্যূহ তাহা লইয়া পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে মতভেদ আছে। 'সাত্বতসংহিতা' ও 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' প্রভৃতির মতে বাসুদেব পর, এবং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিনটিই ব্যূহ।[3] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব ব্যূহ নহেন; কেননা, ব্যূহ কালান্তর্গত, আর বাসুদেব কালাতীত। "স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর—কাল এই ত্রিবিধ। (উহা) পরাত্মাতে নাই,—পরব্রহ্ম বাসুদেবকে উহা স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। লবাদিমান কাল 'স্থূল', তত্ত্বনিরূপক (কাল) 'সূক্ষ্ম', আর ব্যূহদিগের চেষ্টিতব্যাপী কাল 'পর' বলিয়া নিরূপিত হয়। ব্যূহত্রয়ের কালবশত সর্বদা কলন হয়। পরন্তু ভগবান্ বাসুদেব ব্যূহ নহেন, (সুতরাং) কালবান্ও নহেন।"[4] যেহেতু ব্যূহত্রয়ের কালে উৎপত্তি ও লয় হয়,[5] সেই হেতু উহারা সৃষ্ট প্রপঞ্চের অন্তর্গত।[6] বাসুদেবকে কখন কখন "আদিব্যূহ" বলা হইয়াছে।[7] তাহাতে মনে

---

১) ঐ, ১০৭—৮ পৃষ্ঠা   ২) অহিবুধ্ন্যসং, ৬।৬—

৩) সাত্বতসং, ১।২৬'২—২৭'১ (পরে দেখ) ; অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।২৫'২—২৬'১ ; ৫৫।২৯

৪) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৩।৯'২—১২ ৫) পূর্বে দেখ। ৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৩।১৯ ৭) ঐ, ১৬।৮১'১ ; ৫৩।৬ ; ৫৫।২২

হয় যে বাসুদেবও ব্যূহ। পরন্তু উহার অর্থ 'আদি বা প্রথম ব্যূহ' নহে, 'ব্যূহের আদি বা মূলকারণ' করা যাইতে পারে।[১] তথাপি নিস্তার পাওয়া যায় না। কেননা, কোথাও কোথাও বাসুদেবাদিকে স্পষ্টতঃ "চতুর্ব্যূহ" বলা হইয়াছে।[২] 'পরমসংহিতা' প্রভৃতিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে বাসুদেবও ব্যূহ। 'বিষ্বক্সেনসংহিতা'য় আছে যে "নিত্যোদিত" ও "শান্তোদিত" ভেদে বাসুদেব দ্বিবিধ। 'নিত্যোদিত' অর্থ 'নিত্য উদিত', সুতরাং উদয়াস্ত বা উৎপত্তি-প্রলয়-রহিত। আর 'শান্তোদিত' অর্থ 'শান্ত ও উদিত', সুতরাং উদয়াস্ত-যুক্ত।

"নিত্যোদিতাৎ সম্বভূব তথা শান্তোদিতো হরিঃ"[৩]

অর্থাৎ শান্তোদিত বাসুদেব নিত্যোদিত বাসুদেব হইতে সমুৎপন্ন হয়। নিত্যোদিত বাসুদেব পর বাসুদেব, আর শান্তোদিত বাসুদেব ব্যূহ বাসুদেব। কথিত হইয়াছে যে নিত্যোদিত বাসুদেব আদিদেব; তিনি ষড়্‌গুণ, শান্ততনু, চতুর্ভুজ, শ্যামলাঙ্গ এবং পরম ব্যোমে নিষ্ঠিত; শান্তোদিতও শান্ততনু, পরন্তু দ্বিভুজ পুরুষাকৃতি।[৪] 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেবের দুই ভেদ।[৫] পর বাসুদেব পরমতত্ত্ব। তাঁহা হইতে তত্ত্বতঃ পর কিছুই নাই। তিনি সদোদিত। তদ্ব্যতীত অপর সমস্তই, এমন কি বাসুদেবাদি-অনিরুদ্ধান্ত চতুর্ব্যূহও সদ্বিরূপ এবং প্রভবাপ্যয়াত্মক।[৬] নিত্যোদিত পরমতত্ত্ব "সুসূক্ষ্ম"।[৭] উহা সংশান্তপরমানন্দ, অনৌপম্য এবং অতীন্দ্রিয় বলিয়া সমুদ্দিষ্ট।[৮] উহা কালাতীত—কাল উহাতে লব্ধগোচর হয় না। "নিত্যোদিতত্ব, নিত্যত্ব, ব্যাপকত্ব, পূর্ণত্ব এবং ষড়্‌গুণত্ব হেতু পরম পদে কাল লব্ধগোচর হয় না।"[৯] সর্ববস্তুর ভেদকারী কালতান উহা হইতে প্রবৃত্ত হয়।[১০] সূক্ষ্মসংজ্ঞক ব্যূহ উহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহাতেই লয় পায়।[১১] 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতেও এক বাসুদেব কখন শান্ত থাকেন, এবং কখন ক্ষুভিত হইয়া সৃষ্টি করেন, আর দ্বিতীয় বাসুদেব,—যাঁহাকে "অব্যয় বাসুদেব" বা "পরব্রহ্ম" বলা হইয়াছে এবং যিনি পরমতত্ত্ব, তিনি কূটস্থ নিত্য,—"অক্ষর এবং অক্ষোভ্য"।[১২] পরবর্তী সংহিতাসমূহের পরিভাষায় এই বাসুদেব 'পর বাসুদেব', আর প্রথমোক্ত বাসুদেব ব্যূহ বাসুদেব। 'অহিবুর্ধ্ন্যসংহিতা'য় পরব্রহ্মকে বা বাসুদেবকে, তথা উৎপন্ন ব্যূহগণকেও "নিত্যোদিত" বলা হইয়াছে।[১৩] তাহা অবশ্যই সমীচীন হয় নাই। 'বিষ্ণুতিলকসংহিতা'য়ও দুই বাসুদেবের উল্লেখ আছে,—এক ব্যূহ বাসুদেব, অপর তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ। পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম তদুভয় অপেক্ষা পর।[১৪] পরবর্তী পাঞ্চরাত্রবাদীদিগের মধ্যে যামুন ও রামানুজ চতুর্ব্যূহবাদী, আর লোকাচার্য ত্রিব্যূহবাদী। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র

---

১) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১১১ পৃষ্ঠা

২) দেখ—"ব্যূহত্রিতয়পূর্বত্বাৎ প্রধানং পরিপঠ্যতে।" (ঐ, ৫৩।১৮·১)

৩) "চতুর্ভিরক্ষরৈরেবং চতুর্ব্যূহনিরূপণম্"—(ঐ, ৫২।৭৬·২) পরে দেখ।

৪) ঐ, ১১৩—৪ পৃষ্ঠা। ৫) পৌষ্করসং, ৩৮।২০৪·১

৬) ঐ, ২০।৬৩—৫ ৭) ঐ, ২০।৭২ ৮) ঐ, ২০।৭৬

৯) ঐ, ২২।২৫ ১০) ঐ, ২২।২৩—৪ ১১) ঐ, ২০।৭৭

১২) পূর্বে দেখ ১৩) অহিবুর্ধ্ন্যসং ২।২৫ ও ৯।৩১ দেখ।

১৪) বিষ্ণুতিলকসং, ২।৫—(পূর্বে দেখ)।

'রামানুজদর্শনে' ধৃত একটা বচনেও ব্যূহ বাসুদেবাদিচতুষ্টয়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'ও চতুর্ব্যূহবাদী।[১]

'পাদ্মসংহিতা'য় তিন বাসুদেবের উল্লেখ আছে। আদি বাসুদেব একমুখ ও দ্বিভুজ। তিনি শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ এবং সহস্র রবির বা লক্ষকোটি চন্দ্রের সমান প্রভাশালী। তিনি শঙ্খ, চক্র, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ প্রভৃতি ধারণ করেন এবং পীতাম্বরধর। তিনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ, সৌম্যরূপ এবং অনাময়। তাঁহার মুখ হইতেই সমস্ত সৃষ্ট হয়। তিনি যোগিগণ কর্তৃক নিত্য হৃদয়াকাশে ধ্যেয় এবং সূরিগণ তাঁহাকেই নিত্য দর্শন করেন।[২] ঐ আদ্য বাসুদেব হইতে অপর এক বাসুদেব উৎপন্ন হন,—যিনি একমুখ ও চতুর্ভুজ। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। জগতের সৃষ্ট্যর্থ তিনি পদ্ম ধারণ করেন; রক্ষার্থ তিনি চক্র ধারণ করেন এবং সংহারার্থ গদা ধারণ করেন। জীবকে মুক্তিপ্রদানার্থ তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধারণ করেন।[৩] তিনি ময়ূরকণ্ঠবৎ শ্যাম এবং পীতাম্বরধর। তিনি শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, প্রভৃতিও ধারণ করেন। এই (অপর বা দ্বিতীয়) বাসুদেব আবার কোন হেতুতে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন—এক বাসুদেব,—যিনি শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ, অপর নারায়ণ—যিনি নীলাম্বুদসমপ্রভ। এই (তৃতীয়) বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। এই চারি মূর্তির সকলেই চতুর্ভুজ। বাসুদেবের জ্ঞানাদি ষড়্‌গুণ সমভাবে বর্তমান,—"জ্ঞানাদিগুণসামান্যো বাসুদেবঃ প্রকীর্তিতঃ ('জ্ঞানাদিগুণ-সামান্য বাসুদেব বলিয়া প্রকীর্তিত হয়।') উহাদের বৈষম্যে ক্রমে তিন মূর্তি নির্গত হয়। জ্ঞানাধিক সঙ্কর্ষণ, বলাধিক প্রদ্যুম্ন এবং ঐশ্বর্যাধিক অনিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয়।[৪] এই বিবরণ 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় উদ্ধৃত হইয়াছে।[৫] ইহা বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, 'পাদ্মসংহিতা'র মতে, আদি বাসুদেব পরমতত্ত্ব নহেন। কেননা, তিনি জাত। বিজ্ঞান বা ভগবজ্‌-জ্ঞানই, তন্মতে, পরমতত্ত্ব। উহা "আদিমধ্যান্তরহিত, বৃদ্ধি, ক্ষয় (প্রভৃতি) রহিত, অচ্যুত এবং অব্যয়। উহা নিত্য, নিরূপম জ্যোতি, নিত্যতৃপ্ত ও নিরঞ্জন; সর্বাকার ও নিরাকার; এবং তমের পর।" ঐ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। কোন কারণবশত তাহা হইতে (আদ্য) বাসুদেব আবির্ভূত হন।[৬] পরে বিবৃত হইয়াছে যে "অনাদি বাসুদেব", "বিভবাখ্য বাসুদেব" ও "ব্যূহাখ্য বাসুদেব"—এই তিন বাসুদেবের, তথা সঙ্কর্ষণের, প্রদ্যুম্নের ও অনিরুদ্ধের, লোক ভিন্ন ভিন্ন। কথিত হইয়াছে যে অনাদি বাসুদেব শ্রীদেবী ও ভূদেবীকে সঙ্গে লইয়া মণিমণ্ডপে দিব্য শেষভোগাসনে শোভা পাইতেছেন। ব্যাপ্ত্যাদি অষ্ট শক্তি চারিদিকে অন্তিকে থাকিয়া বালব্যজন হাতে লইয়া তাঁহার সেবা করেন। সেনেশাদি পারিষদগণ এবং চক্রাদি আয়ুধগণও তাঁহার সেবায় উপস্থিত থাকেন। যেই সকল পঞ্চকালজ্ঞ এবং দ্বাদশাক্ষরচিন্তক মুক্ত ও সিদ্ধ

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।১১।২১

২) "পশ্যন্তি সূরয়ঃ শশ্বত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"—(পাদ্মসং ১।২।১২·১)

৩) ঐ, ১।২।১৩·২-১৪·১ 'পরমসংহিতা'য় সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (পূর্বে পাদটীকা দেখ) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।১০১·২-১০২·১

৪) ঐ, ১।২।৮·২-২০·১

৫) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।৯৬·২-১১১

৬) পাদ্মসং, ১।২।৬-৮·১

পুরুষ তাঁহার সামীপ্যাদিপদে অবস্থিত এবং তাঁহার কিঙ্করতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সতত প্রণামাদি দ্বারা তাঁহার সেবায় ও উপাসনায় রত থাকেন। ইত্যাদি।[১]

পরের সহিত ব্যূহের সম্পর্ক, 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে, ভেদাভেদ। নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে। এক স্থলে আছে, চিনির নানাপ্রকার খেলনার সঙ্গে চিনির যে সম্পর্ক ব্যূহের সহিত পরের সেই সম্পর্ক।[২] অন্যত্র আছে "ভগবান্ বাসুদেব পর (ব্রহ্ম) পরমাত্মার (জীবের প্রতি) অনুগ্রহার্থ জ্ঞানকর্মসমন্বিত উল্লাস।"[৩] "নির্ধূম অগ্নির শুভ্র অর্চিসমূহের ন্যায় সমুদ্রের ঊর্মিসমূহের এবং সূর্যের রশ্মিসমূহের ন্যায় পরমেশ্বরের ঐ উল্লাস (তাঁহা হইতে) অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞেয়।"[৪] কিঞ্চিৎ পরে আবার উক্ত হইয়াছে যে "জ্বালা যেমন অগ্নির সহিত, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের সহিত, প্রভা যেমন সূর্যের সহিত অভেদে থাকে, পরব্রহ্মের বাসুদেবাখ্য নিত্য, ব্যাপক এবং অমল মূর্তি (তাঁহার সহিত) তেমনই অভেদে থাকে।"[৫] সঙ্কর্ষণাদি সম্বন্ধেও সেই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। মূল কথা এই যে বাসুদেবাদি পরব্রহ্মের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ। পরন্তু ঐ অভেদ আত্যন্তিক নহে। উহাদের সম্বন্ধ প্রকৃত পক্ষে ভেদাভেদ। সুতরাং পর ও ব্যূহের সম্বন্ধও ভেদাভেদ। পরব্রহ্মও কখন কখন বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ("সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্")।[৬] তাঁহার উল্লাস বাসুদেব হইতে পার্থক্য করিতে বলিতে হইবে যে উনি পর বাসুদেব বা আদি বাসুদেব। তখন উল্লাস বাসুদেব হইবে ব্যূহ বাসুদেব কিংবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় বাসুদেব। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় সেই প্রকারে ব্যূহকে প্রভা বা শক্তি বলা হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ সূর্যের প্রভার ন্যায় বাসুদেবের প্রভা কিংবা শক্তি। সেইপ্রকারে প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণের এবং অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নের প্রভা বা শক্তি।[৭] আবার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে যিনি বাসুদেব, তিনিই সঙ্কর্ষণ ; যিনি সঙ্কর্ষণ, তিনিই প্রদ্যুম্ন ; এবং যিনি প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ ; তাঁহাদের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে। 'বাসুদেব' শব্দের চারি অক্ষরের মধ্যে এই পরার্থ নিহিত আছে নাকি। "বকার দ্বারা অমৃতাধার বাসুদেব নিরূপিত হন এবং আকার দ্বারা আদিদেব সঙ্কর্ষণ উদ্গীরিত হন। 'যিনি সনাতন মোক্ষাধার ভগবান্ বাসুদেব, তিনিই সঙ্কর্ষণ'—বাকারের অর্থ ইহাই বলিয়া নিরূপিত হয়। যেই সনাতন পুরুষোত্তম (সৃষ্টির) আদিতে ভুবন কর্ম প্রসব করেন ('অসূয়ত'), তিনি উদিত সোম। সেইহেতু (তিনি) প্রদ্যুম্ন (বলিয়া কথিত হন)। এইখানে উদ্গম বা উদয় সঙ্কর্ষণ বলিয়া উদ্গীরিত হন। কেননা, সঙ্কর্ষণ দশায় হরির সম্পূর্ণ উদয় হয়। 'যিনি বাসুদেবাত্মক (বা বাসুদেবস্বরূপ) তিনিই সঙ্কর্ষণ বলিয়া কথিত হন ; আবার তিনিই প্রদ্যুম্ন'—সুকারের অর্থ—ইহাই বলিয়া নিরূপিত হয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বৃদ্ধ্যর্থ জলে শয়ান যেই মহাত্মা দ্বারা স্বনাভিকমলোদরে অবকাশ দত্ত হইয়াছিল সেই অনিরুদ্ধ 'দত্তাবকাশ' দৃষ্টিতে, দকারের অর্থ বলিয়া উক্ত হয়। একার দ্বারা জগদ্যোনি প্রদ্যুম্ন পরিপঠিত হন। 'যিনি সঙ্কর্ষণাত্মক, তিনি প্রদ্যুম্ন বলিয়া পরিকীর্তিত

---

[১] ঐ, ১।১২।৬৪—বৃহদ্ব্রহ্মসং, ২।৭।১৩৭—

[২] পৌষ্করসং, ২৭।৬৭৮-৬৮২ [৩] ঐ, ৩৮।১৬২.২— [৪] ঐ, ৩৮।১৬৫-১৬৬·১

[৫] ঐ, ৩৮।১৯২-১৯৩·১

[৬] পৌষ্করসং, ৩৮।৩০৬·১ [৭] অহির্বুধ্ন্যসং ৫।৩০—(পূর্বে দেখ)

হন এবং তিনি অনিরুদ্ধ'—দেকারের অর্থ এই প্রকার বলিয়া নিরূপিত হয়। এইরূপে বর্ণত্রয় দ্বারা উত্তম ব্যূহতাদাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। উপসংহাররূপে উহা পুনঃ 'ব' বলিয়া উক্ত হয়।"[১] পরে আছে, বাসুদেব পরা প্রকৃতি ; সঙ্কর্ষণাদিভূম্যন্ত অশেষ ভুবনকে তিনি আধারভাবে ধারণ করেন এবং স্বয়ং উহার অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত আছেন।[২] সুতরাং ব্যূহ সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহের, তথা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের, সহিত বাসুদেবের প্রকৃতি-বিকৃতি বা আধার-আধেয় ভাব। 'সাত্বত-সংহিতা'য় ঐ বিষয়ে নানাপ্রকার মত দেখা যায়। পরের সহিত একমূর্তি শান্তোদিত ব্যূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে উহাতে সূর্য ও প্রভার এবং সমুদ্র ও তরঙ্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। স্বপ্নব্যূহে চতুর্মূর্তিভবন সম্বন্ধে স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে যেমন একই আত্মা স্বপ্নে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমন একই পরমাত্মা বাসুদেবাদি চতুরাত্মারূপে প্রতীতিগোচর হন। ঐ বিষয়ে বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। যেমন একই সূর্য বহু জলাধারে বহু বলিয়া দৃষ্ট হয়, তেমন একই পরমাত্মা আশ্রয়ভেদে চতুরাত্মা হন। পরে অধ্যাসের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিক নানা বর্ণের উপাধির সংযোগে নানা বর্ণবান্ বলিয়া প্রতীতিগোচর হয়, তেমন একই বিশুদ্ধ পরমতত্ত্ব উপাধিভেদে নানা প্রকার চতুর্ব্যূহ হন।[৩]

'পাদ্মসংহিতা'র মতে আদি বাসুদেব দ্বিভুজ। 'সাত্বতসংহিতা'[৪] এবং 'পৌষ্করসংহিতা'র[৫] মতেও পরবাসুদেব দ্বিভুজ। বেঙ্কটনাথ কর্তৃক ধৃত বচন হইতে দেখা যায় 'সৌমন্তবসংহিতা', 'ভারদ্বাজসংহিতা' এবং 'সঙ্কর্ষণসংহিতা'র মতও তাহাই।[৬] তাই কোন কোন পাঞ্চরাত্রিক আচার্য মনে করেন যে পরবাসুদেব দ্বিভুজ বলিয়া সিদ্ধ হয়। পরন্তু বেঙ্কটনাথ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বহু সংহিতাতে পরবাসুদেবকে চতুর্ভুজ বলাতে, তাঁহার চতুর্ভুজত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা হউক, তাহাতে অন্ততঃ ইহা সিদ্ধ হয় যে পরবাসুদেব দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ সেই বিষয়ে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের, তথা তদনুযায়ী আচার্যগণের, মধ্যে মতভেদ আছে। যামুন চতুর্ভুজ বলিয়া মানিতেন।[৭]

আর একটা বিষয়ের প্রতি এইখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত মনে করি। 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'দিতে প্রপঞ্চিত চতুর্ব্যূহবাদ মতে সঙ্কর্ষণ জগৎ-সংহার করেন। 'মহাভারতে'ও উক্ত হইয়াছে যে প্রলয়কালে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ নামে প্রোক্ত হন ("ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ")। মহাভারত-পুরাণাদিতে রুদ্রকেই জগতের সংহার-কর্তা বলা হয়। উভয় মতের সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে সঙ্কর্ষণ = রুদ্র। 'পাদ্ম-সংহিতা'য় পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে 'সঙ্কর্ষণ' ভগবান্

---

১) ঐ, ৫২।৭৬-৮৫'১

'ভগবান্' শব্দের চারি অক্ষরে নাকি চারিব্যূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—ভকার বাসুদেব, যিনি ধ্রুব বা জগতের উপাদান ; গকার সঙ্কর্ষণ,—যিনি আদিতে সচ্ছাস্ত্র প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্ত করান ; বকার প্রদ্যুম্ন,—যিনি "ত্রয়ীকর্মোভয়াত্মক বিশ্ব"কে বরণ করেন বা করান ; আর ন-কার অনিরুদ্ধ,—যিনি বিশ্বকে স্বনাভিকমলোদরে ধারণ করেন এবং তথা হইতে সৃষ্টি ও তথায় সংহার করেন। (ঐ, ৫২।৭১-৭৬'১।

২) ঐ, ৫৩।১২-২৫'. ৩) পরে দেখ। ৪) পরে দেখ। ৫) পৌষ্করসং,

৬) বেঙ্কটনাথের 'স্তোত্ররত্নভাষ্য', ৩৩ শ্লোক (গ্রন্থাবলী, ৭১-২ পৃষ্ঠা)

৭) স্তোত্ররত্ন, ৩৩ শ্লোক।

রুদ্রেরই নাম ; কল্পান্তে তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে প্রকৃতিতে সংহার বা বিলয় করেন ;[১] "সঙ্কর্ষণঃ শিবঃ"।[২] 'মহাসনৎকুমারসংহিতা'য়ও সেই প্রকার বলা হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণ = শিব।[৩] পরন্তু পুরাণে ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার উক্তিও আছে। যথা, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে রুদ্র সঙ্কর্ষণ হইতে উৎপন্ন ;[৪] সঙ্কর্ষণ রুদ্রের প্রকৃতি।[৫] 'পদ্মপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে যে রুদ্র সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণের অংশে সংহারার্থ উৎপন্ন হন।[৬] 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে'র মতে সঙ্কর্ষণ রুদ্রমূর্তি।[৭] ব্যূহবাদ মতে, সঙ্কর্ষণ "জ্ঞানমূর্তি",—জ্ঞান, তথা বল সম্পন্ন,—তাঁহাতে ঐ দুই গুণ কার্যবশতঃ সমধিক স্ফুট। যেহেতু রুদ্র = সঙ্কর্ষণ, সেইহেতু রুদ্রও জ্ঞানমূর্তি। তাই 'পরমসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "জ্ঞানার্থং রুদ্রমর্চয়েৎ" ('জ্ঞানলাভার্থ রুদ্রকে অর্চনা করিবে')।[৮] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র প্রারম্ভে নারদ-কৃত অহির্বুধ্ন্যের স্তুতিতে আছে যে তিনি জ্ঞানরূপ, বৈরাগ্য-বারিধি এবং ঐশ্বর্যপূর্ণ।[৯] সুতরাং তিনি একাধারে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। ঐখানে অহির্বুধ্ন্যকে জগতের সৃষ্ট্যাদিকর্তা এবং সর্বাত্মক ব'লিয়া স্তুতি করিয়াছেন।[১০] সুতরাং তাঁহাকে সঙ্কর্ষণাদি বলা ঠিকই হইয়াছে। 'বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা'র মতে "রুদ্র সঙ্কর্ষণাংশজ"।[১১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু বা কপর্দী সঙ্কর্ষণাংশ হইতে উৎপন্ন।[১২]

পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে বেদান্তে, সাংখ্যে এবং পুরাণে পরিকল্পিত বিভিন্ন সৃষ্টি-প্রক্রিয়াসমূহের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা প্রাচীন ভাগবতধর্মে হইয়াছিল এবং তাহা হইতে স্রষ্টা ব্রহ্মের নানা ব্যূহের বা রূপের সম্ভাব পরিকল্পিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে বা পরিস্থিতির মধ্যে সম্ভূত বিভিন্ন চিন্তাধারাসমূহের সমন্বয় সাধন অতীব দুষ্কর। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই ভাগবতধর্মের সঙ্কর্ষণাদি সংজ্ঞার অপরাপর শাস্ত্রের সংজ্ঞাসমূহের সহিত সমীকরণ সম্বন্ধে নানা মতভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপূর্বে ব্যূহের সংখ্যা সম্বন্ধে ভাগবতধর্মীদিগের মধ্যে মতান্তর হইয়াছিল। 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে তাহার উল্লেখ আছে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে একান্তধর্ম "কোথাও একব্যূহবিভাগ(যুক্ত) বলিয়া দৃষ্ট হয় ; কোথাও দ্বিব্যূহ(যুক্ত) বলিয়া অভিহিত হয়। কোথাও ত্রিব্যূহ সংখ্যাত হয়। আর কোথাও চতুর্ব্যূহ দৃষ্ট হয়। নির্মল এবং নিষ্কল হরিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি সর্বভূতে পঞ্চভূতগুণাতীত জীব।

---

[১] "সঙ্কর্ষণাখ্যো ভগবান্ প্রকৃতাবেব তাঃ প্রজাঃ।
রুদ্রঃ সংহরতি স্বৈরং ব্রহ্মণো দিবসক্ষয়ে॥"—(পাদ্মসং, ১।৮।১৮)

[২] ঐ, ১।১১।১৭

[৩] Schrader, Introduction to the Pancaratra, p. 86.

[৪] (বিষ্ণু)ভাগপু, ৫।১৭।২২

[৫] ঐ, ৫।১৭।১৬

[৬] পূর্বে দেখ।

[৭] বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ২।১০৮।১৯ আরও দেখ—
"যমং সঙ্কর্ষণং বিদ্ধি তামসীং তনুমাশ্রিতম্॥"—(ঐ ৩।৫১।৭'২)

[৮] পরমসং, ১৩।৫৪'১

[৯] অহির্বুধ্ন্যসং, ১।৩৮'২-৩৯'১

[১০] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র অপর এক স্থলেও নারদ অহির্বুধ্ন্যকে সেই প্রকারে সর্বাত্মক বলিয়াছেন। (৩৫।৮৩-৯১১'১)। দেবগুরু বৃহস্পতিও শঙ্করকে "বিশ্বমূর্তি" বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। (৪৩।২৯-৪৩)

[১১] বৃহদ্ব্রহ্মসং ১।২।৮৯'২

[১২] লক্ষ্মীতং, ৫।৮'২-৯

তিনিই পঞ্চেন্দ্রিয়পরিচালক মন বলিয়া প্রথিত হন। তিনি লোকবিধি (অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ) এবং তিনিই লোকস্রষ্টা ইত্যাদি।[১] এইখানে ইহাও বলা বৈশম্পায়নের অভিপ্রায় ছিল মনে হয় যে ঐ মতভেদ বিশেষ দোষের নহে। তবে উহাতে ব্যূহের সংখ্যা কি প্রকারে নির্ণীত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন। সৃষ্ট জগৎ স্রষ্টারই রূপবিশেষ এবং জগৎ আকাশাদিপঞ্চমহাভূতাত্মক—এই দুই বিষয়ে, তথা আকাশ হইতে পরবর্তী সৃষ্টির ক্রম বিষয়ে ভাগবতধর্মিগণের মধ্যে, তথা সাংখ্যমত ব্যতীত, অপর মতসমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। স্রষ্টা ঈশ্বরের সদ্ভাব এবং তাঁহাকে বা তাঁহার শক্তিকে বা তদুৎপন্ন অব্যক্তকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সাংখ্যমতও উহাতে ভিন্ন হয় না। 'মহাভারতে' সাংখ্যমতের যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রকারেরই। সুতরাং ঐ প্রকার সাংখ্যমতের সদ্ভাব কপোলকল্পনা মাত্র নহে। সুতরাং মতভেদ থাকে একমাত্র স্রষ্টার আকাশোৎপত্তি-প্রাক্‌রূপ বা ব্যূহ সম্বন্ধে। নারায়ণীয়াখ্যানে পরমতত্ত্ব বাসুদেবের বা নারায়ণের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি ব্যূহ স্বীকৃত হইয়াছে। অনিরুদ্ধ হইতে আকাশ ক্রমে সৃষ্টি হয় মানিলে, উহা চতুর্ব্যূহ মত হয়। পরন্তু কখন কখন বলা হয় যে অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং তিনি আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি করেন। তখন আকাশোৎপত্তির পূর্বে পাঁচ বস্তুর সদ্ভাব স্বীকৃত হয়। সুতরাং উহাকে পঞ্চব্যূহ মত বলিতে হয়। 'গীতা'য় তিন বস্তুর গণনা আছে—(১) ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ; অথবা (২) অপরা প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি ও পুরুষ বা বাসুদেব; অথবা (৩) প্রকৃতি, পুরুষ ও পরম পুরুষ। উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে,—পরস্পরসংশ্লিষ্ট,—একেরই তিন রূপ। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে'ও ব্রহ্মকে ঐ প্রকারে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে।[২] ঐ সকল হইতে আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি হয় মানিলে, ঐ ভাগবতমত ত্রি-ব্যূহ মত হয়। পরন্তু মহত্তত্ত্বাহঙ্কারাদি সাংখ্যোক্ত ক্রমে সৃষ্টি মানিলে, উহা চতুর্ব্যূহ বা পঞ্চব্যূহ মত হয়। অন্য প্রকারে 'গীতা'য় পরম অব্যক্ত এবং অব্যক্ত—এই রূপদ্বয়ের পরিকল্পনা আছে। বেদান্তশাস্ত্রে সেই প্রকার ব্রহ্মের নির্গুণ ও নির্বিকার এবং সগুণ ও সবিকার বিভাবদ্বয়ের পরিকল্পনা আছে। কোথাও বা ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির[৩] কিংবা ব্রহ্ম ও মায়ার পরিকল্পনা আছে। মায়াবশতই ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ বিভাবদ্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্বিব্যূহ মত। পরন্তু উহাদিগেতে বেদান্তের সৃষ্টিক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতিতে আকাশের পূর্বে একমাত্র পরমাত্মার সদ্ভাবের কথাও আছে। উহা একব্যূহ মত।

প্রকৃত তত্ত্ব এই মনে হয় যে, ব্যূহবাদের উৎপত্তির কথা,—ভগবানের ব্যূহ কল্পনার প্রয়োজন মূলে কেন হইয়াছিল।—সেই কথা লোকে পরে পরে ভুলিয়া গিয়াছিল। কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়[৩] উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ স্বেচ্ছায় পর, ব্যূহ, বিভব, প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছেন।[৩]

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৮।৫৭— ; পূর্বে দেখ।

২) শ্বেতউ, ১।৭-১২

৩) "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥"
—(শ্বেতউ, ৪।১০)

ভগবানের ঐ ইচ্ছা কেন হইল তৎসম্বন্ধেও কল্পনা জল্পনা হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ভক্তগণ আপন আপন অধিকার অনুসারে পরব্যূহাদি ভগবানের রূপসমূহের কোন একটির, জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা, উপাসনা আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপের উপাসনা করিয়া অন্তে পরমতত্ত্ব বাসুদেবকে প্রাপ্ত হয়।[১] নিম্নতর অধিকারীর পক্ষে উচ্চতর সূক্ষ্ম রূপের উপাসনা করা অতীব কঠিন। তাই কল্পিত হইয়াছে যে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই,—যাহাতে তাহারাও যথাবিধি উপাসনা করিয়া ক্রমে ক্রমে পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ স্বেচ্ছায় স্থূল ও স্থূলতর রূপ ধারণ করিয়াছেন। যথা, 'পৌষ্কর-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "কর্ম্মী মনুষ্যগণের প্রতিপত্ত্যর্থ এবং (তন্মূলে উহাদের) উদ্ধারণ-সিদ্ধ্যর্থ—অনাদিনিধন (ভগবান্) অনন্ত স্বয়ং ব্যূহভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[২] লোকানুগ্রহকামনায় প্রবৃত্ত ভগবান্ স্বয়ং স্বচ্ছসৎষড়্‌গুণাত্মা (পর), ব্যূহ ও বিভব রূপ ধারণ করিয়াছেন।[৩] কৃতদীক্ষ ব্যক্তিগণের অখিলতত্ত্বসমূহের শুদ্ধ্যর্থ, নানাসিদ্ধিব্যপেক্ষায় শাশ্বত ভগবানের সাক্ষাৎকরণার্থ, জ্ঞানাবরণশান্ত্যর্থ এবং অপবর্গলাভার্থ-পরমাত্মা শুদ্ধসংবিৎস্বরূপে, এবং চিৎপ্রকাশাত্মক মন্ত্রাত্মারূপে, তথা কর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ব্যূহ ও বিভবরূপে, অবস্থিত আছেন।[৪] 'সাত্বতসংহিতা'র মতে, ভগবান্ বাসুদেব ব্যূহরূপে ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সাধকের ভাবস্থিতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করেন;[৫] পরমধাম-অব্যয় পরব্রহ্ম কর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যদিগের ভাব মোক্ষপ্রদরূপে আকর্ষণ করতঃ ভবদুঃখপ্রশান্ত্যর্থ নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও জাগ্রৎপদে চতুর্ভুজ বাসুদেবাদি চতুরাত্মা-রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন।[৬] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় কথিত হইয়াছে যে "সচ্চিদানন্দলক্ষণ এই চাতুরাত্ম্য-ব্যবস্থিতি জগতের উপকারার্থ এবং (মনুষ্যগণের) মনের আলম্বনার্থ।"[৭] ভূতিশক্তির ব্যূহ-বিভবাত্মিক শুদ্ধময়ী স্ফূর্তিকে অবলম্বন করতঃ যোগিগণ এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হয়;[৮] স্বসমাশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি বাৎসল্যবশতঃই ভগবান্ ব্যূহরূপ বিভূতি প্রকট করেন।[৯] 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় আছে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সিদ্ধ্যর্থ, অনাদিকামকর্ম্মবশে অধঃপতনশীল সাংসারিক মনুষ্যগণের (অনিষ্টাদি নিবৃত্তি করতঃ) রক্ষণার্থ, মুমুক্ষুগণের হিতার্থ, এবং উপাসকদিগকে অনুগ্রহার্থ, ভগবান্ বাসুদেব চারিরূপে অবস্থিত আছেন।[১০] সুতরাং, তখন 'ব্যূহ' ভগবানের রূপকল্পনা মাত্র হইল। মূলে আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বের তত্ত্বের সংখ্যা অনুসারে ব্যূহের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইত। পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়। তখন আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বের তত্ত্বের সঙ্গে ব্যূহের সংখ্যার কোন সম্বন্ধই রহিল না। এই দৃষ্টিতে 'গীতো'ক্ত ভাগবতমত ত্রিব্যূহ মতই। 'গীতা'য় দ্বিব্যূহমতও আছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বাসুদেব পর কি ব্যূহ তাহা লইয়া পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহারা বাসুদেবকে ব্যূহ বলিয়া মনে করে না, অপর কথার পরবাসুদেবও ব্যূহবাসুদেবের ভেদ মানে না, তাহাদের মতে ব্যূহ তিনটি। আর যাহারা ঐ ভেদ মানে তাহাদের মতে ব্যূহ চারিটি।

---

১) পরে দেখ। ২) পৌষ্করসং, ৩৩।১৮·২—১৯·১ ৩) ঐ, ৩২।১০৮

৪) ঐ, ৩৩।৯১-৩; আরও দেখ—৩৩।৮৩-৬ ৫) সাত্বতসং, ৩।১১·২-১২·১ ৬) ঐ, ৭।৩—

৭) অহির্বুধ্ন্যসং ৫।৪৪ ৮) ঐ, ৬।৬·২—৭·১

৯) "স্বসমাশ্রিতবাৎসল্যকৃতব্যূহবিভূতয়ে"—(ঐ, ৪১।২০) 'কৃত' স্থলে 'পর' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১০) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্যে' ধৃত (১০২-৩ পৃষ্ঠা) 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র বচন।

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় আর এক প্রকারের চতুর্ব্যূহ-কল্পনা দেখা যায়। যথা 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্‌ পরমলোক বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক, শ্বেতদ্বীপ, এবং ক্ষীরসাগর—এই চারি স্থলে চারি ব্যূহরূপে আপনাকে প্রকট করিয়াছেন।[১]

পরে পরে সাত্বতশাস্ত্রে ব্যূহ আরও অধিক সংখ্যক বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল। এক মতে ব্যূহের সংখ্যা নয়। পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের রত্নত্রয়ের অন্যতম 'পৌষ্করসংহিতা'য় নবমূর্তির পূজাবিধির বিস্তারিত বিবরণ আছে।[২] 'অগ্নিপুরাণে'ও নবব্যূহের অর্চনাবিধি[৩] এবং নবব্যূহে দীক্ষাবিধি[৪] বিবৃত হইয়াছে। নবব্যূহবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল মনে হয়। কেননা, 'পৌষ্করসংহিতা'য় উহা মুখ্যতয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ সংযত ব্যক্তিগণ সর্বদা সম্যগ্‌রূপে উহাঁদের পূজা করিবেক।[৫] 'অগ্নিপুরাণে'ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে "নবব্যূহ হরিকে যজন করিবে।"[৬] উহাতে আর ও কথিত হইয়াছে যে ভগবান্‌ হরি স্বয়ং নারদকে "নবব্যূহার্চন" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৭] উহা অবশ্যই অর্থবাদমাত্র। কেননা, নারায়ণ কর্তৃক নারদকে উপদেশের অধুনা-প্রাপ্ত প্রাচীনতম বিবরণ মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে নবব্যূহের উল্লেখ মাত্রও নাই, নবব্যূহার্চন-ব্যাখ্যা ত দূরের কথা। যাহা হউক তাহাতে নবব্যূহবাদের মহত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র মতে, সাত্বতগণ নবব্যূহবাদী।[৮] নবব্যূহ কি কি তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ ছিল দেখা যায়। 'পৌষ্করসংহিতা'দির মতে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নৃসিংহ এবং ধরণীধর বা বরাহ—ইঁহারাই "নবব্যূহ" বা "নবমূর্তি।"[৯] 'পাদ্মসংহিতা'দি কোন কোন সংহিতায় ব্রহ্মার পরিবর্তে হয়গ্রীবের নাম আছে।[১০] আর কোথাও বা বিষ্ণুর পরিবর্তে হয়গ্রীবের নাম আছে।[১১] 'অগ্নিপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে উঁহাদের গাত্রবর্ণ যথাক্রমে জবারুণ, হরিদ্রাভ, নীল, শ্যামল, লৌহিত, মেঘ, অগ্নি, মধু এবং পিঙ্গাভ।[১২] পরন্তু ঐ বিষয়ে 'পৌষ্করসংহিতা'র মত কথঞ্চিৎ ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়। উহাতে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে "বারাহী ভগবচ্ছক্তিঃ নীলজীমূতসন্নিভা।"[১৩] বাসুদেবের বর্ণ তন্মতে সিত বলিয়া বোধ হয়।[১৪] অপর ব্যূহগণের বর্ণ পরিষ্কার বুঝা যায় না।[১৫]

---

১) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৩।২।৭৬'২—

২) পৌষ্করসং, ১০।১৪-৩৩ ; ১১শ—১৮শ অধ্যায়। আরও দেখ—১৯।৭৫ ; ৩৩।১ ; ইত্যাদি।

৩) অগ্নিপু, ২৩।২০-৩ ; ২০১তম অধ্যায়। ৪) অগ্নিপু, ২৭।২৫— ৫) পৌষ্করসং ১০।১০'২

৬) অগ্নিপু, ২৯।৩১'২ ৭) ঐ, ২০১।১'১ ৮) পূর্বে দেখ।

৯) পৌষ্করসং, ১০।৩-৫'১, ১৪-৩৩ ; ৩৩।৪-১৩ ; অগ্নিপু,, ২৫।১-৪ ; ২০১।১-৩

'অগ্নিপুরাণে'র এক স্থলে আছে যে জীব, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারাই "নবাত্মা" বা নবব্যূহ। (পরে দেখ)।

১০) পাদ্মসং, ৩।১৮।৫৯ ; ঈশ্বরসং, ১৫।১৫৬, ১৯২-৪ ;

১১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) ধৃত 'সাত্বততন্ত্র' বচন। ২।২০।২৩৯-২৪০

১২) অগ্নিপু, ২৫।৪'২-৫ ১৩) পৌষ্করসং, ১১।৬৩'২ ১৪) ঐ, ১১।১১-২ দেখ

১৫) 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে জ্ঞানাদিগুণষট্‌কের জ্ঞাপকবর্ণ যথাক্রমে এই—সিত, অরুণ, জাম্বুনদনিভ, নৃপশৈলপ্রভ, প্রবালোপম ও শতনীলোপম (অর্থাৎ গাঢ়নীলবর্ণ)। (১১।৩-৪'১)

তবে ইহা সত্য যে সকলের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন।[১] সকলেই চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, পদ্ম, বর ও অভয়ধারী বলিয়া মনে হয়।[২]

'পৌষ্করসংহিতা'য় বাসুদেবাদি-ধরণীধরান্ত নবকে অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, বিভু এবং অমল পরতত্ত্ব পরমাত্মার যেমন "মূর্তি" "রূপ" বা "ব্যূহ" বলা হইয়াছে, তেমন "প্রকৃতি" বা "শক্তি"ও বলা হইয়াছে।[৩]

"নবপ্রকৃতয়স্ত্বেতাঃ শক্তিত্বেন ব্যবস্থিতাঃ।"[৪]

'পরন্তু এই নব প্রকৃতি শক্তিরূপে ব্যবস্থিত।' উঁহারা ভবসাগরে নিমগ্ন জীবগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ।[৫] যেমন সুপ্রদীপ্ত বৃহৎ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয় এবং যেমন বিক্ষুব্ধ সাগর হইতে বুদ্বুদ্‌সমূহ নির্গত হয়, তেমন ক্ষুভিত শক্তীশ পরমাত্মা হইতে ঐ শক্তিসমূহ অভিব্যক্ত হয় ("ব্যঞ্জতি")। পরন্তু ঐ শক্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে অজারূপা ("ত্বজারূপাস্তু শক্তয়ঃ")।[৬]

কোন কোন মতে ব্যূহের সংখ্যা পাঁচ। 'পদ্মপুরাণে' আছে যে বাসুদেব "পঞ্চনবব্যূহভেদরূপ।"[৭] 'পৌষ্করসংহিতা'য় পঞ্চব্যূহের উল্লেখ আছে,[৮] পরন্তু কোন বিশেষ বিবরণ নাই। 'ঈশ্বরসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে "সাত্বতসংজ্ঞক মহোপনিষৎ তন্ত্রে"—যাহা মূলবেদ হইতে পরিস্রুত, সুতরাং তাদৃশ, তথা সর্বশাস্ত্রার্থগর্ভিত ও সিদ্ধিমোক্ষপ্রদ, তাহাতে শান্ততরব্যূহ, শান্তোদিতব্যূহ, সুষুপ্তিব্যূহ, স্বপ্নব্যূহ এবং জাগ্রদ্‌ব্যূহের বর্ণনা আছে।[৯] শান্ততরব্যূহ অমূর্তি, শান্তোদিত ব্যূহ একমূর্তি এবং সুষুপ্ত্যাদি ব্যূহ চতুর্মূর্তি। পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ শান্ত ও সংবিৎস্বরূপ, সুতরাং অমূর্ত হইলেও ভক্তকে অনুগ্রহ-কামনায় অনৌপম্য দেহ ধারণ করত মূর্ততা প্রাপ্ত হন। তিনি অযুতপূর্ণচন্দ্রতুল্য কান্তি দ্বারা বিশ্বকে আপ্যায়িত করেন। তিনি দ্বিভুজ;—তাঁহার দুই হাতে বরদ ও অভয়দ শঙ্খ ও চক্র আছে। যেমন ভাস্কর রশ্মিসমূহ দ্বারা এবং সমুদ্র ঊর্মিসমূহ দ্বারা আবৃত তেমন তিনি অমূর্তি ও সমূর্তি অচ্যুতাদি দ্বারা আবৃত।[১০] ইহা শান্তোদিত ব্যূহের ধ্যেয় রূপ। সুষুপ্তিব্যূহের রূপ এই—ভগবান্ বেদকল্পে ব্রহ্মসম্বলিতাকৃতি হইলেও কর্ণিক মধ্যে স্তম্ভের ন্যায় স্থিত হইয়া বেদ্যত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মযাজী কর্মীদিগের উপকারার্থ প্রভু পরবাসুদেব স্বয়ং নিজে নিজেকে গুণভেদে বিভক্ত করিয়া পূর্বাদি দিক্‌ভাগে অবস্থিত থাকেন। পূর্বদিকে তিনি অনুজ্‌ঝিত স্বরূপে,—পূর্ণষাড়্‌গুণ্যরূপে থাকেন। দক্ষিণে জ্ঞান ও বল সম্বলিত রূপে, পশ্চিমে ঐশ্বর্য ও বীর্য সম্বলিত রূপে এবং উত্তরে তেজ ও শক্তি সম্বলিত রূপে পরমেশ্বর সংস্থিত আছেন। "যদ্যপিও ভগবান্ অরূপ, তথাপি যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ব্যূহাত্মাগুণলক্ষণ রূপ তাঁহাতে উপচরিত হয় ("রূপমস্যোপচর্যতে")। দ্বিতীয় মূর্তির দুই হাতে শঙ্খ ও লাঙ্গল, তৃতীয়ের শঙ্খ ও বাণ এবং চতুর্থের শঙ্খ ও অসি বর্তমান। এই প্রকার লক্ষণ দ্বারা

---

১) ঐ, ১০।১০'১

২) "শঙ্খপদ্মধরাঃ সর্বে বরাভয়করাস্তু বৈ ॥"—(ঐ, ২৪।৩৭'২)
পরন্তু অন্যত্র আছে যে, "শক্ত্যাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুঃ ; শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥"—(ঐ, ১০।২৫'২)

৩) ঐ, ১০।৬, ২০, ২১, ২৩; ২৫-৬, ২৮।
"নবমূর্তি"কে "নবাত্মা" ও বলা হয়। (ঐ, ১০।১১'২ ; ২৭।৪৫৬)

৪) পৌষ্করসং, ১০।৫'২ ৫) ঐ, ১০।৭'১ ৬) ঐ, ১০।৭'২-৯

৭) পদ্মপু, উত্তরখণ্ড, ২৫৬।১৬'১ ৮) পৌষ্করসং, ৩৮।২০৯ ৯) ঈশ্বরসং, ২০।১৯৬'২-১৯৯'১

১০) সাত্বতসং, ২।৬৯-৭০ = ঈশ্বরসং, ২৪।৭৩-৯'১ (ঈষৎ পাঠভেদে)

ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া এই ব্যূহে সাধকের ভাবস্থিতি বন্ধন করেন। সাদৃশ্য, ষড়্গুণত্ব এবং সমত্ব, বিশেষতঃ শান্তত্ব এবং নিষ্কলত্ব হেতু পরতত্ত্বে ভেদ নাই। সেইহেতু যদিও বলা হইয়াছে যে ভগবানের রূপ, মুখ্যবৃত্তিতে দুই দুই গুণবিশিষ্টরূপে ভিন্ন ভিন্ন, অপর চারিগুণও প্রত্যেকের আছে।[1] যেমন আত্মা স্বপ্নে অপর ভিন্নরূপ ধারণ করে, তেমন অব্যক্ত পরমাত্মা স্বপ্নব্যূহে কর্মীদিগের প্রতি অনুকম্পাবশত ক্রমে বিভিন্ন রূপে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হন।[2] তিনি অভিন্ন ষাড়্গুণ্য বিভব দ্বারা উপবৃংহিত এবং অভিন্ন সিতাদিভাসমূহ দ্বারা নিরন্তর দীপ্ত। ভগবান্ স্বয়ং পূর্বদিকে সূর্যকান্তি অপেক্ষা অধিক কান্তিমান্ সিত দেহে বাসুদেবরূপে ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর প্রভু দক্ষিণ দিকে পদ্মরাগসমান তেজে সঙ্কর্ষণরূপে উদিত হন। পশ্চিম দিকে ঘর্মাংশু-রশ্মিসন্তপ্তশতধামাধিক রূপে প্রদ্যুম্ন নামে ব্যক্ত হন। অনন্তর পরমেশ্বর উত্তর দিকে শরদ্-গগনসংকাশবর্ণে অনিরুদ্ধরূপে সমবস্থিত হন। সকলের সংস্থান আদিমূর্তির সমান। সকলে তেজে কোটিসূর্যপ্রভ এবং সকলেই নানালঙ্কারশোভিত।[3] জাগ্রদ্ব্যূহেও বাসুদেবাদি মূর্তিচতুষ্টয় পূর্বের ন্যায় পূর্বাদি চারিদিকে অবস্থিত। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গকণের ন্যায় উঁহারা পর (বাসুদেব) হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বাচকের (=শব্দের) অন্তর্নিবিষ্টরূপে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়াছেন।[4] আদ্য ভগবদ্রূপ বাসুদেব হিমকুন্দেন্দুকান্তিমান্, পীতকৌশেয়বসন ও সুপর্ণধ্বজশোভিত; সঙ্কর্ষণ সিন্দুরশিখরাকার, অতসীপুষ্পসঙ্কাশবাসভৃৎ ও তালধ্বজযুক্ত; প্রদ্যুম্ন প্রাবৃড্নিশাসমুদিতখদ্যোতচয়-দীধিতি, রক্তকৌশেয়বসন ও মকরধ্বজশোভিত; এবং অনিরুদ্ধ অঞ্জনাদ্রিপ্রতীকাশ, সুসিতাম্বর-বেষ্টিত ও মৃগলাঞ্ছনশোভিত। সকলেই চতুর্ভুজ এবং সকলেরই মুখ্য দুই হাতে, দক্ষিণে ও বামে, যথাক্রমে অভয় ও বিদ্যাকোশ আছে; অপর দুই হাতে সেই প্রকারে বাসুদেবের শঙ্খ ও গদা, সঙ্কর্ষণের সীর ও মুসল, প্রদ্যুম্নের পঞ্চবাণ ও শার্ঙ্গধনু, এবং অনিরুদ্ধের খড়্গ ও খেটক আছে। সকলেই শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনমালা-ধারী এবং কিরীট-হার-কেয়ূরাদি-নানালঙ্কার-বিভূষিত। অপ্যয়যোগে অনিরুদ্ধকে সিত-কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নকে কৃষ্ণ-পীত, সঙ্কর্ষণকে পীত-রক্ত এবং বাসুদেবকে রক্তসিত বর্ণ বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে।[5]

এইরূপে এইখানে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ স্থানভেদে তিন চাতুরাত্ম্যের বা চতুর্ব্যূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহারা শান্তোদিত বা পর বাসুদেব হইতে উৎপন্ন। উহাতে বীজ-চাতুরাত্ম্য অব্যক্তচাতুরাত্ম্য সমবস্থিত আছে কল্পনা করিলে, চাতুরাত্ম্য সর্বসমেত চতুর্বিধ হয়।[6] পরমস্বরূপের সহিত চতুর্বিধ-চাতুরাত্ম্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া

---

১) সাত্বতসং, ৩।৬'২-১৫'১=ঈশ্বরসং, ২৪।৭৯-৯০

২) "যেনাত্মা স্বপ্ন এবাত্মা কর্মিণামনুকম্পয়া।
ক্রমেণ ব্যক্ততাং নীতো বাগ্বর্ণকমলোপরি ॥"
—(সাত্বতসং' ৪।২=ঈশ্বরসং, ২৪।৯১'২-৯২'২)

৩) সাত্বতসং, ৪।২-১৯=ঈশ্বরসং, ২৪।৯১'২—১০৯'১

৪) সাত্বতসং, ৫।৭-৮=ঈশ্বরসং, ২৪।১১৫-৬

৫) সাত্বতসং, ৫।৭-২৫=ঈশ্বরসং ২৪।১১৫—১৩৩

৬) অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে বিষ্ণুর চাতুরাত্ম্য ত্রিবিধ—ব্যাপ্তিমাত্র, গুণোন্মেষ ও মূর্তিকার। (৫।২০-২১'১, পূর্বে দেখ।

হইয়াছে। একস্থলে কথিত হইয়াছে যে "স্ফটিকোপলবৎ অতিশুদ্ধাশয়ত্ব হেতু সেই বিভু স্থানভেদ প্রাপ্ত হইয়া উপসংহার-লক্ষণ শবল রূপ গ্রহণ করেন এবং ভেদভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন।"[১] অর্থাৎ যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিক নানাবর্ণের উপাধি সংযোগে নানাবর্ণযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমন বিশুদ্ধ পরমতত্ত্ব উপাধিভেদে নানা প্রকার চতুর্ব্যূহ হয়। সুতরাং চতুর্ব্যূহ অধ্যস্ত রূপ। পরন্তু অন্যত্র ঐ বিষয়ে বিম্ব-প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। "আদিদেব পর বিভু নানামন্ত্রস্বরূপে সর্বদা সর্বের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত। নিজ শান্তাদি ব্যক্তলক্ষণে চতুর্ব্যূহ-চতুষ্কে তিন দেবের প্রাধান্যে অবস্থান করেন। হে মহামতি, যেমন আকাশস্থ সূর্য নিশ্চয় এক, পরন্তু বহু জলাধার আশ্রয় করত (অর্থাৎ বহু জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া) বহুত্ব সম্প্রদর্শন করে, তেমন ভগবান্ এক হইলেও তুর্যাদিপদসংস্থে নানামন্ত্রাশ্রয়ে বহুত্ব প্রাপ্ত হন। মনুষ্যগণের নানাপ্রকারের শ্রদ্ধাবশত, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিতে (তিনি নানা রূপ ধারণ করেন)।"[২] যাহা হউক, কথিত হইয়াছে যে, আদ্য চাতুরাত্ম্য মহৎ, শুদ্ধসংবিন্ময়, পরমার্থতঃ সর্বক্রিয়াবিনির্মুক্ত এবং বটবীজবৎ আদিমূর্তির অভেদে সংস্থিত। দ্বিতীয় চাতুরাত্ম্য বহ্ন্যর্কেন্দুসহস্রাভ, আনন্দ-স্পন্দলক্ষণ সর্বক্রিয়ার বীজ এবং সমস্ত বিকল্পের আস্পদ। তৃতীয় চাতুরাত্ম্য নিত্য, নিত্যাকৃতিধর, তেজে সূর্যবর্চের ন্যায়, সিতাদিবর্ণ-ভেদভিন্ন, উর্দ্ধাধোভাবে সংস্থিত, ভববীজক্ষয়কর, কৈবল্যভোগ-ফলদ এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়করসর্বোপকরণান্বিত। নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া উহা সমুদিত এবং অস্তমিত হয়। চতুর্থ চাতুরাত্ম্য বিশ্বের প্রশাসক। উহাদের প্রত্যেকের বর্ণ যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বাসুদেবাদি চারিমূর্তির বর্ণ যথাক্রমে কৃতযুগে সিত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ; ত্রেতাযুগে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও সিত; দ্বাপরে পীত, কৃষ্ণ, সিত ও রক্ত; এবং কলিতে কৃষ্ণ, সিত, রক্ত ও পীত। পরন্তু যুগসন্ধিতে সকলেই একবর্ণ;—কৃতান্তে সিত-রক্ত, ত্রেতান্তে রক্ত-পীত, দ্বাপরান্তে পীত-কৃষ্ণ এবং কল্যন্তে কৃষ্ণ-সিত। আয়ুধ, অম্বর ও লাঞ্ছনের ভেদ পূর্বের ন্যায়।[৩] 'সাত্বত-সংহিতা'র প্রারম্ভে বিবৃত হইয়াছে যে যুগভেদে লোকসাধারণের স্বভাবভেদ অনুসারে ভগবান্ বাসুদেবের "রূপ বিপর্যয়" হয়; কৃতযুগে লোকগণ একমাত্র সত্ত্ববহুল থাকে; সেইহেতু তখন ভগবানের গাত্রবর্ণ শ্বেত হয়; আর ত্রেতাযুগে জনগণ রাগপর বা রজোগুণপ্রধান হয়; তাই তখন ভগবান্ রক্তবর্ণ হন।[৪] 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'য় আছে যে উপাসকদিগকে অনুগ্রহার্থ শান্তোদিত (বা ব্যূহ বাসুদেব) হইতে "চাতুরাত্ম্যত্রয়" প্রবৃত্ত হয়। উহারা সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ নামে অভিহিত হয়। শান্তোদিত, নিত্যোদিত, এবং সুষুপ্ত্যাদিকে লইয়া ব্যূহ মোট পাঁচ। উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে জাগ্রদাদি অবস্থা প্রকৃত পক্ষে জীবেরই। ঐ সকল অবস্থাগত ধ্যানপরায়ণ জীবের খেদ শান্তির নিমিত্ত তত্তৎপদস্থ কর্মবশ্য জীবের অধিষ্ঠাতা এবং উপাস্যরূপে পরমাত্মারও অবস্থাভেদ কল্পনা করা হইয়াছে।[৫]

'ব্রহ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে "নারায়ণ শির, প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ পক্ষ, অনিরুদ্ধ বাম পক্ষ এবং বাসুদেব সন্দোহ; অথবা নারায়ণ সন্দোহ, আর বাসুদেব শির; এবং সঙ্কর্ষণ পুচ্ছ বলিয়া

---

১) সাত্বতসং, ৫।২৬-২৭'১=ঈশ্বরসং, ২৪।১৩৪-১৩৫'১

২) সাত্বতসং, ৪।৩১-৪

৩) সাত্বতসং, ৫।৮১-৯১=ঈশ্বরসং, ২৪।১৩৫'২-১৪৬'১—(ঈশ্বরসং, ২৪।১৩৫ ২

৪) সাত্বতসং, ১।১৮'২-২১

৫) 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১১১ পৃষ্ঠা

প্রোক্ত হয়। এই প্রকারে একই ভগবান্ পুরুষোত্তম অঙ্গাঙ্গিভাবে পঞ্চধা ক্রীড়া করেন। সেই জনার্দনে ইহা বিরুদ্ধ বলিয়া চিন্তা করিবে না, কেননা, তিনি (মহান্) ঐশ্বর্যসম্পন্ন। তিনি অতর্ক্য, (সুতরাং তাঁহার বিষয়ে) তর্কের স্থান কোথায়? তিনি অপ্রমেয়, (সুতরাং তাঁহার বিষয়ে) প্রমার স্থান কোথায়?"[১]

'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিপ্রধান। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র চতুর্বিধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে—মন্ত্রসিদ্ধান্ত, আগমসিদ্ধান্ত, তন্ত্রসিদ্ধান্ত ও তন্ত্রান্তরসিদ্ধান্ত। 'পাদ্মসংহিতা'র মতে—মন্ত্রসিদ্ধান্ত "একমূর্তিপ্রধান", আগমসিদ্ধান্ত "চতুর্মূর্তি-প্রধান" এবং তন্ত্রসিদ্ধান্ত "নবমূর্তিপ্রধান"। তন্ত্রান্তরসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সেই প্রকার কিছু বলা হয় নাই। তবে বলা হইয়াছে যে উহাতে "চতুর্বক্ত্রে বা ত্রিবক্ত্রে দেবতার অর্চনাবিধি" আছে।[২] উহার অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে যাহাতে একই মূর্তি প্রধানতয়া আরাধ্য, তাহা মন্ত্রসিদ্ধান্ত। উঁহার পরিবাররূপে শ্রীপ্রভৃতি দেবীগণেরও অবশ্য পূজা করা যায়। মন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রথম বা অগ্রিম সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় আগমসিদ্ধান্তে বাসুদেবাদি চারিমূর্তি ক্রমাগত তুল্যভাবে পূজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহাতে "কর্মসমূহের সন্ন্যাসে"রও কথা আছে। তৃতীয় তন্ত্রসিদ্ধান্তে নবমূর্তির পূজার প্রাধান্য থাকিলেও, দ্বাদশমূর্তির, প্রাদুর্ভাবের, মূর্ত্যন্তরের এবং প্রাদুর্ভাবান্তরগণেরও পূজার কথা আছে। আর তন্ত্রান্তরসিদ্ধান্তে "দ্বিত্র্যাদিমুখভেদে একই মূর্তি পূজিত হয়।"[৩] মূর্তি-প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন মূর্তি নিম্ন প্রকার,—[৪]

"একমূর্তি" = বাসুদেব বা পর নারায়ণ;
"দ্বিমূর্তি" = বাসুদেব ও পর নারায়ণ;
"ত্রিমূর্তি" = সত্য, অচ্যুত ও পুরুষ;
"চতুর্মূর্তি" = বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ;
"পঞ্চমূর্তি" = সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব ও পুরুষ;
"ষণ্মূর্তি" = অন্নাধিপতি, শক্তীশ, কালনেমিজিৎ, ত্রৈলোক্যমোহন, যজ্ঞবরাহ, শঙ্খোদর ও নৃসিংহ;
"সপ্তমূর্তি" = বাসুদেবাদি চারিমূর্তি এবং পুরুষাদি ত্রিমূর্তি;
"অষ্টমূর্তি" = হয়গ্রীব, মুকুন্দ, বভ্রু, বৃষাকপি, শৌরি, দাশার্হ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষ;
"নবমূর্তি" = বাসুদেবাদি চতুর্মূর্তি, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বিষ্ণু, নৃহরি ও বরাহ;
"দশমূর্তি" = 'ষণ্মূর্তি' ও 'চতুর্মূর্তি';
"একাদশমূর্তি" = 'দশমূর্তি' ও 'আদিমূর্তি';
"দ্বাদশমূর্তি" = কেশবাদি (পরে দেখ)।

'ঈশ্বরসংহিতা'র মতে, আগমসিদ্ধান্তই চতুর্বিধ পাঞ্চরাত্রতন্ত্রশাস্ত্রের "আদ্য; (উহা) নিত্যোদিতব্যূহস্থাপনাদিপ্রকাশক।" সুতরাং উহাই, 'পাদ্মসংহিতা'র পরিভাষায় 'একমূর্তি-

---

১) আচার্য মধ্ব-ধৃত 'ব্রহ্মসংহিতা'-বচন। (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৫ মধ্ব-ভাষ্য)

২) পাদ্মসং, ১।১।৮৫'২-৮৮

৩) ঐ, ৪।১৯।১১০-১১৯'১

৪) ঐ, ৩।১৮।৫২

প্রধান'। মন্ত্রসিদ্ধান্তে—শান্ততর, শান্তোদিত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ—এই পঞ্চব্যূহের, তথা কেশবাদি মূর্ত্যন্তরের ও প্রাদুর্ভাবাদির, বিষয় আছে।[১] 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে, আগমসিদ্ধান্তে চাতুরাত্ম্য উপাসনা আছে; উহাই প্রথম সিদ্ধান্ত; মন্ত্রসিদ্ধান্তে নানাব্যূহ, দ্বাদশমূর্তি, মূর্ত্যন্তর, প্রাদুর্ভাব ও প্রাদুর্ভাবান্তরগণের পূজাদি আছে।[২]

'অগ্নিপুরাণে' পরমাত্মার এক হইতে ছাব্বিশ ব্যূহ, রূপ বা মূর্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।[৩] "একমূর্তি" বাসুদেবই। তিনিই "আদিমূর্তি।" অপরাপর মূর্তিসমূহ এই প্রকার বলিয়া বিবৃত হইয়াছে—

"দ্বিরূপক" = পুরুষাত্মা ও প্রকৃত্যাত্মা, পরাত্মা ও অগ্ন্যাত্মা, কিংবা বসু ও অর্ক;
"ত্রিব্যূহ" = অগ্নির তিন মূর্তি;
"চতুর্ব্যূহ" = ঋগাদি বেদচতুষ্টয়;
"পঞ্চব্যূহ" = আকাশাদি পঞ্চমহাভূত;
"ষড়্ব্যূহ" = মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়;
"সপ্তরূপক" = অগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র; আপ্তোর্যাম ও যজ্ঞাত্মা;
"অষ্টব্যূহ" = বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ;
"নবাত্মা" = জীব, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ;[৪]
"দ্বাদশাত্মা" = বিষ্ণু, মধুহর, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, কেশব, নারায়ণ, মাধব ও গোবিন্দ;[৫]
"পঞ্চবিংশব্যূহ" = পুরুষ, ধী, অহঙ্কার, মন, চিত্ত, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চবিষয়, শ্রোত্রত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও আকাশাদি পঞ্চমহাভূত।
"ষড়্বিংশব্যূহ" = পরপুরুষ, পুরুষ, ধী, প্রভৃতি (যেমন পঞ্চবিংশব্যূহে)।

অপর ব্যূহসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। পরন্তু অন্যত্র "চতুর্বিংশতিমূর্তি"র বিবৃতি আছে।[৬] উঁহারা এই—(১) কেশব, (২) নারায়ণ, (৩) মাধব, (৪) গোবিন্দ, (৫) বিষ্ণু, (৬) মধুসূদন, (৭) ত্রিবিক্রম, (৮) বামন, (৯) শ্রীধর, (১০) হৃষীকেশ, (১১) পদ্মনাভ, (১২) দামোদর, (১৩) বাসুদেব, (১৪) সঙ্কর্ষণ, (১৫) প্রদ্যুম্ন, (১৬) অনিরুদ্ধ, (১৭) পুরুষোত্তম, (১৮) অধোক্ষজ, (১৯) নৃসিংহ, (২০) অচ্যুত, (২১) উপেন্দ্র, (২২) জনার্দন, (২৩) হরি, এবং (২৪) কৃষ্ণ। ইহাদের সকলেই চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। পরন্তু শঙ্খচক্রাদির বিন্যাস প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের অস্ত্রবিন্যাস বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে "বাসুদেব আদিমূর্তি। তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয় ('অভবৎ')। প্রত্যেকে কেশবাদি প্রভেদে ক্রমে ত্রিধা হন।"[৭] কেশবাদির উৎপত্তির অধিক বিবরণ 'অগ্নিপুরাণে' নাই। ঐ ২৪ মূর্তির শঙ্খাদি আয়ুধবিন্যাসের বর্ণনা 'পদ্মপুরাণে'ও আছে।[৮]

---

১) ঈশ্বরসং, ২১।৫৬০
২) পৌষ্করসং, ৩৮।২৯৩
৩) অগ্নিপু, ২৫।১৯
৪) অগ্নিপু, ২৫।৩১'২-৩২'১; পূর্বে উক্ত নবমূর্তি ভিন্ন।
৫) অগ্নিপু, ২৫।৩৮-৯
৬) অগ্নিপু, ৪৮।১
৭) অগ্নিপু, ৪৮।১৩-১৪'১
৮) পদ্মপু, ৭৯। পাতাল

"চতুর্বিংশতিমূর্তি"র উল্লেখ কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায়ও পাওয়া যায়। তথায় উহাদিগকে দুই কোটিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেশবাদিদামোদরান্ত বারটিকে "মূর্তিভেদ" "ব্যূহান্তর" বা "মূর্ত্যন্তর" বলা হইয়াছে [১], এবং বাসুদেব হইতে কৃষ্ণ পর্যন্ত বারটিকে কোথাও কোথাও "বিভেশ্বর" বলা হইয়াছে।[২] বাসুদেবাদি চার ব্যূহ হইতে উহাদের উৎপত্তিক্রমও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। যথা, 'পৌষ্করসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে [৩] কেশব নারায়ণ ও মাধব—এই তিন মূর্ত্যন্তর বাসুদেবমূর্তি হইতে; গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন—এই তিন মূর্ত্যন্তর সঙ্কর্ষণ মূর্তি হইতে; ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর—এই তিন মূর্ত্যন্তর প্রদ্যুম্ন মূর্তি হইতে; এবং হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর—এই তিন মূর্ত্যন্তর অনিরুদ্ধ মূর্তি হইতে উৎপন্ন হয়।[৪] সেই হেতুতে আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে কেশবাদি বাসুদেবের "মূর্তিত্রয়"; গোবিন্দাদি সঙ্কর্ষণের, ত্রিবিক্রমাদি প্রদ্যুম্নের এবং হৃষীকেশাদি অনিরুদ্ধের মূর্তিত্রয়।[৫] বাসুদেবের মূর্তিত্রয় "কুন্দেন্দুস্ফটিকপ্রভ"; সঙ্কর্ষণের মূর্তিত্রয় "পদ্মরাগোজ্জ্বলদ্যুতি"। প্রদ্যুম্নের মূর্তিত্রয় "হেমধামপ্রভ" এবং অনিরুদ্ধের মূর্তিত্রয় "অতসীপুষ্পসংকাশ"।[৬] বাসুদেবের মূর্তিত্রয়ের ধ্বজার চিহ্ন, বাসুদেব ধ্বজার চিহ্নের ন্যায়, গরুড়। সঙ্কর্ষণের মূর্তিত্রয়ের ধ্বজা-লাঞ্ছন তালবৃক্ষ। প্রদ্যুম্নের মূর্তিত্রয়ের ধ্বজাচিহ্ন মকর এবং অনিরুদ্ধের মূর্তিত্রয়ের কুরঙ্গ।[৭] সকল মূর্ত্যন্তরই চতুর্ভুজ এবং সকলেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। তবে প্রত্যেকের হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খচক্রাদি আয়ুধসমূহের বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন। সকলের আয়ুধ-বিন্যাস বিবৃত হইয়াছে।[৮] 'অগ্নিপুরাণে' বিবৃত আয়ুধ-বিন্যাস হইতে উহা ভিন্ন মনে হয়। অপরাপর পাঞ্চরাত্রসংহিতায় মূর্ত্যন্তরগণের আয়ুধবর্ণলাঞ্ছনাদির অন্য প্রকার বর্ণনাও পাওয়া যায়। যথা, 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র মতে, মূর্ত্যন্তরগণের প্রত্যেকের বর্ণ ও অস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন; পরন্তু প্রত্যেকে চারি হস্তে একই অস্ত্র ধারণ করেন। উহাতে কেশবাদি ক্রমে বর্ণ ও অস্ত্র এই প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—"জাম্বুনদপ্রভ চতুশ্চক্রধর", "নীলজীমূতসন্নিভ চতুঃশঙ্খধর", "ইন্দ্রনীলশ্যাম চারি হস্তে গদাধর", "চন্দ্রমঃসন্নিভদ্যুতি চতুর্ভুজধনুষ্মন্ত", "পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভ চতুর্হলধর", "অরবিন্দাভ মুশলাস্ত্র", অগ্নিসন্নিভতেজস্ক খড়্গপাণি",

---

[১] যথা দেখ—'পৌষ্করসং, ৩৬।১৪৪, বিষ্বক্‌সেনসং ('তত্ত্বত্রয়', ১১২ পৃষ্ঠা), অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।৪৬; ৮।৪৭'১ 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয়ের প্রত্যেকে স্বীয় বপুকে কেশবাদি স্বরূপে ত্রিধা বিভক্ত করেন। ঐ ১২টা পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে 'ব্যূহান্তর' নামে অভিহিত হয়। (লক্ষ্মীতং ৪।২৭—৮; ১১।৩০)

[২] 'সাত্বতসংহিতা'য় তাহা আছে। (দেখ—১।৫৫'২)

[৩] যথা দেখ—মহাসনৎকুমারসং, ৩।৬।৩৪

[৪] পৌষ্করসং, ৩০।৩১; ৩৬।১৩৯

[৫] অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় (৫।৪৬-৪৮'১) সংক্ষেপে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে "ব্যূহান্তর কেশবাদি দ্বাদশ বলিয়া প্রকীর্তিত হয়। তন্মধ্যে কেশবাদিত্রয় বাসুদেব হইতে (উদ্ভূত বলিয়া) বিভাবিত হয়। গোবিন্দাদি ত্রিতয় সঙ্কর্ষণ হইতে উদ্ভূত। হে মুনে, ত্রিবিক্রমাদি ত্রিতয় প্রদ্যুম্ন হইতে উদিত। হে মহামুনে, হৃষীকেশাদি (ত্রিতয়) সেই প্রকারে অনিরুদ্ধ হইতে (উদিত)।" 'সাত্বতসংহিতা'য় ও এই মতের উল্লেখ আছে)। ৮।৫৯—১১৮ দেখ) 'বিষ্ণুভাগবতপুরাণে'র মতে, কেশব, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, মধুহান্, মাধব, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, শ্রীবৎসধর হরি, জনার্দন, দামোদর ও কাল—ইহাই মূর্ত্যন্তর বলিয়া মনে হয়। (৬।৮।২০-২)

[৬] পৌষ্করসং, ৩৬।১৫০, ১৫৬, ১৬২ ও ১৬৮ [৭] ঐ, ৩৬।১৮৩-৯ [৮] ঐ, ৩৬।১৩৯-১৪৪

'তরুণাদিত্যসন্নিভ বজ্রধর", "পুণ্ডরীকাভ পট্টিশায়ুধহস্ত", "বিদ্যুৎসমপ্রভ মুদ্গরধর", "সহস্রাংশুসমপ্রভ পঞ্চায়ুধধর" এবং "বালার্কশতসন্নিভ পাশহস্তধর"।[1]

'পাদ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে যেমন দীপ হইতে দীপান্তর উৎপন্ন হয়, তেমন বাসুদেবাদি চারি মূর্তি হইতে ক্রমে চতুর্বিংশতি মূর্তি উৎপন্ন হয়। উঁহাদের সকলেই চতুর্ভুজ এবং পদ্মশঙ্খচক্রগদাধর। বাসুদেব হইতে কেশব, নারায়ণ ও মাধব, সঙ্কর্ষণ হইতে গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন, প্রদ্যুম্ন হইতে ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর এবং অনিরুদ্ধ হইতে হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর উৎপন্ন হন। এইরূপে চতুর্মূর্তি হইতে "দ্বাদশাংশগণ" উৎপন্ন হন।[2] ঐ চতুর্মূর্তি হইতে অপর দ্বাদশমূর্তির উৎপত্তিক্রম ভিন্ন। উহা কিঞ্চিৎপরে বিবৃত হইবে। কথিত হইয়াছে যে চতুর্বিংশতিমূর্তির সকলেই পীতাম্বরধর, এবং শ্রীবৎসকৌস্তুভাদিবিভূষিত; পরন্তু তাঁহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন।[3] যথা, কৃতাদি চারিযুগেই কেশব কনকপ্রখ্য, নারায়ণ অর্জুনসমাকৃতি, মাধব শ্যামবর্ণ, গোবিন্দ স্ফটিকপ্রভ, বিষ্ণু পদ্মকিঞ্জল্কনিভ, মধুসূদন অরুণাম্বুজসঙ্কাশ, ত্রিবিক্রম শিখিনিভ, বামন বালসূর্যবৎ, শ্রীধর পীতপদ্মাভ, হৃষীকেশ তড়িৎপ্রভ, পদ্মনাভ শ্যামবর্ণ, এবং দামোদর বন্ধূককুসুমচ্ছবি। বাসুদেবাদি (বিশ্বেশ্বর) চতুষ্টয়ের বর্ণ ব্যূহবাসুদেবাদির মত। পুরুষোত্তম শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, অধোক্ষজ শ্যামবর্ণ, নৃসিংহ হেমসন্নিভ, অচ্যুত পীতবর্ণ, জনার্দন অতীবরক্তবর্ণ, উপেন্দ্র শ্যামল, হরি পীতনিভ এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণাম্বুজপ্রখ্য।[4] পদ্মশঙ্খাদি আয়ুধচতুষ্টয়ের বিন্যাসও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের আয়ুধবিন্যাস বিবৃত হইয়াছে।[5] উহা প্রায় 'অগ্নিপুরাণো'ক্ত আয়ুধ-বিন্যাসের মতই। দুই এক স্থলে যে ঈষৎ পার্থক্য দেখা যায়, তাহা লিপিকরপ্রমাদবশত হওয়াও খুব সম্ভব। 'পরমসংহিতা'য় পঞ্চতন্মাত্রা, দিক্, কাল, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং যোগবিগ্রহ—এই বারটিকে পরমাত্মার দ্বাদশ মূর্তি বলা হইয়াছে।[6]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র মতে, ব্যূহান্তর ত্রিবিধ—পর, সূক্ষ্ম ও স্থূল। পরব্যূহান্তরগণ স্বকারণান্তঃস্থ; সূক্ষ্মব্যূহান্তরগণ সকলে দ্বিভুজ এবং স্থূলব্যূহান্তরগণ সকলে চতুর্ভুজ।[7] স্থূল ব্যূহান্তরগণের প্রত্যেকের বর্ণ এবং আয়ুধ-বিন্যাস বিবৃত হইয়াছে। কেশব তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্য চতুর্বাহু, পদ্মশঙ্খচক্রগদাধর, পুণ্ডরীকায়তেক্ষণ, পীতাম্বরধর, বনমালাবিভূষিত, হারকেয়ূরকটককুণ্ডলশোভিত। নারায়ণ নীলাম্বুদচ্ছবি, শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর ও সর্বালঙ্কারসংযুত। মাধব ইন্দীবরশ্যাম ও পদ্মগদাশঙ্খচক্রধর। গোবিন্দ ইন্দুবিম্বনিভ ও চক্রগদাশঙ্খপদ্মায়ুধবিরাজিত। বিষ্ণু পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভ ও গদাপদ্মশঙ্খচক্রধর। মধুসূদন রক্তপদ্মদলপ্রখ্য ও চক্রশঙ্খপদ্মগদাধারী। ত্রিবিক্রম উজ্জ্বলৎকনকপ্রখ্য ও চক্রগদাপদ্মশঙ্খধর। বামন তরুণাদিত্যসঙ্কাশ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর। শ্রীধর পুণ্ডরীকনিভ এবং পদ্মচক্রগদাশঙ্খধর। হৃষীকেশ বিদ্যুৎপ্রভ ও গদাচক্রশঙ্খপদ্মযুক্ত। পদ্মনাভ সহস্রাদিত্যসঙ্কাশ ও শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর। দামোদর বন্ধূকসন্নিভ এবং

---

১) তত্ত্বত্রয়, ১১৪ পৃষ্ঠা। শ্রীনিবাসদাসের 'যতীন্দ্রমতদীপিকা'য় এবং বর্বরমুনির 'তত্ত্বত্রয়-ভাষ্যে' এই মত পরিগৃহীত হইয়াছে।

২) পাদ্মসং, ১।২।২০-২—২৫'১। বৃহদ্ব্রহ্মসং, ১।১১।১১০'২—১১৫'১

৩) পাদ্মসং, ৩।১৬।৪৫-৪৬'১ ৪) ঐ, ৩।১৪।৬৭'২-৭৪

৫) ঐ, ৩।১৬।৩০—৪৪ ৬) পরমসং, ২।৫২—৫৬'১ ৭) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।৪৮'২—৪৯

পদ্মশঙ্খগদাচক্রধর।[১] 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'র মতে, কেশব অমল সুপর্ণবর্ণ, শঙ্খচক্রখড়্গগদাধর ও শুক্লাম্বরধর ; নারায়ণ মেঘশ্যাম, শঙ্খপদ্মগদাসিধর ও পীতবাস ; মাধব উৎপলপ্রখ্য, চক্রশার্ঙ্গগদাখড়্গধারী ও তপ্তকাঞ্চনভূষণ ; গোবিন্দ মাধবের ন্যায় ; বিষ্ণু গৌরবর্ণ, চক্রশঙ্খহলখড়্গধর ও ক্ষৌমবাসা ; মধুসূদন অরবিন্দনিভ ও চক্রশার্ঙ্গহলখড়্গধর ; ত্রিবিক্রম রক্তবর্ণ ও শঙ্খচক্রগদাখড়্গাধারী ; বামন কুন্দবর্ণাভ ও দোর্ভির্বজ্রগদাশঙ্খচক্রধর, ইত্যাদি।[২]

'বৃদ্ধহারীতস্মৃতি'র মতে, কেশব সুবর্ণাভ, শঙ্খচক্রগদাসিধর, শুক্লাম্বরধর, সৌম্য ও মুক্তাভরণভূষিত ; নারায়ণ ঘনশ্যাম, শঙ্খপদ্মগদাসিভৃৎ, পীতবাস ও মণিময়ভূষণোপশোভিত ; মাধব উৎপলপ্রখ্য, চক্রশার্ঙ্গগদাসিভৃৎ, চিত্রমাল্যাম্বরধর ও পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ ; গোবিন্দ শঙ্খবর্ণ, পদ্মশঙ্খগদাসিভৃৎ, রক্তারবিন্দপাদাব্জ ও তপ্তকাঞ্চনভূষণ ; বিষ্ণু গৌরবর্ণ, শঙ্খচক্রহলাসিভৃৎ, ক্ষৌমাম্বরধর, স্রগ্বী ও কেয়ূরাঙ্গদভূষিত ; ইত্যাদি।[৩]

এইরূপে দেখা যায় যে কেশবাদি দ্বাদশ মূর্তির, অথবা আরও বলিলে চতুর্বিংশতিমূর্তির, প্রত্যেকের বর্ণ এবং আয়ুধ-বিন্যাস সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে স্বল্পবিস্তর মতভেদ আছে। তবে এই বিষয়ে সকলে একমত যে তাঁহাদের আয়ুধসমূহ বা উহাদের বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে যে অস্ত্রভেদ হেতু উঁহাদের নামভেদ হইয়াছে।[৪]

'বৌধায়নধর্মসূত্রে' উক্ত নিত্যতর্পণবিধিতে কেশবাদি দামোদরপর্যন্ত দ্বাদশ জনকে, ঠিক 'অগ্নিপুরাণে' উক্ত ক্রমে উল্লেখ করত, তর্পণ করার বিধান আছে, "ওঁ কেশবং তর্পয়ামি। নারায়ণং তর্পয়ামি" ইত্যাদি। অনন্তর শ্রীদেবী, সরস্বতীদেবী, পুষ্টিদেবী, তুষ্টিদেবী, বৈনতেয়, বিষ্ণুপার্ষদগণ এবং বিষ্ণুপার্ষদীগণকে যথাক্রমে তর্পণ করার কথা আছে।[৫]

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্যন্তরগণকে "মাসেশ" বা "মাসাধিপ" বলা হইয়াছে।[৬] 'সাত্বতসংহিতা'য় মার্গশীর্ষমাস হইতে আরম্ভ করিয়া কৌমুদমাস পর্যন্ত বার মাসে কেশবাদি বার "মাসেশে"র পূজাবিধি বিবৃত হইয়াছে।[৭] 'পাদ্মসংহিতা'য় আছে যে "চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে বিষ্ণ্বাদি ক্রমে দ্বাদশ অধিপগণের অর্চনা কর্তব্য।[৮] 'পরমসংহিতা'য় ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে "এই প্রকারে পরপুরুষ ব্রহ্ম কাল হইয়া ব্যবস্থিত (আছেন। তিনি) লোকসংব্যবহারার্থ (জগৎ) চক্রকে ধ্রুব ভ্রমণ করাইতেছেন। সনাতন দেব যেন ক্রীড়াচ্ছলেই ('ক্রীড়ন্নিব') এই গুণমায়ারই দ্বারা সর্বজগৎকে ভ্রমণ করাইয়া কৃতিপর আছেন।"[৯] কালপুরুষের কার্য বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।[১০] "এই প্রকারে সমস্ত শরীরিগণ অজ্ঞানমায়াবশত কালচক্রে সমারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছে এবং

---

১) অহির্বুধ্ন্যসং, ২৬।৩৩—৪৬ ২) বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।৬১—৭৩

৩) বৃদ্ধহারীতস্মৃতি,' ২।৮০—৯১ ; আর ও দেখ—১০।১১০·১২

৪) "অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব বিলাস"—('চৈতন্যচরিতামৃত', ২।২০।১৮৯
"অস্ত্রধারণভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥" (ঐ, ২।২০।২০৫

৫) বৌধায়নধর্মসূত্র, ২।৯।১০

৬) পৌষ্করসং, ৩১।১১৫ ৭) সাত্বতসং, ৮।৪৫— ৮) পাদ্মসং, ৪।১৫।১২১—

৯) পরমসং, ২।৭৭-৮ ১০) ঐ, ২।৬৭-৮

বিবিধ গতি প্রাপ্ত হইতেছে।"[১] কালপুরুষের দ্বাদশ "মূর্তি" বা "বিভাগ"। যথা—(১) অয়ন, (২) ঋতু, (৩) মাস, (৪) পক্ষ, (৫) তিথি, (৬) সবন, (৭) যাম, (৮) মুহূর্ত, (৯) নাড়ী, (১০) কলা, (১১) বিনাড়ী, এবং (১২) প্রাণ।[২] এই "দ্বাদশ মূর্তি" হইতে এই "দ্বাদশ শক্তি" ক্রমে উৎপন্ন হয়—(১) যোগেশ্বরী, (২) সুখা, (৩) প্রজ্ঞা, (৪) তুষ্টি (ও পুষ্টি), (৫) স্মৃতি, (৬) দীপ্তি, (৭) রাগ, (৮) বাক্, (৯) নীতি, (১০) কান্তি, (১১) অমৃতা এবং (১২) সর্বাত্মিকা শক্তি। উহাদের হইতে পুনঃ দ্বাদশ "মূর্তিপাল" উৎপন্ন হন। উঁহারা ইহসংসারে তত্তৎ শক্তি দ্বারা বিখ্যাত। উঁহারা "মাসসমূহের অধিপগণ" বলিয়া খ্যাত। "দ্বাদশমাসেন্দ্রগণ" এই প্রকারে মাসে মাসে ব্যবস্থিত।[৩]

মাস	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন
অধিপ	বিষ্ণু	মধুসূদন	ত্রিবিক্রম	বামন	শ্রীধর	হৃষীকেশ	পদ্মনাভ	দামোদর	কেশব	নারায়ণ	মাধব	গোবিন্দ

'মহাভারতে' এক ব্রত বর্ণিত আছে; তন্মতে বিভিন্ন মাসের (শুক্লা) দ্বাদশী তিথিতে উপবাস থাকিয়া ভগবান বিষ্ণুকে বিভিন্ন নামে অহোরাত্র পূজা করিলে দ্বাদশ ভিন্ন ভিন্ন প্রধান বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের ফল লাভ হয়। মার্গশীর্ষ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সকল নাম যথাক্রমে এই,—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ এবং দামোদর।[৪] ঐ সকল পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্যন্তরগণেরই নাম। মাসে মাসে পূজার বিধান হইতে মনে হয়, তাঁহারা মাসাধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রতি মাসে সূর্যকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করার প্রথা এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে এক বৎসরে বা বার মাসে সূর্যের বার নাম হয়। আদিত্যের ঐ দ্বাদশ নাম কালক্রমে দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বেদোক্ত ৩৩ দেবতার ১২টী ঐ দ্বাদশ আদিত্য। উঁহাদের নাম ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জন্য, অংশ, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। উঁহারা মাসাধিপতি। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু নারায়ণ সূর্যেরই নামান্তর।[৫] সুতরাং সূর্যের দ্বাদশ নাম বিষ্ণুরই দ্বাদশ নাম হয়।

---

১) ঐ, ২।৬৫

২) ঐ, ২।৭০—১ ৩) ঐ, ২।৭৯-৮৬ ; 'চৈতন্যচরিতামৃত', ২।২০।১৯৬-৯

৪) মহাভা, ১৩।১০৯ তম অধ্যায়

৫) যথা দেখ

> "এক এব হি লোকানাং সূর্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ।"—(বিষ্ণুভাগপু, ১২।১১।৩০'১
> "এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ।"—(ঐ, ১২।১১।৪৫'১)
> স এষ ভগবানাদিপুরুষ এব সাক্ষান্নারায়ণো" ইত্যাদি (ঐ, ৫।২২।৩—)

তাহাতে ধাতাদি বিষ্ণুরই মূর্তি বা ব্যূহ হয়।[১] প্রাচীন ধাতাদি ১২ নামের স্থলে কেশবাদি ১২ নাম বৈষ্ণবদিগেরই উদ্ভাবিত মনে হয়। 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা'য় আছে যে ধাতাদি "দ্বাদশ আদিত্য অনিরুদ্ধাত্মক বলিয়া মত হয়।"[২] জ্যোতিষার্ণব বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে মার্গশীর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর—ইহারা যথাক্রমে মাস বা মাসেশ বলিয়া প্রোক্ত হয়।[৩] বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ঐ মাসের নামক বা অধিপতি দেবতাকে বিধিবৎ সমভ্যর্চনা এবং প্রকীর্তন করিলে ("বিধিবৎ প্রকীর্তয়ন্‌……সমভিপূজ্য") মনুষ্য "তৎপদং যাতি যত্র ন হি জন্মজং ভয়ং" ('সেই পদে গমন করে, যাহা হইতে ইহসংসারে পুনর্জন্ম হওয়ার ভয় থাকে না')।[৪]

বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয় হইতে বিদ্বেশ্বরগণের উৎপত্তি এই প্রকারে হয় বলিয়া 'পাদ্মসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে,[৫]—ব্যূহ বাসুদেব হইতে অপর একজন বাসুদেব উৎপন্ন হন; তাঁহা হইতে পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তম হইতে জনার্দন উৎপন্ন হন। অর্থাৎ

ব্যূহ বাসুদেব—(অপর) বাসুদেব—পুরুষোত্তম—জনার্দন।

সেই প্রকারে

ব্যূহ সঙ্কর্ষণ—(অপর) সঙ্কর্ষণ—অধোক্ষজ—উপেন্দ্র;[৬]
ব্যূহ প্রদ্যুম্ন—(অপর) প্রদ্যুম্ন—নৃসিংহ—হরি;
ব্যূহ অনিরুদ্ধ—(অপর) অনিরুদ্ধ—অচ্যুত—কৃষ্ণ।

ইঁহাদের লক্ষণ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

'পাদ্মসংহিতা'য় আরও উক্ত হইয়াছে যে (চতুর্মূর্তির) আদিদেব বাসুদেব হইতে ব্রাহ্মী, প্রাজাপত্যা, বৈষ্ণবী, দৈবী, আর্ষী, মানুষী, আসুরী এবং পৈশাচী ক্রমে "মূর্ত্যষ্টক" বা "অষ্ট পরামূর্তি" উৎপন্ন হয়।[৭] উঁহাদের সকলের লক্ষণও বর্ণিত হইয়াছে।[৮] যথা,—ব্রাহ্মী চতুর্মুখ, অষ্টভুজ, তপ্তপনীয়সমদ্যুতি, পীতাম্বরধর ও বনমালা-বিভূষিত। তাঁহার আট হাতে বর, চক্র, পদ্ম, বাণ, শঙ্খ, গদা, চর্ম ও শার্ঙ্গধনু আছে। মহর্ষি মরীচি ও ভৃগু তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। প্রাজাপত্যা চতুর্ভুজ, শঙ্খকুন্দেন্দুবর্ণাভ, পীতবাস ও বনমালাধর। তাঁহার চারি হাতে শঙ্খ,

---

[১] (বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' (১২।১১।২৮'১) দ্বাদশাদিত্যকে "ব্যূহং সূর্যাত্মনো হরেঃ" বলা হইয়াছে।

[২] বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ৩।১০।২২-২৩'১। উহাতে 'পর্জন্য' স্থলে 'সবিতা' নাম আছে এবং 'অংশ,কে 'অংশু' বলা হইয়াছে।

[৩] 'বৃহৎসংহিতা', ১০৪।১৪-৫ এই বচনের শেষাংশের "মাসাঃ প্রোক্তা যথাসংখ্যং" এবং "মাসেশাঃ স্যুর্যথাসংখ্যং" এই দুই প্রকার পাঠ পাওয়া যায়। টীকাকার ভট্টোৎপলও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

[৪] ঐ, ১০৪।১৬

[৫] পাদ্মসং, ১।২।২৫'২—২৮'১; বৃহদ্‌ব্রহ্মসং, ১।১৩।১১৫'২—১২০.১

[৬] এই সকল নাম আমাদের দৃষ্ট 'অগ্নিপুরাণে' যে ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে তন্মতে জনার্দন অধোক্ষজ হইতে, এবং উপেন্দ্র পুরুষোত্তম হইতে উৎপন্ন হন। তবে তাহা মুদ্রাকর প্রমাদ কিনা বিবেচ্য।

[৭] পাদ্মসং, ১।২।২৮'২-৩০'১; ৩।১৬।৪৭-৪৯'১ [৮] ঐ, ৩।১৬।৪৯-৭৮

চক্র, গদা ও অভয় বর্তমান। মহর্ষি সনক ও সনৎকুমার তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবী চতুর্ভুজ, ভিন্নাঞ্জননিভ, পীতবাস, বনমালাধর এবং শ্রী ও ভূ দেবী সংযুক্ত। তাঁহার চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও বর বা অভয় বিদ্যমান। নারদ ও ভৃগু তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ইত্যাদি। মানুষী মূর্তি দ্বিভুজ, শঙ্খচক্রধর, সৌম্য ও মুকুটোজ্জ্বল। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পর পর শ্রীদেবী, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও ব্রহ্মা এবং বাম পার্শ্বে পর পর অনিরুদ্ধ, শাম্ব ও গরুড় বর্তমান। অষ্টমূর্তির সকলেই সর্বাভরণভূষিত এবং শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বনমালা বিভূষিত। 'বৃহদব্রহ্মসংহিতা'য় চতুর্থী মূর্তিকে 'পুণ্ড্ররূপিণী' বলা হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে ঐ "মূর্ত্যষ্টক" দেবদেব বাসুদেব হইতে, কোন কারণবশতঃ, পৃথিবী হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে।[১]

'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' বর্ণিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, তদ্ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। তিনি "পুরুষবিধ" ছিলেন। একাকী থাকিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন না। তাই দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি স্ত্রী ও পুরুষ দ্বিধা হইলেন। তদুভয়ে মিলিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন।[২] সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের বীজ ঐ শ্রুতিতে নিহিত আছে মনে হয়। যাহা হউক, 'শাণ্ডিল্যসংহিতা'য় উহা যথাযথ পরিগৃহীত হইয়াছে।[৩] তবে আদিপুরুষ বা আত্মা তথায় 'নারায়ণ' অভিহিত হইয়াছেন। আরও কথিত হইয়াছে যে ভাগবতাগমে তদুৎপন্ন স্ত্রী 'লীলা' বা 'লীলাশক্তি' এবং পুরুষ 'বাসুদেব' নামে অভিহিত হয়। "তাঁহা (বাসুদেব) হইতে সঙ্কর্ষণ (উৎপন্ন হন) যাঁহাকে (ভাগবতশাস্ত্র) আদিশ্রুতিচিদাত্মক বলে; সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মতি উৎপন্ন হন, এবং উঁহা (প্রদ্যুম্ন) হইতে মনোময় অনিরুদ্ধ (উৎপন্ন হন)। সকলেই সেই বাসুদেবের পরিণামান্তরস্বরূপ ('পরিণামান্তরাত্মক')। এইরূপে ঐ দেব স্বয়ং স্বাত্মক জগতে ক্রীড়া করেন। অনন্তর তিনি সগুণ হইয়া মায়াক্ষরকে সৃষ্টি করেন।"[৪] কথিত হইয়াছে যে সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি, তথা দেবতাগণ ও মুনিগণ, নারায়ণদেবকে নির্গুণ বলেন; কেননা, তিনি নিত্য, নিরন্তর, নির্বিকার, নিরাকার, নিরাশ্রয় এবং নিজানন্দপূর্ণ।[৫]

কোন কোন সংহিতায় "ষোড়শমূর্তি"র উল্লেখ আছে। বাসুদেবাদি চতুর্মূর্তি এবং কেশবাদি দ্বাদশ মূর্তি (কিংবা অপর বাসুদেবাদি দ্বাদশ মূর্তি) একত্রে ষোড়শ মূর্তি হয়। পরন্তু উক্ত ষোড়শমূর্তি ভিন্ন। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে কেশবাদি দ্বাদশ মূর্তি সুদর্শন-পুরুষের পরিবার, আর "বিষ্ণ্বাদি ষোড়শমূর্তি" বা "বিষ্ণ্বাদি মূর্তিভেদগণ" তাঁহার পঞ্জর।[৬] উঁহাদের ধ্যানও ভিন্ন ভিন্ন।[৭] 'পৌষ্করসংহিতা'য় "ষোড়শমূর্তি"র আয়ুধাদি বিবৃত হইয়াছে।[৮] 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে'ও নাকি ১৬ মূর্তির আয়ুধবিন্যাস বর্ণিত হইয়াছে।[৯]

পরবর্তী পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রমতে ব্যূহবাদের রহস্য তদনুযায়ী পিল্লৈ লোকাচার্য (১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ পর, ব্যূহ,

---

১) বৃহদ্ব্রহ্মসং,১।১৩।১৩৩·২-১৩৫

২) বৃহউ, ১।৪।১— ৩) শাণ্ডিল্য,সং, ৩।১।২— ৪) ঐ, ৩।১।৭·২-৯ ৫) ঐ ৩।১।২—৩

৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৩৬।৪৯·২-৫১, ৬১·২-৬২·১ ৭) ঐ, ৩৬।৯·২-১২

৮) পৌষ্করসং, ৩৬।১৭২·২— ৯) 'চৈতন্যচরিতামৃত', ২।২০।২৩৫-৭

বিভব, অন্তর্যামিত্ব ও অর্চাবতার ভেদে পঞ্চপ্রকার। তন্মধ্যে অকালকাল্যে ও অনবধিক আনন্দে দ্বিতীয় দেশে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে) নিত্যমুক্তদিগের ভোগ্যত্বে অবস্থিতি 'পরত্ব'। সৃষ্টিস্থিতি-সংহারার্থ, সংসারিসংরক্ষণার্থ এবং উপাসকদিগকে অনুগ্রহার্থ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে অবস্থিতির নাম 'ব্যূহ'। পরত্বে জ্ঞানাদি ছয় (গুণ) পূর্ণ ; ব্যূহে দুই দুই গুণ প্রকট (হয়)। তন্মধ্যে সঙ্কর্ষণ জ্ঞান ও বল যুক্ত। (তিনি) জীবতত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া উহাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করত প্রদ্যুম্নাবস্থা প্রাপ্ত হন। (তিনি) শাস্ত্রপ্রবর্তন এবং জগৎসংহার করেন। প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য ও বীর্য যুক্ত। তিনি মনস্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া ধর্মোপদেশ করেন এবং মনুচতুষ্টয় প্রভৃতি শুদ্ধবর্গসৃষ্টি করেন। অনিরুদ্ধ শক্তি ও তেজ যুক্ত। তিনি (জগতের) রক্ষণের, তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের, কালসৃষ্টির এবং মিশ্রসৃষ্টির নির্বাহক। বিভব অনন্ত হইলেও দ্বিবিধ এবং গৌণও মুখ্য ভেদে ভিন্ন ইত্যাদি।[১] টীকাকার বর্বরমুনি (জন্ম ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে) 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র ও ততোধিক বিষ্বক্সেন সংহিতা'র প্রমাণ উদ্ধৃত করত ঐ বিষয় বিশদ করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ (১০১৭-১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) বলেন,[২] ভাগবতশাস্ত্রের প্রক্রিয়া এই—আশ্রিত বৎসল বাসুদেব নামক পরব্রহ্মই স্বাশ্রিতদিগের সমাশ্রয়ণীয়ত্বার্থ স্বেচ্ছায় চতুর্ধা অবস্থিত হন। সুতরাং চাতুরাত্ম্যোপাসনা প্রকৃত পক্ষে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা। সম্পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্যবপু বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব এই ত্রিবিধ ভেদে ভিন্ন।[৩] ভক্তগণ জ্ঞানপূর্বক কর্মদ্বারা যথাধিকার উঁহাদের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হয়। কথিত হয় যে বিভবার্চন দ্বারা ব্যূহকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর ব্যূহার্চন দ্বারা সূক্ষ্ম বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।[৪] রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি প্রাদুর্ভাবগণ 'বিভব'। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপ চতুর্ব্যূহ 'ব্যূহ'। আর কেবলষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মই 'সূক্ষ্ম'। অতএব সঙ্কর্ষণাদি পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপ (মাত্র)। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" এই শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্য নিমিত্ত তাঁহাদের স্বেচ্ছায় বিগ্রহসংগ্রহরূপ জন্ম (ভাগবতশাস্ত্রে) অভিহিত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, যদিও তাঁহারা জীবাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। যেমন শ্রুতিতে ব্রহ্ম আকাশ, প্রাণ, প্রভৃতি শব্দ

---

১) 'তত্ত্বত্রয়', ১০১ পৃষ্ঠা। ২) 'শ্রীভাষ্য', ২।২।৪১

৩) রামানুজ এইখানে অন্তর্যামী ও অর্চার উল্লেখ করেন নাই। তাই বলিয়াছেন যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম ত্রিধা অবস্থিত। তিনি এই বিষয়ে '(পৌষ্কর সংহিতা'কে অনুসরণ করিয়াছেন। উহাতে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে বিভব, ব্যূহ এবং অচ্যুত শাশ্বতরূপ বা সুসূক্ষ্ম এই তিনটি পরমপদ প্রাপ্তির পরম কারণ বলিয়া স্মৃত হন। প্রপন্নদিগকে এবং জ্ঞানপূর্বক কর্ম দ্বারা ভাবিতাত্মা কর্মীদিগকে উহারা ক্ষিপ্রই সৎপদপ্রাপ্তি প্রদান করেন। কামীদিগকে উহারা কাম্য বস্তু প্রদান করেন। (৩২।১১৩-৬)

৪) স্বকৃত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' রামানুজদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া মাধবাচার্য (জন্ম ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন, "তত্র পূর্বপূর্বমূর্ত্ত্যুপাসনয়া পুরুষার্থপরিপন্থিদুরিতনিচয়ক্ষয়ে সত্যুত্তরোত্তরমূর্ত্ত্যুপনত্যধিকারঃ।" তিনি 'পাঞ্চরাত্ররহস্য' নামক এক গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন, উহাও তদ্বৎ। সুতরাং তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।[১] তৎপূর্বে আচার্য যামুনও (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) সেই প্রকারই বলিয়াছেন। রামানুজ তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। যামুন বলিয়াছেন, "পরন্তু ইহারা চারিজন (হয়ত স্বতন্ত্র এবং) সমানৈশ্বর্যভাগীই, কিম্বা একেরই চতুর্ভেদ (—'একেরই স্বেচ্ছায় পরিগৃহীত মূর্তি চতুষ্টয়')। দুই প্রকারে ব্যুৎপত্তি অসম্ভব। সমানৈশ্বর্যভাগী হইলে তুল্যত্ব হেতু (একে অপরকে) নিশ্চয় সৃষ্টি করেন না। একাত্মত্ব অভ্যুপগম করিলেও উৎপত্তি সেই প্রকার অসম্ভব। কেননা, একেতে স্রষ্টৃসৃজ্যবিভাগ কল্পনা করা যায় না।"[২] এইরূপে তিনি সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন যে সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তি অসম্ভব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে প্রথম বিকল্প কোন ঈশ্বরবাদীর স্বীকার্য নহে ; তাহাতে জগৎকে অনেকেশ্বর মানিতে হয়। বিশেষতঃ পাঞ্চরাত্রবাদিগণের মতে একমাত্র বাসুদেবই পরা প্রকৃতি পরমাত্মা। তাঁহারা অনেক ঈশ্বর মানেন না। তাঁহারা বলেন যে সেই ভগবান্ সকল হইলেও লীলাবিরচিত চতুর্ভেদ হইয়া জগৎকে সংরক্ষণ করেন। তাহা অযৌক্তিকও নহে। "অচিন্ত্যমহিমাময় লীলাই যাঁহার একমাত্র প্রয়োজন এবং যিনি স্বলীলাবশত গগন-পবন-হর-বিরিঞ্চ্যাদি-প্রপঞ্চ বিরচনা করেন সেই ভগবানের রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নাদি স্বচ্ছন্দবিগ্রহ-সমূহ (থাকা) যেমন বিরুদ্ধ হয় না, তেমন সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নাদিভেদসমূহ।"[৩] ইহা পরবর্তী পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্ত বটে। পরন্তু 'মহাভারতে'র 'নারায়ণীয়াখ্যানে' ঐ সম্পর্কে "প্রসূত" "অসৃজৎ" ও "অজীজনৎ" এই সৃষ্টিবাচক শব্দসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার অন্যত্র 'বিশ্বোপাখ্যানে'ও সেই প্রকারে বাসুদেবকর্তৃক সঙ্কর্ষণাদির সৃষ্টির কথা আছে। ("সৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণং··· অস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং···")

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' অনন্ত চতুর্ব্যূহের কল্পনা দেখা যায়। কথিত হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ কৃষ্ণের "প্রাভব-বিলাস"।[৪] উঁহারা "আদি-চতুর্ব্যূহ" এবং মথুরা ও দ্বারকায় নিত্য বাস করেন। উঁহাদের হইতে অনন্ত চতুর্ব্যূহ প্রকটিত হয়।[৫] অনন্তচতুর্ব্যূহ-কল্পনা কোন পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে আমরা পাই নাই। আদি-চতুর্ব্যূহের ব্যতীত অপর কোন চতুর্ব্যূহের পরিচয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ পূর্বরূপে চতুর্ব্যূহ লইয়া নারায়ণরূপে পরমব্যোমে বাস করেন। নারায়ণের চারি ব্যূহ তাঁহার চারিদিকে আবরণরূপে অবস্থিত, বাসুদেব পূর্বে, সঙ্কর্ষণ দক্ষিণে, প্রদ্যুম্ন পশ্চিমে এবং অনিরুদ্ধ উত্তরে।[৬]

'মহাভারতে' দেখা যায় যে ভগবান্ বিষ্ণুর সহস্র নামের দুই নাম 'চতুর্ব্যূহ', এবং

---

১) 'আগম প্রামাণ্য, ৫৫-৯ পৃষ্ঠা। ২) ঐ, ৫৭ পৃষ্ঠা।

৩) 'আগমপ্রামাণ্য', ৫৬ পৃষ্ঠা। ৪) 'চৈতন্যচরিতামৃত', ২।২০।১৮৪

৫) "আদি-চতুর্ব্যূহ, কেহো নাহি ইহঁার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥"—(ঐ, ২।২০।১৮৭-৮)

৬) ঐ, ২।২০।১৯০-১

'চতুরাত্মা' এবং অপর দুই নাম 'চতুর্মূর্তি' এবং 'চতুর্ভাব'।[১] পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'ব্যূহ' ও 'মূর্তি' শব্দদ্বয় অভিন্নার্থক, এবং 'চতুর্ব্যূহ'কে পুরাণপাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কখন কখন 'চতুর্মূর্তি' এবং 'চতুরাত্মা'ও বলা হইয়াছে। তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে বিষ্ণু সহস্রনামে ঐ সকল সংজ্ঞাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং প্রথমোক্ত সংজ্ঞাদ্বয়কে দুই দুই রূপে ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। অন্যথা নামের সহস্র সংখ্যা পূর্ণ করা আরও কঠিন হইবে। 'বিষ্ণুসহস্রনাম'—ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এক স্থলে বলিয়াছেন যে বাসুদেবাদি চারি মূর্তিই 'চতুর্ব্যূহ'[২] এবং অপর স্থলে বলিয়াছেন যে শরীরপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ, বেদপুরুষ, এবং মহাপুরুষ—শ্রুত্যুক্ত এই চার পুরুষ বা ব্যূহই 'চতুর্ব্যূহ'।[৩] 'চতুরাত্মা' সম্বন্ধে তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে জগতের সৃষ্ট্যাদিতে বাসুদেবের চারি বিভূতিই 'চতুরাত্মা'[৪] এবং অন্যত্র বলিয়াছেন যে চিত্তাদি অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ই 'চতুরাত্মা', অথবা চতুর্+আত্মা (=মন)=চতুরাত্মা।[৫] তাঁহার মতে, বিরাট, সূত্র, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়—এই আত্মাই 'চতুর্মূর্তি'। পরন্তু 'মহাভারতে' ঐ সংজ্ঞার অন্য এক ব্যাখ্যা আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "আমি চতুর্মূর্তি হইয়া শাশ্বত কাল ধরিয়া লোকযাত্রার্থ উদ্যত। আমি আপনাকে (চতুর্ধা) প্রবিভক্ত করিয়া ইহ সংসারে লোকগণের হিত সাধন করি। আমার এক মূর্তি ইহ ভুবনে স্থিত থাকিয়া তপশ্চর্যা করে। অপর (দ্বিতীয়) মূর্তি সাধু ও অসাধু কর্মকারী জগৎকে দেখে। অপর (তৃতীয়) মূর্তি মনুষ্যলোক আশ্রয় করত কর্ম করে। অপর চতুর্থী মূর্তি সহস্রবৎসরব্যাপী নিদ্রায় শয়ান থাকে।"[৬] টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে অত্রোক্ত প্রথম মূর্তি নারায়ণ ঋষি,-যিনি হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত; দ্বিতীয় মূর্তি পরমাত্মা (বা ঈশ্বর), যিনি জগতের পাপপুণ্যের বিচার করেন; তৃতীয় মূর্তি ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব; এবং চতুর্থ মূর্তি জলশায়ী (বা নারায়ণ)। 'পৌষ্কর সংহিতা'য় 'চতুর্ব্যূহ' ও 'চতুরাত্মা' সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে কখন কখন পার্থক্য করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে বাসুদেবাদি চতুষ্টয় 'চতুর্ব্যূহ;[৭] আর নবব্যূহের আদিমূর্তি বাসুদেব ব্যতীত অপরের মধ্যে ক্রমাগত যে কোন চারিটি "চতুরাত্মা" বা "চতুর্মূর্তি"; যথা, সঙ্কর্ষণাদিনারায়ণান্ত চতুষ্ক চতুরাত্মা, প্রদ্যুম্নাদিব্রহ্মান্ত চতুষ্টয় চতুরাত্মা, ইত্যাদি।[৮] বাসুদেবকে বাদ না দিলে প্রথম চতুরাত্মা, বাসুদেবাদি

---

[১] মহাভা, ১৩।১৪৯।২৮'২ ও ৯৫; আরও দেখ—"চতুরাত্মধরঃ" (১২।৩৪৬।২০.১); চতুর্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি।" (১২।৩৫১।২২'১); "চতুর্ভিশ্চতুরাত্মানং সত্ত্বস্থং সাত্বতাং পতিম্। যং দিব্যৈর্দেবমর্চন্তি গুহ্যৈঃ পরমনামভিঃ॥" (১২।৪৭।২৭)

[২] 'বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য', ২৮ এই স্থলে শঙ্কর নিম্নোক্ত ব্যাস-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ব্যূহাত্মানং চতুর্ধা বৈ বাসুদেবাদিমূর্তিভিঃ।
সৃষ্ট্যাদীন্ প্রকরোত্যেষ বিশ্রুতাত্মা জনার্দনঃ॥"

[৩] 'বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য', ৯৫ উক্ত চারি পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণের জন্য 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ১ম ভাগ, দেখ। কোন কোন পুরাণেও ঐ চারি পুরুষের উল্লেখ আছে। যথা,—'পদ্মপুরাণে' 'ছন্দঃপুরুষ, স্থলে 'শুদ্ধ পুরুষ' নাছে। (পদ্মপু, উত্তর খণ্ড, ২৭২।১১৩-১১৪'১)

[৪] বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য ২৮ এই খানে বিষ্ণুপুরাণের এক বচন উপস্থিত করিয়াছেন।

[৫] ঐ ৯৫

[৬] মহাভা ৭।২৯।২৬—৮

[৭] পৌষ্করসং, ১০।৩

[৮] ঐ, ৩৬।১—

অনিরুদ্ধান্ত চতুষ্টয়, ও চতুর্ব্যূহ অভিন্ন হইত—অন্ততঃ ঐ স্থলে চতুর্ব্যূহ ও চতুরাত্মা, সংজ্ঞাদ্বয়ের পার্থক্য থাকিত না। বোধ হয় সেই কারণেই চতুরাত্মা পরিগণনায় বাসুদেবকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ঐ চতুরাত্মার অর্চনা ভাবিতাত্মা ব্যক্তিদিগের চতুর্বর্গফলপ্রদ, আর ফলার্থীদিগের অভীষ্টফলপ্রদ।[১] চতুরাত্মার অপর ব্যাখ্যাও আছে। যথা, প্রাণ, ইচ্ছা, শব্দ ও কাল—এতৎ চতুষ্টয় চতুরাত্মা।[২] ব্যূহ বাসুদেব এবং তদুৎপন্ন কেশবাদি মূর্তিত্রয় মিলিয়া 'চতুরাত্মা'।[৩] সেই প্রকারে ব্যূহগত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং তত্তৎ মূর্তিত্রয়কে একত্রে পৃথক্ পৃথক্ 'চতুরাত্মা' বলা হইয়াছে।[৪] 'চতুর্ব্যূহ' সংজ্ঞার অন্য অর্থও উহাতে আছে।[৫] 'মহাভারতের' টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি ভাই বাসুদেবের চারি মূর্তি।'[৬]

মহাভারতপুরাণাদিতে দেখা যায়,—কৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব; তাঁহার বড় ভাই বলরামের নাম সঙ্কর্ষণ এবং তিনি শেষনাগের অবতার বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে; কৃষ্ণের এক পুত্রের নাম,—তাঁহার সর্বপ্রধান ধর্মপত্নী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রের নাম—প্রদ্যুম্ন; এবং প্রদ্যুম্নের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। আধুনিক কোন কোন লেখক মনে করেন যে ঐ সকল নামের সঙ্গে চতুর্ব্যূহবাদের সঙ্কর্ষণাদি নামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যথা, রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় মনে করেন যে ভাগবতধর্মে আদিতে ব্যূহকল্পনা ছিল না, উহা পরে প্রবর্তিত হয় এবং ভাগবতধর্মের এক বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। গীতা প্রথমাবস্থার গ্রন্থ। তাই উহাতে ব্যূহবাদের উল্লেখ নাই। পরন্তু উহাতে বাসুদেবের প্রকৃতিসমূহের পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং জীবের—উল্লেখ আছে। কালক্রমে ভাগবতধর্মের (অন্যতম প্রধান) প্রবর্তক কৃষ্ণ যখন উহার পরমতত্ত্ব বাসুদেব বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন তাঁহার ঐ আত্মীয়ত্রয়ও দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল এবং বাসুদেবের আদ্য প্রকৃতিত্রয় উহাদের নামে অভিহিত হইতে থাকিল।[৭] শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এই অনুমান বিচারসহ নহে।[৮] কেননা, গীতার মতে ভগবানের প্রকৃতি বস্তুতঃ দুইটিই—পরা এবং অপরা; মহাভূতাদি অপরা প্রকৃতিরই অন্তর্গত, আর জীব পরা প্রকৃতি। ভাণ্ডারকারের কল্পনায় এই পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই। অধিকন্তু উহাতে মন ও বুদ্ধিকে সংমিশ্রিত করিতে হয়, অন্যথা মনকে আদ্য প্রকৃতিত্রয়ের অন্তর্গত করা যায় না। আবার কোন কোন ব্যূহবাদ মতে

---

১) ঐ, ৩৩।১৬·২-৫ ২) ঐ, ৩৩।১৯·২

আরও দেখ—"কালবৈশ্বানরাখ্যা যা মৃর্তিস্তুর্যাত্মনো বিভোঃ"—(ঐ, ২০।৪৫·১)

৩) ঐ, ৩৬।১৫০ ৪) ঐ, ৩৬।১৫৬, ১৬২, ১৬৮

৫) যথা দেখ—ঐ, ৭।১২১, ১৪৮; ইত্যাদি।

৬) মহাভা. ১২।৩০৪।৮ (নীলকণ্ঠের টীকা)

৭) R. G, Bhandarkar, Vaisnaxisam etc, p. 17.

বার্থ লিখিয়াছেন, পাঞ্চরাত্রদিগের মধ্যে, কৃষ্ণ 'আত্মা' ছিলেন; তাঁহার ভাই বলরাম 'জীব' ছিলেন; তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন 'মন' এবং তাঁহার পৌত্র অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। (A. Barth, the Religions of India, authorised English Translation by Rev. I wood, London, 1882, p. 218)

৮) R, P. Chanda, Indo-Aryan Revs, Part I, pp. 97-8.

বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়ের প্রত্যেকে তৎপূর্ববূ্যহ হইতে উৎপন্ন। পরন্তু গীতার মতে বাসুদেবের প্রকৃতিদ্বয় তাঁহারই মত অজ ও নিত্য। এই সকল কারণে চন্দ মহাশয় অনুমান করেন যে ভাণ্ডারকারের অনুমান সমীচীন নহে।

কোন কোন পাঞ্চরাত্রসংহিতায় বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চারই বিষ্ণুর অবতার,—বিষ্ণু ঐ চারি অংশে মথুরায় অবতার হন।[১]

মহাভারতপুরাণাদিতে চতুর্ব্যূহবাদের বহুল উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে উহার বহুল প্রচার হইয়াছিল, অনেকেই উহাকেই গ্রহণ করিয়াছিল। আচার্য জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, "পরন্তু এই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ স্বয়ং ভগবান্ বাদরায়ণ কর্তৃক পুরাণাদিতে দর্শিত হইয়াছে। কেননা, উহাদিগেতে শত শত স্থানে বাসুদেবাদি ব্যূহসমূহকে অভ্যুপগম করা হইয়াছে। শ্রুতিসমূহেও ঐ সকল প্রক্রিয়া সতত দৃষ্ট হয়।"[২] মুখ্য মুখ্য শ্রুতিসমূহে ব্যূহবাদের উল্লেখ নাই। সুতরাং জীবগোস্বামীর ঐ উক্তির শেষাংশ সত্য নহে।

(২) অবতারবাদ

প্রাচীন ভাগবতধর্মে বিশ্বাস করা হইত যে ভগবান্ নারায়ণ যেই রূপ ইচ্ছা সেই রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, এবং কখন কখন কোন বিশেষ কার্য্য সাধনার্থ তিনি মনুষ্য কিংবা অপর কোন জাগতিক প্রাণীরূপে সাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বলেন,

"যাং যামিচ্ছেত্তনুং দেবঃ কর্তুংকার্য্যবিধৌ ক্বচিৎ।
তাং তাং কুর্যাদ্বিকুর্বাণঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা॥"[৩]

'দেব (নারায়ণ) কখন কখন কার্য্যার্থ যে যে মূর্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্বয়ং নিজে নিজেকে বিকারগ্রস্ত করিয়া সেই সেই মূর্তি করেন।' কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে দেবর্ষি নারদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন এবং বলেন যে—তিনি পশ্চিমোত্তর সমুদ্রে হয়শিরা মূর্তি হইয়া শ্রদ্ধার সহিত উত্তমরূপে হুত হব্যকব্য পান করেন;[৪] তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া অনেক বর দেন এবং তন্মধ্যে একটি এই যে

"প্রাদুর্ভাবগতশ্চাহং সুরকার্য্যেষু নিত্যদা।
অনুশাস্যস্ত্বয়া ব্রহ্মন্নিযোজ্যশ্চ সুতো যথা॥"[৫]

'হে ব্রহ্মন্! দেবতাদিগের কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভাবপ্রাপ্ত আমি পুত্রের ন্যায় নিত্য তোমার অনুশাস্য এবং নিযোজ্য হইব।' অনন্তর তিনি বিস্তারিতরূপে আপন বিভিন্ন প্রাদুর্ভাবসমূহের বর্ণনা করেন। শ্বেতদ্বীপ হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করত নারদ নর-নারায়ণ ঋষিকে বলেন, "ইহলোকে যে যে প্রকারে (ভগবান্ নারায়ণের) প্রাদুর্ভাবসমূহ হইবে, সেই সকলও (তিনি)

---

[১] যথা দেখ—লক্ষ্মীসং, ৮।৪১'২-৪২

[২] সর্বসংবাদিনী, বংগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণ, ১৫১ পৃষ্ঠা।

[৩] মহাভা, ১২।৩৪৯।৭৯

[৪] ঐ, ১২।৩৩৯।৫৯'২-৬০'১

[৫] ঐ, ১২।৩৩৯।৬৫

বলিয়াছেন।"[১] পরমর্ষি ব্যাস বলেন যে ভগবান নারায়ণ হয়শিরা মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকে দর্শন দেন; তখন তাঁহার হাতে কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড ছিল এবং তিনি সাঙ্গ বেদসমূহ আবৃত্তি করিতেছিলেন।[২] তিনি ব্রহ্মাকে বলেন যে জগতের ভার তাঁহার (ব্রহ্মার) হাতে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পরন্তু

"যদা চ সুরকার্য্যং তে অবিষহ্যং ভবিষ্যতি॥
প্রাতুর্ভাবং গমিষ্যামি তদাত্মজ্ঞানদৈশিকঃ।"[৩]

'যখন দেবগণের কার্য্য তোমার অবিষহ্য হইবে, তখন আত্মজ্ঞানদৈশিক আমি প্রাতুর্ভাব প্রাপ্ত হইব।' এই বলিয়া হয়শির-মূর্তি তথায় অন্তর্ধান হয়। অল্প পরে ব্যাস কিঞ্চিৎ বিস্তারিত রূপে সেই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বর্তমান কল্পের আদিতে ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে লোকসৃষ্টি করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান হন; তিনি মুহূর্ত মধ্যে 'দেব' নামে অভিহিত স্বস্থানে গমন করেন এবং নিজ পূর্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া "একীভাবগত" হন।[৪] ব্রহ্মা এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন। ক্রমে এই তপস্বিনী বসুমতী দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ হইয়া ভারাক্রান্ত হইল। তখন ভগবানের মনে এই বিচার উৎপন্ন হইল,—"অনেক দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপস্যা দ্বারা উত্তম বরসমূহ প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবীতে অত্যন্ত বলবান্ হইবে। বরলাভে দর্পিত হইয়া তাহারা সকলে অবশ্যই দেবগণ, ঋষিগণ এবং তপোধনগণের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবে। তখন পৃথিবীর ভার অবতরণ করা আমার পক্ষে ন্যায্য হইবে। অনন্তর পৃথিবীতে নানারূপে উৎপন্ন হইয়া ("নানাসমুদ্ভবৈঃ") পাপীদিগের নিগ্রহ এবং সাধুদিগের পালন দ্বারা ("নিগ্রহেণ চ পাপানাং সাধুনাং প্রগ্রহেণ চ")[৫] যথাশক্তি (ভার অবতরণ করিলে) এই তপস্বিনী মেদিনী (সংসারকে) ঠিক ঠিক ধারণ করিবে। পাতালে নাগরূপে থাকিয়া আমি এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি এবং এইরূপে আমার দ্বারা ধৃত হইয়া ইহা চরাচর বিশ্ব জগৎকে ধারণ করিতেছে। সেইহেতু আমি উৎপন্ন হইয়া ("সম্ভবং গতঃ") পৃথিবীর পরিত্রাণ করিব।' প্রাতুর্ভাব বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভগবান মধুসূদন উৎপত্ত্যর্থ অনেক রূপসমূহ সৃষ্টি করেন। বরাহ, নরসিংহ, বামন এবং মানুষরূপ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের দুর্বিনীত শত্রুগণকে বধ করিতে সঙ্কল্প করেন।[৬] গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন,

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"[৭]

হে ভারত! যখন যখন ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি নিজেকে সৃজন

---

১) "প্রাদুর্ভাবাশ্চ কথিতা ভবিষ্যা ইহ যে যথা॥"—(মহাভা, ১২।৩৪৩।৫২.২); আরও দেখ—৩৪৪।২১

২) ঐ, ১২।৩৪০।৯২

৩) ঐ, ১২।৩৪০।৯৬.২-৯৭.১

৪) "তাং চৈব প্রকৃতিং প্রাপ্য একীভাবগতোঽভবৎ॥"(ঐ, ১২।৩৪৮।২৮)

৫) ঐ, ১২।৩৪৯।৩৪.১

৬) ঐ, ১২।৩৪৯।৩৭-৩৮.১

৭) গীতা, ৪।৭-৮

করি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কর্মকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে উৎপন্ন হই।'

শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ নারদের নিকট আপন ভবিষ্য প্রাদুর্ভাবসমূহের নামোল্লেখ করেন, এবং যে যে প্রাদুর্ভাবে যে যে কর্ম করিবেন সেই সকল বিবৃত করেন।[১] তিনি বলেন যে "বরাহরূপ" ধারণ করত তিনি সর্বভূতহিতার্থ নষ্টপ্রায় পৃথিবীকে পুনঃ স্বস্থানে আনয়ন করিবেন এবং বলগর্বিত হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিবেন। যখন বিরোচনের পুত্র বলবান্ মহাসুর বলি ইন্দ্রকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করত ত্রৈলোক্য অপহরণ করিবে তখন মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে এবং অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হইয়া তিনি ইন্দ্রকে পুনঃ রাজ্য প্রদান করিবেন, দেবতাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবেন, এবং দেবতাসুররাক্ষসাদি সর্বলোকের অবধ্য বলিকে পাতালে প্রেরণ করিবেন। ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে রাম হইয়া সমৃদ্ধবলবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিবেন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশে সুরকার্যার্থে জগৎপতি দাশরথি রাম হইয়া বানরগণের সাহায্যে পুলস্ত্যকুলকলঙ্ক লোককণ্টক রাবণকে স্বগণের সহিত বধ করিবেন। এবং দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে কংসের বধের নিমিত্ত মথুরাতে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তখন তিনি নানা কার্য করিবেন। অপর প্রাদুর্ভাবের কর্তব্য কার্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, ঐ কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবের কার্যসমূহ তিনি অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর দেড় শ্লোকে তিনি হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, (ভার্গব)রাম, দাশরথি রাম, সাত্বত (বা কৃষ্ণ) এবং কল্কি—এই দশ প্রাদুর্ভাবের নাম করিয়াছেন।[২] উপসংহারে তিনি বলেন, "যখন যখন বেদশ্রুতি বিনষ্ট হয়, তখন তখন আমি উহাদিগকে পুনঃ প্রত্যাহরণ করি।"[৩]

"অতিক্রান্তাশ্চ বহবঃ প্রাদুর্ভাবা মমোত্তমাঃ॥
লোককার্যাণি কৃত্বা চ পুনঃ স্বাং প্রকৃতিং গতাঃ।"[৪]

'আমার বহু উত্তম প্রাদুর্ভাব ব্যতীত হইয়াছে। উহারা লোককার্যসমূহ সম্পাদন করত পুনঃ আমার নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।'

আধুনিক কোন কোন লেখক মনে করেন যে হংসাদি দশ প্রাদুর্ভাব বিষয়ক বচন 'মহাভারতে' পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক উহাতে কিংবা ঐ প্রাদুর্ভাব-গণনার অপর কোথাও নারায়ণ ঋষিকে কিংবা নর ঋষিকে ভগবান্ তাঁহার প্রাদুর্ভাব বলেন নাই। পরন্তু অর্জুনের সহায়ে কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবের কার্যসমূহের বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে "এই প্রকারে লোকে বলিবে যে ঈশ্বর নর ঋষি ও নারায়ণ ঋষি লোককার্যার্থ উদ্যোগী হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন।"[৫] তাহাতে অবশ্যই তিনি নারায়ণ ঋষিকে প্রকারান্তরে নিজের প্রাদুর্ভাব বলিয়াছেন। অন্যত্র, শ্বেতদ্বীপে প্রারম্ভেই ভগবান্ নারদ বলিয়াছেন, "নর ও নারায়ণ ঋষি তাঁহার শ্রেষ্ঠ তনু।[৬] সাংখ্যমতের প্রবর্তক ভগবান্ কপিলকে এবং যোগমতের প্রবর্তক ভগবান্ হিরণ্যগর্ভকেও নারায়ণের অবতার বলা হইয়াছে।[৭]

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।৭৬-১০৩'১ ২) মহাভা, ১২।৩৩৯।১০৩'২-১০৪

৩) ঐ, ১২।৩৩৯।১০৫'১ ৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।১০৬.২-১০৭'১ ৫) মহাভা, ১২।৩৩৯।১০০

৬) "মমৈতাস্তনবঃ শ্রেষ্ঠা জাতা ধর্মগৃহে দ্বিজ।
তাংস্ত্বং ভজস্ব সততং সাধয়স্ব যথাগতম্॥"—(মহাভা, ১২।৩৩৯।১৪)

৭) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬৮-৯ ; ৩৪২।৯৫-৬

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহে প্রাদুর্ভাবকে বিশেষভাবে ‘বিভব’ বলা হইয়াছে।[১] বিভবের সংখ্যা সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ‘পৌষ্করসংহিতা’র মতে প্রাদুর্ভাব “মৎস্যাদি দশ”।[২] ‘পাদ্মসংহিতা’য় স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে “মীনাদি দশ মূর্তি” এই—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য রাম, রাঘব (রাম), হলী (রাম), কৃষ্ণ ও কল্কি।[৩] ‘পারমেশ্বরসংহিতা’র মতে, উহারা “দিব্যাবতার”।[৪] ‘অহির্বুধ্ন্যসংহিতা’র মতে বিভব পদ্মনাভাদি ৩৯। তথায় উহাদের সকলের নামও উল্লিখিত হইয়াছে,—[৫]

(১) পদ্মনাভ
(২) ধ্রুব
(৩) অনন্ত
(৪) শক্ত্যাত্মা
(৫) মধুসূদন
(৬) বিদ্যাধিদেব
(৭) কপিল
(৮) বিশ্বরূপ
(৯) বিহঙ্গম
(১০) ক্রোড়াত্মা
(১১) বড়বাবক্ত্র
(১২) ধর্ম
(১৩) বাগীশ্বর
(১৪) একাম্ভোনিধিশায়ী
(১৫) কমঠেশ্বর
(১৬) বরাহ
(১৭) নারসিংহ
(১৮) পীযূষহরণ
(১৯) শ্রীপতি
(২০) কান্তাত্মা
(২১) রাহুজিৎ
(২২) কালনেমিঘ্ন
(২৩) পারিজাতহর
(২৪) লোকনাথ
(২৫) শান্তাত্মা
(২৬) দত্তাত্রেয়
(২৭) ন্যগ্রোধশায়ী
(২৮) একশৃঙ্গতনু
(২৯) বামনদেহ
(৩০) ত্রিবিক্রম
(৩১) নর
(৩২) নারায়ণ
(৩৩) হরি
(৩৪) কৃষ্ণ
(৩৫) পরশুরাম
(৩৬) ধনুর্ধর রাম
(৩৭) বেদবিৎ
(৩৮) কল্কী
(৩৯) পাতালশয়ন।

এই সকল বিভবনাম ‘সাত্বতসংহিতা’ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।[৬] তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে উঁহারাই “মুখ্য প্রাদুর্ভাবগণ”[৭] এবং যেই ক্রমে উঁহাদের নাম এইখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই উঁহাদের ক্রম।[৮] ‘লক্ষ্মীতন্ত্রে’ উক্ত হইয়াছে যে “বিভব অনন্তরূপ। পরন্ত পদ্মনাভাদি সেই বিভু অনিরুদ্ধের বিস্তর বলিয়া ‘সাত্বতসংহিতা’য় দর্শিত হইয়াছে।[৯] পরে পদ্মনাভাদি ৩৯ বিভবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে[১০] এবং আরও কথিত হইয়াছে যে উহাদের রূপ, আয়ুধসমূহ এবং শক্তি সমস্তই সাত্বতে সিদ্ধ হইয়াছে।[১১] ‘বিষ্বকসেনসংহিতা’র মতে,

---

১) বর্বরমুনি বলেন, “বিভবো নামেতরসজাতীয়ত্বেনাবির্ভাবঃ।” (‘তত্ত্বত্রয়ভাষ্য’, ১০৮ পৃষ্ঠা) এই বিভব সংজ্ঞা ‘পদ্মপুরাণে’ও পাওয়া যায়। (উত্তরখণ্ড, ২৫৭।৪০-১ ; ২৫৮।৩-৪)

২) পৌষ্করসং, ৩৬।১২৬·২ ৩) পাদ্মসং ১।২।৩০-২ ৪) দেখ ‘পাঞ্চরাত্ররক্ষা’, আরও দেখ—৫৬।২—

৫) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।৫০-৭·১ ; ৬) সাত্বতসং, ৯।৭৭·২-৮৩=অহির্বুধ্ন্যসং, ৫।৫০·২-৬ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ১০০ পৃষ্ঠা।

মুদ্রিত ‘সাত্বতসংহিতা’য় ১৪শ বিভবকে ‘একার্ণবশয়’, ১৫শকে ‘কূর্ম’ এবং ১৮শকে ‘অমৃতাহরণ’ বলা হইয়াছে। ‘অহির্বুধ্ন্যসংহিতা’র অন্য স্থলে (৫৬।৩·২, ৮·১. ১১·১) ঐ, নামই আছে।

৭) “প্রাদুর্ভাবগণো মুখ্য ইত্যুক্তস্তে সমাসতঃ।”—(সাত্বতসং, ৯।৮৪·১)

৮) “পদ্মনাভাদয়ো দেবা বাচ্যাস্তেষাং ক্রমেণ তু।”—(ঐ, ৯।৭৭।·১) ৯) লক্ষ্মীতং, ২।৫৫ ; আরও দেখ—৪।২৯

১০) লক্ষ্মীতং ১১।১৮·২-২৫ ; ২০।৩৭-৪০·২ ১১) ঐ, ১১।২৮

বিভব প্রকৃত পক্ষে অনন্ত ;[১] তবে পদ্মনাভাদি সমস্ত বিভবগণ সংখ্যায় প্রধানতঃ ২৬ এবং উঁহারা সকলেই অনিরুদ্ধ হইতে সমুৎপন্ন।[২] উক্ত ২৬ বিভব কে কে জানা নাই।[৩] সুতরাং উঁহাদের সকলে উপরে উক্ত ৩৯ বিভবের অন্তর্গত কিনা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, লোকাচার্যও ঐ মত অঙ্গীকার করিয়াছেন,—তিনিও বলিয়াছেন যে "পদ্মনাভাদি বিভবগণ ষড়্‌বিংশ ভেদভিন্ন।"[৪] তাঁহার ভাষ্যকার বর্বরমুনি বলেন যে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' এবং 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র মধ্যে প্রধান প্রাতুর্ভাবের সংখ্যা বিষয়ে বিরোধ নাই। কেননা, তিনি বলেন, অহির্বুধ্ন্যোক্ত ৩৯ অবতারের মধ্যে কপিল, দত্তাত্রেয় এবং পরশুরাম—এই তিন জন "আবেশাবতার" ; তাঁহাদের কার্য নিকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রধান অবতারের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বাকী ৩৬ জনের মধ্যে কতিপয় আবার অপর "পূর্বোৎপন্ন বিভব হইতে প্রাতুর্ভূত।" সুতরাং অনিরুদ্ধোৎপন্ন প্রধান বিভবগণের মধ্যে তাঁহাদিগকেও ধরা যায় না। তাঁহাদিগকেও বাদ দিলে প্রধান বিভবের সংখ্যা ২৬ হয়।[৫] এই সমন্বয় প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে 'সাত্বতসংহিতা'য় অতি স্পষ্ট বাক্যে উক্ত ৩৯ প্রাতুর্ভাবকে মুখ্য প্রাতুর্ভাব বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে কপিলাদিকে অধম বিভব বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ তদুক্ত ৩৬ বিভবের কোন্ দশটিকে তিনি "পূর্বোৎপন্ন বিভব হইতে প্রাতুর্ভূত" বা বিভবান্তর মনে করেন, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। হয়ত তিনি স্বয়ং তৎসম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন না। 'পৌষ্করসংহিতা'য় উক্ত ৩৯ বিভবের কতিপয়কে বিভবান্তর বলা হইয়াছে। (পরে দেখ)

ইহা বিশেষ লক্ষিতব্য যে পূর্বোক্ত ৩৯ বিভবের মধ্যে বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণের নাম নাই।[৬] যে কৃষ্ণের নাম তন্মধ্যে আছে, উনি ভিন্ন ব্যক্তি। 'মহাভারতে' উক্ত বরাহাদি ৬ প্রাতুর্ভাবের সাত্বত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর পাঁচজন যথাক্রমে উক্ত কোষ্টির ১৬, ১৭, ২৯, ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যক প্রাতুর্ভাব। হংসাদি দশাবতারের সাত্বত ব্যতীত অপর ৯ অবতার যথাক্রমে ৯, ১৫, ২৮, ১৬, ১৭, ২৯, ৩৫, ৩৬ ও ৩৮। 'পাদ্মসংহিতা'য় উক্ত মীনাদি দশাবতারের হলী রাম ও কৃষ্ণ ব্যতীত অপর ৮ জন যথাক্রমে এই;—২৮, ১৫, ১৬, ১৭, ২৯, ৩৫, ৩৬ ও ৩৮। ৩য় বিভব অনন্ত হলধর বলিয়া মনে হয়।[৭] 'লক্ষ্মীসংহিতা'র মতে, বিষ্ণু মথুরায় চারিরূপে অবতার হন এবং তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী তখন রেবতী, রুক্মিণী, রতি এবং উষা হন।[৮]

---

[১] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও আছে যে বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥" (১।৩।২৬)

[২] 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্যে' (১১২ পৃষ্ঠায়) ধৃত 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র বচন।

[৩] 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্যে' বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র সেই বচন উদ্ধৃত হয় নাই। মূল সংহিতা আমরা দেখি নাই।

[৪] 'তত্ত্বত্রয়', ১১১ পৃষ্ঠা

[৫] 'তত্ত্বত্রয়ভাষ্য', ১১৩ পৃষ্ঠা

[৬] শ্রেডার বোধ হয় মনে করেন যে বেদবিৎ'· (৩৭শ সংখ্যক) নামে কৃষ্ণকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন যে 'মহাভারতে' উক্ত দশ অবতারের নাম উক্ত কোষ্টিতে আছে। Schrader, Introduchor to the Pancaratra, p. 43) পরন্তু 'সাত্বতসংহিতা'র (১২।১৫৩-৬) বর্ণনা হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে বেদবিৎ বেদব্যাসই। শ্রেডার স্বয়ং পরে তাহা বলিয়াছেন (p. 45)

[৭] সাত্বতসং, ১২।৬-৮। অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৬।৭

[৮] লক্ষ্মীসং, ৮।৪১·২-৪২